রবীন্দ্রজীবনী

প্রথম খণ্ড

১২৬৮-১৩০৮ ॥ ১৮৬১-১৯০১

রবীন্দ্রজীবনী

ও

রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা

যে-কেহ মোরে দিয়েছ সুখ,
দিয়েছ তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি।
যে-কেহ মোরে দিয়েছ দুখ
দিয়েছ তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি॥
যে-কেহ মোরে বেসেছ ভালো
জ্বেলেছ ঘরে তাঁহারি আলো,
তাঁহারি মাঝে সবারি আজি
পেয়েছি আমি পরিচয়,
সবারে আমি নমি॥

"বর্ত্ম কর্ষতি পুরঃ পরমেক
স্তদ্‌গতানুগতিকো ন মহার্ঘ্যঃ।"

একজনই আগে পথ কেটে দেন। পরে সেই পথ দিয়ে যাতায়াত করার লোক দুর্লভ হয় না।

পরিবর্ধিত সংস্করণের ভূমিকা

রবীন্দ্রজীবনী মুদ্রিত হইতেছে শুনিয়া একদিন শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "বইখানি বুঝি ফিরে ছাপছেন?" তাঁহাকে আমি উত্তরে বলি, 'রবীন্দ্রজীবনী' ও 'প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়' এই দুইটি কথা ছাড়া পুরাতন গ্রন্থের কিছুই বোধ হয় ছাপা হইতেছে না, কারণ বইখানি পনেরো আনাই নূতন করিয়া লেখা। তাছাড়া দ্বিতীয় সংস্করণে বইখানি আকারেও প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। চৌদ্দ বৎসর পূর্বে যখন রবীন্দ্রজীবনী লিখিতে আরম্ভ করি তখন কবি সম্বন্ধে কিইবা তথ্য জানা ছিল। সেই সামান্য উপকরণ অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রজীবনী রচনায় প্রবৃত্ত হই। তারপর গত কয়েক বৎসরের মধ্যে সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষীয়েরা কবির জীবনী সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য ও উপকরণ লোকচক্ষুর গোচর করিয়াছেন। এই সকল উপাদানের মধ্যে প্রধান তাঁহার পত্রাবলী। কবির জীবিতকালে যেসব পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার অধিকাংশই কবিকর্তৃক সম্পাদিত ও সংশোধিত; যেসব পত্রের সাহিত্যিক মূল্য নাই অথচ তথ্যের বিচারে চরিতকারের নিকট মূল্যবান, সেগুলিকে কবি অনেকসময়েই নির্মমভাবে বর্জন করিয়াছিলেন। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ কবির 'চিঠিপত্র' ধারাবাহিকভাবে মুদ্রণ শুরু করায় কবিজীবনের বহু তথ্য এখন আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এতদ্-ব্যতীত নানা সাময়িক পত্রিকায় অসংখ্য পত্র প্রকাশিত হইয়াছে; ঐতিহাসিক দিক হইতে জীবনীকারের নিকট সেগুলি অমূল্য।

পত্রাদি সম্বন্ধে বলিতে গিয়া শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ হয়। কারণ, তিনিই খুল্লতাতের বহু পত্র সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। কবিযশ তখনো মধ্যাহ্নগগনে আরোহণ করে নাই; তিনি যেন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার তুচ্ছ ছিন্ন পত্রগুলি এককালে সাহিত্যের ডালা পূর্ণ করিবে। তাঁহারই সঞ্চিত পত্ররাজি 'ছিন্নপত্র' নামে মুদ্রিত হয়, পরবর্তী কালে বিশ্বভারতী পত্রিকায় আরও অনেকগুলি বাহির হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের অচলিত রচনাসম্বন্ধে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ সর্বপ্রথম বাঙালি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; তজ্জন্য তিনি রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠকমাত্রের নিকট ধন্যবাদার্হ। এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বহু গবেষণা করিয়াছেন; তাঁহাদের প্রবন্ধাদি কবিজীবনের প্রত্যুষান্ধকারে প্রচুর আলোকসম্পাত করিয়াছে। এই সূত্রে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীশান্তিদেব ঘোষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবির বাল্যজীবন সম্বন্ধে বহু তথ্য আমরা অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র কর্তৃক সম্পাদিত বিশ্বভারতী-সংস্করণ 'জীবন-স্মৃতি' হইতে পাইয়াছি। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ হইতে যে রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশিত হইতেছে, তাহার সংযোজন-অংশ এবং গ্রন্থপরিচয় অংশ বহু তথ্যসমন্বিত হওয়ায় জীবনীকারের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান।

রবীন্দ্রনাথ বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন, কোন্ গ্রন্থ কখন লিখিত তাহা জীবনীকারের পক্ষে জানা একান্ত প্রয়োজন; তজ্জন্য রবীন্দ্রনাথের জয়ন্তী-উৎসবের প্রাক্‌কালে আমি এক 'গ্রন্থপঞ্জী' প্রস্তুত করি। উহাই এ-ধরনের প্রথম প্রয়াস। তাহার প্রায় এগারো বৎসর পরে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রবীন্দ্রগ্রন্থের বিশুদ্ধ সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন; ব্রজেন্দ্রবাবুর সত্যনিষ্ঠা সর্বজনবিদিত; তাঁহার 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়' আমাদের বিশেষ কাজে লাগিয়াছে।

এই গ্রন্থ প্রণয়ন-কালে নানা ভাবে বহু লোকের সহায়তা লাভ করিয়াছি। অধ্যাপক নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী, শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন, অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীকানাই সামন্তের নাম সর্বাগ্রে করা কর্তব্য। যেসব বন্ধু নানা সমালোচনার দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক সুনীলচন্দ্র সরকার, অধ্যাপক বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুখময় ভট্টাচার্য,

অধ্যাপক সুখময় চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অধ্যাপক বিনয়গোপাল রায়, অধ্যাপক অনিলকুমার চন্দ, শ্রীক্ষিতীশ রায় ও শ্রীঅমিয়কুমার সেনকে বিশেষভাবে স্মরণ করিতেছি। তবে যাঁহার সহায়তার কথা সম্পূর্ণ পৃথকভাবে ও বিশেষভাবে বলা উচিত তিনি হইতেছেন শ্রীসুধীরচন্দ্র কর; বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের কর্মীরূপে তিনি আমার গ্রন্থখানির কেবলমাত্র প্রুফ সংশোধন করেন নাই, স্বভাবসাহিত্যিকের দৃষ্টিতে তিনি রচনার দোষগুণ বিচার করিয়া আমাকে সর্বদা যথাবিধ পরামর্শ দান করিয়াছেন; তাঁহার নিঃস্বার্থ সহযোগিতা না পাইলে এই গ্রন্থে ভুলত্রুটি আরও থাকিত।

গতবার এই গ্রন্থের আমিই ছিলাম প্রকাশক, অবশ্য বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের আনুকূল্যেই উহা মুদ্রিত হয়; তখন বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের মত ছিল যে রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তাঁহার সম্বন্ধে কোনো গ্রন্থ তাঁহারা প্রকাশ করিবেন না। যাহা হউক বিশ্বভারতীর কর্মসচিব শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সহকারী সচিব স্বর্গীয় কিশোরীমোহন সাঁতরার চেষ্টায় উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। এইবার বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ এই রবীন্দ্রজীবনী প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু বিশ্বভারতী ইহার প্রকাশভার গ্রহণ করিলেও এই গ্রন্থে যেসব মন্তব্য করা হইয়াছে তাহা আমার ব্যক্তিগত মত, তাহার জন্য একমাত্র আমিই দায়ী।

এই জীবনচরিতের বহু তথ্য রবীন্দ্রভবন হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। তজ্জন্য শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি; তবে এই ধন্যবাদ নিষ্প্রয়োজন, কারণ রথীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম উৎসাহ ব্যতীত কখনই আমি এই বিরাট গ্রন্থ প্রণয়নে অগ্রসর হইতে পারিতাম না। ইহার প্রকাশনে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের সচিব শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহানুভূতি না পাইলেও ইহা প্রকাশিত হইত না।

শান্তিনিকেতন প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের ধৈর্যের পরীক্ষা হইয়াছে আমার প্রুফ লইয়া; তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই ইহা যথাসময়ে প্রকাশিত হইতে পারিল। প্রেসের প্রধান কম্পোজিটর শ্রীবলরাম সাহা ও প্রধান প্রেসম্যান শ্রীসীতানাথ দের নাম এইখানে না করিলে অকৃতজ্ঞতা হইবে। শ্রীভূষণচন্দ্র মাইতি প্রুফের কার্য যেভাবে দেখিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকেও অন্তরের ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সুপ্রিয় ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বিশ্বপ্রিয়, ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান শোভনকুমার মুখোপাধ্যায় এবং লাইব্রেরির সহকারী কর্মী শ্রীমান দ্বিজপদ হাজরা ও শ্রীমান কৃষ্ণগোপাল হাজরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহারা আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করুন। এই গ্রন্থের বিস্তৃত সূচী প্রণয়নে শ্রীযুক্তা নলিনী ঘোষ বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে এইখানে স্মরণ করিতেছি।

প্রথম সংস্করণ রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড মদীয় অগ্রজ রেঙ্গুন বেঙ্গল অ্যাকাডেমির প্রধান শিক্ষক, শিক্ষাব্রতী মহিতকুমার মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।

বিশ্বভারতীর বিশাল গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষতা করিবার সৌভাগ্য লাভ করায় আমি রবীন্দ্রনাথের বিরাট সাহিত্য ও তৎসংক্রান্ত গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রিকাদি যদৃচ্ছাক্রমে ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইয়াছি। তজ্জন্য আমি তাঁহারই নিকট ঋণী, যিনি আমাকে আমার বালক বয়সে এই শান্তিনিকেতন আশ্রমে আশ্রয় দান করেন ও কালে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বপূর্ণ পদে বসাইয়া যান; আজ তাঁহার উদ্দেশ্যে এ পুস্তক আমার সামান্য শ্রদ্ধাঞ্জলি মাত্র।

গ্রন্থভবন, বিশ্বভারতী

২৫ বৈশাখ, ১৩৫৩

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে রহিয়াছেন; তাঁহার লেখনী এখনো অজস্রধারে বাঙলা-সাহিত্যকে গীতে, গল্পে, নাট্যে, প্রহসনে, প্রবন্ধে সমৃদ্ধ করিতেছে; দেশের গুরুতর সমস্যার সময়ে তাঁহার বাণী জনগণের চিত্তকে কল্যাণময় সত্যের পথে চালাইতেছে।

জীবিত কোনো স্রষ্টার জীবনী লেখাই কঠিন, রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মনীষী ও কবির জীবনী কোনো কালে যথাযথ লেখা অসম্ভব। বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার জীবনবীণা ঝংকৃত। তাঁহার প্রতিভা নিত্য নবধারায় আপনাকে বহুধা প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। সূর্যরশ্মিকে বিশ্লেষণ করিলে সপ্তবর্ণ পাওয়া যায়; রবীন্দ্রসাহিত্যও সেই বিপুল বর্ণচ্ছটায় বিশেষ মনের আতসকাঁচে বিশ্লিষ্ট বর্ণে ধরা দেয়। আমাদের কাহারো কাছে তিনি হয়তো কেবলমাত্র কবি বা নাট্যকার বা রাজনৈতিক; কেহ বা তাঁহাকে শিক্ষক, ধর্মগুরু, বৈয়াকরণ, সংগীতকার বা নৃত্যকলাবিদ্ এই রকম কোনো বিশেষ একটি পরিচয়ে নির্দিষ্ট করিয়া জানিতে চাই। তাঁহার প্রতিভায় এই সকল রূপেরই সমন্বয়, সব মিলিয়াই তাঁহার স্বভাবের অখণ্ড সত্তা। বিশ্লেষণ করিয়া খণ্ড খণ্ডভাবে তাঁহাকে জানিবার চেষ্টায় বিপদ আছে— তাঁহার নানান্ কর্ম এবং সৃষ্টির গভীর ঐক্যসূত্র ধরা না পড়িলে তাঁহার প্রতিভাকে স্ববিরোধী বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এমনতরো ভুল করিবার সম্ভাবনা বেশি, কেননা তিনি কোনো কিছুকেই বাদ দিতে চান নাই— জীবনের সকল বৃত্তি, সকল শক্তিকেই তিনি স্বীকার করিয়া স্বভাবের সম্পূর্ণতার মধ্যে স্থান দিয়াছেন।

জ্ঞান ও ভাব, রূপ ও রস, সৌন্দর্যের বিচিত্র নিবিড় অনুভূতি, জগৎকে ও জীবনকে নানা কল্পনায় ও চেতনায় শাশ্বতের পটে সত্য করিয়া জানিবার ও জানাইবার প্রয়াসই তাঁহার জীবনের মূলগত সাধনা। এই সাধনার মধ্য দিয়াই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ণরূপ তাঁহার অধ্যাত্মজীবনকে গড়িয়া তুলিয়াছে; অন্তরে বাহিরে, ধ্যানে কামনায় কর্মকে সত্যের বিপুল মহিমা দান করিয়াছে। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ কবি ও কর্মী, ধ্যানী এবং শিল্পস্রষ্টা আত্মসমাহিত সাধক এবং বিচক্ষণ সমাজসংস্কারক।

সংসারের কোনো দায়িত্বকেই রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেন নাই; বিষয়কর্মের কোনো দাবিকেই এড়াইতে চান নাই, কঠিন কর্তব্যবোধের তাগিদে বারংবার তিনি দেশের ও দশের জন্য নানা দুরূহ প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। জমিদারি ও বিদ্যালয় পরিচালনা, সাহিত্যসেবা, মাসিকপত্র সম্পাদনা ও সংসার এবং আশ্রমের বিবিধ কর্মসাধন— কোনো কিছুকেই তিনি বাদ দেন নাই। ক্ষুদ্র শিক্ষায়তন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর ব্যাপক কর্মপ্রবর্তনার মধ্যেও তাঁহার স্বভাবে সত্যের অনিবার্য বিকাশ দেখিতে পাই; যাঁহারা বাস্তব বিলাসের নেশায় জীবনের সমগ্ররূপ দেখিতে চান না, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের জীবনের, তাঁহার বিচিত্র সৃষ্টির এই বিপুল সাধনার তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে অক্ষম। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত এবং কাব্যগত জীবনের এই বৃহৎ সম্মিলিত রূপ সংহত করিয়া দেখানোই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।

রবীন্দ্রনাথের জীবনী বাংলায় এভাবে লিখিবার চেষ্টা পূর্বে হয় নাই; ইহার মধ্যে দোষত্রুটি অনেক আছে, সে বিষয়ে গ্রন্থকার খুবই সচেতন। কিন্তু সাধ্যমতো প্রয়াসের নিশ্চয়ই কিছু মূল্য আছে। সহৃদয় পাঠক এই পুস্তকের ভুলভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের মন্তব্য আমাকে লিখিয়া পাঠাইলে বিশেষ উপকৃত হইব। সত্য প্রকাশিত হয়, ইহাই আমাদের কাম্য, এখানে ব্যক্তিগত মান অভিমানের স্থান নাই।

গ্রন্থের প্রারম্ভে ঠাকুরপরিবারের ইতিহাস দীর্ঘই হইয়া পড়িয়াছে; অনেকেরই অজানা থাকায় এ বিষয় বিশদভাবে তথ্যসংগ্রহ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই, রবীন্দ্রনাথের জীবনীর সহিত সে অংশের হয়তো প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ অল্প।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে অনেকের কাছ হইতে সহায়তা লাভ করিয়াছি, তবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সাহায্য পাইয়াছি শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর নিকট হইতে; তাঁহার ঋণ ভূমিকায় নামোল্লেখ দ্বারা নিঃশেষিত হইবে না। মৎকৃত 'রবীন্দ্র-বর্ষপঞ্জী'র শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের সমালোচনা ও 'প্রবাসী'তে তাঁহার 'রবীন্দ্র-পরিচয়' সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি আমার বিশেষ কাজে লাগিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের দুষ্প্রাপ্য পুরাতন পুস্তকগুলি দেখিবার সুযোগ দিয়াছেন শ্রীপৃথ্বীসিং নাহার। সেজন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। রবীন্দ্রনাথের সুযোগ্য পুত্র বিশ্বভারতীর কর্মসচিব কর্মীশ্রেষ্ঠ শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সহকারী কর্মসচিব শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা মহাশয়দ্বয়ের নিকট বিশেষ ঋণী।

এই গ্রন্থ প্রণয়নকালে আমি রবীন্দ্রনাথের সহিত অনেক তথ্য ও তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু গ্রন্থের কোনো অংশ লিখিবার সময় বা মুদ্রণকালে আমি তাঁহাকে দেখাই নাই। এ গ্রন্থের মধ্যে যেসব মতামত আছে, তাহার জন্য আমি একমাত্র দায়ী। তিনি ছাড়া তাঁহার পরিবারের কাহারও কাহারও কাছ হইতে কিছু কিছু তথ্য পাইয়াছি, তাহার জন্য তাঁহাদের ধন্যবাদ দিতেছি।

এইখণ্ডে আমরা রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম পঞ্চাশ বৎসর আলোচনা করিয়াছি। গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ বিলাতে প্রকাশের পর হইতে রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র বাঙালীর কবি থাকিলেন না; তিনি বিশ্বের কবিরূপে দেশে বিদেশে গৃহীত হইলেন। আমরা সেই অংশ অর্থাৎ তাঁহার বিশ্বখ্যাতির ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করিব।

গ্রন্থভবন, শান্তিনিকেতন
৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৪০

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

সূচী

বাঙালি এই প্রথম অধিবেশনে কোনো বিশেষ অংশ গ্রহণ করে নাই। রবীন্দ্রনাথের মনে কি এই বেদনা ছিল, যখন তিনি লিখিলেন,

পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ, শুনিতে পেয়েছি ওই—
সবাই এসেছে লইয়া নিশান, কই রে বাঙালি কই।

এই কবিতাটি পাঠকগণ পুনরায় পাঠ করিলে কবির মনোভাবের নিখুঁত চিত্রটুকু পাইবেন। নিখিল ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙালির অসম্মান হইয়াছে বটে, কিন্তু কবির ভরসা বাঙালি তাহার শ্রেষ্ঠ আসন পাইবে গানের মধ্য দিয়া, মাতৃভাষার মধ্য দিয়া—

উঠ বঙ্গকবি, মায়ের ভাষায় মুমূর্ষুরে দাও প্রাণ—
জগতের লোক সুধার আশায় সে ভাষা করিবে পান।
চাহিবে মোদের মায়ের বদনে, ভাসিবে নয়নজলে,
বাঁধিবে জগৎ গানের বাঁধনে মায়ের চরণতলে।
বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাই ব'লে, কাঁদিছে বঙ্গভূমি,
গান গেয়ে কবি জগতের তলে স্থান কিনে দাও তুমি।
একবার কবি মায়ের ভাষায় গাও জগতের গান,
সকল জগৎ ভাই হয়ে যায়—ঘুচে যায় অপমান।[১]

একদিন কবিই বাঙালির সে-অপমান দূর করিয়া তাহাকে বিশ্বের সিংহাসনে বসিবার অধিকার দিয়া গেলেন।

নব্য হিন্দুসমাজ

বঙ্কিমের সহিত রবীন্দ্রনাথের মসীযুদ্ধ অল্পতেই শেষ হইয়া যায়; কিন্তু চন্দ্রনাথ বসুর সহিত যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়, তাহা বহুকাল বাংলার সাময়িক সাহিত্যাকাশকে কখনো ধূম্রে অন্ধকার, কখনো আলোকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। চন্দ্রনাথ 'নবজীবন' মাসিকপত্রে হিন্দুসমাজের জাতিভেদের জয়গান করিয়া এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন; ইহাতে রবীন্দ্রনাথের উদ্‌বেজিত হইবার কোনো কারণ ছিল না; সুতরাং, উহার কোনো জবাব তিনি লেখেন নাই। কিন্তু 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিকে প্রসঙ্গক্রমে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হইলে আদি ব্রাহ্মসমাজের তরুণ সম্পাদকের পক্ষে তাহা নীরবে উপেক্ষা করা সম্ভব হইল না; 'সঞ্জীবনী' সাপ্তাহিকে রবীন্দ্রনাথ তাহার এক কড়া জবাব লিখিলেন। নব্য হিন্দুসমাজের সহিত বিরোধের সূত্রপাত হয় এইভাবেই।

কিন্তু বিরোধের কারণ ছিল আরও গভীরে; চন্দ্রনাথ এই সময়ে শশধর তর্কচূড়ামণির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক নূতন ব্যাখ্যা দানে প্রবৃত্ত হইলেন। তর্কচূড়ামণি দিগ্বিজয়ীর ন্যায় কলিকাতায় আসিয়া শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুসমাজে আসর জমাইয়া বসিলেন। বাংলার তরুণদের উপর চূড়ামণির ন্যায় পণ্ডিতের প্রভাব কিরূপে সম্ভব হইল, তাহা ভাবিবার বিষয়; যে-লোকের না ছিল পাণ্ডিত্য, না ছিল আধ্যাত্মিক বল, সে-লোক কি জাদুবলে বাংলার চিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বঙ্কিমপ্রমুখ সকলেই চূড়ামণির আজগুবি ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিরোধী ছিলেন; স্বামী বিবেকানন্দ পরযুগে এইসব আন্দোলনের কঠোর সমালোচনা করেন। দুঃখের বিষয় শ্রোতাদের মধ্যে অধিকাংশের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানের সমতুল্য ছিল; সুতরাং তাঁহারা শাস্ত্র ও বিজ্ঞান, দুইই সমান বুঝিতেন বা কিছুই বুঝিতেন না; সেইজন্য নির্বিচারে সবই বিশ্বাস করিতেন। কারণ বিশ্বাস করিতে হইলে, সাধারণ মানুষের কোনপ্রকার মানসিক মেহন্নত করিতে হয় না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রদত্ত হইত, তাহা হইতে ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান ছাত্রদের আয়ত্ত হইত না,—

১ আহ্বান-গীত, কড়ি ও কোমল পৃ ১৬৮।

মানসীর তৃতীয় স্তর—গাজিপুরে [১২৯৫] ১৯৬—২০১। গাজিপুরে লিখিত কবিতাগুচ্ছ— 'গুরুগোবিন্দ' 'নিষ্ফল উপহার' 'ভৈরবীগান' 'পরিত্যক্ত' 'ধর্মপ্রচার' 'নববঙ্গ দম্পতীর প্রেমালাপ' সম্বন্ধে আলোচনা। গাজিপুরে নিজ কবিতার প্রথম ইংরেজি অনুবাদ।

সখীসমিতিতে মায়ার খেলা [১২৯৫] ২০১—২০৫। পারিবারিক সাহিত্য মজলিস— 'পারিবারিক স্মৃতি'— সখীসমিতি ও শ্রীমতী সরলা রায়— 'মহিলা শিল্প মেলা'— 'মায়ার খেলা'র অভিনয়— 'মায়ার খেলা'র আলোচনা।

মানসীর যুগ। রাজা ও রানী [১২৯৬] ২০৬—২১৩। সোলাপুরে সপরিবারে বাস— 'রাজা ও রানী' রচনা— পুণায় রমাবাঈএর বক্তৃতা— রাজা ও রানীর গল্পাংশ— তপতীর ভূমিকায় রাজা ও রানীর সমালোচনা।

মানসীর যুগ। বিসর্জন [১২৯৭] ২১৩—২১৮। 'বিসর্জন' নাট্যরচনা— নাটকের গল্পাংশ— সমালোচনা— উৎসর্গ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।

মন্ত্রী অভিষেক [১২৯৭] ২১৯—২২১। মন্ত্রী অভিষেক রচনার ইতিহাস— মন্ত্রী নির্বাচন সম্বন্ধে মতামত— শান্তিনিকেতনে গ্রীষ্মযাপন ও কয়েকটি লিরিক কবিতা রচনা— মেঘদূত— প্রমথ চৌধুরীকে পত্র।

বিলাতে দ্বিতীয় বার। মানসীর পালা শেষ [১২৯৭] ২২২—২২৭। দ্বিতীয় বার বিলাত যাত্রা— সোলাপুরে রচিত কবিতা— বিলাতের সঙ্গী সত্যেন্দ্রনাথ ও লোকেন পালিত— লণ্ডনে পৌঁছিয়া অতৃপ্তি— কবির জীবনে সুন্দরের প্রভাব, বিলাতে নিজস্ব পোষাক ব্যবহার— প্রত্যাবর্তন। বিলাতে ও ফিরিবার পথে কবিতা রচনা— লোকেন পালিতের ইংরাজী কবিতার অনুবাদ— 'মানসী' প্রকাশ— 'মানসী' কাব্যের মূলসূত্র— সমসাময়িক কবিগান— প্রমথ চৌধুরীর পত্রের উত্তরে মানসী কাব্যের আলোচনা।

হিতবাদী ও পরে [১২৯৮] ২২৭—২৩১। হিতবাদী সাপ্তাহিক প্রকাশ— রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সাহিত্যবিভাগের ভারগ্রহণ— ছোটগল্প রচনা— 'অকালবিবাহ' প্রবন্ধ— চন্দ্রনাথ বসুর সহিত বাল্যবিবাহ বিষয়ে পত্রবিনিময়— হিতবাদীর সহিত সম্বন্ধচ্ছেদ— সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্যে'র জন্য ব্যঙ্গ রচনা। জমিদারীর কাজকর্মে যোগদান— অবসর সময়ে ডায়ারীর মতো পত্র রচনা— পরে 'ছিন্নপত্রে' প্রকাশিত— নদীপথে কটক যাত্রা, পাণ্ডুয়াতে 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যের খসড়া রচনা— প্রত্যাবর্তন ও শিলাইদহে বাস— পদ্মার প্রভাব।

য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি—ভূমিকা [১২৯৮] ২৩২—২৩৬। জমিদারীর ভার গ্রহণ— প্রকৃতি ও মানুষের মিলিত পূর্ণ সৌন্দর্যের পরিচয় লাভ— ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রধারায় তৎকালীন মনোভাব প্রকাশ— চৈতন্য লাইব্রেরীতে বক্তৃতা— 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারী'র ভূমিকা প্রকাশ— য়ুরোপীয় সভ্যতার সমালোচনা— প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সংমিশ্রণ সমর্থন।

সাধনা পত্রিকা [১২৯৮] ২৩৬—২৪০। সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর— সাধনায় 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী' ধারাবাহিক প্রকাশ— হিন্দুত্ব লইয়া তর্ক— ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে 'ধর্ম' ও 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থমালায় কবির ব্যাখ্যা— শান্তিনিকেতনে মন্দির প্রতিষ্ঠা—চন্দ্রনাথ বসুর 'আহার তত্ত্বে'র আলোচনা—'স্ত্রীমজুর' প্রবন্ধ ও 'দালিয়া' ছোটগল্প রচনা।

সোনার তরী [১২৯৮-১৩০০] ২৪০—২৪৭। 'সোনার তরী' কবিতা রচনা—তৎসম্বন্ধে আলোচনা— 'কঙ্কাল' গল্প ও বাল্যস্মৃতি— 'শৈশবসন্ধ্যা'— 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' ও 'বিম্ববতী' রচনা— কবিতার পরিপূরক 'নিদ্রিতা'। 'সুপ্তোত্থিতা'— শান্তিনিকেতনে বাস— নরনারীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ— ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রে কবিতা রচনার আনন্দের কথা জ্ঞাপন— দুই বিভিন্ন রসের কবিতা রচনা— 'হিং টিং ছট' ও 'পরশ পাথর'— চন্দ্রনাথ বসুর সমালোচনা— পরশপাথরের আলোচনা— 'বৈষ্ণব কবিতা'— দেবতা মানুষের মনেরই সৃষ্টি।

সাধনার ছোটোগল্প [১২৯৮-৯৯] ২৪৮—২৫০। ছোটোগল্পের যুগ— জমিদারীতে বাসকালে সাধারণ মানুষের সংস্পর্শ ও ছোটো গল্পের উপাদান—প্রথম গল্প 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'— তৎসম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবুর পত্র— ছোটোগল্পের সমালোচনা।

সাধনার সমালোচনা [১২৯৯] ২৫০—২৫৬। বিভিন্ন বিষয়ে গদ্য রচনা— লোকেন পালিতের সহিত সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা— বাংলা ছন্দের আলোচনা।

চিত্রাঙ্গদা [১২৯৯] ২৫৬—২৫৯। 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাটক ও 'গোড়ায় গলদ' প্রহসন প্রকাশ— অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রাঙ্কণে হাতেখড়ি— চিত্রাঙ্গদার গল্পাংশ।

সংগীতসমাজ ও গোড়ায় গলদ [১২৯৯] ২৫৯—২৬৭। ভারতীয় সংগীতসমাজ— ব্রাহ্মসমাজ ও সংগীত— সখের থিয়েটারের আরম্ভ— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকর্তৃক সংগীত রচনা ও নাট্যাভিনয়— নাটকরচনায় মধুসূদন ও দীনবন্ধু— ন্যাশানাল থিয়েটার স্থাপন ও গিরীশচন্দ্র ঘোষের নাট্যমঞ্চে আবির্ভাব— জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চেষ্টায় সংগীতসমাজ প্রতিষ্ঠা— অভিনয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' রচনা— রবীন্দ্রনাথের নাটকাভিনয়ের ইতিহাস— পাবলিক ষ্টেজের সহিত পরোক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ— রঙ্গমঞ্চে 'বৌঠাকুরানীর হাট' অবলম্বনে কেদারনাথ চৌধুরীকৃত 'রাজা বসন্ত রায়' নাটক অভিনয়।

সাধনার দ্বিতীয় বর্ষ [১২৯৯-১৩০০] ২৬৭—২৬৯। ছোটোগল্পের ধারা— 'জয়পরাজয়' গল্প ও 'যেতে নাহি দিব' কবিতার ব্যাখ্যা— 'কাবুলিওয়ালা'।

শিক্ষার হেরফের [১২৯৯] ২৬৯—২৭২। রাজসাহীতে লোকেন পালিতের বাড়িতে গমন— প্রমথ চৌধুরী, নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনারায়ণ, অক্ষয়কুমার মৈত্র ও শরৎকুমার রায়— 'শিক্ষার হেরফের' রচনা ও পাঠ— পঞ্চভূতের পরিকল্পনা।

মানসসুন্দরী [১২৯৯] ২৭২—২৭৪। রাজসাহী হইতে লোকেন পালিতের সহিত নাটোর-যাত্রা— ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীকে পত্র— 'মানসসুন্দরী' রচনা— স্ত্রী ও সন্তানদের সোলাপুর হইতে প্রত্যাবর্তন।

উড়িষ্যা ভ্রমণ [১২৯৯] ২৭৪-২৭৯। শান্তিনিকেতন পৌষ উৎসবে কবির অনুপস্থিতি— তৃতীয়া কন্যা মীরার জন্ম— মাঘোৎসবের জন্য পাঁচটী গানরচনা— বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত জমিদারী তদারকে উড়িষ্যা যাত্রা।— কটকে বিহারীলাল গুপ্তের বাড়ীতে বাস— মৃণালিনী দেবীকে পত্র— ইন্দিরা দেবীকে পত্র— পত্রে জুরিপ্রথা সম্বন্ধে আলোচনা—পুরীর সমুদ্র ও ভুবনেশ্বর মন্দির দর্শন—পুরী হইতে কটকে প্রত্যাবর্তন—সাধনার জন্য রচনা— বালিয়া যাত্রা— উড়িষ্যায় ইংরেজদের সম্বন্ধে নূতন অভিজ্ঞতা— কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন ও রাজসাহী যাত্রা— ষ্টিমারে রচিত কবিতা— রাজসাহীতে 'ঝুলন' ও 'সমুদ্রের প্রতি' রচনা।

উড়িষ্যা ভ্রমণের পর [১২৯৯] ২৭৯—২৮৩। কটকে ফিরিবার পথে কবিতা রচনা— ভুবনেশ্বরের মন্দির দর্শন ও 'দেউল' রচনা—'বিশ্বনৃত্যে'র ব্যাখ্যা— 'দুর্বোধ' কবিতায় নারী ও পুরুষের প্রেমের প্রভেদ— 'ঝুলনে'র ব্যাখ্যা— ইন্দিরা দেবীর পত্রে ' সমুদ্রের প্রতি' কবিতার মর্ম ব্যাখ্যা।

পদ্মার প্রান্তে [১৩০০] ২৮৪—২৯১। কবিজীবনে পদ্মার প্রভাব, সাধনার দ্বিতীয় বর্ষে 'পঞ্চভূতের ডায়ারি', পরিবারিক স্মৃতিলিপির প্রভাব— ছোটগল্প 'ছুটী' ও 'কাবুলিওয়ালা' রচনা— বৈষ্ণব কবিতার প্রেমতত্ত্ব— জগদীশচন্দ্রকে পত্রে নিজ চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে মত প্রকাশ— 'পুরস্কার' কবিতা— 'জয়পরাজয়ের সহিত তুলনা।

সোনার তরীর শেষপর্ব [১৩০০] ২৯১—২৯৭। স্ত্রীপুরুষের স্বভাবভেদ সম্বন্ধে পত্র— পঞ্চভূতে আলোচনা— 'নরনারী' 'বিদায় অভিশাপ'— চৈতন্য লাইব্রেরিতে 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধ পাঠ— বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতি— 'বসুন্ধরা'— সোনারতরী উৎসর্গ— গদ্য রচনা— 'বিনিপয়সার ভোজ'।

চিত্রা [১৩০১] ২৯৮—৩১০। ১৩০০ সালের শান্তিনিকেতন পৌষ উৎসবে যোগদান। মাঘোৎসবের গান রচনা— চিত্রার কবিতা আরম্ভ— রাজসাহী 'এবার ফিরাও মোরে' রচনা— 'রাজনীতির দ্বিধা'— রাজসিংহের সমালোচনা Amiel's Journal—কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন—'বর্ষশেষ' 'নববর্ষ' স্নেহস্মৃতি' 'দুঃসময়' 'মৃত্যুর পরে' রচনা— বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুশোকসভায় প্রবন্ধ পাঠ— বিহারীলালের মৃত্যু— কার্সিয়ঙে ত্রিপুরারাজের অতিথি বিদেশী অতিথি হামারগ্রেন— 'বিদেশী অতিথি ও দেশীয় আতিথ্য' — 'অনধিকার প্রবেশ' এবং 'মেঘও রৌদ্র' গল্প— 'অপমানের প্রতিকার' প্রবন্ধ— প্রমথ চৌধুরীকে পত্র— বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ স্থাপন— প্রিয়নাথ সেন— 'অন্তর্যামী' কবিতা— 'মেয়েলি ছড়া'।

সাধনার যুগে রাজনৈতিক প্রবন্ধ [১৩০০-১] ৩১০—৩১৫। 'ইংরেজ ও ভারতবাসী'— 'সুবিচারের অধিকার'— হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধসঞ্চারে গভর্মেণ্টের হাত— অন্যায়ের প্রতিকারে স্বজাতিবর্গের বাধাসৃষ্টি— 'মেঘ ও রৌদ্র' এবং 'গোরা'র উদাহরণ— বিলাতপ্রবাসী প্রমথ চৌধুরীকে পত্র— 'রাজনীতির দ্বিধা' প্রবন্ধে যুরোপীয় সভ্যতার আলোচনা— অর্থনীতি রাজনীতি সমাজনীতির দ্বন্দ্ব।

সাধনার সম্পাদক [১৩০১-২] ৩১৬—৩২১। রাজসাহী হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন— 'অন্তর্যামী' কবিতা সম্বন্ধে ইন্দিরা দেবীকে পত্র— বোলপুরে 'সাধনা' কবিতা রচনা— 'সাধনার' সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ— দ্বিজেন্দ্রলালের 'আর্যগাথা'র সমালোচনা— সাধনায় গ্রন্থসমালোচনা আরম্ভ— সাধনার সম্পাদকত্বের দুর্বহ দায়িত্ব— 'পঞ্চভূতের ডায়ারি' রচনার দ্বিতীয় স্তর— গল্পরচনা— 'প্রায়শ্চিত্ত', 'বিচারক' ও 'নিশীথে',— 'ব্রাহ্মণ' কবিতা— কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন— সাধনার শেষ গল্প 'অতিথি' ও এযুগের শেষ গল্প 'ইচ্ছাপূরণ'— কলিকাতায় বহুমুখী কর্মভারে পীড়িত— নদীপথে উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ— 'ক্ষুধিত পাষাণ'— বাস্তবের সংঘর্ষের প্রকাশ 'শীত ও বসন্তে'— কলিকাতায় আগমন— ঈশ্বরচন্দ্রের স্মৃতিসভায় 'বিদ্যাসাগরচরিত' পাঠ।

চিত্রার শেষ পর্ব [১৩০২] ৩২১—৩২৯। সুরেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবসায়ের সহিত কবির যোগদান— 'নগরসংগীত' কবিতায় কবির মনের কর্মব্যাকুলতার ভাব—'সাধনা' বন্ধ— গল্পলেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে পত্র— 'পূর্ণিমা' কবিতা— চিত্রার সমালোচনা— 'উর্বশী' সম্বন্ধে কবির মত— 'বিজয়িনী' কবিতা— মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে গমন— বলেন্দ্রনাথের বিবাহ— 'উৎসব' কবিতা রচনা, বিবাহোপলক্ষে 'নদী' কবিতার উপহার— 'নদী'র বৈশিষ্ট্য— 'জীবনদেবতা' সম্বন্ধে মোহিতচন্দ্র সেনকে পত্র— জীবনদেবতার মূলসূত্র 'সিন্ধুপারে' কবিতায় প্রকাশ—চিত্রার মুদ্রণ ও প্রকাশ— সুহৃৎনাথ চৌধুরীর দীক্ষা ও বিবাহোপলক্ষ্যে কবির গান রচনা।

চৈতালি, মালিনী, বৈকুণ্ঠের খাতা [১৩০৩] ৩২৯-৩৩৭। চৈতালির প্রথমার্ধ— চৈতালির কবিতার মর্মব্যাখ্যা— 'মালিনী' উড়িষ্যায় রচিত—স্বপ্নের কথা— নাটকের গল্পাংশ— চৈতালির দ্বিতীয়ার্ধ— উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাবর্তন ও জমিদারির পার্টিশন— সাজাদপুরে— কালিদাসের প্রভাব—চৈতালি কাব্য —সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক সম্পাদন— কলিকাতা কন্‌গ্রেসে (১৮৯৬) বন্দেমাতরম্ গান— 'বৈকুণ্ঠের খাতা'— 'পঞ্চভূত' প্রকাশ।

কল্পনার সূত্রপাত [১৩০৪] ৩৩৭-৩৪৪। 'দুঃসময়' কবিতার ভাব— 'চৌরপঞ্চাশিকা' প্রভৃতি কবিতা রচনা—'মদনভস্মের পর' ও 'মদনভস্মের পূর্বে' যুগ্মকবিতা— নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন (১৩০৪, ২৯ জ্যৈষ্ঠ)— সমসাময়িক রাজনীতি সম্বন্ধে কবির মত —আশ্বিন মাসে নদীপথে গান ও কবিতা রচনা— 'কাহিনী'র কবিতা—নাট্যকাব্য— গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস, লক্ষ্মীর পরীক্ষা, কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ— মানবধর্ম ও লৌকিক ধর্ম ব্যাখ্যা।

রবীন্দ্রজীবনী

বাহির হইতে দেখো না এমন করে,
আমায় দেখো না বাহিরে।
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহি রে।

. . .

যে-আমি স্বপন-মূরতি গোপনচারী,
যে-আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি, কে পারে আমারে ধরিতে।
মানুষ-আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতিনিমেষের ভরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতিনিন্দার জ্বরে,
কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।

সূচনা

বাংলার কোনো তরুণ সাহিত্যিক বর্তমান লেখকের 'রবীন্দ্রজীবনী' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইলে ঐ গ্রন্থ ক্রয় করিবেন কিনা তৎসম্বন্ধে আর-কাহারও পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া স্বয়ং কবিরই রায় সংগ্রহ করিতে তাঁহার বাসভবনে উপস্থিত হন। প্রশ্ন শুনিয়া কবি নাকি অত্যন্ত বিব্রত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, ঐ গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের জীবনী নহে, উহা দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্রের কাহিনী। নবীন লেখকটিকে কবি কী ভাব হইতে ঐ মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা আমরা জানি না। তবে গ্রন্থমধ্যে ঠাকুরপরিবারের বিস্তৃত আলোচনাংশ পাঠ করিয়া কবি জীবনীলেখককে ঐ অংশ পরিশিষ্টে সংযোজিত করিবার নির্দেশ দেন। আমাদের অনুমান কবি মনে করিতেন যে, পূর্বপুরুষদের সহিত তাঁহার ব্যবধানটা কেবলমাত্র কালের দূরত্বের দিক দিয়া নহে, গুণের গুরুত্বের দিক্ হইতেও দুর্লঙ্ঘ্য। কিন্তু বস্তুবিচারী ঐতিহাসিকদের নিকট কবির বহুমুখী প্রতিভার অভিব্যক্তির জন্য তাঁহার পূর্বপুরুষদের দোষ ও গুণ সমভাবে দায়ী। প্রতিভার সহিত প্রাকৃতের পার্থক্য যতই গভীর বলিয়া প্রতিভাত হউক, গঙ্গোত্রীর সহিত গঙ্গাসাগরের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্যভাবেই যুক্ত। সেইজন্যই আমরা রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষগণের কাহিনীপর্বটি অবান্তর জ্ঞানে পরিত্যাগ বা পরিশিষ্টে সংযোজন করিতে পারিলাম না, গঙ্গোত্রী হইতেই আমরা যাত্রা শুরু করিলাম।

রবীন্দ্রনাথ যে-ঠাকুরপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই পরিবারের সহিত গত একশত বৎসরের বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাস এমনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যে রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভার যথার্থ উৎস আবিষ্কার করিতে হইলে সেই বংশের উৎপত্তি, ব্যাপ্তি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। বাংলার ব্রাহ্মণসমাজের দ্বারা পরিত্যক্ত এই বংশ এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ও শক্তি অর্জন করিয়াছিল, যাহার বলে তাহা এককালে বাংলার বিচিত্র সামাজিক জীবনের শীর্ষস্থানে নিজ অক্ষুণ্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সুতরাং এই পরিবারের ইতিহাস আলোচনা নিরর্থক বা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বংশপরিচয়

ইতিহাসের আরম্ভ কোথায় এ কথার জবাব দেওয়া যায় না; তবুও মানুষ লৌকিক ব্যবহারের জন্য একটা সীমানা টানিয়া লয়। সেই সূত্র অনুসারে বাংলাদেশের কিংবদন্তিমূলক যে সামাজিক ইতিহাস চলিয়া আসিতেছে তাহাকে অনুবর্তন করিতে হয়; অর্থাৎ পঞ্চব্রাহ্মণের বঙ্গদেশে আগমনকথা হইতেই এই অনুসন্ধানটি আরম্ভ করা যাইতে পারে। পঞ্চব্রাহ্মণের বঙ্গদেশে আগমনের ঐতিহ্য সম্বন্ধে আমরা কোনো মতামত পোষণ করি না, কেবল কিংবদন্তি আশ্রয় করিয়া এই বংশের যে ইতিহাস চলিয়া আসিতেছে তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

কিংবদন্তিমূলক ইতিহাস অনুসারে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগে আদিশূরের সময় পঞ্চব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আসেন। মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিচিত্র মতবাদপ্লাবিত বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে এই পঞ্চ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের আগমন। এই পঞ্চজন সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের নাম শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ক্ষিতীশ, বাৎস্য-গোত্রীয় সুধানিধি, সাবর্ণগোত্রীয় সৌভরি, ভরদ্বাজগোত্রীয় মেধাতিথি ও কাশ্যপগোত্রীয় বীতরাগ। ইঁহারা নামে মাত্র এদেশে আসেন, বস্তুত সাক্ষাৎসম্বন্ধে যজ্ঞাদি করেন নাই; ইঁহাদের পঞ্চপুত্র— ভট্টনারায়ণ, ছান্দড়, বেদগর্ভ, শ্রীহর্ষ ও দক্ষ হইতে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণকুলের তথাকথিত উদ্ভব।

কাশ্যপগোত্রীয় বীতরাগের দক্ষাদি চারিপুত্র রাঢ় বা পশ্চিমবঙ্গে বাস করিয়া 'রাঢ়ীয়' বলিয়া বিদিত। দক্ষের চৌদ্দ সন্তানের মধ্যে ধীর নামক এক ব্যক্তি আদিশূরপুত্র ভূশূরের নিকট বাসার্থ গুড় নামক গ্রাম প্রাপ্ত হন। বর্তমানে এই গ্রাম মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত। গুড়গ্রামের অধিবাসী বলিয়া ধীর 'ধীরগুড়ি' বা 'ধীরগুড়' নামে পরিচিত হন।

ইঁহার সপ্তম অধস্তন পুরুষ রঘুপতি আচার্য পরিণত বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'দণ্ডী' হন ; জনশ্রুতি কাশীবাসকালে দণ্ডি-সমাজ ইঁহাকে কনকদণ্ড উপহার প্রদান করে। কেহ কেহ বলেন 'কনকদাঁড়' গ্রামে গিয়া বাস করেন বলিয়া উত্তরকালে রঘুপতির বংশধরেরা 'কনকদণ্ডী গুড়' নামে পরিচিত হন। এই কনকদণ্ডী গুড়ের একটি শাখা যবনসম্পর্কে পীরালি দোষে দুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণসমাজে পতিত হন।

রঘুপতি আচার্যের অধস্তন চতুর্থপুরুষ জয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী বোধহয় 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন। এই জয়কৃষ্ণের দুই পুত্র— নাগর ও দক্ষিণানাথ। দক্ষিণানাথের চারি পুত্র— কামদেব, জয়দেব, রতিদেব ও শুকদেব। মুসলমান সম্পর্কে কামদেবাদি প্রথম যবনদুষ্ট হইয়া পীরালি হন। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ তুর্কী-মুসলিম দ্বারা বিজিত হইয়াছিল, এবং দক্ষিণানাথ রাজদ্বারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া 'রায়চৌধুরী' উপাধিদ্বারা ভূষিত হন। কামদেবাদি চারি ভ্রাতা বর্তমান যশোহর জেলার চেঙ্গুটিয়া পরগণার জমিদার ছিলেন। তুর্কী-বিজয়ের পর সকল হিন্দুই যে তাঁহাদিগকে যবন আখ্যা দিয়া দূরে দূরে রাখিয়াছিলেন, তাহা নহে। বিজেতাকে অনুকরণ, তাহার অনুগ্রহভাজন হইয়া অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভের লোভ চিরকাল একই ভাবে দেখা দিয়া আসিয়াছে। তুর্কী-বিজয়ের ফলে হিন্দুদের মধ্যে কেহ ধর্মের আকর্ষণে. কেহ তুর্কী-রমণী লাভের মোহে, কেহবা ঐহিক লাভের জন্য, কেহবা উৎপীড়নের দায় হইতে মুক্তিলাভের জন্য ইসলাম গ্রহণ করে। এইরূপে যবনদোষে দুষ্ট হইয়া নানা পরিবার হিন্দুসমাজ-দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। সেরখানী, পীরালি, শ্রীমন্তখানী প্রভৃতি থাকের উদ্ভব এইভাবেই হয়।[১]

বাংলাদেশের মেল-উৎপত্তি সম্বন্ধে বিচিত্র কাহিনী কুলাচার্যগণ সৃষ্টি করিয়াছেন ; তবে আচার্যগণের সততা ও কাহিনীসমূহের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের বহু কারণ আছে। নানা অজ্ঞাত কারণে কুলাচার্যগণ যবনদুষ্ট পরিবার-সমূহের কাহাকেও মর্যাদা দান করিয়া সমাজে চালাইয়া দিয়াছিলেন, কাহাকেও বা 'পতিত' করিয়া সমাজে অচল করিয়া রাখিয়াছিলেন। যেসব পরিবার কুলাচার্যগণের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া সমাজে 'পতিত' থাকিয়া গেল, তাহাদেরই অন্যতম হইতেছে 'পীরালি' ব্রাহ্মণগণ। পীরালি ব্রাহ্মণদের উৎপত্তিসম্বন্ধে কুলাচার্যগণকর্তৃক সৃষ্ট যে কিংবদন্তি চলিত আছে, তাহাই আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম।

দক্ষিণ বাংলার জলা-জমিতে উপনিবেশের চেষ্টা শুরু হয় তুর্কী রাজত্বকালে। খান জাহান আলি নামক এক ব্যক্তি বাংলার দক্ষিণে বদ্বীপের সুঁদরি বনে (বর্তমান খুলনার সুন্দরবনে) উপনিবেশ স্থাপন করিবার সনন্দ লইয়া যশোহরে উপস্থিত হন ও চেঙ্গুটিয়া পরগণার কর্তৃত্ব লাভ করেন। খান জাহানের সহিত তাহের নামে এক ব্যক্তি আসেন ; এই ব্যক্তি পূর্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন, এক মুসলমানীর প্রেমে পড়িয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। ইঁহার নিবাস ছিল নবদ্বীপের নিকটস্থ পিরলিয়া বা পিরল্যা গ্রাম। ইসলামধর্মে গোঁড়ামি দেখিয়া অথবা পিরলিয়া গ্রামে বাস থাকায় লোকে তাঁহাকে পিরল্যা খাঁ বা পীরআলি খাঁ বলিয়া ডাকিত। তাহের কর্মপটু লোক ছিলেন বলিয়া খান জাহান তাঁহাকে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করিয়া যশোহরে আনেন। পূর্বোল্লিখিত দক্ষিণানাথের দুই পুত্র কামদেব ও জয়দেব তাহেরের প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত হন।

কথিত আছে একদিন রোজার সময় তাহের বা পীরআলি একটি নেবুর ঘ্রাণ লইতেছিলেন। এমন সময়ে কামদেব ঠাট্টার সুরে বলেন, "আমাদের শাস্ত্রানুসারে ঘ্রাণে অর্ধেক ভোজন হয়। সুতরাং রোজা নষ্ট হইল।" তাহের মুসলমান হইলেও ব্রাহ্মণসন্তান ; তিনি কামদেবের বিদ্রূপ সহজেই বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তখন কিছু বলিলেন না। তৎপরে একদিন এক জলসায় ব্রাহ্মণাদি সকল জাতিকেই নিমন্ত্রণ করিলেন ; এমন সময়ে মজলিসের চারিদিকে

১ ঊনবিংশ শতকে ইংরেজ-আমলে খ্রীস্টীয় ধর্ম ও য়ুরোপীয়তা, ইংরেজি ভাষা ও সভ্যতা এদেশের মধ্যে সেই একই কারণে প্রবেশ লাভ করে।

মুসলমানী খানার সুগন্ধ বহিল; হিন্দুর পক্ষে তাহা সহ্য করা কঠিন। অনেকেই নাকে কাপড় দিয়া চলিয়া গেলেন; ধূর্ত পীরআলি কামদেব ও জয়দেবকে ধরিয়া কহিলেন যে, "ঘ্রাণে যখন অর্ধেক ভোজন হয়, তখন নিশ্চয়ই গোমাংসের ঘ্রাণ পাইয়া তোমাদের জাতি গিয়াছে।" ভ্রাতৃদ্বয় পলাইবার চেষ্টা করিলে পীরআলির লোকেরা তাঁহাদিগকে জোর করিয়া নিষিদ্ধ মাংস মুখে ভরিয়া দিল। এইভাবে তাঁহারা উভয়ে জাতি হারাইলেন। তৎপরে কামদেব কামাল খাঁ ও জয়দেব জামাল খাঁ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। পীরআলি তাঁহার প্রভু খান জাহান সাহেবকে অনুরোধ করিয়া উভয়কে সিংগির জায়গির পাওয়াইয়া দিলেন। পীরআলির মজলিসে কামদেবের অন্যান্য আত্মীয়গণের মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের শত্রুপক্ষ তাঁহাদিগের 'পীরালি' অপবাদ রটাইলেন, এমনকি অনেককে সমাজচ্যুত করিলেন। অর্থের মহিমায় ও ঘটকের কৃপায় তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই 'জাতে' উঠিলেন, কেবল যাঁহাদের অবস্থা মন্দ বা ধন থাকা সত্ত্বেও যাঁহারা ঘটকের মর্যাদাদান করিতে নারাজ ছিলেন, তাঁহারাই কেবল 'পীরালি' বলিয়া সমাজে অচল রহিলেন।

কামদেবের অপর দুই ভ্রাতা রতিদেব ও শুকদেব রায়চৌধুরী দক্ষিণডিহির বাটীতে থাকিতেন; সমাজের অত্যাচারে রতিদেব ক্ষুণ্ণমনে গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। শুকদেবকে ভগ্নীর ও কন্যার বিবাহ লইয়া খুবই কষ্টভোগ করিতে হইল এবং বহু ছল, চাতুরী ও অর্থব্যয় করিয়া ফুলিয়ার এক মুখুটির সহিত ভগ্নীর বিবাহ দিতে সমর্থ হইলেন। শুকদেবের কন্যারও বিবাহ হইল একজন শ্রেষ্ঠ শ্রোত্রিয়ের সহিত; জামাতার নাম জগন্নাথ কুশারী, পিঠাভোগের জমিদার। পতিত ব্রাহ্মণের ঘরে বিবাহ করার অপরাধে জগন্নাথকে তাঁহার জ্ঞাতি কুটুম্বেরা 'পতিত' করিলেন এবং সেইজন্য তিনি পিঠাভোগ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণডিহিতে শ্বশুরালয়ে বাস করিতে আসিলেন। শুকদেব জামাতাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন; খুলনা জেলার বর্তমান বারোপাড়া-নরেন্দ্রপুর গ্রামের উত্তরে 'উত্তরপাড়া' নামে গ্রামখানি তাঁহাকে দান করেন। এইরূপে শুকদেবের ভগ্নী ও কন্যার বিবাহের ফলে 'পীরালি' শাখা পল্লবিত হইল।

জগন্নাথ কুশারীই ঠাকুরগোষ্ঠীর আদিপুরুষ; বিবাহের দ্বারা ইনি পীরালিসমাজভুক্ত হইলেন। কুশারীরা ভট্টনারায়ণের পুত্র দীন কুশারীর বংশজাত; দীন মহারাজ ক্ষিতিশূরের নিকট 'কুশ' নামক গ্রাম (বর্ধমান জিলা) পাইয়া গ্রামীন হন ও কুশারী নামে খ্যাত হন। দীন কুশারীর অষ্টম কি দশম পুরুষ পরে জগন্নাথ। জগন্নাথের দ্বিতীয় পুত্র পুরুষোত্তম হইতে ঠাকুরবংশের ধারা চলিতেছে; অপর তিনপুত্রের ধারা লুপ্ত বা প্রায়লুপ্ত। পুরুষোত্তমের প্রপৌত্র রামানন্দের দুই পুত্র, মহেশ্বর ও শুকদেব, হইতে ঠাকুরগোষ্ঠীর কলিকাতা-বাস আরম্ভ।

কথিত আছে জ্ঞাতিকলহে বিরক্ত হইয়া মহেশ্বর ও শুকদেব নিজগ্রাম বারোপাড়া হইতে কলিকাতা গ্রামের দক্ষিণে গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। সে-সময়ে কলিকাতা ও সুতানুটিতে শেঠ, বসাক ও দত্তচৌধুরীরা বিখ্যাত বণিক্। ইংরেজরাও প্রায় এই সময়ে কলিকাতায় আসিয়া আশ্রয় পায়। মহেশ্বরের পুত্র পঞ্চানন ও তদীয় খুল্লতাত শুকদেব আসিয়া আদিগঙ্গার তীরে বাস স্থাপন করেন। তাঁহারা যে-স্থানে বাস করিতেন, সেই স্থানে মৎস্যব্যবসায়ী জেলে, মালো ও কৈবর্তদের সংখ্যা ছিল অধিক; এ ছাড়া কতকগুলি পোদ বণিক্ বাস করিত; ইহারা নবাগত ব্রাহ্মণদের বাসস্থানাদির ব্যবস্থা করিয়া দেয়। এতগুলি তথাকথিত জল-অনাচরণীয় শূদ্রের মধ্যে পঞ্চাননরাই একঘর ব্রাহ্মণ; ক্রমে পঞ্চানন কুশারীর নাম ও উপাধি ডুবিয়া গেল, সকলেই তাঁহাকে 'ঠাকুর'মশাই বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল। শেষকালে লোকে তাঁহার কথা বলিবার সময়ে 'পঞ্চানন ঠাকুর' নামেই উল্লেখ করিত। এই সময়ে আদিগঙ্গার মুখে বিলাতী জাহাজ আসিত; পঞ্চানন এইসব জাহাজে রসদপত্র সরবরাহ করিতেন। ক্রমে তিনি জাহাজের লোকদের নিকটও 'ঠাকুর' আখ্যাতেই পরিচিত হইলেন। তাহাদের কাগজপত্রে 'ঠাকুর' (Tagoure বা Tagore) নামই চলিল। এইভাবে এই বংশের 'ঠাকুর' উপাধি প্রবর্তিত হইল।

পঞ্চানন ঠাকুরের জয়রাম ও রামসন্তোষ নামে দুই পুত্র ও শুকদেবের কৃষ্ণচন্দ্র নামে এক পুত্র হয়। তিন জনেই ইংরেজ বণিক্‌দের নিকট হইতে কিছু ইংরেজি শিক্ষা করেন; তাহা ব্যতীত পারসি ভাষা তো তখনকার দিনে ভদ্রলোক মাত্রকেই জানিতে হইত। ১৭০৭ অব্দে কলিকাতার জরিপকার্য আরম্ভ হইলে জয়রাম ও রামসন্তোষ আমিন-পদে নিযুক্ত হন। সেইজন্য খুলনায় ইঁহাদের পৈতৃক ভিটা 'আমিনের ভিটা' নামে খ্যাত। ইঁহারা কোম্পানীর কাজ করিয়া বিলক্ষণ ধন উপার্জন করিয়া ধনসায়রে (বর্তমান ধর্মতলা ও গড়ের মাঠ) বাড়ি, জমিজমা এবং যেখানে বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম আছে, সেইখানে গঙ্গাতীরে বাগানবাটী নির্মাণ করিয়াছিলেন। ১৭৫৬ অব্দে জয়রামের মৃত্যু হয়। জয়রামের মৃত্যুকালে তাঁহার দুই স্ত্রী ও তিন পুত্র (নীলমণি, দর্পনারায়ণ ও গোবিন্দরাম), দুই পৌত্র (জ্যেষ্ঠ মৃত পুত্র আনন্দীরামের পুত্র) ও এক কন্যা বিদ্যমান ছিলেন।

পলাশীযুদ্ধের (১৭৫৭) পর মীরজাফর আলি বাংলার নবাব হইয়া সিরাজউদ্দৌলাকৃত কলিকাতা-ধ্বংসের জন্য যে ক্ষতিপূরণ দেন, তাহা হইতে কিছু টাকা জয়রামের বংশধরগণ ধনসায়রের সম্পত্তির খেসারত বাবদ পাইয়াছিলেন। এই সময়ে গড়ের মাঠ বাড়াইবার জন্য কোম্পানী ধনসায়রের বাড়ি ও বাগান প্রভৃতি প্রচুর অর্থ দিয়া কিনিয়া লন। তখন জয়রামের জ্যেষ্ঠপুত্র নীলমণি কলিকাতা গ্রামে আসিয়া পাথুরেঘাটায় বাস করেন (১৭৬৪)। ইহাই কলিকাতা গ্রামে ঠাকুরগোষ্ঠীর বাসের সূত্রপাত। নীলমণি পরে অনেক জমি কিনিয়া গৃহাদি নির্মাণ করেন। এই বাটীতে তিন ভাই ও তাঁহার পোষ্যরা বাস করিতেন।

কোম্পানী দেওয়ানি পাইয়া (১৭৬৫) রাজস্ব আদায়ের নূতন ব্যবস্থা করিলে নীলমণি ঠাকুর উড়িষ্যায় কলেক্টরের সেরেস্তাদার হইয়া গমন করিলেন। নীলমণি তাঁহার উপার্জিত ধন কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতেন, দর্পনারায়ণ অভিভাবকরূপে দেখাশুনা করিতেন। কিন্তু দর্পনারায়ণও নানারূপ ব্যবসায় করিয়া ধনাগমে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

অর্থ অনর্থের মূল; অর্থ লইয়া দুই ভ্রাতার মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিল। পরে উভয়ে আপোসে বিবাদ মিটাইয়া লইলেন। নীলমণি নগদ এক লক্ষ টাকা লইয়া পাথুরেঘাটার বাড়ি ও দেবত্র-সম্পত্তি কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ছাড়িয়া দিলেন; পিতা জয়রাম ঠাকুর নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে রাধাকান্ত জীউএর সেবার জন্য যে নিষ্কর জমি পাইয়াছিলেন, তাহাও দর্পনারায়ণকে দিয়া দিলেন।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবার

জয়রাম ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র নীলমণি ঠাকুর হইতে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের উদ্ভব। নীলমণি জোড়াবাগানের বৈষ্ণবচরণ শেঠের নিকট হইতে বর্তমান জোড়াসাঁকোর বাড়ির এক বিঘা জমি দেবত্র প্রাপ্ত হন। ১৭৮৪ অব্দে জুনমাসে জোড়াসাঁকোয় ঠাকুরগোষ্ঠীর বাসের সূত্রপাত। তখন এই পল্লীর নাম জোড়াসাঁকো ছিল না; মেছুয়াবাজার পল্লীর নিকটবর্তী বলিয়া এ স্থানটিও ঐ নামে অভিহিত হইত।

নীলমণির তিন পুত্র ও এক কন্যা— রামলোচন (১৭৫৪), রামমণি (১৭৫৯), রামবল্লভ (১৭৬৭), ও কমলমণি (১৭৭৩)। সুতরাং জোড়াসাঁকোর বাস যখন আরম্ভ হয় তখন (১৭৮৪) নীলমণির সকল পুত্রই বয়স্ক। নীলমণি তাঁহার পুত্রকন্যাগণের বিবাহ পীরালিসমাজে দেন নাই; তাঁহার সদাচারখ্যাতি ও ততোধিক অর্থখ্যাতি নিষ্ঠাবান্ হিন্দুপরিবার হইতে পুত্রবধূ ও জামাতা-লাভের সহায়তা করিয়াছিল।

নীলমণির মৃত্যুর (১৭৯১) পর পরিবারের অভিভাবক হইলেন রামলোচন। তাঁহার চেষ্টায় পরিবারের বিষয়-সম্পত্তি বৃদ্ধি পায়। রামলোচনের কোনো পুত্র ছিল না, তাই তিনি ভ্রাতা রামমণির পুত্র দ্বারকানাথকে দত্তক গ্রহণ

করেন। রামমণির দুই বিবাহ; মেনকাদেবীর গর্ভে রাধানাথ, জাহ্নবীদেবী, রাসবিলাসী ও দ্বারকানাথের এবং গঙ্গাদেবীর গর্ভে রমানাথ ও সরস্বতীদেবীর জন্ম হয়।

রামলোচন ঠাকুর ছিলেন তৎকালীন আদর্শে বিশিষ্ট ভদ্রলোক বা সম্ভ্রান্ত। বেশভূষার পারিপাট্য, সান্ধ্যভ্রমণ, সংগীতাদির প্রতি অনুরাগ প্রভৃতি তৎকালীন আভিজাত্যের লক্ষণ তাঁহার জীবনে দেখা যায়।

পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর : ১৭৯৪-১৮৪৬

১৮০৭ অব্দে রামলোচনের যখন মৃত্যু হয় তখন দ্বারকানাথের বয়স বারো তেরো বৎসর। এই সময়ে তাঁহার জনক রামমণি ও পিতৃব্য রামবল্লভ উভয়ে জীবিত, তথাপি বৈষয়িক ব্যাপারের তদারকের ভার অর্পিত হইল জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাধানাথের উপর। রাধানাথ ইংরেজি শিক্ষায় একজন কৃতবিদ্য লোক ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় বিষয়াদির ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। রামলোচনের বিধবা স্ত্রী অলকা দেবী বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে যে পিতামহীর মৃত্যুর কথা উল্লেখ আছে তিনি হইতেছেন এই অলকা দেবী, দ্বারকানাথের মাতা। অলকা দেবীর মৃত্যু হয় ১৮৩৮ সালে (১২৪৪ ফাল্গুন)।[১]

দ্বারকানাথ বাল্যকালে পারসি ও ইংরেজি ভাষা ভালোভাবেই শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইংরেজি ভালোরূপে দুরস্ত হওয়ায় বৈষয়িক জীবনের উন্নতিতে উহা তাঁহার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। এই সময়ে কলিকাতায় ম্যাকিন্‌টস কোম্পানী সদাগরী কাজের জন্য খুবই খ্যাত; এই কোম্পানীর কর্মচারীগণের ঘনিষ্ঠতায় আসিয়া দ্বারকানাথ যে ব্যবসায়বুদ্ধি লাভ করেন তাহার ফলে তিনি যৌবনের আরম্ভেই ব্যবসায় করিতে শুরু করেন। প্রথম প্রথম তিনি ম্যাকিন্‌টসদের গোমস্তারূপে রেশম ও নীল ক্রয়ে সাহায্য করিতেন; কিন্তু কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে তিনি স্বয়ং বিলাতী অর্ডার সরবরাহ শুরু করিলেন। এই ব্যবসায় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জমিদারির কার্যও বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে আয়ত্ত করেন। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়ায় জমিদারদের স্বত্ব, অধিকার, রাজস্ব প্রভৃতি ব্যাপারে বিচিত্র ও জটিল সমস্যাসমূহ দেখা দিয়াছিল। দ্বারকানাথ রাজস্ব ও স্বত্ববিষয়ক সমস্যাগুলিকে উত্তমরূপে পর্যালোচনা করিয়া প্রভূত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। পৈতৃক জমিদারি বিরাহিমপুর পরগণাই এই সময় তাঁহার প্রধান ভূসম্পত্তি ছিল। সুপ্রীমকোর্টের ব্যারিস্টার মিঃ ফার্গুসনের সাহায্যে তিনি আইন-বিশেষজ্ঞ হন এবং অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলা এমনকি বিহারের বহু জমিদারের আইন-পরামর্শদাতা বা মোক্তার হইয়া উঠেন। আদালতের সংস্রবে আসিয়া দ্বারকানাথ অনেক সরকারী পদস্থ কর্মচারীর সহিত পরিচিত হন। ইহার ফলে উনত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি চব্বিশপরগণার কলেক্টর ও 'নিমকি' অধ্যক্ষের (Salt Agent) দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। এইখান হইতে ছয় বৎসর পরে তিনি শুল্ক ও আবগারী বিভাগের দেওয়ান পদে উন্নীত হন। এদিকে জমিদারদের পরামর্শদাতারূপেও তাঁহার বিশেষ অর্থ লাভ হইতেছিল। ইতিপূর্বে ম্যাকিন্‌টস কোম্পানীর কিছু অংশ ক্রয় করিয়া তাহাদের অংশীদার হইয়াছিলেন। এই সময়ে কলিকাতায় সাহেবদের পরিচালিত ব্যাঙ্ক ছিল, কিন্তু বাঙালির ব্যাঙ্ক ছিল না। দ্বারকানাথ ১৮২৯ সালে কয়েকজন সাহেবকে লইয়া য়ুনিয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। ১৮৩৪ সালে ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক ফেল হইলে বড়ো অংশীদার বলিয়া তাঁহার উপর অনেক দায়িত্ব আসিয়া পড়ে।

ইতিমধ্যে ইস্ট ইন্‌ডিয়া কোম্পানী পার্লামেন্টের নির্দেশ অনুসারে (১৮৩৩) বাণিজ্য ব্যবসায় হইতে অবসর লইতে

১ নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি-জীবনীর কয়েকটি তথ্য : তত্ত্বকৌমুদী, মহর্ষির দীক্ষা-শতবার্ষিকী সংখ্যা ১৯৪৩।

বাধা হইল। দ্বারকানাথ কোম্পানীর চাকুরি ছাড়িয়া কার্‌-ঠাকুর কোম্পানী নামে এক কুঠি স্থাপন করিলেন। এই কুঠির কাজের সঙ্গে-সঙ্গে তিনি শিলাইদহে এবং অন্যান্য স্থানে নীলকুঠি ক্রয় করিয়া লইলেন; শিলাইদহের বাড়ি এখন পর্যন্ত কুঠিবাড়ি নামে তদঞ্চলে খ্যাত। এই সময়ে তিনি রানীগঞ্জের কয়লাখনির ইজারা লইয়া দক্ষতার সহিত কাজ শুরু করেন। রামনগরের চিনির কারখানা তাঁহার প্রতিভার আর-একটি উদাহরণ। এ ছাড়া তিনি বিস্তর জমিদারি ক্রয় করেন; ইহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের জমিদারি। নাটোরের ঋষিকল্প জমিদার রাজা রামকৃষ্ণ রায়ের সংসার-ঔদাসীন্যের ফলে তাঁহার বহু সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় হয়, দ্বারকানাথ ঐসব সম্পত্তি কয়েকজন ট্রাস্টির নামে ক্রয় করিয়া লন।

দ্বারকানাথের সহায়তায় তৎকালীন বহু জনহিতকর কার্য অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দুকলেজ, মেডিক্যাল কলেজ ও জমিদার সভা স্থাপন, ইংলন্ড ও ভারতের মধ্যে দ্রুত ডাক-বিনিময়ের ব্যবস্থা, সতীদাহ-নিবারণ, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি ব্যাপারে দ্বারকানাথ অগ্রণী হইয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। সর্বপ্রকার লোকহিতকর ও সমাজসংস্কার কার্যে তিনি রামমোহন রায়ের প্রধান সহায় ছিলেন। যদিও তিনি রাজার ধর্মমত গ্রহণ করেন নাই, তথাপি তাঁহার 'আত্মীয় সভা' স্থাপন, ব্রাহ্মসমাজমন্দির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির সহিত তাঁহার আন্তরিক যোগ ছিল। দ্বারকানাথের পরিবার ঘোর বৈষ্ণব ছিল; তিনিও তাঁহার প্রথমজীবনে নিষ্ঠাবান্‌ ছিলেন। কিন্তু ঐশ্বর্যবৃদ্ধির সহিত তাঁহার প্রবল নিষ্ঠার লোপ হয় ও ক্রমে তিনি হিন্দুদের সাধারণ সংস্কারসমূহ ত্যাগ করেন। শতাব্দীপূর্বে হিন্দুর পক্ষে বিলাতযাত্রা কত বড়ো সাহসের কথা ছিল তাহা বর্তমানে আমাদের কল্পনাতীত। ১৮৪২ অব্দে দ্বারকানাথ প্রথমবার বিলাত যান। সেই বৎসরেই ফিরিয়া আসেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর তিনি তাঁহার বৈঠকখানাবাড়িতে থাকিতেন; কারণ একান্নবর্তী পরিবারের বহু আত্মীয় কুটুম্বকুটুম্বিনীদের ধর্মবিশ্বাস পাছে আহত হয় এই আশঙ্কায় তিনি এই বহির্বাটীতে বাস করিতে থাকেন।[১]

১৮৪৪ সালে দ্বারকানাথ দ্বিতীয়বার বিলাত যান। এইবার সঙ্গে ছিলেন তাঁহার ভাগিনেয় নবীন মুখোপাধ্যায় ও কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ; এ ছাড়া অন্য লোকও ছিল। এই বৎসর তাঁহার চেষ্টায় ও অর্থানুকূল্যে চারিজন বাঙালি ছাত্র ডাক্তারি শিক্ষার জন্য বিলাত যান; দুইজনের ব্যয় দ্বারকানাথ স্বয়ং বহন করেন, অপর দুইজনের ব্যয় দেন গভর্নমেন্ট। বিলাতে দ্বারকানাথ যেরূপ বিলাস ও বৈভবের মধ্যে থাকিতেন তাহাতে লোকে তাঁহাকে 'প্রিন্‌স্‌ দ্বারকানাথ' বলিত। তথায় তাঁহার মৃত্যু হয় (১৮৪৬ অগস্ট ১), তখন তাঁহার বয়স মাত্র একান্ন বৎসর।

দ্বারকানাথের বদান্যতা, সৌন্দর্যপ্রিয়তা, বিলাসিতা সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার, সেটি হইতেছে তাঁহার সৌন্দর্যভোগের অসীম ক্ষমতা। যে বিলাসিতা ও সৌন্দর্যপ্রিয়তা তাঁহার বেলগাছিয়া বাগানে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, তাহাই উত্তরকালে বংশধরদের মধ্যে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ১৮১৭-১৯০৫

রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাদেশে 'মহর্ষি' নামে পরিচিত; ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা প্রথমে ইঁহাকে এই সম্মানসূচক উপাধি দিয়াছিলেন। ইনি দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইঁহার মাতা দিগম্বরী দেবী

১ বৈঠকখানাবাড়ি বলিতে বুঝায় ৫নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলির বাড়ি। পরে গিরীন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী বাসের জন্য ইহা পান। এককালে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসংগ্রহের জন্য ইহার খ্যাতি ছিল। ১৯৪১ সালে ইহা বিক্রয় হইয়া যায়: ইহার শিল্পসংগ্রহ আমেদাবাদে চলিয়া গিয়াছে। মূল বসতবাটী হইতেছে ৬নং বাড়ি।

স্বধর্মনিষ্ঠা ও তেজস্বিতার জন্য খ্যাত ছিলেন। দ্বারকানাথ সাহেবদিগের সহিত একত্রে পান আহার করিতে আরম্ভ করিলে দিগম্বরী দেবী 'স্বামীর সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মচর্য অবলম্বনে জীবননির্বাহের ব্রত ধারণ করিয়া মৃত্যুর দ্বারা তাহা উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন'।[১] দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার ধর্মনিষ্ঠা হয়তো জননীর চরিত্র হইতেই লাভ করিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথের সন্তানগণের মধ্যে কেবল দেবেন্দ্রনাথই দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় ও চতুর্থ পুত্র অপ্রাপ্তবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তৃতীয় পুত্র গিরীন্দ্রনাথ চৌত্রিশ বৎসর (মৃ ১৮৫৪) ও কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ (মৃ ১৮৫৮) উনত্রিশ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের জন্মের সময়[২] দ্বারকানাথের বয়স তেইশ বৎসর মাত্র; তখন দ্বারকানাথের অবস্থা অতি সামান্য। সাত বৎসর পরে দ্বারকানাথ চব্বিশ-পরগণার কলেক্টরের দেওয়ানপদে নিযুক্ত হন ও সেই হইতে তাঁহার ভাগ্যোদয়। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথের কৈশোর ও যৌবন পিতার বৈভব ও আড়ম্বরের মধ্যে কাটে। দেবেন্দ্রনাথের বিবাহ হয় বোধহয় ১৮৩৪ সালের ফাল্গুন মাসে, তখন তাঁহার বয়স সতেরো বৎসর মাত্র। পত্নী সারদা দেবীর বয়স ছয় কি সাত বৎসরের বেশি নয়; ইনি খুলনা দক্ষিণডিহির রায়চৌধুরী রামনারায়ণের কন্যা। ইঁহার গর্ভে পনেরোটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিই রবীন্দ্রনাথের গর্ভধারিণী। ইনি পঞ্চাশ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন।

দ্বারকানাথ প্রাচীন মত ও পথ সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ না করিলেও তিনিই ছিলেন রামমোহন রায়ের প্রধানতম পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু তাঁহার অন্দরমহল ছিল বৈষ্ণব; বাড়ির ত্রিসীমানায় মাংসাদি আসিতে পারিত না, মদ্যের তো কথাই ছিল না। পিতামহীর প্রভাবে দেবেন্দ্রনাথ বাল্যকালাবধি নিরামিষ আহারেই অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু যৌবনকালে যখন তাঁহার পিতা কলিকাতার একজন প্রধান ধনী, তখন সেই প্রাচীন অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুকলেজে কয়েক বৎসর পাঠ করেন, কিন্তু তথাকার উচ্ছৃঙ্খল আবহাওয়া ও আদর্শ তাঁহাকে স্পর্শ না করিলেও পিতার ধনৈশ্বর্যের আবিলতা তাঁহাকে সম্পূর্ণ অমলিন রাখিতে পারে নাই। কার-ঠাকুর কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত (১৮৩৪ জুলাই) হইলে বহু দেশীয় ও ইংরেজ ধনীর সহিত দ্বারকানাথের ব্যবসায়িক ও সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই সমস্ত আমোদ-প্রমোদ সভায় সামাজিকতার খাতিরে দ্বারকানাথ পুত্রগণের সহিত উপস্থিত হইতেন; ইহার কুফল দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ক্ষণকালের জন্য দেখা দিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ গৃহসংসারের কর্তৃত্ব পাইয়া যদৃচ্ছভাবে জীবন যাপন করিতে থাকেন; আঠারো হইতে একুশ বৎসর বয়স পর্যন্ত কয় বৎসর দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে বিলাসিতার জীবন। দ্বারকানাথ পুত্রকে এই দুর্নীতিপূর্ণ পারিপার্শ্বিক হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহাকে য়ুনিয়ন ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু এমন সময়ে তাঁহার পিতামহী অলকা দেবীর মৃত্যুতে তাঁহার জীবনের আমূল পরিবর্তন হয়। পিতামহীর শবপার্শ্বে শ্মশানে বসিয়া তাঁহার চিত্তে এমন একটি আনন্দময় উদাস ভাবের উদয় হইয়াছিল, যাহার স্পর্শচিহ্ন মন হইতে আর মুছিল না। মহর্ষির আত্মচরিতের পাঠকমাত্রেই জানেন, কিভাবে এই মৃত্যু তাঁহার জীবনকে নূতন পথে পরিচালিত করিল। তখন তাঁহার বয়স একুশ বৎসর।

ইহার পর সংস্কৃত শিখিয়া শাস্ত্রের মধ্যে কী আছে জানিবার জন্য তাঁহার প্রবল ইচ্ছা হইল। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি য়ুরোপীয় দার্শনিকদের গ্রন্থ অধ্যয়নেও মন দিলেন। যুব-বাংলার জ্ঞানপিপাসু চিত্তকে সেদিন অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক ও বিপ্লববাদী লেখকগণ এবং হিউম প্রভৃতি নিরীশ্বরবাদীরা কিভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল, তাহা পাঠকমাত্রেই

১ মহর্ষির আত্মজীবনী (বিশ্বভারতী সংস্করণ) পরিশিষ্ট পৃ ২৯৮।

২ ১৮১৭ মে ১৫। ১২২৪ জ্যৈষ্ঠ ৩।

অবগত আছেন। য়ুরোপীয় মনীষীদের বিপ্লববাদ হিন্দুকলেজের ছাত্রগণের মধ্যে প্রচার লাভ করিয়া শিক্ষিত বঙ্গসমাজের মধ্যে কী আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা শিবনাথ শাস্ত্রীকৃত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে বিশদভাবে বিবৃত আছে। এইসব মতের সহিত পরিচয় থাকিলেও দেবেন্দ্রনাথের মন ইহাতে সাড়া দেয় নাই। ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবার জন্য তিনি মূল সংস্কৃত মহাভারত পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন; সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে সংস্কৃত মহাভারত বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে সর্বপ্রথম মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। পণ্ডিতদের সাহায্যে তিনি মহাভারতপাঠে রত হইলেন। এ ছাড়া হিন্দুকলেজের প্রাক্তন ছাত্রগণকর্তৃক স্থাপিত 'সাধারণ জ্ঞানোন্নতি সভা'র সদস্য হইয়া নানারূপ আলাপ-আলোচনায় যোগদান করিবার ফলে ধর্মসম্বন্ধে তাঁহার মত ক্রমশই প্রচলিত মত ও বিশ্বাস হইতে বিপ্লবমুখী হইতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার এই ধর্মজিজ্ঞাসা অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার মরুভূমির মধ্যে গিয়া আত্মঘাতী না হইয়া ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করিতে অগ্রসর হইল। তাঁহার এই দৃঢ় ধারণা জন্মিল যে প্রতিমা ঈশ্বর নহে; রামমোহন রায়কে তিনি বালককালে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার কথা স্মরণ হইল। ভাইদের লইয়া একত্রে প্রতিজ্ঞা করিলেন প্রতিমাকে প্রণাম করিবেন না। অতঃপর 'সর্বতত্ত্বদীপিকা'[১] নামে সভার সদস্য হইলেন; 'ধর্মবিষয়ের আলোচনা' ছিল এই সভার বিশেষত্ব। এই সভার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল গৌড়ীয় ভাষা ও স্বদেশীয় বিদ্যার অলোচনা; এ ছাড়া স্থির হয় 'বঙ্গভাষা ভিন্ন এ-সভাতে কোনো ভাষায় কথোপকথন হইবেক না'।[১] মোটকথা তাঁহার মন পরা ও অপরা উভয়বিধ জ্ঞান আহরণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময়ে হঠাৎ একদিন রামমোহন রায়কর্তৃক প্রকাশিত ঈশোপনিষদের একখানি ছিন্নপত্র আসিয়া তাঁহার হাতে পড়িল, তাহাতে লেখা ছিল, "ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্"॥ ইহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের (১৭৮৬-১৮৪৫) নিকট গমন করেন ও উহার মর্মার্থ অবগত হইয়া পরম তৃপ্ত ও চমৎকৃত হন; অতঃপর গভীর অভিনিবেশ সহকারে উপনিষদ্ অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন।

১৮৩৯ অব্দে বাইশ বৎসর বয়সে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদের বাড়িতে 'তত্ত্বরঞ্জিনী-সভা' স্থাপন করেন; পরে উহার নাম হয় 'তত্ত্ববোধিনী-সভা'। এই সময়ে অক্ষয়কুমার দত্ত আসিয়া তাঁহার সহিত যুক্ত হইলেন। ইঁহারই ভরসায় দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪০ সালের জুনমাসে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' স্থাপন করিলেন। ইহা স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল খ্রীস্টীয় ধর্মের স্রোত নিবারণ এবং বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান ও ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান। বিনা বেতনে এই বিদ্যালয়ে বিদ্যাদান করা হইত। এই বৎসর তিনি কঠোপনিষদের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করিয়া রাজা রামমোহন রায়ের কার্যের অনুক্রমণ করিলেন। তেইশ বৎসর বয়সে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম হয় (১৮৪০ এপ্রিল ৮)।

১৮৪২ সালে দেবেন্দ্রনাথের প্রেরণায় তত্ত্ববোধিনী-সভা ব্রাহ্মসমাজের ভার গ্রহণ করিল। পর বৎসর তাঁহারই অর্থানুকূল্যে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হইল, অক্ষয়কুমার দত্ত হইলেন প্রথম সম্পাদক। হেদুয়ার নিকটবর্তী রামমোহন রায়ের পরিত্যক্ত স্কুলবাটীতে ছিল 'পত্রিকা'র যন্ত্রালয়; দ্বারকানাথ তখন জীবিত, তাঁহার বিরাগভাজন হইবার ভয়ে দেবেন্দ্রনাথ বাড়িতে না বসিয়া তথায় গিয়া রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট বেদান্ত পাঠ করিতেন। এই সময় হইতে তাঁহারই চেষ্টায় মৃতবৎ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হইতে লাগিল। রামমোহনের সময়ে ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে প্রকাশ্যে বেদপাঠ হইত না, পাছে অব্রাহ্মণ কেহ শ্রবণ করিয়া ফেলে। দেবেন্দ্রনাথ এই বৎসর প্রকাশ্যে বেদ পঠিত হইবে বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অবশেষে স্বয়ং ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া

১ প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—"মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা" : বিশ্বভারতী-পত্রিকা ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, পৃ ২৮৮-২৯৫।

(১৭৬৫ শক। ১২৫০ সাল পৌষ ৭। ১৮৪৩ ডিসেম্বর ২৩) সম্পূর্ণভাবে সমাজের আদর্শ ও কর্মের সহিত যুক্ত হইয়া পড়িলেন। দেবেন্দ্রনাথের সমগ্র পরবর্তী জীবন যেন সেই দিনের গৃহীত সংকল্পেরই বিকাশমাত্র। তিনি সারা জীবন এই দিনটিকে পবিত্র চক্ষে দেখিতেন। রবীন্দ্রনাথের নিকটও পিতার দীক্ষাদিন ছিল তেমনি পূত, তাঁহার বিরাট গদ্যসাহিত্যে এই দিনের স্মরণে বহু রচনা আছে। দুই বৎসর পরে (১৮৪৫) ৭ই পৌষ গোরেটির বাগানে ব্রাহ্মদের লইয়া দেবেন্দ্রনাথ এক 'উৎসব' করেন, ব্রাহ্মদের মধ্যে ইহাই প্রথম সামাজিক উৎসব।

দীক্ষাগ্রহণের পর হইতে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে মন দিলেন। সেই সময়ে একদিকে খ্রীস্টান পাদরীরা হিন্দু ধর্ম ও সমাজকে নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করিতেছেন; অন্যদিকে দেশীয় পণ্ডিতগণ প্রাচীন শাস্ত্রকে অভ্রান্ত জ্ঞানে প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিবার জন্য বদ্ধপরিকর; আর হিন্দুকলেজের যুক্তিবাদী ছাত্ররা ধর্মমাত্রকেই বিদ্রূপ করিতেছেন। এই ত্রিবিধ আক্রমণ হইতে হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কাজে যতই মনোযোগী হইতে লাগিলেন, বৈষয়িক ব্যাপারে ঔদাসীন্য ততই বাড়িয়া চলিল। এমন সময়ে বিলাতে দ্বারকানাথের মৃত্যু হইল (১৮৪৬ অগস্ট ১)। পিতার মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ কিভাবে বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা করিলেন, কিভাবে পিতৃঋণ শোধ ও শ্রাদ্ধাদি নিষ্পন্ন করিলেন তাহা তাঁহার আত্মজীবনীতে বিস্তৃতভাবেই বিবৃত হইয়াছে। অপৌত্তলিকভাবে পিতার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান যে হিন্দুসমাজের চক্ষে কত বড়ো বিদ্রোহ তাহা বর্তমান যুগে হৃদয়ংগম করা কঠিন। ইহা ব্যক্তিগত বিদ্রোহ নহে, ইহা সামাজিক বিপ্লব।

ইতিমধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী মনীষার প্রভাবে দেবেন্দ্রনাথের নিজের ও ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাসে পরিবর্তন সাধিত হইতেছিল। রামমোহন রায় যে একেশ্বরবাদী মণ্ডলী স্থাপন করেন, উহার মতবাদের নাম দেন 'বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম' (১৮২৬ অগস্ট ২০। ১৭৫০ শক ভাদ্র ৬)। ১৮৩০ অব্দে (জানুয়ারি ২৩, ১১ই মাঘ বুধবার) চিৎপুর রোডে মণ্ডলীর নূতন মন্দিরগৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের ভার লইবার পরে তত্ত্ববোধিনী সভার এক অধিবেশনে স্থির হইল যে অতঃপর বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম নামের পরিবর্তে 'ব্রাহ্মধর্ম' নাম অবলম্বন করা হইবে (১৮৪৭ মে ২৮)। "এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে কি দুর্ধর্ষ মানসিক বলের পরিচয়, তাহা আমরা এখন কল্পনাতেও আনিতে পারি না।" বেদ অভ্রান্ত ও ধর্মের উৎসরূপে এতকাল স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল, সেই মতে ভাঙন ধরিল, "শতসহস্র যুগযুগান্তরের অর্জিত মানসিক শৃঙ্খল নির্বিবাদে ও সহজে খসিয়া গেল"।

এদিকে ১৮৪৮ অব্দের প্রথমভাগে য়ুনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল হইল এবং অল্পকাল পরেই কর ঠাকুর কোম্পানির দ্বারে তালা পড়িল। দেবেন্দ্রনাথ কঠোরভাবে ব্যয়সংকোচ করিয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন; কিন্তু অভাবের মধ্যেও তাঁহার নিয়মিত শাস্ত্রানুশীলন বন্ধ রহিল না।

বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম যদি সত্য ধর্ম না হয় তবে সত্য ধর্ম কী, এই প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের সৃষ্টি। উপনিষদাদি বহু গ্রন্থ হইতে বিশেষ বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ সম্পাদন করেন; কিন্তু কোথাও ঐ সব অংশের মূল নির্দেশ করেন নাই। ইহার কারণ বোধ হয় প্রাচীন গ্রন্থসমূহে যুক্তি ও সহজজ্ঞানের পরিপন্থী বহু মতবাদ আছে, তিনি তাহা স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন না। দেবেন্দ্রনাথের মন পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও যুক্তিবাদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া তিনি কোনো প্রাচীন গ্রন্থকে 'শাস্ত্রে'র স্থান দিতে পারিলেন না। এইজন্য ভাষা উপনিষদাদি হইতে গৃহীত হইলেও ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের বক্তব্য বিষয় ও তাহার শৃঙ্খলা সম্পাদনের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে স্বয়ং গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর ব্রাহ্মধর্মপ্রচার-কার্যে দেবেন্দ্রনাথ প্রায় দশবৎসর নিরন্তর ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার চারিত্রমাধুর্য ও আধ্যাত্মিক প্রেরণার জন্য বহু বন্ধু লাভ হয়; ইঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন বর্ধমান-অধিপতি

মহাতাপচাঁদ[১] ও কৃষ্ণনগরের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র। উভয়েই ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন কিন্তু শেষপর্যন্ত কেহই তাহার সহিত যুক্ত হন নাই; একমাত্র রাজনারায়ণ বসুর সহিত দেবেন্দ্রনাথের যোগ আজীবন সর্বতোভাবে অটুট ছিল।

১৮৫৩ অব্দে দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী-সভা'র সম্পাদক হইলেন। এখনও ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরের বেদিতে বসিয়া উপাসনা করিলেন না। এদিকে গৃহের মধ্যে পৌত্তলিক অনুষ্ঠানাদির সমর্থন করা ক্রমেই আধ্যাত্মিক দিক্ হইতে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। অথচ ভ্রাতারা ভ্রাতৃবধূরা এবং অন্যান্য আত্মীয়রা তাঁহার মতবিরোধী। ইতিমধ্যে ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যু হইলে (১৮৫৪) সংসারে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দেখা দিল। গিরীন্দ্রনাথই বিষয়সম্পত্তি প্রভৃতি দেখাশুনা করিতেন; তাঁহার অভাবে যাবতীয় সাংসারিক কাজকর্ম দেবেন্দ্রনাথের উপর আসিয়া পড়িল। তিনি ভ্রাতাদের বিষয়াদি যথোপযুক্তভাবে পৃথক্ করিয়া দিলেন, কিন্তু জমিদারির দেখাশুনা এজমালিতে থাকিয়া গেল। এইসব কারণে অনেকটা সংসারবিরক্ত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ নৌকাযোগে (১৮৫৬) কাশীযাত্রা করিলেন ও তথা হইতে হিমালয়ে চলিয়া গেলেন। দুই বৎসর পরে সিপাহীবিদ্রোহের সূচনা হইলে তিনি কলিকাতায় ফিরিলেন (১৮৫৮ নভেম্বর)।

এইবার পাহাড় হইতে ফিরিবার পর দেবেন্দ্রনাথের সহিত বিংশ বৎসরের তরুণ যুবক কেশবচন্দ্র সেন আসিয়া মিলিত হইলেন। এই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন যুবককে শিষ্যরূপে পাইয়া দেবেন্দ্রনাথের কর্মজীবনে চতুর্গুণ বল আসিল। ধর্মমত পোষণ ও ধর্মজীবন পালনের মধ্যে যে সংগ্রাম চলিতেছিল এতদিন পরে তাহারও সমাধান হইল। হিন্দুসমাজের পৌত্তলিক অনুষ্ঠানাদির সহিত কোনোপ্রকার সম্বন্ধ রক্ষা করা কঠিন হওয়ায় তিনি গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দনের সেবা রহিত করিয়া দিলেন। অবশেষে বিগ্রহকে স্থানান্তরিত করিতে উদ্যত হইলে গিরীন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী (গণেন্দ্র ও গুণেন্দ্রনাথের জননী) উহার সেবার ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া দ্বারকানাথের বৈঠকখানাবাটীতে দুই পুত্র, পুত্রবধূদ্বয়, দুই কন্যা ও জামাতাদের লইয়া উঠিয়া গেলেন।

এদিকে কেশবচন্দ্রের সহায়তা লাভ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের নানা কর্মে জড়িত হইয়া পড়িলেন। ১৮৫৯ অব্দে 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' স্থাপিত হইল; তথায় দেবেন্দ্রনাথ বাংলায় ও কেশবচন্দ্র ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতেন। সেই বৎসর আশ্বিন মাসে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রকে লইয়া সিংহল ভ্রমণ করিয়া আসেন; এখন হইতে কেশবচন্দ্র সকল বিষয়ে সকল কার্যে দেবেন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। নূতন প্রাণশক্তির প্রেরণায় এইবার দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং বেদিতে বসিলেন (১৮৬০ জুলাই ২৫, ১২৬৭ শ্রাবণ ১১)। ইহারই পরদিন দ্বিতীয়া কন্যা সুকুমারী দেবীর বিবাহ হইল। ব্রাহ্মধর্মমতে দেবেন্দ্রনাথের ইহাই প্রথম অপৌত্তলিক বিবাহ অনুষ্ঠান। সুকুমারী দেবীর বিবাহে দেবেন্দ্রনাথ যে গতানুগতিকের পথ ত্যাগ করিয়া সত্য ধর্মের পথে অগ্রসর হইলেন, মনে হয় ইহার মূলে ছিলেন কেশবচন্দ্র। কারণ এই সময়ে কেশব তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া জোড়াসাঁকোর বাটীতে বাস করিতেছেন। দেবেন্দ্রনাথের উপর তখন কেশবের প্রভাব অতি প্রবল। সুকুমারীর বিবাহে দেবেন্দ্রনাথ প্রাচীন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিলেন; পৌত্তলিকতা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি তুলসীপত্র, বিল্বপত্র, কুশ, শালগ্রামশিলা, গঙ্গাজল ও হোমাগ্নি বর্জন করিয়া এক নূতন অনুষ্ঠানপদ্ধতি সংকলন করিলেন ও তদনুযায়ী কন্যার বিবাহ দিলেন।[২]

নূতন পদ্ধতিমতে কন্যার বিবাহ দানের ফলে দেবেন্দ্রনাথের পরিবারের সামাজিক পরিধি আরো সংকীর্ণ

১ মহাতাপচাঁদের প্রভাবে বর্ধমানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয় এবং সেখান হইতে এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়: ওঁ তৎসৎ সত্যসন্ধগণের ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি। সত্যসন্ধায়িনী সভা হইতে প্রকাশিতা। বর্ধমান:সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে ১৭৮৭ শকাব্দে অগ্রহায়ণে মুদ্রিতা। (১৮৬৫ নবেম্বর। ১২৭২ সাল) পৃ ১২৫ + সত্যসন্ধদিগের প্রতিষ্ঠা, পৃ ৵০।

২ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃত রবীন্দ্র-কথা দ্রষ্টব্য।

হইয়া আসিল। নব্য ব্রাহ্মদলের সংযোগে দেবেন্দ্রনাথের সামাজিক গণ্ডি একটু একটু প্রসার লাভ করিতেছিল বটে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ পৃথক্ ধরনের। নিজগৃহে পূজাপার্বণ বন্ধ হওয়ায় ও অন্যের গৃহে পূজাদিতে নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করায় সাধারণ হিন্দুসমাজের সহিত ঠাকুরপরিবারের বিচ্ছেদটা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

গৃহদেবতার পূজা বন্ধ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ বাটীতে সমবেত ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। চণ্ডীমণ্ডপে দৈনিক ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্তিত হইল, প্রতিমার পীঠস্থানে উপাসনার বেদি নির্মিত হইল; ব্রাহ্মধর্মের বীজমন্ত্র শ্বেতপ্রস্তরে উৎকীর্ণ করিয়া ভিত্তিগাত্রে প্রোথিত হইল। পূজাপার্বণ লুপ্ত হইল বটে, কিন্তু তিনি কতকগুলি নূতন উৎসবের প্রচলন করিলেন; জামাইষষ্ঠী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রভৃতি সামাজিক নির্দোষ পার্বণগুলিও তাঁহার পরিবারে চলিত রহিল। নূতন উৎসবের মধ্যে মাঘোৎসব (১১ই মাঘ) তাঁহারই প্রবর্তন ; এ ছাড়া নববর্ষ (১লা বৈশাখ), ভাদ্রোৎসব (৬ই ভাদ্র), দীক্ষা দিন (৭ই পৌষ) প্রভৃতির উৎসব প্রবর্তন করিয়া প্রাচীন পালপার্বণের অভাব দূরীকরণে চেষ্টা করেন।

অল্পকাল মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের আভিজাতিক জীবনাদর্শের সহিত তাঁহার ধর্মবন্ধুদের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক আদর্শের বিরোধ বাধিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, সমাজের গঠনতন্ত্র, উপবীতবর্জন, ব্রাহ্মণেতরের বেদি গ্রহণাধিকার, স্ত্রীস্বাধীনতা, জাতিভেদ দূরীকরণ প্রভৃতি নানা বিষয় লইয়া নবীন ব্রাহ্মদের সহিত দেবেন্দ্রনাথের মতভেদ। এই বিরোধী আন্দোলনের নেতা হইলেন কেশবচন্দ্র। দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ ও বন্ধুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন, তৎসত্ত্বেও কেশবের প্রবল প্রগতির সঙ্গে পদক্ষেপের সমতা রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। অবশেষে কেশব দেবেন্দ্রনাথকে ত্যাগ করিয়া নূতন সমাজ গঠন করিলেন (১৮৬৬ নভেম্বর ১১)। দুই বৎসর পরে (১৮৬৮ মাঘোৎসব) মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজমন্দির স্থাপন করিলেন। তদবধি দেবেন্দ্রনাথের সমাজ আদিব্রাহ্মসমাজ নামে অভিহিত হইল। দেবেন্দ্রনাথের বড়ো আশা ছিল যে কেশবই তাঁহার কার্য চালনা করিবেন, পুত্রের ন্যায়, শিষ্যের ন্যায়; তাঁহার সে-আশা পূর্ণ হইল না। দেবেন্দ্রনাথ মর্মাহত হইয়া বাহিরের সকল কাজ হইতে একপ্রকার অবসর গ্রহণ করিয়া পরিব্রাজক জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার জীবনের শেষ চল্লিশ বৎসর ভ্রমণে, শান্তিনিকেতন-বাসে, ধ্যানে, মননে কাটিয়া যায়। অষ্টআশি বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন (১৯০৫ জানুয়ারি ১৯, ১৩১১ মাঘ ৬)।

জননী সারদা দেবী : ১৮২৬ ?–১৮৭৫

সারদা দেবী বিদুষী না হইলেও মহীয়সী, রত্নগর্ভা। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় মহাপুরুষের পত্নী এবং দ্বিজেন্দ্রনাথপ্রমুখ সন্তানের জননী হইলেও সাহিত্যে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া কোনো অমর সৌধ নির্মিত হয় নাই। তাঁহার কৃতকর্মা পুত্র অথবা বিদুষী কন্যাগণের মধ্যে কেহই তাঁহাদের মাতৃদেবী সম্বন্ধে তেমন-কিছু লিখেন নাই, কেহ কোনো গ্রন্থ মাতৃনামে উৎসর্গও করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিরাট্ সাহিত্যে জননী সম্বন্ধে কয়েকটি স্থানে মাত্র সামান্য উল্লেখ করিয়াছেন ; মাতৃবিয়োগের সময় রবীন্দ্রনাথ শিশু ছিলেন না, তখন তাঁহার বয়স প্রায় চৌদ্দ বৎসর ; সুতরাং মাতৃস্মৃতি ম্লান হইয়া যাইবার কারণ ছিল না। আমাদের মনে হয় সারদাদেবী শেষজীবনে অসুস্থ থাকায়, মাতাপুত্রের মধ্যে যে স্বাভাবিক মধুর সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে তাহা ইঁহাদের ক্ষেত্রে ব্যাহত হইয়াছিল ; মাতার স্মৃতি বোধহয় সেইজন্য এমন ক্ষীণ।

সারদা দেবী ছিলেন নিষ্ঠাবান্ সাধারণ হিন্দুঘরের মেয়ে, ঠাকুরপরিবারের প্রাচীন লৌকিক হিন্দুধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে তাঁহার বাল্য ও যৌবনের প্রথম কয়েক বৎসর কাটিয়া যায়। ১৮৪৩ হইতে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ আঠারো বৎসর দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সংগ্রামের পর্ব। স্বামীর এই সংগ্রামের সহিত পত্নী

সম্পূর্ণ সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে পারিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ, কারণ নানা আচার-অনুষ্ঠানে তাঁহাকে প্রাচীন লোকাচারই অনুবর্তন করিতে দেখা যায়। যাহাই হউক, ধর্মসম্বন্ধে তিনি কী মত পোষণ করিতেন, তাহার আলোচনা আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন; তবে চারিত্রিক দিক্ হইতে তাঁহার মধ্যে যে একটি কর্তৃত্বশক্তি ছিল, তাহার প্রমাণ আমরা যথেষ্ট পাই। দেবেন্দ্রনাথ নানাপ্রকার কর্ম উপলক্ষে বা ভ্রমণ উদ্দেশ্যে প্রায়ই বাহিরে বাহিরে থাকিতেন, এইসব সময়ে সারদা দেবী গৃহে আর-কোনো কর্ত্রীর অভাবে নিজ শান্ত সংযত শক্তিবলে এই বৃহৎ পরিবারকে চালনা করিয়াছিলেন।[১] আমাদের মনে হয় সারদা দেবীর মধ্যে এমন কতকগুলি সুকুমার বৃত্তি ছিল, যাহা বাল্যকালে অনুকূলতার অভাবে ও যৌবনে সংসারের কর্মপীড়নে বিকশিত হইবার সুযোগ পায় নাই। রবীন্দ্রনাথের মাতার গুণাগুণসম্বন্ধে এত কম তথ্য জানা যায় যে, আমাদের পক্ষে অনুমানের সাহায্য লওয়া ছাড়া উপায় নাই।

দেবেন্দ্রনাথের বংশধর

দেবেন্দ্রনাথের পনেরোটি সন্তান জন্মিয়াছিল। প্রথম একটি কন্যা (১৮৩৮?) অকালেই মারা যায়, তাহার নামকরণাদিও হয় নাই তজ্জন্য সাধারণত দেবেন্দ্রনাথের চৌদ্দটি পুত্রকন্যা বলা হইত। তন্মধ্যে পুত্র নয়জন।

জ্যেষ্ঠপুত্র **দ্বিজেন্দ্রনাথ** (১৮৪০-১৯২৬)[২]। কাব্যে, দর্শনে, সংগীতে, গণিতে তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ছিল। ছাব্বিশ বৎসর বয়সে (১২৬৬) তিনি মেঘদূতের পদ্যানুবাদ করেন। তাঁহার স্বপ্নপ্রয়াণ[৩] কাব্য বাংলা সাহিত্যে নানা দিক্ হইতে উল্লেখযোগ্য। শোনা যায় সাহিত্যিক মহলে কথা উঠে যে পৌরাণিক আখ্যান ছাড়া কাব্যরচনার উপাদান সুদুর্লভ; আর মধুসূদন যে সংস্কৃতবহুল ভাষায় মেঘনাদবধ কাব্য লিখিয়াছেন, সে-ভাষা ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ ছাড়া মহাকাব্য রচনা করা দুঃসাধ্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ এই দুই ধারণা দূর করিবার জন্যই স্বপ্নপ্রয়াণ লিখিতে প্রবৃত্ত হন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় দ্বিজেন্দ্রনাথের অসংখ্য সারগর্ভ রচনা প্রকাশিত হয়। 'ভারতী' পত্রিকার তিনি প্রথম সম্পাদক (১২৮৪-১২৯০)। তাঁহার দীর্ঘ জীবন প্রধানত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় অতিবাহিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা: পুত্র দ্বিপেন্দ্র (১৮৬২-১৯২২), অরুণেন্দ্র, নীতীন্দ্র, সুধীন্দ্র ও কৃতীন্দ্র। নীতীন্দ্র যৌবনেই মারা যান। ইনি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার পত্নীর বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন; রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র' প্রথম খণ্ডের মধ্যে বহুবার নীতীন্দ্রের উল্লেখ আছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র সুধীন্দ্রনাথ (১৮৬৯-১৯২৯) 'সাধনা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন; বাংলাসাহিত্যে তাঁহার দান একেবারে নিশ্চিহ্ন হইবে না। ইঁহার পুত্র সৌম্যেন্দ্রনাথ বর্তমানে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুপরিচিত। দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরোজা দেবী ও কনিষ্ঠা কন্যা ঊষা দেবীর সহিত যথাক্রমে ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র মোহিনীমোহন ও রমণীমোহনের বিবাহ হয়। ললিতমোহন ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রাধাপ্রসাদের দৌহিত্র। মোহিনীমোহন ও রমণীমোহন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। রবীন্দ্রনাথের সহিত উভয়ের যথেষ্ট সৌহার্দ্য ছিল; তাঁহার শান্তিনিকেতনস্থ বিদ্যালয় পরিচালনা বিষয়ে আদিযুগে উভয়েরই যোগ ছিল। দ্বিপেন্দ্রনাথের পুত্র দিনেন্দ্রনাথ (১৮৮২-১৯৩৫) বহু বৎসর রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন; রবীন্দ্রসংগীতে তাঁহার অপূর্ব প্রতিভা আজ সর্বজনবিদিত; রবীন্দ্রনাথ 'ফাল্গুনী' নাটক তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যে লিখিয়াছিলেন 'আমার সকল গানের ভাণ্ডারী', এই উক্তিটি অতি সত্য।

দ্বিতীয় পুত্র **সত্যেন্দ্রনাথ** (১৮৪২-১৯২৩)। তিনিই ভারতের প্রথম আই. সি. এস.। আঠারো বৎসর বয়সে

১ দ্র: রবীন্দ্রকথা। ২ জন্মকাল ১৭৬১ শকাব্দ ১২৪৬ সাল ফাল্গুন ৩০, মৃত্যুকাল ১৩৩২ মাঘ ৪, ১৯২৬ জানুয়ারি ১৮।

৩ স্বপ্নপ্রয়াণ ১ম সর্গ, বঙ্গদর্শন ২য় বর্ষ ১২৮০ আশ্বিন।

তিনি বিলাত যান ও ১৮৬৪ অব্দে সিভিল সার্বিসে প্রবেশ করেন।[১] তাঁহার চাকুরিকাল বোম্বাই প্রদেশে কাটে; রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে ও পত্রাবলীতে বোম্বাই-প্রবাসের কথা বহুবার উল্লিখিত ও আলোচিত দেখিতে পাই। তাঁহার পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী অসাধারণ রমণী ছিলেন; সামান্য বালিকাবধূরূপে জোড়াসাঁকোর বাটীতে প্রবেশ করেন, কিন্তু প্রতিভাবলে নিজেকে সুশিক্ষিতা করিয়া তোলেন। বাংলাদেশে মেয়েদের পরদা বা অবরোধ-প্রথা ভাঙিবার আন্দোলনে সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী ছিলেন অগ্রণী। এই মেজোবৌঠানের কাছে কবি নানা বিষয়ে ঋণী ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথের অসাধারণ অধিকার ছিল। বাংলাসাহিত্যেও তাঁহার দান কম নয়। মহারাষ্ট্রীয় সাধকদের কথা তিনিই সর্বপ্রথম বাঙালি পাঠকদের গোচর করেন। তাঁহার 'গীতা' ও 'মেঘদূত'এর পদ্যানুবাদ (১৯০৫) 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস' এবং 'বৌদ্ধধর্ম' সুবিদিত। ইঁহার পুত্র সুরেন্দ্রনাথ (১৮৭২-১৯৪০) ও কন্যা ইন্দিরা দেবী (১৮৭৩) রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ পিতার প্রাচীনপন্থী মতের সহিত সর্বদা একমত হইতে পারিতেন না, পুত্রকন্যার শিক্ষাবিষয়ে স্বাধীনভাবেই চলিতেন। ইন্দিরাদেবীকে সাহেবী স্কুলে দিয়া ফরাসীভাষায় ও য়ুরোপীয় সংগীতবিদ্যায় পারদর্শী করেন। ইন্দিরাদেবীর বিবাহ হয় প্রমথনাথ চৌধুরীর সহিত; প্রমথনাথ বাংলাসাহিত্যে 'বীরবল' নামে খ্যাত। সুরেন্দ্রনাথ বাংলাদেশের সমবায়, জীবনবীমা ও ব্যাঙ্কিং আন্দোলনের যে অন্যতম গুরু, তাহা আজ বাঙালি ভুলিয়াছে সত্য, কিন্তু ইতিহাস তাঁহাকে চিরকাল স্মরণ রাখিবে। সুরেন্দ্রনাথ, ইন্দিরাদেবী ও প্রমথনাথ রবীন্দ্র-সাহিত্যের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

তৃতীয় পুত্র **হেমেন্দ্রনাথ** (১৮৪৪-৮৪)। ইনি কেশবচন্দ্র সেনের বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁহার মত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইঁহারই সম্বন্ধে জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "যখন চারিদিকে খুব করিয়া ইংরেজি পড়াইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে তখন যিনি সাহস করিয়া আমাদিগকে দীর্ঘকাল বাংলা শেখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই আমার স্বর্গগত সেজদাদার উদ্দেশে সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।" হেমেন্দ্রনাথের তিন পুত্র আট কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রতিভা দেবী (১৮৬৫-১৯২২) রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র প্রথম অভিনয়ে 'বালিকা'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। হেমেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তি-অংশ দেবেন্দ্রনাথ পৃথক্ করিয়া দিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ যে-সম্পত্তির মালিক হন, তাহা বহু দায় ও দায়িত্বের বোঝায় ভারাক্রান্ত ছিল; কিন্তু সেসব দায় হইতে তিনি হেমেন্দ্রনাথের ওয়ারিশগণকে মুক্তি দিয়া যান।

চতুর্থ পুত্র **বীরেন্দ্রনাথ** (১৮৪৫-১৯১৫)। ইনি উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়া বহু বৎসর জীবিত ছিলেন। ইঁহার একমাত্র পুত্র বলেন্দ্রনাথ (১৮৭০-৯৯) বাংলাসাহিত্যে সুপরিচিত; ইনি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ভক্ত ছিলেন।

পঞ্চম পুত্র **জ্যোতিরিন্দ্রনাথ** (১৮৪৯-১৯২৫)। সাহিত্যে, সংগীতে, চিত্রকলায় ইঁহার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। ইনি ও ইঁহার পত্নী কাদম্বরী দেবী রবীন্দ্রসাহিত্যে 'নতুনদা' ও 'বৌঠান'। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিঃসন্তান ছিলেন।

ষষ্ঠ পুত্র **পূর্ণেন্দ্রনাথ** (? ১৮৫১-৫৭)। বাল্যকালে পুকুরে ডুবিয়া ইনি মারা যান। সপ্তম পুত্র **সোমেন্দ্রনাথ**[২] (১৮৫৯-১৯২৩)। অল্প বয়সে বায়ুরোগগ্রস্ত হন বলিয়া ইনি বিবাহাদি করেন নাই।

অষ্টম পুত্র **রবীন্দ্রনাথ**; জন্ম ১২৬৮ বৈশাখ ২৫ (১৮৬১ মে ৭)। মৃত্যু ১৩৪৮ সালের ২২ শ্রাবণে (১৯৪১ অগস্ট ৭) রাখি-পূর্ণিমার অস্তে। তখন তাঁহার বয়স আশি বৎসর তিন মাস।

১ সিবিল সার্বিসে প্রবেশ ১৮৬৪ জুলাই ৩০, ভারতে প্রত্যাবর্তন ১৮৬৪ ডিসেম্বর ১২, অবসর গ্রহণ ১৮৯৭ জানুয়ারি।

২ সোমেন্দ্রনাথ কৈশোরে রবীন্দ্রনাথের কাব্যচর্চার একজন প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। দ্রষ্টব্য: জীবনস্মৃতি, ১৩৪০ অগ্রহায়ণ, "কবিতা-রচনারম্ভ" পাদটীকা ২, পৃ ৮৪।

তাঁহারও পরে **বুধেন্দ্রনাথ** (১৮৬৩-৬৪) নামে এক পুত্র জন্মে, শিশুকালেই তাহার মৃত্যু হয়।

দেবেন্দ্রনাথের পাঁচ কন্যা। জ্যেষ্ঠা সৌদামিনীর (১৮৪৭-১৯২০) সহিত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। ইহাদের পুত্র সত্যপ্রসাদ (১৮৫৯-১৯৩৩) ও কন্যা ইরাবতী (১৮৬১-১৯১৮)। সারদাপ্রসাদ দেবেন্দ্রনাথের জমিদারির কাজকর্ম দেখিতেন, রবীন্দ্রনাথের বিবাহের দিন শিলাইদহে তাঁহার মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়া কন্যা সুকুমারীর (? ১৮৫০-৬৪) বিবাহ হয় হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত। তৃতীয়া কন্যা শরৎকুমারীর (১৮৫৫-১৯২০) সহিত যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। চতুর্থা কন্যা স্বর্ণকুমারী (১৮৫৬-১৯৩২) বাংলাসাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক ও প্রসিদ্ধ লেখিকা। ইনি রবীন্দ্রনাথের 'নদিদি'। ইঁহার বিবাহ হয় জানকীনাথ ঘোষালের সহিত। ইঁহাদের দুই কন্যা ও এক পুত্র ; কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী সমাজসেবায় ও সরলা দেবী সাহিত্যক্ষেত্রে ও দেশসেবায় সুপরিচিতা; পুত্র জ্যোৎস্নাময় ঘোষাল সিভিল সার্বিসের খ্যাতিমান কর্মী। পঞ্চম কন্যা বর্ণকুমারী (১৮৫৮) ; তাঁহার বিবাহ হয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত। ইনি জীবনস্মৃতিতে 'ছোড়দি' বলিয়া পরিচিত।

রবীন্দ্রনাথের পরিবার

বাইশ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়, খুলনাজেলার শুকদেব রায়চৌধুরী গোষ্ঠীয় বেণীমাধবের কন্যা ভবতারিণী দেবীর সহিত (১২৯০ অগ্রহায়ণ ২৪, ১৮৮৩ ডিসেম্বর ৯)। ঠাকুরবাড়িতে তাঁহার নূতন নামকরণ হয় মৃণালিনী ও সেই নামেই তিনি পরিচিতা ছিলেন। বিবাহের সময় বধূর বয়স ছিল দশ-এগারো বৎসর, ত্রিশের পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয় (১৩০৮ অগ্রহায়ণ ৭)। ইঁহার গর্ভে তিন কন্যা ও দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

প্রথম সন্তান মাধুরীলতা বা বেলা (১২৯৩ কার্তিক ৯, ১৮৮৬ অক্টোবর ২২)। পনেরো বৎসর বয়সে মাধুরীলতার বিবাহ হয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র শরৎচন্দ্রের সহিত (১৩০৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৯০১ মে)। মাধুরীলতার মৃত্যু হয় ১৯১৭ অব্দে ; শরৎচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৯৪২ এর জুলাই মাসে। ইঁহাদের কোনো সন্তান জন্মে নাই।

দ্বিতীয় সন্তান বা জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ (১২৯৫ অগ্রহায়ণ ১৩, ১৮৮৮ নভেম্বর ২৭)। ইঁহার বিবাহ হয় (১৩১৬ মাঘ ১৪) অবনীন্দ্রনাথের ভগ্নী বিনয়নীদেবীর বিধবা কন্যা শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর সহিত। ইঁহারা নিঃসন্তান ; একটি গুজরাটি শিশুকে কন্যারূপে গ্রহণ করেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাম দেন 'নন্দিনী'। রবীন্দ্রসাহিত্যের সায়াহ্নে এই 'নাতনী' নানাভাবে বহুবার দেখা দিয়াছে। গুজরাটের এক ধনী বণিক্‌পরিবারে ইঁহার বিবাহ হইয়াছে।

তৃতীয় সন্তান রেণুকা (১২৯৭ মাঘ ১১, ১৮৯১ জানুয়ারি ২৬)। মাত্র এগারো বৎসর বয়সে ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সহিত ইঁহার বিবাহ হয় (১৩০৮ শ্রাবণ)। ১৩১০ এর আশ্বিন মাসে রেণুকার মৃত্যু হয়। ১৩১৫এর কার্তিক মাসে জামাতা সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটে।

চতুর্থ সন্তান শ্রীমতী মীরা দেবী (১২৯৯ পৌষ ২৯, ১৮৯৩ জানুয়ারি ১২)। ইঁহার বিবাহ হয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত (১৩১৪)। ইঁহাদের দুইটি সন্তান, নীতীন্দ্রনাথ ও নন্দিতা। নীতীন্দ্রনাথ বিশবৎসর বয়সে (১৩৩৯ শ্রাবণ) জারমেনিতে মারা যান। নন্দিতার বিবাহ হয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালানি নামে সিন্ধুদেশীয় এক কৃতী যুবকের সহিত। ইনি বর্তমানে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও কর্মী।

রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১৩০১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে, মৃত্যু হয় ১৩১৪ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ।

আবির্ভাব কাল

বংশানুকূলতা যেমন ব্যক্তির চরিত্রগঠনের আদিম সম্বল, স্থানানুকূলতা তেমনি চরিত্রবিকাশের প্রধানতম সহায়। স্থানমাহাত্মোর অর্থ এই নয় যে, বিশেষ স্থানে বাস করিলেই বিশেষ কতকগুলি গুণধর্মের অধিকারী হওয়া যায়; পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে মানুষের জীবন কতখানি নিয়ন্ত্রিত হয় তাহাই হইতেছে স্থানমাহাত্ম্য বা দেশপ্রভাবের যথাযথ অর্থ। ঠাকুরপরিবারের মধ্যে যে বৈষয়িক মানসিক ও আত্মিক গুণাবলীর বিকাশ দেখা যায়, তাহার জন্য পাশ্চাত্ত্য প্রভাবযুক্ত কলিকাতা কতখানি দায়ী তাহার সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ অদ্যাবধি হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বে সার্ধশতাব্দী-কাল পাশ্চাত্ত্য, বিশেষভাবে ইংরেজি সভ্যতার ও অসভ্যতার বিচিত্র তরঙ্গ কলিকাতার পল্লীজীবনকে নাগরিক জীবনে রূপান্তরিত করিয়াছিল। ইংরেজ বণিক্, কর্মচারী, মিশনারি, শিক্ষক, সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের বহুমুখীন্ কর্মপ্রচেষ্টা বাঙালি নাগরিকের জীবনযাত্রার ও চিন্তাধারার মধ্যে যে বিপ্লব আনিয়াছিল, এই পরিবারের মধ্যে তাহার প্রতিক্রিয়া বেশ সুষ্ঠুভাবেই পরিব্যক্ত হয়। বিদেশের সহিত বাণিজ্য বিষয়ে সহযোগিতা করিয়া যেসব সাধারণ লোক ধনবান্ হয়, ঠাকুরপরিবারের পূর্বপুরুষ তাহাদের অন্যতম। ব্রাহ্মণ্যবুদ্ধির তীক্ষ্ণতার সহিত বৈশ্যবুদ্ধির চতুরতার যোগ হওয়ায় ইহারা অচিরে ধনী ও অভিজাত হইয়া উঠিলেন।

ইংরেজের সঙ্গে মেলামেশা করিয়া আচারে ব্যবহারে, আহারে বিহারে, পোষাকে পরিচ্ছদে কলিকাতাবাসী বাঙালিদের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, ইংরেজের মুদ্রাযন্ত্র, থিয়েটর, বিদ্যালয়, আপিস, ফ্যাক্টরি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বাঙালিদের আর্থিক ও নৈতিক জীবনে এমনসব পরিবর্তন সংঘটন করিয়া তুলিয়াছিল,—এক কথায় ইংরেজের সহিত মিশিয়া কলিকাতার বাঙালি তাহার জীবনে এমন সব প্রেরণা লাভ ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিল, যাহা নাগরিক জীবনের বাহিরে আহরণ করা অসম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্ব হইতে কলিকাতা বহুলপরিমাণে আধুনিক নগরীতে পরিণত হইয়াছিল। মানব-ইতিহাসে নাগরিক জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব বরাবর স্বীকৃত ও নাগরিকের বৈশিষ্ট্য গ্রামিকদের দ্বারা চিরদিন অনুকৃত হইয়াছে। কলিকাতা ও মফস্বলের মধ্যে যে পার্থক্য তাহাকে কেবল স্থানের ব্যবধান দিয়া পরিমাপ করিলে চলিবে না; পটের চিত্রিত দিক্ ও অচিত্রিত দিকের মধ্যে ব্যবধান না থাকিলেও চিত্রের গুণগত পার্থক্যহেতু লোকদৃষ্টি চিত্রের উপরই নিবদ্ধ হয়; নগর ও গ্রাম সম্বন্ধে সেই কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরু হইতে কলিকাতা বঙ্গদেশের তথা ভারতের সকল প্রকার কর্মপ্রচেষ্টা, সাহিত্যসাধনা, ধর্মান্দোলন, রাজনৈতিক আশা-উদ্দীপনার কেন্দ্র। ঠাকুরপরিবারের বৈষয়িক উন্নতি ও মনের বিকাশ কলিকাতা ছাড়া আর-কোথাও হইতে পারিত না; কারণ চিরদিনই দেখা যায় রাজধানী বা মহানগরীমধ্যস্থিত বিচিত্র শক্তিসমাবেশ প্রতিভার সর্বতোমুখী অভিব্যক্তির সহায়তা করিয়াছে। কলিকাতা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সেই অনুকূলতা করিয়াছিল।

বংশানুকূলতা বা স্থানানুকূলতা প্রতিভার জন্মের ও বিকাশের কারণ নহে। প্রতিভার আবির্ভাব কিভাবে হয়, তাহার উত্তর দান করিতে আজ পর্যন্ত কেহ পারেন নাই, এবং স্থানানুকূলতায় সকল ব্যক্তির মধ্যে সমফল দর্শায় না কেন, তাহারও জবাব এখন পর্যন্ত মিলে নাই।

বংশ ও স্থানের প্রভাব আমরা যেমন স্বীকার করিতে বাধ্য, কালের প্রভাবকেও তেমনি না মানিয়া লইলে চলে না। রবীন্দ্রনাথের জন্মক্ষণে কালধর্মের যেসব বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাত চলিতেছিল সে-সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। নানাদিক্ হইতে রবীন্দ্রনাথের জন্মাব্দ বাংলার তথা ভারতের ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করিতে

পারি। রাজনৈতিক দিক্ হইতে সিপাহীবিদ্রোহ একটা যুগের অস্ত। ইংরেজ কোম্পানির শাসনের অবসানে পার্লামেণ্টের শাসনের অভ্যুদয় হইল; শাসক ছিল একটি কোম্পানি, এখন হইতে হইল সমগ্র বৃটিশজাতি। এতদিন কোম্পানিকে ভারতশাসন বিষয়ে কৈফিয়ত দিতে হইত পার্লামেণ্টের কাছে; এখন পার্লামেণ্ট স্বয়ং মালিক হওয়ায় জবাবদিহির দায় হইতে শাসকশ্রেণী মুক্ত হইলেন। দেশের অভ্যন্তরে সুশাসনের অজুহাতে ভারতীয়দিগকে দৃঢ়তর শাসনজালে বাঁধিবার জন্য বিচিত্র বিধিবিধানের নিগড় প্রস্তুত হইল। রাজস্ব ও আয়ব্যয়ের সুব্যবস্থা, নূতন হাইকোর্ট স্থাপন, ভারতশাসনসম্পর্কীয় নূতন আইন প্রণয়ন, বড়লাটের ব্যবস্থাপরিষদ্ গঠন প্রভৃতি এই শাসনশৃঙ্খলার প্রয়োগব্যপদেশে অনুষ্ঠিত হইল। রেলপথের দ্রুত প্রসার ও সুয়েজখাল খনন বিদেশী বাণিজ্যের পথ সুগম করিল। শিক্ষাবিভাগ পুনর্গঠন ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে ভারতীয়দের সাংস্কৃতিক ও আর্থিক জীবনে যে যুগান্তর সাধিত হইল পৃথিবীর ইতিহাসে বোধ করি তাহার তুলনা নাই। প্রাচীন শিক্ষা ও বিশ্বাসের সহিত এই নবীন শিক্ষা ও জ্ঞানের যে পার্থক্য তাহা পরিমাণগত ভেদ নহে, তাহা গুণগত প্রভেদ; ইহা প্রাচীনের বিকাশ নহে, ইহা প্রাচীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা বিপ্লব।

ভারতীয় বিচিত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনার পাশাপাশি বাংলাদেশে বিবিধ সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন বাঙালির চিত্তকে গভীরভাবে অভিভূত করিতেছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলিয়াছেন যে, ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত কালটি বঙ্গসমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ। এই স্মরণীয় কালের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম প্রচার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহবিষয়ক আন্দোলন, নীলকরের হাঙ্গামা ও হরিশ মুখুজ্জের 'হিন্দু-প্যাট্রিয়টে' তাহার প্রতিবাদ, বাংলাসাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্তের তিরোভাব (১৮৫৮), মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের আবির্ভাব, 'সোমপ্রকাশ'এর অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যশালা স্থাপন ও নাট্যসাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতির আত্মপ্রকাশের প্রয়াস প্রভৃতি সংঘটিত হয়। এইসব ঘটনা বঙ্গসমাজকে এমনভাবে আলোড়িত করিয়াছিল যে ইহার প্রত্যেকটি বিষয়ই পৃথক্‌ভাবে আলোচনার যোগ্য।

বাংলাদেশের জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তির ইতিহাস-পাঠকমাত্রই জানেন যে, রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে ধর্মবিষয়ক বিচিত্র আলোচনা ও বাদপ্রতিবাদ হইতে বাংলাভাষা কিভাবে স্বচ্ছন্দগতি ও বাংলাসাহিত্য কিভাবে উন্নতি লাভ করে। পূর্বোক্ত আন্দোলনগুলিও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে প্রত্যক্ষভাবে সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। বাংলার প্রথম ত্রিশ বৎসরের সাময়িক সাহিত্য এই ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে আলোচনায় বিশেষভাবে রত ছিল। সাহিত্যের দিকে বাঙালির চিত্তকে আকর্ষণ করিবার প্রথম প্রয়াস করেন মধ্যযুগীয় বাংলার শেষকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে তাহার সূচনা। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ' নব্যবঙ্গে সংবাদপত্রের আদর্শ স্থাপন করে। য়ুরোপীয় সাহিত্য-দর্শনের ভাবধারা ইংরেজিশিক্ষিত মুষ্টিমেয় বাঙালির মনের মধ্যে যে বিপ্লবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল, ঘটনাচক্রে বাংলাভাষার প্রতি তাঁহাদের অবজ্ঞাহেতু তাহা প্রচারলাভের সুযোগ পায় নাই; সেইজন্য য়ুরোপীয় চিন্তাধারা মুষ্টিমেয়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়া যায়। 'সংবাদ প্রভাকর'এর রাজত্ব যখন মধ্যাহ্নসূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান্, তখন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র আবির্ভাব হয় (১৮৪৩)।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাঙালির রেনেসাঁস বা উজ্জীবনের প্রথম স্পন্দন বহন করিয়া আবির্ভূত হয়। নিজের অতীত ও তাহার যথার্থ ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও অন্ধগর্ব, ইহাই হইতেছে জাতীয় জীবনের চরম দুর্গতির অবস্থা। ঐতিহাসিক ভাষায় তাহাকে বলা হয় অন্ধকার যুগ। বাঙালি ছিল সেই আত্মবিস্মৃত জাতি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই সর্বপ্রথম প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যসম্ভার মাতৃভাষার মাধ্যমে লোকসমাজে প্রচারের ব্যবস্থা করে। বেদের ও উপনিষদের ধারাবাহিক অনুবাদ সর্বপ্রথম এই পত্রিকায় বাহির হয়; বাংলা ভাষার ভিতর দিয়া বাঙালি

বেদের পরিচয় লাভ করিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ শুরু করিলেন ইহারই পৃষ্ঠায়। "লোক-হিতকর বহুবিধ আন্দোলনের মূল আমরা ইহার আলোচনার মধ্যে প্রাপ্ত হই। শিক্ষায় স্বাবলম্বন, মিশনরিদের ষড়যন্ত্র হইতে স্বধর্ম ও স্বধর্মীদের রক্ষা, স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা, সুরাপাননিবারণ, শারীরিক শক্তির উন্মেষ, নীলকরের অত্যাচার প্রতিরোধ, রাজাপ্রজার সম্বন্ধ নির্ণয়, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি বহুবিষয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বঙ্গবাসীদের প্রেরণা দিয়াছিল।"[১]

এই যেমন একদিকে জাগিল প্রাচীন ভারতের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে আত্মচেতনা, অপরদিকে তেমনি জাগিল য়ুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে বাঙালির সুপ্ত মনের সচেতনতা। এই কার্যে দেবেন্দ্রনাথের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন অক্ষয়-কুমার দত্ত। দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, "আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদপত্রই ছিল; তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোনো প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্বপ্রথমে সেই অভাব পূরণ করে। বেদ বেদান্ত ও পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচার করা আমার যে মুখ্য সংকল্প ছিল, তাহা এই পত্রিকা হওয়াতে সুসিদ্ধ হইল।"[২]

দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষার সাহায্যে 'বৈষয়িক জ্ঞান ও ধর্ম প্রচার।' "বঙ্গভাষার বিস্তার দ্বারা স্বজাতির ধর্ম রক্ষার নিমিত্ত" ঐ পাঠশালা স্থাপনের একান্ত প্রয়োজন সেদিন দেবেন্দ্রনাথ-প্রমুখ চিন্তাশীল বাঙালিরা বুঝিয়াছিলেন। "আমারদিগের স্ব স্ব স্বাধ্যানুসারে আপন ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা এবং এদেশীয় যথার্থ ধর্মের উপদেশ প্রদান করা অতি আবশ্যক হইয়াছে নতুবা··· হিন্দু নাম ঘুচিয়া আমারদিগকে পরের নামে বিখ্যাত হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। এইসকল সাংঘাতিক ঘটনার নিরাকরণ করিতে এবং বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতে তত্ত্ববোধিনী সভা" কর্তৃক তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হয়।

কিন্তু প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবশত অক্ষয়কুমার ও ঈশ্বরচন্দ্র বাংলাভাষাকে সংস্কৃতবহুল করিয়া তুলিলেন। ভাষা ক্রমেই সংস্কৃতব্যাকরণমার্গী ও সমাসাদির বাহুল্যে জটিল ও ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, উহা স্বভাবের পথে না গিয়া কৃত্রিমতার পথে গেল; বাংলা গদ্যের আদর্শ হইল ইংরেজ লেখক মিলটন, জনসন, মেকলে প্রভৃতির রচনা; এইসব লেখক লাতিন শব্দদ্বারা ইংরেজিকে যুগপৎ সমৃদ্ধ ও দুর্বোধ্য করিয়াছিলেন।

ইহারই সমকালে বিপরীত আন্দোলন চলিতেছে। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' এই রচনারীতির প্রতিক্রিয়া-আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তৎকালীন অভিজাত লেখকসম্প্রদায় এই 'আলালী' ভাষাকে উচ্চ ভাবধারা বহনের উপযুক্ত মাধ্যম বলিয়া স্বীকার করিলেন না। এমন সময়ে মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের অভ্যুদয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন শক্তি আসিল। রচনারীতিতে গতানুগতিকের পথ ত্যাগ করিয়া ইহারা আতিশয্যের পথকে অনুসরণ করিলেন, অর্থাৎ অক্ষয়কুমার ও ঈশ্বরচন্দ্রের প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল বাংলাকে আশ্রয় করিলেন মধুসূদন ও 'আলালী' ভাষার চরমরূপ গ্রাম্য-বাংলাকে সাহিত্যে স্থান দিলেন দীনবন্ধু। বাংলা কবিতা ছিল পয়ারাদি ছন্দের বন্ধনে বন্দী, খাঁটি বাংলাভাষার বাহনে ছিল তার মন্থর গতি ও মাধুর্য; মধুসূদন সেই চিরাচরিতকে বিসর্জন দিয়া ছন্দে আনিলেন প্রবহমানতা, অমিত্রাক্ষরের মারফত ভাষায় আনিলেন সংস্কৃতের বাহুল্য, এমনকি অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের বাংলা মধুসূদনের আতিশয্যের নিকট ম্লান প্রতিভাত হইল। কিন্তু একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, মধুসূদন বাংলাভাষায় আনিলেন শক্তি মুক্তি ও স্বচ্ছন্দগতি। গদ্য নাটক রচনায় দীনবন্ধু যে-ভাষাকে বাহন করিলেন তাহা খাঁটি গ্রাম্য-বাংলা, এখানেও আতিশয্য। দীনবন্ধুর ভাষার গ্রাম্যতার কাছে 'আলালী'র ভাষা

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা ২য় বর্ষ ১৩৫০ পৃ. ২৮৭। ২ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী (বিশ্বভারতী সংস্করণ) পৃ. ৭৬-৭৭।

একেবারে নিষ্প্রভ। মোটকথা বাংলা পদ্যে ও গদ্যে মধুসূদন ও দীনবন্ধু উভয়েই আতিশয্যের পথাশ্রয়ী হইয়াছিলেন। সংস্কৃতশব্দ অথবা গ্রাম্যশব্দের বাহুল্য ব্যতীত বাংলা রচনারীতির মধ্যে প্রকাশপটুতার আর কোনো পন্থা নাই, এই ছিল সে-যুগের লেখকদের ধারণা।

এই সন্ধিক্ষণে বঙ্কিমের আবির্ভাব হইল; তিনি না লিখিলেন দত্ত-বিদ্যাসাগরী ভাষায়, না লিখিলেন আলালী ভাষায়; তিনি লিখিলেন সেই ভাষায়, যাহা কালে 'বঙ্কিমী' বাংলা নামে চলিত এবং বহুকাল বাংলাগদ্যের আদর্শরূপে অনুকৃত হইয়াছিল। কিন্তু এখানে বলা উচিত যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম যুগে বহুকাল বিদ্যাসাগরী-ভাষার প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারেন নাই। যাহাই হউক বঙ্কিমের গদ্যরচনারীতি বাংলাভাষাকে ওজস্বিনী ও সাবলীল করিল। এই ভাষার সাহায্যে, নানা রূপের ভাবসমাবেশে সাহিত্যের মধ্যে বঙ্কিম যে গতিবেগ ও ঘটনাবৈচিত্র্য আনিয়াছিলেন, তাহাই বাংলাকে সর্বতোভাবে আধুনিকত্ব দান করে।

গতশতাব্দীর মধ্যভাগে সাহিত্যে যে দুইটি পরস্পর-বিরোধী ভাবধারা বাঙালির চিত্তকে অভিভূত করে, মধুসূদন ও বঙ্কিমকে তাহাদের প্রতীক বলা যাইতে পারে। বাহিরের কাঠামোকে সর্বপ্রকারে ভারতীয় রাখিয়া সাহিত্যের অন্তরে য়ুরোপীয় মনোধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেন মধুসূদন তাঁহার কাব্যে; আর য়ুরোপীয় আদর্শের ছাঁচে প্রস্তুত করিয়া ভারতীয় সনাতনী হিন্দু ভাবসমূহকে মূর্তিদান করেন বঙ্কিম তাঁহার উপন্যাসে। মধুসূদনের কাব্যরচনায় ও বঙ্কিমের গদ্যরচনায় য়ুরোপীয় ও ভারতীয় এই দুই বিপরীত-ধর্মী মনোভাবের যে সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহারই আংশিক সমন্বয়ের সূচনা হয় বিহারীলালের কাব্যে এবং পূর্ণ পরিণতি হয় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন, তখন মধ্যযুগীয় বাংলার সমস্ত চিহ্ন প্রায়-অবলুপ্ত, স্মৃতিও তাহার ম্লান। মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিম প্রভৃতি লেখকগণ পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য দর্শনাদির আদর্শে যে-সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাহিত্যচেতনা উদ্‌বুদ্ধ হয়।

সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার বিচরণভূমি প্রস্তুত হইয়াই ছিল, সাংসারিক জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রেও গতানুগতিকের বাধা ভাঙিয়া জ্যেষ্ঠেরা তাঁহার জন্য পথ মোচন করিয়া রাখিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র ধর্মসাধনায় যে সমন্বয় মন্ত্র, সমাজ-ব্যবস্থায় যে বিপ্লববাণী প্রচার করিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক স্বীকৃত বা অনুমোদিত না হইলেও কালধর্মের প্রভাবে তাঁহার পুত্রদের জীবনে তাহা ব্যর্থ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের জন্মকালে প্রাচীন সংস্কারের বহু আবর্জনা তাঁহাদের পরিবার হইতে লুপ্ত হইয়াছিল, এবং তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে আরো অনেকগুলি একে একে লুপ্ত হয়। এই মুক্ত জীবনের মধ্যে, বহুলপরিমাণে সংস্কারহীন এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হইল।

কবি সত্তর বৎসর বয়সে এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিলাম: "যে-সংসারে প্রথম চোখ মেলেছিলুম, সে ছিল অতি নিভৃত।...আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধা-ঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। আচার অনুশাসন ক্রিয়াকর্ম সেখানে সমস্তই বিরল। আমাদের ছিল মস্ত একটা সাবেককালের বাড়ি।...পূর্বযুগের নানা পালপার্বণের পর্যায় নানা কলরবে সাজেসজ্জায় তার মধ্য দিয়ে একদিন চলাচল করেছিল, আমি তার স্মৃতিরও বাইরে পড়ে গেছি। আমি এসেছি যখন, এ-বাসায় তখন পুরাতন কাল সদ্য বিদায় নিয়েছে, নতুন কাল সবে এসে নামল, তার আসবাবপত্র তখনো এসে পৌঁছয়নি।...আমি ধনের মধ্যে জন্মাইনি ধনের স্মৃতির মধ্যেও না। এই নিরালায় এই পরিবারে যে স্বাতন্ত্র্য জেগে উঠেছিল সে স্বাভাবিক,—মহাদেশ থেকে দূর-বিচ্ছিন্ন দ্বীপের গাছপালা জীবজন্তরই স্বাতন্ত্র্যের মতো।[১]

-১ সত্তর বৎসর বয়সে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনন্দনের প্রতিভাষণ, ১৩৩৮ পৌষ ১৫, প্রবাসী ১৩৩৮ মাঘ, পৃ. ৫০৯। আত্মপরিচয় ১৩৫০ পৃ. ৮৫-৮৬।

এই স্বাতন্ত্র্য ছিল সর্ববিষয়ে। তাঁহাদের পরিবারের মেয়ে পুরুষের কথা-বলিবার ভাষায় ছিল একটা বিশেষ ভঙ্গি, বেশভূষায় চালচলনের মধ্যে ছিল আভিজাত্যের গর্ব। পুরুষদের পোশাক ছিল পায়জামা আচকান চোগা চাপকান তাজ পাগড়ি, গৃহসজ্জা ছিল জাজিম ফরাশ মছলন্দ তাকিয়া আলবোলা ফরসি; আদবকায়দায় ইঁহারা ছিলেন মোগলাই। এই সমস্ত মধ্যযুগীয়তার মধ্যে য়ুরোপীয় আধুনিকতা নানাভাবে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দ্বারকানাথের সময় হইতেই বিলাতী ছবি মর্মরমূর্তি টেবিল চেয়ার সোফা প্রভৃতি গৃহসজ্জা জোড়াসাঁকোর বৈঠকখানায় ও বেলগাছিয়ার বাগানবাটীতে আমদানি হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের পুত্রেরা ও জামাতারা ইংরেজিয়ানায় যে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন তাহা নহে।[১] রবীন্দ্রনাথের জন্মকালের পর বাড়িতে বিলাতী অর্গান ফ্লুট প্রভৃতির চলন বেশ দেখা যায়; এমনকি আদিব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরের জন্য প্রকাণ্ড বিলাতী পাইপ-অর্গান কেনা হইয়াছিল। এই দেশী ও বিদেশী সংস্কৃতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের শিশুকাল কাটে।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের পর হইতে তাঁহাদের অন্তঃপুরের মধ্যে দ্রুত পরিবর্তন চলিতেছিল; স্ত্রীস্বাধীনতার নব আন্দোলনের অগ্রণী ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ যেদিন খোলা ফিটনগাড়িতে স্ত্রীকে লইয়া জোড়াসাঁকোর বাড়ি হইতে বাহির হইলেন, আর যেদিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁহার স্ত্রী ঘোড়ায় চড়িয়া গড়ের মাঠে বেড়াইতে গেলেন, সেদিন ঘরে বাহিরে যে 'ছি ছি' রব উঠিয়াছিল, তাহার রেশ মিটিতে বহুকাল লাগে।[২]

দেবেন্দ্রনাথের মার্জিত রক্ষণশীল মতামতের সহিত সত্যেন্দ্রনাথের প্রগতিশীল ও বহুলপরিমাণে-পাশ্চাত্ত্য মতামতের মিল ছিল কম; তাই তিনি নিজ পরিবারকে প্রায়ই জোড়াসাঁকো হইতে দূরে দূরে রাখিতেন; রবীন্দ্রনাথ বড়ো বয়সে তাঁহার 'মেজদাদা'র সঙ্গে বাস করিতে অধিক পছন্দ করিতেন বলিয়া মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের জন্মকালে বাঙালির অন্তরে বাহিরে, সমাজে সংসারে নানাভাবে মুক্তির আহ্বান আসিয়াছিল। সকল আন্দোলনের মূলে ছিল য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত আমাদের প্রথম পরিচয়ের আনন্দ ও প্রতিক্রিয়া। সাহিত্যে ও সমাজে অরুণোদয়ের আঁধার-আলোয় রবির আবির্ভাব হইল।

১ দ্র. জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি পৃ. ১২৩।

২ "... মেজদাদা (সত্যেন্দ্রনাথ) বিলাত হইতে ফিরিয়া, আমাদের পরিবারে যখন আমূল পরিবর্তনের বন্যা বহাইয়া দিলেন, তখন আমারও মতের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। তখন হইতে আর আমি অবরোধপ্রথার বিরোধী নহি, বরং ক্রমে ক্রমে একজন সেরা নব্যপন্থী হইয়া উঠিলাম।... গঙ্গার ধারের কোনো বাগানবাড়িতে সস্ত্রীক অবস্থানকালে আমার স্ত্রীকে আমি নিজেই অশ্বারোহণ পর্যন্ত শিখাইতাম। তাহার পর জোড়াসাঁকো বাড়িতে আসিয়া, দুইটি আরব ঘোড়ায় দুইজনে পাশাপাশি চড়িয়া, বাড়ি হইতে গড়ের মাঠ পর্যন্ত প্রত্যহ বেড়াইতে যাইতাম। ময়দানে পৌঁছিয়া দুইজনে সবেগে ঘোড়া ছুটাইতাম। প্রতিবাসীরা স্তম্ভিত হইয়া গালে হাত দিত। রাস্তার লোকেরা কৌতূহলে ও বিস্ময়ে...হতভম্ব হইয়া থাকিত। দারোয়ানেরা আমাদের পানে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিত। সেসব দিকে আমার ভ্রূক্ষেপও ছিল না।" জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ. ১৩৮।

শৈশব

আত্মীয়স্বজন

রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয় কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে, ১২৬৮ সালের ২৫এ বৈশাখ,[১] কৃষ্ণা ত্রয়োদশী, সোমবার, মধ্যরাত্রির পর। ইংরেজি পঞ্জিকা অনুসারে ইনি ভূমিষ্ঠ হন ১৮৬১ অব্দের ৭ই মে, মঙ্গলবার। মধ্যরাত্রির পর জন্ম হয় বলিয়া উহা ইংরেজি মতে মঙ্গলবার, এবং বাংলা মতে শেষরাত্রি পূর্বদিবাভাগের অন্তর্গত বলিয়া উহা সোমবার।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জন্মদিনকে জীবনের একটি বিশেষ দিন বলিয়া অনুভব করিতেন। তাঁহার জীবনের পঞ্চাশ বৎসর হইতে শেষ জন্মদিন পর্যন্ত প্রায় প্রতিবৎসরেই 'পঁচিশে বৈশাখ' সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু বলিয়াছেন বা লিখিয়াছেন। পৃথিবীতে নিজ আবির্ভাবকে এমন বিচিত্র রসে অভিষিক্ত করিয়া আর-কোনো কবি বা লেখক এত রচনা প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানি না।

দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চদশ সন্তানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ চতুর্দশতম। কোনো কোনো বিদেশী লেখক[২] উদাহরণ দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বহুসন্তানসমৃদ্ধ পরিবার মহাপুরুষের মহত্ত্ব বিকাশের পক্ষে অনুকূল নহে। তাঁহারা আরো বলেন যে মহাপুরুষদের মধ্যে দীর্ঘকায় ব্যক্তি কম। মহাপুরুষের আবির্ভাব সম্বন্ধে দৈব ও জৈব বহুপ্রকারের গবেষণা হইয়াছে; কিন্তু উপরিউক্ত উভয় সিদ্ধান্তই অন্তত রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ব্যর্থ।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের সময় তাঁহার পিতার বয়স ছিল চুয়াল্লিশ বৎসর। তখন তিনি ব্রাহ্মসমাজের বিচিত্র কর্মে লিপ্ত; স্বাস্থ্য অনিন্দনীয় সুন্দর। তাঁহার জননী সারদা দেবীর বয়স প্রায় সাঁইত্রিশ বৎসর; বহুসন্তানবতী জননী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার স্বাস্থ্য তখনো অটুট ছিল; কনিষ্ঠ পুত্র বুধেন্দ্রের জন্মের পর তাঁহার শরীর ভাঙিতে থাকে। স্বামীর দীর্ঘ জীবনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রবীন্দ্রনাথের জন্মক্ষণে তাঁহার ভ্রাতাভগ্নী প্রভৃতির কাহার কত বয়স ছিল তাহা জানিলে সাংসারিক আব-হাওয়াটার একটা চিত্র পাওয়া যাইতে পারে। 'বড়দাদা' দ্বিজেন্দ্রনাথের বয়স তখন একুশ বৎসর, তিনি তখন বিবাহিত। রবীন্দ্রনাথের জন্মের এক বৎসর পরে দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হন। 'মেজদাদা' সত্যেন্দ্রনাথ তখন উনিশ বৎসরের যুবক, সিভিল সার্বিস পরীক্ষা দিতে বিলাত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ১৮৬২ অব্দের ২৩ মার্চ তিনি বিলাত যাত্রা করেন; তিনি যখন আই. সি. এস. হইয়া ফিরিলেন (১৮৬৪ ডিসেম্বর ১২) তখন রবীন্দ্রনাথ নিতান্ত শিশু। সত্যেন্দ্রনাথের বালিকা বধূ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ঠাকুরবাড়িতেই আছেন। 'সেজদাদা' হেমেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ হইতে সতেরো বৎসরের বড়ো। ইনি ও সত্যেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র সেনের বিশেষ অনুগত ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের জন্মকালে কেশব সস্ত্রীক মহর্ষির আশ্রয়ে ঠাকুরপরিবারের মধ্যে বাস করিতেছিলেন।[*]

১ কিশোরীমোহন সাঁতরাকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র, ১৩৪৫ বৈশাখ ২৬। দ্র প্রবাসী ১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠ পৃ. ১৯৬

২ C. T. Whitby, Makers of Man, a Study of Human Initiative, 1910.

* The first opening of my eyes to the light of the sun closely coincided with my first meeting with Brahmananda Keshub Chandra Sen when he came to our Jorasanko house and made it his home for some time at the early period of his life consecrated to the service of God. I was fortunate enough to receive his affectionate caresses at the moment when he was cherishing his dream of a great future of spiritual illumination. ... Letter. 17th Nov. 1937. See *Navavidhan* (The New Dispensation). Keshub Chandra Centenary Number. Vol. I. p. 2.

চতুর্থভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথের বয়স পনেরো; যৌবনাবস্থায় তিনি উন্মাদরোগে আক্রান্ত হন, ব্যাধির লক্ষণ এখনো দেখা দেয় নাই। 'বড়দিদি' সৌদামিনী দেবীর বয়স তখন প্রায় চৌদ্দ; তাঁহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে; পুত্র সত্যপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথ হইতে কিছু বড়ো এবং কন্যা ইরাবতী এক বৎসরের ছোটো। ইহারা উভয়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের খেলার সাথী। সাহিত্যে সত্যপ্রসাদের কথা নানাভাবে স্থান পাইয়াছে; 'ইরু' দেখা দিয়াছে কবির জীবনসায়াহ্নের কয়েকটি রচনায়। নূতন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স তেরো বৎসর, তখন তিনি স্কুলের ছাত্র। 'মেজদিদি' সুকুমারীর বয়স মাত্র বারো বৎসর; রবীন্দ্রনাথের জন্মের তিন মাস পরে ইহার বিবাহ হয়; মৃত্যু হয় অল্পকাল পরেই। 'সেজদিদি' শরৎকুমারীর বয়স সাত বৎসর; 'নদিদি' স্বর্ণকুমারীর বয়স পাঁচ ও 'ছোটদিদি' বর্ণকুমারীর বয়স চার বৎসর। সত্যজ্যেষ্ঠ 'দাদা' সোমেন্দ্রনাথের বয়স দুই বৎসরের কম। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন দুই বৎসর, তখন তাঁহার আর একটি ভ্রাতা জন্মে, শিশুকালেই তাহার মৃত্যু হয়।

দেবেন্দ্রনাথের বসতবাটীর পাশেই তাঁহার ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের বাড়ি। এই বাড়ি ছিল দ্বারকানাথ ঠাকুরের 'বাহিরের বাড়ি' বা বৈঠকখানা বাড়ি; প্রথমবার বিলাত হইতে ফিরিয়া দ্বারকানাথ এই বাড়িতেই উঠেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মের কিছুকাল পূর্বে গিরীন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী কেন ও কিভাবে এই বাটীতে উঠিয়া আসেন সেকথা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের জন্মক্ষণে তাঁহাদের নিজ পরিবারের সন্তানসন্ততি ও তৎসংশ্লিষ্ট আত্মীয়স্বজনের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। উভয় বাড়ির মেয়েদের মধ্যে দেখাশুনা খুব কমই হইত; তবে গিরীন্দ্রনাথের পুত্র গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ এ বাড়ির যুবকদের সহিত একাত্ম ছিলেন; মহর্ষি কোনোদিনই ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে নিজপুত্র হইতে পৃথক করিয়া দেখিতেন না।[১]

জোড়াসাঁকোর বসতবাড়ি প্রয়োজনের তাগিদে প্রায় শতাব্দীকাল ধরিয়া ধীরে ধীরে গড়িয়া ও বাড়িয়া উঠিয়াছিল, বিশেষ কোনো পরিকল্পনার দ্বারা উহাকে সুন্দর করিবার চেষ্টা হয় নাই। এই বৃহৎ অট্টালিকা বহু আঙিনায়, বহু তলায়, বহু ছাদে খণ্ডিত বিভক্ত, গোলকধাঁধার ন্যায় বিচিত্র; আজকালকার কোনো অট্টালিকার সহিত তুলনা হয় না। শিশুর নিকট এই সুবৃহৎ অট্টালিকার জানা-অজানা আঙিনা কুঠরি ছাদ ছিল বিরাট রহস্যে পূর্ণ; সাহিত্যের মধ্যে নানা সুরে এই রহস্যাবৃত সৌধের কথা প্রকাশ পাইয়াছে।

বাড়ি যেমন বিশাল, লোকসংখ্যাও তেমনি বিপুল ও বিচিত্র। একান্নবর্তী পরিবারের পাকশালা ছিল যেন একটা বিরাট যজ্ঞশালা; এই সাধারণ রন্ধনশালা হইতে প্রত্যেক পরিবারের ঘরেঘরে অন্নব্যঞ্জন যাইত; এতদ্‌ব্যতীত বধূরা নিজ নিজ স্বামীপুত্রাদির জন্য সামান্য খাদ্যাদি তোলা উনুনে রান্না করিয়া লইতেন। দেশের প্রাচীন রীতি ও নীতি অনুসারে বনিয়াদি ধনী ঘর প্রায়ই আত্মীয় অনাত্মীয় কুটুম্ব কুটুম্বিনী আশ্রিত আশ্রিতাতে পূর্ণ থাকিত। এ পরিবারে তাহার ব্যতিক্রম না হইলেও ব্রাহ্ম পিরালী ঘরে বহুদূরসম্পর্কীয় আত্মীয়রা 'জাতি' যাইবার ভয়ে কলিকাতায় কমই আসিত। পুত্র পুত্রবধূ পৌত্র পৌত্রী কন্যা জামাতা দৌহিত্র দৌহিত্রী প্রভৃতিতে ঘর পরিপূর্ণ ছিল। এ ছাড়া ছিল দাসদাসী বাবুর্চি খানসামা পাইক হরকরা নায়েব গোমস্তা ওস্তাদ বাজিয়ে প্রভৃতি। ঠাকুরবাড়িতে জামাতারা প্রায়ই 'ঘর-জামাই' থাকিতেন। তার বিশেষ কারণ ছিল; পিরালী, তাহাতে ব্রাহ্ম পরিবারে যেসব ব্রাহ্মণসন্তান বিবাহ করিতেন, তাঁহারা প্রায়ই পৈত্রিক সংসার ও সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেন, ধনী শ্বশুরের আশ্রয়গ্রহণ ছাড়া তাঁহাদের গত্যন্তর থাকিত না। এইজন্য দেখা যায় ঠাকুরবাড়িতে পুত্র পৌত্রাদির সহিত দৌহিত্র দৌহিত্রীগণ সমভাবে লালিত হইতেছে। এই বহু সন্তানসমন্বিত, আত্মীয়কুটুম্ববেষ্টিত সংসারে রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হন।

১ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর: আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস, পৃ. ৩৭।

ভৃত্যরাজক তন্ত্র

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে তাঁহার শিশুজীবনের এক পর্বকে 'ভৃত্যরাজক তন্ত্র' আখ্যা দিয়াছেন। ধনীর গৃহে শিশুদের তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত থাকে দাসদাসীদের উপর। ভৃত্যদের হেপাজতে তাহাদের মহলে বালকদের অধিকাংশ সময় কাটে। বাড়ির বাহির হওয়া নিষেধ— কর্তাদের অভিজাত্যে আঘাত লাগে; বাড়ির ভিতরেও যখন-তখন যাওয়ার অনুমতি মিলে না— মেয়েদের আরামে ব্যাঘাত জন্মে। বাড়িতে নূতন বধূ আসিলে তাঁহার সহিত পরিচয় লাভের ইচ্ছা বালকবালিকাদের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক, অথচ সেই সহজ আনন্দ-আবেগ প্রকাশের সুযোগ হইতে তাহারা বঞ্চিত হইত। কিন্তু কল্পনাপ্রিয় বালকের মন কেবলই এই নবাগতার পরিচয় লাভের জন্য লালায়িত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত।[১]

শিশুদের দিন কাটিত বাহিরবাড়িতে, দোতলার দক্ষিণপূর্বকোণের একখানি ঘরে, চাকরদের মহলে। ভৃত্যদের হৃদয়হীন ব্যবহার বালককে কিরূপ পীড়িত করিত, তাহা জীবনস্মৃতির পাঠক অবগত আছেন। বৃদ্ধ-বয়সে রচিত 'ছেলেবেলা'য় উহা বিস্তৃতভাবেই বর্ণিত হইয়াছে; শেষবয়সে লেখা 'গল্পসল্পে' ঐসব স্মৃতি উঁকিঝুঁকি মারিয়াছে। শেষদিককার কাব্যের মধ্যেও পুরাতন কথা প্রায়ই পাওয়া যায়। ভৃত্যেরা নিজেদের কর্তব্যকে সরল করিবার জন্য যেসব অদ্ভুত পন্থা অবলম্বন করিত, তাহা শিশুর দেহ বা মনের গঠনপক্ষে আদৌ অনুকূল ছিল না; ফলে একপ্রকার অনাদরের মধ্যে তাঁহাদের দিন কাটিত। খাওয়ানো পরানো সাজানো গোছানোর প্রতি অতিরিক্ত মনোসংযোগের ফলে আজকালকার শিশুদের দেহমনকে যেমন ঠাসিয়া ধরা হয়, ঠাকুরবাড়ির এই শিশুদের ভাগ্যে সেটা পুরামাত্রায় জোটে নাই; খানিকটা অনাদরে অবহেলায় মানুষ হইবার সুযোগ লাভ করাতেই, বোধহয় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য উদ্‌বুদ্ধ হইবার অবকাশ মিলিয়াছিল। আজকাল শিশুদের 'মানুষ' করা সম্বন্ধে যেসব কৃত্রিম বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি ধনীগৃহে অনুসৃত ও মধ্যবিত্তঘরে অনুকৃত হয়, তাহা সে-যুগে অজ্ঞাত ছিল। সেইজন্য ঠাকুর-বাড়ির শিশুজীবনের যে-চিত্র কবি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বর্তমানে দীনতম মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুদেরও কাম্য নহে। "বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্বে কোনোদিন কোনো কারণেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে আর-একটা জামাই যথেষ্ট ছিল" এ বর্ণনা দিতে আজকাল সাধারণ গৃহস্থ ঘরের ছেলেও লজ্জাবোধ করিবে।

যাহাই হউক, ঘটনাসমূহকে কেবলমাত্র ঘটনা বলিয়া দেখিলে, তাহাদের বাস্তবতা সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া যায়। কিন্তু ঘটনাকে তাহার স্বাভাবিক পরিপ্রেক্ষণা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরকালের মধ্যে ফেলিয়া দেখিলে উহাকে অনাবশ্যক বৃহৎ ও তীব্র করিয়া দেখা হয়। কবিচিত্তের এই বিশেষ ধর্ম হইতেই তিনি সামান্য ঘটনাকে বারংবার বলিতে বলিতে এমন একটি কাব্যময় লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেন, যেখানে বাস্তব ও কল্পনা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হইয়া নূতন রূপ ও রসের সৃষ্টি করে, অবশেষে সাহিত্যধর্মী হইয়া উজ্জ্বল ও সুন্দর হইয়া উঠে। রবীন্দ্রসাহিত্যে তাঁহার শিশুজীবনের বর্ণনা অপরূপ সৌন্দর্যে প্রকাশিত হইয়াছে; বাস্তবতার রূঢ়লোক হইতে কল্পনার অসীম সৌন্দর্যমধ্যে তাহার পরিপূর্ণতা।[২]

বাহিরের ঘরে ভৃত্যদের হেপাজতে বন্দী অবস্থায় বাসকালে এই শিশুর একমাত্র সঙ্গী ছিল সম্মুখের মুক্ত

১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহ হয় কাদম্বরী দেবীর সহিত (১২৭৫ আষাঢ় ২৩ । ১৮৬৮ জুলাই ৫)। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সাত বৎসর; এই স্মৃতি হইতে 'বধূ' কবিতা রচিত (১৯৩৮ অক্টোবর ২৫), দ্র. আকাশ প্রদীপ, ১৩৪৫।

২ তু. ধ্বনি ২১।১০।১৯৩৮, আকাশপ্রদীপ। সাথী ১৬ জুলাই ১৯৩২, পরিশেষ, পৃ. ২৬। পথে ও পথের প্রান্তে, ৩২নং পত্র, ১৯২৯ মার্চ ১৪।

বাতায়নের মধ্য দিয়া দৃশ্যমান জগতের শোভা। ঘরের "জানালার নিচেই একটি ঘাট-বাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট—দক্ষিণধারে নারিকেলশ্রেণী।...গণ্ডিবন্ধনের বন্দী" হইয়া "জানলার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্ত দিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মতো দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া" দিতেন। বহুকাল পরে কবি গাহিয়াছিলেন 'আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ'; সেই শিশুকালেও সেই চেয়ে-থাকাতেই ছিল বালকের পরিপূর্ণ আনন্দ। মন ভরিয়া উঠিত রূপকল্পনায়, ছন্দ রচনায়, সুর যোজনায়; কিন্তু তখনও তাহা মুকুলের ন্যায় মুদিত, শোভায় ও সৌরভে সার্থক হয় নাই। এই পুকুরের ছবিখানি যৌবনের দিনে লেখনীর রেখায় ছন্দে গাঁথিয়াছিলেন প্রভাতসংগীতে 'পুনর্মিলন' কবিতায় "পুকুর গলির ধারে, বাঁধাঘাট একপারে" ইত্যাদি পংক্তিতে। পুকুরপারের চীনাবটকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন :

নিশিদিসি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট, ছোটোছেলেটি মনে কি পড়ে ওগো প্রাচীন বট।[১]

জীবনসায়াহ্নে এই পুকুরের স্মৃতি লইয়া লেখেন 'জল' কবিতা :

পুলকিত সাবধানে নামিতাম স্নানে,
গোপন তরল কোন্ অদৃশ্যের স্পর্শ সর্ব গায়ে ধরিত জড়ায়ে।
হর্ষ সাথে মিলি ভয় দেহময় রহস্য ফেলিত ব্যাপ্ত করি।

পুকুরটির আর-একটি আকর্ষণ ছিল; রাস্তার ধারে বাঁধানো নালা দিয়া জোয়ারের সময় গঙ্গার জল আসিয়া পুকুরে পড়িত। সেই জলপড়ার কলধ্বনি ও ফেনরাশি শিশুকবির চিত্তকে নানা ছন্দে ও ছবিতে ভরিয়া তুলিত।[২] 'ছেলেবেলা'য় কবি লিখিয়াছেন, "ঠাকুরদার আমল থেকে সেই নালার জলের বরাদ্দ ছিল আমাদের পুকুরে। যখন কপাট টেনে দেওয়া হোত ঝরঝর কলকল করে ঝরনার মতো জল ফেনিয়ে পড়ত। মাছগুলো উলটো দিকে সাঁতার কাটবার কসরত দেখাতে চাইত। দক্ষিণের বারান্দার রেলিঙ ধরে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকতুম।"[৩]

বালকের আর-একটি আকর্ষণের স্থান ছিল 'বাড়িভিতরের বাগান'; স্থানটিকে বাগান বলিবার কোনো সংগত কারণ ছিল না; দুই চারিটা অযত্নরক্ষিত গাছছাড়া সেখানে কিছু ছিল না। অথচ শিশু "শরৎকালের ভোরবেলায় ঘুম ভাঙিলেই এই বাগানে আসিয়া উপস্থিত" হইত, যেন কী অসম্ভব তাহার অপেক্ষায় আছে। "সে তখন ছেলেবেলা—রজনী প্রভাত হোলে, তাড়াতাড়ি শয্যা ছাড়ি ছুটিয়া যেতেম চলে"[৪] ইত্যাদি পংক্তির মধ্যে সেই বাগানের স্মৃতি প্রচ্ছন্ন।

কল্পনাকুশল বালকের বিশ্বাস করিবার শক্তি ছিল অপরিসীম; কেহ মিথ্যা বলিতেছে বা ঠকাইতেছে এ ধারণা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সঙ্গীদের মধ্যে ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ ছিলেন দুরন্ত; যতকিছু অদ্ভুত কথা সৃষ্টি করিয়া ক্ষুদ্র মাতুলটিকে অভিভূত করিতে তাঁহার অতুল আনন্দ ছিল। 'পুলিসম্যান' 'পুলিসম্যান' হাঁকিয়া তিনি মাতুলকে কিভাবে ভয় দেখাইয়াছিলেন ও শান্তিনিকেতন-যাত্রার পূর্বে কিসব অদ্ভুত কথা বলিয়া দিয়াছিলেন তাহা জীবনস্মৃতি-পাঠকের অজ্ঞাত নহে। সত্যপ্রসাদের ভগ্নী ইরাবতী ছিল রবীন্দ্রনাথের খেলার সঙ্গিনী। এই বালিকা 'রাজার বাড়ি' সম্বন্ধে প্রহেলিকাপূর্ণ ইঙ্গিত করিয়া বালককে কিভাবে উতলা করিয়া তুলিত, সেকথা কবি নানা স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন।

১ পুরানো বট, শিশু। বালক ১২৯২ ভাদ্র।
২ ১৯৩৮ অক্টোবর ২৬, আকাশপ্রদীপ, পৃ. ১৫
৩ তু. কলিকাতায় তখনো কলের জল হয় নাই। ঠাকুরবাড়ির পানীয় জল আসিত লালদিঘি হইতে। এ ছাড়া মাঘমাসে গঙ্গা হইতে জল আনাইয়া বড়ো বড়ো জালা ভরিয়া রাখা হইত; তাহাতেই সম্বৎসর কাজ চলিয়া যাইত। দ্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি পৃ. ৬১।
৪ ভারতী, ১২৮৯ চৈত্র। পুনর্মিলন, প্রভাতসংগীত।

এই কয়টি পংক্তি যে-কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইল, সেটি 'শিশু' কাব্যের সুপরিচিত 'রাজার বাড়ি' কবিতা :

আমার রাজার বাড়ি কোথায় কেউ জানে না সে তো
সে-বাড়ি কি থাকত যদি লোকে জানতে পেতো।

বৃদ্ধ বয়সে রচিত 'গল্পসল্পে' এই শিশুকালের স্মৃতি দিয়া গড়া রাজবাড়ির কথা পুনরায় বলিয়াছেন। সেখানে কবি একটা কথা কবুল করিয়াছেন, "সকলেরই মধ্যে এক জায়গায় বাসা করে থাকে একটা বোকা, সেইখানে ভালো করে বোকামি চালাতে পারলে মানুষকে বশ করা সহজ হয়।" সামান্য লোকের কথা বিশ্বাস করিয়া অসম্ভবকে সম্ভব মনে করিবার অপরিসীম ক্ষমতা ছিল তাঁহার; ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে কল্পনার রঙে আদর্শবাদী গড়িয়াছেন; অযোগ্যপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া হতাশ হইয়াছেন। যাহাই হউক 'রাজার বাড়ি'র মধ্যে যে কোনো অলীকতা থাকিতে পারে, তাহা বালকের কল্পনার অতীত ছিল। কিন্তু মনশ্চক্ষে তিনি যে রাজার বাড়ি দেখিতেন, তাহা চতুরা বর্ণনাকারিণী কখনো দেখিতে পায় নাই। এই বাল্যকালেরই আর-কোনো-একটি সঙ্গিনীর কথা স্মরণ করিয়াই কি কবি 'মানসসুন্দরী' (১২৯৯ পৌষ ৪) কবিতায় লিখিয়াছিলেন :

মনে আছে, কবে কোন্ ফুল্ল যূথীবনে,
বহু বাল্যকালে, দেখা হোত দুই জনে
আধ চেনা-শোনা। তুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরার অস্থির
এক বালকের সাথে কী খেলা খেলাতে
সখি, আসিতে হাসিয়া, অরুণ প্রভাতে…
নিদ্রাভঙ্গে দেখা দিতে, নিয়ে যেতে টানি
উপবনে কুড়াতে শেফালি। বারে বারে
শৈশব-কর্তব্য হতে ভুলায়ে আমারে,…
নিয়ে যেতে নির্জনেতে রহস্য-ভবনে;
জনশূন্য গৃহছাদে আকাশের তলে
কী করিতে খেলা, কী বিচিত্র কথা বলে
ভুলাতে আমারে, স্বপ্নসম চমৎকার
অর্থহীন, সত্যমিথ্যা তুমি জানো তার।

তাঁহার যৌবনে-লেখা একখানি পত্রমধ্যে এই শৈশবের কথা লিখিয়াছিলেন, "মনে আছে এক-একদিন সকাল বেলায় অকারণে অকস্মাৎ খুব একটা জীবনানন্দ মনে জেগে উঠত। তখন পৃথিবীর চারিদিক রহস্যে আচ্ছন্ন ছিল।… গোলাবাড়িতে একটা বাঁখারি দিয়ে রোজ রোজ মাটি খুঁড়তুম, মনে করতেম কী একটা রহস্য আবিষ্কার হবে। দক্ষিণের বারান্দার কোণে খানিকটা ধুলো জড়ো করে তার ভিতর কতকগুলো আতার বিচি পুঁতে রোজ যখন-তখন জল দিতেম— ভাবতেম এই বিচি অঙ্কুরিত হয়ে উঠলে সে কী একটা আশ্চর্য:ব্যাপার হবে। পৃথিবীর সমস্ত রূপরসগন্ধ, সমস্ত নড়াচড়া আন্দোলন,— বাড়িভিতরের বাগানের নারিকেল গাছ, পুকুরের ধারের বট, জলের উপরকার ছায়ালোক, রাস্তার শব্দ, চিলের ডাক, ভোরের বেলাকার বাগানের গন্ধ, ঝড়বাদলা— সমস্ত জড়িয়ে একটা বৃহৎ অর্ধপরিচিত প্রাণী নানামূর্তিতে আমায় সঙ্গ দান করত।"[১]

আর্টের আবহাওয়া

বাল্যকালের যেসব স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের খুবই স্পষ্ট, তাহাদের অন্যতম হইতেছে ঠাকুরবাড়ির সাহিত্যিক ও আর্টিষ্টিক আবহাওয়ার কথা। গণেন্দ্রনাথ প্রমুখ যুবকগণের মধ্যে সাহিত্য, সংগীত ও নাট্যকলার প্রতি যে অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল, তাহার কথা জীবনস্মৃতিতে কবি বিস্তৃতভাবেই বলিয়াছেন। গণেন্দ্রনাথের বৈঠকখানা প্রায়ই গীতে নাট্যে হাসিউচ্ছ্বাসে মুখরিত থাকিত। দুঃখের বিষয় তথায় যেসব আমোদ-প্রমোদ চলিত তাহা সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ আর্ট-আশ্রয়ী ছিল না; দেবেন্দ্রনাথের পবিত্র জীবনাদর্শ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে অকালমৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। এতৎসত্ত্বেও বহু সদ্গুণে তাঁহারা ভূষিত ছিলেন; রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন, "বাংলার আধুনিক যুগকে যেন

১ পত্র ১৮৯২। দ্র. জীবনস্মৃতির খসড়া, বিশ্বভারতী পত্রিকা ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা ১৩৫০ পৃ. ১১২। তু. আতার বিচি, ছড়ার ছবি পৃ. ৬০-৬২।

তাঁহারা সকল দিক দিয়াই উদ্‌বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বেশে ভূষায় কাব্যে গানে চিত্রে নাট্যে ধর্মে স্বাদেশিকতায় সকল বিষয়ে তাঁহাদের মনে একটা সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিয়াছিল।"

গণেন্দ্রনাথের ভ্রাতা গুণেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, উভয়েরই নাট্যাভিনয়ের দিকে প্রবল আকর্ষণ ছিল ; তাঁহাদের চেষ্টায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একটি নাটকীয় দলের গঠন হয়। কিছুকাল হইতে প্রবাসী ইংরেজদের থিয়েটরের অনুকরণে কলিকাতার ধনী ও গুণীলোকেরা নিজ নিজ বাড়িতে নাট্যাভিনয়ের আয়োজনে রত হন। ইংরেজি নাটকের ছায়াবলম্বনে নাটক লিখিয়া অথবা সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করাইয়া প্রথম প্রথম অভিনয় হইত। কলিকাতার অন্যান্য ধনীদের ন্যায় ঠাকুরবাড়ির যুবকরাও এই প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণভাবে যোগদান করিয়াছিলেন। অভিনয়ের আয়োজন, নাটকনির্বাচন প্রভৃতি কার্যের জন্য এক পঞ্চায়েত সভা (কমিটি অব্-ফাইভ) গঠিত হয়। কেশবচন্দ্রের ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ, যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ও অক্ষয় চৌধুরী,— ইহার পঞ্চ সদস্য ; বলা প্রয়োজন এই যুবকদের বয়স তখন উনিশ হইতে পঁচিশের মধ্যে। এই কমিটির ঘোষণাক্রমে (১৮৬৫) রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২৩—৮৫) 'নব-নাটক' রচনা করেন। এই নাটকের প্রথম অভিনয় যখন হয় (১৮৬৭ জানুয়ারি ৫) তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ছয় বৎসর মাত্র। উপর্যুপরি নয়বার এই নাটকখানি ঠাকুরবাড়িতে অভিনীত হয়। ইহার স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের মন হইতে একেবারে ম্লান হইয়া যায় নাই।[১] সুতরাং একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বাল্যকালে নাটক ও অভিনয়ের যে দৃষ্টান্ত ও আদর্শ স্পষ্টবোধের অগোচরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা বাংলাদেশের যাত্রাগান, কৃষ্ণলীলা, নিমাইসন্ন্যাস নহে, তাহা সম্পূর্ণ য়ুরোপীয়-আদর্শে-গড়া থিয়েটরের অনুকরণে রচিত নাটকের অভিনয়। এইসব অভিনয়ের ক্ষীণ স্মৃতি-কণিকাগুলি বালকের অবচেতন মনের স্তরে সঞ্চিত ছিল এবং উত্তরকালে তাহারাই পূর্ণাঙ্গ আর্টরূপে কবির জীবনে প্রকাশ পায়।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যবয়সে বাড়িতে কাব্যসাহিত্যের আলোচনার একটা স্রোত বহিয়া চলিতেছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যরচনায় মগ্ন। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "বড়দাদা লিখিতেছেন আর শুনাইতেছেন, আর তাঁহার ঘন ঘন উচ্চহাস্যে বারান্দা কাঁপিয়া উঠিতেছে। বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে, তেমনি স্বপ্নপ্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই।" তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন, "আমি ঘরের একটি কোণে বসিয়া বা দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহা [স্বপ্নপ্রয়াণ] শুনিবার চেষ্টা করিতাম।···শুনিয়া তার বহুতর স্থান আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল।"[২]

সাহিত্যের রসগ্রাহিতা যেমন ঠাকুরপরিবারের ছেলেমেয়েদের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল, গীতকুশলতা ছিল তাহাদের তেমনি প্রকৃতিগত। শিশুকাল হইতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সুকণ্ঠ ; তিনি লিখিয়াছেন, "কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না।" বালকের এই সুকণ্ঠের জন্য তাঁহার আদর ছিল সর্বত্র। তাঁহার এই শিশুকালের গানের প্রধান সমঝদার ছিলেন শ্রীকণ্ঠ সিংহ— দেবেন্দ্রনাথের বন্ধু ও ভক্ত। শ্রীকণ্ঠ ছিলেন বিশ্ববন্ধু, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ছিল তাঁহার সমবয়সীতুল্য, অন্তরঙ্গ আত্মীয় সদৃশ। 'ছেলেবেলা'য় তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "আমাদের বাড়ির বন্ধু শ্রীকণ্ঠবাবু দিনরাত গানের মধ্যে তলিয়ে থাকতেন। বারান্দায় বসে বসে চামেলির তেল মেখে স্নান করতেন, হাতে থাকত গুড়গুড়ি, অম্বুরি তামাকের গন্ধ উঠত আকাশে, গুন্‌গুন্ গান চলত, ছেলেদের টেনে রাখতেন চারদিকে। তিনি তো গান শেখাতেন না, গান তিনি দিতেন, কখন তুলে নিতুম জানতে পারতুম না। ফুর্তি যখন রাখতে

১ দ্র : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঘরোয়া, পৃ ৯৮-১০৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস।
২ জীবনস্মৃতির খসড়া, বিশ্বভারতী পত্রিকা ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা ১৩৫০ পৃ ১১৮।

পারতেন না দাঁড়িয়ে উঠতেন, নেচে নেচে বাজাতে থাকতেন সেতার, হাসিতে বড়ো বড়ো চোখ জলজল করত, গান ধরতেন,— ময় ছোড়োঁ ব্রজকী বাসরী, সঙ্গে সঙ্গে আমিও না গাইলে ছাড়তেন না।"

আদিব্রাহ্মসমাজের গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮১৯-১৯০১ ?) ছিলেন ইঁহাদের বাড়ির গীতশিক্ষক ; ধ্রুপদী বলিয়া ইঁহার খ্যাতি ছিল। ইনিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংগীতগুরু। 'ছেলেবেলা'য় লিখিয়াছেন, "যে কয়দিন আমাদের শিক্ষা দেবার কর্তা ছিলেন সেজদাদা, ততদিন বিষ্ণুর কাছে আনমনাভাবে ব্রহ্মসংগীত আউড়েছি।" ইঁহার সম্বন্ধে কবি অন্যত্র বলিয়াছেন, "প্রত্যহ শুনেছি সকাল-সন্ধ্যায় উৎসবে আমোদে উপাসনামন্দিরে তাঁর গান। ঘরে ঘরে আমার আত্মীয়েরা তম্বুরা কাঁধে নিয়ে তাঁর কাছে গান চর্চা করেছেন। আমার দাদারা তানসেন প্রভৃতি গুণীর রচিত গানগুলিকে আমন্ত্রণ করেছেন বাংলাভাষায়। এর মধ্যে বিস্ময়ের ব্যাপার এই, চিরাভ্যস্ত সেইসব প্রাচীন গানের নিবিড় আবহাওয়ার ভিতর থেকেও তাঁরা আপন মনে যেসব গান রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, তার রূপ ও তার ধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।"[১]

আর-একটু বড়ো বয়সে যদুভট্টের নিকট গানের যে শিক্ষাগ্রহণ করেন, তাহার প্রভাবই জীবনে স্থায়ী হয়। সে যুগে ধনীদের গৃহে গানের জন্য বাঁধা ওস্তাদ থাকিত। ধনীর পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত আর কোনো গতি ছিল না তাঁহাদের। দেবেন্দ্রনাথের গৃহে সংগীত নূতন রূপ ও নূতন প্রাণ পাইয়াছিল। বর্তমান যুগে রাজা রামমোহন রায় ধর্মমন্দিরে সঙ্ঘ-উপাসনার প্রবর্তক ; মন্দিরে উচ্চাঙ্গের তালমানলয়সংযোগে গানের প্রবর্তন তিনিই করেন। রাজার আরব্ধ কার্য দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা উজ্জীবিত হয় ; তিনি আদিব্রাহ্মসমাজমন্দিরে উৎকৃষ্ট সংগীতের ব্যবস্থা করেন। ব্রহ্মসংগীত তিনি স্বয়ং রচনা করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ নানা রকম হিন্দিগান হইতে সুর আহরণ করিয়া বা হিন্দিগান ভাঙিয়া ব্রহ্মসংগীত রচনায় প্রবৃত্ত হন। রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে ভগবৎবিষয়ক সংগীত-রচনার আদর্শ তাঁহারা স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন।

যদুভট্টের শিক্ষাধীন অবস্থায় সবিশেষ চেষ্টা দ্বারা রবীন্দ্রনাথকে মার্গসংগীত আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল ; কিন্তু তিনি নিয়মিতভাবে গান কখনো শেখেন নাই। একথা অন্য পাঁচটা বিষয় সম্বন্ধেও যেমন সত্য, গান সম্বন্ধেও তেমনি সত্য। তিনি লিখিয়াছেন, "ইচ্ছেমতো কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা পেয়েছি ঝুলি ভরতি করেছি তাই দিয়েই। মন দিয়ে শেখা যদি আমার ধাতে থাকত তাহলে এখনকার দিনের ওস্তাদরা আমাকে তাচ্ছিল্য করতে পারত না।" 'কুড়িয়ে বাড়িয়ে' যাহা পাইয়াছিলেন তাহা হইতেছে দেশী গান, নানা লোকের মুখ হইতে শোনা— দাসদাসী, কর্মচারী, ভিখারী, বাউল, মাঝিমাল্লার গান। এইসব বিচিত্র সুরতরঙ্গ বালককে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিত। এইসব গানের ভাষা ও ভাব স্পর্শকাতর ভাবপ্রবণ বালকের চিত্তাকাশে সপ্তবর্ণের যে হোলিখেলা খেলিত, উত্তরকালে সুরসৃষ্টিতে সেসব কিভাবে কাজে লাগিয়াছিল, তাহা বিশ্লেষণ করা কঠিন ; কিন্তু ইহাদের প্রভাব সুনিশ্চিত।

শিক্ষালাভ

অক্ষর পরিচয়ের পূর্বে শিশুর শিক্ষা শুরু হয় ছড়া ও রূপকথার অরূপ রাজ্যে। রবীন্দ্রনাথ ছড়ার রসকে বাল্যরস আখ্যা দান করিয়াছেন। ছড়ার অসমছন্দের অর্থহীন শব্দঝংকার শিশুর চিত্তে যে দোলা দেয়, রূপকথার তেপান্তরের মাঠের মোহন ছবি তাহার শিক্ষা-অপটু মনকে যে স্বপ্নরাজ্যে লইয়া যায়, তাহার সহিত পরযুগে আহরিত জ্ঞানবিজ্ঞানের তুলনা হয় না আদৌ। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কল্পনাপ্রিয় ও ভাবপ্রবণ শিশুর মনে ছড়ার ছন্দ ও রূপকথার কাহিনী যে তরঙ্গ সৃষ্টি করিত, তাহার ধ্বনিপ্রতিধ্বনি রবীন্দ্রসাহিত্যে বারে বারে দেখা দিয়াছে। শিশুকবি শিশুশিক্ষার প্রথম পাঠ

১ শান্তিদেব ঘোষ প্রণীত 'রবীন্দ্র-সংগীত' হইতে উদ্ধৃত পৃ ১৮।

লইয়াছিলেন এই ছড়ার ছন্দ হইতে; গুরুমহাশয়ের নিকট ঘণ্টা ধরিয়া বই লইয়া এ শিক্ষা পাওয়া যায় নাই। এই ছন্দের শিক্ষা কবিজীবনে কিভাবে সার্থক হইয়াছিল, তাহার হিসাব দেওয়া জীবনীকারের সাধ্যের অতীত।

বহুকাল পরে রূপকথার তত্ত্ব সম্বন্ধে কবি স্বয়ং যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় এবিষয়ের শেষ কথা। "রূপকথার সুন্দর মিথ্যাটুকু শিশুর মতো উলঙ্গ, সত্যের মতো সরল, সদ্য উৎসারিত উৎসের মতো স্বচ্ছ; আর এখনকার দিনের সুচতুর গল্প মুখোশ-পরা মিথ্যা।...শিশুকালে আমরা যথার্থ রসজ্ঞ ছিলাম, এইজন্য যখন গল্প শুনিতে বসিয়াছি, তখন জ্ঞানলাভ করিবার জন্য আমাদের তিলমাত্র আগ্রহ উপস্থিত হইত না এবং অশিক্ষিত সরল হৃদয়টি ঠিক বুঝিত আসল কথাটা কোন্‌টুকু।" (অসম্ভব গল্প)

শিশুকালের যেসব কথা তাঁহার স্মরণে ছিল, তাহাদের অন্যতম হইতেছে এই ছড়ার রাজ্যে বিচরণের স্মৃতি, বাড়ির খাজাঞ্চি কৈলাস মুখুজ্জের কথা। অতি দ্রুতবেগে মস্ত একটা ছড়ার মতো বলিয়া বলিয়া বালকচিত্তে তিনি কী যে চঞ্চলতা সৃষ্টি করিতেন সে কথা জীবনস্মৃতিতে ব্যক্ত হইয়াছে। সেই দ্রুত উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলাই ছিল আকর্ষণের প্রধান বিষয়। কবি লিখিয়াছেন, "শিশুকালের সাহিত্যরসভোগের এই দুটো স্মৃতি এখনো জাগিয়া আছে— আর মনে পড়ে, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর, নদেয় এল বান'। ঐ ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদূত।"

এই স্মৃতিটার ছবি আঁকেন 'ছড়ার ছবি'তে 'বালক' কবিতায়; 'ছেলেবেলা'র মুখবন্ধেও ঐ কবিতাটি মুদ্রিত হয়। তার এক জায়গায় আছে,

কিশোরী চাটুজ্জে হঠাৎ জুটত সন্ধ্যা হোলে,
বাঁ হাতে তার থেলো হুঁকো, চাদর কাঁধে ঝোলে।
দ্রুতলয়ে আউড়ে যেত লবকুশের ছড়া,
থাকত আমার খাতা লেখা, পড়ে থাকত পড়া;
মনে মনে ইচ্ছে হোত যদিই কোনো ছলে
ভরতি হওয়া সহজ হোত এই পাঁচালির দলে;
ভাবনা মাথায় চাপত নাকো ক্লাসে ওঠার দায়ে,
গান শুনিয়ে চলে যেতুম নতুন নতুন গাঁয়ে।

বাঙালির ঘরে খুব কম বয়সেই ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা আরম্ভ হয়। সেকালে শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল অজ্ঞাত, বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি ছিল অনাবিষ্কৃত; বাড়িতেই অভিভাবকগণ পড়াশুনার তদারক করিতেন, 'গুরু-মহাশয়' ঠাকুর দালানে পড়াইতেন, বাড়ির ও পাড়ার শিশুরা সকলেই একত্র পড়িত। আজকালকার শিশুদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য অসংখ্য শিশুপাঠ্য গ্রন্থ, বহুবর্ণে চিত্রিত বই, শিক্ষণীয় খেলার সরঞ্জাম, নানা তথ্যপূর্ণ সচিত্র মাসিক-পত্র ও বার্ষিকী পাওয়া যায়। সেযুগে এসব ছিল সম্পূর্ণ অজানা; বাড়িতে শিশুদের অনুকূল আবহাওয়া ছিল না, পাঠ্যগ্রন্থাদির অভাব ছিল বিস্তর, অভিযোগ ছিল কম। শিশুদের শিক্ষার জন্য নিত্যবরাদ্দ অন্নব্যঞ্জনের ন্যায় পৃথক্ ভোজ্যের আয়োজন ছিল শূন্য। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' ছিল সেযুগের সর্বজনবিদিত পাঠ্যপুস্তক; উহারই সাহায্যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সহিত ভাবী কবির প্রথম পরিচয় ঘটে। প্রথমভাগের 'কর খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র যেদিন 'জল পড়ে পাতা নড়ে' পড়িতেছেন, সে-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা'।

রবীন্দ্রনাথ, তাঁহার অনতিজ্যেষ্ঠ 'দাদা' সোমেন্দ্রনাথ ও ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ পড়াশুনা শুরু করেন একসঙ্গে, যদিও রবীন্দ্রনাথ উভয় অপেক্ষা বয়সে ছোটো। বহুকালপরে পদ্মাবক্ষে ফাল্গুনের (১২৯৮) এক উতলা দিনে "...মনে পড়ে সেই সন্ধ্যাবেলা শৈশবের; কত গল্প, কত বাল্যখেলা, এক বিছানায় শুয়ে মোরা সঙ্গী তিন" (শৈশব সন্ধ্যা, সোনার তরী)। প্রায় ঐ সময়ে রচিত 'কঙ্কাল' গল্পে 'তিন বাল্যসঙ্গী যে-ঘরে শয়ন' করিতেন তাহার উল্লেখ আছে। তাঁহারা তিনজনে যে-গুরুর নিকট প্রথম বিদ্যারম্ভ করেন, তাঁহার নাম ছিল মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাঁকুড়া জিলার লোক। জীবনস্মৃতিতে আছে যে একদা বড়োদের সহিত স্কুলে যাইবার জন্য তিনি কান্না জুড়িয়া দিলে গুরুমহাশয়

প্রবল চপেটাঘাত করিয়া বলিয়াছিলেন, "এখন ইস্কুলে যাবার জন্য যেমন কাঁদিতেছ, না যাবার জন্য ইহার চেয়ে অনেক বেশি কাঁদিতে হইবে।" রবীন্দ্রনাথের স্কুলজীবনের কাহিনী পাঠের পর সকলেই স্বীকার করিবেন যে "এতবড়ো অব্যর্থ ভবিষ্যদ্‌বাণী [তাঁহার] জীবনে আর-কোনো দিন কর্ণগোচর হয় নাই।" কান্নার জোরে খুব অল্প বয়সে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে ভর্তি হইলেন।

স্কুলের সময় ছাড়া বালকদের অন্য সময়ের অনেকখানি কাটিত ভৃত্য-অভিভাবক মহলে। সেখানে যেসকল বই চলতি ছিল, তাহাদের মধ্যে চাণক্যশ্লোক ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ ছিল বালকদের বোধগম্য। ভৃত্যদের মধ্যে ঈশ্বর ছিল ভূতপূর্ব গ্রাম্য গুরুমহাশয়। ঈশ্বর প্রায়ই সন্ধ্যার পর বালকদিগকে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া শুনাইত। সে-যুগের সন্ধ্যাটা শিশুদের কাছে বিশেষ সুখের ছিল না; কারণ ভালো রোশনাই-এর বন্দোবস্ত সুলভ হয় নাই। তখনো ঘরে ঘরে রেড়ির তেলের প্রদীপ বা সেজ জ্বলে। কেরোসিনের আলোর চল তেমন হয় নাই; গ্যাসের আলো শুরু হইয়াছে মাত্র, বিজলিবাতি তো অজ্ঞাতই ছিল। সেই নিরুজ্জ্বল আলোর চারিপাশে বসিয়া বালকেরা ঈশ্বরের নিকট রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শুনিত।

শিশুকালে রবীন্দ্রনাথকে যেসব পাঠ্যপুস্তক পড়িতে হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়ে'র[১] কথা বৃদ্ধবয়সেও তাঁহার মনে ছিল। আকাশের যে-নীলটা দেখা যায় সেটা যে কোনো বাধা নহে, এই তথ্যটি এই গ্রন্থে পাইয়া বালকের মনের মধ্যে যে-একটি অনির্বচনীয় উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার কথা তিনি কখনো ভুলেন নাই।

কান্নার জোরে বালক যে-বিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেন, সেটি ছিল সে যুগের নামকরা স্কুল— গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি।[২] তথায় রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল পড়েন নাই এবং সেখানকার স্মৃতি তাঁহার মন হইতে প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল। তথা হইতে নর্মাল স্কুলে[৩] বালকদিগকে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয় ছিল আজকালকার গুরুট্রেনিং স্কুলের মতো। গুরুদের হাতেকলমে শিক্ষকতা শিখাইবার জন্য একটি মডেল স্কুল সংলগ্ন ছিল, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই স্কুলের ছাত্র। তখন তাঁহার বয়স সাত-আট বৎসরের বেশি নয়, নর্মাল স্কুলের গুরু বিদ্যার্থীরা তাঁহা অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়ো।

১ সেযুগে বালকদের পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা হিসাবে খ্যাতি ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের। 'বর্ণপরিচয়' হইতে আরম্ভ করিয়া 'সীতার বনবাস' পর্যন্ত বহুগ্রন্থ নানা বয়সের শিক্ষার্থীর জন্য পর্যায়ক্রমে (graded) তিনি লিখিয়াছিলেন। ইংরেজি ও সংস্কৃত হইতে অনুবাদ করিয়াই অধিকাংশ বই লেখা। ইংরেজি হইতে তিনি যেসব গ্রন্থ অনুবাদ করেন 'বোধোদয়' তাহার অন্যতম, উহা Chamber's Rudiment of Knowledge এর অনুবাদ (১২৫৭)। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের বাংলাভাষা শিক্ষার বুনিয়াদ গড়িল য়ুরোপীয় পাঠ্যপুস্তকের তর্জমা হইতে, যাহার বিষয়বস্তু সবই পাশ্চাত্ত্য।

২ গৌরমোহন আঢ্য (১৮০৫-৪৫) নিতান্ত জীবিকা অর্জনের জন্য আঠারো বৎসর বয়সে একটি ইংরেজি পাঠশালা খোলেন। অচিরেই উহা কলিকাতার বিশিষ্ট ভদ্র বাঙালিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখনকার দিনে ইংরেজি শিখিতে হইলে খ্রীস্টানদের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। হিন্দুস্কুল নামেই হিন্দু ছিল, উহার শিক্ষা দীক্ষা, দৃষ্টান্ত ও আদর্শ কোনোটিই হিন্দুর কাম্য ছিল না। তাহারই প্রতিক্রিয়ায় গৌরমোহনের বিদ্যালয়টি হিন্দুসমাজের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিল। তৎকালীন হিন্দুবঙ্গের বহু কৃতি পুরুষ এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের পুত্রগণ এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

৩ নর্মালস্কুল ১৮৪৭ সালে প্রথম স্থাপিত হয়, দুই বৎসর পর উহা উঠিয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করিবার পর তাঁহারই চেষ্টায় সংস্কৃত কলেজের বাটীতে এই নর্মালস্কুল পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৫৫ জুলাই ১৭)। রবীন্দ্রনাথ যখন এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, তখন উহা বিদ্যাসাগরের আদর্শ হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছে। কারণ বহুপূর্বেই তিনি সরকারী চাকুরি ত্যাগ করিয়া শিক্ষাবিভাগের সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়াছিলেন। দ্র. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়: হিন্দুজাতি ও শিক্ষা ২য় ভাগ, পৃ ৪৮৫-৮৬। সাহিত্যসাধক চরিতমালা ১৮— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পৃ ৫৪।

এই বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন চলিত বিলাতি শিক্ষাপ্রণালীর ছাঁচে; সেটি এদেশের শিক্ষার্থীদের চিত্ত ও চরিত্র বিকাশের অনুকূল কিনা, এদেশের সমাজসংস্থান ও ঐতিহ্যের সহিত উহার যোগবন্ধন স্বাভাবিক কিনা, এসব প্রশ্ন তুলিয়া শিক্ষাবিভাগের ইংরেজ কর্মকর্তারা মনকে কখনো পীড়িত করেন নাই; শিশু ছাত্রদের শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ দিবার জন্য সংগীত একটা উপাদান— এই থিওরি অনুসরণ করিয়া বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ একটা ইংরেজি গানকে রোজ ক্লাস বসিবার পূর্বে ছাত্রদের দিয়া গাওয়াইতেন। প্রত্যহ সেই একটা অর্থহীন একঘেয়ে ব্যাপারে যোগ দেওয়া বালকদের পক্ষে সুখকর ছিল না। সেই ইংরেজি গানের ভাষা বাঙালি ছাত্রদের সমবেত কণ্ঠে আসিয়া কী অদ্ভুত রূপ লইয়াছিল, তাহা জীবনস্মৃতিতে কবি নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন।

নর্মাল স্কুলের স্মৃতি নানা কারণে তাঁহার নিকট সুমধুর নহে। ক্লাসের মধ্যে শিক্ষক হরনাথ পণ্ডিতের কুৎসিত ভাষা প্রয়োগের অভ্যাস বালকের মনকে এমনি বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিল যে তিনি কোনো দিন ক্লাসে তাঁহার প্রশ্নের কোনো উত্তর দেন নাই। পরযুগে 'গিন্নি' (হিতবাদী ১২৯৮) গল্পে তিনি যে শিবনাথ পণ্ডিতের কথা বলিয়াছেন, তাহা হরনাথের নামান্তর মাত্র। ভবিষ্যতের বহু রচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ স্কুল ও স্কুলমাস্টারদের প্রতি যে তীব্র মনোভাব প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার মূল কারণ রহিয়া গিয়াছে জীবনপ্রত্যূষে নর্মালস্কুলের অভিজ্ঞতার মধ্যে। আবার ইহাও আশ্চর্য লাগে যে তাঁহার গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে যে-কয়েকটি দেবচরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই শিক্ষক বা অধ্যাপক।[1]

নর্মাল স্কুলের ছাত্রদের সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা বড়ো মধুর নহে। তাঁহার ন্যায় স্বভাবকোমল, সুদর্শন বালকের প্রতি বয়স্ক ছাত্ররা যেরূপ ব্যবহার করিতে প্রয়াস পাইত, তাহাকে তিনি অশুচি মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। ইহাদের উপর স্কুলের ছাত্রদের অন্যায় আক্রোশের কারণ ছিল অনেক। তখনকারদিনের ঠাকুরপরিবারের ছেলেদের মধ্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল, যাহা শহুরে সাধারণ ছেলের দলের পক্ষে সহ্য বা স্বীকার করা ছিল কঠিন। ইহারা আসিতেন ঘোড়ার গাড়িতে, চাকর বা দ্বারবানের সঙ্গে, সাধারণের কাছে সেটা ঠেকিত বড়োলোকের দেমাকি চাল। তারপরই চোখে পড়িত তাঁহাদের বেশভূষার পারিপাট্য ও আভিজাত্য। পায়জামা ও তৎসংশ্লিষ্ট পরিচ্ছদ চিরদিনই সাধারণ বাঙালি হিন্দুর কাছে 'মুসলমানী' বলিয়া অবজ্ঞাত; অথচ প্রতিদিন সে যে পোশাক পরিয়া থাকে, তাহার বিশ্লেষণ করিলে সে দেখিতে পাইত যে, ধুতি উড়নি ও চটি ছাড়া সে আর যাহা কিছু ব্যবহার করে, তা সমস্তই পরদেশী বা বিদেশী। ঠাকুরবাড়ির বালকদের কথ্যভাষার মধ্যে প্রকাশ পাইত একটি মার্জিত রুচি, যাহা কেবল অভিজাত শিক্ষার দ্বারা অর্জন করা সম্ভব। কলিকাতার খাশবাসিন্দাদের বিকৃত উচ্চারণাদি হইতে ইঁহাদের ভাষার বৈশিষ্ট্য ছিল খুব স্পষ্ট। এইসব কারণেই, আমাদের মনে হয় বালকদের উপর বিচিত্র ধরনের উপদ্রব চলিত।

বাহিরে যাত্রা

ছোটোবেলায় রবীন্দ্রনাথের চলাফেরার ভৌগোলিক পরিধি ছিল খুবই সীমায়িত; কলিকাতার মধ্যে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি ছাড়া শহরের বাহিরে কখনো যান নাই। তাই জোড়াসাঁকোর অবরুদ্ধ গতানুগতিক জীবনের অভ্যস্ত ধারা হইতে মুক্তি পাইয়া যেদিন পেনেটিতে[2] ছাতুবাবুর[3] বাগানবাটীতে ডেঙ্গুজ্বরের তাড়ায় তাঁহাদিগকে

১ কবিশেখর কালিদাস রায়: গল্পগুচ্ছে শিক্ষকের কথা, শিক্ষা ও সাহিত্য ২৩ শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৩৫০ মাঘ।

২ পেনেটি বা পানিহাটি। কলিকাতার উত্তরে খড়দহ ও সোদপুরের মধ্যবর্তী স্থান।

৩ ছাতুবাবু (সাতু) আশুতোষদেব (১৮০৪-৫৬)। ধনী বণিক রামদুলাল দেবের পুত্র। দানের জন্য বিখ্যাত।

আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল, সেটি তাঁহার জীবনের স্মরণীয় দিন; তখন বালকের বয়স আট বৎসর হইবে। কলিকাতার বাহিরে ইহাই তাঁহার প্রথম যাত্রা। পরে বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ বহুবার বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু বাহিরের জগতের সহিত এই প্রথম পরিচয়ের তীব্র আনন্দানুভূতি তিনি কখনো বিস্মৃত হন নাই। জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন, "গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল। সেখানে চাকরদের ঘরটির সামনে গোটা কয়েক পেয়ারা গাছ। সেই ছায়াতলে বারান্দায় বসিয়া সেই পেয়ারাবনের অন্তরাল দিয়া গঙ্গার ধারার দিকে চাহিয়া আমার দিন কাটিত।" যৌবনে (পুনর্মিলন, প্রভাতসংগীত) কবিতায় লিখিয়াছিলেন,

আরেকটি ছোটোঘর মনে পড়ে নদীকূলে,
সম্মুখে পেয়ারা গাছ ভরে আছে ফুলেফলে।
বসিয়া ছায়াতে তারি ভুলিয়া শৈশব খেলা,
জাহ্নবীপ্রবাহ পানে চেয়ে আছি সারা বেলা।

পেনেটির বাগানে আসিয়াও চলাফেরার নিষেধ শিথিল হইল না। নিকটে বাংলার পল্লীগ্রাম, সেখানেও প্রবেশের অনুমতি নাই। "আমরা বাহিরে আসিয়াছি কিন্তু স্বাধীনতা পাই নাই।" "...কিন্তু গঙ্গা সম্মুখ হইতে আমার সমস্ত বন্ধন হরণ করিয়া লইলেন। পালতোলা নৌকায় যখন-তখন আমার মন বিনাভাড়ায় সওয়ারি হইয়া বসিত এবং যেসব দেশে যাত্রা করিয়া বাহির হইত, ভূগোলে আজ পর্যন্ত তাহাদের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নাই।" তাই লিখিয়াছিলেন : "সাধ যেত যাই ভেসে কত রাজ্য কত দেশে দুলায়ে দুলায়ে ঢেউ নিয়ে যাবে কতদূর"।

অবশেষে একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ফিরিতে হইল; "দিনগুলি নর্মাল স্কুলের হাঁ-করা মুখবিবরের মধ্যে তাহার প্রাত্যহিক বরাদ্দ গ্রাসপিণ্ডের মতো প্রবেশ করিতে লাগিল।" নর্মাল স্কুলে বালকদের যাহা পড়িতে হইত, তাহার চেয়ে অনেক বেশি শিখাইবার ব্যবস্থা ছিল বাড়িতে। বালকদের শিক্ষাদান বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন হেমেন্দ্রনাথ। তাঁহারই নির্দেশ ও সময়সূচীমতে ছেলেদের বিচিত্র বিষয়ের গৃহশিক্ষা চলিত। ভোরের অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া তাহাদিগকে লংটি পরিয়া প্রথমেই হীরাসিং নামে এক কানা শিখ পালোয়ানের সহিত কুস্তি করিতে হইত। তারপর সেই মাটিমাখা শরীরের উপরে জামা পরিয়া লেখাপড়া আরম্ভ হইত। নর্মাল স্কুলের শিক্ষক নীলকমল ঘোষাল তাঁহাদের পড়াইতেন। সকাল ছয়টা হইতে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত বালকদের শিক্ষার ভার ছিল তাঁহার উপর। পাঠ্য ছিল অক্ষয়কুমার দত্তের 'চারুপাঠ' (১৮৫২-৫৬) রামগতি ন্যায়রত্নের 'বস্তুবিচার ও সাতকড়ি দত্তের প্রাণিবৃত্তান্ত', মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য'; এছাড়া জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল তো ছিলই। স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিলেই ড্রয়িং এবং জিমনাষ্টিক শিক্ষক তাঁহাদের লইয়া পড়িতেন। সন্ধ্যার পর ইংরেজি পড়াইবার জন্য আসিতেন অঘোরবাবু, মোটকথা প্রত্যুষ হইতে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত কঠিন শারীরিক ও মানসিক ব্যায়ামের মধ্যে তাঁহাদের নর্মাল স্কুলের যুগ কাটে।

রবিবার সকালে গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে গান শিখিতে হইত এবং তাছাড়া মাঝে মাঝে সীতানাথ ঘোষ[১] আসিয়া সামান্য যন্ত্রযোগে প্রাকৃত বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। যন্ত্রসাহায্যে বিজ্ঞানশিক্ষা-দেওয়া সেযুগে শিক্ষাব্যবস্থায় নূতন জিনিস, দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় ধনীর পক্ষেই পুত্রাদির জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে এই শিক্ষাটি তাঁহার কাছে বিশেষ ঔৎসুক্যজনক ছিল এবং যে রবিবারের সকালে বিজ্ঞানশিক্ষক না আসিতেন সে-রবিবার বালকের কাছে রবিবার বলিয়া বোধ হইত না।

১ সীতানাথ ঘোষ (১২৪৮-৯০)। ভুলক্রমে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে সীতানাথ দত্ত লিখিয়াছেন। ইনি এক সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। দ্র. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ : পিতৃদেব সম্বন্ধে জীবনস্মৃতি, প্রবাসী, ১৩১৯ মাঘ পৃ ৩৮৮। যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, বৈজ্ঞানিক সীতানাথ, প্রবাসী, ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ পৃ ২১৩-২১৫।

অঘোরবাবু নামে যে শিক্ষক সন্ধ্যার পর বালকদিগকে ইংরেজি পড়াইতেন, তিনি ছিলেন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। শিক্ষাকে সরস করিবার ও ছাত্রগণকে আনন্দ দিবার জন্য তাঁহার অপরিসীম চেষ্টা ছিল। তাঁহার কাছে বালকরা একদিন মরামানুষের কণ্ঠনলীর সাহায্যে স্বরযন্ত্রের সমস্ত ক্রিয়াকৌশল অবগত হন। ইহাতে বালকের "মনটাতে কেমন একটা ধাক্কা লাগিল।" আর-একদিন শিক্ষক মহাশয় তাঁহাদিগকে মেডিক্যাল কলেজের শবচ্ছেদগৃহে লইয়া যান; সেখানে মেজের উপর এক খণ্ড পা পড়িয়াছিল। "টেবিলের উপর একটি বৃদ্ধার মৃতদেহ শয়ান ছিল; সেটা দেখিয়া আমার মন তেমন চঞ্চল হয় নাই; কিন্তু মেজের উপরে একখণ্ড কাটা পা পড়িয়া ছিল,...সেই মেজের উপর পড়িয়া-থাকা একটা কৃষ্ণবর্ণ অর্থহীন পায়ের কথা আমি অনেকদিন পর্যন্ত ভুলিতে পারি নাই।" বিচিত্র অভিজ্ঞতা এই বাল্য বয়সেই হইয়াছিল।

বাল্যকালের এইসব বিদ্যায়োজনকে রবীন্দ্রনাথ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া তাচ্ছিল্য করিয়াছেন; আমাদের মতে বিজ্ঞানের প্রতি কবির আজীবন অনুরাগের বুনিয়াদ গড়ে এই বাল্য দিনে, এই সামান্য শিক্ষার ভিতর দিয়া। পরযুগে তাঁহার সম্পাদিত বা পরিচালিত সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার সংকলিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বা 'প্রসঙ্গকথা' এই বাল্যবয়সে বিজ্ঞানানুরাগের অভিপ্রকাশমাত্র। বৃদ্ধবয়সে 'বিশ্বপরিচয়' (১৩৪৪) রচনা আমাদের মতবাদেরই সমর্থক। বাল্য-কালে আমের আঁটি ও আতার বীচির পরীক্ষার কথা লইয়া তিনি নিজেকে ঠাট্টা করিয়াছেন; কিন্তু পরযুগে কৃষি লইয়া তিনি যে কতরূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত আলোচনা কেহ এখনো করেন নাই। বৃদ্ধবয়সে আমের চারাকে লতানে গাছ করিবার জন্য তাঁহার যে উদ্যম দেখিয়াছি, তাহা কেবল বিজ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব। তাঁহারই সেই পথ ধরিয়া তাঁহার পুত্র রথীন্দ্রনাথ তাঁহার শান্তিনিকেতনের বাগানে বিচিত্র ফলের গাছকে কিভাবে লতানে গাছে পরিণত করিয়াছেন, তাহা কেহ না দেখিলে বিশ্বাস করানো কঠিন; আম, লিচু, পেয়ারা, লেবু, কুল, সপেতার লতানে-গাছে প্রচুর ফল হইতেছে।

যাহাই হউক, বালকদিগকে সর্বশাস্ত্রবিশারদ করিবার জন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অভিভাবকগণের সাধু উদ্যম যে-হতভাগ্যদের কল্যাণার্থে অনুসৃত হইতেছিল, তাহাদের উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতেছে, তাহা কেহই লক্ষ্য করেন নাই। ভাষা ও ব্যাকরণ শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রতি যে বীতশ্রদ্ধভাব জন্মিল এবং শিক্ষকদের সম্বন্ধে যে বিভীষিকা ও অশ্রদ্ধার বীজ উপ্ত হইল, তাহা কবির সাহিত্যজীবনে নিরর্থক হয় নাই। শৈশবের এই বেদনাকে বহু বৎসর পরে 'অসম্ভব গল্পে'র ভূমিকায় যেভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক প্রাইভেটটিউটর-উপদ্রুত হতভাগ্য মানবকের অব্যক্ত মনের কথা। "বেশ মনে আছে সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল। কলিকাতা শহর একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল। গলির মধ্যে এক হাঁটু জল। মনে একান্ত আশা ছিল, আজ আর মাস্টার আসিবে না।... তখন মনে হইত পৃথিবীতে বৃষ্টির আর কোনো আবশ্যক নাই, কেবল একমাত্র সন্ধ্যায় নগরপ্রান্তের একটিমাত্র ব্যাকুল বালককে মাস্টারের করাল হস্ত হইতে রক্ষা করা ছাড়া।... বিশেষ কোনো নিয়মানুসারে বৃষ্টি ছাড়িল না। কিন্তু হায় মাস্টারও ছাড়িল না। গলির মোড়ে ঠিক সময়ে একটি পরিচিত ছাতা দেখা দিল, সমস্ত আশাবাষ্প এক মুহূর্তে ফাটিয়া বাহির হইয়া আমার বুকটি যেন পঞ্জরের মধ্যে মিলাইয়া গেল।"[১]

বাঁধাবরাদ্দ খাদ্যদ্বারা শরীর রক্ষা পায় বটে, কিন্তু মানুষের মন তৃপ্তি মানে না। তাই দেখা যায়, খাদ্যের চেয়ে অখাদ্যের দিকেই তাহার লোলুপতা বেশি। স্কুলের ধরাবাঁধা পাঠ্যতালিকার মধ্যে হতভাগ্য ছাত্রকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিবার চেষ্টা হয় বলিয়াই, অ-পাঠ্য বইএর প্রতি তাহার টান এত প্রবল। সত্তর-পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে বাংলার শিশুদের মনের

১ দ্র. সাধনা ১৩০০ আষাঢ়; গল্পগুচ্ছ ১ম খণ্ড।

খোরাক মিটাইতে পারে এমন গ্রন্থের সংখ্যা ছিল নগণ্য। সেইজন্য ছেলেবেলায় হাতের কাছে বাংলায়-লেখা যাহা আসিত, তাহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের পাঠ্য। যে কয়খানি বই বালকের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল তাহাদের কথা তাঁহার স্মরণে ছিল, যেমন, মৎস্যনারীর কথা, সুশীলার উপাখ্যান[১] ও রবিন্সন ক্রুসো[২] র কথা। শেষোক্ত বইখানি সম্বন্ধে জীবনস্মৃতির খসড়ায় উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।

সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথের বাল্যবয়সে এমন দুইচারিখানি পত্রিকা ও গ্রন্থ হাতে পড়িয়াছিল, যাহা তাঁহার মনে যথার্থ আনন্দ দান করিতে পারিয়াছিল; ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'বিবিধার্থসংগ্রহ'[৩] ও 'অবোধবন্ধু' পত্রিকা। রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১২২৮-৯৮) তাঁহার যৌবনে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' বলিয়া একখানি ছবিওয়ালা মাসিকপত্র বাহির করিয়াছিলেন। অনিয়মিতভাবে বৎসর ছয় (১২৫৮-৬৪) প্রকাশিত হয়। তাহারই বাঁধানো একভাগ হেমেন্দ্রনাথের আলমারিতে ছিল, সেটি রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করেন। জীবনস্মৃতিতে কবি লিখিয়াছেন, "বারবার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুশি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড়ো চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তা-পোশের উপর চিত হইয়া পড়িয়া নর্হাল তিমিমৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।"

তাঁহার বড়দাদার আলমারিতে বহু মূল্যবান গ্রন্থের মধ্যে ছিল 'অবোধবন্ধু' পত্রিকা। আলমারিতে বালকদের হাত দেওয়া ছিল নিষেধ। কিন্তু 'অবোধবন্ধু'র বন্ধুত্ব-প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া বালক সে-নিষেধ লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। স্কুল ফাঁকি দিয়া মধ্যাহ্নে 'অবোধবন্ধু' হইতে 'পৌল বর্জিনী'র[৪] বাংলা অনুবাদ পাঠ করিতে করিতে বালকের হৃদয় বেদনায় কিভাবে অভিভূত হইয়া যাইত, তাহার কথা জীবনস্মৃতিতে তিনি স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাহিরের প্রকৃতি বালকের নিকট তখনো অপরিচিত, তাই পৌল-বর্জিনীতে সমুদ্রতীরস্থ অরণ্য দৃশ্যাবলী তাঁহার নিকট অনির্বচনীয় সুখস্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইত। পৌল-বর্জিনীর কথা এ যুগের পাঠকশ্রেণীর নিকট অজ্ঞাত। সত্তর বৎসরপূর্বে বাংলায় শিশুপাঠ্য গ্রন্থ ছিল কম। তাই এই করুণ উপাখ্যানটি তরুণ অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ফরাসী ভাষা হইতে বাংলায় অনুবাদ করিয়া 'অবোধবন্ধু'তে প্রকাশ করেন। অবোধবন্ধুর গদ্য রচনার বৈশিষ্ট ছিল; ইহার ভাষা স্কুলের পাঠ্যের 'অনুবৃত্তি বলিয়া মনে হইত না।' "বাংলা ভাষায় বোধ করি সেই প্রথম মাসিকপত্র বাহির হইয়াছিল, যাহার রচনার মধ্যে একটা স্বাদবৈচিত্র্য পাওয়া যাইত।... বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতসূর্য বলা যায় তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধুকে প্রত্যুষের সুখতারা বলা যাইতে পারে।"[৫] অবোধবন্ধুতে প্রকাশিত পৌল বর্জিনীর প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনার মধ্যে অস্পষ্ট নহে, বনফুল কাব্য পাঠ করিলে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

এই পত্রিকায় বালককবি বাংলার তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠকবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাব্যের প্রথম পরিচয়

১ সুশীলার উপাখ্যান, মধুসূদন মুখোপাধ্যায় প্রণীত, বেঙ্গল ফ্যামেলি লাইব্রেরী, ৩ খণ্ড, কলিকাতা ১৮৬১-৬৫।

২ রবিন্সন ক্রুসো, D. Defoe. (1659-1781) Robinson Crousoe (1719)। জন্ রবিন্সন কর্তৃক অনুদিত শ্রীরামপুর ১৮৫২। ঐ—অনুবাদ, বেঙ্গল ফ্যামিলি লাইব্রেরী... তৃতীয় সং। ১৮৬০।

৩ "কৃত্তিবাস, কাশিরামদাস, একত্র বাঁধানো বিবিধার্থ সংগ্রহ, আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস, বাংলা রবিন্সন ক্রুসো, সুশীলার উপাখ্যান, রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের জীবন চরিত, বেতালপঞ্চবিংশতি প্রভৃতি তখনকার কালের গ্রন্থগুলি বিস্তর পাঠ করিয়াছিলাম।" 'বঙ্কিমচন্দ্র', সাধনা ১৩০১ বৈশাখ, পৃ ৫৪০।

৪ Jacques Henri Bernardin de Saint-Pierre (1787-1814) Paul et Virgine (1787)। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, পৌল ও বর্জিনী অবোধবন্ধু পত্রিকা ১২৭৫ পৌষ—২ চৈত্র, ১২৭৬ পৌষ—চৈত্র। দ্র. সাধকচরিত মালা ২, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, পৃ ৩০-৩১।

৫ বিহারীলাল, আধুনিক সাহিত্য পৃ ১৮

লাভ করেন। 'পৌল-বর্জিনীতে যেমন মানুষের এবং প্রকৃতির নিকট পরিচয় লাভ' করিয়াছিলেন, 'বিহারীলালের কাব্যের সেইরূপ একটি ঘনিষ্ঠ সঙ্গ প্রাপ্ত' হইয়া তাঁহার কবিতাকেই কাব্যাদর্শ করিয়া লইলেন। অবোধবন্ধুতে বিহারীলালের নিসর্গসন্দর্শন, বঙ্গসুন্দরী, সুরবালা কাব্য প্রকাশিত হইয়াছিল। এইসব রচনার মধ্যে যেসব শ্লোকের বর্ণনা এবং সংগীত মনশ্চক্ষের সমক্ষে সুন্দর চিত্রপট উদ্‌ঘাটিত করিয়া হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া তোলে সেগুলির কথা বড়ো হইয়াও তাঁহার মনে ছিল। বিহারীলালের কবিতা পাঠ করিয়া বাল্যকালে তাঁহারও মন হুহু করিয়া উঠিত। ঝরনার ধারে জলশিকরসিক্ত স্নিগ্ধশ্যামল দীর্ঘকোমল ঘনকাশের মধ্যে দেহ নিমগ্ন করিয়া নিস্তব্ধভাবে জলকলধ্বনি শুনিতে পাওয়ার কল্পনাও বালককে মুগ্ধ করিত। আবার পল্লীগ্রামের সুখময় চিত্রে কলিকাতার ধনীগৃহের নিয়মনিষ্ঠার মধ্যে আবদ্ধ-জীবন বালকের মন যে ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, তাহাতে বিচিত্র কিছু ছিল না। অট্টালিকার অপেক্ষা বিহারীলালের বর্ণিত "নড়বোড়ে পাতার কুটীরে, স্বচ্ছন্দে রাজার মতো ভূমে আছি নিদ্রাগত" ইত্যাদি পংক্তি যে অধিক সুখের এ মায়া বালকের মনে কে সৃষ্টি করিল। বিহারীলালের এই শ্রেণীর প্রকৃতিবর্ণনা কল্পনাকুশল বালককে বিভোর করিয়া তুলিয়াছিল।

আর-একটু বড়ো বয়সে 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) হাতে পড়ে, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স বৎসর এগারো। বহু বৎসর পরে বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সমসাময়িক মনোভাব না হইলেও প্রণিধানযোগ্য, "পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম তাহা দুইকালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেব-কাওলি, সেই বালক-ভুলানো কথা— কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য।"[১] বঙ্গদর্শনে যে কেবল বঙ্কিমের উপন্যাস প্রকাশিত হইত তাহা নহে; সে-যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকদের বিবিধ বিষয়ের রচনাসম্ভারে উহা পূর্ণ থাকিত। রবীন্দ্রনাথের বয়স অনুপাতে তাঁহার কল্পনা ও বোধশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল, ইংরেজিতে যাহাকে বলে precocious child তিনি ছিলেন তাই; সুতরাং তাঁহার পক্ষে বঙ্গদর্শনের উপন্যাস ও গল্প ছাড়া অন্যান্য রচনাসমূহ পাঠ করা অসম্ভব ছিল না। বঙ্কিমের গদ্য রচনা হইতে রবীন্দ্রনাথ যে বিশেষ প্রেরণালাভ করিয়াছিলেন সেবিষয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব। এইসব সমসাময়িক সাহিত্য ছাড়া যে-সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাষাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল, তাহা হইতেছে বৈষ্ণবপদাবলী-সাহিত্য; আমরা অন্যত্র সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

নর্মাল স্কুলে ছাত্রবৃত্তির নিচের ক্লাস পর্যন্ত তাঁহাদের পড়া চলে। কিভাবে নর্মাল স্কুলের পড়া হঠাৎ শেষ হয়, ও বাংলাশিক্ষার অবসান ঘটে, জীবনস্মৃতিতে সেকথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত আছে সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। নর্মালস্কুলে পড়িবার ফলে বাংলা ভাষাটা বালকদের বেশ ভালোভাবেই আয়ত্ত হইয়াছিল; তখন চারিদিকে খুব করিয়া ইংরেজি পড়াইবার ধুম চলিতেছে, হেমেন্দ্রনাথ যাঁহার উপর বালকদের পড়াশুনা দেখিবার ভার ছিল, তিনি সকল প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করিয়া বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া তাহারে জ্ঞানবিজ্ঞানের পঠনপাঠন ব্যবস্থা করেন। ফলে বালকদের বাংলা ভাষার বুনিয়াদ হয় পাকা, বিষয়জ্ঞানও একেবারে কাঁচা হয় নাই। বাংলার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণেরও শক্ত ভিত্তি গড়ে। মাতৃভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত ছিল বলিয়া, উত্তরকালে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সহজ হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। পরযুগে রবীন্দ্রনাথ যখন নিজ বিদ্যায়তনে শিক্ষাসম্বন্ধে নূতন পরীক্ষা করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, তখন ছাত্রদের একটা বয়স পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষা মুলতবী রাখিয়া বাংলার

১ বঙ্কিমচন্দ্র, আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্ররচনাবলী ৯ম খণ্ড।

মধ্য দিয়া সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয়ের বুনিয়াদ পত্তন করিবেন, এই ইচ্ছা মাঝেমাঝে প্রকাশ করিতেন। কিন্তু ইচ্ছা কখনো সংকল্পে পরিণত হয় নাই বলিয়া গতানুগতিকের পথ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাজীবনে বাংলা ভাষার বুনিয়াদ পত্তন হইবার জন্য তিনি তাঁহার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের নিকট ঋণী ছিলেন একথা তিনি কোনোদিন জীবনে বিস্মৃত হন নাই।

কিন্তু বাঙালির ঘরে যে জন্মিয়াছে, তাহাকে ইংরেজি শিখিতেই হইবে। সুতরাং ডিক্রুজ (De Cruz) সাহেবের বেঙ্গল একাডেমি নামে ফিরিঙ্গি বিদ্যালয়ে বালকদের ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল। ইংরেজি ভালো করিয়া বলিতে কহিতে শিখিতে হইলে সাহেবের কাছেই শেখা ভালো, এ ধারণা তখনো ছিল এখনো আছে; স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই ধারণা পোষণ করিতেন, নিজ সন্তানদের শিক্ষার জন্য লরেন্স নামে ইংরেজকে নিযুক্ত করেন; শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়েও সে ব্যর্থ চেষ্টা যে মাঝে মাঝে করেন নাই তাহা নহে।

বেঙ্গল একাডেমিতে পড়ার থেকে পলায়নটা হইত বেশি; বিদ্যালয়ের অভাবগ্রস্ত কর্তৃপক্ষ যথাসময়ে ধনী ছাত্রদের নিকট হইতে মাসিক দক্ষিণাটা নিয়মিত পাইতেন বলিয়া তাহাদের উপস্থিতি বা পাঠোন্নতি সম্বন্ধে বেশি কড়াক্কড়ি করিতেন না। ফিরিঙ্গি ছেলেদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে তাহারা নর্মাল স্কুলের ছাত্রদের ন্যায় গ্রাম্য ছিল না, ইহারা ছিল 'দুর্বৃত্ত'।

বেঙ্গল একাডেমিতে বালকদের শিক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ এক অভাবনীয় ঘটনায় বালক রবীন্দ্রনাথের জীবনে অনেকখানি পরিবর্তন হইল, সেটি হইতেছে হিমালয় যাত্রা।

এই বিদ্যালয়ের একটি বাঙালি ছাত্র সম্বন্ধে কবি জীবনস্মৃতিতে বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছেন; সে ম্যাজিক দেখাইতে পারিত বলিয়া ছাত্রমহলে তাহার অশেষ প্রতিপত্তি ছিল। রবীন্দ্রনাথের সহিত তাহার বেশ ঘনিষ্ঠতা হয় এবং তাহাকে বৃদ্ধবয়সে স্মরণ করিয়া 'গল্পসল্পে' ম্যাজিসিয়ানের গল্প সৃষ্টি করেন। সাহিত্যে কবি তাঁহার অনামা বন্ধুকে অমর করিয়া গিয়াছেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ঘরোয়া' বইএ এই লোকটির কথা লিখিয়াছেন, নাম তাঁহার হরিশ্চন্দ্র হালদার—বন্ধুমহলে তিনি হ. চ. হ. নামে খ্যাত ছিলেন। বহুকাল পরে বঙ্গদর্শনে (১৩০৯) 'দর্পহরণ' গল্পের নায়কের নাম দেখি হরিশচন্দ্র হালদার।[১]

রবীন্দ্রনাথ কবি, তাঁহার কাব্যখ্যাতি তাঁহাকে অমরত্ব দান করিয়াছে, সুতরাং তাঁহার কাব্যরচনার যে সামান্য ইতিহাস জানা যায় তৎসম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইবে না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যশক্তি কখন্ কিভাবে বিকশিত হইয়াছিল, তাহার সন তারিখ-দেওয়া ইতিহাস কখনো পাওয়া যাইবে না। শিশু কবে কখন্ অস্ফুট কাকলি ত্যাগ করিয়া অর্থযুক্ত শব্দ কহিল, এই প্রশ্নের উত্তর দান করা যেমন কঠিন, কবি প্রথম কবিতা কবে রচিয়াছিলেন, সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তদপেক্ষা কম কঠিন নহে। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁহার বাল্যরচনার যেসব নমুনা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও স্মৃতিমাত্র, ইতিহাস নহে; সুতরাং তাহাকেই আদিরচনার নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিবার কোনো কারণ নাই। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে কবিতা রচনারম্ভ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন, "আমার বয়স তখন সাত আট বছরের বেশি হইবে না। আমার এক ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ[২] আমার চেয়ে বয়সে বেশ একটু বড়ো।... একদিন দুপুরবেলা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, 'তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে।' বলিয়া, পয়ারছন্দে চৌদ্দ অক্ষর যোগাযোগের রীতিপদ্ধতি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন।"

১ 'বালক' পত্রিকার (১২৯২) কতকগুলি লিথো ছবির তলায় আছে H. C. Halder। ১৮৮১ সালে ইনিই কি কালাপাহাড় নামে এক ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন? দ্র. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড পৃ ৩২৭।

২ জ্যোতিঃপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৫৫-১৯১৯), দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী কাদম্বিনী দেবীর পুত্র।

তাঁহার এই আত্মীয়টি বালকের মধ্যে এমন কিছু লক্ষণ দেখিয়াছিলেন, যাহা দ্বারা অনুপ্রেরিত হইয়া তিনি ইহাকে পদ্যরচনার রহস্য ধৈর্যের সঙ্গে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর বালকের পদ্য লিখিবার ভয় ভাঙিয়া গেল। তারপর কোনো এক কর্মচারীর কৃপায় একখানি নীলকাগজের খাতা জোগাড় করিয়া তাহাতে স্বহস্তে পেন্সিল দিয়া কতকগুলি অসমান রেখা টানিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে পদ্য লিখিতে শুরু করিলেন। বিশ্বকবির কাব্যরচনার সূত্রপাত হইল এমনি দীনভাবে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাতাপত্র এবং বাহ্য উপকরণের দিকে দৃষ্টি গেল। নর্মাল স্কুলে তাঁহার কবিখ্যাতি রাষ্ট্র হয়; হেডমাস্টার সাতকড়ি দত্ত মহাশয় বালককবিকে কিভাবে পদ্যরচনায় উৎসাহিত করেন এবং সুপারিন্টেন্‌ডেণ্ট্ গোবিন্দ বাবুর আদেশে 'উচ্চাঙ্গের সুনীতি'মূলক কবিতা লিখিবার পর যেসব ঘটনা ঘটে, তাহা কবি স্বয়ং বহুবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন।

শান্তিনিকেতনে ও হিমালয়ে

১২৭৯ সালে শীতকালের প্রারম্ভে (১৮৭২ শেষভাগে) দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় ভ্রমণান্তে কলিকাতায় ফিরিয়াছেন— কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয় ও জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রের উপনয়নসংস্কারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঠাকুরপরিবারে ব্রাহ্মণদের লোকাচার ও ধর্মসংস্কার সকলই নিষ্ঠার সহিত অনুষ্ঠিত হইত। এযাবৎকাল দেবেন্দ্রনাথের পুত্রদের উপনয়নসংস্কার প্রাচীন হিন্দুমতেই সম্পাদিত হইয়াছিল। সোমেন্দ্রনাথপ্রমুখ বালকদের (সোমেন্দ্র, রবীন্দ্র ও সত্যপ্রসাদ) উপনয়ন যাহাতে অপৌত্তলিকভাবে ও বৈদিকমতে অনুষ্ঠিত হয়, দেবেন্দ্রনাথ তাহারই আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। আচার্য আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের সহিত দিনের পর দিন বসিয়া বৈদিকমন্ত্র চয়ন করিয়া উপনয়ন অনুষ্ঠানপদ্ধতি সংকলন করিলেন। লৌকিক হিন্দু আচার অনুসারে উপনয়নাদির সময়ে শালগ্রাম শিলার প্রয়োজন অনিবার্য; আবার উহা বৈদিক দীক্ষাবিধি বলিয়া, নানা যাজ্ঞিক অনুষ্ঠান ইহার সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। উপনয়নের সহিত একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট প্রতীকাদির পূজা ও হোমযজ্ঞাদিক্রিয়ার অনুষ্ঠান বর্জন করিয়া দেবেন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ উপনয়নবিধি প্রণয়ন করিলেন। তদনুযায়ী বালকদের উপনয়ন হইল; তৎপূর্বে বহুদিন ধরিয়া সেইসব মন্ত্র বিশুদ্ধ রীতিতে বারংবার আবৃত্তি করাইয়া বালকগণকে শেখানো হইয়াছিল।

মাঘোৎসবের[১] কয়েকদিন পরে রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন[২] হয়, তখন তাঁহার বয়স এগারো বৎসর নয় মাস। এই অনুষ্ঠানে বেদান্তবাগীশ মহাশয় পুরোহিতের ও দেবেন্দ্রনাথ আচার্যের কার্য করেন। মহর্ষি বেদি হইতে যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহাতে উপনয়নের একটি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বেশ স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সংস্কৃত ও সংশোধিত উপনয়নবিধি প্রাচীন বা নবীন দলের কাহারও মনঃপূত হইল না। নূতন উপনয়নপদ্ধতি গতানুগতিক আচার ও প্রচলিত মন্ত্রাদির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে বলিয়া প্রাচীনপন্থীদের পক্ষে মানিয়া লওয়া কঠিন হইল, আবার বিশুদ্ধ যুক্তিবাদের দিক হইতে উপনয়নের ন্যায় প্রাগৈতিহাসিক সংস্কারকে নবীন ব্রাহ্মদের পক্ষে সমর্থন করাও অসম্ভব। মহর্ষির একান্ত অনুগত ধর্মবন্ধু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মনে এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে দ্বিধা একবার জন্মিয়াছিল, কিন্তু তিনি বিরাট হিন্দুজাতীয়তার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন বলিয়া ইতিপূর্বে যেমন অনেক অযৌক্তিকতার সহিত আপস করিয়া

১ ৪৩ তম মাঘোৎসবের সময় 'সুধাবর্ষী বালকবালিকারা মধুর স্বরে নূতন দুইটি সংগীত করিলেন।' গান দুইটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত 'শঙ্কর শিব সংকটহারি' ও বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় কৃত 'জয় জগজীবন জীবনপাতাহে।' তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ৮ম কল্প, ২য় ভাগ ১৭৯৪ শকাব্দ [১২৭৯] ফাল্গুন পৃ ১৮১। রবীন্দ্রনাথ বালকবালিকাদের মধ্যে ছিলেন বলিয়া মনে হয়। বৃদ্ধবয়সে এই গানের সুর তাঁহার মনে ছিল।

২ ১২৭৯ মাঘ ২৫। ১৮৭৩ ফেব্রুয়ারি ৬। ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান, উপনয়ন, সমাবর্তন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৯৪ শক চৈত্র পৃ ২০৩-৬।

লইয়াছিলেন, এবারও তাহাই করিলেন। সেইজন্য তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে এই উপনয়ন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল, "শ্রীমৎ প্রধান আচার্য প্রাচীন উপনয়নপদ্ধতি যতদূর ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্তিত করা যায় তাহা করিলেন। পূর্বে যে অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রকাশিত হয় তাহাতে উপনয়ন বলিয়া একটি ক্রিয়া আছে বটে, কিন্তু তাহা কেবল ব্রাহ্ম উপদেষ্টার নিকটে কোনো বালককে আনিয়া তাঁহার উপর তাহার ধর্মশিক্ষার ভার অর্পণ করা।...কিন্তু নূতন প্রবর্তিত উপনয়নপদ্ধতিতে গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষাপূর্বক উপবীত গ্রহণ করার নিয়ম প্রবর্তিত হইল। · পৌত্তলিকতা ছাড়া ব্রাহ্মণ্য সকল নিয়ম পালন করিয়া উপনয়নক্রিয়া সম্পাদিত হয়।...প্রথমে আমি নূতন উপনয়নপ্রথার বিপক্ষ ছিলাম, কিন্তু এরূপ উপনয়ন ব্যতীত আদি ব্রাহ্মসমাজের হিন্দু অনুষ্ঠানপদ্ধতি সর্বায়ব সম্পন্ন হয় না, ইহা বিবেচনা করিয়া তাহাতে যোগ দিয়াছিলাম।" (পৃ ১৯৮-৯)।

ব্রাহ্মণমাত্রেই জানেন যে উপনয়নের পর নূতন ব্রহ্মচারীকে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রীমন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব একটা ঝোঁক পড়িল।' মন্ত্রজপের সময় তিনি গ্রহমণ্ডল-সমেত আকাশের বিরাট রূপকে মনে আনিতে চেষ্টা করিতেন। বিশ্বানুভূতির চেষ্টা এই প্রথম; তাঁহার বয়সের বালকের পক্ষে যেটুকু সম্ভব উহা তাহাই মাত্র, তদরিক্ত কিছু কল্পনা করিবার কারণ নাই।

রবীন্দ্রনাথের উপর ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থোদ্ধৃত উপনিষদাদির মন্ত্রের ও বিশেষভাবে গায়ত্রীমন্ত্রের প্রভাব অতীব গভীর। রাজা রামমোহন রায়ের ও মহর্ষির জীবনে এই মন্ত্রের কী প্রভাব ছিল তাহা তাঁহাদের জীবনচরিত-পাঠকের নিকট অবিদিত নাই। দেবেন্দ্রনাথ প্রতিদিন 'প্রাতে, অভুক্ত অবস্থায়, দশবার গায়ত্রীমন্ত্র জপের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা'[১] করিতেন। শিষ্য ও পুত্রাদির মধ্যে সেই পদ্ধতি প্রচলিত করিবার চেষ্টায় কোনোদিন তিনি শৈথিল্য প্রকাশ করেন নাই। রবীন্দ্র-নাথের 'ধর্ম' ও 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা পাঠে জানা যায় যে সংস্কৃত মন্ত্র ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার অনুরাগ যেমন অকৃত্রিম, তেমনি গভীর। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একসময় পর্যন্ত উপনয়নাদি হিন্দুসংস্কারে বিশ্বাসবান ছিলেন; কারণ আমরা দেখিতে পাই তিনি যথাবিধি জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপনয়ন সম্পন্ন করেন; কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহ সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত জামাতাকে উপনয়ন ধারণের জন্য অত্যন্ত জিদ্ করা হইয়াছিল বলিয়া আমরা জানি। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল এইসব সামাজিক আচারকে স্বয়ং মানিয়া চলিয়াছিলেন। প্রাচীন মন্ত্রের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা জীবনের শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে তাঁহার মজ্জাগত সামাজিক সংস্কারসমূহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার সেই মনের মুক্তির ইতিহাস আমরা উন্মোচন করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিব।

উপনয়নের পর মুণ্ডিত মস্তকে কেমন করিয়া ফিরিঙ্গি বিদ্যালয়ে যাইবেন এই ভাবনায় যখন বালক অত্যন্ত ম্রিয়মাণ, এমন দুশ্চিন্তার সময় তিনি খবর পাইলেন পিতা এবার তাঁহাকে লইয়া হিমালয়ে যাত্রা করিবেন। বিদেশে যাত্রা এই প্রথম; মনে কী যে আনন্দ হইয়াছিল তাহা প্রৌঢ়কালেও তিনি ভুলিয়া যান নাই; তবে যে সামান্য ঘটনাটি খুব স্পষ্ট করিয়া মনে ছিল সেটি হইতেছে যে, তাঁহার জন্য এই প্রথম নূতন পোশাক প্রস্তুত হইল, এমনকি মাথার জন্য জরি-দেওয়া টুপিও আসিল।

হিমালয়ে যাইবার পূর্বে কয়েকদিন বোলপুরে থাকিবার কথা হইল। কলিকাতা হইতে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত বীরভূম জেলার এই ক্ষুদ্র গ্রামের সহিত দেবেন্দ্রনাথের কী সম্বন্ধ তাহা এইখানে বিবৃত করা প্রয়োজন। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারব্যপদেশে বাংলার নানা স্থানে ভ্রমণকালে বহু ধনী মানী ব্যক্তির সহিত পরিচিত ও

১ মহর্ষির আত্মজীবনী, বি-ভা-সং। ২৭ পরিশিষ্ট পৃ ৩৭৬

প্রীতিবদ্ধ হন। সেই সময়ে বীরভূম জেলার অন্তর্গত গণ্ডগ্রাম রায়পুর ধনেজনে পূর্ণ ছিল; তথাকার সিংহপরিবার ছিলেন সর্ব বিষয়ে নেতৃস্থানীয়, ধনে ও জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ। ইস্ট ইন্ডিয়া রেলপথ খোলা হইলে দেবেন্দ্রনাথ একদা বোলপুর স্টেশনে নামিয়া সুরুলের মধ্য দিয়া রায়পুর যাইতেছিলেন; পালকি হইতে তাঁহার চোখে পড়ে উত্তর দিকের সীমাশূন্য প্রান্তর; সেই প্রান্তরে দুটিমাত্র ছাতিম বা সপ্তপর্ণী গাছ ও বন্য খর্জুর ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়িত না; সেই সীমাহীন প্রান্তর তাঁহার মন ভুলাইল। সেই প্রান্তরের মধ্যে ছিল একটি দিঘি বা বাঁধ (ভুবনডাঙার বাঁধ বা ভুবন সাগর) এবং তাহার নিকটে ছিল সামান্য কয়েক ঘর দরিদ্রের বাস। এই প্রান্তরে ছাতিম গাছের নিকট তিনি বিশ বিঘা জমি রায়পুরের জমিদারদের কাছ হইতে ক্রয় করিয়া লন (১২৬৯ ফাল্গুন ১৮)। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স দুই বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। কালে দেবেন্দ্রনাথ তথায় একখানি ক্ষুদ্র একতল অট্টালিকা নির্মাণ করেন, উত্তরকালে উহা শান্তিনিকেতন অতিথিশালায় পরিণত হয়। সময়ে সময়ে মহর্ষির পুত্রদের বা কন্যাজামাতাদের কেহ কেহ গিয়া কয়েকদিন করিয়া বাস করিয়া আসিতেন, শান্তিনিকেতন নাম তখনো হয় নাই।

পরবর্তী যুগে যে শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথের জীবনের কর্মকেন্দ্র ও সাধনপীঠ হয়, বালককালে সেই স্থানকে তিনি কী চক্ষে দেখিয়াছিলেন তাহার বিস্তৃত বর্ণনা জীবনস্মৃতিতে লিখিয়া গেছেন। এই বোলপুরে পিতার সহিত পুত্রের, প্রবীণ সাধকের সহিত কিশোর শিল্পীর যেন প্রথম ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল। এই নির্জন প্রান্তরের মধ্যে বাসকালে বালক পিতার বিবিধ কার্যে সহায়তা করিয়া আত্মগৌরব বোধ করিয়াছিলেন; পিতাও পুত্রের উপর প্রচুর দায়িত্ব ও অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন। উত্তরকালে এই শান্তিনিকেতন আশ্রমের ভার পিতার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পিতার আরব্ধ কার্য সার্থক করেন। মহর্ষির ব্রাহ্মধর্মাদর্শ রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়া উজ্জীবিত হইয়া নব কলেবরে বিশ্বধর্মরূপে বিশ্বভারতীর মধ্যে মূর্তি গ্রহণ করে; কবি সেই নবতর ধর্মের নাম দিয়াছেন মানুষের ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ সেই মানুষের ধর্ম তাঁহার সাহিত্যের মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

শান্তিনিকেতনে বাসকালে পিতার কাছে পাঠ গ্রহণ ব্যতীত বালক কবির কাব্য রচনা চলিতেছে; "শুধু কবিতা লেখা নহে, নিজের কল্পনার সম্মুখে নিজেকে কবি বলিয়া খাড়া করিবার জন্য একটা চেষ্টা" জন্মিয়াছিল। শিশু নারিকেল গাছের তলায় কাঁকরের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া বালকের কবিতা লিখিয়া খাতা ভরাইতে ভালো লাগে। "তৃণহীন কঙ্করশয্যায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' বলিয়া একটা বীররসাত্মক কাব্য" লিখিয়া ফেলিলেন। কবি লিখিয়াছেন, "তাঁহার প্রচুর বীররসেও উক্ত কাব্যটাকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই।" তবে আমাদের মনে হয় এই কাহিনীর ক্ষীণ প্রতিধ্বনি বোধ হয় 'রুদ্রচণ্ড' নামক নাটকের মধ্যে শোনা যায়, রুদ্রচণ্ড পৃথ্বীরাজের এক প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম।

শান্তিনিকেতনে এই আসাটা জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা। তিনি লিখিয়াছেন, "শান্তিনিকেতনে এসেই আমার জীবনে প্রথম সম্পূর্ণ ছাড়া পেয়েছি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে। উপনয়নের পরেই আমি এখানে এসেছি।··· আমার জীবন নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকত প্রথম বয়সে এই সুযোগ যদি আমার না ঘটত।··· সেই বালক বয়সে এখানকার প্রকৃতির কাছ থেকে যে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেম— এখানকার অনবরুদ্ধ আকাশ ও মাঠ, দূর হতে প্রতিভাত নীলাভ শাল ও তালশ্রেণীর সমুচ্চ শাখাপুঞ্জের শ্যামলা শান্তি, স্মৃতির সম্পদরূপে চিরকাল আমার স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তারপরে এই আকাশে এই আলোকে দেখেছি সকালে বিকালে পিতৃদেবের পূজার নিঃশব্দ নিবেদন, তার গভীর গাম্ভীর্য।"[১]

ফাল্গুনের শেষদিকে মহর্ষি পুত্রকে লইয়া অনুচরাদিসহ হিমালয় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রবীন্দ্রনাথের

১ আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা, প্রবাসী ১৩৪০ আশ্বিন।

জীবনপ্রত্যুষের যে কয়টি ঘটনা তাঁহার মনের উপর গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, তাহার অন্যতম হইতেছে এই হিমালয়যাত্রা; জীবনস্মৃতিতে বিস্তৃতভাবেই উহা বর্ণিত হইয়াছে; এমনকি সামান্য একখানি পত্রে যখন একবার তাঁহাকে নিজ জীবনকাহিনী সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতে হয়, তখন তিনি হিমালয়বাসের কথাটাকে খুবই উজ্জ্বল করিয়া স্বল্প কথায় প্রকাশ করেন।

বোলপুর হইতে বাহির হইয়া সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর প্রভৃতি স্থানে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতে করিতে অবশেষে পিতাপুত্র অনুচরগণসহ অমৃতসরে পৌঁছিলেন। অমৃতসরে শিখদের বিখ্যাত গুরুদ্বার বা ধর্মমন্দির তথাকার প্রধান দর্শনীয় স্থান; মন্দিরে 'গ্রন্থসাহেব' হইতে অখণ্ডপাঠ ও ভজন চলে, নামকীর্তন মুহূর্তমাত্র ক্ষান্ত হয় না। মহর্ষি আবিষ্ট হইয়া সেইসব ভক্তিপূর্ণ গান শুনিতেন, সেকথা রবীন্দ্রনাথের মনে খুবই স্পষ্ট ছিল। আমাদের মনে হয় শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া মহর্ষি তথায় প্রতিদিন প্রাতে ও সায়াহ্নে ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ হইতে স্বাধ্যায়পাঠ ও সংগীতের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার আদর্শ অমৃতসর গুরুদ্বারের অখণ্ডপাঠ হইতে গৃহীত।

অমৃতসরে তাঁহারা মাসখানেক ছিলেন; সেখান হইতে চৈত্রমাসের শেষে (১২৭৯) ডালহৌসি পাহাড়ে যাত্রা করেন; হিমালয়ের আহ্বান বালককে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল, অমৃতসরে দিন আর কাটিতেছিল না।[২] ডালহৌসি চম্বা রাজ্যের মধ্যে বক্রোটা, তেহ্‌রা, পোত্‌রেন পর্বতত্রয়ের উপর অবস্থিত ক্ষুদ্র জনপদ; বক্রোটাই সর্বোচ্চ পর্বত (৭,৮১৯ ফিট), ইহারই শিখরে ছিল তাঁহাদের বাসা। বৈশাখ মাস, (১২৮০) কিন্তু শীত এত প্রবল যে ছায়াশীতল স্থানে বরফ তখনও জমিয়া ছিল।

বক্রোটা শৈলে বাসকালে বালক রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণাদি ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিলেন। "কোনো বিপদ আশঙ্কা করিয়া আপন ইচ্ছায় পাহাড়ে ভ্রমণ করিতে" মহর্ষি তাঁহাকে কোনো দিন বাধা দেন নাই। বাসার নিম্নবর্তী অধিত্যকায় বিস্তীর্ণ কেলুবনে বালক একাকী দীর্ঘ লৌহফলকবিশিষ্ট লাঠি লইয়া প্রায়ই বেড়াইতেন; এই ভ্রমণের মধ্য দিয়া তিনি কী আহরণ করিতেন তাহা বলা সুকঠিন; কিন্তু অল্পকাল পরে তিনি যেসব কাব্যোপন্যাস বা কাব্যনাটক রচনা করেন, তাহার মধ্যে এই হিমালয়ভ্রমণের, এই নির্জনবনের প্রভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। হিমালয়ভ্রমণে আসিয়াছেন বলিয়া বালকের পড়াশুনা যাহাতে নিয়মিতরূপে হয়, তদ্‌বিষয়ে মহর্ষির তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল।

মহর্ষি পুত্রকে কিভাবে পড়াইতেন তাহার বিস্তৃত সংবাদ আমরা জীবনস্মৃতি হইতে পাই। প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠাইয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ 'উপক্রমণিকা' মুখস্থ করিতে দিতেন। ইতিপূর্বে বালককে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়াইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। বহু শতাব্দী ধরিয়া এদেশে সংস্কৃত পড়াইবার পদ্ধতি ছিল আবৃত্তি, অর্থাৎ বিদ্যার্থীকে সমগ্র একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও তৎসঙ্গে অমরকোষ অভিধানখানি মুখস্থ করিতে হইত। যখন সংস্কৃতই বিদ্যার্থীদের একমাত্র পঠনীয় বিষয় ছিল, তখন 'আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী' পদ্ধতি সম্বন্ধে মন্তব্য করিবার কিছুই ছিল না; কিন্তু উনবিংশ শতকের নূতন রাজনীতিক পরিস্থিতিহেতু বিদ্যার্থীর পক্ষে বিচিত্র বিষয় ও বিদেশীভাষা আয়ত্ত করা আবশ্যিক হইয়া উঠে। সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগ অম্লান রাখিবার উদ্দেশ্যে সংস্কৃত ব্যাকরণের দুরূহতাকে শিথিল করিয়া, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সর্বপ্রথম বাঙালি ছাত্রের জন্য বাংলাভাষার মধ্য দিয়া সংস্কৃত শিখাইবার ব্যবস্থা করেন; তজ্জন্য উপক্রমণিকা, ব্যাকরণকৌমুদী, ঋজুপাঠ প্রভৃতি প্রণীত হয়। হিমালয়ে রবীন্দ্রনাথ পিতার কাছে ঋজুপাঠ দিয়া সংস্কৃতে পাঠগ্রহণ আরম্ভ করেন।

১ পদ্মিনী নিয়োগীকে লিখিত পত্র ১৩১৭, ভাদ্র ২৮। প্রবাসী ১৩৪৮ কার্তিক। আত্মপরিচয়।

২ মহর্ষির পত্রাবলী পৃ ১০৫। বক্রোটা ১৪ বৈশাখ, ১৭৯৫ শক [২৫ এপ্রিল ১৮৭৩ (১২৮০)] "আমি•অমৃতসর হইতে আবার সেই আমার বক্রোটা শিখরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি।"

তবে মহর্ষি ঋজুপাঠের প্রথম ভাগ না পড়াইয়া একেবারে দ্বিতীয়ভাগ শুরু করিয়া দেন। বাংলায় বুনিয়াদ খুব ভালো ছিল বলিয়া 'সংস্কৃত শিক্ষার কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়া' যাইত। 'গোড়া হইতেই যথাসাধ্য রচনাকার্যে তিনি' বালককে উৎসাহিত করিতেন।

ইংরেজি পড়াইবার জন্য মহর্ষি Peter Parley's' Tales পর্যায়ের অনেকগুলি বই সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। পিটার পার্লি হইতেছে Samuel Griswold Goodrich (1793-1860) নামে আমেরিকান শিশুসাহিত্য-লেখকের ছদ্মনাম। এই গ্রন্থমালা হইতে বেন্‌জামিন ফ্রাংকলিনের জীবনবৃত্তান্ত তিনি পাঠ্যরূপে বাছিয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু ফ্রাংকলিনের 'হিসাবকরা কেজো ধর্মনীতি' তাঁহার নিকট অত্যন্ত সংকীর্ণ মনে হইত; পড়াইতে পড়াইতে বিরক্ত হইয়া উঠিতেন, প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

এই হিমালয়ভ্রমণ পর্বে পিতার সাহচর্যে বালকের আরেকটি বিষয়ের প্রতি অনুরাগ উদ্দীপ্ত হইল। সেটি হইতেছে জ্যোতিষ্কশাস্ত্র। মহর্ষি পুত্রকে প্রক্‌টরের[১] রচিত সরলপাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষের বই হইতে অনেক বিষয় মুখে মুখে বুঝাইয়া দিতেন, বালক তাহা বাংলায় লিখিতেন।[২] অমৃতসর হইতে বক্রোটায় যাইবার পথে ডাকবাংলায় বিশ্রামকালে সন্ধ্যার পর প্রায়ই পিতাপুত্রে জ্যোতিষ সম্বন্ধে আলোচনা চলিত। জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে কৌতূহল বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত অম্লান ছিল, তাহার পত্তন হয় এই সময়ে।

এমনি করিয়া চারিমাস পিতার সঙ্গে ভ্রমণ ও বাস করিয়া কাটিলে পর রবীন্দ্রনাথ পিতৃ-অনুচর কিশোরী চাটুজ্জের সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।[৩]

প্রত্যাবর্তন

হিমালয়ভ্রমণ পর্বটা রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে নানাদিক হইতে স্মরণীয়। তিনি লিখিয়াছেন, গৃহের মধ্যে "পূর্বে যে-শাসনের মধ্যে সংকুচিত হইয়া ছিলাম হিমালয়ে যাইবার সময়ে তাহা একেবারে ভাঙিয়া গেল। যখন ফিরিলাম তখন আমার অধিকার প্রশস্ত হইয়া গেছে।··· বাড়িতে যখন আসিলাম তখন কেবল যে প্রবাস হইতে ফিরিলাম তাহা নহে—এতকাল বাড়িতে থাকিয়াই যে-নির্বাসনে ছিলাম সেই নির্বাসন হইতে বাড়ির ভিতরে আসিয়া পৌঁছিলাম। অন্তঃপুরের বাধা ঘুচিয়া গেল, চাকরদের ঘরে আর আমাকে কুলাইল না। মায়ের ঘরের সভায় খুব একটা বড়ো আসন দখল করিলাম। তখন আমাদের বাড়ির যিনি কনিষ্ঠ বধূ [কাদম্বরী দেবী] ছিলেন তাঁহার কাছ হইতে প্রচুর স্নেহ ও আদর পাইলাম।"

কিন্তু গ্রীষ্মাবকাশের ছুটির পর বেঙ্গল একাডেমি স্কুলে যথারীতি যাইতে হইল। বাহিরের উন্মুক্ত জীবনের মধ্যে চারি মাস কাটাইয়া আসিয়া ও পিতার নিকট প্রচুর স্বাধীনতা পাইয়া পুনরায় ফিরিঙ্গি বিদ্যালয়ের চারি প্রাচীর-বেষ্টিত কক্ষ তাঁহার কাছে পাষাণকারার ন্যায় কঠিন হইয়া উঠিল।

১ R. A. Proctor (1837-88) রচিত Half-hours with the Telescope (1868) অথবা The Orbs Around Us (1872) গ্রন্থ হইতে এই পাঠ দেওয়া হইত।

২ জ্যোতিষ সম্বন্ধে এই বালকোচিত রচনা বোধ হয় কোনো পণ্ডিত ছাটিয়া কাটিয়া 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' প্রকাশ করেন। দ্র. শনিবারের চিঠি ১৩৪৮ কার্তিক।

৩ মহর্ষির পত্রাবলী পৃ ১০৭। বক্রোটাশেখর ১৪ আষাঢ় ১৭৯৫ [২৭ জুন ১৮৭৩] "রবীন্দ্রকে একটি জীবন্ত পত্রস্বরূপ করিয়া তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছি।"

বিদ্যালয়ের গণ্ডির মধ্যে মন টেঁকে না, মনে জাগে নানা আশা বহু আকাঙ্ক্ষা বিচিত্র সাধ। বোধ হয় সেই সময়ে অভিলাষ[১] নামে এক দীর্ঘ কবিতা লেখেন। ইহাতে কি বালককবির মনের অভিলাষই বালকোচিত ভাষায় ও ছন্দে প্রকাশ পাইয়াছিল।

জনমনোমুগ্ধকর উচ্চ অভিলাষ।
তোমার বন্ধুর পথ অনন্ত অপার।
অতিক্রম করা যায় যত পান্থশালা
তত যেন অগ্রসর হতে ইচ্ছা হয়॥ ১

কবিতাটির শেষ কয়টি স্তবকে দ্বাদশবর্ষীয় বালক উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে দার্শনিক ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন,

উচ্চ অভিলাষ, তুমি যদি নাহি কভু
বিস্তারিতে নিজ পথ পৃথিবীমণ্ডলে
তাহা হোলে উন্নতি কি আপনার জ্যোতি
বিস্তার করিত এই ধরাতল মাঝে? ৩৮

বিদ্যালয়ের নিয়মকরা পড়াশুনার মধ্যে বালককে বাঁধা ক্রমশই অভিভাবকগণের পক্ষে সমস্যাপূর্ণ হইয়া উঠিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ এক পত্রে লিখিতেছেন[২] যে বালকেরা স্কুলে টিকিতে না পারায় তিনি স্বয়ং তাহাদিগকে পড়াইতেছেন, প্রাতে রামসর্বস্ব পণ্ডিত সংস্কৃত শিখাইতেছেন। তিনি বালকদিগকে শকুন্তলা অর্থ করিয়া পড়াইতেন। মাঝে কিছুকাল মহর্ষির অনুরোধে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে পড়াইবার চেষ্টা করেন; কিন্তু অমন ক্ষণজন্মা শিক্ষকের শিক্ষারীতিকেও তিনি পরাভূত করিলেন। অতঃপর আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য[৩] ইহাদের গৃহশিক্ষক হইলেন; তিনি যখন বালককে স্কুলের পড়ায় কোনোমতেই বাঁধিতে পারিলেন না, তখন তাহার রুচিমতো সাহিত্যরস পরিবেশনে মন দিলেন। জ্ঞানচন্দ্র আসিয়া সংস্কৃতে কালিদাসের কুমারসম্ভব মহাকাব্য ও ইংরেজিতে শেকসপীয়রের ম্যাকবেথ নাটক পড়ানো শুরু করিলেন। বলা বাহুল্য এই দুই গ্রন্থ বালকের সম্মুখে দুইটি নূতন জগত উদ্ভাসিত করিল— একটি প্রকৃতির সৌন্দর্য, অপরটি মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য। কুমারসম্ভব পড়িতে পড়িতে তিন সর্গ তাঁহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু জ্ঞানচন্দ্র কেবল পড়াইয়া ক্ষান্ত হইতেন না, যাহা পড়াইতেন তাহা বালককে দিয়া বাংলা কবিতায় লিখাইয়া লইতেন। ম্যাকবেথ নাটকখানিও এইভাবে সম্পূর্ণরূপে তর্জমা হইয়া যায়। কবি লিখিয়াছেন, "যতক্ষণ তাহা বাংলা ছন্দে আমি তর্জমা না করিতাম ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। সমস্ত বইটার অনুবাদ শেষ হইয়া গিয়াছিল।" আমরা উভয় অনুবাদ হইতে কিছু কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। প্রথমেই কুমারসম্ভব মহাকাব্যের প্রথম সর্গের অনুবাদ-অংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

সময় লঙ্ঘন করি নায়ক তপন
উত্তর অয়ন যবে করিল আশ্রয়,
দক্ষিণের দিক্‌-বালা প্রাণের হুতাশে
অধীর হইয়া উঠি ফেলিল নিঃশ্বাস।
নূপুর শিঞ্জন সহ সুন্দরী-কুলের
চারুপদ-পরশের বিলম্ব না সহি,
অশোকের কাঁধ হৈতে সর্বাঙ্গ ছাইয়া
ফুটিয়া উঠিল ফুল পল্লব সহিতে।
কচি কচি নবীন পল্লব উদগমে
সমাপ্তি লভিল যেই নব-চূত-বান,

১ অভিলাষ, দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের রচনা বলিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (১২৮১ অগ্রহায়ণ) প্রকাশিত হয়। প্রকাশকালে বালকের বয়স ১১ বৎসর ৭ মাস। তবে উহা রচিত হয় খুব সম্ভব ১২৮০ সালের শীতকালে। দ্র. শনিবারের চিঠি ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ। বি-ভা-প ১৩৫০ বৈশাখ।

২ ১৭৯৫ শক মাঘ ২৫ (১২৮০) (১৮৭৪ ফেব্রুয়ারি ৬) জীবনস্মৃতি ১৩৫০ সং পৃ ৬৮ পাদটীকা ১।

৩ জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র। ১৮৭১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এ. পাশ করেন। ১৮৭৩এ রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। জীবনস্মৃতিতে আছে যে ইনি ওকালতি পড়িতে গেলে এই কাজ ছাড়িয়া দেন। তিনি ওকালতি পাশ করেন নাই বা শেষ পর্যন্ত পড়েন নাই; কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের B. L. পাশের তালিকায় তাঁহার নাম পাই নাই। ১৯১০ কি' ১১ সালে তিনি কয়েক মাসের জন্য শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করিতে আসেন। তখন তিনি জরাগ্রস্ত।

বসাইল অলিবৃন্দ বসন্ত অমনি
কুসুম ধনুর যেন নামাক্ষরগুলি।
কর্ণিকার ফুলের এমন বর্ণ শোভা,
সৌরভ নাহি রে তার, বড়ো প্রাণে বাজে।
একাধারে সব গুণ বর্ত্তিবে যে কভু
বিধাতার প্রবৃত্তি বড়োই তাহে বাম।
মর্ম্মর শবদে যথা জীর্ণ পর্ণ ঝরে—
হেন বনে মদ-ভরে উদ্ধত হইয়া

বায়ুর প্রত্যভিমুখে চরে মৃগকুল,—
পিয়াল-মঞ্জরী হ'তে উড়ি' আসি রেণু
করিতেছে তা'-সবার নয়ন আকুল।
উদ্যত-কুসুম-ধনু সঙ্গে লয়ে রতি
সেই ঠাঁই যখন হইলা উপনীত,
জীব-জন্তু সবাকার মরমে মরমে
কি যে রস সঞ্চারিল, অন্তরের ভাব
বাহিরিতে লাগিল সবার সব কাজে।[1]

নিম্নে ম্যাকবেথের অনুবাদ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল, ইহা ভারতী ১২৮৭ সালের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

দৃশ্য। এক প্রান্তর। বজ্র। তিনজন ডাকিনী।

১ম ডা—এতক্ষণ বোন কোথায় ছিলি ?
২য় ডা—মারতেছিলুম শুয়োরগুলি।
৩য় ডা—তুই ছিলি বোন, কোথায় গিয়ে ?

১ম ডা—দেখ্, একটা মাঝির মেয়ে
গোটাকতক বাদাম নিয়ে
খাচ্ছিল সে কচ্‌মচিয়ে—
কচ্‌মচিয়ে কচ্‌মচিয়ে—
চাইলুম তার কাছে গিয়ে,
পোড়ারমুখী বোল্লে রেগে
'ডাইনি মাগী যা' তুই ভেগে।'

আলোপোয় তার স্বামী গেছে,
আমি যাব পাছে পাছে।
বেঁড়ে একটা ইঁদুর হোয়ে
চালুনীতে যাব বোয়ে—
যা বোলেছি কোর্‌ব আমি কোর্‌ব আমি—
নইক আমি এমন মেয়ে!

২য় ডা—আমি দেব বাতাস একটি
১ম ডা—তুই ভাই বেশ লোকটি!
৩য় ডা—একটি পাবি আমার কাছে।
১ম ডা—বাকি সব আমারি আছে।

...

খড়ের মত একেবারে
শুকিয়ে আমি ফেল্‌ব তারে।
কিবা দিনে কিবা রাতে
ঘুম রবে না চোকের পাতে।
মিশ্‌বে না কেউ তাহার সাথে।

একাশি বার সাত দিন
শুকিয়ে শুকিয়ে হবে ক্ষীণ।
জাহাজ যদি না যায় মারা
ঝড়ের মুখে হবে সারা।
বল্ দেখি বোন, এইটে কি ?

১ বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পুঁথি হইতে প্রাপ্ত অনুবাদ। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১ম বর্ষ ১৩৫০ বৈশাখ পৃ ৫৮৫-৯১। ভারতী ১ম বর্ষের (১২৮৪) মাঘ সংখ্যায় ইহা সামান্য সংস্কৃত হইয়া মদনভস্ম (কুমারসম্ভব) নামে সম্পাদকের বৈঠকে প্রকাশিত হয়। দ্র. বি-ভা-প ২য় বর্ষ ১৩৫০ পৃ ২১৮ পাদটীকা।

২য় ডা—কই, কই, কই, দেখি, দেখি।
১ম ডা—একটা মাঝীর বুড় আঙুল রোয়েচে লো বোন, আমার কাছে,
বাড়িমুখো জাহাজ তাহার পথের মধ্যে মারা গেছে।
৩য় ডা—ঐ শোন্ শোন্ বাজ্‌ল ভেরী আসে ম্যাকেথ, নাইক দেরী।

রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি নর্মাল স্কুলের ও গৃহের বাহিরে একদিন কিভাবে প্রচারিত হয়, তাহার কাহিনী কবি স্বয়ং সকৌতুকে 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন।

তাঁহার গৃহশিক্ষক জ্ঞানবাবুর শাসনে তাঁহাকে ম্যাকবেথের যে অনুবাদ করিতে হইয়াছিল, তাহার কথা প্রচার করেন তাঁহাদের সংস্কৃতের অধ্যাপক রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য মহাশয়। ইনি ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশনের হেড্ পণ্ডিত। ইনিই একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনুবাদ শুনাইবার জন্য পাণ্ডুলিপিসহ লেখককে নিয়া তাঁহার সমক্ষে হাজির করিলেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৬-৮৬) সেই সময়ে তাঁহার কাছে বসিয়াছিলেন। বালকের অনুবাদ শুনিয়া উভয়েই প্রীত হইলেন। রাজকৃষ্ণবাবু উপদেশ দিয়াছিলেন নাটকের অন্যান্য অংশের অপেক্ষা ডাকিনীর উক্তিগুলির ভাষা ও ছন্দের কিছু অদ্ভুত বিশেষত্ব থাকা উচিত। বোধ হয় এই উপদেশ অনুসারে তিনি সেই অংশ নূতন করিয়া লেখেন। "সেই অনুবাদের [ম্যাকবেথের] আর সকল অংশই হারাইয়া গিয়াছিল, কেবল ডাকিনীদের অংশটা অনেকদিন পরে ভারতীতে বাহির হইয়াছিল।"[১]

জ্ঞানচন্দ্র শিক্ষকতা হইতে অবসর গ্রহণ করিলে মেট্রোপলিটান স্কুলের শিক্ষক ব্রজনাথ দে মহাশয় আসিয়া গোল্‌ড্‌স্মিথের ভিকার অব্ ওয়েকফীল্ড-এর তর্জমা করিতে দিলেন; কিন্তু তাঁহার পরীক্ষা সফল হইল না। ১৮৭৪ সালটা ঘরে পড়ার পরীক্ষায় কাটিয়া গেল; অবশেষে বালকদিগকে সেণ্টজেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু সেখানেও ফল ভালো হইল না। ইতিমধ্যে জননীর মৃত্যু হইল; মাতৃবিয়োগের পর[২] "মাতৃহীন বালক বলিয়া অন্তঃপুরে বিশেষ প্রশ্রয় পাওয়াতে স্কুলে যাওয়া প্রায় একপ্রকার ছাড়িয়াই" দিলেন। বিদ্যালয়ে গিয়া বাঁধাধরা পড়াশুনা না করিলেও সাহিত্যসাধনা সাধ্যমতো চলিতেছে; লেখনীও শান্ত নহে। 'বনফুল কাব্য' এই সময়ে রচিত, যদিও মুদ্রিত হয় আরো কিছুকাল পরে। এই কাব্য সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব; এইখানে যেসব কবিতা তাঁহার রচিত বলিয়া দাবি করা হয়, অথচ যাহাতে রচয়িতার নাম নাই সেইসব কবিতা সম্বন্ধে আলোচনাটা শেষ করিব।

'শৈশব সঙ্গীত' কাব্যসংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের মধ্যে রচিত কবিতা সংকলিত হইয়াছিল; এই কাব্যসংগ্রহে কোন্ বয়সের কোন্ রচনা তাহা নির্দেশ করা কঠিন। তদুপরি ইহা নির্বাচিত কবিতার সমষ্টি; সুতরাং দুই-চারিটি যে নিশ্চয়ই বাদ পড়িয়াছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহের কোনো কারণ নাই। সেইরূপ একটি কবিতা বোধ হয় 'প্রকৃতির খেদ'।[৩] প্রকৃতি ও লোকালয়ের মধ্যে যে বিচ্ছেদ দ্বন্দ্ব 'বনফুল' কাব্যের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, 'প্রকৃতির খেদ'-এর মধ্যে তাহাই প্রকট হইয়াছে বলিয়া আমাদের অনুমান হয়। ইহা 'বালকের রচিত' বলিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই দীর্ঘ কবিতাটি হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত হইল—

১ জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপি। দ্র. ভারতী ৪র্থ বর্ষ ১২৮৭ আশ্বিন। রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়ে এই অংশটি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

২ সারদা দেবীর মৃত্যু ১২৮১ ফাল্গুন ২৭, ১৮৭৫ মার্চ ১০। ত-বো-প ১৭৯৭ (১২৮২) বৈশাখ পৃ ১৭। মাতার চতুর্থী শ্রাদ্ধক্রিয়াতে শ্রীমতী সৌদামিনী দেবীর প্রার্থনা ১২৮১ ফাল্গুন ৩০ শনিবার। ৭ চৈত্র শনিবার, মাতার আদ্যশ্রাদ্ধে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রার্থনা। দ্র: সৌদামিনী দেবী, পিতৃস্মৃতি, প্রবাসী ১৩১৮ ফাল্গুন।

৩ প্রকৃতির খেদ, বালকের রচিত। ত-বো-প ১৭৯৭ শক (১২৮২) আষাঢ় ১৮৭৫ জুন।

বিস্তারিয়া উর্মিমালা, সুকুমারী শৈলবালা
অমল সলিলা গঙ্গা অই বহি যায় রে।
প্রদীপ্ত তুষাররাশি, শুভ্র বিভা পরকাশি
ঘুমাইছে স্তব্ধভাবে গোমুখীর শিখরে ॥

ফুটিয়াছে কমলিনী অরুণের কিরণে
নির্ঝরের একধারে, দুলিছে তরঙ্গভরে
ঢুলে ঢুলে পড়ে জলে প্রভাত পবনে ॥

আমরা যে কয়টি কবিতাসম্বন্ধে আলোচনা করিলাম, সেগুলি সবই অ-নামে প্রকাশিত। তাঁহার নিজ নামে প্রকাশিত প্রথম কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার'। তৎসম্বন্ধে আমরা অন্যত্র আলোচনা করিব।

'দ্বাদশবর্ষীয় বালকের রচিত' ও 'বালকের রচিত' অ-নামে-লিখিত কবিতা দুইটি ছাড়া বালক রবীন্দ্রনাথের আরও দুইটি কবিতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দুইখানি নাটকের মধ্যে প্রায়-লুপ্তভাবে আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। কিভাবে কবিতা দুইটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের মধ্যে আশ্রয় পাইল, তাহার ইতিহাস সংক্ষেপে এই :

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটক ছাপা হইতেছে।[১] তিনি রামসর্বস্ব পণ্ডিতের সাহায্যে প্রুফ দেখেন; রামসর্বস্বের অভ্যাস ছিল খুব জোরে জোরে পড়া। পাশের ঘর রবীন্দ্রনাথের পড়ার ঘর; রবীন্দ্রনাথ তখন সেণ্টজেভিয়ার্স স্কুলের ছাত্র। প্রুফের পাঠ কানে যাওয়াতে মাঝে মাঝে তিনি পণ্ডিত মহাশয়ের উদ্দেশে কোন্ স্থলে কী করিলে আরো ভালো হয়, তৎসম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। রাজপুত মহিলাদের চিতাপ্রবেশ উপলক্ষ্যে একটা গদ্য বক্তৃতা ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মচরিতে বলিয়াছেন, "গদ্য রচনাটা এখানে একেবারেই খাপ খায় নাই বুঝিয়া, কিশোর রবি একেবারে আমাদের ঘরে আসিয়া হাজির। তিনি বলিলেন, এখানে পদ্য রচনা ছাড়া কিছুতেই জোর বাঁধিতে পারে না। প্রস্তাবটা আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না।…রবীন্দ্রনাথ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই 'জ্বলজ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ'—এই গানটি রচনা করিয়া আনিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন।" (পৃ ১৪৭)

অপরটি 'স্বপ্নময়ী' নাটকের মধ্যে লুকানো রহিয়াছে;[২] ১৮৭৭ সালের হিন্দুমেলার জন্য রচিত কবিতাটিরই অঙ্গহানি ও শব্দ পরিবর্তন করিয়া উহাকে নাটকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমরা এ সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করিব।

আমরা এতক্ষণ বালক কবির যে কয়টি কবিতা লইয়া আলোচনা করিলাম, সেগুলির রচয়িতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের নাম পাওয়া যায় না। বাহিরের প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া সেগুলিকে তাঁহার রচনা বলিয়া মানিয়া লইতে হইয়াছে।

স্বাদেশিকতা : হিন্দুমেলা

ছাপার অক্ষরে 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' এই নামযুক্ত যে কবিতা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়, সেটি হইতেছে 'হিন্দুমেলার উপহার'।[৩] কবিতাটি হিন্দুমেলায় (১২৮১ মাঘ ৩০) পঠিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স তেরো বৎসর আট মাস মাত্র রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি বা অন্য কোনো রচনার মধ্যে এই কবিতা সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ইহার দুই বৎসর পরে যে কবিতা হিন্দুমেলায় আবৃত্তি করেন, তাহার কথা জীবনস্মৃতিতে বিস্তৃতভাবেই বলিয়াছেন।

সত্তর বৎসর পূর্বে কী সূত্রে উহা রচিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে যথাযথ ধারণা করা এযুগের পাঠকদের পক্ষে সহজ নহে; সেইজন্য আমরা সেই অতীতযুগের বিস্মৃত কাহিনী সংক্ষেপে এখানে বিবৃত করিব। রবীন্দ্রনাথের অন্তরে

১ রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়। সরোজিনীর প্রকাশকাল ১২৮২ অগ্রহায়ণ ১৫। ১৮৭৫ নভেম্বর ৩০।

২ স্বপ্নময়ীর প্রকাশকাল ১৮৮২। রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়, পৃ ৬৫-৬৭।

৩ ১২৮১ ফাল্গুন ১৪, ১৮৭৫ ফেব্রুয়ারি ২৫ তারিখের দ্বিভাষিক অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবাসীর ১৩৩৮ মাঘ সংখ্যায় উহা পুনঃ প্রকাশ করেন। দ্র: রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয় পৃ ৬০-৬২।

এই বালক বয়সে দেশাত্মবোধ ও স্বদেশপ্রীতির বুনিয়াদ কিভাবে পত্তন হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে হইলে বাংলাদেশের হিন্দুমেলা বা এই প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসটা জানা প্রয়োজন।

স্বাদেশিকতা বা জাতীয়তা বা ন্যাশনালিজম পদার্থটা য়ুরোপীয় শিক্ষার ফল একথা লইয়া আশা করি কেহ বাদপ্রতিবাদ করিবেন না। হিন্দুকলেজ স্থাপনের ফলে যে ইংরেজিশিক্ষা দেশের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার ফল সর্বতোভাবে দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকর হয় নাই; তবে দেশের জন্য দরদ বা জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিবার জন্য এই বিদেশী শিক্ষাই যে দায়ী তদ্‌বিষয়ে সন্দেহের অবসর নাই। যাহাই হউক নূতন শিক্ষা বিস্তারের ফলে পাশ্চাত্ত্য দর্শন বিজ্ঞান অধ্যয়নের প্রতিক্রিয়ায় দেশের ধর্মশাস্ত্র, ধর্মসাধনা ও সকল প্রকার হিন্দু অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাহীন বিরূপতা শিক্ষিতদের পক্ষে শ্লাঘার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের প্রচারকার্য এই অশ্রদ্ধার অগ্নিতে ইন্ধন জোগায়। হিন্দুসংস্কৃতি-গ্রাসোদ্যত য়ুরোপীয়তাকে প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজ যুগপৎ বাধা দান করিতে উদ্যত হইল; তবে ব্রাহ্মসমাজের বাধাদানপদ্ধতির সহিত সনাতনীদের পদ্ধতির মূলগত পার্থক্য ছিল। য়ুরোপীয় শিক্ষার ফলে একটি সুষ্ঠু দেশাত্মবোধ বা ন্যাশনালিজমের আদর্শে নবীনদের মন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল; বৃহত্তর আন্তর্জাতিক জগতের মধ্যে নিজ দেশকে দেখিবার শিক্ষা তাহারা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সনাতনীরা য়ুরোপীয়তার বিরুদ্ধে যে অভিযান পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা প্রতিক্রিয়ামূলক,— ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরাভব বা বর্ণাশ্রমের বিলোপভয়ে আতঙ্কজনিত কর্মপ্রচেষ্টা। রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে আজপর্যন্ত এই দুইটি বিপরীত স্রোতের গতিবেগের দ্বন্দ্বে বাঙালির চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত, তাহার প্রগতি বাধাগ্রস্ত। দেবেন্দ্রনাথপ্রমুখ ব্রাহ্ম নেতারা হিন্দুজাতীয়তাবোধকে উদ্‌বুদ্ধ ও য়ুরোপীয় তথা খ্রীষ্টীয় স্রোতকে প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। বাহির হইতে দেখিলে ঠাকুরপরিবারের মধ্যে অনেক কিছু বিদেশী প্রথার প্রচলন ছিল; কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের[১] যে একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই ঠাকুরপরিবারের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতির খসড়ায় লিখিয়াছেন, "আমাদের পিতৃদেব যখন স্বদেশের প্রচলিত পূজাবিধি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তখনো তিনি স্বদেশী শাস্ত্রকে ত্যাগ করেন নাই, ও স্বদেশী সমাজকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়া ছিলেন। আমার পিতামহ ও ছোটোকাকা মহাশয় [নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর] বিলাতের সমাজে বর্ষযাপন করিয়া ইংরাজের বেশ পরিয়া আসেন নাই এই দৃষ্টান্ত আমাদের পরিবারের মধ্যে সজীব হইয়া আছে।..." "আমাদের পিতামহ ইংরাজ রাজপুরুষদিগকে বেলগাছির বাগানে নিমন্ত্রণ করিয়া সর্বদাই ভোজ দিতেন,......কিন্তু শুনিয়াছি তিনি পিতাকে নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন যে, ইংরাজকে যেন খানা দেওয়া না হয়! তাহার পর হইতে ইংরাজের সহিত সংশ্রব আর আমাদের নাই; এবং পিতামহের আমল হইতে আজ পর্যন্ত সরকারের নিকট হইতে খেতাবলোলুপতার উপসর্গ আমাদের কোনোকালে দেখা দেয় নাই।"

রাজনারায়ণ বসুকে বাংলাদেশের এই নূতন স্বাদেশিকতার গুরু বলিলে বোধ হয় শব্দের অপপ্রয়োগ হইবে না। ১৮৬১ অব্দে তিনি মেদিনীপুর হইতে 'শিক্ষিত বঙ্গবাসীর মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভাস্থাপনের এক প্রস্তাব'[২] শীর্ষক ইংরেজি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। কয়েক বৎসর পরে (১৮৬৫) কলিকাতায় আসিয়া তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ,

১ দেবেন্দ্রনাথ 'ব্রিটিশ-ভারত-সভা'র (British Indian Association) সহকারী সম্পাদক ছিলেন (১৮৫১)। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেন, "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আমল হইতেই প্রকৃতপক্ষে স্বদেশী ভাবের প্রচার আরম্ভ হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় উক্ত পত্রিকাতে ভারতের অতীত গৌরবের কাহিনী লিখিয়া লোকের মনে সব প্রথম দেশানুরাগ উদ্দীপিত করিয়াছিলেন।" জীবনস্মৃতি পৃ ১৩১।

২ Prospectus of a Society for the promotion of National feeling among the educated natives of Bengal.

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও নবগোপাল মিত্রের সহিত যুক্ত হইয়া 'স্বাদেশিকদের সভা' স্থাপন করেন। অতঃপর ঠাকুরবাড়ির আর্থিক ও আন্তরিক সাহায্যে ও রাজনারায়ণ বসুর প্রেরণায় এবং নবগোপালের প্রচেষ্টায় 'হিন্দুমেলা' স্থাপিত হয়। ইহার প্রথম অধিবেশন হয় ১২৭৩ এর চৈত্র সংক্রান্তিতে (১৮৬৭ এপ্রিল ১২)। এই মেলার সম্পাদক হইলেন গণেন্দ্রনাথ, সহকারী-সম্পাদক নবগোপাল মিত্র। মেলার অধ্যক্ষগণ স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতি, সাহিত্যের বিকাশ, সংগীতের চর্চা, স্বদেশী কুস্তি প্রভৃতির পুনর্বিকাশে উৎসাহদান করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। এই পূর্ণাঙ্গ স্বদেশীভাব প্রচারের জন্য দেবেন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্যে নবগোপাল ঐ বৎসর 'ন্যাশনাল পেপার' নামে একখানি ইংরেজি সাপ্তাহিকও প্রকাশ করিলেন।

আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মসম্মান জাগরণ ছিল এই হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য। গণেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বার্ষিক সভায় এই মেলার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আজও সত্য বলিয়া অনেকের মনে হয়। "ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব যে, আমাদের সকল কার্যেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহায্য যাচ্ঞা করি, ইহা সাধারণ লজ্জার বিষয়!… অতএব যাহাতে আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়, ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার উদ্দেশ্য।" সংক্ষেপে বলিতে গেলে—জাতীয় স্বাবলম্বন প্রবৃত্তিকে জাতীয় চিত্তে উদ্দীপ্ত করাই হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য ছিল।[১]

হিন্দুমেলা স্থাপনের সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বৎসর; সুতরাং বাল্যকাল হইতে হিন্দুমেলার উচ্ছ্বাস উৎসাহের সহিত বালকের নিবিড় পরিচয় হয়। ক্রমে কিশোর বয়সে তাঁহারও একদিন আহ্বান আসিল মেলার সাহিত্যক্ষেত্রে। মেলার নবম অধিবেশনে বালক কবি 'হিন্দুমেলার উপহার' লইয়া উপস্থিত হইলেন। সভা বসে পার্সিবাগানে; শোভাবাজারের রাজা কমলকৃষ্ণদেব সভার দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন, সভাপতি হন রাজনারায়ণ বসু[২] বালক রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাটি আবৃত্তি[৩] করেন, তাহা কবিতা হিসাবে তুচ্ছ— হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'ভারতসঙ্গীত' কবিতার ক্ষীণ অনুকরণমাত্র। হেমচন্দ্রের "বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্‌ এই রবে, সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে"— এই পদগুলি সেদিন বাঙালির মুখে মুখে শোনা যাইত। রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম মুদ্রিত কবিতা হেমচন্দ্রের সুরে বাঁধা ও বিহারীলালের রঙে রঞ্জিত। আমরা নিম্নে 'হিন্দুমেলার উপহার' হইতে কয়েকটি স্তবক উদ্ধৃত করিতেছি :

১

হিমাদ্রি শিখরে শিলাসনপরি,
গান ব্যাস-ঋষি বীণা হাতে করি—
কাঁপায়ে পর্ব্বত শিখর কানন,
কাঁপায়ে নীহার-শীতল বায়!

৯

অমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক্ ভারত কানন,
চন্দ্র সূর্য্য হোক্ মেঘে নিমগন
প্রকৃতি-শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া যাক্।

৪

ঝঙ্কারিয়া বীণা কবিবর গায়,
"কেনরে ভারত কেন তুই, হায়,
আবার হাসিস্। হাসিবার দিন
আছে কি এখনো এ ঘোর দুঃখে।

১৮

ভারত কঙ্কাল আর কি এখন,
পাইবে হায়রে নূতন জীবন;
ভারতের ভস্মে আগুন জ্বালিয়া,
আর কি কখন দিবেরে জ্যোতি।

১ শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ পৃ ১৫৭-৮। যোগেশচন্দ্র বাগল : মুক্তির সন্ধানে ভারত, পৃ ১০০-১০২।

২ হিন্দুমেলার অধিবেশন ১২৮১ মাঘ ৩০। ১৮৭৫ ফেব্রুয়ারি ১১। এই মেলা উপলক্ষে বরদাবাসী সুবিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সের গান হয় এবং যশোহরের নড়ালনিবাসী জমিদার রায়চরণ রায় ব্যাঘ্রশিকারের নৈপুণ্যের জন্য এক স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়েন। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত পৃ ২১৪।

৩ Indian Daily News 1875, 15 Feb. "The Hindoo Mela. The Ninth Anniversary of the Hindoo Mela was opened at 4 p. m. on Thursday the 11th instant, at the well-known Parsee Bagan on the Circular Road by Rajah Kamalkrishna Bahadur, the President of the National Society. Baboo Rabindranath Tagore, the youngest son of Baboo Debendranath Tagore, a handsome lad of some 15, had composed a Bengali poem on Bharat (India) which he delivered from memory; the suavity of his tone much pleased his audience."

২২

মুছে যাক্ মোর স্মৃতির অক্ষর, ডুবুক আমার অমর জীবন,
শূন্যে হোক্ লয় এ শূন্য অন্তর, অনন্ত গভীর কালের জলে। [শেষ]

জাতীয়তাবোধ বা জাতীয়গৌরব-সঞ্চারিণী কবিতা বাংলা ভাষায় এই যুগের নূতন সৃষ্টি ; তেমনি নূতন সৃষ্টি 'জাতীয়' সংগীত। স্বদেশপ্রেমদ্যোতক সংগীত রচনায় ঠাকুরপরিবারের যুবকদের দান এখানে স্মরণীয়। হিন্দুমেলার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ রচনা করেন,—'মিলে সবে ভারতসন্তান, একতান মনপ্রাণ',[১] গণেন্দ্রনাথ লিখিলেন— 'লজ্জায় ভারত যশ গাহিব কি করে,' দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখিলেন— 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি'। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি, এইসব রচনার মধ্যে 'দেশমুক্তি-কামনার সুর ভোরের পাখির কাকলির মতো শোনা যায়'। বালক রবীন্দ্রনাথের কাকলিও এই প্রত্যুষে শোনা গিয়াছিল, তবে তাহা অতি ক্ষীণ ও অস্ফুট। রবীন্দ্রনাথের প্রাচীনতম জাতীয় সংগীত কোন্‌টি তাহা সঠিক নির্দেশ করা কঠিন। 'জাতীয় সঙ্গীত'[২] নামে একখানি সংগীতসংগ্রহে 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা' কবিতাটিকে গান বলা হইয়াছে ; পাদটীকায় আছে যে গানটি ইংরেজি সুরে গেয়। এই কবিতাটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকের জন্য বালক রবীন্দ্র কিভাবে রচনা করিয়া দেন তাহার কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। সরোজিনী নাটকের মুদ্রণকালে উহা রচিত হয় ; সুতরাং রচনাকালে বালকের বয়স চৌদ্দ বৎসর ছিল। কিন্তু এই গানটিকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম 'জাতীয়' সংগীত আখ্যা দান করা যায় না ; আমরা জাতীয় সংগীত অর্থে এখন যাহা বুঝি সেই দেশমাতৃকাবোধ হইতে রচিত সংগীত ইহা নহে। যথার্থ জাতীয় সংগীত রচিত হয় সঞ্জীবনী সভার যুগে, সেকথা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব।[৩]

'জাতীয় সঙ্গীত' গ্রন্থে আর একটি গানের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, যাহা রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া অনেকে মনে করেন ; সন্দেহের কারণ এই যে ইহাতে রচয়িতার নাম নাই ; কিন্তু 'ভারতীয় সঙ্গীত-মুক্তাবলী' নামক গ্রন্থে গানটির রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ বলিয়াই উক্ত।[৪] এই জাতীয় সংগীতের প্রথম পংক্তি ছিল, 'ভারতরে তোর কলঙ্কিত পরমাণু-রাশি'। গানটির ভাবধারা নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিকয় হইতে স্পষ্ট হইবে।

এই হিমগিরি স্পর্শিয়া আকাশ, যেদিন তোমার গিয়াছে চলিয়া
প্রাচীন হিন্দুর—কীর্ত্তি, ইতিহাস, সেদিন ত আর আসিবে না,
যতদিন তোর শিয়রে দাঁড়ায়ে যে রবি পশ্চিমে পড়েছে ঢলিয়া
অশ্রুজলে তোর বক্ষ ভাসাইবে সে আর পূরবে উঠিবে না।[৫]
ততদিন তুই কাঁদরে।

এই যুগের আর একটি গান সম্বন্ধে মতভেদ দেখা দিয়াছে ; সেটি হইতেছে

একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্রজীবন।

কাহারও কাহারও মতে গানটির রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ।[৫] কিন্তু গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' নাটকের দ্বিতীয়

১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' নাটকে (১৮৭৪) প্রথম অঙ্কে গানটি আছে।

২ জাতীয় সঙ্গীত (প্রথম ভাগ) প্রথম সংস্করণ ১২৮২ ফাল্গুন ১৮৭৬ মার্চ। দ্বিতীয় সংস্করণে 'তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ,' (ভারতী ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা ১২৮৪ আশ্বিন) আছে।

৩ নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী ২য় সংস্করণ ১৮৯৬ (১২৯১ পৃ ৪৪)। দ্র : শনিবারের চিঠি ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ, পৌষ।

৪ রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয় পৃ ৬৬-৬৭। সমগ্র কবিতাটি এইখানে 'স্বপ্নময়ী' হইতে উদ্ধৃত আছে।

৫ নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : রবীন্দ্র-গীতজিজ্ঞাসা, গীতবিতান বার্ষিকী, পৃ ১৫৫-১৬৭।

সংস্করণে (১৮৭৯)[১] সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকি প্রতিভা' রচনাকালে বোধ হয় ইহারই প্রথম পংক্তি ভাঙিয়া দস্যুদের গান 'একডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে' লিখিয়াছিলেন (১৮৮১)। স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁহার 'স্নেহলতা' নামক উপন্যাসে সঞ্জীবনী সভার অনুরূপ এক গুপ্ত সভার বর্ণনা দিয়াছেন; তাহাতে চারু নামে এক তরুণ কবি রচিত একটি গীত আছে; তাহার প্রথম পংক্তি 'একসূত্রে গাঁথিলাম সহস্র জীবন।' অন্যান্য পংক্তির ভাষা পৃথক হইলেও ভাব একই রূপের। (১৮৮৯)[২] গানের রচয়িতা নিজেকে শেক্‌পীয়রের ন্যায় নাট্যকার মনে করিতেন; তাই সন্দেহ হয় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্মুখে ছিলেন না। আমরা এতক্ষণ যেসব গান রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া আলোচনা করিলাম তাহার কোনোটিতেই রচয়িতাহিসাবে তাঁহার নাম না পাওয়ায় সন্দেহের বা প্রশ্নের অতীত তাহারা নহে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জাতীয় সংগীত বলা যাইতে পারে—'তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ',—যাহার মধ্যে সঞ্জীবনী সভার সুর প্রতি শব্দে ধ্বনিত হইতেছে।

জ্ঞানাঙ্কুর : বনফুল

তেরো বৎসর বয়সের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যাহাকিছু লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ছাপার অক্ষরে নিজনামে কোনো রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া এখন পর্যন্ত জানা যায় নাই। রবীন্দ্রনাথের তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের মধ্যে রচিত গ্রন্থ হইতেছে—বনফুল, কবিকাহিনী, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, শৈশবসঙ্গীত এবং বোধ হয় রুদ্রচণ্ড। ভানুসিংহের পদাবলী ব্যতীত আর গ্রন্থগুলি একবারমাত্র লোকসমক্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ কোনোটিকে সাহিত্যদরবারে দ্বিতীয়বার প্রবেশ করিতে দেন নাই।

এই কাব্য ও কাব্যনাট্যগুলি কবির তৎকালোচিত বয়সের এবং তাৎকালীন বঙ্গসাহিত্যের মানসূচির উপযুক্ত বলিয়া আমরা বিবেচনা করি, তাহার অধিক স্থান দিই না। সেগুলিকে সাহিত্যক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করা বৃথা, একথা কবি স্বয়ং ভালো করিয়াই জানিতেন এবং সেইজন্য বারে বারে নানা বয়সে নিজ কাব্য সম্পাদন কালে নির্মমভাবে পরিবর্জন ও পরিবর্তন করিয়াছেন। তাঁহার তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের মধ্যে রচিত কবিতা 'শৈশব সঙ্গীত' গ্রন্থে সংগৃহীত হয়, কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ নহে। তিনি সেখানেও কঠোরভাবে নির্বাচননীতি অনুসরণ করিয়া ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন যে, 'যাহার বিশেষ কিছু-না-কিছু গুণ না দেখিতে' পাইয়াছিলেন, তাহা কাব্যমধ্যে সংগৃহীত হয় নাই; তখন কবির বয়স বাইশ বৎসর।

কিন্তু কবির সাহিত্যবিচারের মানসূচিতে সে-সংগ্রহও টিকিল না। ১৩০৩ সালে প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থাবলীতে কৈশোরক অংশে বনফুল, কবিকাহিনী, রুদ্রচণ্ড, ভগ্নহৃদয় ও শৈশব সঙ্গীত হইতে নির্বাচিত অংশসমূহ সন্নিবেশিত হইল, সম্পূর্ণ গ্রন্থ হিসাবে কোনোটিই স্থান পাইল না। ১৩১০ সালে মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থে কৈশোরকের অতি সামান্য অংশ 'যাত্রা' খণ্ডে স্থান লাভ করে। অতঃপর ১৩২১ সালে তাঁহার কাব্যগ্রন্থের শোভন সংস্করণ প্রকাশ কালে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'কে তাঁহার আদি গ্রন্থরূপে স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু মনের দ্বিধা তখনো ঘুচিল না, তাহা ঐ সংস্করণের ভূমিকা পাঠ করিলেই জানা যায়। ১৩৩৮ সালে যখন কবি স্বয়ং তাঁহার নিজ কাব্যের 'সঞ্চয়িতা' নামে একটি চয়নিকা প্রকাশ করিলেন, তখন তিনি স্পষ্টভাবেই তাঁহার পুরাতন কাব্যগুলিকে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন বলিয়া কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন; সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত, ছবি ও গানকে তিনি অত্যন্ত অপরিণত সাহিত্য বলিয়া

১ পুরুবিক্রম নাটকের ১ম সংস্করণে (১৮৭৪ জুলাই) এই গানটি নাই।

২ স্নেহলতা, ভারতী ও বালক ১২৯৬ কার্তিক পৃ ১৬১। অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাকে এইটি দেখাইয়া দেন।

সঞ্চয়িতা হইতে বাদ দিতে পারিলে খুশি হইতেন—কেবল সঞ্চয়নের অসম্পূর্ণতার অভিযোগ হইতে মুক্তিলাভের জন্য কয়েকটি কবিতার অংশমাত্র উদ্ধৃত করিয়া পার্শ্বচরদের ক্ষুব্ধচিত্তকে শান্ত করেন। এই কাব্যগুলি এখনো যে গ্রন্থ আকারে চলিতেছে, তাহা কবির ভাষায় 'কালাতিক্রমণ দোষ'। (সঞ্চয়িতার ভূমিকা)

বাল্য, কৈশোর ও অপরিণত যৌবনের রচনাসমূহ মুদ্রণযন্ত্রের কৃপায় চিরস্থায়ী হইয়া থাকে ইহা সাহিত্যিকদের দুর্ভাগ্য। কবির অপরিণত বয়সের কবিতা ও গান লইয়া তাঁহাকে প্রৌঢ় বয়সে লজ্জিত করিবার চেষ্টা আধুনিক যুগের সমালোচনা-সাহিত্য খুঁজিলে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "মনে আছে, কোনো এক প্রবন্ধে আমার গানের সমালোচনায় এমন-সকল গানকে আমার কবিত্বের পঙ্গুতার দৃষ্টান্তস্বরূপে লেখক উদ্ধৃত করেছিলেন যেগুলি ছাপার বইয়ে প্রশ্রয় পেয়ে আমাকে অনেক দিন থেকে লজ্জা দিয়ে এসেছে। সেগুলি অপরিণত মনের প্রকাশ অপরিণত ভাষায়।" (সঞ্চয়িতার ভূমিকা)

বিশ্বভারতী হইতে কবির এইসব অচলিত গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা হইলে কবি একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে 'সমগ্র গ্রন্থাবলী বলতে বোঝায় অনেকখানি অংশ যা প্রাগৈতিহাসিক; যার সঙ্গে আমার সাহিত্য-ইতিহাসের দূরবর্তী যোগ আছে কিন্তু চলতি কারবার বন্ধ হয়ে গেছে।'[১] এটি সাহিত্যিকের সত্য দৃষ্টিভঙ্গি; কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকগণ তাহাতে তৃপ্ত নহেন। সেইজন্য কবি তাঁহাদের উদ্দেশে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিলাম: "ইতিহাসের সম্বল আর কাব্যের সম্পত্তি একজাতের নয়।…ইতিহাস সবই মনে রাখতে চায় কিন্তু সাহিত্য অনেক ভোলে। ছাপাখানা ঐতিহাসিকের সহায়। সাহিত্যের মধ্যে আছে বাছাইকরার ধর্ম, ছাপাখানা তার প্রবল বাধা।" যেসব কাব্যের মধ্যে পরিণতি ঘটে নাই সে-সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "তারা কোনো এক সময়ে দেখা দিয়েছিল বলেই যে ইতিহাসের খাতিরে তাদের অধিকার স্বীকার করতে হবে একথা শ্রদ্ধেয় নয়; সেগুলোকে চোখের আড়াল করে রাখতে পারলেই সমস্তগুলোর সম্মান থাকে।"[২] এই কথাটাই কবি জীবনসায়াহ্নে রহস্যচ্ছলে বলিয়াছিলেন 'অবর্জিত'[৩] নামে কবিতায়।

লিখিতে লিখিতে কেবলি গিয়েছি ছেপে
সময় রাখিনি ওজন দেখিতে মেপে,
　　কীর্তি এবং কুকীর্তি গেছে মিশে।
ছাপার কালিতে অস্থায়ী হয় স্থায়ী,
এ অপরাধের জন্য যে জন দায়ী
　　তার বোঝা আজ লঘু করা যায় কিসে।
…
সৃষ্টির কাজ লুপ্তির সাথে চলে,
ছাপাযন্ত্রের ষড়যন্ত্রের বলে
　　এ বিধান যদি পদে পদে পায় বাধা

জীর্ণ ছিন্ন মলিনের সাথে গোঁজা
কৃপণ পাড়ার রাশীকৃত নিয়ে বোঝা
　　সাহিত্য হবে শুধু কি ধোবার গাধা।
যাহা কিছু লেখে সেরা নাহি হয় সবি,
তা নিয়ে লজ্জা না করুক কোনো কবি,
　　প্রকৃতির কাজে কত হয় ভুলচুক;
কিন্তু হেয় যা শ্রেয়ের কোঠায় ফেলে
তারেও রক্ষা করিবার ভূতে পেলে
　　কালের সভায় কেমনে দেখাবে মুখ।

কিন্তু জীবনীলেখক হিসাবে আমাদের মত অন্যরূপ; সাহিত্য সৃষ্টির এই অরুণ যুগকে রবীন্দ্র-কাব্যজিজ্ঞাসা হইতে বর্জন করিবার অধিকার আমাদের নাই। রবীন্দ্র-প্রতিভা উন্মেষের সূচনা হয় এই যুগেই; প্রতিভার দীপ্তি এই বালক বয়সে কী উজ্জ্বল, তাহা কাব্যালোচনা কালেই পরিস্ফুট হইবে। এখানে এইমাত্র বলিতে পারি যে, সে-সময়ে এমন কোনো

১ রবীন্দ্র রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ ১ম খণ্ড। নিবেদন। ২ ঐ, ভূমিকা।
৩ ১৯৩৫ জুন ৫, চন্দননগর। নবজাতক।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ছিলেন না, যিনি বালক রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে তাচ্ছিল্য করিতে পারিতেন,—অবশ্য অরসিকের দল চিরদিনই ব্যঙ্গজীবী।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনা চিরদিনই সাময়িকপত্রিকা আশ্রয় করিয়া সার্থক হইয়াছে। অন্তরের ভাবনাকে ভাষায় মূর্তিদান করিবার প্রয়াস মানুষের অন্যতম আদিম ধর্ম। বহির্জগতের কাছে আত্মপ্রকাশের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইতেছে সাহিত্যসৃষ্টির মূল সূত্র। বালক কবির আত্মপ্রকাশের সুযোগ মিলিল— 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব'[১] নামে এক ক্ষুদ্র মাসিকপত্রের আনুকূল্যে। কবি লিখিয়াছেন, "কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অঙ্কুরোদ্গত কবিও কাগজের কর্তৃপক্ষেরা সংগ্রহ করিলেন। আমার সমস্ত পদ্যপ্রলাপ নির্বিচারে তাঁহারা বাহির করিতে শুরু করিয়াছিলেন।" 'জ্ঞানাঙ্কুর' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে মন্তব্য করিয়াছেন, পত্রিকাখানি সেরূপ অকিঞ্চিৎকর ছিল না বলিয়া আমাদের ধারণা। রবীন্দ্রনাথের 'বনফুল' কাব্য যে-মাসে প্রথম বাহির হইল, সে-মাসের লেখকশ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই বাংলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক,—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কালীবর বেদান্তবাগীশ, রজনীকান্ত গুপ্ত, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন, দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়। সুতরাং বালককবি বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সহিত এই পত্রিকামধ্যে একাসন লাভ করিয়াছিলেন।

জ্ঞানাঙ্কুরে যখন 'বনফুল' প্রকাশিত হইল, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স তেরো বৎসর সাতমাস। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ কবিকে এই কাব্যখানির রচনাকাল সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি নাকি বলিয়াছিলেন, 'বেশ কিছুদিন আগে।'[২] জীবনস্মৃতির প্রথম খসড়ায় আছে যে পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া বনফুল রচনা করেন।[৩] সুতরাং রচনাকালে কবির বয়স তেরো বৎসরের বেশি ছিল না। বৎসর তিনচারি পরে "দাদা সোমেন্দ্রনাথের অন্ধ পক্ষপাতিত্বের উৎসাহে" উহা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়।[৪]

'বনফুল' আখ্যায়িকা কাব্য। বাংলাসাহিত্যে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীকে রোমান্টিক আখ্যায়িকা-কাব্য ও গাথা-কবিতার অন্যতম প্রবর্তক বলা যাইতে পারে। অক্ষয়চন্দ্রের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, প্রভৃতি গাথা-কবিতা বা আখ্যায়িকা-কাব্য রচনা করেন বলিয়া কাহারও কাহারও মত। রবীন্দ্রনাথের 'বনফুল' প্রভৃতি কাব্যের রচনারীতিতে বিহারীলালের প্রভাব স্পষ্ট নহে, অক্ষয়চন্দ্রেরই প্রভাব আখ্যানবস্তুর পরিকল্পনায় জাজ্বল্যমান। জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিতে আছে, "ইহার সদ্য রচনাগুলি সর্বদাই পড়িয়া শুনিয়া আলোচনা করিয়া আমার তখনকার রচনারীতি

১ জ্ঞানাঙ্কুর/ সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদি সম্বন্ধীয়/ মাসিকপত্র ও সমালোচনা। রাজসাহী বোয়ালিয়া। / [১২৭৯ (১৮৭৩)] শ্রীকৃষ্ণদাস, সম্পাদক। ১২৮২ অগ্রহায়ণ মাস হইতে ৪র্থ বৎসর শুরু হয়। এই সংখ্যা হইতে "জ্ঞানাঙ্কুরের সহিত প্রতিবিম্ব মিলিত হইল। ইহার কার্যভার হস্তান্তরিত হইল।"...জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব (মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন) ১২৮২ ৪র্থ খণ্ড। কলিকাতা ৫৫ নং কলেজ স্ট্রীট...ক্যানিং লাইব্রেরী। শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। নূতন সংস্কৃতযন্ত্রে...মুদ্রিত। জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব ৪র্থ খণ্ড ১২৮২ অগ্রহায়ণ ১ম সংখ্যা পৃ ১৫-১৬, বনফুল, ১ম সর্গ। মাঘ ৩য় সংখ্যা পৃ ১৩৫-১৩৮, বনফুল ২য় সর্গ। ফাল্গুন ৪র্থ সংখ্যা, প্রলাপ (কবিতাগুচ্ছ)। চৈত্র ৫ম সংখ্যা পৃ ২২৮-২৩৪, বনফুল ৩য় সর্গ। ১২৮৩ বৈশাখ ৬ষ্ঠ সংখ্যা পৃ ২৭৮-২৮০, প্রলাপ। জ্যৈষ্ঠ ৭ম সংখ্যা পৃ ৩১৬-১৯, বনফুল কাব্য ৪র্থ সর্গ, ৫ম সর্গ।...শ্রাবণ ৯ম সংখ্যা পৃ ৪২০-২৫, বনফুল ৬ষ্ঠ সর্গ।...ভাদ্র ১০ম সংখ্যা পৃ ৪৫৭-৪৬১, বনফুল ৭ম সর্গ।...আশ্বিন-কার্তিক ১১শ-১২শ সংখ্যা পৃ ৫৪৩-৫০। ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী। [লেখকের নাম নাই] পৃ ৫৬৭-৭১। বনফুল ৮ম সর্গ।

২ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ : রবীন্দ্র-পরিচয়, প্রবাসী ১৩২৮, ২য় খণ্ড পৃ ৫৯৪।

৩ জীবনস্মৃতি, ১৩৫০ সংস্করণ, পৃ ৮৪ পাদটীকা।

৪ বনফুল (কাব্যোপন্যাস), অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈঃ।...গুপ্তপ্রেস, ২২১, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা ১২৮৬ সাল, [পৃ ৯৮] দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ ১ম খণ্ড পৃ ৪৭-১১৬। দ্র. প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ : রবীন্দ্র-পরিচয়, প্রবাসী ১৩২৮ ফাল্গুন ও চৈত্র।

লক্ষ্যে অলক্ষ্যে ইহার লেখার অনুসরণ করিয়াছিল।"[১] অক্ষয়চন্দ্রের 'উদাসিনী' কাব্য এককালে বালক রবীন্দ্রনাথ, যুবক নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবিকে যে নূতন প্রেরণা দিয়াছিল সেকথা আজ বিস্মৃত হইলে চলিবে না। 'উদাসিনী'র পংক্তি পর্যন্ত বনফুলের মধ্যে উদ্ধৃত দেখা যায়; তাছাড়া imageryর মধ্যে বহুল পরিমাণে সাদৃশ্য আছে। যে 'উদাসিনী' কাব্য সেযুগের আখ্যায়িকা-কাব্যের আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল, তাহা ইংরেজ কবি টমাস পার্নেলের (১৬৭৯-১৭১৮) 'হার্মিট' কাব্যের ছায়াবলম্বনে রচিত। সেযুগের বহু কবির কাব্যপ্রেরণার উৎস ছিল ইংরেজি কাব্য, ইংরেজি আদর্শ। 'বনফুল' সেই আদর্শে গড়া, উহার নায়ক-নায়িকাদের প্রেমকাহিনীর পটভূমি পাশ্চাত্ত্য সমাজ।

'বনফুল' কাব্য আটসর্গে বিভক্ত; প্রথম, দ্বিতীয়, সপ্তম ও অষ্টম সর্গের বিশেষ নাম আছে, অবশিষ্টের নাম নাই। রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত-সংগ্রহে পুনর্মুদ্রিত হইবার পূর্বে ইহার আর কোনো সংস্করণ ছাপা হয় নাই; ইহার কোনো অংশ কাব্যগ্রন্থের কোনো সংস্করণে স্থান পায় নাই। এই কাব্যোপন্যাসের গল্পাংশ সংক্ষেপে এই :

কমলা শিশুকাল হইতে নির্জন কুটিরে পালিত, শৈশবে মায়ের মৃত্যুর পর সে তাহার পিতা ছাড়া আর কোনো মানুষ দেখে নাই। বিজন কাননের তরুলতা পশুপক্ষীর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। বালক কবি বিজন কুটিরের বর্ণনা দিতেছেন :

চৌদিকে মানব-বাস নাহিক কোথায়
নাহি জন-কোলাহল, গভীর বিজন-স্থল
শান্তির ছায়ায় যেন নীরবে ঘুমায়!
কুসুম-ভূষিত-বেশে, কুটীরের শিরোদেশে
শোভিছে লতিকা-মালা প্রসারিয়া কর,
কুসুমস্তবক রাশি, দুয়ার উপরে আসি
উঁকি মারিতেছে যেন কুটীর ভিতর!
কুটীরের এক পাশে, শাখা-দীপ ধূমশ্বাসে
স্তিমিত আলোক শিখা করিছে বিস্তার।
অস্পষ্ট আলোক তায় আঁধার মিশিয়া যায়
ম্লান ভাব ধরিয়াছে গৃহ-ঘর দ্বার!
গভীর নীরব ঘর, শিহরে যে কলেবর!
হৃদয়ে রুধিরোচ্ছ্বাস স্তব্ধ হয়ে রয়—[২]
বিষাদের অন্ধকারে, গভীর শোকের ভারে,
গভীর নীরব গৃহ অন্ধকারময়![৩]

কমলা যখন ষোড়শী বালিকা তখন তাহার পিতার মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় সর্গে রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। পথভ্রান্ত পথিক বিজয় আসিয়া দুয়ারে আঘাত করিতেছে। দ্বার খুলিয়া ভিতরে আসিয়া বিজয় দেখে কমলা অচেতন; সে নিকটের নদী হইতে জল আনিয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিল। কমলা পিতা ছাড়া অন্য কোনো মনুষ্য দেখে নাই।

মেলিয়া নয়ন পুটে, বালিকা চমকি উঠে
একদৃষ্টে পথিকেরে করে নিরীক্ষণ
পিতামাতা ছাড়া কারে, মানুষ দেখে নি হা রে
বিস্ময়ে পথিকে তাই করিছে লোকন!
আঁচল গিয়াছে খ'সে, অবাক্ রয়েছে ব'সে
বিস্ফারি পথিক পানে যুগল নয়ন![৪]

বিজয় বৃদ্ধের মৃতদেহ তুষারের মধ্যে রাখিয়া আসিল। তারপর বনভূমি হইতে কমলার বিদায়দৃশ্য; এস্থানে শকুন্তলার কথা মনে পড়ে; বনভূমি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার সময়ে শকুন্তলার মতো কমলাও তাহার হরিণ ও পাখির নিকট বিদায় লইল।

১ জীবনস্মৃতি ১৩৫০ সংস্করণ। পৃ ৮০ পাদটীকা হইতে উদ্ধৃত।

২ অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'উদাসিনী' কাব্য হইতে গৃহীত পংক্তির সহিত তুলনীয় :

একিরে অদ্ভুত সৃষ্টি ! দেখে লাগে ভয়, হৃদয়ে শোণিতস্রোত স্তব্ধ হয়ে রয়।

৩ বনফুল, ১ম সর্গ। জ্ঞানাঙ্কুর ১২৮২ অগ্রহায়ণ। পৃ ৩৫-৩৬। ঐ গ্রন্থ পৃ ৩-৪। র-র-অচলিত সংগ্রহ ১ম খণ্ড পৃ ৫২-৫৩।

৪ র. র, অচলিত সংগ্রহ ১ম খণ্ড পৃ ৬০।

তৃতীয় সর্গে কমলা লোকালয়ে আসিয়াছে। বিজয়ের এক সখী তাহাকে নানাপ্রকারে ভুলাইয়া, সান্ত্বনা দিয়া সুখী করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কমলার হৃদয় ভারাক্রান্ত ; সে কিছুতেই তাহার সেই বন, গিরি, নদী, তাহার হরিণ, পাখির কথা ভুলিতে পারিতেছে না।

লভেছি জনম, করিতে রোদন
রোদন করিব জীবন ভোরে!
ভুলিব সে বন?—ভুলিব সে গিরি?
সুখের আলয় পাতার কুঁড়ে?
মৃগে যাব ভুলে—কোলে লয়ে তুলে
কচি কচি পাতা দিতাম ছিঁড়ে।

হরিণের ছানা একত্রে দুজনা
খেলিয়ে খেলিয়ে বেড়াত সুখে!
শিঙ ধরি ধরি খেলা করি করি
আঁচল জড়িয়ে দিতাম মুখে![১]

কমলা কখনো মানবসমাজের সংস্পর্শে আসে নাই, তাই মানুষের প্রতি তাহার টান কম। ক্রমে বিজয় কমলাকে বিবাহ করিল ; কিন্তু কমলা সংসারের কিছুই বোঝে না, সে ভালোবাসিল বিজয়ের বন্ধু নীরদকে। বালক-কবি বালিকার মুখ দিয়া বলাইতেছেন।

জেনেছি মানুষ কাহারে বলে!
জেনেছি হৃদয় কাহারে বলে!

জেনেছি রে হায় ভাল বাসিলে
কেমন আগুনে হৃদয় জ্বলে![২]

কমলা ও সখী নীরজা বাগানে বেড়াইতেছে, এমন সময়ে দূরে নীরদ গান করিল :

কি জানি লো বালা! কিসের তরে
হৃদয় আজিকে কাঁদিয়া উঠে!
কি জানি কি ভাব ভিতরে ভিতরে
জাগিয়া উঠেছে হৃদয় পুটে!
অফুট মধুর স্বপনে যেমন
জাগি উঠে হৃদে কি জানি কেমন
কি ভাব কে জানে কিসের লাগি!

বাঁশরীর ধ্বনি নিশীথে যেমন
সুধীরে গভীরে মোহিয়া শ্রবণ
জাগায় হৃদয়ে কি জানি কেমন
কি ভাব কে জানে কিসের লাগি।
দিয়াছে জাগায়ে ঘুমন্ত এ মনে
দিয়াছে জাগায়ে ঘুমন্ত স্মরণে
ঘুমন্ত পরাণ উঠেছে জাগি![৩]

কমলা মনের কথা লুকাইতে জানে না, নীরদকে সে তাহার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করিল।

চতুর্থ সর্গে কমলার সহিত নীরদের সাক্ষাৎ হইল। নীরদ কমলাকে ভালোবাসিয়াছে, কিন্তু বন্ধুর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিবে না বলিয়া কমলাকে অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করিল ; বলিল, বিজয় তাহার স্বামী, এখন অপর কাহারও কথা মনে করা পাপ। কিন্তু কমলা সেসব কথা কিছুই বুঝিতে পারে না।

"বিবাহ কাহারে বলে জানি না তা আমি"···
"কারে বলে পত্নী আর কারে বলে স্বামী,
কারে বলে ভালবাসা আজিও শিখি নি।
এই টুকু জানি শুধু এই টুকু জানি,
দেখিবারে আঁখি মোর ভাল বাসে যারে

শুনিতে বাসি গো ভাল যার সুধা বাণী—
শুনিব তাহার কথা দেখিব তাহারে!···
বিবাহ কাহারে বলে জানিতে চাহি না—
তাহারে বাসিব ভাল, ভাল বাসি যারে![৪]···"।

নীরদ তাহাকে ভর্ৎসনা করিল ও অশ্রু-সংবরণ করিয়া সেস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, কমলা বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ক্রমেই সংসারের জটিলতা ঘনাইয়া উঠিতেছে। সখী নীরজা বিজয়কে ভালোবাসে, কিন্তু সেকথা বিজয় জানে না

১ র. র. অচলিত সংগ্রহ ১ম খণ্ড পৃ ৬৭। ২ ঐ পৃ ৭০। ৩ ঐ পৃ ৭৪। ৪ ঐ পৃ ৮২।

এবং নীরজাও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না, কারণ সে জানে বিজয় কমলাকে বিবাহ করিয়াছে। এদিকে বিজয় বন্ধু নীরদের উপর সন্দিহান হইয়া গোপনে তাহাকে হত্যা করিল; কমলা নীরদের মৃত্যুশয্যার পাশে নীরবে বসিয়া থাকিল। মৃত্যুকালে নীরদ বলিয়া গেল— 'একদিন অশ্রু-জল ফেলিবে বিজয় একদিন অভিশাপ দিবে ছুরিকায়।' নীরদের মৃত্যুর পর কমলা লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইল; পুরাতন আরণ্য কুটিরে ফিরিয়া গেল বটে, কিন্তু সে অরণ্যে আশ্রয় পাইল না; শিশুকালের স্বর্গ আজ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহা আজ অসম্পূর্ণ মনে হইল। বনভূমির এই কঠিন নিদারুণ প্রত্যাখ্যান বেদনা-কাতর কমলার পক্ষে কী সাঙ্ঘাতিক সকরুণ। বনফুলের 'ট্রাজেডি' এইখানে চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে।

তেরো বৎসরের বালককবি যে এই আখ্যায়িকাটি নির্বাচন করিয়াছিলেন, ইহা আমরা একটি আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে করি না। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সুগভীর সম্বন্ধ রবীন্দ্রসাহিত্যে নানাস্থানে ঘটিয়া উঠিয়াছে। তপোবনকে আশ্রয় করিয়া মানুষ ও প্রকৃতির সম্মিলন যে এই ভারতবর্ষেই একদিন চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছিল একথা কবির মনকে চিরদিন নাড়া দিয়াছে। বাল্যকালেও কাব্যের বিষয় নির্বাচন করিবার সময়ে তিনি প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই।

জ্ঞানাঙ্কুরে প্রকাশিত কবিতা যাহাকে কবি তাঁহার জীবনস্মৃতিতে পদ্যপ্রলাপ আখ্যাদান করিয়াছেন, তাহা সত্যই 'প্রলাপ' নামে কবিতাগুচ্ছ। বালককবির কল্পনাশক্তি ও রচনাভঙ্গির নিদর্শনস্বরূপ নিম্নে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করা হইতেছে:[১]

আয় কল্পনা মিলিয়া দুজনা
ভূধরে কাননে বেড়াব ছুটি।
সরসী হইতে তুলিয়া কমল
লতিকা হইতে কুসুম লুটি।
দেখিব উষার পূরব গগনে,
মেঘের কোলেতে সোনার ছটা।
তুষার দর্পণে দেখিছে আনন
সাঁঝের লোহিত জলদ ঘটা॥

ঝর ঝর ঝর নদী যায় চলে,
ঝুরু ঝুরু ঝুরু বহিছে বায়।
চপল নির্ঝর ঠেলিয়া পাথর
ছুটিয়া-নাচিয়া-বহিয়া যায়।
বসিব দুজনে—গাইব দুজনে,
হৃদয় খুলিয়া, হৃদয় ব্যথা;
তটিনী শুনিবে, ভূধর শুনিবে
জগৎ শুনিবে সেসব কথা।

বোধ হয় আরো কিছুদিন পরে লিখিত:

ঢাল্ ঢাল্ চাঁদ! আরো আরো ঢাল্!
স্বনীল আকাশে রজত ধারা।
হৃদয় আজিকে উঠেছে মাতিয়া
পরাণ হয়েছে পাগলপারা।

গাইব রে আজ হৃদয় খুলিয়া
জাগিয়া উঠিবে নীরব রাতি।
দেখাব জগতে হৃদয় খুলিয়া
পরাণ আজিকে উঠেছে মাতি।

বালক কবির অন্তরের জ্বালার কথাও এই প্রলাপগুচ্ছে প্রকাশ পাইয়াছে:

আয়লো প্রমদা! নিঠুর ললনে
বার বার বলি কি আর বলি!

মরমের তলে লেগেছে আঘাত
হৃদয় পরাণ উঠেছে জ্বলি।

ইংরেজিতে যাহাকে বলে precocious child তাহা না হইলে তেরো বৎসরের বালকের পক্ষে এই স্তবকটি লেখা সম্ভব

১ জ্ঞানাঙ্কুর ১২৮২ অগ্রহায়ণ পৃ ১৬-১৭। দ্র. শনিবারের চিঠি ১৩৪৬ কার্তিক পৃ ১৫১।

নহে। বালকহৃদয় হইলেও বালকোচিত হৃদয়াবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রের অভাব ছিল না, এবং সেইসব fancyকে ঘিরিয়া বিচিত্র অনুভূতি বা অনুভূতির ভান করিয়া কবিতা লেখা এই অসাধারণ বালকের পক্ষে আশ্চর্য নহে।

'বনফুল' ও 'প্রলাপ' কবিতাগুচ্ছের সমকালে রচিত কতকগুলি কবিতা আছে 'শৈশব সঙ্গীতে'র (১২৯১) মধ্যে। কিন্তু কোন্‌টি এই সময়ের রচনা তাহার কোনো নির্দেশ নাই। চারিটি ছাড়া শৈশব সঙ্গীতের কবিতাগুলি সবই ভারতীতে (১২৮৪ হইতে ১২৮৭) প্রকাশিত হয়; সেগুলি পুরাতন রচনা না সমসাময়িক রচনা, তাহা জানিবার উপায় না থাকায় আমরা ঐ কবিতাসঞ্চয়নের মধ্যে কবির বনফুলের সমকালীন রচনা সন্ধানে নিবৃত্ত হইলাম।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম যে-গদ্যপ্রবন্ধ লেখেন তাহাও এই জ্ঞানাঙ্কুরে বাহির হয়; সেটি গ্রন্থসমালোচনা বা ক্রিটিসিজম (১২৮৩ কার্তিক)। প্রবন্ধটির নাম 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী।' তিনখানিই কবিতা-গ্রন্থ— প্রথমখানির রচয়িতা নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়[1], 'অবসরসরোজিনী'র কবি রাজকৃষ্ণ রায়[2] ও 'দুঃখসঙ্গিনী'র লেখক হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী[3]। 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' কাব্যের লেখককে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে অমর করিয়া গিয়াছেন। জীবনস্মৃতির পাঠকরা অবগত আছেন 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র লেখিকাকে (?) লইয়া যখন খুবই গবেষণা চলিতেছে, তখন বালককবির সন্দেহ হয় যে ঐ কাব্যের রচয়িতা রমণী নহে। তাঁহার এক বন্ধু বোধ হয় প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, (যিনি পরে কবিকাহিনী প্রকাশ করেন) লেখিকার (?) নিজ হস্তে সহিকরা পত্র আনিয়া বালক কবিকে দেখাইতেন। কিন্তু ইহাতেও বালকের সন্দেহ নিরাকৃত হয় নাই। অতঃপর বালক 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'প্রমুখ কাব্যত্রয়ের সমালোচনা লিখিয়া জ্ঞানাঙ্কুরে প্রকাশ করিলেন।

এই প্রবন্ধে খুব ঘটা করিয়া খণ্ড-কাব্যেরই বা লক্ষণ কী, গীতিকাব্যেরই বা লক্ষণ কী তাহা অপূর্ব বিচক্ষণতার সহিত বালক আলোচনা করিয়া মত দেন যে আলোচ্য কাব্যগুলির মধ্যে গীতিকাব্যের ধর্ম নাই। বাংলাগদ্যের নমুনাস্বরূপ আমরা নিম্নে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম:— "মহাকাব্য আমরা পরের জন্য রচনা করি এবং গীতিকাব্য আমরা নিজের জন্য রচনা করি। যখন প্রেম, করুণা, ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তিসকল হৃদয়ের গূঢ় উৎস হইতে উৎসারিত হয়, তখন

১ 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' (১৮৭৫) কাব্যের লেখকের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া দরকার, কারণ রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে এই কাব্যখানিকে অমর করিয়া গিয়াছেন। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১২৬০-১৩২৯) ছিলেন বীরভূম জিলার কীর্ণাহারের অধিবাসী; পেটেণ্ট ঔষধ প্রস্তুত করিয়া অর্থ ও খ্যাতি অর্জন করেন। এতদ্‌কালে নবীনবাবুর লৌহসার ছিল 'ডি. গুপ্তের'ই সমতুল্য খ্যাত ম্যালেরিয়ানাশক ঔষধ। সাহিত্যক্ষেত্রেও তিনি একদা যশোলাভ করেন। নবীনচন্দ্রের অপর গ্রন্থ হইতেছে 'আর্যসঙ্গীত' (দ্রৌপদী-নিগ্রহ কাব্য ১৮৮০), 'আর্যসঙ্গীত' (জাতিনিগ্রহ কাব্য ১৯০২) সিন্ধুদূত (১৮৮৩)। এই শেষোক্ত কাব্য লইয়া রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় 'ভারতী'তে (১২৮৩) ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কবিতাগুলিকে ভুবনমোহিনী নামধারিণী কোনো মহিলার রচনা বলিয়া সাধারণের ধারণা জন্মাইয়া নবীনচন্দ্র বোধ হয় কৌতুক দেখিতেছিলেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষ 'বান্ধব' পত্রিকায় (১২৮২ ফাল্গুন) ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় এডুকেশন গেজেটে (১২৮২ চৈত্র ২৬) ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'সাধারণী' কাগজে এই মহিলা (?) কবির অভ্যুদয়কে প্রবল জয়বাদ্যের সহিত ঘোষণা করেন। আসল কথা 'বিনোদিনী' নামে এক মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী, রাধিকা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পত্নী। নবীনচন্দ্রই যথার্থ পত্রিকা পরিচালনা করিতেন; এবং তাঁহারই রচিত কবিতা 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' নামে প্রচারিত হওয়ায় সাহিত্যিক মহলে এই ধারণা জন্মে যে লেখক রমণী। দ্র. সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৪৪। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ১৩৫১ শ্রাবণ।

২ রাজকৃষ্ণ রায় (১২৬২-১৩০০) বাংলাসাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে যশ অর্জন করেন। তাঁহার রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে উপন্যাস হিরণ্ময়ী, কিরণ্ময়ী এককালে পাঠকদের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। তাঁহার বীণা থিয়েটার একসময়ে কলিকাতায় সুখ্যাত ছিল।

৩ হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী—'দুখসঙ্গিনী' (১৮৭৫), 'ভারতের সুখ' (১৮৭৫, প্রিন্‌স্ অব্ ওয়েল্‌সের ভারত আগমন উপলক্ষে রচিত কাব্য)। 'বিনোদমালা' (১২৮৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩০৫), 'মালতীমালা' (১৮৯৯), 'প্রীতি উপহার' ইত্যাদি রচয়িতা। 'দুখসঙ্গিনী' বঙ্গদর্শনে প্রশংসিত হইয়াছিল। (দ্র. সুকুমার সেন, বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড পৃ ৪৬২)।

আমরা হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া তাহা গীতিকাব্যরূপ স্রোতে ঢালিয়া দিই এবং আমাদের হৃদয়ের পবিত্র প্রস্রবণজাত সেই স্রোত হয়তো শত শত মনোভূমি উর্ব্বরা করিয়া পৃথিবীতে চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে। ইহা মরুভূমির দগ্ধ বালুকাও আর্দ্র করিতে পারে। ইহা শৈলক্ষেত্রের শিলারাশিও উর্ব্বরা করিতে পারে।"[১]

জ্ঞানাঙ্কুরে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে কবির এক বন্ধু [প্রবোধচন্দ্র ঘোষ ?] উত্তেজিত হইয়া আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দেন যে একজন বি. এ. তাঁহার সমালোচনার জবাব লিখিতেছেন। এই দুঃসংবাদে রবীন্দ্রনাথ কিরূপ অভিভূত হইয়াছিলেন, তাহা জীবনস্মৃতি-পাঠকদের নিকট অবিদিত নাই। সুখের বিষয় কোনো বি. এ. পাশ তাঁহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন নাই।

বালক কবির প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার' দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে উহা সাহিত্যিকদের দৃষ্টি তেমনভাবে আকর্ষণ হয়তো করে নাই। কিন্তু'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় মাসে মাসে 'বনফুল' কাব্য ও অন্যান্য রচনাবলী প্রকাশের প্রতিক্রিয়া যে অভিজাত সাহিত্যিক সমাজে কিছুই হয় নাই— একথা তো আমাদের মনে হয় না। দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে অনেকেই আসিতেন—তাঁহারা এই বালক কবির প্রতিভার কথা নিশ্চয়ই শুনিয়াছিলেন। সিপাহীবিদ্রোহের ইতিহাস-লেখক রজনীকান্ত গুপ্ত (১২৫৬—১৩০৭), দার্শনিক পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি জ্ঞানাঙ্কুরের লেখকরা নিশ্চয়ই জানিয়াছিলেন যে 'বনফুল' কাব্যরচয়িতা তাঁহাদের সহ-লেখক বালকটি কে। যুবক সাহিত্যিকরা এই সম্ভ্রান্ত সুদর্শন সুকণ্ঠ কবির সহিত পরিচিত হইবার জন্য নিশ্চয়ই আকাঙ্ক্ষা করিতেন। চন্দ্রনাথ বসু (১২৫১— ১৩১৭) ছিলেন সেযুগের ছাত্র ও তরুণসাহিত্যিক মহলের নেতৃস্থানীয়। সে সময়ে হিন্দুকলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের একটি বার্ষিক সভা বসিত। দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে[২] (১৮৭৬ জানুয়ারি) তিনিই উদ্যোগী হইয়া বালক রবীন্দ্রনাথকে সভায় লইয়া যান। চন্দ্রনাথের বয়স তখন একত্রিশ বৎসর, রবীন্দ্রনাথের বয়স প্রায় পনেরো, তখন তিনি সেণ্টজেভিয়ার্স স্কুলের নামে-মাত্র ছাত্র। কলেজ রি-ইউনিয়ন সভা হয় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'মরকত কুঞ্জে' (Emerald Bower)। রাজনারায়ণ বসু প্রধান উদ্যোক্তাদের অন্যতম; রবীন্দ্রনাথের উপর 'কি একটা' কবিতা পড়িবার ভার অর্পিত হইয়াছিল, নিশ্চয়ই অন্যের রচনা, নিজের কোনো রচনা হইলে স্মরণ থাকিত। এই সভাতে তিনি সর্বপ্রথম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে (বয়স ৩৮) দেখেন। বঙ্কিমের সেই স্মৃতি তাঁহার মনে চিরকাল অম্লান ছিল। এই অধিবেশনে তৎকালীন খ্যাতনামা কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ৩৮) 'সুহৃদ্‌-সমাগম' নামে কবিতা পাঠ করেন।[৩]

স্বাদেশিকতা : সঞ্জীবনীসভা

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন রাজনীতিক্ষেত্রে যুবক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে স্যর সুরেন্দ্রনাথ) ভারতীয় সিবিল সার্বিসের চাকুরি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন সৃষ্টিকল্পে দেশময় বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন ইতালির স্বাধীনতা মন্ত্রের গুরু মহাবিপ্লবী মাৎসিনির (১৮০৫-৭২) শিষ্য। আমাদের আলোচ্যপর্বে ইংরেজি ভাষায় মাৎসিনির রচনাবলী ও জীবনকাহিনী প্রকাশিত (১৮৬৪-৭০) হওয়ায় এতদ্দেশীয়

১ জ্ঞানাঙ্কুর ১২৮৩ কার্তিক পৃ ৫৪৩। দ্র. শনিবারের চিঠি ১৩৪৬ কার্তিক পৃ ১৫১।

২ দ্র. জীবনস্মৃতি ১৩৫০ সংস্করণ, পৃ ১৫৫ পাদটীকা।

৩ দ্র. বঙ্গদর্শন ১২৮২ অগ্রহায়ণ। মন্মথনাথ ঘোষ : হেমচন্দ্র ১ম খণ্ড পৃ ২৮২। শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ পৃ ৩২২। রাজনারায়ণ বসু : আত্মচরিত পৃ ২০৬-৭।

শিক্ষিত যুবকদের পক্ষে উহা পাঠ করা সহজসাধ্য হইল। সুরেন্দ্রনাথের অনুরোধে উদীয়মান সাহিত্যিক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহার নবপ্রকাশিত 'আর্য্যদর্শন' পত্রিকায় মাৎসিনির জীবনী ধারাবাহিক প্রকাশ করিলেন। মাৎসিনির অতুলনীয় দেশাত্মবোধ, আত্মত্যাগ, পরার্থপরতা ও মানবহিতৈষণা— যাহা তিনি তাঁহার Duties of Man নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন— তাহারই প্রতি বাঙালি যুবকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথের আহ্বান আসিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ মধ্য-ভিকটোরিয়া যুগের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় অনুপ্রেরিত ছিলেন, অন্তরে অন্তরে সংস্কারপন্থী, বিধিসংগত আন্দোলনে চরম বিশ্বাসী; অথচ মাৎসিনি ছিলেন বিপ্লবপন্থী। সুরেন্দ্রনাথ মাৎসিনির বিপ্লবাদর্শ গ্রহণ করিতে পারেন নাই[১], কিন্তু দেশমধ্যে মাৎসিনির জীবনের মূলসূত্র অনাবিষ্কৃত ও অননুসৃত থাকিল না। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার ইংরেজি আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, "সুরেন্দ্রনাথের ম্যাটসিনি সম্পর্কীয় বক্তৃতা থেকে প্রেরণা পেয়ে আমরাও ভারতের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠায় লেগে গেলাম।…আমি একটি সমিতির কথা জানি—যার সভ্যগণ তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা বক্ষঃস্থল ছিন্ন করে রক্ত বার করতেন ও সেই রক্তে অঙ্গীকার পত্রে নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করতেন।"[২]

মাৎসিনির বিপ্লবাত্মক গুপ্তসভার ক্ষীণ অনুকরণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথপ্রমুখ যুবকগণ ঠনঠনিয়ার এক পোড়ো বাড়িতে 'সঞ্জীবনী সভা' নামে এক গুপ্তসভা স্থাপন করিয়াছিলেন।[৩] তৎকালীন সর্বপ্রকার স্বাদেশিকতা, জাতীয়তা প্রভৃতি আন্দোলনের প্রধান পুরোহিত ছিলেন চিরতরুণ, চিরবৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু। সঞ্জীবনী সভার অধ্যক্ষও ছিলেন তিনি। 'জাতীয় হিতকর ও উন্নতিকর সমস্ত কার্যই এই সভায় অনুষ্ঠিত হইবে, ইহাই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যেদিন নূতন কোনো সভ্য এই সভায় দীক্ষিত হইতেন সেদিন অধ্যক্ষ মহাশয় লাল পট্টবস্ত্র পরিয়া সভায় আসিতেন। সভার নিয়মাবলী অনেকই ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান ছিল মন্ত্রগুপ্তি; অর্থাৎ এ-সভায় যাহা কথিত হইবে, যাহা কৃত হইবে এবং যাহা শ্রুত হইবে, তাহা অ-সভ্যদের নিকট কখনও প্রকাশ করিবার কাহারও অধিকার ছিল না।'

আদি ব্রাহ্মসমাজ-পুস্তকাগার হইতে লাল-রেশমে জড়ানো বেদমন্ত্রের একখানা পুঁথি এই সভায় আনিয়া রাখা হইয়াছিল। টেবিলের দুই পাশে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষুকোটরে দুইটি মোমবাতি বসানো ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত-ভারতের সাংকেতিক চিহ্ন। বাতি দুইটি জ্বালাইবার অর্থ এই যে, মৃত-ভারতে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এ ব্যাপারের ইহাই মূল কল্পনা। সভার প্রারম্ভে বেদমন্ত্র গীত হইত— সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্। সকলে সমস্বরে এই বেদমন্ত্র গান করার পর তবে সভার কার্য (অর্থাৎ কিনা গল্পগুজব) আরম্ভ হইত। কার্যবিবরণী জ্যোতিবাবুর উদ্‌ভাবিত এক গুপ্তভাষায় লিখিত হইত। এই গুপ্তভাষায় 'সঞ্জীবনী সভা'কে 'হাঞ্চু পামু হাফ' বলা হইত।[৪] রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন, "আমার মতো অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল। সেই সভায় আমরা এমন একটি খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে, অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া চলিতাম। লজ্জা ভয় সংকোচ আমাদের কিছুই ছিল না। এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো।"

১ মহাজাতি গঠন পথে…সুরেন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি (A Nation in Making) পৃ ৫০।

২ যোগেশচন্দ্র বাগল : মুক্তির সন্ধানে ভারত পৃ ১৩৩ হইতে উদ্ধৃত।

৩ মাৎসিনি যৌবনে ইতালির স্বাধীনতাকামী 'কার্বোনারি' (Carbonari) নামে গুপ্তসভার সদস্য হন। 'কার্বোনারি'র অর্থ 'কাঠপোড়ানি' (charcoal burners); ইহাদের মধ্যে কথাবার্তা চলিত সাংকেতিক ভাষায় (mystic religious language); অনুষ্ঠানাদি কাঠ-পোড়ানিদের ভাষা হইতে গৃহীত; সেইজন্য অদীক্ষিতদের পক্ষে তাহাদের কাজকর্ম ভাষা বুঝা শক্ত ছিল। ইতালির গুপ্তসভা কার্বোনারিদের অনুকরণে এই গুপ্তসভা গঠিত হয়।

৪ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি পৃ ১৬৬-৭।

সঞ্জীবনী সভা স্থাপন করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত ছিলেন না। বাঙালির মৃতকল্প প্রাণে জীবনীশক্তি দান করিবার জন্য তিনি যেসব চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা আজ সকলেই ভুলিয়া গিয়াছে। তাঁহার সার্বজনীন পোশাক, তাঁহার শিকার করা ও শিকার শেখানোর উদ্যম, তাঁহার তাঁত ও দেশলাই-এর কল করিবার জন্য প্রয়াস ও সর্বশেষে স্বদেশী স্টীমার কোম্পানি খুলিয়া দেউলিয়া হইয়া যাইবার কাহিনী আজ বিস্মৃত ইতিহাসের মধ্যে গিয়াছে; কিন্তু বাঙালির সকল প্রকার স্বাদেশিকতার মূলে এই মহাত্মার ব্যর্থ জীবনের কথা অমর হইয়া রহিয়াছে সেকথা ভুলিলে জাতীয় কৃতঘ্নতা হইবে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের কৈশোর কাটে।

এই সঞ্জীবনী সভার উত্তেজনায় মন যখন উদ্দীপ্ত তখন বালককবি লেখেন দিল্লিদরবার সংক্রান্ত কবিতা। জীবনস্মৃতিতে এই সম্বন্ধে পরে কবি লিখিয়াছিলেন: 'লর্ড কর্জনের সময় দিল্লিদরবার সম্বন্ধে একটা গদ্যপ্রবন্ধ [অত্যুক্তি] লিখিয়াছি— লর্ড লিটনের সময় লিখিয়াছিলাম পদ্যে, তখনকার ইংরেজ গবর্মেণ্ট রুসিয়াকেই ভয় করিত, কিন্তু চৌদ্দপনেরো বছর বয়সের বালক কবির লেখনীকে ভয় করিত না।" কবিতাটি কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। রচনাটির ভাবধারা কবির স্মরণে ছিল; প্রাচীনকালে ভারতের সম্রাটগণ রাজসূয়াদি যজ্ঞ সম্পন্ন করিতেন; সেসব উৎসবের দিনে ভারতের কী অবস্থা ছিল, আর আজ সেই দিল্লিতে কিসের উৎসব দেখিতে রাজন্যরা সমবেত হইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি বহু বৎসর পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' নাটকের মধ্য হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কবিতাটির ভাষা ও ভাবের উদাহরণরূপে আমরা কয়েকটি পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :

কিসের তরে গো ভারতের আজি, সহস্র হৃদয় উঠেছে বাজি?
যতদিন বিষ করিয়াছে পান, কিছুতে জাগেনি এ মহা-শ্মশান,
বন্ধন শৃঙ্খলে করিতে সম্মান ভারত জাগিয়া উঠেছে আজি?
কুমারিকা হতে হিমালয়-গিরি এক তারে কভু ছিল না গাঁথা,
আজিকে একটি চরণ আঘাতে, সমস্ত ভারত তুলেছে মাথা!

...

হারে হতভাগ্য ভারত-ভূমি, কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার
পরিবারে আজি করি অলঙ্কার গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে?
তাই কাঁপিতেছে তোর বক্ষ আজি মোগলরাজের বিজয় রবে?
মোগল বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক্ আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,
এস গো আমরা যে ক-জন আছি, আমরা ধরিব আরেক তান।[১]

এই কবিতাটি হিন্দু মেলার বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত হয়। কবি জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন, "সেটা পড়িয়াছিলাম হিন্দুমেলায় গাছের তলায় দাঁড়াইয়া। শ্রোতাদের মধ্যে নবীন সেন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। আমার বড়ো বয়সে তিনি একদিন একথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।"

কবি নবীনচন্দ্র তাঁহার আত্মজীবনীতে এই ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন; সমসাময়িকের বর্ণনা হিসাবে তাহার মূল্য আছে।

১ স্বপ্নময়ী, ১৮৮২। ৪র্থ অঙ্কের ৪র্থ গর্ভাঙ্কে শুভ সিংহের স্বগত কবিতা। রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়, পৃ ৬৬-৬৯।

তিনি লিখিয়াছেন, "স্মরণ হয় ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে আমি কলিকাতায় ছুটিতে থাকিবার সময়ে কলিকাতার উপনগরস্থ কোনো উদ্যানে 'নেশনাল মেলা' দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহার বৎসরেক পূর্বে আমার 'পলাশির যুদ্ধ' প্রকাশিত হইয়া কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। একজন সদ্যপরিচিত বন্ধু মেলার ভিড়ে আমাকে 'পাকড়াও' করিয়া বলিলেন যে একটি লোক আমার সঙ্গে পরিচিত হইতে চাহিতেছেন। তিনি আমার হাত ধরিয়া উদ্যানের এক কোণার এক প্রকাণ্ড বৃক্ষতলায় লইয়া গেলেন। দেখিলাম সেখানে সাদা ঢিলা ইজার চাপকান পরিহিত একটি সুন্দর নব-যুবক দাঁড়াইয়া আছেন। বয়স ১৮।১৯, [১৫] শান্ত স্থির। বৃক্ষতলায় যেন একটি স্বর্ণ-মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে। বন্ধু বলিলেন—'ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ।' তাঁহার জ্যেষ্ঠ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার সহপাঠী ছিলেন। দেখিলাম সেই রূপ, সেই পোশাক। সহাস্যমুখে করমর্দন কার্যটা শেষ হইলে, তিনি পকেট হইতে একটি 'নোটবুক' বাহির করিয়া কয়েকটি গীত গাহিলেন, ও কয়েকটি কবিতা গীতকণ্ঠে পাঠ করিলেন। মধুর কামিনী লাঞ্ছন-কণ্ঠে, এবং কবিতার মাধুর্যে ও স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভায় আমি মুগ্ধ হইলাম। তাহার দুই এক দিন পরে বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার চুঁচুড়ার বাড়িতে লইয়া গেলে আমি তাঁহাকে বলিলাম যে আমি 'নেশনাল মেলায়' গিয়া একটি অপূর্ব নব-যুবকের গীত ও কবিতা শুনিয়াছি, এবং আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে তিনি একদিন একজন প্রতিভাসম্পন্ন কবি ও গায়ক হইবেন। অক্ষয়বাবু বলিলেন— 'কে? রবি ঠাকুর বুঝি? ও ঠাকুরবাড়ির কাঁচামিঠা আঁব।' তাহার পর ১৬ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আজ ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দ। আমার ভবিষ্যৎবাণী সত্য হইয়াছে।"[১]

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি কেন কোনো সমসাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই এবং কেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'বৃটিশের' স্থলে 'মোগল' শব্দ বসাইয়া কবিতাটিকে স্বপ্নময়ী নাটকের মধ্যে প্রচ্ছন্ন করিলেন, সে সম্বন্ধে গবেষণা নিরর্থক নহে।

বড়লাট লর্ড লিটনের শাসন-পর্বটা (১৮৭৬ এপ্রিল— ১৮৮০ জুন) ভারতের স্বাদেশিকতার ইতিহাসে নানা দিক হইতে স্মরণীয়। তাহার ন্যায় রুক্ষ ইম্‌পিরিয়ালিস্ট— দাম্ভিক শাসক ইতিপূর্বে মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজপ্রতিনিধিতখত শোভিত করেন নাই। ভারতে আসিবার অল্পকাল পরেই মুগল বাদশাহদের কুশ্রী অনুকরণে দিল্লীতে এক দরবার আহ্বান করিলেন (১৮৭৭ জানুয়ারি ১)। ভারতব্যাপী তখন দুর্ভিক্ষ; সেই মহাশ্মশানের কোলে উৎসব আয়োজনটা অনেকেরই কাছে বিসদৃশ ঠেকিয়াছিল; কিন্তু কাহারও কোনো কথা কানে করিবার মতো বিনয় তাঁহার ছিল না।

সমসাময়িক দেশীয় পত্রিকাসমূহ কিছুকাল হইতে ইংরেজের রাজনীতি সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। দেশের বেদনা প্রকাশের জন্য সাময়িকপত্রিকাই ছিল আমাদের একমাত্র সম্বল। ভারতীয়দের এই ধৃষ্ট মুখরতাকে নীরব করিবার জন্য লিটনের ভার্নাকুলার প্রেস-অ্যাক্টের প্রবর্তন। এই আইনের কবলে পড়িয়া ভারতের বহু পত্রিকা লোপ পায়; বাংলাদেশে 'সোমপ্রকাশ' 'সাধারণী' ও 'নববিভাকর' রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা লোপের প্রতিবাদে কাগজ প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিল। দ্বিভাষী 'অমৃতবাজার পত্রিকা' বাংলা কলেবর সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া ইংরেজি সাপ্তাহিক রূপে বাহির হইল, কেবল পুরাতন বাংলা নামটা তাহার রহিয়া গেল; নূতন আইনের প্যাঁচে দেশীয় ভাষার পত্রিকা পড়িবে, ইংরেজি পত্রিকা পড়িবে না। রাজদ্রোহ আইন ইতিপূর্ব হইতেই ছিল; সেই আইন এড়াইবার জন্য কবি হেমচন্দ্র 'ভারত-সঙ্গীত'[২] কবিতাটি মধ্যযুগীয় মহারাষ্ট্রীয় যুবকের জবানীতে প্রকাশ করেন। কবি নবীনচন্দ্র তাঁহার 'পলাশির যুদ্ধে' (১৮৭৫) মোহনলাল, মীর মদন, রানী ভবানী প্রভৃতির মুখে দীর্ঘ উচ্ছ্বাসময়ী বাণী বসাইয়া

১ নবীনচন্দ্র সেন : আমার জীবন ৪র্থ ভাগ, পৃ ২৬৪।

২ ১৮৭০ অগস্ট ১, ১২৭৭ শ্রাবণ ১৭ তারিখের এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়।

আইনের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু নূতন প্রেস-আইন প্রবর্তিত সংক্রান্ত হইবার আয়োজনে সকলেই আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। আমাদের মনে হয় এই কারণে রবীন্দ্রনাথের দিল্লি-দরবার সংক্রান্ত কবিতাটি কোনো পত্রিকায় যথাযথভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই ; পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বপ্নময়ী (১৮৮২) নাটকের মধ্যে কবিতাটিকে সামান্য অদল বদল করিয়া সন্নিবেশিত করেন।

ভারতী পত্রিকা

জীবনের প্রথম প্রত্যুষে রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁহার পত্নী কাদম্বরী দেবীর নিকট হইতে যে অযাচিত প্রেম ও প্রশ্রয় পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কাব্যজীবন গঠনের কতখানি সহায় তাহার যথোপযুক্ত বিচার এখনো হয় নাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন ঠাকুরপরিবারের জ্যোতিঃস্বরূপ, সর্ব কর্ম সর্ব আন্দোলনের কেন্দ্র। বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা ও চর্চায় ইঁহার আনন্দ ছিল অপরিসীম, উৎসাহ ছিল অদম্য, সাহস ছিল দুর্জয়। কিন্তু কখনো কোনো বিষয় শ্রমসহকারে অনুশীলনের দ্বারা আয়ত্ত করেন নাই, কেবল সহজ-প্রতিভার দীপ্তিতে সকল বিষয় দেখিতেন বলিয়া কোনোটিই স্থায়ী ফলপ্রদ হয় নাই। চিত্রে সংগীতে নাট্যে ভাষা-শিক্ষায় ব্যবসায়ে স্বাদেশিকতায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভা ব্যাপ্ত ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বহুমুখীনতা রবীন্দ্রনাথের জীবনে গভীরভাবে প্রতিফলিত ও সুন্দররূপে সার্থক হইয়াছিল। এই জ্যেষ্ঠ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনসন্ধ্যায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই বোধ হয় কৃতজ্ঞতার চরম স্বীকৃতি : "পিতৃদেব ছিলেন হিমালয়ে, বাড়িতে দাদারা ছিলেন কর্তৃপক্ষ। জ্যোতিদাদা, যাঁকে আমি সকলের চেয়ে মানতুম, বাইরে থেকে তিনি আমাকে কোনো বাঁধন পরাননি। তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি বয়স্যের মতো। তিনি বালককেও শ্রদ্ধা করতে জানতেন। আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার চিত্তবিকাশের সহায়তা করেছেন। তিনি আমার 'পরে কর্তৃত্ব করবার ঔৎসুক্যে যদি দৌরাত্ম্য করতেন তাহলে ভেঙেচুরে তেড়েবেঁকে যা-হয় একটা কিছু হতুম, সেটা হয়তো ভদ্রসমাজের সন্তোষজনকও হোত, কিন্তু আমার মতো একেবারেই হোত না।"[১] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সুপ্ত শক্তির সন্ধান আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিলে বেশি বলা হইবে না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে এই ভাবপ্রবণ বালককে সেণ্টজেভিয়ার্স স্কুলের পাঠ্য বইয়ের খোঁটায় বাঁধিয়া পীড়ন করা নিরর্থক। তাই তাহার সাহিত্যশিক্ষায়, ভাবচর্চায় তিনিই হইলেন প্রধান সহায়। তাঁহার সংস্রবে রবীন্দ্রনাথের ভিতরকার সংকোচ ঘুচিয়া গেল। নূতন বৌঠানও দেবরের কাব্যজীবনের ভাবধারা উন্মোচনে সোনার কাঠির স্পর্শ দিলেন স্নেহের দ্বারা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহিত্যমজলিসের মধ্যমণি ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। ইনি ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহপাঠি ও প্রায়-সমবয়সী বন্ধু, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ হইতে এগারো-বারো বৎসরের বড়ো। প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজ অধ্যাপকের নিকট ইংরেজি সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াও বাংলা সাহিত্যের রসগ্রহণে তাঁহার বাধা ছিল না আদৌ। তাঁহার অসামান্য রসানুভূতির শক্তিবলে তিনি রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে কাব্যবিচারের একটি সুষ্ঠু মানসূচী ধরিয়াছিলেন। সেযুগের ইংরেজি সাহিত্য শিক্ষার তীব্র উত্তেজনাকে তিনিই রবীন্দ্রনাথের কাছে মূর্তিমান করিয়া তোলেন, এবং বোধ হয় তাঁহারই প্রেরণায় সেযুগের পক্ষে আধুনিক ইংরেজ কবিদের কতকগুলি কবিতা বাংলা ছন্দে ও ভাষায় অনুবাদ করিতে সমর্থ হন। ইঁহারই কাছে রবীন্দ্রনাথ কবি মূরের Irish Melodies ও বালককবি চ্যাটার্টন সম্বন্ধে তথ্য অবগত হন।

১ রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পরিপূর্তি উপলক্ষে যে জয়ন্তী হয়, তাহাতে ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দনের প্রতিভাষণ। প্রবাসী ১৩৩৮ মাঘ পৃ ৫১১। দ্র. আত্মপরিচয় পৃ ৮৯।

ইঁহারই রচিত 'উদাসিনী' কাব্য সেযুগের গাথা কাব্যের রোমাণ্টিসিজ্‌ম্‌ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে এবং রবীন্দ্রনাথ ঐ কাব্য হইতে সবিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার প্রথম কাব্য বনফুল হইতেই জানা যায়।

অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ি হইতে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তখন বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-পত্রিকা খুব বেশি ছিল না। বঙ্গদর্শন বাংলাভাষায় সাহিত্য-পত্রিকার একটি সুসংগত আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল; কিন্তু মাত্র চারি বৎসর চলিয়া (১২৭৯-১২৮২) উহা বন্ধ হইয়া যায়। এক বৎসর পরে ১২৮৪ সালের প্রথম হইতে উহা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে পুনর্প্রকাশিত হয়। অন্য দুইখানি পত্রিকা হইতেছে যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আর্য্যদর্শন' ও কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'বান্ধব', উভয়ই ১২৮১ সালে প্রকাশিত হয়। 'বান্ধব' ঢাকার কাগজ। সুতরাং কলিকাতায় বঙ্গদর্শন ও আর্য্যদর্শন ব্যতীত নামকরা সাহিত্যবিষয়ক পত্রিকা আর ছিল না বলিলেই হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত পত্রিকার নাম হইল 'ভারতী'; দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমে নাম দেন 'সুপ্রভাত', সে নাম সকলের মনোমতো না হওয়ায় 'ভারতী' নামই গৃহীত হইল। দ্বিজেন্দ্রনাথ হইলেন প্রথম সম্পাদক। ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাস হইতে 'ভারতী' বাহির হইল; তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ষোলো বৎসর।

তখনকার দিনে পত্রিকাদিকে চিত্রসমন্বিত করিবার সুলভ রীতি আবিষ্কৃত হয় নাই, রচনা গৌরবই ছিল পত্রিকার আভিজাত্য। নূতন পত্রিকার জন্য রচনাসংগ্রহের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথকেই সাহিত্যিক মহলে ঘোরাঘুরি করিতে হইল, কারণ উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন বয়োকনিষ্ঠ এবং এক হিসাবে বেকার। এই রচনাসংগ্রহ অভিযানের ফলে কলিকাতার বুধমণ্ডলীর সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। নবপরিচিতদের মধ্যে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর সহিত পরিচয়ই বালকের জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা। অবোধবন্ধু পত্রিকায় ইঁহারই কাব্যসুধা তিনি কী আবেগে প্রাণ ভরিয়া পান করিয়াছিলেন তাহার কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে; এতদিন কবির কাব্যের সহিত পরিচয় ছিল, এখন কাব্যের কবির সহিত পরিচয় ঘটিল; এটি একটি নূতন অনুভূতি। বিহারীলালের গৃহমধ্যে তাঁহাকে কাব্যরচনায় তন্ময় দেখিলেন। রবীন্দ্রনাথ দেখেন তাঁহাদের বাড়িতে বিহারীলাল সকলের শ্রদ্ধার পাত্র; দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে তাঁহার দ্বার অবারিত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহাকে বন্ধুর ন্যায় দেখেন; এমনকি অন্তঃপুরে নূতন বৌঠান কবিকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান, তাঁহার জন্য আসন বুনেন, তাঁহার কবিতা সশ্রদ্ধভাবে আবৃত্তি করেন! কবির সম্মান ও সমাদর সর্বত্র। কাদম্বরী দেবী ছিলেন বিহারীলালের বিমুগ্ধ ভক্ত; তিনি আশা করিতেন যে কাব্যরচনায় তাঁহার আদরের দেবরটির যেরূপ প্রতিভা, কালে তিনি বিহারীলালের সমকক্ষ কবি হইতে পারিবেন। রবীন্দ্রনাথের তখন আত্মবিশ্বাস জাগে নাই, তাই এইসব আশা ও উক্তিকে ভয়ে ভয়ে বিশ্বাস করিতেন এবং বিহারীলালের কাব্যকেই কাব্যসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ আদর্শজ্ঞানে অন্তর দিয়া তাঁহারই অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভারতীর জন্য রচনা সংগ্রহ উপলক্ষে যেমন বিচিত্র লোকের সহিত পরিচয় হইল, তেমনি নিজেদের পারিবারিক পত্রিকা বলিয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিচিত্র রচনা নির্বিচারে প্রকাশ করিবার বাধা দূর হইল। দুই বৎসর পূর্বে জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বের পৃষ্ঠায় তাঁহার গদ্য ও পদ্যপ্রলাপ যেমন নির্বিচারে প্রকাশিত হইয়াছিল, ভারতীতে সেই সুযোগ দেখা দিল শতগুণে। বালকের লিখিবার শক্তি ছিল অসাধারণ, প্রকাশের বাধা ছিল সামান্য, সাহিত্যবিচারের মানসূচী ছিল অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট।

জ্ঞানাঙ্কুরে তাঁহার গদ্য রচনা শুরু হয় সাহিত্যসমালোচনা দিয়া; 'ভারতী'তে[১] মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র

১ মেঘনাদ বধ কাব্য। ভারতী ১২৮৪ শ্রাবণ পৃ ৭-১৭। ভাদ্র…পৃ ৬৫-৬৯। আশ্বিন পৃ ১০৩-১১। কার্তিক পৃ ১৬১-৬৪। পৌষ পৃ ২৬৯-৭৪। ফাল্গুন পৃ ৩৬৬-৭০। প্রায় ৩৬ পৃষ্ঠা প্রবন্ধ।

সমালোচনা দিয়া রচনা আরম্ভ করিলেন। চিরদিনই দেখা যায়, সাহিত্যক্ষেত্রে নবীন লেখকগণ তাঁহাদের আবির্ভাবকে প্রবীণের সমালোচনা ও সনাতনীদের নিন্দার দ্বারা বিঘোষিত করেন; প্রতিভার ঔদ্ধত্যে বিচারবুদ্ধি তখন আবিষ্ট থাকে। রবীন্দ্রনাথ পরযুগে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তিনিও মধুসূদনের অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ষোলো বৎসর বয়সের এই গদ্য রচনা কবি তাঁহার গ্রন্থমধ্যে কখনো পুনর্মুদ্রিত করেন নাই। কিন্তু প্রবন্ধটির সমস্তটাই যে অযৌক্তিক বাক্যচ্ছটা তাহা ভাবিবার কারণ নাই, অনেক কথা এখনো বিচার্য। আমরা একটিমাত্র উদাহরণ উদ্ধৃত করিব। কাব্যের প্রথমে রাবণের সভায় বীরবাহু বধের সংবাদে যে ক্রন্দনের বর্ণনা আছে, তাহা নবীন সমালোচকের মতে অত্যন্ত অশোভন। বীরের পক্ষে এইভাবে ক্রন্দন, সভাসুদ্ধ সকলের এইরূপ আত্মবিহ্বলতা ব্যক্তিগত জীবনেও যেমন অশোভন, কাব্যেও তেমনি অসুন্দর। 'ম্যাকবেথ' নাটকে সিউয়ার্ড তাঁহার পুত্রের মৃত্যুতে যে সংযম দেখাইয়াছিলেন, অ্যাডিসন লিখিত 'কেটো' নাটকে পুত্রশোকাতুর কেটো যে গাম্ভীর্য প্রকাশ করিয়াছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকে লক্ষ্মণ সিংহের দ্বাদশপুত্র নিধনের পরেও তাঁহার যে বীরত্ব ও স্থৈর্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সাহিত্যে একটা আদর্শ স্থাপন করিয়াছে; কিন্তু তাহার তুলনায় মাইকেলবর্ণিত রাবণ অত্যন্ত দুর্বল চরিত্র। সমালোচক 'সাহিত্যদর্পণ' হইতে কাব্যের দোষ কী তাহা এই প্রসঙ্গে উত্থাপন করিয়া এই মহাকাব্যকে সেই মানসূচী হইতে বিচার করেন ও পদে পদে দোষত্রুটি দেখান। লেখক তাঁহার যুক্তির সমর্থনে হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন অনূদিত বাল্মীকি রামায়ণ, গ্রাম্য ও স্বভাব কবিদের গান ও কবিতা, এমনকি কবিওয়ালা হরুঠাকুরের রচনা হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেন। মোট কথা সমস্ত প্রবন্ধটি মেঘনাদবধ মহাকাব্যের একটি কঠোর সমালোচনা।

মধুসূদনের মহাকাব্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই কঠোর বিরূপতার কারণ অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায়। নর্মাল স্কুলে পড়ার সময়ে তাঁহাকে যেসব গ্রন্থ 'পাঠ্যপুস্তক' হিসাবে অধ্যয়ন করিতে হইত, তাহার মধ্যে ছিল মেঘনাদবধ কাব্য। কাব্যহিসাবে কল্পনাপ্রিয় বালককে এই গ্রন্থ কখনো আকর্ষণ করে নাই; অনিচ্ছার বশে, শাসনের দায়ে, ভাষাশিক্ষার অজুহাতে কাব্যপাঠ করার মতো এত বড়ো বিড়ম্বনা আর নাই। জীবনস্মৃতিতে মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা অতি সত্য। "যে-জিনিসটা পাতে পড়িলে উপাদেয় সেইটাই মাথায় পড়িলে গুরুতর হইয়া উঠিতে পারে। ভাষা শিখাইবার জন্য ভালো কাব্য পড়াইলে" কাব্যের অমর্যাদা হয়। "কাব্য জিনিসটাকে রসের দিক হইতে পুরাপুরি কাব্যহিসাবেই পড়ানো উচিত, তাহার দ্বারা ফাঁকি দিয়া অভিধান ব্যাকরণের কাজ চালাইয়া লওয়া কখনোই সরস্বতীর তুষ্টিকর নহে।" মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনার সাহিত্যিক মূল্য সামান্যই, তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে ইতঃপূর্বে এমন নির্ভীক বিস্তারিত সমালোচনা বাংলাসাহিত্যে কোনো গ্রন্থ সম্বন্ধেই হয় নাই।

ছোটোগল্প রচনার হাতেখড়ি হয় ভারতীরই প্রথম সংখ্যায়। 'ভিখারিণী' গল্প হিসাবে এতই নগণ্য যে রবীন্দ্রনাথ কোনো দিন ইহার নাম উল্লেখ পর্যন্ত করেন নাই। 'ছেলেবেলা'য় এই গল্প সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "সেটা যে কী বকুনির বিনুনি নিজে তার যাচাই করবার বয়স ছিল না।" অধ্যাপক সুকুমার সেন তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রকৃত ছোটোগল্প প্রবর্তিত হয় রবীন্দ্রনাথের দ্বারা।"..."রবীন্দ্রনাথের পূর্বে যে-সকল গল্প লেখা হইয়াছিল তাহার মধ্যে দামিনী [সঞ্জীবচন্দ্র ১২৮১] গল্পটিতেই ছোটোগল্পের লক্ষণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথের বাল্য-রচনা 'ভিখারিণী' গল্পেও ছোটোগল্পের ঠাট বজায় আছে।" (পৃ ২৮২)।

ছোটোগল্প লিখিয়া বোধ হয় একটু সাহস হয়, তাই 'করুণা'[১] নামে উপন্যাস শুরু করিলেন। এই উপন্যাসখানি

১ "প্রথম বৎসরের ভারতীতে প্রকাশিত আমার বাংলা রচনা 'করুণা' নামক গল্প তাহার নমুনা।" জীবনস্মৃতির খসড়া। জীবনস্মৃতিতে (চলিত সংস্করণে) করুণার নাম নাই।

তাঁহার এই সময়ের উচ্ছ্বাসপূর্ণ কাব্যেরই অনুরূপ, গল্পাংশ তুচ্ছ। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এইসব রচনা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "ভারতীর পত্রে পত্রে আমার বাল্যলীলার অনেক লজ্জা ছাপার কালির কালিমায় অঙ্কিত হইয়াছে। কেবলমাত্র কাঁচা লেখার জন্য লজ্জা নহে— উদ্ধত অবিনয়, অদ্ভুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতার জন্য লজ্জা।' "তরুণ বাংলা সাহিত্যের এমন একটা বিস্তার ও প্রভাব হয় নাই যাহাতে সেই সাহিত্যের অন্তর্নিহিত রচনাবিধি লেখকদিগকে শাসনে রাখিতে পারে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'করুণা' উপন্যাসসম্বন্ধে জীবনস্মৃতিতে কোনো কথাই বলেন নাই, গ্রন্থ আকারে উহা কখনো প্রকাশিতও হয় নাই; কিন্তু ইহার প্রতি মায়া একসময় পর্যন্ত ছিল বলিয়া মনে হয়। ভারতীতে উহা প্রকাশিত হইবার সাত বৎসর পরে তিনি চন্দ্রনাথ বসুকে ভারতীর প্রথম দুই বৎসরের পত্রিকা পাঠাইয়া দিয়া 'করুণা' সম্বন্ধে বোধ হয় তাঁহার মতামত জানিতে চাহিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথবাবু করুণার অতি বিস্তৃত সমালোচনাপূর্ণ যে পত্র লেখেন তাহা বহুকাল পরে আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১]

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

আমরা পূর্বে একস্থানে বলিয়াছি যে রবীন্দ্রনাথের তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের মধ্যে রচিত প্রায় সকল কাব্যই তিনি কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে বর্জন করিয়াছিলেন, কেবল রাখিয়াছেন 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। তথাকথিত পদাবলী ভারতীর আদি যুগের রচনা, অর্থাৎ কবির ষোলো বৎসর বয়সের লেখা। ১২৮৪ সালের বর্ষাকাল। কবি লিখিয়াছেন, "একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলা দিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা স্লেট লইয়া লিখিলাম, 'গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে'।" ইহা লিখিয়া নিজের উপর বিশ্বাস জন্মিল ও তৎপরে একটির পর একটি কবিতা লিখিয়া চলিলেন। এইভাবে পদাবলীর সৃষ্টি।

ভারতীতে প্রথম যে কবিতাটি বাহির হইল, তাহার নাম ছিল 'অভিসার'[২] 'সজনি গো—আঁধার রজনী ঘোর ঘনঘটা চমকত দামিনীরে। কুঞ্জপথে সখি, কৈসে যাওব অবলা কামিনীরে।" এখন প্রশ্ন উঠে বৈষ্ণব পদাবলী অনুকরণে কাব্যরচনার প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ কেমন করিয়া ও কোথা হইতে পাইলেন। বৈষ্ণব পদাবলী রচনার স্রোত বাংলাসাহিত্যে বহুকাল হইতে তেমন প্রচলিত ছিল না। আধুনিক যুগে মাইকেল মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' (১৮৬১) বৈষ্ণবভাবের কবিতা রচনা করেন সত্য, কিন্তু 'ব্রজবুলি' ভাষা তিনি প্রয়োগ করেন নাই। আমাদের মনে হয় আধুনিক কবিতায় সর্বপ্রথম ব্রজবুলি ব্যবহার করেন বঙ্কিমচন্দ্র। 'মৃণালিনী' উপন্যাসে যে তিনটি গান আছে তাহা এই মিশ্র-ভাষায় রচিত (১৮৬৯)। বঙ্গদর্শনের তৃতীয় বর্ষে (১৮৭৪) 'র জ' সহিতে যে চারিটি কবিতা আছে তাহাও এই কৃত্রিম ব্রজবুলিতে লেখা। সমসাময়িক পত্রিকা সন্ধান করিলে আরও হয়তো দুই চারিটি কবিতা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রাচীন পদকর্তাদের এমন নকলকরা 'পদাবলী' রবীন্দ্রনাথের পূর্বে কেহ লিখিতে পারেন নাই। সেইজন্যই ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী সাহিত্যক্ষেত্র হইতে একেবারে বহিষ্কৃত হয় নাই। বৈষ্ণব কবিতার প্রতি তাঁহার অনুরাগ সম্বন্ধে একখানি পত্রে[৩] লিখিয়াছিলেন, "আমার বয়স যখন তেরো-চৌদ্দ তখন থেকে আমি অত্যন্ত আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করেছি; তার ছন্দ রস ভাষা ভাব সমস্তই আমাকে মুগ্ধ করত। যদিও আমার বয়স অল্প ছিল তবু অস্পষ্ট অস্ফুট রকমেও বৈষ্ণবধর্মতত্ত্বের মধ্যে আমি প্রবেশলাভ করেছিলুম।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথ

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা ২য় বর্ষ ১৩৫১ ৪র্থ সংখ্যা পৃ ৪২০-২৩; চিঠিপত্র। ১৭ই আশ্বিন ১২৯১।

২ ভারতী ১ম বর্ষ ১২৮৪ আশ্বিন পৃ ১৩৫। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ১৩ সংখ্যক কবিতা। মুদ্রিত গ্রন্থে শব্দের পরিবর্তন আছে।

৩ পত্র ২০ আষাঢ় ১৩১৭। প্রবাসী ১৩৩৪ পৌষ পৃ ৩৯০।

বৈষ্ণবসাহিত্য পাঠ করিয়াছিলেন, সাহিত্যরসের জন্য, তত্ত্বের জন্য নহে ; তিনি লিখিয়াছেন যে "বৈষ্ণবপদ-সমুদ্রের অপরিচিত ভাণ্ডার হইতে একটি আধটি কাব্যরত্ন চোখে পড়িতে পারে এই আশাতেই" তিনি উৎসাহিত হন।

বাংলাসাহিত্যের এমন একটা যুগ ছিল যখন বাংলার এই শ্রেষ্ঠ সম্পদ শিক্ষিত সমাজের নিকট প্রায় অজ্ঞাত ছিল। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত যথার্থই লিখিয়াছেন, "যে বয়সে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন সেকালে বটতলা ছাড়া বৈষ্ণবকবিতা আর কোথাও পাওয়া যাইত না।...বৈষ্ণব কবিতার যে শুধু সমাদর ছিল না এমন নহে তাচ্ছিল্য ভাবও লক্ষিত হইত।...বটতলার নিকৃষ্ট পুস্তকালয়ে বৈষ্ণব ভিক্ষুকের কণ্ঠে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল।"[১]

বাংলার শিক্ষিত সমাজ বলিতে আধুনিক যুগে বুঝায় ইংরেজিজানা সম্প্রদায় ; সেই শিক্ষাভিমানী সমাজের দৃষ্টি সর্বপ্রথম আকর্ষণ করেন বাংলা সাপ্তাহিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (১২৭৬ চৈত্র ১৬)। কিন্তু গ্রন্থ হিসাবে প্রথম বৈষ্ণব পদাবলী সম্পাদন করেন জগদ্বন্ধু ভদ্র (১৮৭০)। 'মহাজন পদাবলী'তে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সম্বন্ধে সমালোচনা ও বিদ্যাপতির পদাবলী ও টীকা প্রকাশিত হয়। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন।[২]

অতঃপর অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭) ও সারদাচরণ মিত্র (১৮৪৮-১৯১৭) সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' (১৮৭৪-৭৬ তিনখণ্ড, চুঁচুড়া) বালকের হাতে পড়ে ; তৎসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে "গুরুজনেরা ইহার গ্রাহক ছিলেন, কিন্তু নিয়মিত পাঠক ছিলেন না। সুতরাং এগুলি জড় করিয়া আনিতে আমাকে বেশি কষ্ট পাইতে হইত না। বিদ্যাপতির দুর্বোধ বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত।"

জগদ্বন্ধু ভদ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, সারদাচরণ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র[৩] ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়[৪] বৈষ্ণবসাহিত্যের কাব্য-সৌন্দর্য বাঙালি শিক্ষিতসমাজে প্রচার করেন। যে-সাহিত্য এতদিন ভক্তবৈষ্ণবদের সাধনার ধন ছিল, তাহা এখন সাহিত্যবিলাসীদের ভোগের বস্তু হইল। তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের নিকট এই পদসমুদ্র সেই কাব্যরস সম্ভোগের সামগ্রী, সাধনার সম্পদ নহে। তাই এই অপরিচিত ভাণ্ডার হইতে কাব্যরত্ন সংগ্রহের জন্য তাঁহার এত ঔৎসুক্য।

বৈষ্ণব পদাবলী অধ্যয়নের পদ্ধতি ছিল বালকের নিজস্ব ; তিনি লিখিয়াছেন, 'আমি টীকার উপর নির্ভর না করিয়া নিজে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। বিশেষ কোনো দুরূহ শব্দ যেখানে যতবার ব্যবহৃত হইয়াছে সমস্ত আমি একটি ছোটো বাঁধানো খাতায় নোট করিয়া রাখিতাম। ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলিও আমার বুদ্ধি অনুসারে যথাসাধ্য টুকিয়া রাখিয়াছিলাম।"

এই পদাবলী তিনি এমন গভীরভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে ইহার অনুকরণ করা তাঁহার পক্ষে সহজ হইয়াছিল। এই বয়সটা ছিল অনুকরণের যুগ। অবোধবন্ধুতে বিহারীলালের কবিতা পড়িয়া তাঁহারই মতো কবি হইবার যেমন সাধ হইয়াছিল, বৈষ্ণবপদসমুদ্র মন্থন করিয়া পদকর্তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার আকাঙ্ক্ষা তেমনি জাগে।

কিন্তু এই কবিতাগুলি[৫] সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কোনো মোহ ছিল না ; জীবনস্মৃতি রচনাকালে তিনি স্পষ্টই বলিয়া-ছিলেন যে "ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে।" প্রাচীন

১ রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব কবিতা, প্রবাসী ১৩৩৯ বৈশাখ পৃ ৬৭।

২ রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত এই গ্রন্থখানি পুরাতন বইয়ের দোকান হইতে শ্রীযুক্ত পৃথ্বীসিংহ নাহার সংগ্রহ করেন।

৩ [বঙ্কিমচন্দ্র] বিদ্যাপতি ও জয়দেব [রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত 'মানস-বিকাশ' গ্রন্থের সমালোচনা, বঙ্গদর্শন ১২৮০ পৌষ]—বিবিধ প্রবন্ধ পৃ ৫৩-৫৭ শতবার্ষিকী সংস্করণ।

৪ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাপতি, বঙ্গদর্শন ১২৮০ জ্যৈষ্ঠ। এতদ্ব্যতীত জ্ঞানদাস (ঐ ১২৮০ মাঘ), বলরামদাস (১২৮০ চৈত্র) সম্বন্ধে প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়।

৫ ভারতী ১ম বর্ষ ১২৮৪ সালে নিম্নলিখিত পদাবলী প্রকাশিত হয়। আশ্বিন—সজনি গো, আঁধার রজনী ঘোর ঘনঘটা। বর্তমান ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে সংখ্যা ১১। অগ্রহায়ণ— গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে— " ৮। পৌষ— বজাও রে মোহন বাঁশী— " ১৯। মাঘ—হম সখি দরিদ নারী। ফাল্গুন—সখিরে পিরীত বুঝাবে কে ; সতিমির রজনী, সচকিত সজনী—" ৯। চৈত্র— বাদর বরখন—" ১৪।

পদকর্তাগণ একটি কৃত্রিম ভাষায় কবিতা রচনা করেন; সে ভাষার নকল করা যায় কিন্তু প্রাচীনদের ভাবের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না; ভাবের ঘরে চুরি করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথের রচনা সেই ভাবেরঘরে দুর্বল বলিয়া জহুরীর হাতে নকল ধরা পড়ে।

জীবনস্মৃতির পাঠকগণ অবগত আছেন বালক কবি কিভাবে তাঁহার এক বয়স্ক বন্ধুকে বুঝাইয়াছিলেন যে পদাবলী ভানুসিংহ নামে এক প্রাচীন পদকর্তা রচিত ও পুঁথিখানি আদি ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থশালায় আবিষ্কৃত।

রবীন্দ্রনাথের এই আত্মগোপনের একটু ইতিহাস আছে। তিনি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর নিকট ইংরেজ বালক কবি চ্যাটার্টনের বিবরণ শুনিয়াছিলেন। চ্যাটার্টন পঞ্চদশ শতকের টমাস রাউলি নামে এক কল্পিত কবির কাব্য আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া দাবি করেন এবং নিজের কবিতাগুলি প্রাচীন কবির রচনা বলিয়া প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথও সেইভাব হইতে ছদ্মনাম গ্রহণ করেন।

বৎসর দুই পরে চ্যাটার্টন[১] সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যাহা লেখেন তাহা কবির নিজেরই মনের কথা ও যুক্তি এবং এক হিসাবে ভানুসিংহের পদাবলী রচনার কৈফিয়ত। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন: "একটি প্রাচীন ভাষায় রচিত ভাল কবিতা শুনিলে তাহারা [লোকে] বিশ্বাস করিতে চায় যে, তাহা কোন প্রাচীন কবির রচিত। যদি তাহারা জানিতে পায় যে, সে-সকল কবিতা একটি আধুনিক বালকের লেখা, যে-বালক তাহাদেরি ভাষায় কথা কয়, তাহাদেরি মত কাপড় পরে— বাহিরের অনেক বিষয়েই তাহাদের সহিত সমান তাহা হইলে তাহারা কি নিরাশ হয়? তাহা হইলে হয়ত তাহারা চটিয়া যায়, তাহারা সে-কবিতাগুলির মধ্যে কোন পদার্থ দেখিতে পায় না, নানাপ্রকার খুঁটিনাটি ধরিতে আরম্ভ করে, যদি বা কেহ সে-সকল কবিতার প্রশংসা করিতে চায়, তবে সে নিজে একটি উচ্চতর আসনে বসিয়া বালকের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অতি গম্ভীর স্নেহের স্বরে বলিতে থাকে যে, হাঁ, কবিতাগুলি মন্দ হয় নাই, এবং বালককে আশা দিতে থাকে যে, বড় হইলে চেষ্টা করিলে সে একজন কবি হইতে পারিবে বটে! তাহাদের যদি বল, এসকল একটি প্রাচীন কবির লেখা, তাহারা অমনি লাফাইয়া উঠিবে, ভাবে গদগদ হইয়া বলিবে, এমন লেখা কখনো হয় নাই হইবে না; এরূপ অবস্থায় একজন যশোলোলুপ কবি বালক কি করিবে?" কবি জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন যে চ্যাটার্টনের "আত্মহত্যার অনাবশ্যক অংশটুকু হাতে রাখিয়া, কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।"

ভানুসিংহ সম্বন্ধে কৌতুককাহিনী এইখানেই শেষ হয় নাই, আরও একটু আছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন যে জার্মানীতে নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া এদেশের গীতিকাব্য সম্বন্ধে একখানি চটি বই লেখেন; তাহাতে তিনি ভানুসিংহকে প্রাচীন পদকর্তারূপে প্রচুর সম্মান দান করিতে কার্পণ্য করেন নাই। তিনি আরও বলেন যে এই গ্রন্থখানি লিখিয়া নিশিকান্ত 'ডক্টর' উপাধি লাভ করেন। এই উক্তিটি সম্বন্ধে সামান্য বিচার প্রয়োজন। নিশিকান্ত একুশ বৎসর বয়সে (১৮৭৩) বিলাত যান। এডিনবরা লাইপজিক, সেন্টপিটার্সবুর্গ প্রভৃতি নানাস্থানে অধ্যয়ন করিয়া অবশেষে জুরিক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে The Yatras[২] নামে একখানি ছোটো বই লিখিয়া 'ডক্টর' উপাধি পান। সেগ্রন্থ আমরা দেখিয়াছি, তাহাতে ভানুসিংহের কোনো কথা নাই। তবে জার্মান ভাষায় 'ভারতীয় প্রবন্ধাবলী' নামে যে বইখানি লেখেন, তাহাতে যদি কিছু থাকে তো আমরা

১ Thomas Chatterton (1752-70), *Ryse of Peyeneteyning in Englande writen by Thomas Rowleie 1469 for Master Canynge* a Bristol Worthy. ভারতী ১২৮৬ আষাঢ় পৃ ১১৮-৪৪।

২ The Yatras or the Popular Dramas of Bengal, Trubner, London 1882. Dedication, Zurich, January 1882. এই বইখানিকে Dissertation বলা হইয়াছে। ডক্টর উপাধির জন্য Thesisকে dissertation বলে।

বলিতে পারি না। তবে সে বই লিখিয়া নিশিকান্ত 'ডক্টর' উপাধির মান পান নাই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি ভ্রমশূন্য নহে।[১]

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ১২৯১ সালে মুদ্রিত হয়; প্রথমবর্ষ ভারতীতে প্রকাশিত কবিতা ব্যতীত এই শ্রেণীর আরও কয়েকটি গ্রন্থমধ্যে সংযোজিত হয়। এই ক্ষুদ্র কাব্যের সকল কবিতাকে একই শ্রেণীতে ফেলা যাইবে না, কারণ সবগুলিই এক সময়ে রচিত নহে। 'মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান' কবিতাটি কড়ি ও কোমলের যুগের রচনা; ভাষা কৃত্রিম হইলেও উহার ভাবের মধ্যে নিছক অনুকরণ দেখা যায় না।

কবিকাহিনী

'ভারতী'র প্রথমবর্ষে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ছাড়া একটি নাতিদীর্ঘ কাব্য প্রকাশিত হয়,—'কবিকাহিনী'[২]। এই গ্রন্থ রচনার প্রায় ত্রিশ বৎসর পর কবি এই কাব্যের সমালোচনা যেভাবে করিয়াছিলেন তাহা সাহিত্য-বিচারের দিক্ হইতে বিচার্য। তিনি জীবনস্মৃতিতে লিখিতেছেন—"যে বয়সে লেখক জগতের আর-সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই, কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে, ইহা সেই বয়সের লেখা। সেইজন্য ইহার নায়ক কবি। সে-কবি যে লেখকের সত্তা তাহা নহে,—লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে, ইহা তাহাই। ঠিক ইচ্ছা করে বলিলে যাহা বুঝায় তাহাও নহে—যাহা ইচ্ছা করা উচিত, অর্থাৎ যেরূপটি হইলে অন্য দশজনে মাথা নাড়িয়া বলিবে হাঁ কবি বটে, ইহা সেই জিনিসটি। ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে, তরুণ কবির পক্ষে এইটি বড়ো উপাদেয়, কারণ ইহা শুনিতে খুব বড়ো এবং বলিতে খুব সহজ।" জীবন-মধ্যাহ্ন অতিক্রম করিয়া কবি তাঁহার বাল্যরচনা সম্বন্ধে যে-রহস্যই করুন না কেন, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে এই কাব্যের মধ্যে কৃত্রিমতা যথেষ্ট থাকিলেও ইহাতে নিজ শৈশবের রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষারাজি নিঃসংকোচে প্রকাশ পাইয়াছে; জীবনস্মৃতির পাঠকমাত্রেই জানেন রবীন্দ্রনাথের শিশুকাল কী রূঢ় রুদ্ধতার মধ্যে, যুক্তিহীন নিষেধের মধ্যে সংকুচিতভাবে কাটিয়াছিল। বহির্জগত ছিল তাঁহার কাছে অজানা রাজ্য; রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শময়ী প্রকৃতি রুদ্ধদ্বার ও গবাক্ষের অন্তরাল হইতে তাঁহাকে ইঙ্গিত করিত, কিন্তু স্পর্শ করিতে পারিত না। "সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ,—মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল।" সেই রুদ্ধ জীবনের মনের কথা অবচেতন স্তরে ছিল নিমজ্জিত, এই

১ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় (১৮৫২-১৯১০) জন্মস্থান ঢাকা—বিক্রমপুর। ১৮৭৩ এ পৈতৃক সম্পত্তি ভ্রাতাদের দিয়া কয়েক হাজার টাকা লইয়া য়ুরোপে যান। এডিনবরা, Leipzig ও তৎপরে সেন্টপিটার্সবুর্গ (আধুনিক লেনিনগ্রাদ) বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। নিহিলিস্ট সন্দেহে তথা হইতে বহিষ্কৃত হইয়া সুইসদেশে আসেন ও জুরিক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৮৮২ সালে 'ডক্টর' উপাধি লাভ করিয়া ১৮৮৩ সালে দেশে ফেরেন। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় হায়দ্রাবাদে কাটে। শেষ জীবনে ইসলাম গ্রহণ করেন ও অশেষ দুঃখের মধ্যে জীবনের অবসান হয়। (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আমার বোম্বাই প্রবাস' পৃ ১৪১-২)। ইঁহার ভ্রাতা নবকান্ত ও শীতলাকান্ত ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হন। নবকান্তের কন্যার সহিত দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র সুধীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। নবকান্ত ভ্রাতাদের এক জীবনী লেখেন। শীতলাকান্তর কতকগুলি রচনা তৎকালীন 'ভারতী'র মধ্যে দেখা যায়। দ্র. জীবনীকোষ, নবকান্ত, নিশিকান্ত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলীতে [১২৮১, ২৮ ফাল্গুন (১১ মার্চ ১৮৭৫)] আছে নিশিকান্তকে জার্মানীতে ৬০০৲ টাকা প্রেরণ করা হইতেছে। মহর্ষির জীবনচরিতকার অজিতকুমার চক্রবর্তী জীবনস্মৃতির উক্তির উপর নির্ভর করিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন যে ঐ টাকা 'ডক্টর' উপাধি গ্রহণের জন্য প্রেরিত হয়। আমরা পূর্বে বলিয়াছি নিশিকান্ত ১৮৮২র পূর্বে ডক্টর হন নাই। সুতরাং সে টাকা অন্য ব্যয়ের জন্য প্রদত্ত হয়।

২ ভারতী ১ম বর্ষ ১২৮৪ পৌষ—চৈত্র সংখ্যায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে মুদ্রিত সংবৎ ১৯৩৫ [১২৮৫ সাল। ১৮৭৮]

কাব্য রচনাকালে তাহা আত্মপ্রকাশ করে। এইভাবে বালকের অনেক অতৃপ্ত আকাজ্ক্ষা ছন্দের মধ্য দিয়া মূর্তি পাইয়াছে। তাই দেখি 'কবিকাহিনী'র কবি সাধ মিটাইয়া প্রকৃতির সঙ্গে খেলা করিয়া বেড়াইতেছেন। 'কবিকাহিনী'র নায়ক 'ছিল কোন কবি বিজন কুটীর তলে।'

প্রফুল্ল উষার ভূষা অরুণ-কিরণে
বিমল সরসী যবে হোত তারাময়ী,…
যখনি গাহিত বায়ু বন্য-গান তার,
তখনি বালক-কবি ছুটিত প্রান্তরে,
দেখিত ধান্যের শিষ দুলিছে পবনে।
দেখিত একাকী বসি গাছের তলায়,
স্বর্ণময় জলদের সোপানে সোপানে
উঠিছেন উষা দেবী হাসিয়া হাসিয়া।[১]

প্রকৃতির কোলে শুধু খেলা নহে, শিশুকবি গাছপালা পশুপক্ষীর সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়েও খোঁজ রাখিতেন। ক্রমে শৈশব অতিক্রম করিয়া, কবি যৌবনে প্রবেশ করিলেন ; প্রকৃতির সহিত যোগ এখন আরও ঘনিষ্ঠ হইল।

প্রকৃতি আছিল তার সঙ্গিনীর মত।
নিজের মনের কথা যত কিছু ছিল,
কহিত প্রকৃতি দেবী তার কানে কানে ;
প্রভাতের সমীরণ যথা চুপি চুপি
কহে কুসুমের কানে মরম-বারতা।

প্রকৃতিকে সম্বোধন করিয়া কবি গাহিতেছেন—

শত শত গ্রহ তারা তোমার কটাক্ষে
কাঁপি উঠে থরথরি, তোমার নিশ্বাসে
ঝটিকা বহিয়া যায় বিশ্ব চরাচরে।
কালের মহান্ পক্ষ করিয়া বিস্তার,
অনন্ত আকাশে থাকি হে আদি জননি,
শাবকের মত এই অসংখ্য জগৎ
তোমার পাখার ছায়ে করিছ পালন!

ইহার পর নীহারিকাপুঞ্জ হইতে ক্রমে ক্রমে জগতের সৃষ্টি ও পরিণতি বর্ণনা করিয়া প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মের কথা বলিয়াছেন—এই নিয়মবন্ধন যদি একবার কোথাও ছিন্ন হয়, তবে কী ভয়ংকর প্রলয়কাণ্ড হয়, তাহা কবি বর্ণনা করিয়াছেন।

এ দৃঢ় বন্ধন যদি ছিঁড়ে একবার,
সে কি ভয়ানক কাণ্ড বাধে এ জগতে
কক্ষচ্ছিন্ন কোটি কোটি সূর্য্য চন্দ্র তারা
অনন্ত আকাশময় বেড়ায় মাতিয়া
মণ্ডলে মণ্ডলে ঠেকি লক্ষ সূর্য্য গ্রহ
চূর্ণ চূর্ণ হোয়ে পড়ে হেথায় হোথায় ;
এ মহান্ জগতের ভগ্ন অবশেষ
চূর্ণ নক্ষত্রের স্তূপ, খণ্ড খণ্ড গ্রহ
বিশৃঙ্খল হোয়ে রহে অনন্ত আকাশে!

প্রকৃতির রুদ্রমূর্তি রবীন্দ্রনাথকে চিরদিনই আকর্ষণ করিয়াছে। এই কাব্যে তাহার আভাস পাই। নিশীথের বর্ণনায় কবি বলিতেছেন—

অমানিশীথের কালে নীরব প্রান্তরে
বসিয়াছি, দেখিয়াছি চৌদিকে চাহিয়া,
সর্ব্বব্যাপী নিশীথের অন্ধকার গর্ভে
এখনো পৃথিবী যেন হতেছে সৃজিত।
স্বর্গের সহস্র আঁখি পৃথিবীর পরে
নীরবে রয়েছে চাহি পলকবিহীন,
স্নেহময়ী জননীর স্নেহ-আঁখি যথা,
সুপ্ত বালকের পরে রহে বিকসিত।

প্রকৃতির কোলে এইভাবে কবির জীবন কাটিতে লাগিল, কিন্তু কবির হৃদয় শূন্য থাকিয়া গেল—

১ ভারতী ১২৮৪, মাঘ। কবিকাহিনী পৃ ২। রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ ১ম খণ্ড পৃ ৬।

এখনো বুকের মাঝে, রয়েছে দারুণ শূন্য,
সে শূন্য কি এ জনমে পূরিবে না আর ?
মনের মন্দির মাঝে, প্রতিমা নাহিক যেন
শুধু এ আঁধার গৃহ রয়েছে পড়িয়া,...

পনেরো-ষোলো বৎসর বয়সের কবি বুঝিতে পারিয়াছেন— "মানুষের মন চায় মানুষেরি মন।" এ যেন "মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই" সুরের পূর্বাভাস। 'কবিকাহিনী'র নায়ক কবি শূন্য হৃদয়ে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ান। একদিন অপরাহ্ণে শ্রান্ত হৃদয়ে এক বৃক্ষতলে শুইয়া আছেন, এমন সময়ে একটি বালিকা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বালিকার নিকট কবি আপনার হৃদয়ের কত কথা বলিয়া গেলেন, এতদিন পরে তাহার মনে হইল হৃদয় যেন একটু জুড়াইল। বালিকার নাম— নলিনী, রবীন্দ্রনাথের এক অতি প্রিয় নাম। নলিনীর সহিত কবি কুটিরে চলিয়া গেলেন; ক্রমে উভয়ে উভয়ের ভালোবাসায় আকৃষ্ট হইলেন। কিন্তু এত সুখেও কবির মন তৃপ্ত হইল না; বালিকা তাহার অন্তরের সমস্ত ভালোবাসা দিয়াও কবির মন পাইল না। মনের ভিতরের অশান্তি যখন কিছুতেই মিটিল না, তখন কবি দেশভ্রমণে বাহির হইলেন। কিন্তু নলিনীর কথা সর্বদাই মনে জাগে, শান্তি খুঁজিয়া খুঁজিয়া কোথাও শান্তি পাইলেন না।

এদিকে বনে নলিনী মরণদশায় উপস্থিত। বহুকাল পরে কবি নলিনীর কাছে যখন আসিলেন সে তখন চিরনিদ্রায় মগ্ন। কাছে থাকিতে কবি বুঝেন নাই যে তিনি নলিনীকেই ভালোবাসিয়াছিলেন, দূরে গিয়া তাঁহার কাছে বালিকার প্রেম প্রকাশিত হয়। ভগ্নহৃদয় কাব্যে আছে মুরলা নামে মেয়েটিকে কবি ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, সেখানেও কবি জানেন নাই মুরলা তাঁহাকেই ভালোবাসিয়াছে। সেখানেও কবি যখন ফিরিলেন, মুরলা তখন মৃত্যুশয্যায়। 'মায়ার খেলা'র অমর শান্তির প্রেম উপেক্ষা করিয়া একদিন চলিয়া গিয়াছিল; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখনী তখন সংযত হইয়াছে— তাই মৃত্যুশয্যার করুণ দৃশ্যের অবতারণ করিয়া কাব্যকে লঘু করেন নাই।

নলিনীর মৃত্যুর পর কবির মনে এই প্রশ্নই উঠিল যে সত্যই কি সব ফুরাইল। শোকাচ্ছন্ন কবি তখন জগতের দিকে চাহিয়া দেখিলেন কালস্রোতে সমস্তই ভাসিয়া চলিয়াছে কিছুই স্থির নাই। ক্রমে কবির বার্ধক্য আসিল। শ্বেতজটা সমাকীর্ণ গম্ভীর মুখশ্রী বৃদ্ধকবি হিমালয়ে আশ্রয় লইলেন। কবির মনে পড়িল এই হিমালয় যুগের পর যুগ মানবসভ্যতার দিকে চাহিয়া আছে; কত পাপ, কত রক্তপাত, কত অত্যাচার তাহার চোখে পড়িয়াছে, স্বাধীনতা হারাইয়া মানুষ কিরূপ হীনতায় নিমজ্জিত হয় তাহা দেখিয়াছে—

দাসত্বের পদধূলি অহঙ্কার কোরে
মাথায় বহন করে পর-প্রত্যাশীরা!
যে পদ মাথায় করে ঘৃণার আঘাত
সেই পদ ভক্তিভরে করে গো চুম্বন!
যে হস্ত ভ্রাতারে তার পরায় শৃঙ্খল,
সেই হস্ত পরশিলে স্বর্গ পায় করে।
স্বাধীন, সে অধীনেরে দলিবার তরে,
অধীন, সে স্বাধীনেরে পূজিবারে শুধু!
সবল, সে দুর্ব্বলেরে পীড়িতে কেবল,
দুর্ব্বল, বলের পদে, আত্ম বিসর্জ্জিতে![1]

এইসব কথা স্মরণ করিয়া কবির মন অত্যন্ত পীড়িত হইয়া উঠিল, কিন্তু তথাপি তিনি বিশ্বাস হারাইলেন না। মরণসন্ধ্যায় কবি ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া শান্তিলাভ করিলেন—

এ অশান্তি কবে দেব, হবে দূরীভূত!
অত্যাচার গুরু ভারে হোয়ে নিপীড়িত,
সমস্ত পৃথিবী দেব, করিছে ক্রন্দন!
সুখ শান্তি সেথা হোতে লয়েছে বিদায়!
কবে দেব এ রজনী হবে অবসান?
স্নান করি প্রভাতের শিশিরসলিলে,
তরুণ রবির করে হাসিবে পৃথিবী!
অযুত মানবগণ এক কণ্ঠে দেব,

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ ১ম খণ্ড, কবিকাহিনী পৃ ৪১, ৪৩, ৪৪।

এক গান গাইবেক স্বর্গ পূর্ণ করি।
নাইক দরিদ্র, ধনী, অধিপতি, প্রজা,
কেহ কারো কুটীরেতে করিলে গমন
মর্য্যাদার অপমান করিবে না মনে,
সকলেই সকলের করিতেছে সেবা,
কেহ কারো প্রভু নয়, নহে কারো দাস।...
...
সে দিন আসিবে গিরি, এখনিই যেন
দূর ভবিষ্যৎ সেই পেতেছি দেখিতে
যেই দিন এক প্রেমে হইয়া নিবদ্ধ
মিলিবেক কোটি কোটি মানবহৃদয়।[১]

বালক-কবির লেখায় বিশ্বপ্রেমের যে আদর্শ ফুটিয়াছে, তাহা গভীর না হইতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে তাহা বিশ্বপ্রেমেরই আদর্শ। কাব্যের পক্ষে অনাবশ্যক হইলেও এই চতুর্থ সর্গটিকে একটি আকস্মিক ঘটনা বলিয়া মনে হয় না। 'বনফুলে'র ন্যায় 'কবিকাহিনী'র বিষয়নির্বাচনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবনের অন্তর্নিহিত সত্য আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। বালক রবীন্দ্রনাথ যখন 'কবিকাহিনী' লিখিয়াছিলেন, তখন হয়তো নিজেই জানিতেন না যে এই লেখার মধ্যে তাঁহার নিজের পরবর্তী জীবনের আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে।[২]

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বালকবয়সের বিশ্বপ্রেম লইয়া প্রৌঢ়বয়সে যে ব্যঙ্গ করিয়াছেন তাহা না করিলেও চলিত। তিনি জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন, "ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে—তরুণ কবির পক্ষে এইটি বড়ো উপাদেয়, কারণ ইহা শুনিতে খুব বড়ো এবং বলিতে খুব সহজ। নিজের মনের মধ্যে সত্য যখন জাগ্রত হয় নাই, পরের মুখের কথাই যখন প্রধান সম্বল, তখন রচনার মধ্যে সরলতা ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব নহে। তখন, যাহা স্বতই বৃহৎ, তাহাকে বাহিরের দিক হইতে বৃহৎ করিয়া তুলিবার দুশ্চেষ্টায়, তাহাকে বিকৃত ও হাস্যকর করিয়া তোলা অনিবার্য।"

'কবিকাহিনী' রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর মধ্যে প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ।[৩] রবীন্দ্রনাথ যখন আমেদাবাদে সত্যেন্দ্রনাথের নিকট ছিলেন, তখন তাঁহার উৎসাহী বন্ধু প্রবোধচন্দ্র ঘোষ এই বইখানি ছাপাইয়া তাঁহার নিকট (ফাইল কপি) পাঠাইয়া দেন। জীবনস্মৃতিতে কবি বন্ধুসম্বন্ধে লিখিয়াছেন— "তিনি যে কাজটা ভালো করিয়াছিলেন তাহা আমি মনে করি না, কিন্তু তখন আমার মনে যে-ভাবোদয় হইয়াছিল, শাস্তি দিবার প্রবল ইচ্ছা তাহাকে কোনোমতেই বলা যায় না। দণ্ড তিনি পাইয়াছিলেন, কিন্তু সে বইলেখকের কাছে নহে, বই কিনিবার মালেক যাহারা তাহাদের কাছ হইতে। শুনা যায় সেই বইয়ের বোঝা সুদীর্ঘকাল দোকানের শেল্‌ফ্‌ এবং তাঁহার চিত্তকে ভারাতুর করিয়া অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছিল।"

যাহাই হউক সাহিত্যিক মহলে এই কাব্যখানি একেবারেই উপেক্ষিত হয় নাই। জীবনস্মৃতির প্রথম খসড়ায় তিনি লিখিয়াছিলেন, "বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রথিতনামা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তাঁহার 'বান্ধব' পত্রে এই কাব্য সমালোচন উপলক্ষ্যে লেখককে উদয়োন্মুখ কবি বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। খ্যাত ব্যক্তির লেখনী হইতে এই আমি প্রথম খ্যাতিলাভ করিয়াছিলাম।"

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ ১ম খণ্ড কবিকাহিনী পৃ ৪৪।

২ দ্র. অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ লিখিত কবিকাহিনী সম্বন্ধে প্রবন্ধ, প্রবাসী ১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়।

৩ কবিকাহিনী। / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। / ও / শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক / প্রকাশিত। / কলিকাতা / মেছুয়াবাজার রোডের ৪৯ সংখ্যক ভবনে / সরস্বতী যন্ত্রে / শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত। সংবৎ ১৯৩৫। [১২৮৫ কার্ত্তিক ২০। ১৮৭৮ নভেম্বর ৫] ৫৩ পৃ। দ্র. ভারতী ১ম বর্ষ ১২৮৪ পৌষ পৃ ২৬৪-৬৮ ১ম সর্গ।— মাঘ, পৃ ৩১৮-২৪, ২য় সর্গ।— ফাল্গুন, পৃ ৩৬০-৬৩, ৩য় সর্গ।—চৈত্র, পৃ ৩৯৩-৯৯, ৪র্থ সর্গ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন যে 'কবিকাহিনী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের বিলাত যাত্রার পর। বিলাত যাইবার পূর্বে তিনি উহার মুদ্রিত ফাইল পাইয়া থাকিবেন। গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আনা তুরখুড়কে ১৮৭৮ নভেম্বর ১১ তারিখে 'কবিকাহিনী' পাঠাইয়া দেন। দ্র. রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়।

'কবিকাহিনী'র কবিতাগুলির ছন্দ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'বনফুলে'র ন্যায় ইহাও অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত, ইহাতে পয়ারের মিল নাই, যাহা পরবর্তী যুগের নাট্যকাব্য ও বিসর্জনাদি নাটকের মধ্যে দেখা যায়। সেযুগে কোনো কবি কাব্য রচনাকালে মাইকেল মধুসূদনের প্রবর্তিত নূতন ছন্দকে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না; রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ কাব্যের যতই তীব্র সমালোচনা করুন, কাব্যরচনাকালে তাঁহাকে মাইকেলেরই তেজোময় অমিত্রাক্ষর ছন্দকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বৃহৎ কাব্য রচনা করিতে গেলে বাংলার চিরন্তন পয়ারাদি ছন্দ অচল; য়ুরোপীয় আদর্শের নূতন ছন্দ যাহা মধুসূদন বাংলা ভাষায় আনিয়াছিলেন, তাহাই পরবর্তীযুগের কবিদের আদর্শ হয়। বিলাতযাত্রায় রবীন্দ্রনাথের একটা নূতন পর্বের সূত্রপাত হইল। যাত্রার পূর্ব পর্বটায় তাঁহার মানসিক অবস্থার যে অস্থির চঞ্চলতার চিত্র কবিকাহিনীর মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাকে নৈর্ব্যক্তিক কবিকল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এযুগের বহু কবিতা পাওয়া গিয়াছে, যাহা রচনা হিসাবে কাঁচা কিন্তু অন্তরের বেদনা প্রকাশের উদাহরণ হিসাবে মূল্যবান। সেগুলি প্রকাশের জন্য রচিত হয় নাই; তাই তাহাদের আদিম অবিকৃত রূপটি পাই— ভাষা ও ভাবের পরিমার্জনার অবসর ও প্রয়োজন হয় নাই। সেই কবিতা হইতে বালক কবির চিত্তের মধ্যে যে আগ্নেয়গিরি গুমরাইতেছে তাহারই তপ্তশ্বাস অনুভব করা যায়।

কবিকাহিনীতে কোনো উৎসর্গপত্র নাই; কিন্তু খসড়াতে আছে। তাহা এখনো মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই। কাব্য লিখিলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দে, কিন্তু খুচরা কবিতা বা লিরিকগুলি লিখিতেছেন যথাযথ ছন্দে, মিল রাখিয়া। এইসব লিরিকের কতকগুলি 'শৈশব সঙ্গীতে'র মধ্যে আছে, তবে কোন্‌গুলি এই সময়ে রচিত বলা কঠিন। এইসকল মূল রচনা ব্যতীত অনুবাদ-সাহিত্যকেও তিনি পুষ্ট করিতেছিলেন। আমরা পূর্বে বলিয়াছি ইংরেজ কবিদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বহু তথ্য সংগ্রহ করেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর নিকট হইতে। অক্ষয়চন্দ্রই তাঁহাকে নানা কবির কাব্য অনুবাদ করিয়া করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। কবি লিখিয়াছেন তাঁহাদের বাড়িতে পাতায় পাতায় চিত্রবিচিত্র-করা কবি ম্যুরের[১] রচিত একখানি আইরিশ মেলডীজ ছিল। তাহা হইতে অক্ষয় চৌধুরী প্রায়ই কবিতা আবৃত্তি করিতেন। বালক কবি মুগ্ধ হইয়া তাহা শুনিতেন। ছবির সঙ্গে বিজড়িত কবিতাগুলি কবির মনে পুরাতন আয়রল্যাণ্ডের একটি মায়ালোক সৃজন করিত। সেই মেলডীজের কয়েকটি সংগীত বাংলায় অনুবাদ করিয়া 'ভারতী'তে[২] এই সময়ে প্রকাশ করেন; আমরা বালক কবির একটি অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

এস এস এই বুকে নিবাসে তোমার,
যূথভ্রষ্ট বাণবিদ্ধ হরিণী আমার,
এইখানে বিরাজিছে সেই চির হাসি,
আঁধারিতে পারিবে না তাহা মেঘরাশি।
এই হস্ত এ হৃদয় চিরকাল মত
তোমার, তোমারি কাজে রহিবে গো রত।
কিসের সে চিরস্থায়ী ভালবাসা তবে,
গৌরবে কলঙ্কে যাহা সমান না রবে?

জানিনা, জানিতে আমি চাহিনা, চাহিনা,
ও হৃদয়ে এক তিল দোষ আছে কিনা,
ভালবাসি তোমারেই এই শুধু জানি,
তাই হোলে হল, আর কিছু নাহি মানি।
দেবতা সুখের দিনে বলেছে আমায়,
বিপদে দেবতা সম রক্ষিবে তোমায়,
অগ্নিময় পথ দিয়া যাব তব সাথে,
রক্ষিব, মরিব কিম্বা তোমারি পশ্চাতে।

১ Moore, Thomas (1779-1852) আইরিশ কবি। ১৮০৭ সালে Irish Melodies প্রকাশিত হয়। "Few poets have ever enjoyed greater popularity with the public, or the friendship of more men distinguished in all departments of life."

২ সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী ১২৮৪ মাঘ পৃ ৩২৭।

আমেদাবাদ ও বোম্বাই

রবীন্দ্রনাথের বয়স এখন সতেরো। সেই-যে হিমালয় হইতে ফিরিয়াছেন, তারপর দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে কোনো বিদ্যালয়ের বন্ধনে, কোনো ধারাবাহিক বিদ্যাচর্চার নিয়মশৃঙ্খলে তাঁহাকে বাঁধা যায় নাই। এই স্কুল-পলায়ন ব্যাপারটা কবি তাঁহার অজস্র রচনায় বহুভাবে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং বলিবার সময়ে বেশ একটু আনন্দগৌরব অনুভব করিতেন। ১৮৭৫ সালে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথকে সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সেখানে পাঠ কিরূপ অগ্রসর হইয়াছিল তাহা নিজেই জীবনস্মৃতিতে কবুল করিয়াছেন। এমন কি বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই, বলিয়াও জানা গিয়াছে। মোট কথা অভিভাবকগণ পড়াইবার জন্য এপর্যন্ত বহু প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন— বাঙালির স্কুল, সরকারী স্কুল, ফিরিঙ্গি স্কুল, সাহেবী স্কুলে একের পর একে পড়াইবার চেষ্টা হয়, কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। স্নেহশীল অভিভাবকগণ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। অভিজাত বংশের সর্বগুণসম্পন্ন, সুদর্শন, বুদ্ধিমান বালক সমাজে সংসারে কৃতিত্ব দর্শাইতে পরাঙ্মুখ, ইহা হইতে উদ্‌বেগের কারণ আর কী হইতে পারে। অবশেষে সত্যেন্দ্রনাথ প্রস্তাব করিলেন রবীন্দ্রনাথকে বিলাতে পাঠাইয়া ব্যারিস্টার করিয়া আনা হউক। তখনকার দিনে ধনীঘরের ছেলেদের লেখাপড়া না হইলে বিলাতে পাঠাইয়া ব্যারিস্টার করিয়া আনা হইত। বিলাতে গিয়া কোনো রকমে লণ্ডন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাটা পাশ করিতে পারিলেই ব্যারিস্টারি পড়িবার যোগ্যতা অর্জন করা যাইত। সহজবুদ্ধি, স্বল্প বিদ্যা ও প্রচুর বিত্ত থাকিলে ব্যারিস্টারি পাশ প্রায় সকলেই করিতে পারিত। এই রেওয়াজ বহু কাল চলিয়াছিল; তারপর গ্রাজুয়েট ছাড়া অন্য কেহ ব্যারিস্টারদের ইন্ (inn)-এর সভ্য হইতে পারিবে না এই নিয়ম প্রবর্তিত হইলে সেই ব্যারিস্টারি পাশের ঢেউ কমিয়া যায়।

বিলাতে পাঠাইবার পূর্বে সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে কয়েকমাস নিজের কাছে আমেদাবাদে রাখা স্থির করিলেন। ইংরেজি বলা-কহায়, লেখাপড়ায় রবীন্দ্রনাথ খুবই কাঁচা ছিলেন— সেইসব শুধরাইয়া লইবার জন্য এই আয়োজন। সত্যেন্দ্রনাথ তখন আমেদাবাদের সেশন-জজ, বোম্বাই প্রদেশে প্রায় চৌদ্দ বৎসর চাকুরী হইয়াছে,— পারসী মরাঠা গুজরাটি সিন্ধী বোরাহ সমাজে সুপরিচিত। সে-সময়ে সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সন্তানদের লইয়া বিলাতে; সত্যেন্দ্রনাথের ফার্লোছুটি সরকারী নিয়মানুসারে সেপ্টেম্বর মাসের পূর্বে পাওয়া যাইবে না; শীতের মুখে বিলাতে পৌঁছাইলে শিশুরা অনভ্যস্ত শীতে কষ্ট পাইতে পারে ভাবিয়া তিনি পত্নী ও শিশুদের গ্রীষ্মের মুখেই বিলাতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী শিশুদের লইয়া বিলাত যান এবং লন্ডন হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরে সাসেক্স জেলার ব্রাইটন নামে সমুদ্রতীরস্থ শহরে বাসা ভাড়া করিয়া বাস করিতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ যখন আমেদাবাদ পৌঁছিলেন তখন জজসাহেবের বাদশাহীযুগের প্রাসাদোপম অট্টালিকা শূন্য। বাড়ির পাদমূল দিয়া সাবরমতী নদী প্রবাহিত; এই প্রাসাদের স্মৃতি উত্তরকালে 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের মধ্যে দেখা দিয়াছিল।

দ্বিপ্রহরে সত্যেন্দ্রনাথ আদালতে, রবীন্দ্রনাথ বাসায় একা। আপন মনে মেজদাদার বিরাট লাইব্রেরি হইতে ইচ্ছামতো গ্রন্থ বাছিয়া বাছিয়া পড়েন, প্রবন্ধ লেখেন, কবিতা রচনা করেন, গানে সুর দেন। ইংরেজি বইয়ের যেখানে বুঝেন না, অভিধানের সাহায্যে তাহার অর্থোদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন; যাহা পড়েন তাহার প্রত্যেকটি বাক্যের অর্থ বুঝিতে হয়তো পারেন না, যেটা না বুঝিতেন— সেটুকু নিজ কল্পনাবলে পূরণ করিয়া লইতেন— সমগ্রের অর্থ বুঝিতে কোনো কষ্ট হইত না। সত্যেন্দ্রনাথের লাইব্রেরিতে টেনিসনের কাব্যসমূহের উপর Dore[১] এর ছবিআঁকা বিরাট সংস্করণের বই ছিল, বালক 'কেবল তাহার ছবিগুলির মধ্যে বারবার করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া' বেড়াইতেন।

১ Gustave Dore ১৮৩৩-৮৩। ফরাসি আর্টিস্ট। Rabelais, Balzac, Cervantes, Poe, Tennyson, LaFontaine, Dante, Milton প্রভৃতির গ্রন্থ চিত্রিত করিয়া ইনি যশস্বী হন।

এইভাবে তিনি সংস্কৃতের ছন্দোবদ্ধ কাব্যও পাঠ করিয়া যাইতেন; হেবরলিন সম্পাদিত শ্রীরামপুরের ছাপা কাব্যসংগ্রহ[১] ছিল তাঁহার সঙ্গী। "সংস্কৃত বাক্যের ধ্বনি এবং ছন্দের গতি আমাকে কতদিন মধ্যাহ্নে অমরুশতকের মৃদঙ্গঘাতগম্ভীর শ্লোকগুলির মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরিয়াছে।" সংস্কৃতের ছন্দ তাঁহাকে ছোটোবেলা হইতেই আনন্দ দিত। জয়দেব কৃত গীতগোবিন্দের মধুর ছন্দহিল্লোল তাঁহার বালকহৃদয়কে কিভাবে চঞ্চল করিয়াছিল, সেসম্বন্ধে জীবনস্মৃতিতে কবি বিস্তৃতভাবেই লিখিয়াছেন। যে বইখানি তাঁহার হাতে পড়ে, সেটিতে শ্লোকগুলি ছিল টানাছাপা, ছেদাদি দেখিয়া পংক্তি ও ছন্দ ঠিক করা ছিল কঠিন। যেদিন তাহারই একটা শ্লোক যথার্থভাবে যতি রাখিয়া আবৃত্তি করিতে পারিয়াছিলেন, সেদিনের আনন্দের কথা তাঁহার মনে ছিল। এই ছন্দের জন্য আগাগোড়া গীতগোবিন্দখানি নকল করিয়া লইয়াছিলেন। আরও একটু বড়ো হইয়া কুমারসম্ভব পাঠকালে কালিদাসের ছন্দ তাঁহাকে এমনি মুগ্ধ করে যে ঐ কাব্যের প্রথম তিন সর্গ সম্পূর্ণ মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মোটকথা সংস্কৃতের শব্দলালিত্য, রূপকল্পনা, ছন্দমাধুর্য বাল্য বয়স হইতেই তাঁহাকে এই সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট করে। সংস্কৃতের জটিল শব্দার্থ ভালো করিয়া বুঝা তাঁহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল না; শব্দ রূপ ও ছন্দই তাঁহার কাছে বিচিত্র রসসৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

আমেদাবাদে বৃহৎ অট্টালিকার তেতলায় একটি ছোটো ঘর ছিল কবির নিজের থাকার জন্য; শুক্লপক্ষের কত নিস্তব্ধ রাত্রে কবি সাবরমতী নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাদটাতে একলা ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এইরূপ একটা রাত্রে বালক যেমন-খুশি ভাঙা ছন্দে একটা গান রচনা করিলেন— বোধ হয় এই তাঁহার প্রথম গান যাহাতে নিজে সুর দিলেন। গানটি—

নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়,
ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাও গো!
ঘুম ঘোরভরা গান বিভাবরী গায়,
রজনীর কণ্ঠসাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো।

'বলি ও আমার গোলাপবালা' গানটাও এমনি আর-এক রাত্রে লিখিয়া বেহাগ সুর বসাইয়া গাহিয়াছিলেন। বলিতে পারা যায় গানের মধ্যে নিজের মুক্তির স্বাদ এই প্রথম পাইলেন।

রবীন্দ্রনাথের আমেদাবাদ বাসকালে 'ভারতী'র দ্বিতীয় বর্ষ (১২৮৫) শুরু হয় বৈশাখমাস হইতে; প্রথম বর্ষে নয় মাসে 'বছর' হয়, কারণ প্রথম সংখ্যা বাহির হইয়াছিল শ্রাবণ মাসে। এবৎসরে রবীন্দ্রনাথের লেখনীর বিরাম নাই; প্রথম বর্ষে আরব্ধ 'করুণা' উপন্যাস এবৎসর ভাদ্রমাস পর্যন্ত চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়। আশ্বিন মাসে বিলাত যাত্রা করায় বইখানি সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। উপন্যাস রচনা-বিষয়ে কবির পরবর্তী জীবনের অভ্যাস দেখিয়া মনে হয় তিনি 'করুণা' মাসে মাসে লিখিয়া পত্রিকায় দিতেছিলেন; সমগ্র বইখানি কখনো লেখেন নাই; বিলাত চলিয়া যাওয়াতে উহা আর শেষ হইল না। এই উপন্যাস ছাড়া বহু গদ্য পদ্যরচনা যুগপৎ চলিতেছে, সত্যেন্দ্রনাথ তুকারামের 'অভঙ্গ' মরাঠী হইতে বুঝাইয়া দেন; রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেন। বহু বৎসর পরে 'নবরত্নমালা'র মধ্যে সেই অনুবাদের কয়েকটি স্থান পাইয়াছিল।[২] এই সময়ে রচিত একটি কবিতার কিয়দংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। কবিতাটি আমেদাবাদে ১৮৭৮ জুলাই ৬ তারিখে লিখিত।[৩]

১ কাব্যসংগ্রহ / অর্থাৎ কালিদাসাদি মহাকবিগণ / বিরচিত ত্রিপঞ্চাশৎ / উত্তম সম্পূর্ণ কাব্যানি। / শ্রীডাক্তার যোহন হেবরলিন কর্তৃক / সমাহৃত মুদ্রাঙ্কিতানি। / শ্রীরামপুরীয় চন্দ্রোদয় যন্ত্রে / ১৮৪৭

২ নবরত্নমালার ভূমিকায় আছে যে উহার সংস্কৃত কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ কৃত। কিন্তু রবীন্দ্রভবনের মালতী পুঁথির মধ্যে কয়েকটি পাতায় তুকারামের অভঙ্গের অনুবাদ আছে। নবরত্নমালার ভাষার সহিত সামান্য পার্থক্য কোনো কোনো স্থানে দেখা যায়। শ্রীস: [সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর] লিখিত তুকারাম প্রবন্ধে যে কয়টি অভঙ্গের অনুবাদ আছে, তাহার মধ্যে কয়েকটির সহিত পুঁথির মিল আছে। ভারতী ১২৮৫, পৃ ২৫-২৬।

৩ রবীন্দ্রভবন, মালতী পুঁথি।

হে কবিতা— হে কল্পনা—

জাগাও— জাগাও দেবি উঠাও আমারে দীনহীন—
ঢাল এ হৃদয় মাঝে জ্বলন্ত অনলময় বল—
দাও দেবি সে ক্ষমতা— ওগো দেবি শিখাও সে মায়া
যাহাতে জ্বলন্ত দগ্ধ নিরানন্দ মরু মাঝে থাকি—
হৃদয় উপরে পড়ে স্বরগের নন্দনের ছায়া—
হইতেছি অবসন্ন— বলহীন— চেতনারহিত—
অজ্ঞাত পৃথিবীতলে— অকর্মণ্য অনাথ অজ্ঞান
উঠাও— উঠাও মোরে করহ নূতন প্রাণ দান!

দিনে দিনে অবসাদে হইতেছি অবশ মলিন
নির্জীব এ হৃদয়ের দাঁড়াবার নাই যেন বল।
...
পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে যুঝিব যুঝিব দিনরাত—
কালের প্রস্তরপটে লিখিব অক্ষয় নিজ নাম
অবশ নিদ্রায় পড়ি করিবনা এ শরীর পাত
মানুষ জন্মেছি যবে করিব কর্মেরি অনুষ্ঠান
অগম্য উন্নতি পথে পৃথ্বি তরে গঠিব সোপান।

বিলাত যাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র বিষয় অধ্যয়নে রত; অনেকগুলি রচনা এই অধ্যয়নের প্রত্যক্ষ ফল। বিলাত যাইতেছেন,— সেখানকার শিষ্টাচার সম্বন্ধে কোনো ইংরেজি বই পড়িয়াছেন, তাহারই উপর লিখিলেন 'ইংরেজদিগের আদব কয়দা।'[১] ইংরেজিসাহিত্য ও ইতিহাস পড়িতে হইতেছে। কবি লিখিয়াছেন, "মেজদাদাকে বলিলাম আমি ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস বাংলায় লিখিব, আমাকে বই আনিয়া দিন। তিনি আমার সম্মুখে টেন্ [Taine] প্রভৃতি গ্রন্থকাররচিত ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসসংক্রান্ত রাশি রাশি গ্রন্থ উপস্থিত করিলেন। আমি তাহার দুরূহতা বিচারমাত্র না করিয়া অভিধান খুলিয়া পড়িতে বসিয়া গেলাম। সেই সঙ্গে আমার লেখাও চলিতে লাগিল। এমনকি অ্যাংলো-স্যাক্সন ও অ্যাংলো-নর্মান সাহিত্য সম্বন্ধীয় আমার সেই প্রবন্ধগুলাও ভারতীতে বাহির হইয়াছিল।"[২] একটি প্রবন্ধের মধ্যে তিনি ইংরেজদের আদিকবি কিডমনের পদ্য-বাইবেল হইতে কয়েকটি অংশ বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহার সামান্য নমুনা উদ্ধৃত করিলাম—

গুহা-অন্ধকার ছাড়া ছিল না কিছুই!
এ মহা অতলস্পর্শ আঁধার গভীর—
আছিল দাঁড়ায়ে শুধু শূন্য নিষ্ফল
উন্নত ঈশ্বর তবে দেখিলা চাহিয়া
এই নিরানন্দ স্থান! দেখিলা হেথায়

অন্ধকার, বিষণ্ণ ও শূন্য মেঘরাশি
রহিয়াছে চিরস্থির নিশীথিনী ল'য়ে।
উত্থিত হইল সৃষ্টি ঈশ্বর আজ্ঞায়।
মহান্ ক্ষমতা বলে অনন্ত ঈশ্বর
প্রথমে স্বর্গ ও পৃথ্বী করিলা সৃজন।[৩]

ইংরেজি সাহিত্য ও সাহিত্য-ইতিহাস ছাড়া ইংরেজির মারফত য়ুরোপীয় সেরা সাহিত্যিকদের অল্পসল্প রচনা ও তাঁহাদের জীবনের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যসম্বন্ধে তথ্য অবগত হইবার সুযোগ রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে লাভ করেন।[৪]

১ ভারতী ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১২৮৫ জ্যৈষ্ঠ।

২ দ্র. জী-স্মৃ খসড়া, বি-ভা-প ১৩৫০ পৌষ পৃ ১২১। স্যাকসন জাতি ও অ্যাংগ্লো-স্যাকসন সাহিত্য, ভারতী ১২৮৫ শ্রাবণ। নর্মান জাতি ও অ্যাংগ্লো-নর্মানসাহিত্য, ভারতী ১২৮৫ ফাল্গুন, ১২৮৬ জ্যৈষ্ঠ।

৩ দ্র. ভারতী ১২৮৫ শ্রাবণ পৃ ১৮০।

৪ I myself have tried to get at the wealth of beauty in the literature of the European languages, long before I gained a full right to their hospitality. When I was young I tried to approach Dante, unfortunately through an English translation. I failed utterly, and felt it my pious duty to desist. Dante remained a closed book to me.

I also wanted to know German literature and by reading Heine in translation, I thought I had caught a glimpse of the beauty there. Fortunately I met a missionary lady from Germany and asked her help. I worked hard for some months, but being rather quick-witted, which is not a good quality, I was not persevering. I had the dangerous facility which helps one to guess the meaning too easily. My teacher thought I had almost mastered the language, which was not true. I succeeded, however, in getting through Heine, like a man walking in sleep crossing unknown paths with ease, and I found immense pleasure.

Then I tried Goethe. But that was too ambitious. With the help of the little German I had learnt, I did go through Faust. I believe I found my entrance to the palace, not like one who has keys for all the doors, but as a casual visitor who is tolerated in some general guest-room, comfortable but not intimate. Properly speaking, I do not know my Goethe, and in the same way many other great luminaries are dusky to me.—Tagore in Contemporary Indian Philosophy edited by S. Radhakrishnan and Muirhead p 29.

এইভাবে তিনি সংস্কৃতের ছন্দোবদ্ধ কাব্যও পাঠ করিয়া যাইতেন; হেবরলিন সম্পাদিত শ্রীরামপুরের ছাপা কাব্যসংগ্রহ[১] ছিল তাঁহার সঙ্গী। "সংস্কৃত বাক্যের ধ্বনি এবং ছন্দের গতি আমাকে কতদিন মধ্যাহ্নে অমরুশতকের মৃদঙ্গঘাতগম্ভীর শ্লোকগুলির মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরিয়াছে।" সংস্কৃতের ছন্দ তাঁহাকে ছোটোবেলা হইতেই আনন্দ দিত। জয়দেব কৃত গীতগোবিন্দের মধুর ছন্দহিল্লোল তাঁহার বালকহৃদয়কে কিভাবে চঞ্চল করিয়াছিল, সেসম্বন্ধে জীবনস্মৃতিতে কবি বিস্তৃতভাবেই লিখিয়াছেন। যে বইখানি তাঁহার হাতে পড়ে, সেটিতে শ্লোকগুলি ছিল টানাছাপা, ছেদাদি দেখিয়া পংক্তি ও ছন্দ ঠিক করা ছিল কঠিন। যেদিন তাহারই একটা শ্লোক যথার্থভাবে যতি রাখিয়া আবৃত্তি করিতে পারিয়াছিলেন, সেদিনের আনন্দের কথা তাঁহার মনে ছিল। এই ছন্দের জন্য আগাগোড়া গীতগোবিন্দখানি নকল করিয়া লইয়াছিলেন। আরও একটু বড়ো হইয়া কুমারসম্ভব পাঠকালে কালিদাসের ছন্দ তাঁহাকে এমনি মুগ্ধ করে যে ঐ কাব্যের প্রথম তিন সর্গ সম্পূর্ণ মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মোটকথা সংস্কৃতের শব্দলালিত্য, রূপকল্পনা, ছন্দমাধুর্য বাল্য বয়স হইতেই তাঁহাকে এই সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট করে। সংস্কৃতের জটিল শব্দার্থ ভালো করিয়া বুঝা তাঁহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল না; শব্দ রূপ ও ছন্দই তাঁহার কাছে বিচিত্র রসসৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

আমেদাবাদে বৃহৎ অট্টালিকার তেতলায় একটি ছোটো ঘর ছিল কবির নিজের থাকার জন্য; শুক্লপক্ষের কত নিস্তব্ধ রাত্রে কবি সাবরমতী নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাদটাতে একলা ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এইরূপ একটা রাত্রে বালক যেমন-খুশি ভাঙা ছন্দে একটা গান রচনা করিলেন— বোধ হয় এই তাঁহার প্রথম গান যাহাতে নিজে সুর দিলেন। গানটি—

নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়, ঘুম ঘোরভরা গান বিভাবরী গায়,
ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাও গো! রজনীর কণ্ঠসাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো।

'বলি ও আমার গোলাপবালা' গানটাও এমনি আর-এক রাত্রে লিখিয়া বেহাগ সুর বসাইয়া গাহিয়াছিলেন। বলিতে পারা যায় গানের মধ্যে নিজের মুক্তির স্বাদ এই প্রথম পাইলেন।

রবীন্দ্রনাথের আমেদাবাদ বাসকালে 'ভারতী'র দ্বিতীয় বর্ষ (১২৮৫) শুরু হয় বৈশাখমাস হইতে; প্রথম বর্ষে নয় মাসে 'বছর' হয়, কারণ প্রথম সংখ্যা বাহির হইয়াছিল শ্রাবণ মাসে। এবৎসরে রবীন্দ্রনাথের লেখনীর বিরাম নাই; প্রথম বর্ষে আরব্ধ 'করুণা' উপন্যাস এবৎসর ভাদ্রমাস পর্যন্ত চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়। আশ্বিন মাসে বিলাত যাত্রা করায় বইখানি সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। উপন্যাস রচনা-বিষয়ে কবির পরবর্তী জীবনের অভ্যাস দেখিয়া মনে হয় তিনি 'করুণা' মাসে মাসে লিখিয়া পত্রিকায় দিতেছিলেন; সমগ্র বইখানি কখনো লেখেন নাই; বিলাত চলিয়া যাওয়াতে উহা আর শেষ হইল না। এই উপন্যাস ছাড়া বহু গদ্য পদ্যরচনা যুগপৎ চলিতেছে, সত্যেন্দ্রনাথ তুকারামের 'অভঙ্গ' মরাঠা হইতে বুঝাইয়া দেন; রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেন। বহু বৎসর পরে 'নবরত্নমালা'র মধ্যে সেই অনুবাদের কয়েকটি স্থান পাইয়াছিল।[২] এই সময়ে রচিত একটি কবিতার কিয়দংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। কবিতাটি আমেদাবাদে ১৮৭৮ জুলাই ৬ তারিখে লিখিত।[৩]

১ কাব্যসংগ্রহ / অর্থাৎ কালিদাসাদি মহাকবিগণ / বিরচিত ত্রিপঞ্চাশৎ / উত্তম সম্পূর্ণ কাব্যানি। / শ্রীডাক্তার যোহন হেবরলিন কর্তৃক / সমাহৃত মুদ্রাঙ্কিতানি॥ / শ্রীরামপুরীয় চন্দ্রোদয় যন্ত্রে / ১৮৪৭

২ নবরত্নমালার ভূমিকায় আছে যে উহার সংস্কৃত কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ কৃত। কিন্তু রবীন্দ্রভবনের মালতী পুঁথির মধ্যে কয়েকটি পাতায় তুকারামের অভঙ্গের অনুবাদ আছে। নবরত্নমালার ভাষার সহিত সামান্য পার্থক্য কোনো কোনো স্থানে দেখা যায়। শ্রীস: [সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর] লিখিত তুকারাম প্রবন্ধে যে কয়টি অভঙ্গের অনুবাদ আছে, তাহার মধ্যে কয়েকটির সহিত পুঁথির মিল আছে। ভারতী ১২৮৫, পৃ ২৫-২৬।

৩ রবীন্দ্রভবন, মালতী পুঁথি।

হে কবিতা— হে কল্পনা—

জাগাও— জাগাও দেবি উঠাও আমারে দীনহীন—
ঢাল এ হৃদয় মাঝে জ্বলন্ত অনলময় বল—
দাও দেবি সে ক্ষমতা— ওগো দেবি শিখাও সে মায়া
যাহাতে জ্বলন্ত দগ্ধ নিরানন্দ মরু মাঝে থাকি—
হৃদয় উপরে পড়ে স্বরগের নন্দনের ছায়া—
হইতেছি অবসন্ন— বলহীন— চেতনারহিত—
অজ্ঞাত পৃথিবীতলে— অকর্মণ্য অনাথ অজ্ঞান
উঠাও— উঠাও মোরে করহ নূতন প্রাণ দান!

দিনে দিনে অবসাদে হইতেছি অবশ মলিন
নির্জীব এ হৃদয়ের দাঁড়াবার নাই যেন বল।
...
পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে যুঝিব যুঝিব দিনরাত—
কালের প্রস্তরপটে লিখিব অক্ষয় নিজ নাম
অবশ নিদ্রায় পড়ি করিবনা এ শরীর পাত
মানুষ জন্মেছি যবে করিব কর্মেরি অনুষ্ঠান
অগম্য উন্নতি পথে পৃথ্বি তরে গঠিব সোপান।

বিলাত যাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র বিষয় অধ্যয়নে রত; অনেকগুলি রচনা এই অধ্যয়নের প্রত্যক্ষ ফল। বিলাত যাইতেছেন,— সেখানকার শিষ্টাচার সম্বন্ধে কোনো ইংরেজি বই পড়িয়াছেন, তাহারই উপর লিখিলেন 'ইংরেজদিগের আদব কয়দা।'[১] ইংরেজিসাহিত্য ও ইতিহাস পড়িতে হইতেছে। কবি লিখিয়াছেন, "মেজদাদাকে বলিলাম আমি ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস বাংলায় লিখিব, আমাকে বই আনিয়া দিন। তিনি আমার সম্মুখে টেন্ [Taine] প্রভৃতি গ্রন্থকাররচিত ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসসংক্রান্ত রাশি রাশি গ্রন্থ উপস্থিত করিলেন। আমি তাহার দুরূহতা বিচারমাত্র না করিয়া অভিধান খুলিয়া পড়িতে বসিয়া গেলাম। সেই সঙ্গে আমার লেখাও চলিতে লাগিল। এমনকি অ্যাংলো-স্যাক্সন ও অ্যাংলো-নর্মান সাহিত্য সম্বন্ধীয় আমার সেই প্রবন্ধগুলাও ভারতীতে বাহির হইয়াছিল।"[২] একটি প্রবন্ধের মধ্যে তিনি ইংরেজদের আদিকবি কিডমনের পদ্য-বাইবেল হইতে কয়েকটি অংশ বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহার সামান্য নমুনা উদ্ধৃত করিলাম—

গুহা-অন্ধকার ছাড়া ছিল না কিছুই!
এ মহা অতলস্পর্শ আঁধার গভীর—
আছিল দাঁড়ায়ে শুধু শূন্য নিষ্ফল
উন্নত ঈশ্বর তবে দেখিলা চাহিয়া
এই নিরানন্দ স্থান! দেখিলা হেথায়

অন্ধকার, বিষণ্ণ ও শূন্য মেঘরাশি
রহিয়াছে চিরস্থির নিশীথিনী ল'য়ে।
উত্থিত হইল সৃষ্টি ঈশ্বর আজ্ঞায়।
মহান্ ক্ষমতা বলে অনন্ত ঈশ্বর
প্রথমে স্বর্গ ও পৃথ্বী করিলা সৃজন।[৩]

ইংরেজি সাহিত্য ও সাহিত্য-ইতিহাস ছাড়া ইংরেজির মারফত য়ুরোপীয় সেরা সাহিত্যিকদের অল্পসল্প রচনা ও তাঁহাদের জীবনের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যসম্বন্ধে তথ্য অবগত হইবার সুযোগ রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে লাভ করেন।[৪]

১ ভারতী ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১২৮৫ জ্যৈষ্ঠ।

২ দ্র. জী-স্মৃ খসড়া, বি-ভা-প ১৩৫০ পৌষ পৃ ১২১। স্যাকসন জাতি ও অ্যাংগ্লো-স্যাকসন সাহিত্য, ভারতী ১২৮৫ শ্রাবণ। নর্মান জাতি ও অ্যাংগ্লো-নর্মানসাহিত্য, ভারতী ১২৮৫ ফাল্গুন, ১২৮৬ জ্যৈষ্ঠ।

৩ দ্র. ভারতী ১২৮৫ শ্রাবণ পৃ ১৮০।

৪ I myself have tried to get at the wealth of beauty in the literature of the European languages, long before I gained a full right to their hospitality. When I was young I tried to approach Dante, unfortunately through an English translation. I failed utterly, and felt it my pious duty to desist. Dante remained a closed book to me.

I also wanted to know German literature and by reading Heine in translation, I thought I had caught a glimpse of the beauty there. Fortunately I met a missionary lady from Germany and asked her help. I worked hard for some months, but being rather quick-witted, which is not a good quality, I was not persevering. I had the dangerous facility which helps one to guess the meaning too easily. My teacher thought I had almost mastered the language, which was not true. I succeeded, however, in getting through Heine, like a man walking in sleep crossing unknown paths with ease, and I found immense pleasure.

Then I tried Goethe. But that was too ambitious. With the help of the little German I had learnt, I did go through Faust. I believe I found my entrance to the palace, not like one who has keys for all the doors, but as a casual visitor who is tolerated in some general guest-room, comfortable but not intimate. Properly speaking, I do not know my Goethe, and in the same way many other great luminaries are dusky to me.—Tagore in Contemporary Indian Philosophy edited by S. Radhakrishnan and Muirhead p 29.

দান্তে, পিত্রার্ক, গ্যেটে তাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করে। বিয়াত্রীচের প্রতি দান্তের[১] অমর প্রেমকাহিনী, লরার প্রতি পিত্রার্কের[২] স্বার্থশূন্য অনুরাগ, বালক কবিকে যেমন মুগ্ধ করিয়াছিল, তেমনি আশ্চর্য করিয়াছিল গ্যেটের[৩] চরিত্র। দান্তে ও পিত্রার্ক তাঁহাদের আরাধ্যা প্রেমাস্পদাকে দূর হইতে দেখিয়াছেন, কাব্যের মধ্যে প্রেমাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছেন; তাসো লিওনারার প্রেমে আত্মহারা হইয়া জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কেবল যাতনা ও উৎপীড়নের ভাগী হইয়া পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। মধ্য যুগীয় য়ুরোপের এইসব কবি-কাহিনী তরুণ বাঙালি কবির মনে কী রস সঞ্চার করিত তাহার রহস্যভেদ করা অসম্ভব। গ্যেটের জীবনকাহিনীও তাঁহার কাছে অদ্ভুত ঠেকিল। জর্মান মহাকবি তাঁহার বাল্যকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত একজনের পর আর-একজন নারীকে ভালোবাসিয়াছিলেন, বহু নারীও তাঁহাকে ভালোবাসিয়াছিল। বাল্যকালে গ্যেটে ফুলের পাঁপড়ি ও পাখির পাখনা ছিঁড়িয়া দেখিতেন যে উহারা কিভাবে গ্রথিত, তেমনি আজীবন তিনি রমণীদের হৃদয় লইয়া বিশ্লেষণ ও স্বয়ং কিয়দ্‌পরিমাণে হৃদয়াবেগ অনুভব করিতেন কিন্তু সে প্রেম ছিল তাঁহার ইচ্ছাধীন, প্রয়োজন অতীত হইলেই সে প্রেম দূর করিতে তাঁহার বড়ো একটা কষ্ট হইত না। গ্যেটের রচনা হইতে এই অংশটি রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করিয়া দেন।

এইসব কবিদের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের জীবনে গভীর না হইলেও এই বাল্য বয়সে তাঁহাদের সাহিত্য আলোচনা কাব্যজীবনে একেবারে ব্যর্থ হয় নাই, কারণ প্রত্যেকের কবিতা হইতে কিছু কিছু তর্জমা করিয়াছিলেন। দান্তের একটি সনেটের অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

প্রেম বন্দী-হৃদি যাঁরা, সুকোমল মন,
যাঁরা পড়িবেন এই সঙ্গীত আমার,
তাঁরা মোর অনুনয় করুন শ্রবণ,
বুঝায়ে দিউন্ মোরে অর্থ কি ইহার?
যেকালে উজ্জ্বল-তারা উজলে আকাশ,
নিশার চতুর্থ ভাগ হোয়ে গেছে শেষ,
প্রেম মোর নেত্রে আসি হোলেন প্রকাশ,
স্মরিলে এখনো কাঁপে হৃদয় প্রদেশ!
দেখে মনে হোল যেন প্রফুল্ল আনন;
মোর হৃদ্‌পিণ্ড রহে করতলে তাঁর;
বাহু পরে শান্তভাবে করিয়া শয়ন
ঘুমাইয়া রয়েছেন মহিলা আমার—
অবশেষে জাগি উঠি, প্রেমের আদেশে
সভয়ে জ্বলন্ত-হৃদি করিলা আহার!
তারপরে চলি গেলা প্রেম অন্য দেশে
কাঁদিতে কাঁদিতে অতি বিষণ্ণ-আকার।[৪]

দান্তের ভিটানুভা ও ডিভাইনা কমেডিয়া হইতেও কিছু কিছু অনুবাদ এই প্রবন্ধের মধ্যে আছে। বাহুল্য ভয়ে অধিক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম না। পিত্রার্কার কবিতার অনুবাদের একটি নমুনা আমরা উদ্ধৃত করিলাম—

হারে হতভাগ্য বিহঙ্গম সঙ্গীহীন!
সুখ-ঋতু অবসানে গাহিছিস্ গীত!
ফুরাইছে গ্রীষ্ম ঋতু ফুরাইছে দিন
আসিছে রজনী ঘোর আসিতেছে শীত!
ওরে বিহঙ্গম, তুই দুখ গান গাস্
যদি জানিতিস্ কি যে দহিছে এ প্রাণ
তা হ'লে এ বক্ষে আসি করিতিস্ বাস,
এর সাথে মিশাতিস্ বিষাদের গান!
কিন্তু হা—জানি না তোর কিসের বিষাদ,
ভ্রমিসরে যার লাগি গাহিয়া গাহিয়া,
হয়ত সে বেঁচে আছে বিহঙ্গিনী প্রিয়া,
কিন্তু মৃত্যু এ কপালে সাধিয়াছে বাদ!
সুখ দুঃখ চিন্তা আশ যা' কিছু অতীত,
তাই নিয়ে আমি শুধু গাহিতেছি গীত।[৫]

১ বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য, ভারতী ১২৮৫ ভাদ্র। দান্তে (Dante Alighieri) ১২৬৫—১৩২১) ইতালিয়ান ভাষার আদি কবি। ভিটানুভা বা নূতন জীবন, ডিভাইনা কমেডিয়া তাঁহার বিখ্যাত কাব্য।

২ পিত্রার্ক ও লরা, ভারতী ১২৮৫, আশ্বিন। পেত্রার্ক (Petrarca, Francesco ১৩০৪-১৩৭৪। ইতালীয় কবি। ১৩৪০ রোম মহানগরীতে ইঁহাকে জনসাধারণের পক্ষ হইতে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। ইনি সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতার প্রবর্তক।

৩ গ্যেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ, ভারতী ১২৮৫ কার্তিক। গ্যেটে (Goethe, Johann Wolfgang Von) (১৭৪৯—১৮৩১) জর্মান কবি ও লেখক, ফাউস্ট নামে নাটকের জন্য অমরতা লাভ করিয়াছেন।

৪ ভারতী ১২৮৫ ভাদ্র পৃ ২-৪।

৫ ভারতী ১২৮৫ আশ্বিন, পৃ ২৭৭।

য়ুরোপীয় কাব্য ও সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ ব্যতীত কাব্য সমালোচনা সম্বন্ধেও পড়াশুনা চলিতেছে। 'কাল্পনিক এবং বাস্তবিক দুই ভাবের দুই প্রকার লোক' (ভারতী ১২৮৫ ভাদ্র) শীর্ষক প্রবন্ধ নীতি ধর্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে সাড়ম্বর আলোচনায় পূর্ণ। বালকের চিন্তাধারা ও রচনারীতির নিদর্শনস্বরূপ নিম্নে কয়েকটি পংক্তি ঐ প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি— লেখক বলিতেছেন যে কল্পনাশ্রয়ী ও বস্তু-আশ্রয়ী দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে ভাববৈষম্য অনেক। "একজন সত্য বা মঙ্গলের অনুশীলনে আপনাকে ভুলিয়া যান— ইনি বাস্তবিক-ভাবের লোক ; আর একজন সত্যেরও আন্দোলন করিয়া থাকেন, মঙ্গলেরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন কিন্তু আপনাকে কখনই ভুলেন না— ইনি কাল্পনিক-ভাবের লোক।" কাল্পনিক ব্যক্তিদের ..."কার্য্যের পরিচয় যত পাও আর না পাও, গুণের পরিচয় বিলক্ষণই পাইবে।...তিলপ্রমাণ কার্য্যের তালপ্রমাণ নাম দিতে না-পারিলে কোন মতেই সুস্থির থাকিতে পারেন না।" "দেশকালপাত্রবিবেচনাবর্জ্জিত অসঙ্গত অনুকরণ,...নামপরায়ণতা অর্থাৎ কার্য্য অপেক্ষা নামের প্রতি অধিক দৃষ্টি।..." তরুণলেখক এই প্রবন্ধে বাঙালি-জাতি কিভাবে নিজ সমস্যা নিজে সমাধান করিলে উন্নতির পথে আশ্রয় পাইবে, তদ্‌বিষয়ে আলোচনার চেষ্টা করিয়াছেন। যাহাই হউক, এইসব গদ্যের রচনারীতি দুর্বল, ভাব ও ভাষা অতিশয়োক্তিতে স্ফীত।[১]

সাহিত্যে আর যাহাই সৃষ্টি করুন, মাঝে মাঝে গল্প বা কাহিনী সৃষ্টি না করিতে পারিলে কল্পনাকুশল কবিচিত্তের সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। রবীন্দ্রজীবনে এই তত্ত্বটি বার বার আমাদের চোখে পড়িবে। বনফুল ও কবিকাহিনী সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল গল্পবলা। এইবার আরম্ভ করিলেন কবিতায় গল্প, যাহাকে 'গাথা' নাম দিয়া শৈশবসঙ্গীতের মধ্যে পরে সংগৃহীত হয়। কিন্তু এই গাথাসাহিত্যের সকলগুলিই ঠিক এই সময়ে রচিত নহে ; কতকগুলি কয়েক বৎসর পূর্বে রচিত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস, এবং সেগুলিকে যথার্থ গাথা বলাও ভুল। ফুলবালা[২] এই ধরনের গাথা— অন্যান্য গাথা হইতে ইহার সুর সম্পূর্ণ পৃথক্, 'প্রকৃতির খেদ' প্রভৃতি কবিতার যুগে রচিত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ইহাতে বনের বর্ণনা, ফুলের কথা আছে ; অশোক, মালতী, মাধবী প্রভৃতি ফুলেরা কাননে খেলা করিতেছে। রবীন্দ্রনাথের বৃদ্ধবয়সে রচিত প্রকৃতিগাথা বা ঋতু-উৎসবের গানে অশোক মালতী মাধবী বারে বারে আবির্ভূত হইয়াছে। এই 'ফুলবালা' গাথার মধ্যে একটি গান আছে, সেটি আমরা উদ্ধৃত করিলাম—

গোলাপ ফুল— ফুটিয়ে আছে মধুপ হোথা যাস্ নে—
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে কাঁটার ঘা খাস্ নে !
হেথায় বেলা, হোথায় চাঁপা শেফালী হোথা ফুটিয়ে—
ওদের কাছে মনের ব্যথা বল্ রে মুখ ফুটিয়ে !

ভ্রমর কহে, 'হোথায় বেলা হোথায় আছে নলিনী—
ওদের কাছে বলিব নাকো আজিও যাহা বলি নি !
মরমে যাহা গোপনে আছে গোলাপে তাহা বলিব,
বলিতে যদি জ্বলিতে হয় কাঁটার ঘায়ে জ্বলিব।'

এই গাথার একটি গান প্রথম সংস্করণ গীতবিতান পর্যন্ত আসিয়াছিল ; সেটি হইতেছে "দেখে যা— দেখে যা— দেখে যা লো তোরা সাধের কাননে মোর সাধের কুসুম উঠেছে ফুটিয়া"...ইত্যাদি। 'ফুলবালা' গানটির ভাষার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র এবং অক্ষয় চৌধুরীর 'উদাসীনী'র ছায়া ও প্রভাব যথেষ্ট আছে তাহা সামান্য প্রণিধানেই বুঝা যাইবে, নিম্নের কয়েকটি পংক্তি তাহার সাক্ষ্য।

১ "কল্পনা এবং কাল্পনিকতা দুইয়ের মধ্যে একটা মস্ত প্রভেদ আছে। যথার্থ কল্পনা, যুক্তি সংযম এবং সত্যের দ্বারা সুনির্দিষ্ট আকারবদ্ধ— কাল্পনিকতার মধ্যে সত্যের ভান আছে মাত্র কিন্তু তাহা অদ্ভুত আতিশয্যে অসংগতরূপে স্ফীতকায়।... এক শ্রেণীর পাঠকেরা এইরূপ ভূরিপরিমাণ কৃত্রিম কাল্পনিকতার নৈপুণ্যে মুগ্ধ এবং অভিভূত হইয়া পড়েন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে সেই শ্রেণীর পাঠক বিরল নহে।"(সাধনা—১৩০০ বঙ্কিমচন্দ্র) দ্র. আধুনিক সাহিত্য পৃ ৯-১০।

২ ফুলবালা, ভারতী ১২৮৫ কার্তিক। শৈশব সঙ্গীত, রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংস্করণ ১ম পৃ ৪২৯-৪৪১।

একি একি ওগো কলপনা সখি ! কোথায় আনিলে মোরে !
ফুলের পৃথিবী—ফুল্লের জগৎ—স্বপন কি ঘুম ঘোরে ?
হাসি কলপনা কহিল শোভনা "মোর সাথে এস কবি !
দেখিবে কত কি অদ্ভুত ঘটনা কত কি অদ্ভুত ছবি !"...
কহিল হাসিয়া কলপনা বালা দেখায়ে কত কি ছবি ;
"ফুলবালাদের প্রেমের কাহিনী শুনিবে এখন কবি ?"

গাথাসাহিত্যের মধ্যে যথার্থ পড়ে 'প্রতিশোধ'[১] 'লীলা'[২] 'অপ্সরা-প্রেম'[৩] এবং পর বৎসর বিলাত বাসকালে রচিত 'ভগ্নতরী'।[৪] পাঠক লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের মধ্যে যে কয়টি কাব্য ও গাথা রচিত হয়, তাহার সবগুলি ট্রাজেডি ; ইহারই অন্তে 'সন্ধ্যা সঙ্গীতে'র সূচনা। তাহারও মধ্যে বিষাদবিজড়িত হৃদয়ের বেদনা তীব্র।

কয়েক মাস আমেদাবাদে রাখিয়া সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে বোম্বাইয়ে তাঁহার এক বন্ধুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন ; তথায় মাস দুইএর বেশি থাকা হয় নাই। বিলাতে যাইবার পূর্বে তাঁহাকে ইংরেজি চালচলনে ও কথাবার্তায় পাকা-করা দরকার। বোম্বাইয়ের পাণ্ডুরঙ্গ পরিবার ইংরেজি শিক্ষায় ও ইংরেজিয়ানার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু দাদোবা পাণ্ডুরঙ্গের বিলাত-ফেরতা কন্যা আন্না তরখড়-এর (Anna) ছিল ইংরেজিতে অসাধারণ দখল। রবীন্দ্রনাথ হইতে বয়সে তিনি কিছু বড়ো। এই অসাধারণ সুন্দরী যুবতীর নিকট তিনি ইংরেজি বলা-কওয়ার পাঠ লইতেন। রবীন্দ্রনাথ ইঁহার শিক্ষকতায় কতখানি ইংরেজি শিখিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি না, তবে তাঁহার 'কবিকাহিনী' কাব্যখানি তর্জমা করিয়া করিয়া নূতন বান্ধবীকে শুনাইয়া মুগ্ধ করিতেন। ভারতীর যে খণ্ডগুলিতে 'কবিকাহিনী' প্রকাশিত হইয়াছিল আন্নাকে সেগুলি উপহার দিয়া যান। গ্রন্থাকারে উহা প্রকাশিত হইলে বোধ হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে আন্নাকে একখণ্ড 'কবিকাহিনী' পাঠাইয়া দিলেন ; তদুত্তরে আন্না লিখিয়াছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ ভারতী হইতে উহা read and translated to me till I know the poem by heart.[৫]

এই তরুণী রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে বহুদিন অধিকার করিয়াছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে কবি তাঁহার 'ছেলেবেলা'য় লিখিয়াছেন, "আমার বিদ্যে সামান্যই, আমাকে হেলা করলে দোষ দেওয়া যেতে পারত না। তা করেননি। পুঁথিগত বিদ্যে ফলাবার মতো পুঁজি ছিল না, তাই সুবিধে পেলেই জানিয়ে দিতুম যে কবিতা লেখবার হাত আমার আছে। আদর আদায় করবার ঐ ছিল আমার সবচেয়ে বড়ো মূলধন। যাঁর কাছে নিজের এই কবিআনার জানান্ দিয়েছিলেম, তিনি সেটাকে মেপেজুখে নেননি, মেনে নিয়েছিলেন।"

কবির কাছ থেকে তিনি একটি ডাক নাম চান, কবি নাম দেন 'নলিনী' ; শুধু তাই নয় নামটাকে কাব্যের গাঁথুনিতে বাঁধিয়া দিলেন, ভৈরবী সুরে সুর দিয়া তাঁকে শুনাইলেন। কবির গান প্রায়ই শুনিতেন ; একদিন তরুণী বলিয়াছিলেন, "তোমার গান শুনলে আমি বোধ হয় আমার মরণদিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি।"

এই তরুণী কবিকে যে ভালোবাসিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই। 'তীর্থঙ্করে'[৬] এই তরুণীর প্রেমলীলার যে সামান্য চিত্র ব্যক্ত হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট। কবি দিলীপকুমারকে বলিয়াছিলেন, "সে মেয়েটিকে আমি ভুলি নি বা তার সে-আকর্ষণকে কোনো লঘু লেবেল মেরে খাটো ক'রে দেখি নি কোনোদিন। আমার জীবনে তারপরে নানান্ অভিজ্ঞতার আলোছায়া খেলে গেছে— বিধাতা ঘটিয়েছেন কত যে অঘটন— কিন্তু আমি একটা কথা বলতে পারি গৌরব ক'রে যে, কোনো মেয়ের ভালোবাসাকে আমি কখনো ভুলেও অবজ্ঞার চোখে দেখি নি— তা সে-ভালোবাসা যে-রকমই হোক না কেন।" এই তরুণী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় যে কথাটি প্রচ্ছন্নভাবে বলিয়াছেন তাহা অতি স্পষ্ট। "জীবন-

১ ভারতী ১২৮৫ শ্রাবণ। ২ ঐ আশ্বিন। ৩ ঐ ফাল্গুন। ৪ ভারতী ১২৮৬ আষাঢ়।
৫ শনিবারের চিঠি ১৩৪৬ পৌষ। ব্রজেন্দ্র, রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয় পৃ ২।
৬ দিলীপকুমার রায়, তীর্থঙ্কর ১৩৪৬, পৃ ২০৫।

যাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন-মানুষের দূতী, হৃদয়ের দখলের সীমানা বড়ো করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই আসে, শেষকালে একদিন ডেকে আর পাওয়া যায় না।"

আমাদের সন্দেহ হয় 'শৈশবসঙ্গীতে'র কয়েকটি কবিতা ও গানের মধ্যে এই তরুণীর মর্মবেদনা কবির ভাষায় রূপ পাইয়াছে। 'ফুলের ধ্যান', 'অপ্সরা-প্রেম', কবিতা দুইটি এই বেদনাভারে নত। রবীন্দ্রনাথের 'শুন, নলিনী খোল গো আঁখি' গানটি ইহারই উদ্দেশে রচিত, তাহা কবি তো স্বয়ং ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। আর-একটি গান এই তরুণীস্মরণে রচিত বলিয়া আমাদের মনে হয়— "আমি স্বপনে রয়েছি ভোর, সখী, আমারে জাগায়ো না।" আন্নার দস্তানা চুরি সম্বন্ধে যে কৌতুককাহিনী তীর্থঙ্করে বর্ণিত আছে, ইহা তাহারই স্মরণে রচিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। আন্নার ধারণা ছিল যে ঘুমাইয়া পড়িলে যদি কেহ কোনো মেয়ের দস্তানা চুরি করে, তবে অপহারকের অধিকার জন্মায় মেয়েটিকে চুমো খাওয়ার। যাহাই হউক নলিনী সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কবিতা অপ্রকাশিত আছে। আমরা দুইটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—[১]

দামিনীর আঁখি কিবা ধরে জ্বল জ্বল বিভা
কার তরে জ্বলিতেছে কেবা তাহা জানিবে!
চারিদিকে তীক্ষ্ণধার—বাণ ছুটিতেছে তার
কার পরে লক্ষ্য তার কেবা অনুমানিবে।
তার চেয়ে নলিনীব আঁখি-পানে চাহিতে
কত ভাল লাগে তাহা কে পারিবে কহিতে
সদা তার আঁখি দুটি, নিচু পানে আছে ফুটি
সে আঁখি দেখেনি কেহ উঁচুপানে তুলিতে!
যদিবা সে ভুলে কভু চায় কারো আননে—
সহসা লাগিয়া জ্যোতি— সে জন বিস্ময়ে অতি
চমকিয়া উঠে যেন স্বরগের কিরণে!
ও আমার নলিনীলো— লাজমাখা নলিনী—
অনেকের আঁখি পরে সৌন্দর্য্য বিরাজ করে
তোর আঁখি পরে প্রেম—নলিনী লো নলিনী।

দামিনীর দেহে রয়—বসন কনকময়
সে বসন অপ্সরী সৃজিয়াছে যতনে
যে গঠন যেই স্থান, প্রকৃতি করেছে দান
সে সকল ফেলিয়াছে ঢাকিয়া সে বসনে।
নলিনী বসন পানে দেখ দেখি চাহিয়া
তার চেয়ে কত ভাল কে পারিবে কহিয়া!
শিথিল বসন তার—ওই দেখ চারিধার
স্বাধীন বায়ুর মতো উড়িতেছে বিমানে—
যেথা যে গঠন আছে, পূর্ণভাবে বিকাশিছে
যেখানে যা উঁচুনিচু প্রকৃতির বিধানে!
ও আমার নলিনী গো—সুকোমলা নলিনী
মধুর রূপের ভাস—তাই প্রকৃতির বাস
সেই বাস তোর দেহে নলিনী লো নলিনী!

বিলাতে। 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'।

রবীন্দ্রনাথের বয়স এখন সতেরো বৎসর পাঁচমাস; আমেদাবাদে মাস চার ও বোম্বাইএ মাস দুই কাটাইয়া তিনি বিলাত চলিলেন, সঙ্গে 'মেজদাদা' সত্যেন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ ফার্লো[২] লইয়া ইংলন্ডে যাইতেছেন, তাঁহার স্ত্রী পুত্রকন্যা ইতিপূর্বে বিলাতে গিয়াছিলেন।

বোম্বাই হইতে 'পুণা' স্টীমারে তাঁহারা যাত্রা করিলেন।[৩] ছয়দিন পরে জাহাজ এডেন বন্দরে পৌছাইল; ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ সমুদ্রপীড়াদি উপসর্গ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পথের ও প্রবাসের বর্ণনা দিয়া পত্রধারা লিখিতে

১ মালতীপুঁথি, রবীন্দ্রভবন।

২ Substantive appointment Judge and Sessions Judge Ahmedabad. Subsidiary leave' from 14th to 19th Sep. 1878. Furlough from 20th Sep. 1878 to 10th May 1880.

৩ যাত্রার তারিখ ১৮৭৮ সেপ্টেম্বর ২০ (১২৮৫ আশ্বিন ৫)।

শুরু করিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই প্রবাসকাহিনীর সুবিস্তৃত বিবরণ ভারতী পত্রিকায় 'য়ুরোপযাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্র' নামে ধারাবাহিক প্রকাশ করেন।[১] বিলাত হইতে ফিরিবার কয়েক মাস পরে (১২৮৮) এই পত্রগুলি 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' এই সংক্ষিপ্ত নামে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। এই সময়ের অনেক কথা তিনি জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন, যাহা পত্রধারার মধ্যে পাই না। এছাড়া এখানে সেখানে বলা পুরাতন কথার মধ্যেও ইংলন্ড-বাসের চিত্র পাওয়া যায়। এইসব রচনা হইতেছে এ যুগের কবিজীবনীর প্রধানতম উপাদান।

সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা এই তাঁহার প্রথম, এই নূতনের অভিজ্ঞতা কবিচিত্তে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তাহা তাঁহার প্রথম পত্রেই প্রকাশ পায়। তিনি লিখিতেছেন, "কল্পনায় সমুদ্রকে যা' মনে করতেম, সমুদ্রে এসে দেখি তার সঙ্গে অনেক বিষয় মেলেনা। তীর থেকে সমুদ্রকে মহান্ বোলে মনে হয়, কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে এলে আর ততটা হয় না। তার কারণ আছে; আমি যখন বম্বের উপকূলে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখ্‌তেম তখন দেখ্‌তেম, দূর দিগন্তে গিয়ে নীল জল নীল আকাশে মিশিয়ে গিয়েছে, কল্পনায় মনে করতেম যে, একবার যদি ঐ দিগন্তের আবরণ ভেদ কোরতে পারি— ঐ দিগন্তের যবনিকা উঠাতে পারি, অমনি আমার সুমুখে এক অকূল অনন্ত সমুদ্র একেবারে উথ্‌লে উঠ্‌বে। ঐ দিগন্তের পর যে কি আছে তা আমার কল্পনাতেই থাকৃত, তখন মনে হোত না, ঐ দিগন্তের পরে আর এক দিগন্ত আসবে! কিন্তু যখন সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়ি, তখন মন হয় যে, জাহাজ যেন চোল্‌চে না, কেবল একটি দিগন্তের গণ্ডীর মধ্যে বোসে আছে। আমাদের কল্পনার পক্ষে সে দিগন্তের সীমা এত সঙ্কীর্ণ যে মন কেমন তৃপ্ত হয় না।"[২]

"এডেন থেকে সুয়েজে যেতে দিন পাঁচেক লেগেছিল।" রবীন্দ্রনাথরা ওভারল্যান্ড্ বা ডাঙাপেরোনো যাত্রী; তাই লোহিত সাগরের বন্দর সুয়েজে নামিয়া রেলপথে মিশরের মধ্য দিয়া গিয়া ভূমধ্যসাগরের বন্দর অ্যালেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছান। এই পথ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "সমস্ত রাত্রিই গাড়ি চোলেছে, দিনের বেলা যখন জেগে উঠ্‌লেম তখন দেখ্‌লেম ধূলোয় আমাদের কেবল গোর হয় নি, আর সব হয়েছে।···এই রকম ধূলোমাখা সন্ন্যাসীর বেশে আমরা অ্যালেকজান্দ্রিয়াতে গিয়ে পৌঁছলেম।···অ্যালেকজান্দ্রিয়ার বন্দর খুব প্রকাণ্ড। অসংখ্য অসংখ্য জাহাজ এখানে আশ্রয় পায়। য়ুরোপীয়, মুসলমান সকল প্রকার জাতিরই জাহাজ এ বন্দরে আছে, কেবল দুঃখের বিষয় হিন্দুদের জাহাজ নেই।"

'মঙ্গোলিয়া' ষ্টীমারে করিয়া চার পাঁচ দিন পরে ইঁহারা ইতালির বন্দর ব্রিন্দিসি পৌঁছাইলেন; তখনকার দিনে বিলাত যাইবার এই ছিল ডাঙা-পারানো পথ। স্বল্পক্ষণের পরিচয় এই বন্দরের সঙ্গে; তবুও সেখানকার একটি বাগানের শোভা তাঁহার মনকে বিশেষভাবেই স্পর্শ করিয়াছিল; এই ঘটনার আটচল্লিশ বৎসর পরে (১৯২৬) যখন তিনি মুসোলিনির আমন্ত্রণে রাজসমারোহে ইতালিতে প্রবেশ করেন, তখন ইতালির দ্বারে য়ুরোপের সহিত তাঁহার এই প্রথম পরিচয়ের কথা উল্লেখ করিয়া ইতালিকে অভিনন্দিত করেন।

ব্রিন্দিসি হইতে রেলপথ ইতালির মধ্য দিয়া গিয়া আল্পস পর্বতমালার অন্যতম সুরঙ্গ মাউণ্ট সেনিস ভেদ করিয়া ফ্রান্সে প্রবেশ করিয়াছে। "ইটালী থেকে ফ্রান্স পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তা— নির্ঝর, নদী, পর্বত, গ্রাম, হ্রদ, দেখতে দেখতে পথের কষ্ট ভুলে" গেলেন। তারপর দিন সকাল বেলায় প্যারিসে গিয়া পৌঁছিলেন। তখন সেখানে ১৮৮৭ সালের বিখ্যাত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী চলিতেছে; একবার সেখানটা ঘুরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু লিখিতেছেন, "একমাস থাকলে তবে তা বর্ণনা করবার দুরাশা করতেম।" তবে প্যারিসের 'টার্কিস বাথে'র বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। প্যারিসে একদিনের বেশি থাকা হয় নাই এবং লন্ডনে পৌঁছাইয়াও দুই এক ঘণ্টার বেশি থাকিলেন না; সোজা ব্রাইটনে চলিয়া গেলেন; মেজোবৌঠান ও শিশুরা ছিল সেখানে।

১ ভারতী ৩য় বর্ষ ১২৮৬ বৈশাখ-পৌষ, ফাল্গুন, ১২৮৭ বৈশাখ-শ্রাবণ। ২ ভারতী ১২৮৬ বৈশাখ পৃ ৪৪-৪৫।

ব্রাইটন লন্ডন হইতে মাইল পঞ্চাশ দূরে, সাসেক্স জেলার সমুদ্রতীরস্থ শহর। মেজোবৌঠাকুরানীর যত্নে এবং শিশু সুরেন্দ্রনাথ (৬) ও ইন্দিরার (৫) বিচিত্র উৎপাত উপদ্রবের আনন্দে দিন বেশ কাটিয়া যাইতে লাগিল। জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন "শিশুদের কাছে হৃদয়কে দান করিবার অবকাশ সেই আমার জীবনে প্রথম ঘটিয়াছিল"। সেইজন্য সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবীর প্রতি কবির স্নেহ অত্যন্ত প্রগাঢ় ও অকৃত্রিম।

অল্পকালের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথকে তথাকার একটি পাব্লিক স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল। ব্রাইটন ক্ষুদ্র শহর; তথাকার ইংরেজসমাজে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ সুদর্শন রবীন্দ্রনাথের সহজেই মিলিল। শহরের নাচসভায় বিলাতী নাচে দীক্ষা হয় এবং এইখানে ইংরেজি গানেরও শিক্ষা শুরু হয়। 'ভারতী'র পত্রধারায় নাচপার্টি প্রভৃতির কথা বেশ ফলাও করিয়া বলিতে কোনো সংকোচ তো বোধ করেনই না-ই, বরং লিখিতে যেন বেশ একটু উল্লাস বোধ করিতেন। 'অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে পাগলের মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াতে' তাঁহার 'ভাল লাগে না' সত্য, কিন্তু 'যাদের সঙ্গে···বিশেষ আলাপ আছে, তাদের সঙ্গে নাচতে মন্দ লাগে না।'[১] কোনো কুমারীর সঙ্গে 'বেশ আলাপ ছিল' আর তাঁকে বেশ দেখতে, তাই তার সঙ্গে Gallop নৃত্য করিয়াছিলেন, ও তাহাতে কিছু ভুল হয় নাই। অপরিচিতদের সহিত নাচিতে গিয়া বারে বারে ভুল হইয়াছিল বলিয়া কী আপসোস প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু এমন সুখে বেশি দিন থাকা হইল না। সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু কলিকাতা হাইকোর্টের উদীয়মান ব্যারিস্টার তারকনাথ পালিত তখন বিলাতে; তিনি তাঁহার বালকপুত্র লোকেনকে লইয়া বিলাতে আসিয়াছিলেন ও তাহাকে ইতিপূর্বে কলেজে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন 'রবি' এমন করিয়া ব্রাইটনে বউঠাকুরানীর কাছে বসিয়া থাকিলে না শিখিবে লেখাপড়া, না চিনিবে বিলাত। তাই তাঁহারই ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথকে লন্ডনে যাইতে হইল। লন্ডনে আনিয়া তাঁহাকে একটা বাসায় একলা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সে বাসাটা ছিল রিজেন্ট উদ্যানের সম্মুখেই। সেই বাসায় থাকাকালে তিনি যে এক ভদ্রলোকের কাছে লাতিন ভাষা শিখিতেন, তাঁহার কথা জীবনস্মৃতিতে বিশেষভাবে বলিয়াছেন। পালিত মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে লন্ডন য়ুনিভার্সিটি কলেজে ভর্তি করিয়া দিলেন। লোকেনের সহিত এইখানে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয় এবং সে-কাহিনী তিনি জীবনস্মৃতিতে অতিবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লোকেন তাঁহা হইতে বয়সে বৎসর চারের ছোটো কিন্তু ইংরেজি ভাষাটা এই অল্প বয়সে সে ভালোই জানিত। কবি লিখিয়াছেন, "য়ুনিভার্সিটি কলেজের লাইব্রেরিতে ·· আমাদের ·· হাস্যালাপ চলিত··· সাহিত্য আলোচনাও করিতাম। সে আলোচনায় বালক বন্ধুকে অর্বাচীন বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না। যদিও বাংলা বই সে আমার চেয়ে অনেক কম পড়িয়াছিল কিন্তু চিন্তাশক্তিতে সেই কমিটুকু সে অনায়াসেই পোষাইয়া লইতে পারিত।" লোকেনের সঙ্গে বাল্যকালে যে সৌহার্দ্যবন্ধন স্থাপিত হয়, তাহা লোকেনের লোকান্তরকাল পর্যন্ত তাঁহার জীবনের নানা পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও অক্ষুণ্ণ ছিল। রবীন্দ্রকাব্যসাহিত্যের এমন নৈষ্ঠিক ভক্ত ও রসজ্ঞ সমঝদার সেযুগে খুব কমই ছিল।

লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে তখন হেন্‌রি মর্লি (১৮২২-৯৪) ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। মর্লির অধ্যাপনা-প্রণালী রবীন্দ্রনাথকে সব প্রথম ইংরেজি সাহিত্যের মধ্যে যথার্থভাবে প্রবেশাধিকার দান করিয়াছিল। সাহিত্য যে ভাষা শিক্ষার যন্ত্রমাত্র নহে, তাহা যে মুখ্যত অন্তর দিয়া রসসম্ভোগের বিষয়, তাহা তিনি ইঁহার অধ্যাপনা হইতে অনুভব করিলেন। বহুবার মর্লির নাম অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি। তবে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন মাসের অধিক পড়া হয় নাই।

১ ভারতী ১২৮৬ শ্রাবণ।

বিলাত বাসকালে তাঁহার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা আছে জীবনস্মৃতিতে। কিন্তু পার্লামেণ্টে গিয়া যে গ্লাডস্টোনের বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন সেকথা বিস্তৃতভাবে পত্রধারার মধ্যে লিখিয়াছিলেন। তখন জন ব্রাইট (১৮১১-৮৯) ও গ্লাডস্টোনের (১৮০৯-৯৮) যুগ— যদিও তাঁহারা বিরোধীদলের নেতা; বেনজামেন ডিস্‌রেলি সনাতনীদের নেতা ও প্রধান মন্ত্রী। ব্রাইট সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পত্রধারায় লিখিতেছেন, "বৃদ্ধ ব্রাইটকে দেখ্‌লে অত্যন্ত ভক্তি হয়, তাঁর মুখে ঔদার্য্য ও দয়া যেন মাখানো; ব্রাইটকে আমি যখন প্রথম দেখি, যখন আমি তাঁকে ব্রাইট বোলে চিনতেম না, তখন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর মুখ থেকে আমি চোখ্‌ ফেরাতে পারি নি।[১]

গ্লাডস্টোন সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন, "এমন সময়ে গ্লাডস্টোন উঠ্‌লেন; গ্লাডস্টোন ওঠবামাত্র সমস্ত ঘর একবারে নিস্তব্ধ হোয়ে গেল, গ্লাডস্টোনের স্বর শুন্‌তে পেয়ে আস্তে আস্তে বাইরে থেকে দলে দলে মেম্বর আস্‌তে লাগ্‌লেন, দুই দিকের বেঞ্চি পূরে গেল। তখন পূর্ণ উৎসের মত গ্লাডস্টোনের বক্তৃতা উৎসারিত হোতে লাগ্‌ল, সে এমন চমৎকার যে কি বল্‌ব। কিছুমাত্র চীৎকার, তর্জ্জন, গর্জ্জন ছিল না, অথচ তাঁর প্রতি কথা, ঘরের যেখানে যে কোন লোক বোসেছিল, সকলেই একেবারে স্পষ্ট শুন্‌তে পাচ্ছিল। গ্লাডস্টোনের কি এক রকম দৃঢ় স্বরে বল্‌বার ধরণ আছে, তাঁর প্রতি কথা মনের ভিতরে গিয়ে যেন জোর কোরে বিশ্বাস জন্মিয়ে দেয়।"[২] পার্লামেণ্টে আইরিশ সভ্যদের নির্যাতন ও অপমান দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন; আয়ারল্যান্ডে হোমরুল আন্দোলন শুরু হইয়াছে— ভারতের রাজনৈতিক নির্যাতিত অবস্থার সহিত আয়রল্যান্ডের তুলনা করিয়া স্বভাবতই তাঁহার সহানুভূতি আইরিশদের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল।

এই সময়ে তাঁহার মেজোবৌঠাকুরানী ব্রাইটন ত্যাগ করিয়া ডেভনশিয়রে টর্কি নামে সমুদ্রতীরস্থ শহরে বাস করিতেছিলেন। তিনি সেখান হইতে ডাক দিলে রবীন্দ্রনাথ মহা আনন্দে তথায় উপস্থিত হইলেন। "সেখানে পাহাড়ে, সমুদ্রে, ফুলবিছানো প্রান্তরে, পাইনবনের ছায়ায়…দুইটি লীলাচঞ্চল শিশু সঙ্গীকে লইয়া" দিনগুলি সুখেই কাটিতে লাগিল। তথাকার সমুদ্রতীরে "একটি সমুচ্চ শিলাতট চিরব্যগ্রতার মতো সমুদ্রের অভিমুখে শূন্যে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে", তাহারই উপরে বসিয়া 'ভগ্নতরী' নামে একটি গাথা রচনা করেন। কবিতাটি ভারতীতে (১২৮৬ আষাঢ়) প্রকাশিত হয়; সেটি সম্বন্ধে জীবনস্মৃতিতে লিখিতেছেন— "সেইখানেই সমুদ্রের জলে সেটাকে মগ্ন করিয়া দিয়া আসিলে আজ হয়তো বসিয়া বসিয়া ভাবিতে পারিতাম যে, জিনিসটা বেশ ভালোই হইয়াছিল। কিন্তু সে রাস্তা বন্ধ হইয়া গেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এখনো সে সশরীরে সাক্ষ্য দিবার জন্য বর্তমান।" কথাটা বিনয় নয়, কবিতা হিসাবে উহা অত্যন্ত তুচ্ছ।

কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে লন্ডনে ফিরিয়া পুনরায় পড়াশুনা আরম্ভ করিতে হইল। এবার ডাক্তার স্কট নামে এক ভদ্র গৃহস্থের ঘরে তাঁহার আশ্রয় জুটিল। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তাঁহাদের ঘরের লোকের মতো হইয়া গেলেন, মিসেস্ স্কট তাঁহাকে আপন ছেলের মতোই স্নেহ করিতেন। ইঁহাদের দুইটি কন্যা কবির বিশেষ অনুরক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই পরিবার ও বিশেষভাবে কন্যা দুইটি সম্বন্ধে পত্রধারায় বিস্তৃতভাবেই লিখিয়াছিলেন। জীবনস্মৃতিতেও অনেক কথা আছে। "লণ্ডনে এই গৃহটি এখন আর নাই— এই ডাক্তার পরিবারের কেহবা পরলোকে কেহবা ইহলোকে কে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তাহার কোনো সংবাদই জানি না কিন্তু সেই গৃহটি আমার মনের মধ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে।"

কবির প্রতি মেয়ে দুইটি যে আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহা পত্রধারার মধ্য হইতে আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাহাদের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন কিনা তাহা কবুল করেন নাই। তবে 'দুদিন' নামক কবিতাটির মধ্যে এই ভাবটি

১ ভারতী ১২৮৬ ভাদ্র পৃ ২১৪। ২ ভারতী ১২৮৬ ভাদ্র, পৃ ২১৫।

অব্যক্ত নাই।[1] "আরম্ভিছে শীতকাল, পড়িছে নীহার-জাল, শীর্ণ বৃক্ষ-শাখা যত ফুলপত্রহীন", প্রভৃতি পংক্তি বোম্বাই বা বাংলাদেশের চিত্র নহে, ইহা শীতের বিলাতের ছবি। আরো স্পষ্ট রহিয়াছে—

"বিদেশে আইনু শ্রান্ত পথিক একেলা;
...
একদিন দুইদিন ফুরাইল শেষে,
আবার উঠিতে হ'ল, চলিনু বিদেশে!
এই যে ফিরানু মুখ, চলিনু পূরবে,
আর ফিরে এ জীবনে ফিরে আসা হবে?
...
সহসা এ মেঘাচ্ছন্ন স্মৃতি উজলিয়া
একটি অস্ফুট রেখা সহসা দিবে যে দেখা
একটি মুখের ছবি উঠিবে জাগিয়া
একটি গানের ছত্র পড়িবেক মনে,
দুয়েকটি সুর তার উদিবে স্মরণে, ..
সেদিনের কথাগুলি বন্যার মতন
একেবারে বিপ্লাবিয়া ফেলিবে এমন।
পাষাণ মানব-মনে সহিবে সকলি!
ভুলিব, যতই যাবে বর্ষ বর্ষ চলি—
কিন্তু আহা, দু'দিনের তরে হেথা এনু,
একটি কোমল প্রাণ ভেঙ্গে রেখে গেনু!

বলা বাহুল্য উদ্ধৃত কবিতাস্তবক এই মেয়েদের একটিকে স্মরণ করিয়াই রচিত। বহু বৎসর পরে (১৯২৬) বৃদ্ধবয়সে একদা যৌবনের প্রেমকাহিনী আলোচনা কালে দিলীপকুমারকে স্কটকুমারীদ্বয়ের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "দুটি মেয়েই যে আমাকে ভালোবাসত একথা আজ আমার কাছে একটুও ঝাপ্‌সা নেই— কিন্তু তখন যদি ছাই সেকথা বিশ্বাস করবার এতটুকুও মরাল কারেজ থাকত।"[2] কবি দিলীপকে এই কথা যখন বলেন তখন বোধ হয় 'দুদিন' কবিতাটির কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে 'ভারতী'তে তিনি যে পত্রধারা প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহা নানা ক্ষেত্রে নানারূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল। ইঙ্গ-বঙ্গদের সম্বন্ধে তিনি যে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছিলেন, তাহা অবশ্যই সমসাময়িক বিলাত-ফেরতা যুবকদের পছন্দ হয় নাই; এই পত্র লিখিবার প্রায় ষাট বৎসর পরে 'পাশ্চাত্য ভ্রমণ' মুদ্রিত করিবার সময় শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে যে পত্র (১৯৩৬ অগস্ট ২৯) লেখেন এবং যাহা ঐ গ্রন্থের ভূমিকারূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আছে— "কয়েকটি চিঠিতে তখনকার দিনের ইঙ্গবঙ্গের বিবরণ কিছু বিস্তারিত করেই দিয়েছি। আজ এরা লুপ্তজীব।...সেকালের ইঙ্গবঙ্গদের অনেককে আমি প্রত্যক্ষ জানতুম। তাঁদের অনেকখানি পরিচয় পেয়েছি তাঁদের নিজেরই মুখ থেকে। যদি এর মধ্যে কোনো অত্যুক্তি থাকে সে তাঁদেরই স্বকৃত।"

কিন্তু যে পত্রধারা লইয়া তাঁহার দেশস্থ শ্রদ্ধেয় অভিভাবক শ্রেণীর কর্তৃপক্ষের সহিত বিরোধ বাধিল, সে হইতেছে য়ুরোপীয় স্ত্রীস্বাধীনতার আদর্শ লইয়া। পত্রমধ্যে বিলাতী সমাজের নিন্দা তিনি যথেষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য জগতের গতিশীল জীবনের প্রচণ্ডতা, মুক্তজীবনের সহজ স্বাধীনতা তাঁহার অনভিজ্ঞ, তরুণ জীবনের বহু সংস্কারের মূলে টান দিয়াছিল। কলিকাতার সংকীর্ণ সমাজজীবনের বৈচিত্র্যহীন পৌনপৌনিকতা তাঁহার সর্বগ্রাহী মনের কাছে আজ অত্যন্ত নিষ্প্রভ বলিয়া প্রতিভাত হইল। বিলাতে স্বাধীনভাবে চলাফেরার জন্য কাহারও কাছে কৈফিয়ত দিতে হয় না; স্বাধীনভাবে মুক্তহস্তে অর্থব্যয় বা অপব্যয় করিলে বাধা দিবার কেহ থাকে না— এসব বাঙালি যুবকের পক্ষে একটা অভাবনীয় মুক্তি। এছাড়া বিলাতে সবথেকে বড়ো আকর্ষণের বিষয় ছিল নারীসমাজে স্বাধীনভাবে মেলামেশা। তিনি

১ ভারতী ১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ। দ্র. সন্ধ্যাসঙ্গীত। কবিতাটিতে লেখকের নাম দেওয়া হইয়াছে— শ্রীদিক্‌শূন্য ভট্টাচার্য। কবি কেন এ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন জানি না। বহুকাল পরে আর একবার লিখিয়াছিলেন বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'ফুরালো দুদিন' শীর্ষক একটি কবিতার পাণ্ডুলিপি কবির পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে (দ্র. মালতী পুঁথি—রবীন্দ্রভবন); 'দুদিন' কবিতাটি তাহারই সংস্কৃত রূপ। প্রথম পাঠটি (ফুরালো দুদিন) বোধ হয় বোম্বাই বাসকালে রচিত এবং ইহার মধ্যে বিচ্ছেদের কথাই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। উহা প্রকাশিত হয় নাই। পরে স্কটকুমারীদ্বয়ের স্মরণে উহাকেই রূপান্তরিত করিয়া লেখেন ও ভারতীতে প্রকাশ করেন।

২ তীর্থঙ্কর পৃ ২০২।

এক পত্রে লিখিতেছেন, "মেয়েপুরুষে একত্রে মিলে আমোদ প্রমোদ করাই ত' স্বাভাবিক। মেয়েরা ত মনুষ্যজাতির অন্তর্গত, ঈশ্বর ত তা'দের সমাজের এক অংশ কোরে সৃষ্টি কোরেছেন। মানুষে মানুষে আমোদ প্রমোদে মেশামেশি করাকে একটা মহাপাতক, সমাজবিরুদ্ধ, রোমাঞ্চজনক ব্যাপার কোরে তোলা শুদ্ধ অস্বাভাবিক নয়, তা' অসামাজিক, সুতরাং এক হিসাবে অসভ্য।" অতঃপর স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা লিখিয়া তিনি বলিলেন, "সমাজের অর্দ্ধেক মানুষকে পশু কোরে ফেলা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত বোলে প্রচার কর, তা হোলে তাঁর নামের অপমান করা হয়। মেয়েদের সমাজ থেকে নির্ব্বাসিত কোরে দিয়ে আমরা কতটা সুখ ও উন্নতি থেকে বঞ্চিত হই, তা' বিলেতের সমাজে এলে বোঝা যায়।" বিলাতের স্বাধীন স্ত্রীসমাজ সত্যই তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, নতুবা তিনি লিখিতেন না, "এখেনে যতগুলি ভারতবর্ষীয় এয়েছেন, সর্ব্ব প্রথমেই তাদের চোখে কি ঠেকেছে? এখানকার সমাজের সুখ ও উন্নতি-সাধনে মহিলাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা। যাঁরা স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন, এখেনে এসে নিশ্চয়ই তাঁদের মতের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হোয়েছে।" (ভারতী ১২৮৬, অগ্রহায়ণ)।

এই প্রবন্ধ ভারতীতে প্রকাশিত হইলে পত্রিকার সম্পাদকরূপে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ বিলাতপ্রবাসী কনিষ্ঠের এইসব মতের প্রতিবাদ করিয়া পত্রধারার পাদটীকায় দীর্ঘ মন্তব্য লিখিলেন। ইহার পর কয়েকমাস জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের মধ্যে নানা বিচার চলে—একদিকে প্রাচীনপন্থী দার্শনিক ও অন্যদিকে নবীনপন্থী কবি।

এমন সময়ে দেশে ফিরিবার জন্য পিতার আদেশ আসিল। 'ভারতী'র পত্রধারা তাঁহার এই আকস্মিক প্রত্যাবর্ত্তন আদেশের জন্য দায়ী কিনা তাহার সঠিক প্রমাণ দিতে পারিব না; তবে আমাদের সন্দেহ হয় তরুণ কবির প্রগল্‌ভতায় অভিভাবকগণ অসন্তুষ্ট হইয়াই তাঁহাকে ফিরিয়া আসিবার জন্য পত্র দেন। রবীন্দ্রনাথেব কাছে তাহা শাপে বর হইল; বিদ্যালয়ের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা অন্তর হইতে নীরব আর্ত্তনাদ করিতেছিল; "দেশের আলোক দেশের আকাশ···ভিতরে ভিতরে ডাক দিতেছিল।" সত্যেন্দ্রনাথের ফার্লো-ছুটি ফুরাইতে তখনো কয়েক মাস বাকি, তিনি ছুটি শেষ হইবার পূর্বেই সপরিবারে দেশে ফিরিলেন— রবীন্দ্রনাথও সঙ্গে আসিলেন (১৮৮০ ফেব্রুয়ারি)।

বিলাত প্রবাসের এই দেড়টা বৎসর রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটা বিশেষ পর্ব। জীবনের এমন একটা সন্ধিক্ষণে তিনি বিলাত গিয়াছিলেন, যেটা না বাল্য, না যৌবন। তিনি গিয়াছিলেন বালকের মতো, ফিরিলেন যুবকের ন্যায়। বিলাত বাসকালে ইংরেজসমাজের সহিত মেলামেশা বিষয়ে তিনি যে খুব দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেন তাহার প্রমাণ তো পত্রধারা হইতে পাওয়া যায় না। য়ুরোপীয় সংগীত শুনিবার বা শিখিবার সুযোগ তিনি যথেষ্ট গ্রহণ করেন; নাচের পার্টি, ভোজের পার্টি, পিকনিক পার্টি প্রভৃতিতে যোগদান বিষয়ে তাঁর কোনো উদাসীনতা প্রকাশ পায় নাই। মেয়েদের সঙ্গে গল্প ও আলাপ-পরিচয় করিতে সংকোচভাব ক্রমে ক্রমে ঘুচিয়াই যায়। তাঁহার সুন্দর কান্তি, সুমিষ্ট কণ্ঠ সকলকেই আকর্ষণ করিত; অর্থেরও দৈন্য ছিল না, সুতরাং নারীসমাজে প্রিয় হওয়ার সকল গুণই তাঁহার ছিল।

বিলাত হইতে ফিরিবার প্রায় দেড় বৎসর পরে ভারতীতে প্রকাশিত পত্রাবলী 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' নামে প্রকাশিত হয় (১৮৮১ অক্টোবর)। গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতি সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। উপহার পৃষ্ঠায় লেখা ছিল "ভাই জ্যোতিদাদা ইংলণ্ডে যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়িত তাঁহারই হস্তে এই পুস্তক সমর্পণ করিলাম।" কাহাকে অধিক মনে পড়িত এবং গ্রন্থখানি কাহার হস্তে সমর্পিত হইল, তাহা উৎসর্গপত্র হইতে স্পষ্ট না হইলেও অনুমান করা কঠিন নহে।

গ্রন্থপ্রকাশকালে এই পত্রধারার রচনার দোষগুণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে বেশ সচেতন দেখি; তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিতেছেন— "বন্ধুদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এই পত্রগুলি প্রকাশ করিলাম। প্রকাশ করিতে আপত্তি ছিল,— কারণ কয়েকটি ছাড়া বাকী পত্রগুলি ভারতীর উদ্দেশে লিখিত হয় নাই, সুতরাং সে সমুদয়ে যথেষ্ট সাবধানের সহিত মত প্রকাশ

করা যায় নাই, বিদেশীয় সমাজ প্রথম দেখিয়াই যাহা মনে হইয়াছে তাহাই ব্যক্ত করা গিয়াছে। কিন্তু ইহাতে আর কোন উপকার হউক বা না হউক, একজন বাঙালী ইংলণ্ডে গেলে কিরূপে তাহার মত গঠিত ও পরিবর্তিত হয় তাহার ইতিহাস পাওয়া যায়।"

এই গ্রন্থের ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লেখক যে বেশ সচেতন তাহাও ভূমিকা পাঠে বুঝা যায়; তিনি লিখিতেছেন,—"আমার মতে যে ভাষায় চিঠি লেখা উচিত সেই ভাষাতেই লেখা হইয়াছে। আত্মীয়স্বজনদের সহিত মুখামুখী এক প্রকার ভাষায় কথা কহা ও তাঁহারা চোখের আড়াল হইবামাত্র আরএক প্রকার ভাষায় কথা কহা কেমন অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।" বহু বৎসর পর (১৯৩৬) এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কবি 'পাশ্চাত্য ভ্রমণে' লিখিয়াছেন, "নিশ্চিত বলতে পারিনে কিন্তু আমার বিশ্বাস, বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষায় লেখা বই এই প্রথম।…বাংলা চলতি ভাষার সহজ প্রকাশপটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে।"

এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কবির মনোভাব অত্যন্ত তীব্র; সেইজন্য স্থায়ী গ্রন্থাবলীতে উহাকে তিনি স্থান দেন নাই। ১৩১১ সালে হিতবাদী হইতে 'রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী'র যে সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাহাতে একবারমাত্র সন্নিবেশিত হইয়াছিল। ষোলো খণ্ড 'গদ্যগ্রন্থাবলী'তেও উহা মুদ্রিত হয় নাই। বহু বৎসর পর কাটিয়া ছাটিয়া 'পাশ্চাত্য ভ্রমণে'র অন্তর্গত করিবার সময়েও এই গ্রন্থসম্বন্ধে তাঁহার অপ্রসন্ন মনোভাব প্রকাশ করিতে কার্পণ্য করেন নাই। তিনি লেখেন, "সাহিত্যে সাবালক হওয়ার পর থেকেই ঐ বইটার পরে আমার ধিক্কার জন্মেছিল। বুঝেছি, যে-দেশে গিয়েছিলুম সেখানকারই যে সম্মানহানি করা হয়েছে তা নয়, ওটাতে নিজেরই সম্মানহানি বিস্তর। লোকের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও বইটা প্রকাশ করিনি। কিন্তু আমি প্রকাশে বাধা দিলেই ওটা যে অপ্রকাশিত থাকবে এই কৌতূহলমুখর যুগে তা আশা করা যায় না।" তবে গ্রন্থের সাহিত্যিক মূল্য লেখক স্বীকার করিয়াছেন, "এ বইটাকে সাহিত্যের পংক্তিতে আমি বসাতে চাই, ইতিহাসের পংক্তিতে নয়। পাঠ্য জিনিসেরই মূল্য সাহিত্যে, অপাঠ্য জিনিসেরও মূল্য ইতিহাসে। ঐতিহাসিককে যদি সম্পূর্ণ বঞ্চিত করতে পারতুম তবে আমার পক্ষে সেটা পুণ্যকর্ম, সুতরাং মুক্তির পথ হোত।" রবীন্দ্রনাথের মতে "য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রশ্রেণী আগাগোড়া অরক্ষণীয়া নয়।"

দেশে প্রত্যাবর্তন

বিলাত হইতে রবীন্দ্রনাথ ফিরিলেন ১২৮৬ সালের মাঘ মাসের শেষাশেষি। ভারতের বাহিরে এক বৎসর পাঁচমাস কাটে (১৮৭৮ সেপ্টেম্বর ২০—১৮৮০ ফেব্রুয়ারি); ফিরিবার সময় তাঁহার বয়স আঠারো বৎসর নয় মাস।

প্রত্যাবর্তনটা হইল অসময়ে। এই আকস্মিক ফিরিয়া-আসাটা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে নিশ্চয় বিচিত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। যাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ বিলাত হইতে ব্যারিস্টার হইয়া আসিবেন ও কালে কলিকাতা হাইকোর্টের যশস্বী আইনজীবী হইয়া ধন ও মান অর্জন করিবেন, তাঁহারা হতাশ হইলেন। মহর্ষি ও অগ্রজেরা মনে মনে খুশি হইয়াছিলেন বলিয়াই আমাদের অনুমান। ভারতীতে প্রকাশিত য়ুরোপসংক্রান্ত পত্রধারায় রবীন্দ্রনাথ যেসব মতামত অকুণ্ঠলেখনীতে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা অভিজাত রক্ষণশীল অভিভাবক শ্রেণীর অগ্রজাদির পক্ষে সহজভাবে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। 'রবি' যে বিলাতের সেই নব্য প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া দেশে ফিরিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহারা আনন্দিত। অতি প্রিয়জন যাঁহারা 'রবি'কে কেবলই স্নেহ করিতেন, তাঁহারা বালকের সুন্দর কান্তি বিলাতের স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় সুন্দরতর হইয়াছে দেখিয়াই খুশি। বৎসরাধিক কাল বিলাতের সমাজে নানাভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়া পূর্বের স্বভাবসুলভ অপ্রতিভ-অপ্রস্তুত ভাব দূর হইয়াছে; তিনি গিয়াছিলেন লাজুক

বালক, ফিরিলেন প্রগল্‌ভ যুবক। বিলাতে যেসব গান শেখেন স্বজনসমাজে সেগুলি গাহিয়া শুনাইতে বেশ একটু গর্ব অনুভব করেন। বিলাতে বাসকালে কণ্ঠস্বরের বেশ বদল হয়, অনেকেই বলিলেন কেমন যেন বিদেশী রকমের হইয়াছে; এই মন্তব্য শুনিতে খারাপ লাগে না। এমনকি কথা কহিবার ঢঙেরও বদল তাঁহারা আবিষ্কার করিলেন;— এসব কথা কবি জীবনস্মৃতিতে স্বয়ং কবুল করিয়াছেন; আঠারো বৎসর যুবকের পক্ষে এইরূপ পরিবর্তন হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।

দেশে ফিরিবার পর সবথেকে আদর আপ্যায়ন পাইলেন তাঁহার নূতন বৌঠাকুরানীর কাছ হইতে। কাদম্বরী দেবীর বয়স এখন প্রায় একুশ বৎসর; তিনি নিঃসন্তান। তাঁহার নিরুদ্ধ নারীহৃদয়ের সমস্ত স্নেহ, প্রেম, প্রীতি ছিল 'রবি'কে ঘিরিয়া। নয় বৎসর বয়সে বালিকা বধূরূপে তিনি যখন এই গৃহে প্রবেশ করেন, তখন সাত বৎসরের বালক 'রবি' ছিল তাঁহার খেলার সাথী, গল্পের সঙ্গী; চৌদ্দ বৎসর তাহাকে নিরন্তর পাইয়াছিলেন। স্বভাবকোমল নারীহৃদয়ের সকল আকাঙ্ক্ষা 'রবি'কে ঘিরিয়া সার্থক হইয়াছিল। তিনি তাঁহার নিঃসঙ্গ স্নেহাতুর জীবনের মধ্যে রবিকে পুনরায় ফিরিয়া পাইয়া যে নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি। রবীন্দ্রনাথও যে সুখী হইলেন তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন; বিলাতে থাকিতে তাঁহারই কথা সবথেকে বেশি করিয়া মনে পড়িত। তাঁহারই স্নেহময় আঁখি ধ্রুবতারকার ন্যায় সর্বদা তাঁহার সম্মুখে বিরাজ করিত।

বিলাত হইতে দেশে যখন ফিরিলেন, বাড়িতে তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও অক্ষয় চৌধুরী দেশি ও বিলাতি সুরের সাহায্যে সংগীতের নানারূপ পরীক্ষায় রত, বাংলা গানে নূতন নূতন রূপ সৃষ্টির সাধনায় তন্ময়। এই ঘটনাটি সামান্য হইলেও বাংলার সংগীতচর্চার ও বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনার ইতিহাসে স্মরণীয়। দেশি ও ও বিলাতি সুরের সংকরমিশ্রণ এমনকি দেশি সুরের রাগরাগিণীর মিশ্রণেও প্রাচীনপন্থীদের ঘোর আপত্তি। কিন্তু যাঁহারা গানের বিশুদ্ধতা নষ্ট হইল বলিয়া বিলাপ করেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে চিরদিনই দেশি ও বিদেশী সুরের মিশ্রণে নবতর সুরের সৃষ্টি হইয়াছে; আজ আমরা যাহাকে মার্গ সংগীত বলি তাহা বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লিষ্ট হইলে দেখা যাইবে যে তাহার অনেকখানিই সংকর; বিশুদ্ধ সংগীত আদিম জাতির মধ্যে ছাড়া আর কোথায়ও থাকিতে পারে না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথপ্রমুখ তরুণের দল যে দুঃসাহসিকতার পথ উন্মোচন করিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই পথ বিস্তারিত করিয়া দিলেন; বিচিত্র সুরের সঙ্গে অনির্বচনীয় ভাবরাজি ও অনিন্দনীয় ভাষার উদ্‌বাহ সম্পন্ন করিয়া বাংলাসাহিত্যে, বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে যুগান্তর সাধন করিলেন।

বিলাত হইতে ফিরিয়া রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই সংগীতগোষ্ঠিভুক্ত হইলেন। এতদিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুরসৃষ্টিতে ভাষা দান করিতেন অক্ষয় চৌধুরী, এবার তাহাতে যোগদান করিলেন রবীন্দ্রনাথ। ইতিপূর্বে এই দেশি ও বিদেশী সুরের ঘাত প্রতিঘাতে সৃষ্ট হইয়াছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' নামে গীতনাট্য। রবীন্দ্রনাথ বিলাত হইতে আসিয়া দেখিলেন নাটকখানি প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে, তিনি শেষদিকে একটি গান যোজনা করিয়া দিলেন— "আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি' ধরি" ইত্যাদি।[১] নাটক রচনা করিয়া তাহার অভিনয়মূর্তি না দেখিতে পাইলে যথার্থ আর্টিস্ট লেখকরা সুখী হইতে পারেন না; মানময়ীর অভিনয় হইল। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ মদনের, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইন্দ্রের ও তাঁহার পত্নী কাদম্বরী দেবী উর্বশীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন বলিয়া শুনিয়াছি। এই মানময়ীকে বাংলা সাহিত্যের গীতনাট্য রচনার প্রথম প্রচেষ্টা বলা যাইতে পারে— কারণ ইহাতে গান ছাড়া গদ্যে কথাবার্তা ছিল। ইহার এক বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকিপ্রতিভা' রচিত ও অভিনীত হয়; সেটি খাঁটি গীতনাট্য, কারণ তাহাতে সকল কথাবার্তাই গানের দ্বারা সম্পন্ন হয়।

১ গীতবিতান ১ম সং পৃ ১২৩।

বিলাত হইতে ফিরিবার পর কালটা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন, সেটি যথার্থ চিত্র বটে। "যৌবনের আরম্ভ-সময়ে বাংলাদেশে ফিরে এলেম। সেই ছাদ, সেই চাঁদ, সেই দক্ষিণে বাতাস, সেই নিজের মনের বিজন স্বপ্ন, সেই ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে চারিদিক থেকে প্রসারিত সহস্র বন্ধন, সেই সুদীর্ঘ অবসর, কর্মহীন কল্পনা, আপন মনে সৌন্দর্যের মরীচিকা রচনা, নিষ্ফল দুরাশা, অন্তরের নিগূঢ় বেদনা, আত্মপীড়ক অলস কবিত্ব— এই সমস্ত নাগপাশের দ্বারা জড়িত বেষ্টিত হয়ে চুপ করে পড়ে আছি।"[১] অল্পকথায় এত সূক্ষ্ম এত সত্য আত্মবিশ্লেষণ করা কেবল রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মনীষীরই পক্ষে সম্ভব।

বিলাতে থাকিতে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসৃষ্টি বিষয়ে তেমন মন দিতে পারিতেন না; তিনি লিখিয়াছেন, "একটা আশ্চর্য এই দেখিয়াছি, যতকাল বিলাতে ছিলাম আমার কবিতা লিখিবার উৎসাহ যেন একেবারে শুষ্ক হইয়াছিল।...... কেবল ডেভন্‌শিয়রের পুষ্পবিকীর্ণ বসন্ত বিরাজিত টর্কি নগরীর সমুদ্রতটে 'মগ্নতরী' বলিয়া একটা কবিতা লিখিয়াছিলাম, সেও জোর করিয়া লেখা।"[২] বিলাতে থাকিতে থাকিতে আর-একখানি কাব্যের পত্তন করেন; কতকটা ফিরিবার পথে এবং অধিকাংশটা দেশে আসিয়া লেখেন। 'ভগ্নহৃদয়' নামে উহা ভারতীতে প্রকাশিত হয়।[৩] এই কাব্য সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। ভগ্নহৃদয় ছাড়া অন্য রচনা চোখে পড়ে কম, কারণ এই সময়টা গানের সুরের বিচিত্র পরীক্ষা চলিতেছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও অক্ষয় চৌধুরীর সহিত। যাহাই হউক, যে দুইচারিটা কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবিতাটির নাম 'হরহৃদে কালিকা'[৪] ইহার মধ্যে পর বৎসরে প্রকাশিত 'মহাস্বপ্ন' ও প্রভাতসংগীতের 'সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়' এর সুরের আভাস পাওয়া যায়; ভগ্নহৃদয়ের কোনো কোনো অংশের সহিতও সুর মেলে। যথাস্থানে সে আলোচনা করা যাইবে। এইখানে 'হরহৃদে কালিকা' হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

একদা প্রলয় শিঙ্গা বাজিয়া রে উঠিবে!
অমনি নিভিবে রবি, অমনি মিশাবে তারা
অমনি এজগতের রাস-রজ্জু টুটিবে।
আলোক-সর্ব্বস্বহারা, অন্ধ যত গ্রহ তারা
দারুণ উন্মাদ হয়ে মহাশূন্যে ছুটিবে!
ঘুম হ'তে জাগি উঠি রক্ত আঁখি মেলিয়া
প্রলয় জগৎ ল'য়ে বেড়াইবে খেলিয়া।

জগতের হাহাকার যবে স্তব্ধ হইবে,
ঘোর স্তব্ধ মহা স্তব্ধ, মহা শূন্য রহিবে,
আঁধারের সিন্ধু রবে অনন্তেরে গ্রাসিয়া—
সে মহান্ জলধির নাই উর্ম্মি নাই তীর
সেই স্তব্ধ সিন্ধু ব্যাপি রব আমি ভাসিয়া;
তখনো রবি কি তুই এই বুকে দাঁড়ায়ে,
ভাবনা বাসনাহীন এই বুক মাড়ায়ে?

...

রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যের মধ্যে 'ভীষণ মধুরে'র বিপরীত সুরলহরী বারে বারে ধ্বনিত হইয়াছে। বৈষ্ণবের মধুর বংশীধ্বনি ও নটরাজ-রুদ্রের পিনাকটংকার রবীন্দ্র-কাব্যসাহিত্যকে লালিত্যে ও শক্তিতে অপরূপ করিয়াছে। এই কবিতাটির মধ্যে রুদ্রের আবাহন-আভাস অস্পষ্টভাবে আছে বলিয়া এইখানে বিশেষভাবে ইহার উল্লেখ করিলাম।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের অভিব্যক্তি আলোচনা করিতে করিতে দেখা যায়, তিনি কখনো কোনো এক মনোভাবে অধিক কাল আবিষ্ট থাকিতে পারিতেন না, নব নব অনুভূতি জীবনকে নব চেতনায়, নব কর্মে উদ্‌বুদ্ধ

১ পাণ্ডুলিপি হইতে উদ্ধৃত, দ্র. জীবন স্মৃতি ১৩৫০ সংস্করণ, গ্রন্থপরিচয় পৃ ২০৫।

২ জী-স্মৃ-খসড়া, বি-ভা-প ১৩৫০ পৃ ১২১।

৩ ভারতী ১২৮৭ কার্তিক হইতে ফাল্গুন সংখ্যায় প্রথম ৬ সর্গ প্রকাশিত হয়। কাব্যখানিতে মোট ৩৪ সর্গ আছে।

৪ ভারতী ১২৮৭ আশ্বিন। র-র অচ ১ম শৈশবসঙ্গীত পৃ ১০৬।

করিত। তাঁহার প্রত্যেক কাব্যের শেষ দিকে সেইযুগ হইতে নিষ্ক্রমণের আকুতি দেখিতে পাই। শৈশবসঙ্গীতের শেষ কবিতা 'পথিক'এর মধ্যে এই যাত্রার সুরই প্রচ্ছন্ন।[১] মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থে' (১৩১০) শৈশব-সঙ্গীতের এই 'পথিক' কবিতা হইতে কিয়দংশ সংকলন করিয়া 'যাত্রা' নামে অভিহিত করেন; এই যাত্রা খণ্ডের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া বাহির হনু তিমির রাতে তরণীখানি বাহিয়া।

জীবনের পথে পথিক 'যাত্রা' করিয়া 'হৃদয় অরণ্যে'র মধ্যে আসিয়া পড়িল এবং পরে তথা হইতে 'নিষ্ক্রমণ' করিয়া 'বিশ্বে'র মধ্যে প্রবেশ করে। ইহা হইতেছে রবীন্দ্র-কাব্যের আদিযুগের অভিব্যক্তি— শৈশবসঙ্গীত, সন্ধ্যাসঙ্গীত ও প্রভাত সঙ্গীত।

গীতিকাব্য কবিজীবনের আংশিক প্রকাশমাত্র; কাব্যের মধ্য দিয়া হৃদয়ের কামনারাজি প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু মানবজীবনের বিচিত্র সংস্কার, অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি সর্বতোভাবে ব্যক্ত হয় না। ভগবৎ বিশ্বাস ও ভগবৎ চিন্তা মানুষের সেইরূপ একটি সংস্কার। রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয় ব্রাহ্মপরিবারে, ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় মহাপুরুষের গৃহে; সুতরাং ভগবৎ বিশ্বাস তাঁহার জন্মগত সংস্কার। এই সংস্কার ও বিশ্বাসবশে তিনি এই সময়ে ব্রহ্মসংগীত রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং মাঘোৎসবের জন্য আটটি গান রচনা করিয়া দিলেন; তখন তাঁহার বয়স বিশ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। এই আটটি গানের দুইটি মাত্র গীতবিতানে (১ম সং) সন্নিবেশিত হয়।[২]

কবি ও সংগীতকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মসংগীত রচনা করিলেন বটে, তবে সেগুলিকে তাঁহার অনুভূতিমূলক কাব্য-ঐশ্বর্য বলা যায় কিনা তাহাই বিচার্য। জীবনের অনেক কাজ আমরা সামাজিক প্রয়োজন, লৌকিক চাহিদা অথবা ব্যক্তিগত অনুরোধাদির জন্য কর্তব্যপালন হিসাবে সম্পন্ন করি। রবীন্দ্রনাথের বিশ বৎসর বয়সে রচিত ব্রহ্মসংগীতগুলি ভগবৎভক্তিপ্রণোদিত আধ্যাত্মিক সংগীত বলিয়া স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। জীবনস্মৃতির একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন, "আমাদের পরিবারের যে ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না— আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই।" রবীন্দ্রনাথের একথা লিখিবার অর্থ কী বলা কঠিন, কারণ দেখা যায়, প্রতি বৎসর নববর্ষ ও মাঘোৎসবের সময় তিনি বহু ব্রহ্মসংগীত রচনা করিতেছেন; এক্ষেত্রে পরিবারের ধর্মসাধনার সহিত তাহা সংস্রবহীন বলিয়া কিরূপে স্বীকার করা যায়। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম বয়সে যেসব ব্রহ্মসংগীত রচনা করিয়াছিলেন, সেসব সামাজিক কর্তব্যপালনের জন্য লেখা, ধর্মবিশ্বাস বা আধ্যাত্মিক আন্তরিকতা হইতে উৎসারিত নহে। গানের সুরেও মুক্তি আসে নাই, অধিকাংশ গানই মার্গসংগীতের বাঁধাপথের পথিক।

১ ভারতী ১২৮৭ পৌষ। র-র অচ ১ম শৈশবসঙ্গীত পৃ ১৩১—১৪৯।

২ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১২৮৭) ফাল্গুন। মাঘোৎসবের সময় এই গানগুলি গীত হয়:

		রবিচ্ছায়া (১২৯২)	গানের বহি (১৩০০)	গীতবিতান ১ম সং (১৩৩৮)
১	তুমি কিগো পিতা আমাদের—	২০৬	২৭৯	নাই
২	মহা সিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ—	২০৬	২৮২	নাই
৩	আমরা যে শিশুমতি—	২১১	২৭৬	নাই
৪	তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা—	২১১	২৮০	১২৮
৫	একি এ সুন্দর শোভা—	২১২	২৭৭	১২৮
৬	দিবানিশি করিয়া যতন—	২১২	২৮০	নাই
৭	আজি কি হরষ সমীর বহে—	২১৫	নাই	নাই
৮	কোথা আছ প্রভু এসেছি দীনহীন—	২১৫	২৭৭	নাই

বাল্মীকিপ্রতিভা

সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চায়, সংগীতের অনুশীলনে রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল হইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন প্রধান সহায়। পিয়ানো ও বেহালা বাজানো এবং বিলাতী সুরের ও গানের চর্চা ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যৌবনের অন্যতম ব্যসন। পিয়ানো বাজাইয়া নূতন নূতন সুর সৃষ্টি করিতে তাঁহার অপার আনন্দ ছিল। এইসব সদ্যজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া ফেলিতে তিনি পারিতেন না, সুরে ভাষা দান করিবার জন্য অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে নিযুক্ত করিতেন। ইঁহারা কিভাবে গান রচনা করিতেন তাহার সুন্দর চিত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের গান রচনার শিক্ষানবিশি আমেদাবাদ যাইবার পূর্বেই শুরু হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন, "সরোজিনী প্রকাশের (১৮৭৫ নভেম্বর) পর হইতেই আমরা রবিকে প্রমোশন দিয়া আমাদের সমশ্রেণীতে উঠাইয়া লইলাম। এখন হইতে সংগীত ও সাহিত্যচর্চাতে আমরা হইলাম তিনজন— অক্ষয় চৌধুরী, রবি ও আমি।" (পৃ ১৫১) বিলাত যাইবার পূর্বে গানে তাঁহার হাতেখড়ি হয়। 'ছেলেবেলা'য় বৃদ্ধবয়সে লিখিয়াছেন— "এইবার ছুটল আমার গানের ফোয়ারা। জ্যোতিদাদা পিয়ানোর উপর হাত চালিয়ে নতুন নতুন ভঙ্গিতে ঝমাঝম সুর তৈরি করে যেতেন, আমাকে রাখতেন পাশে। তখনি তখনি সেই ছুটে-চলা সুরে কথা বসিয়ে বেঁধে রাখবার কাজ ছিল আমার।" অক্ষয়চন্দ্রও এই কাজে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্যতম সহায় ছিলেন; স্বর্ণকুমারীও অনেক সময়ে তাঁহার রচিত সুরে গান প্রস্তুত করিতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "সচরাচর গান বাঁধিয়া তাহাতে সুরসংযোগ করাই প্রচলিত রীতি, কিন্তু আমাদের পদ্ধতি ছিল উল্টা। সুরের অনুরূপ গান তৈরি হইত।" (পৃ ১৫৬) এই সুরের প্রেরণা হইতে রবীন্দ্রনাথের গীত রচনার প্রেরণা। গুণ গুণ করিয়া সুর করিতে করিতে ভাষা আপনি আসিয়া তাহাতে রূপ দেয়— ইহাই রবীন্দ্রনাথের গান রচনার রীতি। আমেদাবাদে বাসকালে তাঁহার নিজের গান বলিতে যা বুঝায় তাহার রচনা আরম্ভ হয়। জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন যে শাহিবাগের প্রাসাদোপম অট্টালিকার "ছাদের উপর নিশাচর্য করিবার সময়ই আমার নিজের সুর-দেওয়া সর্বপ্রথম গানগুলি রচনা করিয়াছিলাম।" জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিতে কবির সেই প্রথম গানের চারিটি চরণ উদ্ধৃত হইয়াছিল। সমগ্র গানটি ভগ্নহৃদয়ে আছে, পরে 'রবিচ্ছায়া' প্রকাশের সময় বা পূর্বে গানটি বদলাইয়া দেন এবং সেই সামান্য পরিবর্তিত রূপটি গীতবিতানে (১ম সং পৃ ১০) ছিল। আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রথম গানটি 'ভগ্নহৃদয়' হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম[১]—

নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়।
ধীরে ধীরে অতি ধীরে—অতিধীরে গাও গো।
ঘুম-ঘোরময় গান বিভাবরী গায়,
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো!
নিশীথের সুনীরব শিশিরের সম,
নিশীথের সুনীরব সমীরের সম,
নিশীথের সুনীরব জোছনা সমান
অতি—অতি—অতিধীরে কর সখি গান!
নিশার কুহক বলে নীরবতা-সিন্ধুতলে
মগ্ন হোয়ে ঘুমাইছে বিশ্ব চরাচর;
প্রশান্ত সাগরে হেন, তরঙ্গ না তুলে যেন
অধীর উচ্ছ্বাসময় সঙ্গীতের স্বর!
তটিনী কি শান্ত আছে! ঘুমাইয়া পড়িয়াছে
বাতাসের মৃদু হস্ত পরশে এমনি,
ভুলে যদি ঘুমে ঘুমে তটের চরণ চুমে
সে চুম্বন ধ্বনি শুনে চমকে আপনি!
তাই বলি অতি ধীরে—অতিধীরে গাও গো,
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো।

১ 'ভগ্নহৃদয়ে' গানটি ষষ্ঠ সর্গে আছে। এই অংশ ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল ১২৮৭ ফাল্গুন পৃ ৫০৮। দ্র. রবিচ্ছায়া পৃ ১।

আমেদাবাদ ও বোম্বাই বাসকালে আরও কতকগুলি গান রচনা করেন যেমন, 'শুন নলিনী খোলো গো আঁখি', 'আঁধার শাখা উজল করি' ইত্যাদি। 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' গানটিরও একটি খসড়া এই সময়ে লেখেন বলিয়া জানা গিয়াছে।[১] পরে সেই গানটিকে সংস্কার করিয়া ভগ্নহৃদয়ের উৎসর্গে যোজনা করেন এবং আরও কিছুকাল পরে অদল বদল করিয়া ব্রহ্মসংগীতে রূপান্তরিত করেন। এখন সেটি ব্রহ্মসংগীত বলিয়াই সকলে জানে।

বিলাতে বাসকালে তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টিতে ভাঁটা পড়িয়াছিল; কবিতা দুই একটি লেখেন, গান রচনা করেন কিনা সন্দেহ; বিলাতি গান ও নাচ আয়ত্ত করিতে তখন উৎসাহ বেশি। বিলাত হইতে ফিরিয়াই দেখিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মানময়ী গীতনাট্য অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত; তাড়াতাড়ি সংযোগ করিয়া দিলেন 'আয় তবে সহচরী' গানটি। গানটি কেবলমাত্র গান নয়, বোধ হয় নৃত্যের সঙ্গে গেয়। বিলাত হইতে আসিবার পর আবার সেই গানের মজলিস সেই গানের আবহাওয়া ফিরিয়া পাইলেন।

এই সময়ে হার্বার্ট স্পেন্সরের The Origin and Function of Music[২] নামক প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে। স্পেন্সর ছিলেন সেযুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল লেখকদের অন্যতম। মানুষের চিরাচরিত মোহাচ্ছন্ন মতকে তিনি জীবতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও অন্যান্য বিজ্ঞানের সাহায্যে বিশ্লেষণ করিয়া দৈব অপৌরুষেয়তার আসন হইতে নামাইয়া আনিয়াছিলেন। সেইজন্য স্পেন্সর ছিলেন সে যুগের ভাঙনপন্থী যুবকদের গুরুস্বরূপ। রবীন্দ্রনাথ স্পেন্সরের ভক্ত ছিলেন। সংগীত সম্বন্ধে প্রবন্ধটি পড়িয়া তাঁহার যেন নূতন দৃষ্টি খুলিয়া গেল; এই প্রবন্ধটি অবলম্বনে 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' (হার্বার্ট স্পেন্সরের মত) শীর্ষক প্রবন্ধটি লেখেন ভারতীতে (১২৮৮ আষাঢ়)। উক্ত প্রবন্ধ সম্পর্কে তিনি জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন যে, "সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয় সেখানে আপনিই কিছু না কিছু সুর লাগিয়া যায়। বস্তুত, রাগ দুঃখ আনন্দ বিস্ময় আমরা কেবলমাত্র কথা দিয়া প্রকাশ করি না— কথার সঙ্গে সুর থাকে। এই কথাবার্তার-আনুষঙ্গিক সুরটারই উৎকর্ষসাধন করিয়া মানুষ সংগীত পাইয়াছে। স্পেন্সরের এই কথাটা মনে লাগিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম এই মত অনুসারে আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না কেন। আমাদের দেশে কথকতায় এই চেষ্টা আছে। তাহাতে বাক্য মাঝে মাঝে সুরকে আশ্রয় করে, অথচ তালমানসংগত রীতিমতো সংগীত নহে।"

রবীন্দ্রনাথের এই ভাবটিকে রূপ দান করিবার সুযোগ জুটিল। 'বিদ্বজ্জন সমাগম সভা'র বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে একটা কিছু অভিনয় করার প্রস্তাব হইতে বাল্মীকিপ্রতিভার জন্ম হইল। এই সভাটি ঠাকুরবাড়িতে সর্বপ্রথম যখন স্থাপিত হয় (১২৮১ বৈশাখ ৬) তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স তেরো বৎসর। প্রথম অধিবেশনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সদ্য প্রকাশিত 'পুরুবিক্রম' নাটক হইতে 'উদ্দীপনাপূর্ণ অংশ' পঠিত হয়। সেই অধিবেশনে "ঠাকুরপরিবারের ছোট ছোট কয়েকটি বালক-বালিকা চৌতাল প্রভৃতি তালে তানলয়-বিশুদ্ধ সংগীত করিয়া সভাস্থবর্গকে" চমৎকৃত করেন; এই দলে বালক রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বলিয়া মনে হয়।[৩] এইবারকার অধিবেশনে একটি নাটক করাই যখন স্থির হইল, তখন "কোন্ বিষয় অবলম্বন করিয়া নাটক লিখিলে এই সভার উপযুক্ত হইবে তাহারই আলোচনাকালে দস্যু রত্নাকরের কবি হইবার কাহিনীই সকলের চেয়ে সংগত বলিয়া বোধ হইল।" বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গল' সেই বৎসরই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল (১২৮৭); প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে 'আর্য্যদর্শন' পত্রিকায় (১২৮১) উহা যখন প্রথম বাহির হয়,

১ মালতীপুঁথি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত।

২ Essays Scientific Political and Speculative. Vol. I.— 1868. "The Origin and Function of Music" in Fraser's Magazine for October, 1857.

৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: সেকালের কথা, প্রবাসী ১৩৪০। দ্র. ভারতসংস্কার ১৮৭৪ এপ্রিল ২৪।

তখনই সাহিত্যরসিকমাত্রকেই উহা মাতাইয়া তুলিয়াছিল। এখন সমগ্র কাব্যখানি পাঠকদের হস্তগত হইল। এই কাব্যের আরম্ভ সর্গ হইতে বাল্মীকি সম্বন্ধীয় গীতনাট্য রচনার ভাব রবীন্দ্রনাথের মনে প্রথম উদিত হয়। গীতনাট্যখানি লিখিবার সময় সারদামঙ্গলের দুই একটি কবিতাও রূপান্তরিত অবস্থায় বাল্মীকিপ্রতিভার গানরূপে স্থান পাইল। বাল্মীকিপ্রতিভার বাল্মীকি, বাংলা কৃত্তিবাসী রামায়ণের রত্নাকর দস্যু, মূল রামায়ণের সহিত ইহার কোনো যোগ নাই। বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' হইতে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করিলেন ক্রৌঞ্চবধের চিত্রখানি— 'ক্রৌঞ্চ রুধিরে আপ্লুত পাখা ধরণী লুটায়।' বালিকার বেশে সরস্বতীর আবির্ভাব ও তিরোধান প্রভৃতি কবির নিজস্ব কল্পনা হইলেও বিহারীলালের কাব্য হইতে তাহা বহুলপরিমাণে গৃহীত। 'বাল্মীকিপ্রতিভা'তে সরস্বতীর অন্তর্ধানের পর বাল্মীকির শোক 'সারদামঙ্গলে'র দ্বিতীয় সর্গে আনন্দলক্ষ্মীর উদ্দেশে কবিচিত্তের অভিসার ও কাতরতার সহিত তুলনীয়। সারদা-মঙ্গলের শেষে কবিচিত্তে যে আনন্দ উপলব্ধি হইয়াছে, বাল্মীকিপ্রতিভাতে সরস্বতীর আবির্ভাবে তাহা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে।[১] সরস্বতী বাল্মীকির হস্তে বীণা সমর্পণ করিলেন—এই চিত্রখানি আইরিশ মেলডীজের চিত্রিত গ্রন্থের স্মৃতি হইতে কল্পিত। জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন, "ছবিতে বীণা আঁকা ছিল, সেই বীণার সুর আমার মনের মধ্যে বাজিত।" রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতির একখানি পাণ্ডুলিপিতে লিখিয়াছেন যে "নাটকের গল্পটা একরূপ খাড়া হইল, তাহার পর জ্যোতিদাদা বাজাইতে লাগিলেন, আমি গান তৈরি করিতে লাগিলাম এবং অক্ষয়বাবুও মাঝে মাঝে যোগ দিলেন।"[২] এইভাবে বিহারীলালের নিকট হইতে নাটিকার বিষয়বস্তুর প্রেরণা পাইয়া এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিকট হইতে সুরসৃষ্টি ও সুরযোজনা সম্বন্ধে সহায়তা লাভ করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইল।

এই নাটিকা সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন— "বাল্মীকিপ্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা— অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোনো স্বাদগ্রহণ সম্ভবপর নহে। যুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মীকিপ্রতিভা তাহা নহে— ইহা সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্য বিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র— স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্পস্থলেই আছে।"

সংগীত সম্বন্ধে এই গীতনাট্যে যেসব দুঃসাহসিক পরীক্ষা চলিয়াছিল, সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বহু বিস্তারে জীবন-স্মৃতিতে আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমত বৈঠকি-গান ভাঙিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনেকগুলি গানে যে সুর দিলেন তাহাতে মার্গসংগীতের অভিজাত্য নষ্ট হইল; তারপরে নিজের যদৃচ্ছাক্রমে রচিত সুরে গান বসাইলেন, ইহাও যে কত বড়ো বিপ্লব তাহা আমরা এখনো স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি নাই। এছাড়া কবি লিখিয়াছেন যে "গুটি তিনেক গান বিলাতি সুর হইতে লওয়া।… দুইটিকে ডাকাতদের মত্ততার গানে লাগানো হইয়াছে এবং একটি আইরিশ সুর বনদেবীদের বিলাপ গানে বসাইয়াছি।"

এইখানে একটি বিষয়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। জীবনস্মৃতি লিখিবার সময় রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকি-প্রতিভার দ্বিতীয় সংস্করণের কথাই বলিয়াছিলেন, বাল্মীকিপ্রতিভার মূল রূপটির কথা তাঁহার স্মরণে ছিল না। কারণ বনদেবী-অংশ বাল্মীকিপ্রতিভার প্রথম সংস্করণে ছিল না, 'কালমৃগয়া' রচনাকালে তিনি বনদেবীদের অবতীর্ণ করেন। কিন্তু যে আইরিশ সুরে-বসানো গানটি বনদেবীদের কণ্ঠে বসাইয়াছেন সেটি বাল্মীকিপ্রতিভার দ্বিতীয় সংস্করণের (১২৯২ ফাল্গুন) অন্তর্গত গান, সুতরাং বিলাতি সুর সংযোগের ঢেউ বহুকাল পর্যন্ত চলিয়াছিল বলিয়া তো দেখা যাইতেছে।

বাল্মীকিপ্রতিভার গান সম্বন্ধে এই নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রায় দুই বৎসর পরে 'কালমৃগয়া' নামে একটি গীতিনাট্য রচনা করেন; যথাস্থানে আমরা সেসম্বন্ধে আলোচনা করিব। অধুনা চলিত বাল্মীকিপ্রতিভা (১২৯২ ফাল্গুন) রচনাকালে কালমৃগয়ার ১০টি গান ইহাতে সংযোজন করেন— কতকগুলি বিশুদ্ধ আকারে, কতকগুলি

১ দ্র. সুকুমার সেন, বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড। ২ জীবনস্মৃতি দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি।

কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া। এছাড়া আরও ২০টি নূতন গান উহাতে সংযোজিত হয়, তেমনি কয়েকটি বর্জিতও হয়।

অবশেষে বাল্মীকিপ্রতিভা বিদ্বজ্জন সমক্ষে অভিনীত হইল[১] রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকি এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভাদেবী[২] সরস্বতী সাজিয়াছিলেন—"বাল্মীকিপ্রতিভা নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু রহিয়া গিয়াছে।"

বিদ্বজ্জন সমাগম সভা উপলক্ষ্যে সেদিন কলিকাতার বহু গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত সাহিত্যিকের সমাবেশ হইয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (৪৩), গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (৩৭), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (২৮) অভিনয়দর্শকশ্রেণীর মধ্যে ছিলেন। নাট্যমঞ্চে সাধারণের সমক্ষে রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম অভিনয়।[৩] পরযুগে নাট্যকলায় আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখাইয়া তিনি যে যশ অর্জন করেন ও বাংলাদেশের অভিনেতাদের সম্মুখে অভিনয়ের নূতন মানদণ্ডটি স্থাপন করিয়া নাট্যাভিনয়ের রীতিতে যুগান্তর আনিয়াছিলেন, বিশ বৎসর বয়সের এই প্রথম অভিনয়ে তাহার সূচনা হয়।

সাহিত্যে ও সংগীতে এই ক্ষুদ্র নাটিকার প্রভাব সেদিন অননুভূত হয় নাই। তরুণ সাহিত্যিক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাল্মীকির জয়' এক সময়ে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে সুযশ লাভ করে। বাংলা Utopian সাহিত্যের অন্তর্গত এই গ্রন্থখানি সবপ্রথম প্রকাশিত হয় বঙ্গদর্শনে (১২৮৭ পৌষ মাঘ ফাল্গুন)। তখনও রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা' প্রকাশিত হয় নাই, বিদ্বজ্জন সমাগম সভা উপলক্ষ্যে উহার প্রথম প্রকাশ ও অভিনয় হয়। অতঃপর হরপ্রসাদ তাঁহার 'বাল্মীকির জয়' গ্রন্থখানি সংশোধিত ও পরিবর্ধিত করিয়া প্রকাশ করেন (১২৮৮ ভাদ্র)। এই গ্রন্থের শেষাংশ (৪র্থ-৬ষ্ঠ খণ্ড) যে রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র দ্বারা অনুপ্রেরিত হইয়াছিল, তাহা বঙ্গদর্শনের বিচক্ষণ সমালোচকের শ্যেনদৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি লিখিয়াছিলেন, "যাঁহারা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাল্মীকিপ্রতিভা পড়িয়াছেন বা তাহার অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা কবিতার জন্মবৃত্তান্ত কখন ভুলিতে পারিবেন না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রবাবুর অনুগমন করিয়াছেন।"[৪] আমাদের মনে হয় এ সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্রেরই, কারণ তিনি নাট্যাভিনয়ে দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কলিকাতা হাইকোর্টের উদীয়মান উকীল; তিনি এই অভিনয় দেখিয়া গিয়া একটি গান রচনা করেন, রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ বর্ষের জয়ন্তী উৎসবের সময়ে (১৩১৮ মাঘ ১৪) তিনি তাহা জনসমাজে প্রকাশ করেন। গানটি এই—

উঠ বঙ্গভূমি, মাতঃ ঘুমায়ে থেকো না আর,
অজ্ঞানতিমিরে তব সুপ্রভাত হল হেরো।
উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি,
নব 'বাল্মীকি-প্রতিভা' দেখাইতে পুনর্বার।
হেরো তাহে প্রাণ ভ'রে, সুখতৃষ্ণা যাবে দূরে.
ঘুচিবে মনের ভ্রান্তি, পাবে শান্তি অনিবার।
'মণিময় ধূলিরাশি' খোঁজ যাহা দিবানিশি,
ও ভাবে মজিলে মন খুঁজিতে চাবে না আর।[৫]

১ ১২৮৭ ফাল্গুন ১৬। ১৮৮১ ফেব্রুয়ারি ২৬, শনিবার। এই তারিখটি পাওয়া গিয়াছে আর্যদর্শন ১২৮৮, বৈশাখ সংখ্যা হইতে। কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের 'বালিকাপ্রতিভা' নামে কবিতার পাদটীকায় তারিখটি ছিল। এই কবিতাটি কবির 'অবসর সরোজিনী'তে সংকলিত আছে। ডক্টর সুকুমার সেন সংবাদটি সবপ্রথম প্রকাশ করেন। দ্র, বিশ্বভারতী পত্রিকা ২য় বর্ষ পৃ ১৬৩।

২ প্রতিভাদেবী (১৮৬৫-১৯২২) হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। ১৮৮৬ অগস্ট মাসে আশুতোষ চৌধুরীর সহিত বিবাহ হয়। ইনি 'আনন্দসভা' ও 'সংগীত সংঘ' প্রতিষ্ঠা করিয়া সংগীতজগতে নবপ্রেরণা আনিয়াছিলেন।

৩ বিলাত যাইবার পূর্বে ষোলো বৎসর বয়সে তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'এমন কর্ম আর করব না,' প্রহসনে অলীকবাবুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, এবং বিলাত হইতে আসিয়া 'মানময়ী'তে ইন্দ্রের অংশ গ্রহণ করেন; তবে এসব অভিনয় প্রায়ই বাড়ির লোক ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত।

৪ বঙ্গদর্শন ১২৮৮ আশ্বিন পৃ ২৮১ স্তাঃ লিঃ কোং সংস্করণ।

৫ এই গানটির প্রথম দুইটি পংক্তি তিনি বরহমপুরে বাসকালে তাঁহাদের 'নবরত্ন' সভার জন্য রচিত গানে ছিল। Reminiscences, Speches and Writings of Sir Gooroo Dass Banerjee Kt. Compiled by Upendra Chandra Banerjee, 1927 p 67.

বঙ্কিমচন্দ্র ও গুরুদাসের যে এই গীতনাট্যখানি ভালো লাগিয়াছিল, তাহার মূল কারণ হইতেছে নাটকটির আখ্যান ভাগের উচ্চ আদর্শ। বঙ্কিম দেখিয়াছিলেন সাহিত্যের দিক হইতে, গুরুদাস দেখিয়াছিলেন তত্ত্বের দিক হইতে। কিন্তু বিশুদ্ধ সংগীত ও নাট্যের দিক হইতে ইহাকে দেখিবার মতো বাঙালির রসশিক্ষা তখনো হয় নাই বলিয়া সে-সম্বন্ধে সমসাময়িক স্তুতিনিন্দা কিছুই জানা যায় না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বাল্মীকিপ্রতিভার অভিনয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে একখানি পত্র লেখেন ; পত্রখানি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে পাঠান। প্রিয়নাথ লিখিতেছেন, "তাঁহার সুন্দর অকপট স্নেহময় ভাষায় মুগ্ধ হইয়াছি।" দুর্ভাগ্যবশত সেই চিঠিখানি আমাদের হস্তগত হয় নাই।[১]

নাট্যকাব্য ও কাব্যনাট্য

বিলাত হইতে ফিরিবার (১৮৮০ ফেব্রুয়ারি) কয়েক মাসের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ পুনরায় বিলাত যাওয়া স্থির করেন। এবার তিনি নিজেই পিতাকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে তিনি ব্যারিস্টার হইবেন। মহর্ষি এই পত্র পাইয়া তাঁহাকে লিখিলেন, "আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ইংলন্‌ডে যাওয়া স্থির করিয়াছ এবং লিখিয়াছ যে আমি ব্যারিস্টার হইব। তোমার এই কথার উপরে এবং তোমার শুভ বুদ্ধির উপরে নির্ভর করিয়া তোমাকে ইংলন্‌ডে যাইতে অনুমতি দিলাম।…… গতবার সত্যেন্দ্র তোমার সঙ্গে ছিলেন, এবার মনে করিবে আমি তোমার সঙ্গে আছি।…"[২]

কিন্তু এই প্রস্তাবমতো বিলাতযাত্রা হয় নাই ; কী কারণে হয় নাই জানি না। এই সংকল্প গ্রহণের প্রায় আট মাস পরে আর-একবার বিলাতযাত্রার চেষ্টা হইয়াছিল বটে, তবে সেবারও মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসেন। ব্যারিস্টার হইবার আশা তিনি ত্যাগ করিলেও তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী গুরুজনেরা সে-আশা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। এইবার তিনি ও তাঁহার ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ বিলাত চাললেন ; কলিকাতা হইতে জাহাজে করিয়া মাদ্রাজ গিয়া, সেখান হইতে বিলাতযাত্রী জাহাজ ধরিবার কথা। মাদ্রাজে পৌঁছিয়া নববিবাহিত সত্যপ্রসাদ আর অগ্রসর হইতে নারাজ হইলেন ; অথচ একা ফিরিতে সাহস করিলেন না, পাছে মহর্ষি বিরক্ত হন। অবশেষে রবীন্দ্রনাথকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন ; তাঁহাদের সঙ্গী আশুতোষ চৌধুরী বিলাত চলিয়া গেলেন। এই যুবকের সহিত জাহাজে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়, এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। সত্যপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ মসুরিতে মহর্ষির সহিত দেখা করিতে গেলেন ; তিনি কাহাকেও ভৎর্সনা করিলেন না, 'কারণ তিনি সমস্ত কর্মকেই ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা বলিয়া মনে করিতেন।'

দ্বিতীয় বার বিলাত যাইবার পূর্বদিন সায়াহ্নে (১২৮৮ বৈশাখ ৮) বেথুন সোসাইটির আমন্ত্রণে মেডিক্যাল কলেজ হলে রবীন্দ্রনাথ সংগীত সম্বন্ধে যে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন, সে বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করিব। এইবার বিলাত যাইবার কথা উঠিলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সদ্যপ্রকাশিত 'ভগ্নহৃদয়' ও 'রুদ্রচণ্ড' গ্রন্থদ্বয়[৩] যথাক্রমে 'শ্রীমতী হে—কে' ও 'ভাই জ্যোতিদাদা'কে উৎসর্গ করেন। উভয় গ্রন্থই যে বিলাতযাত্রার পূর্বে রচিত তাহা উপহারের মধ্যে স্পষ্ট।

১ প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি পৃ ২৯৯। এই পরিচ্ছেদ রচনাকালে শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'বাল্মীকি-প্রতিভা ও ভারতীয় সংগীতের মুক্তির প্রেরণা' (দেশ ১১শ বর্ষ ১৮ সংখ্যা। ২৭শে ফাল্গুন ১৩৫০ পৃ ১৩৭-১৪০) ও 'রবীন্দ্র গীতজিজ্ঞাসা' (গীতবিতান বার্ষিকী পৃ ১৫৫-১৬৭) প্রবন্ধদ্বয়ের সাহায্য পাইয়াছি।

২ ৮ই ভাদ্র ৫১ [ব্রাহ্মাব্দ বা ১৮৮০ অগস্ট ২৩ (বাং ১২৮৭)] মহর্ষির পত্রাবলী পৃ ২০৮

৩ ১২৮৮ বৈশাখ ৯ তারিখ বিলাতযাত্রার দিন। গ্রন্থদ্বয় তৎপূর্বেই মুদ্রিত হয়, যদিও বেঙ্গল লাইব্রেরি ভুক্তান হয় যথাক্রমে ১০ই ও ১২ই আষাঢ় ১২৮৮ [১৮৮১ জুন ২৩ ও ২৫]। Hindu Patriot [১৮৮১ মে ২৩ (১১ জ্যৈষ্ঠ)] দৈনিকে রুদ্রচণ্ডের সমালোচনা বাহির হয়। বাল্মীকিপ্রতিভা অভিনয় ও প্রকাশের (১৮৮১ ফেব্রু ২৬) তিনমাস মধ্যে এই দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

ভগ্নহৃদয়ের উপহারে আছে— "আজ সাগরের তীরে দাঁড়ায়ে তোমার কাছে পরপারে মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার দেশ আছে।" রুদ্রচণ্ডের উপহারে আছে—"সে-স্নেহ আশ্রয় ত্যেজি যেতে হবে পরবাসে। তাই বিদায়ের আগে এসেছি তোমার পাশে!" মোটকথা উভয় গ্রন্থের উপহারের মধ্যে বিদেশযাত্রাজনিত বিচ্ছেদবেদনার আভাস স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত। ভগ্নহৃদয় কখন্ রচিত হয় সেকথা আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি। রুদ্রচণ্ডের মুদ্রণকাল জানি, কিন্তু তাহার রচনাকাল সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি বা তাঁহার অন্য কোনো রচনার মধ্যে এই গ্রন্থের নামমাত্র করেন নাই। ইহার দুইটিমাত্র[1] গান 'রবিচ্ছায়া' (১২৯২) ও পরে কাব্যগ্রন্থাবলীতে (১৩০৩) সন্নিবেশিত হয়; কিন্তু তৎপরে প্রকাশিত কোনো গীতসংগ্রহে বা গ্রন্থাবলীতে তাহাদের আর দেখা যায় নাই।

রুদ্রচণ্ড

রুদ্রচণ্ড একখানি ক্ষুদ্র নাটক বা নাট্যকাব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা। রবীন্দ্রনাথের নাটক রচনার প্রথম প্রয়াস হিসাবে ইহার যাহা কিছু মূল্য, সাহিত্যিক মূল্য যৎসামান্য। আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে বোলপুরে আসিয়া 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়' নামে যে কাব্য রচনা করেন (১৮৭৩ মার্চ) এই 'রুদ্রচণ্ড' তাহারই নাটকীয় রূপান্তর। নাটকের ভাষা অত্যন্ত কাঁচা। আমাদের মনে হয় বিলাত যাইবার পূর্বে তাড়াতাড়িতে নূতন কিছু সৃষ্টি-প্রেরণার অভাবে পুরাতন রচনাটাকে নূতন কলেবরে সাজাইয়া 'জ্যোতিদাদা'কে উপহার দেন। নিম্নে নাটকটির উপাখ্যান অংশ সংক্ষেপে প্রদান করিলাম—

রুদ্রচণ্ড হস্তিনাপুর-অধিপতি পৃথ্বীরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী। যুদ্ধে পরাজিত ও রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অধুনা অরণ্যবাসী। প্রতিশোধ স্পৃহাই তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। নাটিকা আরম্ভ হইয়াছে রাত্রির অন্ধকারে কালভৈরবপ্রতিমার সম্মুখে। নিজ সংকল্প সিদ্ধির উদ্দেশ্যে রুদ্রচণ্ড ভৈরবপূজায় আসীন।

রুদ্রচণ্ডের কন্যা অমিয়ার মনে হিংসা প্রতিহিংসার কথা জাগে না; তাহার বন্ধু চাঁদকবি, পৃথ্বীরাজের সভাসদ্; চাঁদকবি অনেক সময়ে অরণ্যে আসিয়া অমিয়ার সহিত গল্প করেন, তাহাকে গান শেখান। কিন্তু পৃথ্বীরাজ-সম্পর্কিত কোনো ব্যক্তি অমিয়ার সহিত আলাপ করিবে এ ধৃষ্টতা রুদ্রচণ্ডের নিকট অসহ্য। অমিয়াকে কঠোরভাবে বলিয়া দিল অতঃপর চাঁদকবি অরণ্যে আসিলে তাহার আর নিস্তার নাই। চাঁদকবির অদর্শনে অমিয়ার মন ভাঙিয়া গেল; সে ভাবিতেছে:

বড় সাধ যায় এই নক্ষত্র মালিনী
স্তব্ধ যামিনীর সাথে মিশে যাই যদি!
মৃদুল সমীর এই, চাঁদের জোছনা,
নিশার ঘুমন্ত শান্তি, এর সাথে যদি
অমিয়ার এ জীবন যায় মিলাইয়া!
আঁধার ভ্রূকুটিময় এই এ কানন,
সঙ্কীর্ণ-হৃদয় অতি ক্ষুদ্র এ কুটীর,
ভ্রূকুটির সমুখেতে দিনরাত্রি বাস,
শাসন-শকুনি এক দিনরাত্রি যেন
মাথার উপরে আছে পাখা বিছাইয়া,
এমন ক'দিন আর কাটিবে জীবন।[2]

পরদিন চাঁদকবি আসিলেন; সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমি গেলে বল্ দেখি, বোনটি আমার, কার কাছে যাবি মনে ব্যথা পেলে?" অতঃপর চাঁদকবি অমিয়াকে দুইটি গান শিখাইয়া দিলেন:

১ বসন্ত প্রভাতে এক মালতীর ফুল প্রথম মেলিল আঁখি তার। তরুতলে ছিন্ন বৃন্ত মালতীর ফুল মুদিয়া আসিছে আঁখি তার।... উভয় সংগীত প্রথম বার বিলাত যাইবার পূর্বে রচিত। দ্র. মালতী পুঁথি।

২ রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ ১ম পৃ ২৮৫।

"বসন্ত-প্রভাতে এক মালতীর ফুল প্রথম মেলিল আঁখি তার, চাহিয়া দেখিল চারি ধার।" ইত্যাদি।[১]

"তরুতলে ছিন্ন-বৃন্ত মালতীর ফুল মুদিয়া আসিছে আঁখি তার, চাহিয়া দেখিল চারিধার।" ইত্যাদি।[২]

গান দুইটি পরস্পরের পরিপূরক। চাঁদকবি অমিয়াকে বলিয়াছিলেন :

"তুই সুকুমার ফুল যখনি ফুটিলি,
যখনি মেলিলি আঁখি, দেখিলি চাহিয়া—
শুষ্ক জীর্ণ পত্রহীন অতি সুকঠোর
বজ্রাহত শাখা পরে তোর বৃন্ত বাঁধা!"

অমিয়া যখন গান শিখিতেছে, অকস্মাৎ তাহার পিতা আসিয়া উপস্থিত। সে ভাবিয়া আকুল কী করিয়া চাঁদকবিকে সে রক্ষা করিবে। সমস্ত দোষ সে নিজ মস্তক পাতিয়া লইল। কিন্তু রুদ্রচণ্ড দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া চাঁদকবিকে আক্রমণ করিল, কিন্তু পরাভূত হইয়া প্রাণভিক্ষা চাহিতে বাধ্য হইল।

চাঁদকবির সহিত পিতাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া অমিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। রুদ্রচণ্ড যখন চাঁদের কাছে প্রাণভিক্ষা করিলেন অমিয়ার মূর্ছা তখনও ভাঙে নাই। এমন সময়ে রাজধানী হইতে দূত আসিয়া চাঁদকবিকে জানাইল যে রাজ্যের সমূহ বিপদ, রাজসভায় তাঁহার উপস্থিতি অবিলম্বেই আবশ্যক। চাঁদকবিকে তখনই চলিয়া যাইতে হইল, অমিয়ার সহিত কথা বলিবার অবসর ঘটিল না। যাহাই হউক, অনুগ্রহক্ষুব্ধ রুদ্রচণ্ড রোষে অপমানে জ্বলিতে লাগিল; অমিয়ার জন্যই তাহার এই লাঞ্ছনা, অমিয়া তাহার দুই চক্ষের বিষ হইয়া উঠিল।

অবশেষে একদিন অমিয়া চাঁদকবির সন্ধানে হস্তিনাপুর যাত্রা করিল। তখন চাঁদ মহম্মদ ঘোরীর সহিত যুদ্ধায়োজনের জন্য শিবিরে চলিয়া গিয়াছেন, তাহার সাক্ষাৎ মিলিল না। রাত্রির অন্ধকারে ঝড় উঠিয়াছে; এই দুর্যোগে অমিয়া হতাশ হৃদয়ে পথের ধারে বসিয়া পড়িল; সৌভাগ্যক্রমে বনের এক কাঠুরিয়া তাহাকে আশ্রয় দান করিল। চাঁদকবিও শিবিরে অমিয়ার জন্য ব্যাকুল। এমন সময়ে শত্রু-আক্রমণের সংবাদ আসিল।

এদিকে মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রমণ করিয়া রুদ্রচণ্ডের নিকট সাহায্যের জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। রুদ্রচণ্ড বনমধ্যে কোনো মানুষকেই সহ্য করিতে পারে না, দূতকে দেখিয়াই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

আমি রুদ্রচণ্ড, এই অরণ্যের রাজা।
নগর-নিবাসী তোরা হেথা কেন এলি?
ঐশ্বর্য্য মাঝারে তোরা প্রাসাদে থাকিস্,
ননীর পুঁতুল যত ললনারে ল'য়ে
আবেশে মুদিত আঁখি গদ গদ ভাষা,...
নগর-ফুলের কীট হেথা তোরা কেন?...
বিশাল রাজসভার ব্যাধি তোরা যত
আমার অরণ্যে কেন করিলি প্রবেশ?

দূত বুঝাইয়া বলিল যে সে তাহার কোনো উপকার করিতে আসিয়াছে; উপকারের কথা শুনিয়া রুদ্রচণ্ড আরো জ্বলিয়া উঠিল। দূত জানাইল যে সে মহম্মদ ঘোরীর লোক, পৃথ্বীরাজকে পরাভূত করিতে হইলে তাঁহার সাহায্য প্রয়োজন। রুদ্রচণ্ড এতদিন ধরিয়া সংকল্প পোষণ করিয়া আসিতেছিল যে পৃথ্বীরাজকে সে স্বয়ং হত্যা করিবে— আজ

ম্লেচ্ছ সেনাপতি এক মহম্মদ ঘোরী
তস্করের মতো আসে আক্রমিতে দেশ।...
পৃথ্বীর রাজত্ব, প্রাণ এসেছে কাড়িতে,
সমস্ত জগৎ মোর ছিনিতে এসেছে।
এখনি নগরে যাব কহি তোরে আমি।
অশুভ বারতা এই করিব প্রচার।[৩]

রাজধানীতে আসিয়া রুদ্রচণ্ডের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। সে পৃথ্বীরাজকে নিজহস্তে হত্যা করিতে চায়।

১ র-র অচ ১ম পৃ ২৮৮। রবিচ্ছায়া ৯৮। কাব্যগ্রন্থাবলী (১৩০৩) পৃ ৪-৫।

২ র-র অচ ১ পৃ ২৯০। রবিচ্ছায়া ৯০। কা-গ্র (১৩০৩) পৃ ৫। গান দুইটি পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে নাই।

৩ রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত ১ম পৃ ৩০২।

বেধেছে তুমুল রণ; কোথা পৃথ্বীরাজ!
ওরে রে সংগ্রাম-দৈত্য শোণিত পিপাসী,
সমস্ত হস্তিনা তুই কর্‌রিস্ রে গ্রাস,
পৃথ্বীরাজে রেখে দিস্ এ ছুরিকা তরে।...
একি ঘোর কোলাহল নগরের পথে,
সম্মুখে, দক্ষিণে, বামে সহস্র বর্ব্বর
গায়ের উপর দিয়া যেতেছে চলিয়া!
চারিদিকে রহিয়াছে প্রাসাদের বন,
বাতায়ন হ'তে চেয়ে শত শত আঁখি!
এত লোক, এত গোল সহ্য নাহি হয়!

এদিকে চাঁদকবি সৈন্যদল লইয়া যুদ্ধে চলিয়াছে। নেপথ্যে অমিয়া গান গায়, "তরুতলে ছিন্ন-বৃন্ত মালতীর ফুল।" কণ্ঠস্বর শুনিয়া চাঁদকবি ক্ষণমাত্র দাঁড়াইলেন, ভাবিলেন এ রাজপথে মধ্যাহ্নে অমিয়া কেমন করিয়া আসিবে। এমন সময়ে দ্রুত আগাইয়া যাইবার জন্য আদেশ আসিল। অমিয়া একবার চাঁদকে ডাকিয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধযাত্রার কোলাহলে তাহার সে ক্ষীণ স্বর কেহ শুনিতে পাইল না। অবসন্ন হৃদয়ে পথপ্রান্তে বসিয়া সে বলিল —

চ'লে গেল!— সকলেই চ'লে গেল গো!
দিন রাত্রি পথে পথে করিয়া ভ্রমণ,
এক মুহূর্ত্তের তরে দেখা হ'ল যদি
চ'লে গেল? একবার কথা কহিল না?
একবার ডাকিল না 'অমিয়া' বলিয়া?
স্বপ্নের মতন সব চ'লে গেল গো?

অমিয়া যখন দেখিল পৃথিবীতে কোথায়ও আশ্রয় নাই, তখন সে পিতার নিকটে ফিরিবার জন্য অরণ্যাভিমুখে চলিল। এদিকে পৃথ্বীরাজ যুদ্ধে নিহত হইলেন; রুদ্রচণ্ড সেই সংবাদ পাইয়া অরণ্যে ফিরিল। পৃথ্বীরাজের মৃত্যুতে রুদ্রচণ্ডের জীবনের একমাত্র অবলম্বন ভাঙিয়া পড়িল।

মুহূর্ত্তে জগৎ মোর ধ্বংস হ'য়ে গেল।
শূন্য হ'য়ে গেল মোর সমস্ত জীবন!
পৃথ্বীরাজ মরে নাই, মরেছে যে জন
সে কেবল রুদ্রচণ্ড, আর কেহ নয়।
যে দুরন্ত দৈত্য-শিশু দিন রাত্রি ধ'রে
হৃদয় মাঝারে আমি করিনু পালন,
তারে নিয়ে খেলা শুধু এক কাজ ছিল,
পৃথিবীতে আর কিছু ছিল না আমার,
তাহারি জীবন ছিল আমার জীবন—
এ মুহূর্ত্তে ম'রে গেল সেই বৎস মোর!
তারি নাম রুদ্রচণ্ড আমি কেহ নই।

রুদ্রচণ্ডের পক্ষে জীবনধারণ এখন নিরর্থক। তাই সে নিজের বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিল। অরণ্যে ফিরিয়া আসিয়া অমিয়া এই দৃশ্য দেখিল। এতদিন পরে আজ মৃত্যুকালে রুদ্রচণ্ডের যেন মনে পড়িল অমিয়া তাহার কন্যা। প্রতিহিংসা বৃত্তির কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া পিতৃস্নেহ উদ্‌বেল হইয়া উঠিল— "আয় মা অমিয়া মোর, কাছে আয় বাছা। এতদিন পিতা তোর ছিল না এ দেহে আজ সে সহসা হেথা এসেছে ফিরিয়া।"

এদিকে চাঁদকবি পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর পর হস্তিনাপুর ছাড়িয়া চলিয়াছেন, অবশেষে সেই অরণ্যে উপস্থিত হইলেন। অমিয়ার কুটিরে আসিয়া দেখেন রুদ্রচণ্ড মৃত ও অমিয়া মুমূর্ষু। অমিয়ার মৃত্যু হইলে চাঁদকবি স্বগত কহিলেন— "ভাল বোন, দেখা হবে আর একদিন, সে দিন দু-জনে মিলি করিব রে শেষ দু-জনের হৃদয়ের অসম্পূর্ণ কথা।"[১]

১ দ্র. প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখিত রবীন্দ্র-পরিচয় (রুদ্রচণ্ড)। প্রবাসী ১৩২৯ শ্রাবণ।

ভগ্নহৃদয়

'ভগ্নহৃদয়' গীতিকাব্য অথচ লিখিত নাটকাকারে; তাই বোধ হয় ভারতীতে প্রকাশকালে ভূমিকায় কবি কৈফিয়তরূপে বলিয়াছিলেন যে, "কাব্যটিকে কাহারো যেন নাটক বলিয়া ভ্রম না হয়। দৃশ্যকাব্য ফুলের গাছের মত, তাহাতে ফুল ফুটে, কিন্তু সে ফুলের সঙ্গে শিকড়, কাণ্ড, শাখা, পত্র কাঁটাটি পর্য্যন্ত থাকা অনাবশ্যক।...কাব্যটি ফুলের তোড়া। গাছের আর সমস্ত বাদ দিয়া কেবল ফুলগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে। নাটকাকারে কাব্য লিখিত হইয়াছে।"[১]

বনফুল ও কবিকাহিনীর তুলনায় ভগ্নহৃদয়ের আয়তন অনেক বড়ো। ৩৪টি সর্গে ইহা সমাপ্ত। ইহাতে কাহিনীর অংশ অত্যন্ত ক্ষীণ, দীর্ঘ আয়তনের জন্য ঘটনা বুঝিতে পাঠককে কষ্ট পাইতে হয়। অধ্যাপক প্রথমনাথ বিশী লিখিয়াছেন, "এই শিথিলবদ্ধ কাব্যে ঘটনার ত্রুটি ভাবনা দিয়া পুরাইয়া লইবার চেষ্টা কবিকাহিনী ও বনফুলের চেয়ে অনেক বেশি। ইহাতে অনেকগুলি সর্গ আছে যাহাতে কোনো ঘটনা নাই, কেবল পাত্রপাত্রীর গানের দ্বারাই সে-সর্গগুলি গঠিত। আবার ঘটনাযুক্ত সর্গেও গানের সংখ্যা বিরল নয়; গানগুলি যখন-তখন আসিয়া পড়িয়া ঘটনার ক্ষীণ শোভা-যাত্রাকে ধীর মন্থর করিয়া দিয়াছে।"[২] এত বেশি গান থাকিবার কারণ আছে; বিলাত হইতে ফিরিবার পর যে গানের আবহাওয়ার মধ্যে তিনি আসিয়া পড়িয়াছিলেন, ভগ্নহৃদয় সেই সময়ে রচিত কাব্যনাট্য।

ভগ্নহৃদয় কাব্যের পাত্র হইতেছেন এক কবি, কিশোরী মুরলা ইহার নায়িকা। মুরলা কবির বাল্যসহচরী ও কাব্যের অন্যতম পাত্র অনিলের ভগ্নী। অনিল ললিতা নামে বালিকার প্রণয়ী। কবির সহিত মুরলার বন্ধুত্ব আছে, কবি তাহাকে সখি বলিয়া জানে, প্রণয়িনী বলিয়া নয়। কিন্তু মুরলা তাহাকে সর্বান্তঃকরণ দিয়া ভালোবাসে, পূজা করে; কবির নিকট সে-ভালোবাসা কোনোদিন ব্যক্ত করে নাই। সখি চপলা তাহাকে যখন খুবই পীড়াপীড়ি করে তখন সে বলে— "ক্ষমা কর মোরে সখি শুধায়োনা আর মরমে লুকানো থাক্ মরমের ভার"। কবি তাহাকে জিজ্ঞাসা করে তাহার কিসের দুঃখ; সে হতভাগ্য জানে না মুরলা তাহারই জন্য অন্তরে উন্মাদিনী।

লুকায়ো না কোন কথা, যদি কোন থাকে ব্যথা
রুধিয়া রেখো না তাহা হৃদয় মাঝারে! ...
হয়ত গো যৌবনের বসন্ত সমীরে
মানস-কুসুম তব ফুটেছে সুধীরে,
প্রণয় বারির তরে তৃষায় আকুল
ম্রিয়মান হ'য়ে বুঝি পোড়েছে সে ফুল?
পেয়েছ কি যুবা কোন মনের মতন?
ভালবাসো, ভালবাসা করহ গ্রহণ;
তা হ'লে হৃদয় তব, পাইবে জীবন নব
উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসময় হেরিবে ভুবন।[৩]

মুরলা প্রকাশ করিল না তাহার প্রেমাস্পদ কে। কবির মন অশান্ত। তাহারও সংগ্রাম চলিতেছে; তাহার মধ্যে "যেন দুটি সত্তা বাস করিতেছে; তাহার কবিসত্তা, যাহা আর দশজন হইতে স্বতন্ত্র; আবার তাহার মানবসত্তা, যাহা আর দশজনের অনুরূপ। এই দুই পরস্পর বিরোধী সত্তার মধ্যে কবি কিছুতেই মিলন ঘটাইতে পারিতেছেন না—ইহাই তাহার ট্রাজেডি।"[৪] কবি মুরলাকেই বলিতেছে—

বহু দিন হ'তে সখি, আমার হৃদয়
হোয়েছে কেমন যেন অশান্তি-আলয়।
চরাচর-ব্যাপী এই ব্যোম-পারাবার
সহসা হারায় যদি আলোক তাহার,
আলোকের পিপাসায় আকুল হইয়া
কি দারুণ বিশৃঙ্খল হয় তার হিয়া!
তেমনি বিস্ময় ঘোর হৃদয় ভিতরে
হ'তেছে দিবস নিশা, জানিনা কি·· তরে![৫]

১ ভারতী ১২৮৭ কার্তিক পৃ ৩৩৩। এই ভূমিকা মুদ্রিত গ্রন্থে সামান্য পরিবর্তিত হইয়াছে।
২ বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বিতীয় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৩৫১ পৃ ৪০০।
৩ র-র-অচ ১ম পৃ ১৩৪।
৪ প্রমথনাথ বিশী, বি-ভা-প ২য় বর্ষ ১৩৫১ পৃ ৪০২।
৫ ঐ পৃ ১৩৭।

সখি, আর কত দিন সুখ হীন, শান্তি হীন,
হাহা কোরে বেড়াইব, নিরাশ্রয় মন লোয়ে !

ইহা শুনিয়া মুরলা স্বগত বলিতেছে— "হা কবি ও হৃদয়ের শূন্য পুরাইতে অভাগিনী মুরলা গো কি না পারে দিতে !" কিন্তু কবি মুরলার হৃদয়ের সংবাদ রাখেন না।

নলিনী এক চপলস্বভাবা কুমারী। বিনোদ, প্রমোদ, অশোক, বিজয়, সুরেশ তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। সে কিন্তু কাহাকেও চায় না, হৃদয় কাহাকেও দান করে না, সকলের হৃদয় লইয়া খেলা করে। এ হইতেছে 'মায়ার খেলা'র প্রমদার পূর্বাভাস। কবি সেই নলিনী স্বর্ণমৃগীর পশ্চাতেই ফিরিতে লাগিল। মুরলা তাহার বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার ভ্রাতা অনিলকে প্রাণের কথা বলিল ; অনিল তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছে—

যে জন রেখেছে মন শূন্যের উপরে,
আপনারি ভাব নিয়া উলটিয়া পালটিয়া
দিনরাত যেই জন শূন্যে খেলা করে,
শূন্য বাতাসের পটে শত শত ছবি
মুছিতেছে আঁকিতেছে শতবার দেখিতেছে,
সেই এক মোহময় স্বপ্নময় কবি—
সদা যে বিহ্বল প্রাণে চাহিয়া আকাশ পানে
আঁখি যার অনিমেষ আকাশের প্রায়,
মাটিতে চরণ তবু মাটিতে না চায়—
ভাবের আলোকে অন্ধ তারি পদতলে
অভাগিনী, লুটাইয়া পড়িলি কি বোলে ?[১]

এদিকে অনিল ও ললিতার বিবাহ হইল। নলিনী, তাহার সখিগণ ও প্রণয়ীগণ উপস্থিত। নলিনী 'মায়ার খেলা'র প্রমদার ন্যায় একজন প্রেমাকাঙ্ক্ষীকে বলিতেছে— 'মিছে বোলোনাকো মোরে ভালবাস, ভালবাস ! নয়নেতে ঝরে বারি হৃদয়ে হৃদয়ে হাস !"[২] সে প্রত্যেক যুবককে একবার করিয়া বিরক্ত করিতেছে, কিন্তু কাহাকেও গ্রহণ করিতেছে না ; ইংলন্ডে রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি কুমারী মেয়ের জীবনযাত্রা যে ভাবের দেখিয়াছিলেন, এ যেন তাহারই রূপ।

একদা কবি ও মুরলার সাক্ষাৎ হইল। কবি নলিনীর রূপ বর্ণনা আরম্ভ করিলে মুরলা যথাসাধ্য তাহাতে যোগদান করিল ; মোহাচ্ছন্ন কবি মুরলার অন্তর্দাহ অনুভবমাত্র করিতে পারিল না। এদিকে নলিনীর ব্যবহারে কবি বুঝিয়াছেন যে এ নারী প্রেম কাহাকে বলে জানে না। বহুকাল পরে কবি নিজ ভ্রম বুঝিয়া যখন ফিরিলেন, তখন মুরলা অন্তিম শয্যায়। কবির ভুল ভাঙিল ; মুরলার মৃত্যুশয্যায় কবির সঙ্গে তাহার মিলন হইয়া বিবাহ হইল ; একই শয্যায় বাসর ও মুরলার চিতা প্রস্তুত হইল। এদিকে অনিলের প্রেমপিপাসা লাজময়ী ললিতা মিটাইতে না পারায় অনিলও নলিনীর প্রণয়ীর দলে যোগ দিয়াছিল। ললিতার শেষ অবস্থায় অনিলের সঙ্গে তাহার মিলন ঘটিল বটে, তখন ললিতা উন্মাদিনী। আর নলিনী প্রেমের লীলার ব্যর্থতা বুঝিতে পারিয়া আত্মজীবনকে ধিক্কার দিতে দিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী যথার্থ বলিয়াছেন, "নলিনী, তাহার প্রণয়ীগণ, ললিতা, মুরলী, কবি, অনিল সকলেই ভগ্নহৃদয়-প্রেমের চোরা পাহাড়ের আঘাতে বানচাল হইয়া সকলের হৃদয় ভগ্নহৃদয়।"

কবিকাহিনীর সহিত ভগ্নহৃদয়ের গল্পাংশের কিছু সাদৃশ্য আছে, নলিনী নাটকেরও যোগ আছে। মোটকথা বনফুল, কবিকাহিনী, ভগ্নহৃদয়, রুদ্রচণ্ড সবই এক ছাঁচে ঢালা ; সবগুলি তপ্ত উচ্ছ্বাসে ভারাক্রান্ত। প্রায় সকলগুলির মধ্যে নায়ক এক কবি। সে কবি কে, যদি বলা হয় রবীন্দ্রনাথ নিজ আত্মকথা কাব্যগুলির মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তবে ভুল করা হইবে ; কবি সম্বন্ধে যে আদর্শ বাল্যকালে তাঁহার মনে জাগিতেছিল সে আদর্শানুসারে কবি কিভাবে চিন্তা করিবেন

১ র-র অচ ১ম পৃ ১৪৭।   ২ ঐ পৃ ১৬১।

—তাহাই এই কাব্যগুলির মধ্যে প্রকাশ করিবার চেষ্টা জাগিতেছে; কিন্তু তরুণ কবির রুদ্ধমনের বাসনা ও সংগ্রাম তাঁহার অজ্ঞাতসারেই যে প্রকাশ পায় নাই এমন কথাও জোর করিয়া বলা যায় না।

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী ভগ্নহৃদয় ও তৎপূর্ববর্তী কাব্যগুলি সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য জ্ঞানে উদ্ধৃত করিলাম। "রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, 'স্বাভাবিক হবার শক্তি পরিণত বয়সের, সে বয়সে ভুলচুক থাকতে পারে নানা রকমের, কিন্তু অক্ষম অনুকরণের দ্বারা নিজেকে পরের মুখোশে হাস্যকর করে তোলা তার ধর্ম নয়, অন্তত আমি তাই অনুভব করি।' এই অক্ষম অনুকরণ বিশেষ ভাবের বা কোনো কবিবিশেষের অনুকরণমাত্র নয়— ইহা এমন একটা শিল্পধারার অনুকরণ যাহা কবির প্রকৃতিজাত নয়। এই শিল্পধারাটি কাহিনী-কাব্য। তৎকালে দীর্ঘ কাব্য, কাহিনী-কাব্য বা মেঘনাদবধের মতো এপিক-কাব্য রচনা বাংলাসাহিত্যের প্রথা ছিল। তিনিও দীর্ঘ কাহিনী-কাব্য দিয়াই কবিজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু অত্যল্পকালের অভিজ্ঞতাতেই তাঁহার কবিপ্রকৃতি বুঝিতে পারিয়াছিল, ওগুলি তাঁহার পথ নয়— তাঁহার প্রকৃত পথ গীতিকবিতা, লিরিক। যখন হইতে তিনি এই লিরিকে আসিয়া চূড়ান্তভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন তখন হইতেই তাঁহার কাব্য তিনি প্রকাশযোগ্য মনে করেন। সে-কাব্য 'সন্ধ্যাসংগীত'। অচলিত সংগ্রহ প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত সন্ধ্যাসংগীত হইতেই তাঁহার কাব্যের প্রকাশধারা ধরা হইত।"

এই গীতিকাব্যখানি উৎসর্গ করেন 'শ্রীমতী হে—কে।' তৎসঙ্গে 'উপহার' শীর্ষক একটি গান ভারতীতে (১২৮৭ কার্তিক) প্রকাশিত হয়। এই উৎসর্গ-গীতটি কিন্তু সেই বৎসরই মাঘোৎসবের সময় ব্রহ্মসংগীতে রূপান্তরিত করা হয়। সুতরাং ভগ্নহৃদয় পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিবার সময় (১২৮৮ বৈশাখ) কবিকে নূতন উপহার লিখিয়া দিতে হয়।[১] ভারতীতে প্রকাশিত 'উপহার'টি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

রাগিণী— ছায়ানট

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব না ক' পথহারা।
যেথা আমি যাই নাকো, তুমি প্রকাশিত থাকো।
আকুল এ আঁখি 'পরে ঢাল' গো আলোকধারা।
ও মুখানি সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে
আঁধার হৃদয় মাঝে দেবীর প্রতিমা পারা।
কখনো বিপথে যদি ভ্রমিতে যায় এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি সরমে যে হয় সারা।
চরণে দিনু গো আনি— এ ভগ্নহৃদয়খানি
চরণ রঞ্জিবে তব এ হৃদি-শোণিতধারা।

ভগ্নহৃদয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবার সময় উপহার নূতনভাবে রচিত হইল বটে, কিন্তু উপহারের পাত্রী শ্রীমতী হে— থাকিয়া গেলেন। এবার যেটি লেখা হইল, সেটি গান নয়, দীর্ঘ কবিতা (৩০ পংক্তি)। এই কবিতায় একস্থানে আছে:

১ ১২৮৭ মাঘোৎসবের জন্য যে আটটি গান রচনা করেন এই গানটি সামান্য রূপান্তরিতভাবে তাহাদের অন্যতম। ব্রহ্মসঙ্গীতের রূপটি গীতবিতানে আছে। দ্র. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ৮০২ শক (১২৮৭) ফাল্গুন সংখ্যা। রবিচ্ছায়া ১২৯২। গীতবিতান ১ম সংস্করণ পৃ ১২৮।

"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা। / এ সমুদ্রে আর কভু হব না ক পথহারা। / যেথা আমি যাই না ক, তুমি প্রকাশিত থাক / আকুল নয়ন-জলে ঢাল গো কিরণ ধারা। / তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে, / তিলেক অন্তর হ'লে না হেরি কূল-কিনারা। / কখনো বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি / অমনি ও-মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা। [আলাইয়া, ঝাঁপতাল। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৩। ১৩]।

এই গানটি বিলাত যাইবার পূর্বে বোধ হয় আমেদাবাদে রচিত। দ্র. মালতী পুঁথি।

"হয়ত জান না, দেবি, অদৃশ্য বাঁধন দিয়া
নিয়মিত পথে এক ফিরাইছ মোর হিয়া।
গেছি দূরে, গেছি কাছে, সেই আকর্ষণ আছে,
পথভ্রষ্ট হইনাক তাহারি অটল বলে,
নহিলে হৃদয় মম ছিন্ন ধূমকেতু সম
দিশাহারা হইত সে অনন্ত আকাশতলে !"

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিবে 'শ্রীমতী হে' কে। প্রথম ও দ্বিতীয় উপহারের ভাষা দেখিয়া মনে হয় তাঁহার বৌঠাকুরানী কাদম্বরী দেবীকে স্মরণ করিয়া এগুলি লিখিত ; এত ভক্তি, এত নির্ভর আর কাহারও উপর রবীন্দ্রনাথের ছিল না। কিন্তু 'হে'—কেন। এ প্রশ্নের উত্তর নিশ্চিতভাবে দেওয়া কঠিন। আমরা শুনিয়াছি 'হে' কাদম্বরী দেবীর কোনো ছদ্ম নামের আদ্যাক্ষর ; কেহ কেহ বলেন তাঁহার ডাকনাম ছিল 'হেকেটি'— এক গ্রীক দেবী। অন্তরঙ্গেরা রহস্যচ্ছলে এই নামটিতে তাঁহাকে ডাকিতেন। এই নারীর স্নেহ ও শাসন রবীন্দ্রনাথের যৌবনকে সুন্দরের পথে চালিত করিয়াছিল এবং পরবর্তীকালে তাঁহারই পবিত্র স্মৃতি ছিল তাঁহার জীবনের ধ্রুবতারা।

ভগ্নহৃদয় কাব্যখানি একবার মাত্র প্রকাশিত হয়। কবির এই আঠারো বৎসর বয়সের কাব্য সম্বন্ধে তাঁহার ত্রিশ বৎসর বয়সে লিখিত একখানি পত্রে তিনি যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"ভগ্নহৃদয় যখন লিখিতে আরম্ভ করেছিলেম তখন আমার বয়স আঠারো। বাল্যও নয় যৌবনও নয়। বয়সটা এমন একটা সন্ধিস্থলে যেখান থেকে সত্যের আলোক স্পষ্ট পাবার সুবিধা নেই। একটু-একটু আভাস পাওয়া যায় এবং খানিকটা-খানিকটা ছায়া। এই সময়ে সন্ধ্যাবেলাকার ছায়ার মতো কল্পনাটা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিস্ফুট হয়ে থাকে। সত্যকার পৃথিবী একটা আজগবি পৃথিবী হয়ে উঠে। মজা এই, তখন আমারই বয়স আঠারো ছিল তা নয়— আমার আশেপাশের সকলের বয়স যেন আঠারো ছিল। আমরা সকলে মিলেই একটা বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পনালোকে বাস করতেম। সেই কল্পনালোকের খুব তীব্র সুখদুঃখও স্বপ্নের সুখদুঃখের মতো। অর্থাৎ, তার পরিমাণ ওজন করবার কোনো সত্য পদার্থ ছিল না, কেবল নিজের মনটাই ছিল ;— তাই আপন মনে তিল তাল হয়ে উঠত।" (জীবনস্মৃতি)।

ভগ্নহৃদয় গীতিকাব্য রবীন্দ্রনাথকে সে যুগের যুবমহলে যশস্বী করিয়াছিল ; অনেকে এই কাব্যের অংশবিশেষ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন ; এইরূপ একজন সমসাময়িক যুবককে তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে দেখিয়াছি, তিনি কাব্যের বহু অংশ আবৃত্তি করিয়া গেলেন। ভগ্নহৃদয় ও সন্ধ্যাসংগীতের সমতুল্য কাব্য এযুগে বাংলাভাষায় ছিল না; সুতরাং সাহিত্যিক মাত্রেরই মনোযোগ প্রবলভাবেই এই কাব্যদ্বয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল।

ভগ্নহৃদয় প্রকাশিত হইলে ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর কিশোর রবীন্দ্রনাথকে কিভাবে সম্মানিত করিয়াছিলেন, তাহা 'জীবনস্মৃতি'তে বর্ণিত আছে। প্রধানা মহিষীর অকালমৃত্যুতে মহারাজ বিরহীর মর্মবেদনা প্রকাশ করিয়া কবিতালহরী লিখিতেছিলেন। কবি বীরচন্দ্রের তখনকার মানসিক ভাবের সহিত 'ভগ্নহৃদয়ে'র কবিতাগুলি সায় দিয়াছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে প্রতিভার প্রথম সূচনা দেখিতে পাইয়া তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী রাধারমণ ঘোষকে কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রেরণ করেন ; 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যখানি মহারাজকে প্রীত করিয়াছে, তজ্জন্য তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে তিনি জোড়াসাঁকোয় আসিয়া তরুণ কবির সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ বা তাঁহার পরিবারের কাহারো সহিত 'ত্রিপুরারাজের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না।[১]

১ জীবনস্মৃতি পৃ ১১২। রবি মাসিক পত্র ২য় বর্ষ ১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দ, ৪র্থ সংখ্যা।

সন্ধ্যাসংগীত

সন্ধ্যাসংগীত যুগের পূর্বেরচিত কবিতাগুলিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিজস্ব কাব্যসম্পদ বলিয়া স্বীকার করিয়া যান নাই। বনফুল হইতে ভগ্নহৃদয় পর্যন্ত কাব্য কয়খানি তাঁহার তেরো হইতে উনিশ বৎসরের মধ্যে রচিত। এই বয়সে কাব্য আরম্ভ করিয়াছিলেন অনুকরণে, বিহারীলালকে ও অক্ষয় চৌধুরীকে রাখিয়াছিলেন সম্মুখে।[১] এই কাব্যজীবনের অনুকরণপর্বের অবসানে সন্ধ্যাসংগীতের নূতন সুর ধ্বনিত হইল, যথার্থ লিরিকধর্মী কবিতার সুরে। ইতিপূর্বে তরুণ কবি তাঁহার অস্পষ্ট হৃদয়াবেগকে কাব্যের বা গাথার নায়কনায়িকার জবানিতে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তৎকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া এতদিন যাহা কিছু লিখিয়াছিলেন, তাহা আখ্যানমূলক কাব্য, অনুভূতিমূলক গীতিকাব্য নহে। বোধ হয় বাল্য ও যৌবনের মধ্যস্থিত অবস্থায় চিত্তের ভাবনারাজি অশরীরী অস্পষ্টতার মধ্যে বিচরণ করে; তাহারা লিরিকমূর্তি ধারণ করিবার মতো আবেগময়ী হয় না, অবরুদ্ধ মনের ব্যাকুল উচ্ছ্বাস নিজের ছন্দোময় ভাষায় প্রকাশ করিবার শক্তি অর্জন করে না। সন্ধ্যাসংগীতে কবি অতীতের বন্ধন ছিন্ন করিয়া নূতন আত্মশক্তি অনুভব করেন বলিয়াই এই কব্যের এত সমাদর।

সন্ধ্যাসংগীতকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যগ্রন্থাবলীর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন;[২] ভানুসিংহের পদাবলী পূর্বে রচিত হইলেও মুদ্রিত হয় পরে। সন্ধ্যাসংগীত সম্বন্ধে কবি তাঁহার জীবনস্মৃতিতে বহু বিস্তারেই লিখিয়াছেন। কবিতাগুলিকে তুচ্ছ বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু রচনার প্রেরণাকে তাচ্ছিল্য করিতে পারেন নাই। তবে এক এক সময়ে মনে হয়, যে কাব্যকে তিনি 'কালানুক্রমণদোষ'যুক্ত বলিয়া তাঁহার সাহিত্যদরবার হইতে বহিষ্কৃত[৩] করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, সে-সম্বন্ধে এত কৈফিয়ত না দিলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু সেকথা বোধ হয় ঠিক নহে; রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ-নিরপেক্ষ নিজস্ব কাব্যসৃষ্টির সূত্রপাত হইয়াছিল এই কাব্যের মধ্য দিয়া; সেইজন্য এই কাব্যের প্রতি দরদ অন্তত পক্ষে তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্যন্তও ছিল। তাহার পরে মতের হয়তো বদল হইয়াছিল।

প্রেরণা ও প্রতিক্রিয়া ব্যতীত গীতি-কবিতা রচিত হয় না; সন্ধ্যাসংগীত রচনার মধ্যে সেইরূপ প্রেরণা আছে কিনা তাহার অনুসন্ধান নিরর্থক নহে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে হঠাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবী জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছাড়িয়া দূরদেশে বেড়াইতে চলিয়া যান, সেই সময়ে তিনি তেতলার ঘর ও ছাদ অধিকার করিয়া নির্জনে দিনগুলি যাপন করেন। নূতন দাদা ও বৌঠাকুরানী হঠাৎ চলিয়া গেলে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করিতে লাগিলেন। পিতা অন্যত্র; জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ আপনার দর্শন আলোচনা, কাব্যরচনা প্রভৃতি লইয়া বিব্রত। সত্যেন্দ্রনাথ দূরে বোম্বাই প্রদেশে। হেমেন্দ্রনাথ বাড়িতে থাকিলেও তাঁহার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ তেমন দেখা যায় না; তাঁহার পত্নী এগারোটি ছেলেমেয়ে লইয়া নিজ সংসারগণ্ডির মধ্যে এমনি আবিষ্ট থাকিতেন যে দেবরাদির প্রতি মনোযোগ দিবার অবসর হইত কম; তাছাড়া তাঁহারা অন্য সকলের হইতে একটু পৃথক থাকিতেই ভালোবাসিতেন। মোট কথা বাড়িতে রবীন্দ্রনাথকে স্নেহ করিতে পারে এমন কেহ ছিল না। জ্যোতিদাদা ও বৌঠাকুরানীর

১ দ্র. পত্রগুচ্ছ ২৩ ফেব্রু, ১৯৩৯। কবিতা, ১৩৫০ পৌষ পৃ ১৩৭।

২ "সন্ধ্যাসংগীতের পূর্ববর্তী আমার সমস্ত কবিতা আমার কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে বাদ দিয়াছি।... অতএব সন্ধ্যাসংগীতকে দিয়া কাব্যগ্রন্থাবলী আরম্ভ করা গেল।" ১৯১৫ সালের ইণ্ডিয়া প্রেস হইতে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থাবলীর ভূমিকা।

৩ "যদি সুযোগ পাইতাম তবে সন্ধ্যাসংগীতকেও বাদ দিতাম।... দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্যভাণ্ডারে আবর্জনা ... যাহা একবার প্রকাশ হইয়াছে তাহাকে বিদায় করা কঠিন।" ঐ ভূমিকা। সঞ্চয়িতা সম্পাদন কালে এই মনোভাবই প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্ররচনাবলীর প্রথম খণ্ডের ভূমিকা এই কথারই পুনরুক্তিমাত্র।

কাছে স্নেহ পাওয়াটা এমনি অভ্যাসগত হইয়া গিয়াছিল যে তাঁহাদের অভাবটা কবির স্বভাবকোমল চিত্তে নানাভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। কাদম্বরী দেবী তাঁহার অদ্ভুত-স্বভাব দেবরটিকে বাল্যকাল হইতেই একটু অধিক স্নেহ করিতেন, তাঁহার আবদারও সহ্য করিতেন বিস্তর। রবীন্দ্রনাথের 'লেখাপড়া' না হওয়ায় বাড়ির সকলেই যখন তাঁহার উপর বিরূপ তখন বৌঠাকুরানীর অহেতুকী স্নেহ কবির জীবনে দেবতার আশীর্বাদের ন্যায় মঙ্গলপ্রদ হইয়াছিল। বয়সে তিনি রবীন্দ্রনাথ হইতে মাত্র বৎসর দুইএর বড়ো; কিন্তু মেয়েরা সেই সামান্য বয়স্কতার জন্যই ছোটোদের উপর অতি সূক্ষ্ম প্রভাব ও প্রতিপত্তি সহজেই স্থাপন করেন। সেই ঘনিষ্ঠতা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবন বিকাশের জন্য বিপুলভাবে দায়ী, তাহা রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনা করিলে স্পষ্টতর হইবে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবী দূরে চলিয়া গেলে, রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "কাব্যরচনার যে-সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া গেল।" এই বাঁধনছাড়া অবস্থা মনে মুক্তি ও কাব্যে বিপ্লব আনিবার পক্ষে যথার্থই অনুকূল। এখন হইতে কাব্যজীবনের নূতন ধারা শুরু হইল। অন্যকে খুশি করা অপেক্ষা, নিজে খুশি হওয়াটা কাব্যসাধনার বড়ো কথা— এই তত্ত্বটা এইবারকার নিরালাবাসের বড়ো আবিষ্কার। এতদিন জ্যোতিদাদা ও বৌঠাকুরানী ছিলেন তাঁহার সাহিত্য ও ভাবজীবনের প্রেরণা ও রসগ্রাহীতার উৎস। "তাঁহাদের নিকট খ্যাতি পাইবার ইচ্ছায় মন স্বভাবতই যেসব কবিতার ছাঁচে লিখিবার চেষ্টা করিত, বোধ করি তাঁহারা দূরে যাইতেই আপনা-আপনি সেই-সকল কবিতার শাসন হইতে" কবির চিত্ত মুক্তিলাভ করিল। এতদিন পরে বিহারীলালের অনুকৃতি হইতে তাঁহার মুক্তি হইল। কাদম্বরী দেবী বিহারীলালের একজন বড়ো রকম ভক্ত ছিলেন এবং মনে মনে আশা করিতেন যে তাঁহার দেবরটির যেরূপ প্রতিভা, কালে তিনি হয়তো বিহারীলালের সমকক্ষ কবি হইতে পারিবেন। সামান্য বিদ্যা ও স্বল্প বোধশক্তি লইয়া তাঁহার কাব্য-আদর্শের ধারণা বিহারীলালের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিত না। তরুণ কবিও নিজের প্রতি বিশ্বাসের অভাবে ও বৌঠাকুরানীর প্রতি সকল বিষয়ে অতিরিক্ত নির্ভতার ফলে, কাব্যের সেই আদর্শকে চরম বলিয়া এ যাবৎকাল মনে করিয়া আসিতেছিলেন। সন্ধ্যাসংগীতে সেই মুক্তির আহ্বান আসিল বলিয়া রবীন্দ্রনাথ এত করিয়া জীবনস্মৃতিতে এই কাব্যের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বাংলা ভাষায় যথার্থ লিরিকের সুর বাজে বিহারীলালের কাব্যে। রবীন্দ্রনাথের মতে 'সেই প্রথম বাংলা কবিতা' যাহার মধ্যে 'কবির নিজের সুর' শোনা গিয়াছিল। মধুসূদনের চতুর্দশপদ কবিতায় কবির আত্মনিবেদন কখনো কখনো প্রকাশ পাইয়া থাকিবে; কিন্তু 'চতুর্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আত্মকথা এমন কঠিন ও সংহত হইয়া আসে যে, তাহাতে বেদনার গীতোচ্ছ্বাস তেমন স্ফূর্তি পায় না।'[১]

রবীন্দ্রনাথের এই যুক্তি নিজ লিরিক রচনার সমর্থনে লিখিত; কারণ তিনি তাঁহার যথার্থ লিরিকধর্মী কবিতাগুলিকে চতুর্দশপদের মধ্যে সীমায়িত করিয়া সংহত করিতে পারেন নাই। বাংলা লিরিকে রবীন্দ্রনাথ যুগপ্রবর্তক; ইতপূর্ব যুগের কোনো কবির সহিত তাঁহার লিরিকের তুলনা করা যায় না। কিন্তু নূতন লিরিক রচনায় রবীন্দ্রনাথই যে একমাত্র কবি ছিলেন— একথা বলিলে বাঙালি কবিগণের প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হইবে। আধুনিক যুগে মধুসূদন বাংলা-ভাষায় লিরিকের সুর সর্বপ্রথম বাঙালিকে শুনাইয়াছিলেন; সেই হইতে নূতন কবিতার জন্ম। ইংরেজি সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া ও যুগপৎ বাংলা ভাষা ও ছন্দ সামান্যভাবে আয়ত্ত করিয়া একদল তরুণ সাহিত্যিক ইংরেজি কবিতার নকলে লিরিক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাঙালির জীবনে অনুভূতির ক্ষেত্র এতই সংকীর্ণ ও গতানুগতিকের পথে বাঁধা যে, কবিতার মধ্যে লিরিকের আন্তরিক সুর আনা কবিদের পক্ষে কঠিন। এই নবীন লেখকদের নিজস্ব সম্পদ বলিতে ছিল ভাষার দৈন্য ও অনুভূতির ঐকান্তিকতার অভাব! সাহিত্যের সবই ছিল ইংরেজির

১ বিহারীলাল, 'আধুনিক সাহিত্য'।

অনুকরণ। 'ইংরেজি' বলিতেছি— তাহার কারণ, আমরা যে শিক্ষা পাইয়া আসিতেছি, তাহা সম্পূর্ণরূপে ইংরেজের দান ; ইংরেজি সভ্যতা, ইংরেজি সাহিত্য— যাহাকে বলে দ্বৈপ, insular — তাহাই আমাদের প্রধানতম মানসিক উপজীব্য। বৃহত্তর য়ুরোপীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বিশাল খরপ্রবাহের অতিক্ষীণ ধারা বহু পথ ঘুরিয়া আমাদের কাছে পৌঁছায়। সেই ইংরেজি সাহিত্য-অনুপ্রাণিত বাঙালি লেখকমণ্ডলী কালে বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। একথা অস্বীকার করিবার চেষ্টা করা বৃথা যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শুরু হইতে যে-সাহিত্য বাংলাদেশে রূপ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহার প্রেরণা বহুল পরিমাণে পাশ্চাত্ত্য। বিলাতীফুলের বীজ গ্রীষ্মমণ্ডলের মৃত্তিকায় জন্মিলে মাতৃভূমি হইতে তাহার যেটুকু পার্থক্য, মধ্য উনবিংশ শতকোত্তর ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির পার্থক্য ততটুকু মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কোনো সাময়িক প্রবন্ধে তৎকালীন বাঙালি কবিদের ইংরেজি-অনুকরণ-প্রিয়তার জন্য তীব্র ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তিনি নিজেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহারও শিক্ষাদীক্ষা বহুল পরিমাণেই পাশ্চাত্ত্য ; আত্মবিশ্লেষণ করিয়া তখনও তিনি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই যে তাঁহার মনের গঠন গভীরভাবে য়ুরোপীয় ভাবাপন্ন। তাঁহার বিরাট সাহিত্য পাশ্চাত্ত্য রীতি অনুসরণ করিয়া মহান্। তাঁহার কবিতার সহিত মধ্যযুগীয় বাংলা কবিতার সুর, রূপ ও গুণের পার্থক্য এতবেশি, যে একমাত্র ভাষা ছাড়া উভয়ের মধ্যে মিল খুঁজিতে হইলে কষ্ট কল্পনা করিতে হয়। সোক্রাতিস তাঁহার সমসাময়িক সোফিস্ট বা পণ্ডিতগণের সহিত নিত্য কলহ করিয়া তাহাদের চিন্তাধারায় ভ্রম প্রদর্শন করাইতেন, কিন্তু তাঁহাকেই বলা হয় Prince of Sophists ; শঙ্করাচার্য বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছিলেন, অথচ তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া পণ্ডিতেরা তাঁহাকে 'প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ' আখ্যা দান করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সেই কথা প্রযোজ্য। তিনি পাশ্চাত্ত্য তথা ইংরেজি সাহিত্যের ভাব ও রীতি এমন সুনিপুণভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে তাঁহার কাব্যের মধ্যে বৈদেশিকতাটা উৎকটরূপে দেখা দেয় নাই, সেটাকে যতদূর সম্ভব প্রচ্ছন্ন রাখিবার চেষ্টায় তিনি অধিক কৃতকার্য হইতে পারিয়াছিলেন ; তিনি অনুসরণ করেন, কিন্তু অনুকরণ করেন নাই ; সেইখানেই তাঁহার মনীষা। সেইজন্য তাঁহার কাব্যে য়ুরোপীয় প্রভাব প্রচুর থাকিলেও তাহা প্রচ্ছন্ন। সেযুগে 'আধুনিক' লেখকদের কদর হইত ইংরেজ লেখকদের মানসূচী দ্বারা ; সেইজন্য বাঙালি লেখকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে বলা হইত স্কট্, নবীনচন্দ্রকে বাইরন্, মধুসূদনকে মিলটন্, আর রবীন্দ্রনাথকে বলা হইল শেলী। এই নামকরণের দ্বারাই বুঝা যায় তখনো বাংলা সাহিত্যে নিজস্ব কোনো মানসূচী নির্দিষ্ট হয় নাই, ইংরেজি মানসূচী দ্বারা বাঙালি সাহিত্যিকদের মান ও নাম হইত।

বহু বৎসর পরে কবি নিজ রচনাকে সম্পূর্ণরূপ নৈর্ব্যক্তিক পরিপ্রেক্ষণীতে দেখিয়া একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন— "দেশ বিদেশ থেকে নানারকম ভাবের প্রেরণা এসে পৌঁচেছে আমার মনে এবং রচনায়, তাকে স্বীকার করে নিয়েছি, তা আমার কাব্যদেহকে বল দিয়েছে পুষ্টি দিয়েছে কিন্তু কোনো বাইরের আদর্শ তার স্বাভাবিক রূপকে বদল করে দেয়নি।······ আগাগোড়া রূপ বদল দেখলেই বুঝি সেটা আদর্শকে গ্রহণ করা নয় সেটা আদর্শকে নকল করা। এই জিনিসটাকে আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। ··· আমাদের দেশের হাল আমলের কাব্য, যাকে আমরা আধুনিক বলছি যদি দেখি তার দেহরূপটাই অন্য দেহরূপের প্রতিকৃতি তাহলে তাকে সাহিত্যিক জীবসমাজে নেব কী করে। যে কবিদের কাব্যরূপ অভিব্যক্তির প্রাণিক নিয়মপথে চলেছে তাঁদের রচনার স্বভাব আধুনিকও হোতে পারে সনাতনীও হোতে পারে অথবা উভয়ই হোতে পারে, কিন্তু তার চেহারাটা হবে তাঁদেরই, সে কখনোই এলিয়টের বা অডেনের বা এজরা পাউণ্ডের ছাঁচে ঢালাই করা হোতে পারে না।··· যে কবির কবিত্ব পরের চেহারা ধার করে বেড়ায় সত্যকার আধুনিক হওয়া কি তার কর্ম।"[১] রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের কাব্যসম্বন্ধে এই কথাই বলা যায় যে তাহা অনুকরণের স্তরে নিমজ্জিত থাকে নাই।

১ পত্রগুচ্ছ ২৩।২।৩৯ কবিতা পৌষ ১৩৫০ পৃ ১৩৮।

গোধূলিতে আলো-আঁধার পরস্পরকে এমনভাবে অবলেপন করিয়া থাকে যে উভয়কে অস্পষ্টভাবে দেখা যায়, কিন্তু বুঝা যায় না। ভগ্নহৃদয় ও *সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাকে ঠিক সেই পর্যায়ে ফেলা যায়— যেখানে ভাবের অস্পষ্টতায় ভাষা* বিকৃত, ছন্দ পঙ্গু। সন্ধ্যাসংগীতের বীণাতন্ত্রী ভগ্নহৃদয়ের বিষাদসুরে বাঁধা। ভগ্নহৃদয়ের মনোবেদনা গল্পের নায়ক-নায়িকার মুখ দিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল; সন্ধ্যাসংগীতের ঐ বেদনাই অন্যের জবানিতে না কহাইয়া, নিজের ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা মাত্রেই কবির লেখনীতে নবীন বল আসিয়াছিল। বিহারীলালের ছন্দবন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। জীবনস্মৃতিতে কবি লিখিয়াছেন যে, সন্ধ্যাসংগীত রচনাকালে তিনি কোনো বন্ধনের দিকে তাকান নাই। মনে কোনো ভয় ডর যেন ছিল না। কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, কাহারও কাছে কোনো জবাবদিহির কথা ভাবেন নাই। এতদিন কেবলমাত্র নিজের উপর ভরসা করিতে পারেন নাই বলিয়া নিজের জিনিসকে পান নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "কাব্যহিসাবে সন্ধ্যাসংগীতের মূল্য বেশি না হইতে পারে। উহার কবিতাগুলি যথেষ্ট কাঁচা। উহার ছন্দ ভাষা ভাব—মূর্তি ধরিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। উহার গুণের মধ্যে এই যে, আমি হঠাৎ একদিন আপনার ভরসায় যা-খুশি তাই লিখিয়া গিয়াছি। সুতরাং সে-লেখাটার মূল্য না থাকিতে পারে কিন্তু খুশিটার মূল্য আছে।" সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলি প্রধানত ভারতীতে প্রকাশিত হয় ১২৮৮ সালে; শৈশব সংগীতের কবিতা তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের মধ্যে রচিত; ভগ্নহৃদয় উনিশ বৎসর বয়সের লেখা, আর বিশ বৎসর বয়সের লেখা হইতেছে সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলি।

সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলি মনোসংযোগ সহকারে পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে বিচিত্র মান অভিমান রাগ অনুরাগের দ্বন্দ্ব হইতে যে বিষাদ সৃষ্ট হয় তাহাই এই লিরিক বা সংগীতে মূর্তি লইয়াছে। কবিতাগুলি যে সম্পূর্ণরূপে নৈর্ব্যক্তিক, একথা মনে করিবার কোন সংগত কারণ আমরা পাই না। আঘাত অভিঘাত ব্যতীত মানবের অসাড় মন জাগে না, এবং আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথের এই কাব্য রচনার মধ্যেও সেই তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। জোড়াসাঁকোর বাড়ি হইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁহার পত্নী হঠাৎ বেড়াইতে চলিয়া গেলে কবির মনে যে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা 'পরিত্যক্ত' কবিতায় অস্পষ্ট নহে—

চ'লে গেল! আর কিছু নাহি কহিবার।
চ'লে গেল! আর কিছু নাহি গাহিবার!
শুধু গাহিতেছে আর শুধু কাঁদিতেছে
দীনহীন হৃদয় আমার,
শুধু বলিতেছে
'চ'লে গেল সকলেই চ'লে গেল গো!'
'বুক শুধু ভেঙে গেল দ'লে গেল গো!'...
পুরানো মলিন ছিন্ন বসনের মতো
মোরে ফেলে গেল,
কাতর নয়নে চেয়ে রহিলাম কত
সাথে না লইল!
তাই প্রাণ গাহে শুধু—কাঁদে শুধু—কহে শুধু—
'মোরে ফেলে গেল—
সকলেই মোরে ফেলে গেল
সকলেই চ'লে গেল গো!'
একবার ফিরে তারা চেয়েছিল কি?
বুঝি চেয়েছিল!
একবার ভুলে তারা কেঁদেছিল কি?
বুঝি কেঁদেছিল!
বুঝি ভেবেছিল—
'লয়ে যাই— নিতান্ত কি একেলা কাঁদিবে?
না-না কী হইবে ল'য়ে? কী কাজে লাগিবে?'
তাই বুঝি ভেবেছিল!
তাই চেয়েছিল।

পার্থিব দিক হইতে ব্যর্থতার গ্লানিতে রবীন্দ্রনাথের মন তখন ভারাক্রান্ত; কারণ বিলাত হইতে কিছুই না হইয়া ফিরিয়া আসাতে সকলেই তাঁহাকে কৃপার চক্ষে দেখেন; তাই 'গান সমাপন' কবিতাটির মধ্যে লিখিতেছেন—

এমন মহান্ এ সংসারে/জ্ঞানরত্ন রাশির মাঝারে যে-জন কিছুই শেখে নাই।
আমি দীন শুধু গান গাই,/তোমাদের মুখপানে চাই; ওগো সখা, ভয়ে ভয়ে তাই
ভালো যদি না লাগে সে গান/ভালো সখা, তাও গাহিব না।" যাহা জানি, সেই গান গাহি;
বড়ো ভয় হয়, পাছে কেহই না দেখে তারে তোমাদের মুখপানে চাই।

ভগ্নহৃদয়ের মধ্যে যে অবরুদ্ধ মনের দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, সন্ধ্যাসংগীতে তাহারই রূপান্তর দেখা যাইতেছে; বিশ বৎসর বয়স না কৈশোর না যৌবন। যৌবনের মদিরা শিরার মধ্যে মাদকতা আনে কিন্তু উপভোগের আনন্দ হইতে বঞ্চিত বলিয়া কখনো অতৃপ্ত, ক্ষুব্ধ, কখনো বা মুহ্যমান, দুঃখাতুর। 'অসহ্য ভালবাসা' কবিতাটি পাঠ করিলে আমাদের বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে।

"এই রূপে দেহের দুয়ারে/মন যবে থাকে যুঝিবারে, নাহি চাও আত্মহারা প্রেম,/আছে যেথা অনন্ত পিয়াস,
তুমি চেয়ে দেখ মুখ বাগে/এত বুঝি ভালো নাহি লাগে! বহে যেথা চোখের সলিল,/উঠে যেথা দুখের নিশ্বাস।"

'অনুগ্রহ' (ভারতী ১২৮৮, মাঘ) কবিতাটির মধ্যে কবির মনে নানা প্রশ্ন উঠিয়াছে;

এই যে জগত হেরি আমি,
মহাশক্তি জগতের স্বামী,
একি হে তোমার অনুগ্রহ?
হে বিধাতা, কহ মোরে কহ'।
ক্ষুদ্র হোতে ক্ষুদ্র এক জন
আমারে যে করেছ সৃজন,
একি শুধু অনুগ্রহ করে
ঋণ পাশে বাঁধিবারে মোরে?
মহা অনুগ্রহ হ'তে তব
মুছে তুমি ফেলহ আমারে—
চাহিনা থাকিতে এ সংসারে।

কবির আকাঙ্ক্ষা কী, এই কবিতায় তাহাও ব্যক্ত—

কবি হোয়ে জন্মেছি ধরায়,
ভালবাসি আপনা ভুলিয়া,
গান গাহি হৃদয় খুলিয়া,
ভক্তি করি পৃথিবীর মত,
স্নেহ করি আকাশের প্রায়।
আপনারে দিয়েছি ফেলিয়া,
আপনারে গিয়েছি ভুলিয়া,
যারে ভালবাসি তার কাছে
প্রাণ শুধু ভালবাসা চায়।

মান অভিমান ক্রোধ যুগপৎ মনকে ক্লান্ত ও ক্ষুব্ধ করিতেছে—

যবে আমি যাই তার কাছে
সে কি মনে ভাবে গো তখন,
অনুগ্রহ ভিক্ষা মাগিবারে—
এসেছে ভিক্ষুক একজন?

কবিতাটির শেষ দিকে উত্তেজিত ভাবে কবি বলিতেছেন—

"কেহ যেন মনে নাহি করে
মোরা কারো কৃপার প্রয়াসী।
না হয় শুনো না মোর গান,
ভালবাসা ঢাকা রবে মনে,
অনুগ্রহ কোরে এই কোরো
অনুগ্রহ কোরো না এজনে!

সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলি আগাগোড়া একটা নিরাশা, একটা অশান্ত হৃদয়ের অকারণ ক্রন্দনপরায়ণতায় পূর্ণ। 'দুঃখের আবাহন' (ভারতী ১২৮৭ ফাল্গুন) বোধ হয় এই কবিতাগুচ্ছের আদি রচনা। 'ভারতী'তে এই কবিতা যে মাসে প্রকাশিত হইল, সেই মাসে ভগ্নহৃদয়ের ষষ্ঠ সর্গ মুদ্রিত হয়। এই কবিতায় কবি দুঃখকে প্রাণপণে আহ্বান করিতেছেন—

আয় দুঃখ, আয় তুই,
তোর তরে পেতেছি আসন···
নিরালয় এ হৃদয়
শুধু এক সহচর চায় !
তুই দুঃখ, তুই কাছে আয় ।

'শান্তিগীত' কবিতায় সেই দুঃখের স্তব—

ঘুমা' দুঃখ হৃদয়ের ধন,
ঘুমা' তুই, ঘুমারে এখন ।
সুখে সারা দিনমান শোণিত করিয়া পান
এখন তো মিটেছে তিয়াষ !
দুঃখ তুই সুখেতে ঘুমাস্ ।

দুঃখভোগ করিতে যেন ভালো লাগিতেছে; তাই 'আশার নৈরাশ্যে' লিখিতেছেন— 'বলো আশা বসি মোর চিতে, আরো দুঃখ হইবে বহিতে।' এইরূপ বিষাদ সুর সমস্ত কবিতার মধ্যে।

কিন্তু এই বিষাদপূর্ণ মনোভাবকেই তিনি চরম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন না; বারে বারে নিজের সৃষ্টিকে কবি আঘাতে আঘাতে চূর্ণ করিয়াছেন— 'নিজে হাতে জ্বালা, পূজা দীপের থালা' তাঁহার হাতে খান্ খান্ হইয়াছে; সুতরাং এই মোহঘোর হইতে বাহির হইবার জন্য আকুলভাবে বলিয়া উঠিতেছেন,—

দূর কর— দূর কর— বিকৃত এ ভালোবাসা—
জীবনদায়িনী নহে, এ যে গো হৃদয়-নাশা !
কোথায় প্রণয়ে মন যৌবনে ভরিয়া উঠে,
জগতের অধরেতে হাসির জোছনা ফুটে,
···
তা নয়, একি এ হল, একি এ জর্জর মন,
হাসিহীন দু' অধর, জ্যোতিহীন দু'নয়ন !

দূরে যাও— দূরে যাও, হৃদয় রে দূরে যাও—
ভুলে' যাও— ভুলে' যাও— ছেলেখেলা ভুলে' যাও
দূর কর— দূর কর— বিকৃত এ ভালোবাসা—
জীবনদায়িনী নয়, এ যে গো হৃদয়-নাশা।

সাধারণত বই-এর উপহার থাকে প্রথম দিকে, সন্ধ্যাসংগীতের উপহার হইতেছে শেষভাগে। কাহাকে উপহার তাহা কবি বলেন নাই, আমরাও কোনোরূপ অনুমানের উপর সিদ্ধান্ত গড়িতে চাহি না।

মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থে' (১৩১০) সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলি লইয়া যে একটি খণ্ড করেন, তাহার নাম দেন 'হৃদয়ারণ্য'। প্রভাতসংগীতের 'পুনর্মিলন' কবিতায় এই যুগের কথা স্মরণ করিয়া কবি লিখিয়াছেন, 'হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে ···তারি মাঝে হনু পথ হারা।' এই পংক্তি হইতে কাব্যখণ্ডের নাম সংগৃহীত হয়। কবি তাঁহার নব নামাঙ্কিত কাব্যগুলির জন্য ভূমিকারূপে যে কবিতা লিখিয়া দেন সেইগুলি কবিতাগুচ্ছের যথার্থ প্রবেশক। 'হৃদয়ারণ্য' খণ্ডের জন্য লেখেন "কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে কাদিছে আপন মনে"। কিন্তু এই আকুতির অন্তরালে রহিয়াছে চির আশ্বাস, অনন্ত নির্ভর—"কিছু নেই তোর ভাবনা ! যে শুভ প্রভাতে সকলের সাথে, মিলিবি পুরাবি কামনা আপন অর্থ সেদিন বুঝিবি; জনম ব্যর্থ যাবে না।" তাই একদিন এই হৃদয়ারণ্য হইতে প্রভাতসংগীতের সুরের টানে 'নিষ্ক্রমণ' হইল বিশ্বের মাঝে।

সন্ধ্যাসংগীত সে যুগের অন্য সমস্ত কবিতা হইতে আপন ছন্দের বিশেষ সাজ পরিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল; সে সাজ বাজারে চলিত ছিল না। সুতরাং কাব্যের যথার্থ সমজদাররা ইহার সমাদর করিয়াছিলেন প্রচুর পরিমাণে। রচনাকালে "এই উচ্ছৃঙ্খল কবিতা শোনাইবার একজনমাত্র লোক ছিলেন অক্ষয়বাবু।" তাঁহার এই কবিতাগুলি হঠাৎ অত্যন্ত ভালো লাগিয়া গেল; তাঁহার অনুমোদনে কবির পথ আরও প্রশস্ততর হইল। এই কাব্য প্রকাশিত হইলে প্রিয়নাথ সেনকে কবি তাঁহার একজন অকপট বন্ধুরূপে লাভ করিলেন। তিনি ভগ্নহৃদয়

পাঠ করিয়া তরুণ কবি সম্বন্ধে অত্যন্ত হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু সন্ধ্যাসংগীত প্রকাশিত হইলে তাঁহার নিকট প্রচুর সমাদর লাভ করিলেন। প্রিয়নাথ ছিলেন সেই শ্রেণীর সাহিত্যিক যিনি উৎসাহ বাণী ও অনুকূল সমালোচনা দ্বারা সাহিত্যস্রষ্টাদের রচনাকে অভিনন্দিত করিতেন।

সন্ধ্যাসংগীত প্রকাশিত হইলে বঙ্কিমচন্দ্র কবিকে কিভাবে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, সে-কথা জীবনস্মৃতিতে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কন্যা কমলার সেদিন বিবাহ, (১৮৮২ জুন-জুলাই) প্রমথনাথ বসুর সহিত। বিবাহসভার "দ্বারের কাছে বঙ্কিমবাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন। রমেশবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের গলায় মালা পরাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি সে-মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন, 'এ মালা ইঁহারই প্রাপ্য— রমেশ তুমি সন্ধ্যাসংগীত পড়িয়াছ ?" তিনি বলিলেন, 'না'। তখন বঙ্কিমবাবু সন্ধ্যাসংগীতের কোনো কবিতা সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিলেন তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইয়াছিলাম।"

বিবিধ প্রসঙ্গ

মসুরি হইতে ফিরিয়া আসিয়া রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিকট চন্দননগরে গঙ্গাধারের বাগানবাটীতে (মোরান সাহেবের বাগান)[১] আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে গঙ্গাতীর পরিচ্ছেদে এই বাগানবাটীর ও তথাকার আনন্দময় দিবসগুলির সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। "আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ-করা পূর্ণবিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল।" বাড়ির সর্বোচ্চতলে চারিদিক খোলা একটা গোল ঘর ছিল কবির কবিতা লিখিবার স্থান। এখানে আসিয়া সন্ধ্যাসংগীতের কয়েকটি কবিতা লিখিত হয়। এই ঘর লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন —

অনন্ত এ আকাশের কোলে এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
টলমল মেঘের মাঝার— তোর তরে কবিতা আমার।

'কবিতা সাধন'[২] কবিতাটি সন্ধ্যাসংগীতের অন্তর্গত হইলেও ইহার সুরের মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য ফুটিয়াছে ; সন্ধ্যা-সংগীতের অন্যান্য কবিতার মধ্যে যে দুঃখবরণের ভাব আছে এই কবিতাটি যেন সেই মনোভাব হইতে কিছুটা মুক্ত ; কবিতাসুন্দরী বা মানসসুন্দরীকে ভাষার মধ্যে মূর্ত করিয়া তুলিবার প্রথম আভাস যেন এই কবিতায় পাওয়া যায়। বহু বৎসর পরে চন্দননগরে আসিয়া কবি বলিয়াছিলেন, "সেই সময় আমি প্রথম অনুভব করেছিলুম যে, বাংলা দেশের নদীই বাংলা দেশের ভিতরকার প্রাণের বাণী বহন করে।"[৩] রবীন্দ্রনাথের জীবনে তথা রবীন্দ্রসাহিত্যে নদীর প্রভাব বিশেষভাবে আলোচনার একটি বিষয়।

কবি জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন, "যখন সন্ধ্যাসংগীত লিখিতেছিলাম তখন খণ্ড খণ্ড গদ্য 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামে বাহির হইতেছিল।"…"সেও কোনো বাঁধা লেখা নহে—সেও একরকম যা-খুশি তাই লেখা।…মনের রাজ্যে যখন বসন্ত আসে তখন ছোটো ছোটো স্বল্পায়ু রঙিন্ ভাবনা উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে কেহ লক্ষ্যও করে না, অবকাশের দিনে সেইগুলাকে ধরিয়া রাখিবার খেয়াল আসিয়াছিল। আসল কথা, তখন সেই একটা ঝোঁকের মুখে চলিয়াছিলাম—মন বুক-ফুলাইয়া বলিতেছিল, আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিব—কী লিখিব সে খেয়াল ছিল না কিন্তু আমিই লিখিব এইমাত্র তাহার একটা উত্তেজনা।"

১ দ্র. শ্রীহরিহর শেঠ : রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে চন্দননগরের স্থান (সচিত্র) প্রবাসী ১৩৩৮, আশ্বিন।

২ কবিতাসাধন, ভারতী ১২৮৮ পৌষ ৪০৭-৯ : সন্ধ্যাসংগীতে 'গান আরম্ভ' নাম। প্রিয়নাথ সেন ভারতী ১২৮৯ ফাল্গুনে 'কবিতাসাধন' নামে এক দীর্ঘ কবিতা লেখেন।

৩ বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন। চন্দননগর ১৩৩৩।

ভারতী ১২৮৮ সালের শ্রাবণ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া ১২৮৯ সালের বৈশাখ মাস পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক মাসেই দুই চারিটি করিয়া এই টুকরা লেখা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১২৯০ ভাদ্র মাসে (১৮৮৩ সেপ্টে)।

'বিবিধ প্রসঙ্গ' নাম হইতেই বুঝা যায় যে প্রবন্ধগুলি সমধর্মী নহে; ইহাতে যেমন একদিকে 'বসন্ত ও বর্ষা' 'প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল'-এর মতন গভীর ভাবের প্রবন্ধ আছে, যাহা তাঁহার পরযুগের গদ্য রচনার অন্তর্গত করিয়া চালাইয়া দেওয়া যায়; অন্যদিকে তেমনি 'শূন্য' 'স্ত্রৈণ' 'জমাখরচ'এর মতন হালকাভাবের প্রবন্ধ আছে; আবার 'দয়ালু মাংসাশী'র মতন রাজনীতিগন্ধী প্রবন্ধও পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে উপলক্ষ্য করিয়া লেখক বেশ খানিকটা রসিকতা করিয়া লইয়াছেন; কিন্তু প্রবন্ধ পাঠের পর ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদকে আমরা মনে রাখি না, মনে থাকিয়া যায় মধুর হাস্যাবেগ।[১] এই প্রসঙ্গটির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি —

"বিখ্যাত ইংরাজ কবি বলিয়াছেন যে, আমরা বোকা জানোয়ারের মাংস খাই, যেমন ছাগল, ভেড়া, গরু।... দেখা যাক্, বোকা জানোয়ারেরা কি খায়। তাহারা উদ্ভিজ্জ খায়। অতএব উদ্ভিজ্জ যাহারা খায় তাহারা বোকা। এমন দ্রব্য খাইবার আবশ্যক? নির্বোধদের আমরা গাধা, গরু, ঘোড়া, হস্তিমূর্খ কহিয়া থাকি। কখনো বিড়াল, ভল্লুক, সিংহ বা ব্যাঘ্রমূর্খ বলি না। উদ্ভিজ্জভোজীদের এমন নাম খারাপ হইয়া গিয়াছে যে, বুদ্ধির যথেষ্ট লক্ষণ প্রকাশ করিলেও তাহাদের দুর্নাম ঘুচে না। নহিলে 'বাঁদর' বলিয়া সম্ভাষণ করিলে লোকে কেন মনে করে তাহাকে নির্বোধ বলা হইল। উদ্ভিদ-ভোজী ভারতবর্ষকে ইংরাজশ্বাপদেরা দিব্য হজম করিতে পারিয়াছেন; কিন্তু পাকযন্ত্রের প্রতি অল্প অল্প বিশ্বাস থাকাতে মাংসাশী কান্দাহার গ্রাস করিলেন, ভাল হজম হইল না; পেটের মধ্যে বিষম গোলযোগ বাধাইয়া দিল। মাংসাশী জুলুভূমি ও ট্রান্সবাল পেটে মূলেই সহিল না।· অতএব মাংসাশী প্রাণীর লোভ এড়াইতে যদি ইচ্ছা থাকে, তবে মাংসাশী হওয়া আবশ্যক। নহিলে আত্মত্ব বিসর্জ্জন করিয়া পরের দেহে রক্ত নির্ম্মাণ করাই আমাদের চরম সিদ্ধি হইবে।"[২] আদর্শপ্রেম শীর্ষক আরেকটি প্রসঙ্গ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি— "সংসারের কাজ চালানো, মন্ত্রবদ্ধ, ঘরকন্নার ভালবাসা যেমনই হউক, আমি প্রকৃত ভালবাসার কথা বলিতেছি। যে-হউক এক জনের সহিত ঘেঁষাঘেষি করিয়া থাকা, এক ব্যক্তির অতিরিক্ত একটি অঙ্গের ন্যায় হইয়া থাকা, তাহার পাঁচটা অঙ্গুলির মধ্যে ষষ্ঠ অঙ্গুলির ন্যায় লগ্ন হইয়া থাকাকেই ভালবাসা বলে না। দুইটা আঠাবিশিষ্ট পদার্থকে একত্রে রাখিলে যে জুড়িয়া যায়, সেই জুড়িয়া-যাওয়াকেই ভালবাসা বলে না। অনেক সময়ে আমরা নেশাকে ভালোবাসা বলি।... প্রণয়ের পাত্র নীচই হউক, নিষ্ঠুরই হউক, আর কুচরিত্রই হউক, তাহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকাতে অনেকে প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা মনে করিয়া থাকে।·· প্রকৃত ভালবাসা দাস নহে, সে ভক্ত; সে ভিক্ষুক নহে, সে ক্রেতা। আদর্শ প্রণয়ী প্রকৃত সৌন্দর্যকে ভালবাসেন, মহত্ত্বকে ভালবাসেন। তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে যে আদর্শ ভাব জাগিতেছে, তাহারই প্রতিমাকে ভালবাসেন। ভালবাসিবার জন্যই ভালবাসা নহে, ভাল ভালবাসিবার জন্যই ভালাবাসা। তা যদি না হয়, যদি ভালবাসা হীনের কাছে হীন হইতে শিক্ষা দেয়, যদি অসৌন্দর্য্যের কাছে রুচিকে বদ্ধ করিয়া রাখে তবে ভালবাসা নিপাত যাক্।"[৩]

বসন্ত ও বর্ষা এবং প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল প্রসঙ্গ দুটি মানবের মনের ও জীবনের, ঋতুর ও কালের প্রকারভেদকে প্রায় দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণের অন্তর্গত করিয়া আলোচনা করা হইয়াছে। প্রথম প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন— "বসন্ত উদাসীন, গৃহত্যাগী। বর্ষা সংসারী, গৃহী। বসন্ত আমাদের মনকে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। বর্ষা তাহাকে একস্থানে ঘনীভূত করিয়া রাখে। বসন্তে আমাদের মন অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া যায়, বাতাসের উপর ভাসিতে

১ জীবেন্দ্রকুমার গুহ: রবীন্দ্র-প্রবন্ধের আদিপর্ব, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১ম বর্ষ ১৩৫০ বৈশাখ পৃ ৬৩২।
২ রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ ১ম খণ্ড পৃ ৩৪৯। ৩ ঐ চৈত্র পৃ ৩৫৯০-৬২।

থাকে,··· বর্ষায় আমাদের মনের চারিদিকে বৃষ্টিজলের যবনিকা টানিয়া দেয়, মাথার উপরে মেঘের চাঁদোয়া খাটাইয়া দেয়।"

গ্রন্থের শেষ রচনা— সমাপন— গ্রন্থমুদ্রণের সময় বোধ হয় রচিত। এই রচনাটির মধ্যে 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র লেখাগুলি সম্বন্ধে কৈফিয়ত অত্যন্ত কোমলভাবে লিখিত। আমরা উহা হইতে কিছুটা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—"আমার ভয় হইতেছে, পাছে এ লেখাগুলি লইয়া কেহ তর্ক করিতে বসেন। পাছে কেহ প্রমাণ জিজ্ঞাসা করিতে আসেন।···এ বইখানি সেভাবে লেখাই হয় নাই। ইহা, একটি মনের কিছু দিনকার ইতিহাস মাত্র। ইহাতে যে সকল মত ব্যক্ত হইয়াছে, সেগুলি আমার চিরগঠনশীল মনে উদিত হইয়াছিল এই মাত্র।" ·· "জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে মনের গঠনকার্য্য চলিতেছে। ·· এই গ্রন্থে সেই অবিশ্রান্ত কার্য্যশীল পরিবর্ত্তমান মনের কতকটা ছায়া পড়িয়াছে। কাজেই ইহাতে বিস্তর অসম্পূর্ণ মত, বিরোধী কথা, ক্ষণস্থায়ী ভাবের নিবেশ থাকিতেও পারে। জীবনের লক্ষণই এইরূপ। একেবারে স্থৈর্য্য, সমতা ও ছাঁচে-ঢালা ভাব মৃতের লক্ষণ।"···

"আমার পাঠকদিগের মধ্যে একজন লোককে বিশেষ করিয়া আমার এই ভাবগুলি উৎসর্গ করিতেছি। এ ভাবগুলির সহিত তোমাকে আরও কিছু দিলাম, সে তুমিই দেখিতে পাইবে!···এই লেখাগুলির মধ্যে কিছু দিনের গোটাকতক সুখ দুঃখ লুকাইয়া রাখিলাম, এক এক দিন খুলিয়া তুমি তাহাদের স্নেহের চক্ষে দেখিও, তুমি ছাড়া আর কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না। আমার এই লেখার মধ্যে লেখা রহিল, এক লেখা তুমি আমি পড়িব, আর এক লেখা আর সকলে পড়িবে।" ১৮০৫ শক (১২৯০) ভাদ্রমাসে 'বিবিধপ্রসঙ্গ' গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়। এই সমাপন অংশ সেই সময়ে লিখিত। এই অংশ তাঁহার বৌঠাকুরানী কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশে রচিত বলিয়া আমাদের মনে হয়।

'বিবিধ প্রসঙ্গে'র অন্তর্গত না করিলেও 'সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়' নামে ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি[১] এবং 'মহাস্বপ্ন'[২] ও 'সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়'[৩] শীর্ষক কবিতাদ্বয়ের ভাবরাজি ঐ গ্রন্থের বিচিত্র রচনার অন্যতম সুরে বাঁধা, অর্থাৎ দার্শনিকভাবে জগতের সৃষ্টিকে দেখা। সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়কে লেখক অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ব্যাপাররূপে দেখিয়াছেন অর্থাৎ সমগ্র ব্যাপারটা নিরবচ্ছিন্ন কালের মধ্যে প্রতিভাত হইয়াছে। তাঁহার মতে সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয়— তিনকে এক করিয়া দেখিবার একটি পদ্ধতি আছে এবং তিনটিকে পৃথক পৃথক করিয়া দেখিবারও একটি পদ্ধতি আছে; প্রথমটিকে লেখক সংক্ষেপ ও দ্বিতীয়টিকে বিক্ষেপ পদ্ধতি আখ্যা দান করিয়াছেন। প্রথম পদ্ধতিতে তিন ব্যাপার একই কালের ব্যাপার, উহা চিরন্তন; কিন্তু সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের বিক্ষেপ পদ্ধতি বর্ণনে লেখক কবিতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার বিক্ষিপ্তভাব অসীম ব্রহ্মাণ্ডে নব নব ভাবে, নব নব মূর্তিতে প্রকাশ পাইতেছে; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের প্রকাশ সে মূর্তিতে; কিন্তু মঙ্গলই একমাত্র উদ্দেশ্য—যেহেতু জ্ঞান এবং প্রেম সকলের মূলে বর্তমান। 'সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়', ও 'মহাস্বপ্ন' কবিতাদ্বয়ে এই ত্রিমূর্তির সৌন্দর্য প্রকাশিত হইয়াছে। 'সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ে' প্রথমেই ব্রহ্মার পরিকল্পনা, যিনি সৃষ্টি করিয়া নিশ্চিন্ত মনে আছেন—

দেশশূন্য, কালশূন্য, জ্যোতিঃশূন্য মহাশূন্য ,পরি
চতুর্মুখ করিছেন ধ্যান,
মহা অন্ধ অন্ধকার সভয়ে রয়েছে দাঁড়াইয়া—
কবে দেব খুলিবে নয়ান!···
ভাবের আনন্দে ভোর, গীতিকবি চারি মুখে
করিতে লাগিলা বেদগান।

অনন্ত ভাবের দল, হৃদয়-মাঝারে তাঁর
হতেছিল আকুল ব্যাকুল;
মুক্ত হয়ে ছুটিল তাহারা
জগতের গঙ্গোত্রী শিখর হতে
শত শত স্রোতে
উচ্ছ্বসিল অগ্নিময় বিশ্বের নির্ঝর,

১ ভারতী ১২৮৮ মাঘ ৪৭৮-৭৯। ২ ভারতী ঐ। প্রভাতসংগীত ৩ ভারতী চৈত্র ঐ প্রভাতসংগীত।

বাহিরিল অগ্নিময়ী বাণী,
উচ্ছ্বসিল বাষ্পময় ভাব।
উত্তরে দক্ষিণে গেল,
পূরবে পশ্চিমে গেল,
চারিদিকে ছুটিল তাহারা!…

ইহার পর বিষ্ণুর আবির্ভাব সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন—

নূতন সে প্রাণের উল্লাসে,
নূতন সে প্রেমের উচ্ছ্বাসে
বিশ্ব যবে হয়েছে উন্মাদ,
চারিদিকে উঠিছে নিনাদ,
অনন্ত আকাশে দাঁড়াইয়া,
চারি দিকে চারি হাত দিয়া
বিষ্ণু আসি মন্ত্র পড়ি দিলা,
বিষ্ণু আসি কৈলা আশীর্বাদ!

বিষ্ণুর নিয়মচক্রে বিশ্ব বাঁধা পড়িয়া চলিতে লাগিল; অবশেষে "মহাছন্দে বাঁধা হয়ে… অসীম জগত চরাচর! শ্রান্ত হয়ে এল কলেবর।" তখন তাহারা মহাদেবের শরণ লইয়া কহিল—

'নিয়মের পাঠ সমপিয়া
সাধ গেছে খেলা করিবারে,
এক বার ছেড়ে দাও দেব,
অনন্ত এ আকাশ মাঝারে!'…
'গাও দেব মরণ-সঙ্গীত
পাব মোরা নূতন জীবন।'
প্রলয় পিনাক তুলি করে ধরিলেন শূলী,
পদতলে জগৎ চাপিয়া, …
ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল,
জগতের সমস্ত বাঁধন!
উঠিল রে মহাশূন্যে গরজিয়া তরঙ্গিয়া
ছন্দোমুক্ত জগতের উন্মত্ত আনন্দ-কোলাহল।
ছিঁড়ে গেল রবি শশী গ্রহ তারা ধূমকেতু,
কে কোথায় ছুটে গেল,
ভেঙে গেল টুটে গেল,…
সৃজনের আরম্ভ-সময়ে
আছিল অনাদি অন্ধকার,
সৃজনের ধ্বংস-যুগান্তরে
রহিল অসীম হুতাশন!
অনন্ত আকাশগ্রাসী অনল-সমুদ্রমাঝে
মহাদেব মুদি ত্রিনয়ন
করিতে লাগিলা মহাধ্যান।
(সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়)

'মহাস্বপ্ন' কবিতার মধ্যে জগৎ সৃষ্টির অখণ্ডতা ও পুনরাবৃত্তি সম্বন্ধে অনেকগুলি পংক্তি আছে। কবি প্রশ্ন করিতেছেন—

'পূর্ণ আত্মা জাগিবেন, কভু কি আসিবে হেন দিন?
অপূর্ণ জগৎ-স্বপ্ন ধীরে ধীরে হইবে বিলীন?'
'কভু কি আসিবে, দেব, সেই মহাস্বপ্নভাঙা দিন,
সত্যের সমুদ্র মাঝে আধো-সত্য হয়ে যাবে লীন?
আধেক প্রলয় জলে ডুবে আছে তোমার হৃদয়,
বল, দেব, কবে হেন প্রলয়ের হইবে প্রলয়?'

'মহাস্বপ্নে'র সহিত 'হরহৃদে কালিকা' (ভারতী ১২৮৪ মাঘ পৃ ৪৮৪) পাঠ করিলে কবিচিত্তের একটি পূর্ণ রূপ পাওয়া যাইবে। এই কবিতা কয়েকটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জগতের উদ্ভব স্থিতি ও ধ্বংস, প্রকৃতির মধ্যে পুনরাবৃত্তি ও মানবের মনের মধ্যে 'এক পুরাতন হৃদে উঠিতেছে নূতন স্বপন'—তাহারই কথা বলিয়াছেন। এই সময়ে তাঁহার অন্তরের মধ্যে লোকোত্তর সৌন্দর্য ও সমস্যার প্রশ্ন যে আসিয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনস্মৃতি হইতেও জানিতে পারি। "একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ির ছাদের উপর অপরাহ্নের শেষে বেড়াইতেছিলাম। দিবাবসানের ম্লানিমার উপরে সূর্যাস্তের আভাটি জড়িত হইয়া সেদিনকার আসন্ন সন্ধ্যা আমার কাছে বিশেষভাবে মনোহর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল।" নিজের

স্বরূপ সম্বন্ধে জটিল প্রশ্ন উদয় হইয়াছিল; "জগতকে তাহার নিজের স্বরূপে দেখিতেছি। সে-স্বরূপ কখনোই তুচ্ছ নহে— তাহা আনন্দময় সুন্দর।" মনের এইরূপ একটি অবস্থায় এই শ্রেণীর কবিতা লিখিত হয় বলিয়া আমাদের ধারণা।

সন্ধ্যাসংগীত যুগের গদ্য রচনা

ভগ্নহৃদয় ও সন্ধ্যাসংগীত রচনাকালে তাঁহার মনোভাবের যে-চিত্র রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে ও অন্যান্য রচনার মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে অনুবর্তন করিয়া অন্য লেখকেরা কবির মানসলোকের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা আমাদের মতে অসম্পূর্ণ। দার্শনিক সমালোচকের দৃষ্টিকোণ হইতে নিজ জীবনের বিশেষ পর্ব ও সৃষ্টিকে কঠোর বিশ্লেষণদ্বারা যেভাবে রবীন্দ্রনাথ উহাকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সমসাময়িক গদ্য রচনার দ্বারা সমর্থিত হয় না। সন্ধ্যাসংগীতের যুগকে যদি আমরা বলি যে কবি কেবলই আপনার হৃদয়াগ্নিতে হাপর টানিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে। একই কালে বিচিত্র রসের সম্ভোগ ও বিচিত্র সুর সাধনা মহত্ত্বের পরিচায়ক; রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে যখন সন্ধ্যাসংগীত লিখিতেছিলেন, তখন খণ্ড খণ্ড গদ্য 'বিবিধ প্রবন্ধ' নামে বাহির হইতেছিল। রবীন্দ্রনাথকে খণ্ডভাবে কেবল সন্ধ্যাসংগীতের দুঃখবাদী কবি বলিয়া দেখিলে সত্য দৃষ্টির অভাব হইবে; স্রষ্টাকে সমগ্রভাবে দেখিলেই তাহার সত্য রূপটি দেখা যাইবে। তাই তাঁহার বিচিত্র সাহিত্যসৃষ্টির আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। আমরা যে যুগের কথা আলোচনা করিতেছি তখন বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের একটা সুষ্ঠু মানসূচী সর্ববাদী স্বীকৃতি লাভ করে নাই। প্রাচীন কবিতা কী, নূতন কবিতা কী, যথার্থ কবিতার স্বরূপ কী, কবি কে, কাব্য বস্তুগত না ভাবগত প্রভৃতি বিচিত্র প্রশ্ন বাংলার সমসাময়িক লেখক ও পাঠকের চিত্তকে উত্তেজিত রাখিয়াছিল। বঙ্গদর্শন বাংলা সাময়িক সাহিত্যের একটি আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল। বঙ্কিমের প্রেরণায় ইহাতে আলোচনা হয় নাই এমন বিষয় ছিল না। এমনকি কবি ও কাব্যের আদর্শ সম্বন্ধেও ঐ পত্রিকায় বিস্তর আলোচনা প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শনের ১২৮২ সালের মাঘমাসে 'বাঙ্গালি কবি কেন' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ এতকাল পরে নিম্নের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

উক্ত প্রবন্ধের লেখক যে তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা এই: "কবিত্বের প্রধান উপকরণ অনুভাবকতা এবং কল্পনা। অনুভাবকতা সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যে-কেহ কোন ভাবের বেগ, ভাবের তরঙ্গ হৃদয় মধ্যে অনুভব করিয়াছেন তিনিই কবি। যে-কেহ ভালবাসিয়াছেন অথবা ঘৃণা করিয়াছেন তিনিই কবি।"... "আবার অশিক্ষিতের উপর কল্পনার একাধিপত্য। বাঙ্গালি অশিক্ষিত, অপরিমার্জিতবুদ্ধি, কুসংস্কারান্ধ, সুতরাং বাঙ্গালির কল্পনাও প্রবল, সুতরাং বাঙ্গালি কবি।"

রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই বাক্‌চাতুরী বা সফিস্ট্রি সহ্য করা অসম্ভব। বাঙ্গালি কবি নয়[১] ও বাঙ্গালি কবি নয় কেন,[২] প্রবন্ধদ্বয়ে রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। 'বাঙ্গালি কবি নয়' প্রবন্ধের ভূমিকায় লিখিলেন, "একটা কথা উঠিয়াছে মানুষ মাত্রেই কবি। যাহার মনে ভাব আছে, যে দুঃখে কাঁদে, সুখে হাসে, সেই কবি।... কবি শব্দের ঐরূপ অতিবিস্তৃত অর্থ এখন একটা ফ্যাষাণ হইয়াছে বলিলে অধিক বলা হয় না। এমন কি নীরব কবি বলিয়া একটা কথা বাহির হইয়া গিয়াছে।" "অনেকে বলেন, সমস্ত মনুষ্য জাতি সাধারণতঃ কবি, ও বালকেরা, অশিক্ষিত লোকেরা বিশেষরূপে কবি।" রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের লেখকের মত খণ্ডন করিয়া এই মত প্রতিষ্ঠিত

১ ভারতী ১২৮৭ ভাদ্র পৃ ২১৯-২৯। ২ ভারতী ১২৮৭ আশ্বিন।

করিতে চেষ্টা করিলেন যে বাঙ্গালি কবি নয়। "কেহ কেহ যদি এমন করিয়া প্রমাণ করিতে বসেন, যে, সমুদয় মনুষ্যই কবি, বাঙ্গালি মনুষ্য, অতএব বাঙ্গালি কবি; অশিক্ষিত লোকেরা বিশেষরূপে কবি, বাঙ্গালি অশিক্ষিত, অতএব বাঙ্গালি বিশেষরূপে কবি, তবে তাঁহাদের যুক্তিগুলি নিতান্ত অপ্রামাণ্য।"

রবীন্দ্রনাথের মতে বাংলাভাষায় খুব কম কবিতা আছে যাহা প্রথম শ্রেণীর কবিতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। "কয়টি বাঙ্গালা কাব্যে এমন কল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে, সমস্ত জগৎ যে কল্পনার ক্রীড়াস্থল।...কোন বাঙ্গালা কাব্যে কি মনুষ্য চরিত্রের আদর্শ চিত্রিত দেখিয়াছ?" অতঃপর কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল ও রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যদ্বয়ের তুলনা করিয়া বলিলেন, "কবিকঙ্কণ মহাকাব্য নহে", "ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর পড়িয়া কাহারো মনে কখনো মহান্ ভাব বা যথার্থ সুন্দর ভাবের উদয় হয় নাই।"

তাৎকালীন আধুনিক কবিতাসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বেশি আলোচনা না করিয়া সংক্ষেপে লিখিলেন, "আধুনিক বঙ্গ কবিতায় মানুষের নানাবিধ মনোবৃত্তির ক্রীড়া দেখা যায় না। বিরোধী মনোবৃত্তির সংগ্রাম দেখা যায় না। মহান্ ভাব ত নাইই। হৃদয়ের কতকগুলি ভাসা-ভাসা ভাব লইয়া কবিতা।" এইসব যুক্তি দেখাইয়া তরুণ লেখক বলিলেন, 'কি করিয়া বলি বাঙ্গালী কবি।" এই প্রবন্ধে তিনি আর একটি যেকথা বলিয়াছিলেন তাহা রূঢ় সত্য— "উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির অপেক্ষা কল্পনা কাহার আছে? কল্পনা প্রবল হইলেই কবি হয় না। সুমাজ্জিত সুশিক্ষিত ও উচ্চশ্রেণীর কল্পনা থাকা আবশ্যক। কল্পনাকে যথাপথে নিয়োগ করিবার নিমিত্ত বুদ্ধি ও রুচি থাকা আবশ্যক করে।" মার্লো'র (Marlowe) Come live with me and be my love কবিতাটির তর্জমা ও তৎপরে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে কবিতাটির ত্রুটি কোন্ খানে। 'বাঙালি কবি নয়' প্রবন্ধটি পরিবর্তন ও পরিমার্জন করিয়া 'সমালোচনা' গ্রন্থে (১২৯৪) 'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি' নামে প্রকাশ করেন। সেইখানে খুব স্পষ্ট করিয়া বলেন যে কল্পনা অন্তরে থাকিলে কবি হয় না, প্রকাশধর্মে কবিত্ব সার্থকতা লাভ করে; সুতরাং নীরবকবি কথাটি নিরর্থক। বহু বৎসর পরে পত্রধারার মধ্যে এই নীরব কবি সম্বন্ধে যে আলোচনাটুকু করিয়াছিলেন, তাহা এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিলাম।[১]

"নীরব কবি সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উঠেছে সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, সরব এবং নীরবের মধ্যে অনুভূতির পরিমাণ সমান থাকতে পারে কিন্তু আসল কবিত্ব জিনিসটি স্বতন্ত্র। কেবল ভাষার ক্ষমতা ব'লে নয়, গঠন করবার শক্তি। একটা অলক্ষিত অচেতন নৈপুণ্যবলে ভাবগুলি কবির হাতে বিচিত্র আকার ধারণ করে। সেই সৃজন-ক্ষমতাই কবিত্বের মূল। ভাষা, ভাব এবং অনুভাব তার সরঞ্জামমাত্র। কারো বা ভাষা আছে কারো বা অনুভাব আছে, কারো বা ভাষা এবং অনুভাব দুইই আছে, কিন্তু আর একটি ব্যক্তি আছে যার ভাষা অনুভাব এবং সৃজনীশক্তি আছে, এই শেষোক্ত লোকটিকে কবি নাম দেওয়া যেতে পারে। প্রথমোক্ত তিনটি লোক নীরবও হ'তে পারেন সরবও হ'তে পারেন, কিন্তু তাঁরা কবি নন। তাঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে ভাবুক বল্লেই ঠিক বিশেষণটা প্রয়োগ করা হয়। তাঁরাও জগতে অত্যন্ত দুর্লভ এবং কবির তৃষিত চিত্ত সর্বদাই তাঁদের জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে আছে।"

'বাঙ্গালি কবি নয় কেন'[২] এ প্রশ্নও তাঁহার মনে উদয় হয়; তাঁহার মতে কাব্য মানুষের সমস্ত জীবনের সাধনা। বাঙালির জীবন পঙ্গু বলিয়া সে কাব্যসাধনায় দুর্বল; পৃথিবীর যত বড় বড় কাজ হইয়াছে সকলই কল্পনার প্রসাদে। বৈজ্ঞানিক সাধনার মধ্যে কল্পনা আছে, কাল্পনিকতা নাই; মনের সেই প্রসারতা আছে বলিয়া য়ুরোপীয়রা বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কবি। "যে-দেশে শেক্‌সপিয়র জন্মিয়াছে, সেই দেশেই নিউটন জন্মিয়াছে, যে-দেশে

১ ছিন্নপত্র পৃ ২২৬। সাজাদপুর, ৩০ আষাঢ় ১৩০০ [১৮৯৩ জুলাই ১৩]। ২ ভারতী ১২৮৭ আশ্বিন।

অত্যন্ত বিজ্ঞান দর্শনের চর্চা, সেই দেশেই অত্যন্ত কাব্যের প্রাদুর্ভাব ; ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে, কল্পনার কাজ কেবলমাত্র কবিতা সৃজন করা নয়। যে-দেশে কাল্পনিক লোক বিস্তর আছে, সে-দেশের লোকেরা কবি হয়, দার্শনিক হয়, বৈজ্ঞানিক হয়, সকলি হয়। বাঙ্গালি বৈজ্ঞানিক নয়, বাঙ্গালি দার্শনিক নয়, বাঙ্গালি কবিও নয়।"

রবীন্দ্রনাথ যখন এই অংশ লিখিয়াছিলেন, তখন ইহা সম্পূর্ণরূপে সত্য ছিল। বাঙালির intellectual life এর ইতিহাসে দেখা যায় যে বাঙালি একদিন দার্শনিকও ছিল, কবিও ছিল। বাংলার পণ্ডিতেরা যেমন ন্যায় মীমাংসা স্মৃতি প্রভৃতির চর্চা করিয়া ভারতের বুধমণ্ডলী হইতে প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন, তেমনি তথাকার রসের সাধকগণ অমর কাব্যসাহিত্য সৃষ্টি করিয়া অক্ষয় যশ লাভ করিয়াছেন। বাঙালি জীবনের সেই সৃজনী শক্তির অবসান হইয়াছিল। পুনরায় উনবিংশ শতাব্দীতে মনীষার বিচিত্র শক্তি দেখা দিলে কাব্যপ্রতিভাও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইল।

বাঙালি যে কেন দর্শনশাস্ত্রে নিজ প্রতিভার স্ফুরণ করিতে পারিতেছে না, কাব্যসৃষ্টিতেও তাহার সুস্থ মৌলিকতা দেখাইতে অক্ষম— তাহার বিশ্লেষণ করিয়া লেখক বলিতেছেন, "স্বাভাবিক আলস্য, স্বাভাবিক নির্জীব ভাব, সকল বিষয়ে বৈরাগ্য, ইহারাই বাঙ্গালিকে মানুষ হইতে দিতেছে না। আমরা সকল দ্রব্যই অর্দ্ধেক চক্ষু মুদিয়া দেখি। আমাদের কৌতূহল অত্যন্ত অল্প।" ···'বাহ্যপ্রকৃতির প্রতি ঔদাসীন্য আমাদের কবিতাতে স্পষ্টই লক্ষিত হয়।' পশ্চিমের মানবসমাজে নিরন্তর যে সংগ্রাম চলিতেছে তাহারই 'অনবরত সমুদ্র মন্থনে মহা মহা ব্যক্তিদের উৎপত্তি হয়।' বাঙালির জীবনে সেই স্বচ্ছ আনন্দ নাই, সংগ্রাম নাই, তাই এখানে সব জিনিস সঙ্কুচিত কুব্জ। "এমন দেশের কবিতায় চরিত্র্য-বৈচিত্র্যই বা কোথায় থাকিবে, মহান্ চরিত্র-চিত্রই বা কোথায় থাকিবে। আর বিবিধ মনোবৃত্তির খেলাই বা কিরূপে বর্ণিত হইবে।"

বাঙালির ম্লান দেহের মধ্যে যে প্রাণবস্তু আছে তাহা কুঞ্চিত, সংকুচিত। নবীন কবিরা যেসব কবিতা লেখেন তাহাও প্রাণহীন ; তাঁহাদের মধ্যে অকারণ কষ্ট নামে একটা রোগ দেখা দিয়াছে। "বাহিরের কোনো দুর্ঘটনা হইতে ইহার জন্ম নহে।" কাব্যের মধ্য দিয়া দুঃখভোগ করিতে তাঁহাদের ভালো লাগে এই তাঁহাদের সান্ত্বনা। রবীন্দ্রনাথ এই অহেতুকী দুঃখভোগীদের মর্মকথা বিশ্লেষণ করিয়া 'অকারণ কষ্ট'[1] নামে প্রবন্ধ লেখেন ; কয়েকমাস পরে প্রকাশিত 'যথার্থ দোসর'[2] এর সহিত একত্র এইটি পাঠ করিলে এই দুঃখবাদের প্রতি কবির মনোভাবের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। তবে 'অকারণ কষ্টে'র মধ্যে যে শ্লেষ আছে তাহা দ্বিতীয় প্রবন্ধে নাই। কারণ তখন রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যাসংগীতের কবিতা রচনায় নিরত, তিনি স্বয়ং তখন দুঃখভোগী, অকারণ কষ্টে জর্জর। এই অকারণ দুঃখভোগীদের মনের কথা বাইরনের এক কবিতা হইতে অনুবাদ করিয়া বলিতেছেন—

যদিও বা ত্যজি বিরামের আশা,
যখন গভীর রাতি,
হাসি আলাপেতে থাকি নিমগন
আমোদে প্রমোদে মাতি।

তবু সে ভগন প্রাসাদের মত
লতায় পাতায় পোরা,
বাহিরেতে তার হরিত নবীন
ভিতরেতে ভাঙ্গা চোরা।[3]

তরুণ কবির মতে এইসব লেখকেরা নিজে জানিতে চায় যে তাহারা দুঃখী, এবং সকলকে জানাইতে চায় যে তাহারা দুঃখী। রবীন্দ্রনাথ যখন এই প্রবন্ধ লেখেন তখন জানিতেন না যে তিনি অচিরে সন্ধ্যাসংগীতের উদ্‌বোধন করিবেন সেই 'দুঃখের আবাহন' লিখিয়া। ইহাকে বলে অদৃষ্টের পরিহাস।

১ ভারতী ১২৮৭ আশ্বিন পৃ ২৮৭-২৯১। ২ ভারতী ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ। ৩ ভারতী ১২৮৭ আশ্বিন পৃ ২৮৯।

আমরা ইতঃপূর্বে সন্ধ্যাসংগীতের কবিতা রচনার ইতিহাস বিবৃত করিয়াছি; রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নূতন কবিতার সূত্রপাত এইখান হইতে। সুতরাং কবিহিসাবে কাব্যজিজ্ঞাসা খুবই স্বাভাবিক। নিজের কাব্যরীতিতে নূতনের যে প্রেরণা পাইয়াছেন, তাহার সহিত প্রাচীনের পার্থক্য নিতান্ত স্বল্প নহে। কবিতার মধ্যে কতকগুলি বস্তুগত বা বা sensuous বা realistic, আর কতকগুলি হইতেছে spiritual বা emotional, বা ভাবগত। তরুণ কবির সমস্যা— কবিতা, বস্তুগত না ভাবগত। নিজের সঙ্গে নিজের বুঝাপাড়ার প্রয়োজন হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই প্রশ্নের উত্তর অতি সংক্ষিপ্ত। তিনি বলেন, "ভাবগত কবিতা আর কিছুই নয়, তাহা অতীন্দ্রিয় কবিতা। তাহা ব্যতীত অন্য সমুদয় কবিতা ইন্দ্রিয়গত কবিতা।" এই কথাটিকে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, "ভাবগত কবিতায় হৃদয়ের স্বাস্থ্য সম্পাদন করে। ইন্দ্রিয়জগৎ হইতে মনকে আর এক জগতে লইয়া যায়। দৃশ্যমান জগতের সহিত সে জগতের সাদৃশ্য থাকুক বা না থাকুক সে জগৎ সত্য জগৎ, অলীক জগৎ নহে।" "আমাদের দুইটি জগৎ আছে। এক জগতে আমরা বাস করি, আর এক অদৃশ্য জগৎ আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছে। সে জগতের নাম আদর্শ জগৎ।...সেই আদর্শ জগতের জন্য, ভাবের জগতের জন্যই কবিতাকে নিযুক্ত করা হউক।... কবিতার ভাষা চলিত ভাষা নহে, তেমনি কবিতার বিষয়ও চলিত বিষয় নহে। কবিতার সমস্তই দূরের দ্রব্য, আমরা তাহার আভাসমাত্র পাই, কিয়দংশ মাত্র দেখিতে পারি।"

লেখকের মনের ব্যাপ্তি ও গভীরতা দেখাইবার জন্য আমরা এই প্রবন্ধের আরম্ভ হইতে একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি; "চারিদিকে লোক জন, চারিদিকেই হাট বাজার, সদা সর্ব্বদাই কাজকর্ম্ম, বিষয়-আশয়ের চিন্তা। সম্মুখে দেনাদার, পশ্চাতে পাওনাদার, দক্ষিণে বিষয়-কর্ম্ম, বামে লোক-লৌকিকতা, পদতলে গত কল্যের খরচ, মাথার উপরে আগামী কল্যের জন্য জমা। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি.— পৃথিবীর মৃত্তিকা; দীর্ঘ, প্রস্থ, বেধ; স্বাদ, ঘ্রাণ, স্পর্শ; আরম্ভ, স্থিতি ও অবসান। মানুষের মন কোথায় গিয়া বিশ্রাম করিবে? এমন ঠাঁই কোথায় মিলিবে, যেখানে জড়দেহ পোষণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা নাই, এক মুঠা আহারের জন্য লক্ষ লক্ষ আকৃতিধারীর কোলাহল নাই, যেখানকার ভূমি ও অধিবাসী মাটি ও মাংসে নিৰ্ম্মিত নয়; অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টা আমরা যে অবস্থার মধ্যে নিমগ্ন থাকি, সে অবস্থা হইতে আমরা বিরাম চাই। কোথায় যাইব!"[১]

এখন প্রশ্ন উঠে কবিতার বিষয়বস্তু কী এবং সেই বিষয়বস্তু কি শাশ্বত— তাহার কি পরিবর্তন হয় না। রবীন্দ্রনাথ কাব্য সম্বন্ধে নূতন অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছেন; সে অনুভূতির সহিত পারিপার্শ্বিকের যোগ কোথায়? তাই বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, কাব্য সৃষ্টিতে আদর্শের পরিবর্তন হয় কিনা।

গত কয়েক বৎসর য়ুরোপীয় সাহিত্য গভীরভাবে অধ্যয়ন করিবার সুযোগ লাভ করায়, সাহিত্যের সৌন্দর্য ও রসবোধ পরিমার্জিত এবং বিশ্লেষণী শক্তি সুতীব্র হইয়াছে। তাঁহার এই মনের মুক্তির জন্য একমাত্র ইংরেজি কাব্যসাহিত্যই দায়ী নহে, গদ্যসাহিত্যও দায়ী। ইংরেজ সাহিত্যিক, সমালোচক ও ঐতিহাসিক ছাড়া রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও সাহিত্যে যাহাদের রচনার ও চিন্তার প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়, তাঁহারা হইতেছেন হার্বার্ট স্পেন্সর ও টমাস হাক্সলি। বিলাতে বাসকালে স্পেন্সরের সদ্য প্রকাশিত Data of Ethics (1879 June) যে তিনি পড়িয়াছিলেন তাহা আমরা জানি জীবনস্মৃতি হইতে। দেশে ফিরিয়াও নানা গদ্য প্রবন্ধের মধ্যে স্পেন্সরের মতামত প্রকাশ করিতে দেখিয়াছি। 'বাল্মীকিপ্রতিভা' গীতনাট্য রচনার প্রেরণা পান তাঁহারই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া। এমনকি স্পেন্সরের যে-মত জাগতিক সর্বব্যাপারের মধ্যে অভিব্যক্তিবাদ-সংজ্ঞায় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা রবীন্দ্রনাথ

১ বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা, ভারতী ১২৮৮ বৈশাখ। সমালোচনা ১২৯৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ ২য় পৃ ৯২।

'কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন'[১] শীর্ষক আলোচনার মধ্যে ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার আসল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে "সভ্যতার সমস্ত অঙ্গে যেরূপ পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে, কবিতার অঙ্গেও সেইরূপ পরিবর্তন হইবে।" সভ্যতার সহিত রুচির পরিবর্তন হয়, রসবোধের মানসূচীর স্থানচ্যুতি হয়, কবিতার সুর রূপ ও রীতিতে বিপ্লবের বন্যা আসে। এই কথা যে কত সত্য তাহা সাম্প্রতিক কবিতার রূপ দেখিলেই বুঝা যায়।

পূর্বের একটি প্রবন্ধে লেখক বলিয়াছিলেন যে মহাকাব্য রচনার কাল চলিয়া গিয়াছে; প্রবন্ধটি সেই কথা দিয়াই শুরু করেন। এই প্রবন্ধে লেখক মহাকাব্যের সহিত গীতিকাব্য ও খণ্ডকাব্যের ভেদ লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা উত্থাপন করেন; মহাকাব্যে নানা ঘটনার নানা চরিত্রের নানা বিভিন্ন অনুভাবের সমাবেশ হয়। "গীতিকাব্যে ও খণ্ডকাব্যে একটি কি দুইটি চরিত্র, একটি কি দুইটি ঘটনা, একটি কি দুইটি অনুভাব মাত্র ঘনীভূত হইতে থাকে। তাহার মধ্যে অনেকগুলি আবার কবির নিজের কথামাত্র। ইহা প্রায় দেখা যায়, যেসময় মহাকাব্যের সময়, সেসময় খণ্ডকাব্যের সময় নহে। বাল্মীকি ব্যাসের সময় কালিদাস জন্মগ্রহণ করেন নাই।... ... যখন জটিল, লীলাময়, গাঢ়, বিচিত্র, বেগবান মনোবৃত্তিসকল সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত, ঘটনা-বৈচিত্র্যের সহিত, অবস্থার জটিলতার সহিত হৃদয়ে জন্মিতে থাকে, তখন আর মহাকাব্যে পোষায় না।...তখন খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্য আবশ্যক হয়।" সাহিত্যের ক্রমবিকাশে দেখা যায় যে আদি যুগে "ছাড়া-ছাড়া বিশৃঙ্খল অস্ফুট গীতোচ্ছ্বাস, পরে পুঞ্জীভূত মহাকাব্য, তাহার পরে বিচ্ছিন্ন পরিস্ফুট গীতসমূহ।" রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে স্বয়ং সন্ধ্যাসংগীতের গীতিকাব্য রচনায় মগ্ন; নিজের মধ্যে গীতোচ্ছ্বাসের প্রেরণা আজ পরিস্ফুট সংগীত বা লিরিকে মূর্তি লাভ করিতেছে, এই প্রবন্ধ তাহারই সমর্থনে যেন লিখিত। গীতিকবিতা মানুষের হৃদয়ের ভাষার ন্যায় সার্বজনীন অর্থাৎ জাতিগত বা যুগগত কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বাদ দিলে সর্বদেশের সর্বকালের সর্বভাষার গীতিকাব্যের রূপ, চিত্রকলার ন্যায় শাশ্বত। সেইজন্য জগতের শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা প্রায়ই সাম্প্রদায়িক ধর্ম বা পৌরাণিকতা-নিরপেক্ষ সৃষ্টি; বলা বাহুল্য ধর্মতত্ত্ব বা দেবতত্ত্বের প্রভাব যে-কবিতার উপর প্রবল, তাহা কখনো শ্রেষ্ঠ কবিতা হইতে পারে নাই। সেইজন্য ওয়ার্ডসওয়ার্থের ধর্মীয় কবিতাগুলি (Theological Poems) সাহিত্যে সমাদর লাভ করে নাই। পরম্পরাগত ধর্ম-মতের বিরুদ্ধে যাঁহারা বিপ্লবের বাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কণ্ঠ এখনো শোনা যায়। সুতরাং বিদ্রোহেই স্বাস্থ্যের লক্ষণ প্রকাশ পায় ও বিদ্রোহেই নূতন সৃষ্টির উদ্‌বোধন হয়।

রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা সকল দিক হইতে প্রাচীন বা গতানুগতিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সে বিদ্রোহ কেবল ছন্দে নহে, ভাষায় নহে, মানুষের মূলগত ধর্মবিশ্বাস ও ভগবৎ-কল্পনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কিন্তু আমরা যে-সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি, তখনও তাহা তেমন স্পষ্ট হয় নাই। জীবনস্মৃতিতে এক স্থানে লিখিয়াছেন "যদিও এই ধর্মবিদ্রোহ আমাকে পীড়া দিত, তথাপি ইহা যে আমাকে একেবারে অধিকার করে নাই তাহা নহে। যৌবনের প্রারম্ভে বুদ্ধির ঔদ্ধত্যের সঙ্গে এই বিদ্রোহিতা আমার মনেও যোগ দিয়াছিল। আমাদের পরিবারে যে-ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না— আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই।" (পৃ ১১৭)

কিন্তু তাঁহার এই উক্তি সম্পূর্ণ সায় পায় না, সমসাময়িক রচনা হইতে। ধর্মসাধনা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা পালন করিবার বয়স কবির হয় নাই; কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা তিনি কিভাবে করিলেন, তাহা জীবনের ঘটনাবলী ও সাহিত্যের রচনাবলীর মধ্য হইতে আবিষ্কার করা কঠিন। তবে একথা সত্য কবি রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা ব্রাহ্মসমাজের creedএর দ্বারা সীমায়িত ঈশ্বরজ্ঞান হইতে অন্যরূপ, কারণ তিনি বিশ্বসৃষ্টিকে দেখিতেন আর্টের দৃষ্টিতে, কবির চোখে, বোধ হয় সেই অর্থে তিনি ধর্মসাধনা শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু

১ ভারতী ১২৮৮ শ্রাবণ পৃ ১৪৯-৫৫।

ব্রাহ্ম-রবীন্দ্রনাথের ধর্মসম্বন্ধে আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ আদিব্রাহ্মসমাজের creedএর অনুরূপ। 'অদ্বৈতবাদ ও আধুনিক ইংরাজ কবি'[১] শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি আদি সমাজের মতকেই সমর্থন ও প্রকারান্তরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণাকে 'খৃষ্টীয় ঈশ্বরের' (পৃ ৩৫৮) উপাসনা বলিয়া নিন্দা প্রকাশ করিয়াছেন। আদি ব্রাহ্মসমাজে স্পষ্টত না হউক, প্রচ্ছন্নভাবে যে অদ্বৈতবাদ ছিল তাহা তিনি স্বীকার করেন ; "জগত ও পরমাত্মা একই কিনা ইহা লইয়া আমাদের ভারতবর্ষীয় কবি ও দার্শনিকদের মধ্যে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। পরিশেষে আমাদের দেশে অদ্বৈতবাদ মতেরই জয়লাভ হইয়াছে।" "সম্প্রতি ইংলণ্ডে কবিগণ অদ্বৈতবাদের প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন এবং এতদিনে খৃষ্ট ধর্মের যথার্থ আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। কারণ, প্রচার করিবার ভার দার্শনিকদের নহে, কবিদের। বর্ত্তমান কবিরা খৃষ্টীয় পৌত্তলিকতা পরিহারপূর্ব্বক যথার্থ নিরাকারবাদ প্রচলিত করিতে উদ্যোগ করিয়াছেন।" আধুনিক ইংরেজ কবিদের মধ্যে শেলী অখ্রীষ্টীয় অদ্বৈতমতকে তাঁহার কাব্যে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন। ইংরেজের পরম্পরাগত মতধারার বিরুদ্ধে শেলীর বিদ্রোহঘোষণা ইংরেজি সাহিত্যের একটি সুপরিচিত ঘটনা। রাজকবি টেনিসন নূতন মত-বাদকে স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেন ; ম্যাথু আর্নল্ড সমর্থন করেন। এমনকি উত্তম খ্রীস্টান বলিয়া যাঁহার সুনাম ছিল সেই রবার্ট বুকাননের কবিতায় ঈশ্বর সম্বন্ধে পুরাতন ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের মতে ইংলণ্ডের ন্যায় দেশে "এরূপ বর্ব্বর পৌত্তলিকতা কতদিন তিষ্ঠিবে ? ঈশ্বরের এরূপ অপূর্ণ হীন-আদর্শ মানুষের নীতিগত প্রকৃতিকে যে নিতান্ত অবনত করিয়া রাখে ! কবিরা ভবিষ্যৎ শতাব্দীর কাজ অগ্র হইতে আরম্ভ করিয়াছেন।"

বিশ বৎসর বয়সে লিখিত রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি ভবিষ্যদ্‌বাণীর ন্যায় সত্য হইয়াছে। গত সাত আট দশকের মধ্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা কবিদের হাতে নূতন রূপ লইয়াছে এবং তাঁহারই মহিমা নানাভাবে— এমনকি অস্বীকৃতির মধ্য দিয়াও প্রচারিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য এই নূতন ধাতুতে গঠিত বলিয়া তাঁহার সহিত প্রাচীনের ছেদটা খুবই স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ হইতে নূতন চিন্তাধারার সূচনা বলিয়া তাঁহাকে এই নব যুগের প্রবর্তক বলা যাইতে পারে।

আমরা এতক্ষণ যে-কয়টি প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম, সেগুলি হইতেছে সাহিত্যজিজ্ঞাসার প্রথম প্রয়াস-মাত্র,—মোটামুটিভাবে সাহিত্যের লক্ষণ ও গুণাগুণ বিষয়ে আলোচনা। কিন্তু বাংলা কাব্য সম্বন্ধে আলোচনায় তিনি যে মনীষার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা বিস্মিত হই। বৈষ্ণবপদাবলী ও পদকর্ত্তাদের সম্বন্ধে এমন সূক্ষ্ম সমালোচনা ইতঃপূর্বে বাংলায় প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। প্রাচীন কাব্যসংগ্রহের অন্তর্গত 'বিদ্যাপতির পদাবলী' সম্পাদন করিয়াছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় ; বালককালে রবীন্দ্রনাথ সেই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব পদাবলী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ভারতীর পৃষ্ঠায়[২] রবীন্দ্রনাথ উক্ত গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে কয়েক মাস পত্রিকার পাতায় উত্তর-প্রত্যুত্তরের বেশ একটু ঝড় বহিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় অশ্রদ্ধাপূর্ণ দাম্ভিকতা ছিল না। এই রচনায় সম্পাদকের ভুল দর্শাইয়া সমালোচকের কর্তব্য তিনি শেষ করেন নাই ; প্রাচীন কাব্য সম্পাদন করিতে হইলে কোন্ কোন্ বিষয়ে সম্পাদকের অবহিত থাকা উচিত তৎসম্বন্ধে তরুণ লেখক যে নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহা অতিসত্য জ্ঞানে আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। সম্পাদন কার্যে যে কয়টি দোষ পরিহার্য তাহা এই : (১) ব্যাকরণ বিরুদ্ধ অর্থ ব্যাখ্যা, (২) স্বভাব বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা, (৩) সহজ শ্লোকের প্যাঁচালো ব্যাখ্যা, (৪) দুরূহ শ্লোক দেখিয়া মৌন থাকা, (৫) সংশয়ের স্থলে নিঃসংশয়ের ভাব দেখানো। আমরা যে যুগের কথা আলোচনা করিতেছি, তখনো বাংলা ভাষায় প্রাচীন শব্দসমন্বিত অভিধান সংকলিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের অসামান্য শ্রমসাধনার ফলে বহু দুরূহ শব্দের অর্থোদ্ঘাটন সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কবি ;

১ ভারতী ১২৮৮ অগ্রহায়ণ, পৃ ৩৫৫-৬৪।

২ প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ (বিদ্যাপতি), ভারতী ১২৮৮ শ্রাবণ পৃ ১৭৪-৮৪। উত্তর প্রত্যুত্তর, ভারতী ১২৮৮ ভাদ্র পৃ ২২১-২৯। বিদ্যাপতির পরিশিষ্ট, ঐ কার্তিক পৃ ৩৪০।

তিনি জানেন ভাষা ও শব্দগত বিচারের দ্বারা বৈষ্ণব কবিতার সৌন্দর্য ও রস গ্রহণ করা যায় না : তাই চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কাব্য সমালোচনায় বিশুদ্ধ সাহিত্যতত্ত্বের মানসূচী প্রয়োগ করিলেন। কবিত্বের সংজ্ঞা দান করিতে গিয়া কবি লিখিলেন, "নিজের প্রাণের মধ্যে, পরের প্রাণের মধ্যে ও প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতাকেই বলে কবিত্ব।" এই সংজ্ঞা নিভুর্ল হইল কিনা, সে-বিচারভার আমাদের উপর নহে; তবে নবীন লেখক স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে সহজ কথায় সহজ ভাবের উদ্‌বোধনে হইতেছে সত্যসাধক কবির সার্থকতা। চণ্ডীদাসের কবিতা উদ্ধৃত করিয়া সেই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রাচীন বাংলার দুই শ্রেষ্ঠ মহাকবির তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত সমালোচনাও এই প্রবন্ধ মধ্যে পাওয়া যায়। তিনি লিখিতেছেন, "বিদ্যাপতির অনেকস্থলে ভাষার মাধুর্য্য, বর্ণনার সৌন্দর্য্য আছে। কিন্তু চণ্ডিদাসের নূতনত্ব আছে, ভাবের মহত্ত্ব আছে, আবেগের গভীরতা আছে। যে বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন, সে-বিষয়ে একেবারে মগ্ন হইয়াই লিখিয়াছেন।... বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডিদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডিদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকেই সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডিদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি উপভোগের কবি, চণ্ডিদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডিদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয় এবং দুঃখের প্রতিও অনুরাগ। বিদ্যাপতি কেবল জানেন যে মিলনে সুখ ও বিরহে দুঃখ; কিন্তু চণ্ডিদাসের হৃদয় আরো গভীর, তিনি উহা অপেক্ষা আরো অধিক জানেন। তিনি সুখের চখেও অশ্রুজল দেখিতে পান। তাঁহার প্রেম, 'কিছু কিছু সুধা, বিষগুণা আধা', তাঁহার কাছে শ্যাম যে মুরলী বাজান, তাহাও 'বিষামৃতে একত্র করিয়া'।"[১]

এই তুলনামূলক প্রবন্ধের উপসংহারে তরুণ লেখক যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা সন্ধ্যাসংগীতের কবিতারই একপ্রকার মর্মব্যাখ্যা; সন্ধ্যাসংগীতে কবির চিত্ত যে প্রেমের জন্য লালায়িত, যাহার জন্য দুঃখকে বরণ করিতে প্রস্তুত, সেই প্রেমই ভবিষ্যৎ জগতে স্বীকৃতি লাভ করিবে, ইহাই ছিল কবির প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি আরও দশ বৎসর পরে 'সাধনায়' বিদ্যাপতির রাধিকা[২] শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের তুলনামূলক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন।

বৈষ্ণব কবিদের রচনা লইয়া তুলনামূলক আলোচনা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ পূর্বাচার্যগণের পথ অনুসরণ করেন। বহুকাল পূর্বে জগদ্বন্ধু ভদ্র 'মহাজন পদাবলী'র ভূমিকায় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের তুলনামূলক সমালোচনা করেন; বাংলায় বোধ হয় ইহাই এতদ্‌জাতীয় প্রথম আলোচনা; ভদ্র মহাশয়ের রচনা হইতে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল : "অন্যের আনন্দ উৎপাদনকরা বিদ্যাপতির অভিপ্রায় ছিল; চণ্ডীদাস স্বয়ং আনন্দে মাতিয়া জগৎ মাতাইয়াছেন। বিদ্যাপতির কবিতা সমুদ্রগর্ভ-নিহিত অমূল্যরত্ন, চণ্ডীদাসের কবিতা সরসী-উরসে ভাসমানা সৌরভময়ী সরোজিনীসদৃশ।"[৩] বঙ্কিমচন্দ্রও এই শ্রেণীর তুলনামূলক আলোচনা করেন জয়দেব ও বিদ্যাপতির মধ্যে; বঙ্কিমের তুলনাপদ্ধতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়; কারণ রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে বঙ্কিমকেই অনুগমন করেন বলিয়া মনে হয়। বঙ্কিম লিখিতেছেন : "জয়দেবাদিতে বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য, বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে অন্তঃপ্রকৃতির রাজ্য। জয়দেব, বিদ্যাপতি উভয়েই রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কথা গীত করেন। কিন্তু জয়দেব যে প্রণয় গীত করিয়াছেন, তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের অনুগামী। বিদ্যাপতির কবিতা বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত।...বিদ্যাপতি মনুষ্যহৃদয়কে বহিঃপ্রকৃতি ছাড়া করিয়া, কেবল তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন, সুতরাং তাঁহার কবিতা, ইন্দ্রিয়ের সংস্রব শূন্য, বিলাস শূন্য, পবিত্র হইয়া উঠে; জয়দেবের গীত রাধাকৃষ্ণের বিলাস পূর্ণ;

১ চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি, ভারতী ১২৮৮ ফাল্গুন পৃ ৫১৮। সমালোচনা (১২৯৪) র-র অচ ২য় পৃ ১১০-২১।
২ বিদ্যাপতির রাধিকা, সাধনা ১২৯৮ চৈত্র। দ্র. আধুনিক সাহিত্য।
৩ শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী, পৃ ২১৪। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ প্রকাশিত।

বিদ্যাপতির গীত রাধাকৃষ্ণের প্রণয় পূর্ণ। জয়দেব ভোগ; বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দুঃখ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা।"[১]...

বঙ্কিম যেমন জয়দেব ও বিদ্যাপতির তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী তুলনা করিলেন। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে ব্যবধান প্রায় আঠারো বৎসরের। দুইজনের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পৃথক; বঙ্কিম বিদ্যাপতিকে বর্ষার সহিত তুলনা করিয়াছিলেন, আর রবীন্দ্রনাথ করিলেন বসন্তের সহিত। 'বিদ্যাপতির রাধিকা'[২] প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "গতি এবং উত্তাপ যেমন একই শক্তির ভিন্ন অবস্থা, বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমশক্তির সেই প্রকার দুই ভিন্ন রূপ দেখা যায়। বিদ্যাপতির কবিতায় প্রেমের ভঙ্গী, প্রেমের নৃত্য, প্রেমের চাঞ্চল্য, চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমের তীব্রতা, প্রেমের দাহ, প্রেমের আলোক। ...বিদ্যাপতির প্রেমে যৌবনের নবীনতা এবং চণ্ডীদাসের প্রেমে অধিক বয়সের প্রগাঢ়তা আছে।... বিদ্যাপতিতে সেইজন্য কেবল বসন্ত।" বিদ্যাপতি সম্বন্ধে উভয় সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে, তৎসম্বন্ধে একজন আধুনিক লেখক বলিতেছেন, "বঙ্কিমের মানসিক কাঠামো যুক্তিপ্রধান, রবীন্দ্রনাথের আবেগপ্রধান; বঙ্কিম বিদ্যাপতিকে যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখেছেন আবেগের আয়নায়।"[৩] বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গির সহিত রবীন্দ্রনাথের মিল কখনই হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ জন্মকবি; তাঁহার কাব্য বিচারের আদর্শ ও পদ্ধতি যে মার্জিত রসবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা বঙ্কিমী-রীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে রবীন্দ্রনাথ এখন পর্যন্ত বঙ্কিমের ভাষা, ভাবধারা, প্রকাশভঙ্গিকে অজ্ঞাতসারে অনুসরণ করিতেছিলেন, কারণ সেযুগে বঙ্কিম অপেক্ষা মহত্তর মনীষী বংলাদেশে ছিলেন না, যাহাকে রবীন্দ্রনাথ অনুকরণ করিতে পারিতেন। কাব্যসৃষ্টির ন্যায় গদ্যরচনায় এখনো রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব রীতি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই; বক্তব্য বিষয়ে সাবলীলতা, ভাষায় প্রবাহমানতা ধীরে ধীরে রূপ লইতেছে।

এই বৈষ্ণব-সাহিত্য বিচারের ধারা সম্পূর্ণ হইল বসন্তরায়[৪] প্রবন্ধে। পূর্বোল্লিখিত 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে' বসন্তরায়ের পদাবলী ছিল। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির সহিত বসন্তরায়ের তুলনা করিয়া অতি সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত সমালোচনা লিখিলেন। তরুণ কবির চোখে বসন্তরায় বিদ্যাপতি হইতে সহজ স্বাভাবিক এবং সেইজন্য শ্রেষ্ঠ। "বিদ্যাপতি-রচিত রূপ বর্ণনার সহিত বসন্তরায়-রচিত রূপবর্ণনার একটি বিশেষ প্রভেদ আছে। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, রূপ উপভোগ্য বলিয়া সুন্দর; আর বসন্তরায় বলিতেছেন, রূপ সুন্দর বলিয়া উপভোগ্য। ইহা সত্য বটে, সৌন্দর্য ও ভোগ একত্রে থাকে, কিন্তু ইহাও সত্য উভয়ে এক নহে।... সৌন্দর্যস্পৃহা হইতেও ভোগ করা যায় এবং ভোগস্পৃহা হইতেও ভোগ করা যায়। যাহার যেমন মনের গঠন। বসন্ত রায় তাঁহার রূপ বর্ণনায় যাহা কিছু সুন্দর তাহাই দেখাইয়াছেন, আর বিদ্যাপতি, তাঁহার রূপ বর্ণনায় যাহা কিছু ভোগ্য তাহাই দেখাইয়াছেন।" আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথের এই রস বিশ্লেষণ য়ুরোপীয় সাহিত্যবিচারের মানসূচীদ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল।

যৌবনের প্রথম উন্মেষে ব্যথিত হৃদয়ের আত্মপ্রকাশ হয় সন্ধ্যাসংগীতের কবিতার মধ্যে। এইসব কবিতার সমর্থনে যেন রচিত হয় গদ্য প্রবন্ধ 'যথার্থ দোসর।' 'তারকার আত্মহত্যা' ও এই প্রবন্ধটি একই সময়ে প্রকাশিত হয়।[৫] শেলীর একটি কবিতার অনুবাদ দিয়া প্রবন্ধটির আরম্ভ—

১ 'মানস বিকাশ' [সমালোচনা] বঙ্গদর্শন ১২৮০ পৌষ, পৃ ৪৫২।
২ সাধনা ১২৯৮ চৈত্র। আধুনিক সাহিত্য। র-র ৯ ম পৃ ৪৪১।
৩ জীবেন্দ্রকুমার গুহ : বিশ্বভারতী পত্রিকা ১ ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা ১৩৫০ আষাঢ় পৃ ৭৫১।
৪ বসন্তরায়, ভারতী ১২৮৯ শ্রাবণ। সমালোচনা (১২৯৪) র-র-অচ ২য় পৃ ১১১।
৫ যথার্থ দোসর, ভারতী ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ।

হে তারকা, ছুটিতেছ আলোকের পাখা খোরে, তুমি তারা, রজনীর কোন্ গুহা মাঝে যাবে ?
তোমারে শুধাই আমি, বলগো বলগো মোরে আলোকের ডানাগুলি মুদিয়া রাখিতে পাবে ?

জীবনে যথার্থ দোসর পাওয়া যায় না, এই হইতেছে নরনারীর চিরন্তন অভিযোগ। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে য়ুরোপের সর্বত্র যে রোমান্টিক কাব্যের সৃষ্টি ও সম্ভোগের সূত্রপাত হইয়াছিল ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি কবিদেরও রচনার মধ্যে সেই সুরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি স্পষ্টভাবেই শোনা গেল। তৎকালীন আধুনিক কাব্যের মধ্যে যে দুঃখবাদ দেখা দিয়াছিল, যাহাকে কবি 'অকারণ কষ্ট' বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই কাব্যসাহিত্যে স্পষ্ট ও ব্যাপকভাবেই প্রকাশ পাইল। নূতন ইংরেজি কাব্য ও সাহিত্য-সমালোচনা পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "আধুনিক ইংরাজি কবিতার মধ্যে আশ্রয়প্রয়াসী হৃদয়ের বিলাপ সঙ্গীত প্রায় শুনা যায়। আধুনিক ইংরাজ কবিরা অসন্তোষ ও অতৃপ্তির রাগিণীতেই অধিকাংশ গান গাহিয়া থাকেন।" এই তত্ত্ব প্রমাণ করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ শেলী, এড্‌য়ান আর্নল্‌ড, রসেটি, ও ও'-শাঙহেসি প্রভৃতির কবিতা তর্জমা করিয়া দেখাইলেন যে ইংরেজ কবিদের মধ্যে এই বিলাপ সংগীত কী রূপ লইয়াছে।

কবিদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "যাহা ছিল ও হারাইয়া গিয়াছে তাহার জন্য যে কেহ বিলাপ করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য নাই, কিন্তু যাহা ছিল না, যাহা পাইতেছি না, অথচ যাহা জানিনা, তাহার জন্য বিলাপ।...এখনকার কবিরা দেখিতেছেন, প্রেমে তৃপ্তি নাই; সে অতৃপ্তি নিরাশার অতৃপ্তি নহে, অভাবের অতৃপ্তি। তাঁহারা কাহাকে ভালবাসেন খুঁজিয়া পান না, অথচ হৃদয়ে ভালবাসার অভাব নাই। ভালবাসিবার জন্য তাঁহাদিগকে কাল্পনিক প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। ক্রমে প্রেমের অতীন্দ্রিয় ভাব কবিদিগের হৃদয়ে পরিস্ফুট হইতে লাগিল।" .. সাহিত্যবিচার এই পর্যন্তই। ইহার পর এই প্রবন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সহিত মূল প্রবন্ধের সম্বন্ধ একটু দূর। কিন্তু লেখকের অন্তরের মূলে যে বেদনা রহিয়াছে তাহাই প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। তিনি বলিতেছেন মানুষ এই হৃদয়ের দোসর খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তাঁহার বিশ্বাস প্রতিলোকের দোসর আছেই, এককালে না এককালে পরস্পরের সহিত মিলন হইবেই। তিনি আশা করেন মনের মানুষ মিলিবে অথচ এত কাঁদিতে হইবে না। হৃদয়ের প্রতিমার নিকট হৃদয়কে বলিদান দিতে হইবে না; ভালবাসা ও সুখ, ভালবাসা ও শান্তি এক পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করিবে। এ সংসারে লোকে ভালবাসে অথচ ভালবাসার সমগ্র প্রতিদান পায় না, ইহা বিকৃত অবস্থা, অসম্পূর্ণ অবস্থা। তরুণ কবির বিশ্বাস এই অসম্পূর্ণ অবস্থা একদিন না একদিন দূর হইবে।[১] প্রবন্ধ মধ্যে বিবাহ ও প্রেমের চিরন্তন প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া লেখক বলিতেছেন, "সামাজিক বিবাহ অনন্তকালস্থায়ী বিবাহ নহে। সচরাচর বিবাহে হয় একতর পক্ষে নয় উভয় পক্ষে প্রেমের অভাব দেখা যায়, এমন কি হয়ত স্বামীস্ত্রীর মধ্যে আমরণস্থায়ী ঘৃণার সম্পর্ক।...হয়ত এমন দুইজনে বিবাহ হইল, শুভদৃষ্টির পূর্বে যাহাদের মধ্যে দেখাশুনা হয় নাই।...বিসদৃশ প্রকৃতি সামাজিক দম্পতির বিবাহ কি কখন অনন্তকালস্থায়ী বিবাহ বলিয়া গণ্য হইতে পারে? কিন্তু দুই দুইটি করিয়া হৃদয় আছে, প্রকৃতি নিজে পৌরোহিত্য করিয়া যাহাদের বিবাহ দিয়াছেন। তাহাদের বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইবার নহে।" লেখকের মতে জীবনের যথার্থ দোসর সন্ধানকালে প্রথমেই যথার্থ ব্যক্তিকে না-ও পাওয়া যাইতে পারে; "প্রথমে তাহার সহিত আমার প্রকৃত দোসরের সাদৃশ্য দেখিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হইলাম, কিন্তু কিছুদিন নিরীক্ষণ করিয়া করিয়া তাহার বৈসাদৃশ্যগুলি একে একে চক্ষে পড়িতে লাগিল, ও অবশেষে তাহার অপেক্ষা সদৃশতর লোককে দেখিতে পাইলাম, আমার ভালবাসা স্থান পরিবর্তন করিল!"[২]

'যথার্থ দোসর'এর প্রতিধ্বনি হইতেছে 'গোলামচোর'।[৩] পূর্বোক্ত প্রবন্ধে যে কথা অন্তরের বিশ্বাস ও অনুভূতি হইতে গম্ভীরভাবে বিবৃত, এখানে সেই কথাটাই ব্যঙ্গচ্ছলে লিখিত হইল, বেদনাটাকে বাক্যের দ্বারা

১ যথার্থ দোসর, ভারতী ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ পৃ ৮৪। ২ ঐ পৃ ৮২-৮৩। ৩ গোলামচোর, ভারতী ১২৮৮ আষাঢ়।

তাচ্ছিল্য করিবার প্রয়াস। বিবাহাদির ব্যাপারে আমাদের সামাজিক বিধি এমন যে, মানুষ জানে না তাহার ভাগ্যে কিরূপ দোসর জুটিবে। এই বিষয়টাকে লেখক পরিহাসচ্ছলে তাসের খেলায় 'গোলামচোর' নাম দিয়াছেন। "অদৃষ্টের হাত হইতে যখন তাস টানি, তখন হয়ত আমার হাতের সকল তাসগুলিই প্রায় মিলিয়া গেল, কেবল একটা বা দুইটা এমন গোলাম টানিয়া বসি যে, চিরকালের মত গোলামচোর হইয়া থাকি।" "আমাদের দেশের বিবাহ প্রণালীর মতো গোলামচোর খেলা আর নাই। প্রজাপতি তাস বিলি করিয়া দিয়াছেন। আন্দাজ করিয়া টানিতে হয়, আগে থাকিতে জানিবার উপায় নাই।...যেই মিলিল, অমনি মিল-দম্পতি বিশ্রাম পাইল। অন্যান্য অবিবাহিত তাসেরা হাতে হাতে মিল অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল, তাহাদের আর বিশ্রাম নাই। এইখানে সাধারণকে বিদিত করিতেছি, আমি একটি অবিবাহিত তাস আছি, আমার মিল কাহার হাতে আছে জানিতে চাই। আমার বন্ধুবান্ধবরা আমাকে বলেন, গোলাম! বলেন, আমার মিল ত্রিজগতে নাই। যে কন্যাকর্তা টানিবেন তিনি গোলাম-চোর হইবেন। কিন্তু, বোধ করি, তাঁহারা রহস্য করিয়া থাকেন, কথাটা সত্য নহে।" প্রত্যেক লোকই জীবনে এমন কিছু জিনিস টানিয়া বসেন বা অন্যের কৌশলে টানিয়া পান যাহা নীরবে হজম করা ছাড়া উপায় নাই। সকলেই জীবনে গোলামচোর হইয়া থাকেন, সেইজন্য প্রতিবেশীকে গোলামচোর হইতে দেখিলে কেহ যেন হাস্য না করেন—ইহাই হইতেছে লেখকের শেষ উপদেশ।

মানুষ যথার্থ দোসর খুঁজিয়া ব্যর্থকাম হয় ও প্রায়ই গোলামচোর হইয়া বেয়াকুব বনে, সংসার-জীবনের এই হইতেছে ট্রাজেডি। সুতরাং তরুণ কবির মতে সমাজে সংস্কার প্রয়োজন। কিন্তু এই সংস্কার কিভাবে রূপ লইতে পারে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা এখনো হয় নাই; তবে যে তিনি চিন্তা করিতেছেন, তাহার প্রমাণ পাই সমসাময়িক রচনা হইতে। সমাজজীবনে পরিবর্তন ঘটিবেই, কিন্তু কিভাবে ঘটিলে সংস্কারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ না হয়, তাহা লেখক 'এক-চোখো সংস্কার'[১] শীর্ষক এক প্রবন্ধে আলোচনা করেন; তিনি বলিলেন যে একদল লোক কোনোপ্রকার পরিবর্তন বা সংস্কার হইলেই অতীতের সহিত অধুনার তুলনা করিয়া বিলাপ করিতে থাকেন। সেই সর্বসংস্কার-বিরোধী মনোভাবের সমর্থন তিনি করিতে পারেন না। আবার যাঁহারা আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী লেখায় তাঁহাদের সহিতও একমত নহেন। যাঁহারা অর্ধপন্থী তিনি তাঁহাদেরও যুক্তির অসংখ্য ত্রুটি ধরিলেন; তাঁহার মতে লোকাচারের যে প্রাচীর এককালে সমাজকে আশ্রয় দিয়াছিল সেই প্রাচীর ভাঙিলেই সমাজ আপনা হইতেই রক্ষা পাইবে না। তাঁহার মতে সমাজ-প্রাচীরের একটি একটি করিয়া খিড়কি খুলিয়া বাহিরের আলো বাতাস প্রবেশের পথ করিয়া দিতে হইবে; এই শ্রেণীর সংস্কারকগণ রক্ষণশীল দলভুক্ত হইয়াও উন্নতিশীলদিগকে সাহায্য করিতেছেন, সংক্ষেপে বলিতে গেলে আদি ব্রাহ্মসমাজের ধীর মন্থর গতিতে সমাজসংস্কারের আদর্শই বরণীয়। নবীনদের চোখে আদি সমাজের মত প্রগতিমূলক নহে, বরং বলা যাইতে পারে প্রয়োজনানুসারে practical বা সুবুদ্ধিমূলক। কিন্তু সাহিত্যবিচারে বা কাব্যসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ আদৌ সুবুদ্ধির পথাশ্রয়ী নহেন; সাহিত্যের মধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত রসের সৃষ্টি সাহিত্যকে সুন্দর ও উপভোগ্য করে; এই কথাটাই ব্যঙ্গচ্ছলে প্রকাশ করেন 'চর্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয়'[২] প্রবন্ধে। রচনাটি আধুনিক শিক্ষা ও সাহিত্যের একটি রস-সমালোচনা। লেখক বলিতে চান যে বয়োভেদে যেমন মানুষের খাদ্যের পরিবর্তন হয়, জ্ঞান বিতরণের বেলাতেও সেদিকে দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন। চর্ব, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চারিবিধ খাদ্য গ্রহণের পন্থা ছিল সনাতন; অধুনা পঞ্চম পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে—তাহাকে বলা হইয়াছে ধৌম্য বা ধূমায়ন বা তামাকুসেবন। ধূমপান জীবনের বা স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে লাগে না, কেবলমাত্র আনন্দের জন্যই ইহার অভ্যাস,—চর্ব, চোষ্য, লেহ্য পেয়ের ন্যায় জীবধর্ম রক্ষার জন্য অপরিহার্য নহে। তেমনি সাহিত্যক্ষেত্রে নভেল পড়া জ্ঞানালোচনার অন্তরঙ্গ বিষয় নহে, কেবলমাত্র সাময়িক আনন্দের জন্যই এই অভ্যাসের

১ এক-চোখো সংস্কার, ভারতী ১২৮৮ পৌষ পৃ৪০১-৭। ২ চর্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, ভারতী ১২৮৮ শ্রাবণ, পৃ ১৮৪-৮৯।

জন্য। মোট কথা প্রবন্ধটিতে যথেষ্ট কৌতুকোচ্ছ্বাস আছে। এই প্রবন্ধেই বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়— 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র মধ্যে যে প্রীতিপ্রদ অম্লরসের আমেজ আছে তাহাই লেখক সুষ্ঠুভাবে বিচার করিয়াছেন।

তরুণ লেখকের মনে বিচিত্র প্রশ্ন উঠে,— তাহারই অন্যতম হইতেছে, জীবনে যুক্তি reason প্রবল, না আবেগ emotion প্রবল। এ প্রশ্ন মানবের চিরন্তন প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথ অর্ধব্যঙ্গভরে প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়া বলিলেন যে পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে সর্বদা বিচরণ করিবার জন্য যুক্তি বা বুদ্ধি নামে একটি 'দারোয়ান'[১] নিযুক্ত আছে। মানুষের এই প্রবলতম সম্বল তাহাকে সর্বদা চালনা করিতে চায়। কিন্তু লেখকের প্রশ্ন— এই বুদ্ধি বা যুক্তি-দারোয়ান যদি মানুষকে সর্বদাই আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া চালায় তবে তাহার মনের পরিপূর্ণ বিকাশ হয় কিনা সন্দেহ। "নিতান্তই যুক্তির নির্দিষ্ট চারিটি দেওয়ালের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ান' মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নহে, আবার সর্বতোভাবে যুক্তিকে অমান্য করিয়া যথেচ্ছাচার করিয়া বেড়ানও ভাল নয়।" যুক্তিরাজ্যের বাহিরে কল্পনার যে একটি বিস্তৃতক্ষেত্র আছে, তাহাকেও জীবনে উপেক্ষা করা যায় না। যাহাই হউক 'গোলামচোর' 'চর্ব, চোষ্য লেহ্য পেয়' 'দারোয়ান' 'নিমন্ত্রণ সভা' প্রভৃতি রচনাগুলির মধ্যে লেখকের বয়সোচিত ধর্মই চোখে পড়ে; রচনাগুলির মধ্যে কোনো আন্তরিকতা নাই, মতামতের মধ্যে দৃঢ়তা বা উগ্রতা নাই; তবে জীবনের বিচিত্র সমস্যার প্রশ্ন প্রত্যেকটির মধ্যেই অল্পবিস্তর আলোচিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ সমাজসংস্কারক বা ধর্মসংস্কারক নহেন; তিনি কবি ও সাহিত্যিক। সুতরাং তাঁহার রচনার মধ্যে সামাজিক মতামত সম্বন্ধে বরাবর একই ভাবের মতবাদ পোষণ করিতে ও জীবনে পালন করিতে না দেখিলে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি গতানুগতিকের বাধা ভাঙিয়াছেন বহুল পরিমাণে, বিচিত্র ক্ষেত্রে। কাব্য-জগতে তিনি যে মুক্তি আনিয়াছেন, তাহাকে বিপ্লব বলা যাইতে পারে। বাংলা সংগীতেও মুক্তির মন্ত্র প্রচার করেন তিনি। বাল্মীকিপ্রতিভা হইতেছে সেই বিপ্লবের প্রথম জয়ধ্বজা। এই নাট্যে তিনি সংগীত সম্বন্ধে যে স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারই কৈফিয়তে 'সংগীত ও ভাব' সম্বন্ধে প্রবন্ধের উদ্ভব।[২]

রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-৮৫) এই সভায় সভাপতি হন। তরুণ কবির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে গানের কথাকেই গানের সুরের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া তোলা কণ্ঠসংগীতের মূল উদ্দেশ্য। প্রবন্ধের লিখিত অংশ দীর্ঘ নহে; দৃষ্টান্তের দ্বারা বক্তব্যটিকে সমর্থনের চেষ্টায় নানাপ্রকার সুর দিয়া নানাভাবের সঙ্গে গাহিয়া শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কবি বলিতে চেষ্টা করেন যে আমরা যখন কথা বলি তখনও সুরের উচ্চনিচতা ও কণ্ঠস্বরের বিচিত্র তরঙ্গলীলা থাকে; সুরের উচ্চনিচতা ও তরঙ্গলীলা সংগীতে উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়।[৩]

সংগীতের উৎপত্তি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত হার্বার্ট স্পেন্সরের মতকে অনুগমন করিয়াছিল। বেথুন সোসাইটিতে

১ দারোয়ান, ভারতী ১২৮৮ ভাদ্র পৃ ২১৫-১৯।

২ ভারতী ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ। প্রবন্ধটি দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রার পূর্বদিন ১২৮৮ বৈশাখ ৮ (১৮৮১ এপ্রিল ১৯) তারিখে বেথুন সোসাইটির উদ্যোগে মেডিক্যাল কলেজ হলে পাঠ করেন। বেথুন সাহেবের মৃত্যু হয় ১৮৫১ অগস্ট ১২। মেডিক্যাল কলেজের সম্পাদক F. J. Mouat সাহেব ১৮৫১ ডিসেম্বর ১১ তারিখে বেথুন সোসাইটি স্থাপন করেন, সভার অধিবেশন মেডিক্যাল কলেজ হলেই হইত।

৩ আমাদের আলোচ্যপর্বে বাংলাদেশের নানাস্থানে নানা লোক সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা করিতেছেন। মহারাজ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভারতীয় সংগীত বিষয়ক কার্যকলাপ সুবিদিত। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'গীতসূত্রসারে' দেশীয় সংগীতসংস্কারের কথা তোলেন। নবীনচন্দ্র দত্ত প্রণীত 'সংগীত রত্নাকর' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এ ছাড়া 'বঙ্গদর্শনে' (১২৭৯ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়) সংগীত সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে বাঙালি নিজ ঐশ্বর্য সম্বন্ধে সচেতন হয়।

পঠিত প্রবন্ধে পরিব্যক্ত মতের সমর্থনে তিনি স্পেন্সরের The origin and function of Music নামে প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা শীর্ষক[১] প্রবন্ধ লেখেন। তাহাতে কবি বলেন, মনোভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে সংগীত, আর রাগরাগিণীর উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা মাত্র। কিন্তু এখন সংগীতের উদ্দেশ্য দাঁড়াইয়াছে ভাবটিকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রাগরাগিণীর এই অত্যাচার সহ্য করিতে নারাজ। তাই তিনি লিখিলেন, "যদি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভাল শুনায়, আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে, তবে জয়জয়ন্তি বাঁচুন বা মরুন, আমি পঞ্চমকেই বাহাল রাখিবনা কেন?" বৈয়াকরণ ও কবিতে যে প্রভেদ, গানের ওস্তাদের সহিত একজন ভাবুক গায়কেরও সেই প্রভেদ। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "সঙ্গীতের উদ্দেশ্যই ভাব প্রকাশ করা। যেমন কেবলমাত্র ছন্দ, কানে মিষ্ট শুনাক তথাপি অনাবশ্যক, ভাবের সহিত ছন্দই কবিদের ও ভাবুকদের আলোচনীয়, তেমনি কেবলমাত্র সুরসমষ্টি ভাব না থাকিলে জীবনহীন দেহমাত্র; সে-দেহের গঠন সুন্দর হইতে পারে কিন্তু তাহাতে জীবন নাই। কেহ কেহ বলিবেন, তবে কি রাগরাগিণী আলাপ নিষিদ্ধ! আমি বলি তাহা কেন হইবে? রাগরাগিণী আলাপ ভাষাহীন সঙ্গীত। অভিনয়ে pantomime যেরূপ, ভাষাহীন অঙ্গভঙ্গী দ্বারা ভাবপ্রকাশ করা, সঙ্গীতে আলাপও সেইরূপ। Pantomime-এ যেমন কেবল অঙ্গভঙ্গী হলেই হয় না, যে-সকল অঙ্গভঙ্গী দ্বারা ভাবপ্রকাশ হয় তাহাই আবশ্যক; আলাপেও সেইরূপ কেবল কতকগুলি সুর কণ্ঠ হইতে বিক্ষেপ করিলেই হইবে না, যে-সকল সুরবিন্যাস দ্বারা ভাবপ্রকাশ হয় তাহাই আবশ্যক। গায়কেরা সঙ্গীতকে যে-আসন দেন, আমি সঙ্গীতকে তদপেক্ষা উচ্চ আসন দিই; তাঁহারা সঙ্গীতকে কতকগুলি চেতনাহীন জড় সুরের উপর স্থাপন করেন, আমি তাহাকে জীবন্ত অমর ভাবের উপর স্থাপন করি। তাঁহারা গানের কথার উপর সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপর দাঁড় করাইতে চাই। তাঁহারা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।"[২]

যে মতটিকে বিশ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ এত জোরের সহিত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহাই সংগীত সম্বন্ধে তাঁহার চরম কথা নহে। জীবনস্মৃতিতে (পৃ ১২৯) লিখিয়াছেন, "যে-মতটিকে তখন এত স্পর্ধার সঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছিলাম, সে-মতটি যে সত্য নয়, সে-কথা আজ স্বীকার করিব। গীতিকলার নিজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে। গানে যখন কথা থাকে তখন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে গানেরই বাহনমাত্র। গান নিজের ঐশ্বর্যেই বড়ো— বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে। বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্বচনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে। এইজন্য গানের কথাগুলিতে কথার উপদ্রব যতই কম থাকে ততই ভালো।"

'সঙ্গীত ও কবিতা'[৩] শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পূর্ব বক্তব্যকে আরও বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করেন ও বলেন 'সঙ্গীত ও কবিতায়' আমরা আর কিছু প্রভেদ দেখি না, কেবল উন্নতির তারতম্য। ম্যাথু আর্নলডের চিত্র সংগীত ও কবিতা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বিশ্লেষণের মর্ম উদ্ধৃত করিয়া কবি দেখাইলেন যে যে-মুহূর্ত শিল্পীর শিল্পের সর্বাপেক্ষা শুভ মুহূর্ত সেইটি বাছিয়া চিত্রে গাঁথিয়া ফেলা হইতেছে তাঁহার চরম সার্থকতা; ইহার পরের মুহূর্তের ভাব চিত্রে নাই। তেমনি মনের একটিমাত্র ভাব বাছিয়া লইয়া সুরদান হইতেছে সংগীতের কার্য। কিন্তু কবিতার কাজ আরও বিস্তৃত; ভাব হইতে ভাবান্তরে, অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে তাহাকে গমন করিতে হয়। সুতরাং ম্যাথু আর্নল্ডের মতে

১ Herbert Spencer: Essays, Scientific, Political, and Speculative, vol I. 1868, pr 210-38 দ্র. ভারতী ১২৮৮ আষাঢ় পৃ ১১৫-২২।

২ ভারতী, ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ পৃ ৬৮।

৩ ভারতী ১২৮৮ মাঘ পৃ ৪৫৮-৬৬৪।

সংগীত একটি স্থির ভাবের ব্যাখ্যা করে মাত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস যে গতিশীল ভাব যে সঙ্গীতের পক্ষে একবারে অনমুসরণী তাহা নহে; তবে এখনো সংগীতের সে বয়স হয় নাই। কিন্তু তিনিই বৃদ্ধ বয়সে নৃত্যের সহিত সংগীতের বিবাহ দিয়া সংগীতকে গতিশীল ভাবের বাহন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সন্ধ্যাসংগীতের যুগের গদ্য রচনার কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, যদি আমরা রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি অর্ধরাজনৈতিক রচনার উল্লেখ না করি। আমরা যে সময়ের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছি, তখন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, লর্ড লীটনের দাম্ভিক শাসনের অবসান হয় নাই; ইংরেজি খবরের কাগজওয়ালাদের ঔদ্ধত্য ও নীচাশয়তা ছিল অসীম। *Indian Mirror* পত্রিকা একদিন লিখিল, "This evening's ***Englishman*** **has discovered** the secret of correctly treating the people of Bengal. It says 'Kick them first and then speak to them'." এই উক্তিটি পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়া 'জুতা ব্যবস্থা'[১] শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক লিখিলেন, "গবর্ণমেণ্ট একটি নিয়মজারী করিয়াছেন, যে, 'যেহেতুক বাঙ্গালীদের শরীর অত্যন্ত বে-যুৎ হইয়া গিয়াছে, গবর্ণমেণ্টের অধীনে যে যে বাঙ্গালী কর্ম্মচারী আছে, তাহাদের প্রত্যহ কার্য্যারম্ভের পূর্বে জুতাইয়া লওয়া হইবে।" সম্পাদক পাদটীকায় লিখিলেন "যে সমগ্র জাতিকে কোন বিজাতীয় কাগজ হাটের মধ্যে এরূপ জুতা মারিতে সাহস করে, সে জাতি উপরি-প্রকাশিত প্রবন্ধ পড়িয়া বিস্মিত হইবে না।··· আজ অন্য কোন দেশে যদি কোন কাগজ ঐরূপ অপমানের আভাস মাত্র দিত, তাহা হইলে দেশবাসীরা তৎক্ষণাৎ নানা উপায়ে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিত। কিন্তু এতদিন হইতে আমরা জুতা হজম করিয়া আসিতেছি যে, আজ উহা আমাদের নিকট গুরুপাক বলিয়া ঠেকিতেছে না।" সমগ্র প্রবন্ধটি তীব্র শ্লেষে পূর্ণ, রচয়িতার নাম না থাকিলেও উহা যে রবীন্দ্রনাথের লেখনীপ্রসূত সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কমই।

এই সময়ে ভারতীতে জাতীয়তা[২] ও তৎসম্পর্কীয় নানা প্রশ্ন তুলিয়া এককিস্তি আলোচনা শুরু হয়; মনে হয় রবীন্দ্রনাথও তাহাতে যোগদান করেন, কিন্তু কোন্‌টি তাঁহার রচনা তদ্‌বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই বলিয়া আলোচনা স্থগিত থাকিল।

কেবল দেশ নহে, দেশাতীত জগতের সমস্যার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অন্তরের সহানুভূতি চিরদিনের। এই তরুণ বয়সেও তাঁহার একটি রচনার মধ্যে নিপীড়িত জাতির প্রতি অকৃত্রিম দরদ প্রকাশ পাইয়াছে। চীনে অহিফেন ব্যবসায় লইয়া য়ুরোপীয় বণিকসঙ্ঘ ও বিশেষভাবে ইংরেজদের দুর্ব্যবহার জগত-বিশ্রুত। ডক্টর ক্রিস্টলীব নামে একজন জার্মান পাদরি লিখিত গ্রন্থের ইংরেজি তর্জমা[৩] পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ ভারতীতে লেখেন। অর্থের লোভে মানুষ একটি সমগ্র জাতিকে কিভাবে পৃথিবীর সমক্ষে চণ্ডুখোর জাতিতে পরিণত করিতে পারে তাহারই আলোচনা এই গ্রন্থ মধ্যে ছিল। অহিফেনের হীন ব্যবসায়কে ইংরেজ কুটনীতি ও ষড়যন্ত্রের সাহায্যে চীনদেশে কায়েমি করে; অহিফেনের ব্যবসায় যে কেবল চীনাদের সর্বনাশ করিয়াছিল তাহা নহে, ভারতেরও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষতি করে বিস্তর। মালবদেশে অহিফেনের চাষ প্রবর্তিত হওয়ায় সেদেশের কৃষির ও অধিবাসী রাজপুত জাতির যে সর্বনাশ হইয়াছে, সেদিকেও লেখক দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

এই জ্যৈষ্ঠমাসে 'নিমন্ত্রণ সভা[৪] নামে একটি প্রবন্ধ ভারতীতে প্রকাশিত হয়। ইহাতে লেখক আক্ষেপ করিয়া

১ ভারতী ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ পৃ ৫৮-৬২। রচয়িতার নাম নাই; তবে আমরা জানি উহা রবীন্দ্রনাথের রচনা।

২ জাতীয়তা ও বিজাতীয়তার উপদ্রব, ভারতী ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ পৃ ৮৬-৯৩। জাতীয়তার নিবেদন ঐ আষাঢ় পৃ ১৩৫-৩৯। জাতীয়তার নিবেদনে অনতিজাতীয়তার বক্তব্য ঐ শ্রাবণ, পৃ ১৬৩-৭৩।

৩ চীনে মরণের ব্যবসায়, ভারতী ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ পৃ ৯৩-১০০। The Indo-British Opium Trade by Theodore Christlieb DD. Ph. D. Translated from the German by David B. Croom M.A.

৪ নিমন্ত্রণ সভা, ভারতী ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ।

বলিয়াছেন যে আমাদের দেশে নিমন্ত্রণ সভায় আহারের আয়োজনই প্রাধান্য লাভ করে। আহার ব্যতীত সেখানে আর কোনো কাজ হয় না। কেবলমাত্র আলাপ-আলোচনা করিবার জন্য মানুষ একত্র হয় না। লেখক সমাজের এই ত্রুটি সংশোধনের প্রস্তাব করেন।

রবীন্দ্রনাথের ভগ্নহৃদয় ও সন্ধ্যাসংগীত কাব্যদ্বয়ের অলোচনা করিয়া পাঠকদের মনে এই ধারণাই হয় যে কবি যেন সর্বদাই দুঃখে ম্রিয়মাণ, অন্তর তাঁহার বেদনায় জর্জর। এই ধারণা সৃষ্টির জন্য অবশ্য কবি স্বয়ং দায়ী। কিন্তু কাব্যের বিষাদ সুর হইতে গদ্যের রচনারীতির পার্থক্য কত। সেইজন্যই আমরা বলিয়াছিলাম যে কেবলমাত্র কাব্যের দ্বারা লেখকের সমগ্র মনটিকে পাওয়া যায় না; রবীন্দ্রনাথ নিজেও নিজের প্রতি অবিচার করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা এত বিস্তৃতভাবে গদ্য রচনাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম।

বৌঠাকুরানীর হাট, তৎপূর্বে ও পরে

সন্ধ্যাসংগীত ও প্রভাত সংগীত রচনার মধ্যভাগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত চন্দননগরে মোরান সাহেবের কুঠিতে বাসকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'বৌঠাকুরানীর হাট' লিখিতে শুরু করেন।[১] প্রথম উপন্যাস বলিলাম এইজন্য যে ইতঃপূর্বে ভারতীতে ক্রমশ প্রকাশিত 'করুণা' তিনি সম্পূর্ণ করেন নাই ও গ্রন্থাকারে উহা কখনো মুদ্রিত হয় নাই।

'বৌঠাকুরানীর হাটে'র গল্পাংশ আমরা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া গ্রন্থ সম্বন্ধে অন্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য মুগলদের বশ্যতা স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়া স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন শুরু করেন। কিন্তু তদীয় খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায় মুগলদের সহিত মিত্রতা রক্ষার পক্ষপাতী। ইহাতে প্রতাপ পিতৃব্যের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। প্রতাপের পুত্র উদয়াদিত্য ও কন্যা বিভা উভয়েই বসন্তরায়ের অত্যন্ত অনুগত; তজ্জন্যও প্রতাপ তাঁহার উপর বিরক্ত। উদয়াদিত্য অত্যন্ত ধীর-প্রকৃতির যুবক; যৌবনে রুক্মিণী নামে একটি রমণীকে ভালোবাসিবার ফলে এই উপন্যাসে অনেক কিছু দুঃখের ঘটনা ঘটে। উদয়াদিত্যের পত্নী সুরমাকে গোপনে সে-ই বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন। বিভার বিবাহ হয় চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের সহিত। রামচন্দ্র একদা তাঁহার বিদূষক রমাই ভাঁড়কে স্ত্রীলোক সাজাইয়া শ্বশুরবাড়ির অন্তঃপুরে লইয়া যান। প্রতাপ সেই সংবাদ পাইয়া জামাতাকে হত্যা করিবার আদেশ দেন। উদয়াদিত্যের কৌশলে রামচন্দ্র রায় পলায়ন করিতে সক্ষম হন। এই অপরাধে প্রতাপ পুত্রকে কারারুদ্ধ করেন; কিন্তু বসন্ত রায়ের চেষ্টায় কারাগার অগ্নিদগ্ধ হয় ও উদয় মুক্তি পাইয়া 'দাদামহাশয়ে'র নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন প্রতাপ সৈন্য পাঠাইয়া উদয়কে বন্দী করেন; বসন্ত রায় প্রতাপ-প্রেরিত ঘাতকের হস্তে নিহত হন। পরে উদয়াদিত্য পিতার নিকট রাজ্যত্যাগের শপথ করিয়া কাশী যাত্রা করেন; বিভাকে পথিমধ্যে তাহার স্বামীর নিকট পৌঁছাইয়া দিবেন স্থির করিলেন। তাঁহারা চন্দ্রদ্বীপের ঘাটে পৌঁছাইয়া জানিতে পারিলেন যে নির্বোধ রামচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের উপর রাগ করিয়া পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন। বিভাকে রামচন্দ্র গ্রহণ করিলেন না; তখন উদয় ভগ্নীকে লইয়া কাশী চলিয়া গেলেন। চন্দ্রদ্বীপের যে বাজারের নিকট বিভার নৌকা লাগিয়াছিল, সেই বাজার সেই সময় হইতে বৌঠাকুরানীর হাট নামে পরিচিত।

বিশ বৎসর বয়সে রচিত 'বৌঠাকুরানীর হাট'কে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে 'নবেল' বলিয়াছেন। উহা নবেল না রোমান্স সে সূক্ষ্ম-বিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই। বাংলা উপন্যাস বা নবেলের ইতিহাস খুব প্রাচীন নহে; ইহাও

১ বৌঠাকুরানীর হাট, ভারতী ১২৮৮ কার্তিক—১২৮৯ আশ্বিন। গ্রন্থাকারে—পৌষ ১৮০৪ শক [১২৮৯। ১১ জানুয়ারি ১৮৮৩]।

বাংলার অন্যান্য সাহিত্যের ন্যায় য়ুরোপীয় সাহিত্যচর্চার ফলপ্রসূত,— অনুকরণ ও অনুবাদে ইহার জন্ম। সামাজিক জীবনের সমস্যা হইতে আধুনিক উপন্যাসের উদ্‌ভব। কিন্তু উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বঙ্কিমপ্রমুখ লেখকগণ যখন উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন, তখনও সমাজজীবন তাঁহাদের সমক্ষে তেমন কোনো সমস্যা লইয়া উপস্থিত হয় নাই; তাই সেযুগের অধিকাংশ লেখকই তাঁহাদের উপন্যাসের জন্য ঐতিহাসিক অতীত হইতে নায়ক নায়িকাদের সংগ্রহ করেন। 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রভৃতি গ্রন্থকে নবেল বলা যায় না,— কারণ সেখানে সমস্যা নাই, সমস্যা সমাধানের চেষ্টাও নাই, সমাজ-চিত্র ও চরিত্র-অঙ্কনই একমাত্র উদ্দেশ্য। ইংরেজি উপন্যাসের গোড়ার ইতিহাসও অনুরূপ। মানুষের মন কিন্তু ইহাতে তৃপ্ত থাকিতে পারিল না; কাব্য যেমন লিরিকধর্মী হইয়া বিবাহ-ইতর ও বিবাহ-উত্তর প্রেমের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল, উপন্যাসও প্রেমের সাহাসিকতা বর্ণনে অগ্রসর হইল। কিন্তু আধুনিক সমাজজীবনে নরনারীর অবাধ প্রেম-বিনিময়ের স্থান অত্যন্ত সংকুচিত; পরম্পরাগত নীতিবোধ, ধর্মবোধ, শ্রেণীবোধ প্রভৃতি জন্মগত সংস্কার লেখকগণের লেখনীকে সংযত রাখিত। সেইজন্য তাঁহারা আধুনিক সমাজজীবন হইতে ঘটনা ও পাত্রপাত্রী সংগ্রহ না করিয়া অতীত যুগের মধ্যে কাহিনীর সন্ধানে যাত্রা করিলেন। স্কট তাহার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। আমাদের বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রই এই ধারার প্রথম পথপ্রদর্শক ও দুর্গেশনন্দিনী এই নূতন রীতির প্রথম উপন্যাস। বঙ্কিমও তাঁহার সাহিত্যজীবনের প্রথম দিকে এই অতীত যুগের নরনারী হৃদয়ে প্রেমের সংঘাত তুলিয়া উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন। ইংরেজিতে যাহাকে রোমান্স বলে দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি সেইজাতীয় উপন্যাস, বাংলায় ইহাকে বলা যাইতে পারে ঐতিহাসিক উপন্যাস। বৌঠাকুরানীর হাট রচিত হইবার মাত্র পনেরো বৎসর পূর্বে আধুনিক বাংলা উপন্যাসের জন্ম; সুতরাং রবীন্দ্রনাথের পূর্বে দীর্ঘকালের পরম্পরাগত আদর্শ জমাট বাঁধে নাই।

রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরানীর হাট' ঐতিহাসিক উপন্যাস বা রোমান্স। তবে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাঁহার বিশ বৎসর বয়সে উহাকে যতদূর পর্যন্ত 'নবেলি' করা সম্ভবপর, তাহা করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। এখানে আমরা 'নবেলি' অর্থে বাস্তব-ঘেঁসা বুঝিতেছি, যদিও সেই বাস্তব সমসাময়িকের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। আমরা নিম্নে একটিমাত্র উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি যাহা অত্যন্ত বাস্তব বা নবেলি। উদয়াদিত্য "ভুলিয়া গেলেন যৌবনের প্রমত্ত অবস্থায় রুক্মিণী কি করিয়া পদেপদে তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইয়াছে, প্রতিদিন তাঁহার পথের সম্মুখে জাল পাতিয়া বসিয়াছিল, আবর্তের মত তাঁহাকে তাহার দুই মোহময় বাহু দিয়া বেষ্টন করিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মুহূর্তের মধ্যে পাতালের অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়াছিল— সে সমস্ত ভুলিয়া গেলেন।" এই বর্ণনাকে কেবল sensuous বলিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না। ইহা অত্যন্ত realistic বা বাস্তব; লেখকের দর্শন শ্রবণ ও অনুভূতিশক্তি অত্যন্ত সূক্ষ্ম না হইলে এই শ্রেণীর বর্ণনা করা কঠিন। সেইদিক হইতে বিচার করিলে 'বৌঠাকুরানীর হাটে'র মধ্যে এমনসব উপাদান আছে, যাহা নবেল-ধর্মী; এবং সেইজন্যই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ ইহাকে নবেল বলিয়াছিলেন।

এইবার এই উপন্যাসের ঘটনাপুঞ্জের উৎস কোথায় তদ্‌বিষয়ে অনুসন্ধান করা যাউক। প্রতাপাদিত্যের কাহিনী উনবিংশ শতকের প্রারম্ভ হইতেই সমাদৃত হইয়াছিল; ১৮০১ সালে রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রকাশিত হয়। ইতঃপূর্বে ভারতচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের কাহিনী আশ্রয় করিয়া কবিতায় মানসিংহের উপাখ্যান লেখেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে গ্রন্থ হইতে তাঁহার প্রেরণা পান সে হইতেছে প্রতাপচন্দ্র ঘোষ কৃত 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' (১৮৬৯); এই গ্রন্থে প্রতাপাদিত্য কর্তৃক বসন্তরায় হত্যার পর হইতে তাঁহার ধ্বংস পর্যন্ত ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রতাপচন্দ্রকে অনুবর্তন করিয়াছিলেন বলিলে ভুল হইবে না; সমসাময়িক পত্রিকাতে আছে[১] the talented author of *Bauthakuranir*

১ দ্র. বঙ্গাধিপ পরাজয়। পরিশিষ্ট পৃ ৩৩২।

Hat followed out the different incidents of the same story। বঙ্গাধিপের কতকগুলি চরিত্র রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মধ্যে নূতন রূপ লইয়াছে ; বঙ্গাধিপে রমাই যদিও বিদূষক, তথাপি সে বীর ও প্রভুভক্ত, 'বৌঠাকুরানীর হাটের রামমোহন মালের কতকগুলি গুণ ইহাতে দেখা যায়। বঙ্গাধিপের সরমা, এখানে সুরমা হইয়াছে। বঙ্গাধিপে প্রতাপাদিত্য কুচরিত্র, দুরাচার দস্যুপ্রকৃতিরূপে বর্ণিত, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে কেবলমাত্র দুরাচার মূর্তিতে দেখাইয়াছেন। উনবিংশ শতকে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কোনো মোহ বাঙালিকে পাইয়া বসে নাই ; কোনো ঐতিহাসিক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ তখনো প্রকাশিত হয় নাই। আকবরের ঐতিহাসিক আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'তে বা মুগল যুগের শেষ ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'সায়র-উল-মূতাক্ষরীন্'এ বঙ্গের এই বীরের উল্লেখমাত্র নাই দেখিয়া মনে হয় সমসাময়িকরা বা পরবর্তী যুগের মুসলিম ঐতিহাসিকেরা যশোহরেশ্বরের বিদ্রোহকে লিপিবদ্ধ করিবার মতো গুরুতর ঘটনা বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ রচনাবলীর ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময়ে বাংলাদেশের আদর্শ বীরচরিত্ররূপে খাড়া করবার চেষ্টা চলেছিল। এখনো তার নিবৃত্তি হয়নি। আমি সে সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। সে সময়কার ইতিহাসলেখকদের উপরে পরবর্তী কালের দেশাভিমানের প্রভাব ছিল না। আমি যে সময়ে এই বই অসংকোচে লিখেছিলুম তখনো তাঁর পূজা প্রচলিত হয় নি।"[১]

কাব্যে যে অনুকরণের পর্ব চলিতেছে, গল্পরচনায়ও তাহাই হইতেছে। আধুনিক উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রই তখন বাঙালির আদর্শ, বাংলাসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী একছত্র সম্রাট। দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯) যখন রচিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথ নিতান্ত বালক; বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত উপন্যাসের সহিত তাঁহার যে প্রগাঢ় পরিচয় হয় তাহার কথা স্বয়ং তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, চন্দ্রশেখর, রাধারাণী, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ বঙ্গদর্শনে (১২৭৯-৮২, ১২৮৪-৮৫) প্রকাশিত হয়। কমলাকান্ত ও মুচিরাম গুড় বাহির হয় ১২৮৭ সালের মধ্যে। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের ও রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি লেখকের উপন্যাসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত ছিলেন। বিলাত যাইবার পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজি ভাষায় তাঁহার এত দখল হয় নাই যে, তিনি সহজে ইংরেজি নভেল পড়িয়া তাহার রস গ্রহণ করিতে পারেন; সুতরাং বাংলা বইই ছিল তাঁহার মনের প্রধানতম উপজীব্য। তাই লিখিয়াছিলেন, "বোধ করি তখন পাঠ্য অপাঠ্য বাংলা বই যে-কটা ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম।"

১২৮৭ সাল পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র যেসব উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে দুর্গেশনন্দিনী অর্ধ-ঐতিহাসিক রোমান্স, রাজসিংহই যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস। কোনো গ্রন্থেরই পটভূমি বাংলাদেশে নয়, দুর্গেশনন্দিনীতে প্রসঙ্গক্রমে বাংলাদেশ আসিয়াছে বটে, কিন্তু বাঙালি আসে নাই। 'বৌঠাকুরানীর হাটে'র সমসাময়িক রচনা আনন্দমঠের বিষয়বস্তু বাংলাদেশের অন্তর্গত হইলেও কৃত্রিম পটভূমিতে উহা চিত্রিত বলিয়া বাংলার যথার্থ রূপ উহাতে ফুটে নাই। রবীন্দ্রনাথের মনে বাংলাদেশের কোনো আখ্যায়িকা অবলম্বনে উপন্যাস লিখিবার সংকল্প হয় এবং 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে'র প্রতাপাদিত্যের ইতিহাসকে কেন্দ্র করিয়া তিনি উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ তাঁহার 'বঙ্গাধিপে' বাংলার মধ্যযুগের চিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দিতে চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু রচনাদোষে তাহা বহুবিস্তারে জটিল ও নীরস হইয়াছে, সমগ্রের ছবি তাহাতে ফুটে নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নবীন লেখনী বাংলাদেশের গ্রামের ও গ্রামবাসী নরনারীর যে চিত্র আঁকিয়াছে তাহা সত্যই আশ্চর্য বলিতে হইবে।

১ রবীন্দ্র রচনাবলী ১ম খণ্ড পৃ ৩৭৪।

অল্প বয়সের রচনা হইলেও এই উপন্যাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি সুন্দর চরিত্র সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ; ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে বসন্তরায়। রাজা বসন্তরায়কে পদকর্তা বসন্তরায়ের সহিত অভিন্ন করিয়া তিনি এক আদর্শ বৈষ্ণব রাজর্ষি সৃষ্টি করিলেন।[১] 'বৌঠাকুরানীর হাটে' বসন্তরায় সেই বৈষ্ণব চরিত্রে আবির্ভূত হইয়াছেন। এ ছাড়া শ্রীকণ্ঠসিংহের চরিত্র ও চিত্র যে এই সৃষ্টির মধ্যে রূপ লইয়াছে তাহা কবি স্বয়ং বলিয়াছেন। লেখকের অপর আদর্শ চরিত্র উদয়াদিত্য ; এই দুর্বল রাজপুত্রের প্রতি কবির সহানুভূতি সমধিক। উদয়াদিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার পিতা, তদীয় পারিষদগণ, মাতা ও পুরনারীগণ কেহই কোনো আশা পোষণ করিতেন না ; পিতার উপযুক্ত পুত্র তিনি নহেন, বংশের মর্যাদা তিনি অক্ষুন্ন রাখিতে অপারগ, এই কথাই তাঁহাকে নিত্য শুনিতে হইত। অথচ উদয়াদিত্য লোকপ্রিয়, দরিদ্রের বন্ধু, আদর্শবাদী, প্রজার হিতাকাঙ্ক্ষী। উদয়াদিত্যের প্রতি লেখকের সহানুভূতির কারণ ছিল ; লেখকসম্বন্ধেও তাঁহার পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয়বন্ধুর দল অনুরূপ ধারণা পোষণ করিতেন ; রবীন্দ্রনাথ যে সংসারের মধ্যে কাজে কর্মে, জ্ঞানে ধর্মে কোনোদিন বড়ো হইবেন এ আশা ত্যাগ করিয়া সকলে তাঁহাকে কৃপার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পৃথিবী হইতে পরাজিত হইয়া উদয়াদিত্য যেন বিদায় লইয়াছিলেন। সন্ধ্যাসংগীতের কবির মধ্যেও সেই বিষাদঘনছায়া ; সমগ্র উপন্যাসের মধ্যেও সেই দুঃখবাদ প্রবল।

অর্ধশতাব্দী পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই তরুণ বয়সের রচনা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, সাহিত্য সমালোচনার দিক হইতে তাহা অতুলনীয়, কারণ নিজের ত্রুটি সম্বন্ধে এত স্পষ্টবোধ খুব কম লেখকেরই দেখা যায়। তিনি লিখিয়াছেন, "অন্তর্বিষয়ী ভাবের কবিত্ব থেকে বহির্বিষয়ী কল্পনালোকে এক সময়ে মন যে প্রবেশ করলে, ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগল, এ বোধ হয় কৌতূহল থেকে।"…"প্রাচীর ঘেরা মন বেরিয়ে পড়ল বাইরে, তখন সংসারের বিচিত্র পথে তার যাতায়াত আরম্ভ হয়েছে। এই সময়টাতে তার লেখনী গদ্যরাজ্যে নূতন ছবি নূতন নূতন অভিজ্ঞতা খুঁজতে চাইলে। তারি প্রথম প্রয়াস দেখা দিল বৌঠাকুরানীর হাট গল্পে— একটা রোম্যান্টিক ভূমিকায় মানবচরিত্র নিয়ে খেলার ব্যাপারে, সেও অল্প বয়সেরই খেলা। চরিত্রগুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি। তারা আপন চারিত্রবলে অনিবার্য পরিণামে চালিত নয়, তারা সাজানো জিনিস একটা নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে। আজো হয়তো এই গল্পটার দিকে ফিরে চাওয়া যেতে পারে। এ যেন অশিক্ষিত আঙুলের আঁকা ছবি ; সুনিশ্চিত মনের পাকা হাতের চিহ্ন পড়েনি তাতে। কিন্তু আর্টের খেলাঘরে ছেলেমানুষিরও একটা মূল্য আছে।" "সজীবতার স্বতশ্চাঞ্চল্য মাঝে মাঝে এই লেখার মধ্যে দেখা দিয়ে থাকবে তার একটা প্রমাণ এই যে, এই গল্প বেরোবার পরে বঙ্কিমের কাছ থেকে একটি অযাচিত প্রশংসাপত্র পেয়েছিলুম, সেটি ইংরেজি ভাষায় লেখা। সে পত্রটি হারিয়েছে কোনো বন্ধুর অযত্নকরক্ষেপে। বঙ্কিম এইমত প্রকাশ করেছিলেন যে বইটি যদিও কাঁচা বয়সের প্রথম লেখা তবু এর মধ্যে ক্ষমতার প্রভাব দেখা দিয়েছে—এই বইকে তিনি নিন্দে করেননি। ছেলেমানুষির ভিতর থেকে আনন্দ পাবার এমন কিছু দেখেছিলেন, যাতে অপরিচিত বালককে হঠাৎ একটা চিঠি লিখতে তাঁকে প্রবৃত্ত করলে।… তাঁর কাছ থেকে এই উৎসাহবাণী আমার পক্ষে ছিল বহুমূল্য।"

এই উপন্যাস রচনার প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ ইহার গল্পাংশ আশ্রয় করিয়া 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯) নাটক রচনা করেন ; আরও বিশ বৎসর পর ঐ নাটককে সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়া 'পরিত্রাণ' (১৯২৯) লেখেন। মধ্যে

১ "কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একদা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য রাজা বসন্তরায় কবি বসন্তরায় বলিয়া তিনি কোনো কোনো ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করিয়াছেন।" কৈলাসচন্দ্র সিংহ, চণ্ডীদাস, বসন্তরায় ও বিদ্যাপতি ; ভারতী ১২৮৯ আশ্বিন, পৃ ৩০৯। বলা বাহুল্য এধারণা ভুল।

প্রায়শ্চিত্ত ভাঙিয়া 'মুক্তধারা' (১৯২২) লিখিয়াছিলেন। শোনা যায় কেদারনাথ চৌধুরী আনন্দমঠ ও বৌঠাকুরানীর হাটের গল্পাংশ লইয়া দুইখানি নাটক রচনা করেন।[১] উহা মুদ্রিত ও অভিনীত হইয়াছিল কিনা জানিনা।

সাহিত্যস্রষ্টা (creator) যুগপৎ সাহিত্যসমালোচক (critic) হইলে নিজ রচনার সপক্ষে ও সমর্থনে কৈফিয়ত লেখা তাঁহার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ স্রষ্টা ও সমালোচক। সৃষ্টিসৌন্দর্যের একটা সুষ্ঠু মানসূচী অন্তরে তাঁহার ছিল; সেই মানদণ্ডে তাঁহার উপন্যাসের কল্পিত পাত্রপাত্রীদিগকে সাহিত্যের আসরে মর্যাদা দান করিতে পারেন কিনা তাহাই তাঁহার বিচারের বিষয়। মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে কেন্দ্র করিয়া এই আলোচনা শুরু করিলেন। পাঠকের স্মরণ আছে 'ভারতী'র প্রথমবর্ষে (১২৮৪) মাইকেলের এই মহাকাব্যের সমালোচনা দিয়া তাঁহার গদ্যরচনার সূত্রপাত হয়, এবারেও তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের ত্রুটিবিচ্যুতি প্রকাশ করিবার জন্য দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিলেন।[২] যে আঘাত সহ্য করিয়া আহত হয় না আঘাত তাহারই ভূষণ; সুতরাং সাহিত্যের মানসূচী প্রতিষ্ঠাকল্পে মধুসূদনের রচনাকে আক্রমণস্থলরূপে নির্বাচন করিয়া রবীন্দ্রনাথ ভালোই করিয়াছিলেন; কারণ ক্ষীণপ্রাণ সাহিত্যিকদের উপর রবীন্দ্রনাথের তীব্র সমালোচনাসায়কগুলি নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাদের পক্ষে মারাত্মকই হইত। কিন্তু মধুসূদনের কঠিন প্রাণ রবিকর পীড়নে ম্লান হইবে না।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন যে মহাকাব্যের মধ্যে একটি মহৎভাব, আদর্শ থাকা চাই, উহা কোনো মহৎ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যে সেরূপ কোনো মহত্ত্ব পরিলক্ষিত হয় না। সমালোচক বলিলেন যে নিরস্ত্র ইন্দ্রজিতকে হীন ক্ষুদ্র তস্করের ন্যায় রামলক্ষ্মণ বধ করিলেন, ইহা মহাকাব্যের বিষয়বস্তু হইতে পারে না। লক্ষ্মণের শক্তিশেলের মধ্যেও না আছে গৌরব, না আছে বীরত্ব, না আছে মহত্ত্ব। তিনি বলিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'বৃত্রসংহার'-এর মধ্যে বরং মহাকাব্যের উপাদান আছে; সেখানে মহত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় দধীচির জীবনে; স্বর্গোদ্ধারের জন্য দধীচির অস্থিদান, অধর্মের ফলে বৃত্রের সর্বনাশ প্রভৃতি মহাকাব্যের উপযোগী ঘটনা বটে। কিন্তু "মেঘনাদবধ কাব্যে ঘটনার মহত্ত্বও নাই, একটা মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই। তেমন মহৎ চরিত্রও নাই।" তদুপরি ইহা পাশ্চাত্ত্য কবিদের অনুকরণে লিখিত; পাশ্চাত্ত্য কোনো কবি তাঁহার মহাকাব্যে নরকবর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া মধুসূদন অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে নরকের বর্ণনা জুড়িয়া দিয়াছেন, ইহার সহিত মূল কাব্যের কোনো সম্বন্ধ নাই। গ্রীক মহাকবি হোমরের মহাকাব্যের সূচনা গ্রীক সরস্বতীর বন্দনা দিয়া, কিন্তু মধুসূদনের পক্ষে হিন্দুদের দেবতা সরস্বতীর বন্দনা অত্যন্ত কৃত্রিম, কারণ সরস্বতীর সহিত তাঁহার ধর্ম জীবনের কোনোই সম্বন্ধ ছিল না। মোটকথা এবারকার সমালোচনা গতবারের রচনার ন্যায় তীব্র না হইলেও যুক্তির দিক হইতে বিশেষভাবে বিচারণীয়; সে যুগের সমালোচনা-মানসূচীর দৃষ্টিতে এই রচনা সাহিত্যে অপাংক্তেয় হইতে পারে না।

এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে লেখক ট্রাজেডি সম্বন্ধে অতি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন; আমাদের মনে হয় তাঁহার উপন্যাস 'বৌঠাকুরানীর হাট' ট্রাজেডি-ধর্মী কিনা সে-বিষয়ে মনের মধ্যে আন্দোলন চলিতেছে; তাই পরোক্ষভাবে তাহার সমর্থন খুঁজিতেছেন। মহাভারতের আখ্যায়িকা আলোচনা করিয়া তিনি বলিলেন "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের জয় হইল, তখনই মহাভারতের যথার্থ ট্রাজেডি আরম্ভ হইল। তাঁহারা দেখিলেন জয়ের মধ্যেই পরাজয়।··· কয়েক হস্ত জমি মিলিল বটে, কিন্তু হৃদয়ের দাঁড়াইবার স্থান সে দেখিতে পাইল না যেখানে সে তাহার উপার্জিত উদ্যম নিক্ষেপ করিয়া সুস্থ হইতে পারে, ইহাকেই বলে ট্রাজেডি।" 'বিষবৃক্ষ' সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন করিয়া বলিলেন,

১ হারাণচন্দ্র রক্ষিত, ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গালা-সাহিত্য পৃ ৩২৯।

২ মেঘনাদবধ কাব্য, ভারতী ১২৮৯ ভাদ্র পৃ ২৩৪-২৪০। সমালোচনা (১২৯৪)।

"সূর্য্যমুখীর সহিত নগেন্দ্রের শেষকালে মিলন হইয়া গেল বলিয়াই বিষবৃক্ষ ট্রাজেডি নহে— কুন্দনন্দিনী ত' এ ট্রাজেডির উপলক্ষ্যমাত্র। নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীর মিলনের বুকের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু চিরকাল বাঁচিয়া রহিল— ইহাই ট্রাজেডি।"

বৌঠাকুরানীর হাটে সুরমার মৃত্যু ও বসন্তরায়ের হত্যাকাণ্ডের দ্বারা ট্রাজেডি হয় নাই ; ইহা ট্রাজেডি তখনই, যখন উদয়াদিত্য পিতৃসিংহাসন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন,—মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বিজয়দম্ভের মধ্যে যে অসীম শূন্যতা সৃষ্ট হইল, ট্রাজেডি সেইখানে। আর নির্বোধ রামচন্দ্ররায়ের দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের মহোৎসব ক্ষেত্র হইতে সাধ্বী-বিভা ফিরিয়া গেলে রামচন্দ্ররায়ের অন্তরের মধ্যে যে গভীর রেখা পাত করিয়া দিল, তাহাই হইতেছে উপন্যাসের যথার্থ ট্রাজেডি। মেঘনাদবধ কাব্য উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ ট্রাজেডি সম্বন্ধে যে আলোচনা করিলেন, তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বৌঠাকুরানীর হাট যে ট্রাজেডি তাহারই প্রমাণ-সমর্থন।

বঙ্কিমের উপন্যাসই ছিল এই সময়ে গল্প রচনার আদর্শ, শিক্ষিত সমাজের পাঠ্য। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপন্যাস লিখিয়াছেন, সেইজন্য বঙ্কিমের উপন্যাসকে ক্রিটিকের চক্ষে বিচার করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। প্রায় সমসাময়িক একটি রচনায়[১] রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন ; "বঙ্কিম বাবু যখন দুর্গেশনন্দিনী লেখেন, তখন তিনি যথার্থ নিজেকে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। লেখা ভাল হইয়াছে, কিন্তু উক্ত গ্রন্থে সর্বত্র তিনি তাঁহার নিজের সুর ভাল করিয়া লাগাইতে পারেন নাই। কেহ যদি প্রমাণ করে যে, কোন একটি ক্ষমতাশালী লোক অন্য একটি উপন্যাস অনুবাদ বা রূপান্তরিত করিয়া দুর্গেশনন্দিনী রচনা করিয়াছেন, তবে তাহা শুনিয়া আমরা নিতান্ত আশ্চর্য্য হই না। কিন্তু কেহ যদি বলে, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, বা বঙ্কিমবাবুর শেষ-বেলাকার লেখাগুলি অনুকরণ, তবে সেকথা আমরা কানেই আনি না।" রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে মেঘনাদবধ কাব্য প্রবন্ধে বঙ্কিমের বিষবৃক্ষ সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিয়াছিলেন।

আমাদের আলোচ্যপর্বে বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ'[২] বাহির হয় ; এই উপন্যাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত মত তিনি চন্দ্রনাথ বসুকে পত্রযোগে জ্ঞাপন করেন, তাহা তখনো প্রকাশিত হয় নাই। 'আনন্দমঠ' সাহিত্য হিসাবে রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগে নাই ; তাঁহার মতে বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে individualএর চরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেইখানে তিনি চমৎকার সফল হইয়াছেন ; তাঁহার শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু যেখানে মানুষের সমষ্টি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন সেইখানে সমস্তটা একটা পিণ্ডবৎ তাল পাকাইয়া গিয়াছে, কোনও ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার চেষ্টা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না।··· আনন্দমঠের সমস্ত 'আনন্দ' গুলিই যেন এক রকমেরই। একটা প্রকাণ্ড ideaর যে বিচিত্র মানবপ্রকৃতিকে revolutionএর মধ্যে নিয়মিত ও কেন্দ্রীভূত করিয়াছে, তাহাদের প্রকৃতিগত পার্থক্য, তাহাদের বিচিত্র কর্মপ্রবাহ, বিচিত্র ভাবপ্রবাহ, নানা শক্তির উন্মেষ যে একটা প্রকাণ্ড ideaর আবর্তে পড়িয়া একটা দিকে চলিয়াছে, বঙ্কিমবাবু তাহা দেখাইলেন কই। কেন তিনি তাঁহার আনন্দগুলিকে বৈশিষ্ট্য দিলেন না।[৩]

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে যে সাহিত্যের উদ্ভব তাহারও যেমন বিচার প্রয়োজন, খাঁটি বাংলা হৃদয়ের কাব্যে যে অনাবিল গীতরসধারা যুগযুগান্ত হইতে উচ্ছ্বসিত হইতেছে, সাহিত্যিকের হস্তে তাহারও সুবিচার প্রয়োজন। পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যরসতৃপ্ত বাঙালি শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে রবীন্দ্রনাথই বোধ হয় সর্বপ্রথম দেশীয় কাব্যের সৌন্দর্য তাঁহার অনবদ্য ভাষা ও অননুকরণীয় রীতিতে প্রকাশ করেন। তথাকথিত ভদ্রেতর গীত ও কাব্যের প্রতি, তিনিই বাঙালির মনোযোগ আকর্ষণ করেন। 'বাউলের গান' নামে সামান্য একখানি গীত-সংগ্রহের সমালোচনাসূত্রে তিনি তাঁহার বক্তব্য লিখিলেন।

১ বাউলের গান, ভারতী ১২৯০ পৌষ। র র অচ ২য় পৃ ১৩১।
২ আনন্দমঠ, বঙ্গদর্শন, ৭ম খণ্ড ১২৮৭ চৈত্র হইতে ৮ম খণ্ড ১২৮৮ আশ্বিন। ৯ম খণ্ড ১২৮৯ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ১২৮৯ পৌষ।
৩ বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ। ভারতী ১৩২৩ চৈত্র। সাহিত্য ১৩২৪ বৈশাখ পৃ ৭৪।

রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ যে আধুনিক বাংলাভাষায় সচরাচর যাহা-কিছু লিখিত হইতেছে তাহার মধ্যে যেন খাঁটি বৈশিষ্ট্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ; এইসব আধুনিক রচনা ইংরেজি-অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে পড়িতে দিলে উহার ভাব ও ভাষা তাহাদের বোধগম্য হইবে না, তাহার প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিবে না। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এই যে, বাঙালির ভাব ও ভাষা আয়ত্ত করাই যদি আমাদের অভিপ্রায় হয়, তবে বাঙালি যেখানে হৃদয়ের কথা বলিয়াছে সেইখানে তাহার সন্ধান করিতে হইবে। সেইজন্য তিনি লিখিলেন, "গ্রাম্যগাথা ও প্রচলিত গীতসমূহ সকলে মিলিয়া যদি সংগ্রহ করেন, তবে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বিস্তর উপকার হয়। আমরা আমাদের দেশের লোকদের ভাল করিয়া চিনিতে পারি, তাহাদের সুখ দুঃখ আশা ভরসা আমাদের নিকট নিতান্ত অপরিচিত থাকে না।" এই প্রবন্ধ রচনার কয়েক মাস পরে ভারতী পত্রিকা মারফত গ্রাম্য গীতসংগ্রহ করিবার জন্য তিনি দেশবাসীকে আহ্বান করেন।[১] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ স্থাপিত হইলে তিনি গ্রাম্য গীত ছড়া ব্রতকথা প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য কী চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা সমসাময়িক সাহিত্য-পরিষদ্ পত্রিকা ও সাধনা দেখিলেই জানা যায়। শুধু সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিলে ভুল হইবে, এই ভদ্রসমাজ-অজ্ঞাত শিক্ষিতসমাজ-অবজ্ঞাত বিরাট লোকসাহিত্যের সাহিত্যিক রসবিচার দ্বারা তিনি সাহিত্যভাণ্ডারে উহার স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন যে শিক্ষিত সমাজ ক্রমশই দেশের অন্তঃস্থল হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছেন, দেশ ক্রমশই অপরিচিত হইয়া পড়িতেছে। বৃটিশ শাসন ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলে দেশের মধ্যে শ্রেণীগত class বৈষম্য নূতনভাবে দেখা দিয়াছে। পূর্বকালে দেশের ধনী ও দরিদ্র, উচ্চ ও নীচের জ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্যে কম-বেশির মাত্রাপার্থক্য ছিল, অর্থাৎ একই বিষয়ে একজন বেশি আর-একজন কম জানিত, এক শ্রেণী একরূপ জানিত, অন্য শ্রেণী অন্যরূপ জানিত—এধরনের ব্যবধান তখন ছিল না, যাহাকে বলে conflict of ideas। ইংরেজি-জানা ও ইংরেজি-না-জানা লোকের মধ্যে জ্ঞানসমুদ্রের যে দুস্তর ব্যবধান দেখা দিয়াছে, তাহা পরিমাণগত নহে, তাহা গুণগত পার্থক্য। এই পার্থক্য বহুল পরিমাণে ধনবৈষম্য সৃষ্টির জন্য দায়ী, শ্রেণীগত বৈরীবিষের কারণও এইখানে সন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে। এই জ্ঞান বৈষম্য হইতে দেশমধ্যে যে সমাজিক অর্থনৈতিক ও অবশেষে রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তদ্‌বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বহুকাল হইতে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছেন। তিনি বারবার বলিয়াছেন দেশের লোকের অন্তরের সহিত পরিচিত হইতে না পারিলে, তাহাদের সুখদুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা উৎসব বিনোদন প্রভৃতি সহজভাবে বুঝিতে না পারিলে, দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইবে। দেশকে জানা বলিতে যে কোনো abstractionএর উদ্দেশে সাময়িক হৃদয়াবেগ প্রকাশ করা নহে এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ 'চেঁচিয়ে-বলা', 'জিহ্বা আস্ফালন', 'ন্যাশনাল ফাণ্ড' প্রভৃতি সাময়িক রচনার মধ্যে অত্যন্ত তীব্রভাবেই বলিয়াছিলেন। এইসব সাময়িক উত্তেজনার উত্তরে রচিত প্রবন্ধের কথা ছাড়িয়া দিলে, তিনি যাহা তখনও বলিয়াছিলেন এবং পরেও বলিয়াছিলেন তাহার সার মর্ম হইতেছে এই যে, দেশের সাহিত্য যাহার মধ্য দিয়া মানুষ তাহার অন্তরের বাণী বলিবার চেষ্টা করিয়াছে, সেই ভাষা ও ভাবকে বুঝিতে ও সমাদর করিতে পারিলেই দেশকে জানা হয়, দেশ কোনো প্রকার abstraction নহে। ইংরেজি শিক্ষার ফলে দেশের আর যাহাই মঙ্গল হউক না কেন, প্রধানতম অমঙ্গল হইয়াছে দেশের নাড়ীর সঙ্গে দেশের মাটির সঙ্গে বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ বা intelligentsia-র অন্তরের যোগ ছিন্ন হইয়া শ্রেণীগত সমাজ সৃষ্টি করিয়াছে। এই সময়ের কয়েকটি প্রবন্ধের মূলগত তত্ত্ব ছিল এই কথাটি।

রবীন্দ্রনাথ বাংলার দেশজ প্রাচীন ও গ্রাম্য কবিদের প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিলেন, কিন্তু বাংলার

১ ভারতী ১২৯০ বৈশাখ পৃ ৪।

তৎকালীন নবীন উদীয়মান কবিপ্রতিভাদের কাব্য প্রচেষ্টাকে যথাযথ সম্মান দান করিলেন; আধুনিক কবিদের আক্রমণ করিয়া 'ভারতী'তে 'অ' স্বাক্ষরিত দুইটি প্রবন্ধ[১] প্রকাশিত হয়; রবীন্দ্রনাথ তাহার 'প্রত্যুত্তরে'[২] নবীন লেখকদের প্রগতিপরায়ণ মনের ও মতের প্রশংসাবাদ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এখন নব্য কবিদের অন্যতম, সুতরাং সমশ্রেণী কবিদের পক্ষ সমর্থন করাকে নিজ কর্তব্য জ্ঞান করেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলিলেন যে, প্রাচীন কালের তুলনায় আধুনিক যুগের কবিদের প্রতি নিন্দাবর্ষণের কারণ কিছুই নাই। উদাহরণ স্বরূপ উভয়যুগের প্রেমবর্ণনার তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া বলিলেন, প্রেমের যে বীভৎস বর্ণনা বিদ্যাসুন্দরে খাঁটি বাঙালি কবির নিদর্শনরূপে উদ্ধৃত হয়, তাহা অপেক্ষা "আজকালকার এই প্রকাশ্য মুক্ত নির্ভীক অলঙ্কারবাহুল্যবিরহিত কালাপাহাড়ী-ভাব" বিদেশী ভাবাপন্ন হইলেও তাহা সহ্য করা যায়। এই নূতনকে সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে অপসারিত করা যাইবে না। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে সমাজজীবনে যে বিপ্লব সাধিত হইতেছে, সাহিত্যক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবীরূপে তাহার ফল দেখা দিবেই। সমাজের রীতি ও নীতি কালধর্মে পরিবর্তিত হয়, সাহিত্য সেই পরিবর্তনকে মানিয়া লয়। যখন যুগধর্ম প্রভাবে সমস্তেরই পরিবর্তন হইল, আর একমাত্র সাহিত্যের মধ্যে মানুষের মন থাকিয়া গেল প্রাচীনের নিগড়ে বাঁধা, ইহা কখনো স্বাভাবিকও নহে, সম্ভবও নহে। এই মতবাদ প্রকাশ করিবার জন্য সেযুগের তরুণ সাহিত্যিকগণ নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন, কারণ তরুণদের মনের কথা এমন সুযুক্তিপূর্ণ স্পষ্টতার সহিত বলিবার ক্ষমতা আর কাহারও ছিল না।

দেশজ গ্রাম্য কবিদের প্রশংসা করিলেন, নবীন লেখকদের সমর্থন করিলেন—ইহার দ্বারা কেহ যেন মনে না করেন রবীন্দ্রনাথ উভয় পক্ষকে তুষ্ট করিয়া স্বয়ং স্তুতিবাদ অর্জন করিতেছেন। কাহাকেও তুষ্ট করিবার অভিপ্রায় হইতে রবীন্দ্রনাথ খুব কম রচনাই লিখিয়াছেন; তিনি সাহিত্যকে বিচার করিয়াছেন রসের দিক হইতে, সৌন্দর্যের দিক হইতে; রাষ্ট্র ও সমাজকে দেখিয়াছেন মঙ্গলের দিক হইতে। কী সাহিত্যে, কী ধর্মে, কী সমাজে আতিশয্যকে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই নিন্দা করিয়াছেন, কারণ আতিশয্য সমগ্র সত্যকে কেন্দ্রচ্যুত করিয়া অসুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করে। রবীন্দ্রনাথের আর্টিস্ট মন আতিশয্য ও অত্যুক্তিকে কোনোদিন স্বীকার করিতে পারে নাই।

কিন্তু তাঁহার সাহিত্যজীবনের এই গঠনশীল যুগে লেখনী সর্বদা এই উচ্চ নীতি মানিয়া চলে নাই। বিরুদ্ধ মত খণ্ডন-সুখের মত্ততায় ও নিজমত স্থাপনের ব্যগ্রতায় তিনি যুক্তির মাত্রা সর্বদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই সময়ে প্রত্যেকটি বিষয়কে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া আলোচনা করিবার জন্য সমস্ত চিত্ত উদ্‌গ্রীব অপেক্ষায় উন্মুখ থাকিত। বলিবার ঝোঁকে সামান্য বিষয় বৃহৎ হইয়া উঠিত। এইসব রচনা সত্যকে যথাযথভাবে প্রকাশ করিতে পারে নাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথ তাহাদিগকে তাঁহার সাহিত্যসংগ্রহ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। যথাস্থানে আমরা সেই শ্রেণীর কতকগুলি প্রবন্ধের আলোচনা করিব।

অধ্যয়ন ও রচনা এবং রচনা ও অধ্যয়ন যুগপৎ চলে; বিচিত্র বিষয়ের গ্রন্থপাঠে রবীন্দ্রনাথের অসীম আনন্দ; ইংরেজি বাংলা ও নাটক উপন্যাস, সাহিত্য-সমালোচনা তো পড়েনই, ইহার সঙ্গে আছে বিজ্ঞানের গ্রন্থ। সদর স্ট্রীটের বাসায় থাকিবার সময় হাক্সলি, লক্‌ইয়ার, নিউকোম্ব প্রভৃতি তৎকালীন খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের গ্রন্থ পাঠ করেন। জীবতত্ত্ব ও জ্যোতিষ্কশাস্ত্রের গ্রন্থ বিশেষভাবে তাঁহার ভালো লাগে।[৩] ইংরেজিতে যাহা পড়েন বাংলায় তাহা লিখিতে চান,— কিন্তু পরিভাষার অভাবে বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলিতে বাধা পান পদে পদে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের

১ শ্রীঅঃ—দেশজ প্রাচীনকবি ও আধুনিক কবি। ভারতী ১২৮৯, আষাঢ়, শ্রাবণ। [অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ?]।

২ শ্রীরঃ—প্রত্যুত্তর, ভারতী ১২৮৯ ভাদ্র।

৩ জীবনস্মৃতি রচনাবলী ১৩৫০-সং পৃ ১৪৩ পাদটীকা

সহিত কথা ও আলোচনা হয়; উভয়ে দেখেন যে কোনো এক ব্যক্তির দ্বারা বিজ্ঞানের পরিভাষা গঠন করা সম্ভব নহে; যদিই বা কেহ করেন, তবে তাহা সর্ববাদী সম্মত হইবে কেন। সুতরাং কোনো সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান মারফত এই কার্য সংকলিত, সম্পাদিত ও প্রচারিত হওয়া উচিত; অথচ বাংলাদেশে তখন সেরূপ প্রতিষ্ঠান ছিল না। যাহা নাই, তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তুলিবার দিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রবল ঝোঁক। তিনি তৎক্ষণাৎ একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব খুব বিস্তৃতভাবে লিখিয়া ভারতীতে প্রকাশ করিলেন (১২৮৯ জ্যৈষ্ঠ)। এই প্রস্তাবিত সভার নাম দেওয়া হইয়াছিল 'কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন।'[১] ১২৮৯ সাল শ্রাবণ মাসের ২রা তারিখে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এই সভার প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সভাপতি হন; সহকারী সভাপতিদের মধ্যে নাম পাই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন কৃষ্ণবিহারী সেন ও রবীন্দ্রনাথ। এই অধিবেশনে সভার নাম হয় 'সারস্বত সমাজ।'[২] 'বাংলার সাহিত্যিকগণকে একত্র করিয়া একটি পরিষৎ স্থাপন করিবার কল্পনা তাঁহাদের মনে উদিত হইয়াছিল; "বাংলার পরিভাষা বাঁধিয়া দেওয়া ও সাধারণত সর্বপ্রকার উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টি সাধন এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। বর্তমান সাহিত্য পরিষদ্ যে উদ্দেশ্য লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে তাহার সঙ্গে এই সংকলিত সভার প্রায় কোনো অনৈক্য ছিল না।" (জীস্মৃ) সারস্বত সম্মিলনের পরিকল্পনা লইয়া বোধ হয় উভয় ভ্রাতা কলিকাতার বুধমণ্ডলীর সহিত ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করিয়া নানারূপ আলোচনা করিয়াছিলেন; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি নাকি বলিয়াছিলেন, হোমরা চোমরা লোকদের লইয়ো না— তাহা হইলে সব মাটি হইয়া যাইবে। হোমরাচোমরা অর্থে বিদ্যাসাগর বোধ হয় বঙ্কিমপ্রমুখ ব্যক্তিদের সম্বন্ধেই প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে' (১২৭৯ আষাঢ়) 'বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে'র এক পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছিল; পরিকল্পনাটির উদ্‌ভাবক ছিলেন বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ বীম্‌স্ সাহেব কিন্তু তাহা কার্যকরী হয় নাই; বঙ্কিম উৎসাহদান করেন বটে, কিন্তু কল্পনার কোনো রূপ দিতে পারেন নাই। পাঁচজনকে লইয়া কাজ করিবার শক্তি ও সময় বঙ্কিমের ছিল না জানিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্বাহ্নে জ্যোতিরিন্দ্রনাথদের সতর্ক করিয়া দেন। তিনি যুবকদিগকেই উহা গড়িয়া তুলিবার জন্য উৎসাহিত করেন। কিন্তু তাহা হইল না, হোমরা-চোমরারা নাম দিলেন, কাজে ভিড়িলেন না; সভার একমাত্র কর্মী থাকিলেন সভাপতি রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তাঁহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন, তিনি একাই একটা সভা। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া আমি ধন্য হইয়াছিলাম।" তাঁহার স্মৃতি "আমার মনে উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে।"

বোধ হয় বৈশাখ মাসটা (১২৮৯) এই ঘোরাঘুরি ব্যাপারেই কাটে; কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যে মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা তাঁহারা অর্জন করিয়াছিলেন এবং সেই অভিজ্ঞতা হইতে লিখিলেন 'বিজ্ঞতা'[৩] নামে প্রবন্ধ। মৃদু মধুর কশাঘাতে সমাজের বিজ্ঞ জনগণকে তিনি এই প্রবন্ধে সমাদৃত করিলেন। বিজ্ঞেরা সিধা জিনিসকে বাঁকা করিয়া দেখেন ও অন্যকে দেখান, সরল উক্তিকে অভিসন্ধি ও মতলবের ধাপ্পাবাজি বলিয়া সন্দেহ করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মানুষের শাশ্বত ধর্মপ্রয়াসকে শ্রদ্ধা করেন, তাই তিনি বলিলেন, "যে বিজ্ঞ সদনুষ্ঠানকে উপহাস করে, তাহা অপেক্ষা যে সরল ব্যক্তি সদনুষ্ঠানে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছে, সে মহৎ।"

যাহাই হউক ইঁহাদের কল্পিত 'সারস্বত সমাজ' অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল, কিন্তু বাঙালির জাতীয় জীবনে এই স্পন্দন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই; অল্প কয়েক বৎসর পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হইল।

১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর: কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন, ভারতী ১২৮৯ জ্যৈষ্ঠ। ২ নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; রবীন্দ্রনাথ ও সারস্বত সমাজ, বিশ্বভারতী পত্রিকা ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা ১৩৫০ পৃ ২১৬-২২৪। জীবনস্মৃতি রচনাবলী ১৩৫০-সংস্করণ পৃ ২০৭-২০৮।

৩ ভারতী ১২৮৯ জ্যৈষ্ঠ পৃ ৮৪-৮৯।

প্রভাতসংগীত

'বৌঠাকুরানীর হাট'-এর শেষ কিস্তি ভারতীতে প্রকাশিত হইল ১২৮৯ এর আশ্বিন মাসে। রবীন্দ্রনাথ তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথদের সহিত জাদুঘরের নিকট দশনম্বর সদর স্ট্রীটের এক বাসায় থাকেন। সেইখানে একদিন এক অভূতপূর্ব আনন্দ-আবেগ কবির জীবনে নূতন সুর আনিয়াছিল; সেই অদ্ভুত অনুভূতি সম্বন্ধে জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন, "সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রী-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি[1] নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি হইল আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না।" "শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম",— এইটিই হইতেছে যেন সেই অনুভূতির মর্মকথা। এই মনোভাব হইতেই 'প্রভাত উৎসব' রচিত।[2] 'মানুষের ধর্মে' কবি লিখিয়াছেন যে "এই অবস্থায় চারদিন ছিলুম। চারদিন জগৎকে সত্যভাবে দেখেছি (পৃ ১০৪)"। 'প্রভাত উৎসব' কবিতাটি 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র পরিপূরক বলা যাইতে পারে; এই দুইটি কবিতাই যথার্থ প্রভাতসংগীতের মূল কবিতা। জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিতে লিখিয়াছিলেন, "একটি অপূর্ব অদ্ভুত হৃদয়স্ফূর্তির দিনে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' লিখিয়াছিলাম, কিন্তু সেদিন কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে।"[3]

দশ বৎসর পরে বোলপুর হইতে লিখিত একখানি পত্রে বলিতেছেন,[4] "'জগতে কেহ নাই, সবাই প্রাণে মোর'— ও একটা বয়সের একটা বিশেষ অবস্থা। যখন হৃদয়টা সব-প্রথম জাগ্রত হয়ে দুই বাহু বাড়িয়ে দেয় তখন মনে করে, সে যেন সমস্ত জগৎটাকে চায়। যেমন নব-দন্তোদ্গতা [কন্যা] রেণুকা মনে করচেন, সমস্ত বিশ্বসংসার তিনি গালে দিতে পারেন—ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারা যায় মনটা যথার্থ কি চায় এবং কি চায় না। তখন সেই পরিব্যাপ্ত হৃদয়বাষ্প সঙ্কীর্ণ সীমা অবলম্বন করে, জ্বলতে এবং জ্বালাতে আরম্ভ করে। একেবারে সমস্ত জগৎটা দাবী করে বস্‌লে কিছুই পাওয়া যায় না— অবশেষে একটা কোন কিছুর ভিতরে সমস্ত প্রাণমন দিয়ে নিবিষ্ট হতে পারলে তবেই অসীমের মধ্যে প্রবেশ লাভ করা যায়। প্রভাতসংগীতে আমার অন্তর্প্রকৃতির প্রথম বহির্মুখী উচ্ছ্বাস, সেইজন্যে ওটাতে আর কিছুমাত্র বাচবিচার বাধাব্যবধান নেই। এখনো আমি সমস্ত পৃথিবীকে একরকম ভালোবাসি— কিন্তু সে এরকম উদ্দামভাবে নয়— আমার ভালোবাসার জ্যোতিষ্কলোক থেকে একটা দীপ্তি প্রতিফলিত হয়ে সমস্ত মানবের উপর পড়ে— সেই দীপ্তিতে এক এক সময় পৃথিবীটা ভারি সুন্দর এবং ভারি আপনার বোধ হয়।"

প্রভাতসংগীতের এই দুই কবিতার মধ্যে ধর্মের যে নূতন সংজ্ঞা পাই, তাহাকেই উত্তরকালে তিনি 'মানুষের

১ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, প্রথম প্রকাশ, ভারতী ১২৮৯, অগ্রহায়ণ। এই মাসেই ভারতীতে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী রচিত 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি শুনিয়া অক্ষয়চন্দ্রের মনে যে ভাবোদয় হয়, এই কবিতাটি তাহারই প্রকাশ।

২ প্রভাত উৎসব, ভারতী ১২৮৯ পৌষ।

৩ জীবনস্মৃতি ১৩৫০ সং পৃ ১৩৬ পাদটীকা।

৪ ছিন্নপত্র। বোলপুর, মঙ্গলবার, ৫ই জ্যৈষ্ঠ [১২৯৯] বিশ্বভারতী পত্রিকা তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৫১ পৃ ৭৬।

ধর্ম"[১] আখ্যা দান করেন। পৃথিবীর মধ্যে মানুষই জীবশ্রেষ্ঠ, মানুষই বিশ্বের কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত; তাই সেদিনকার অনুভূতি মানুষকে আশ্রয় করিয়া সার্থক হইয়াছিল; সে-মানুষ নাম বর্ণ গোত্রাদির দ্বারা, বহুবিচিত্র সংস্কারদ্বারা আবৃত— সহজ মানুষকে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। বহু বৎসর পরে 'মানব সত্য'[২] নামে যে প্রবন্ধটি লেখেন, তাহাতে 'প্রভাতসংগীতে'র কয়েকটি কবিতাকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের ধর্মের ব্যাখ্যা করেন।

শরৎকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁহার পত্নী দার্জিলিং ভ্রমণে যান; রবীন্দ্রনাথ ভাবিলেন কলিকাতার ভিড়ের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির যে সৌন্দর্য দেখিয়াছেন, হিমালয়ের উদার শৈলশিখরে তাহা আরো ভালো করিয়া দেখিতে পাইবেন। তাঁহাদের সহিত দার্জিলিং গেলেন। দেবদারুবনে ঘুরিলেন, ঝরনার ধারে বসিলেন, তাহার জলে স্নান করিলেন, কাঞ্চনশৃঙ্গার মেঘমুক্ত মহিমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন— কিন্তু যেখানে পাওয়া সুসাধ্য মনে করিয়াছিলেন সেইখানেই কিছু খুঁজিয়া পাইলেন না। 'প্রভাতসংগীতে'র গান থামিয়া গেল; শুধু তাহার দূর প্রতিধ্বনিস্বরূপ 'প্রতিধ্বনি' নামে একটি কবিতা তথায় লিখিলেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন তাঁহার যেসব কবিতার অর্থ লইয়া সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ ও বিরোধ হয়, এই কবিতাটি তাহাদের অন্যতম। সেইজন্য জীবনস্মৃতিতে তিনি ইহার অর্থ বহুবিস্তারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "আসল কথা হৃদয়ের মধ্যে যে-একটা ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল সে নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে। যাহার জন্য ব্যাকুলতা তাহার আর-কোনো নাম খুঁজিয়া না পাইয়া তাহাকে বলিয়াছে প্রতিধ্বনি ··।" ইহাকেই কি কবি পরযুগে মানসসুন্দরী, জীবনদেবতা বলিয়া অন্বেষণ করিয়াছেন।

'প্রভাতসংগীতে'র কবিতায় তাঁহার কাব্যজীবন যেন প্রথম সমে আসিয়া দাঁড়াইল। তরুণ কবি নিজের কাব্যের মধ্যে নিজ কবিজীবনের প্রশ্ন ও তাহার যে উত্তর পাইয়াছিলেন তাহা 'পুনর্মিলন' কবিতার মধ্যে ব্যক্ত করেন। এই কবিতায় কবি তাঁহার স্বল্পকালের কাব্যজীবনের একটি সুষ্ঠু বিশ্লেষণ করিয়াছেন— শৈশবে প্রকৃতির সহিত সহজ মিলন, যৌবনাগমে প্রকৃতির সহিত বিচ্ছেদ এবং পূর্ণযৌবনে তাহার সহিত পুনর্মিলন। 'শৈশবসংগীত' ও বাল্যকাল হইতে আঠারো বৎসর পর্যন্ত রচিত কাব্যসমূহের মধ্যে প্রকৃতির সহিত এই সহজ মিলনের অবস্থা হইতেছে কাব্যসৃষ্টির আদি যুগ। দ্বিতীয় অবস্থা হইতেছে 'ভগ্নহৃদয়' ও 'সন্ধ্যাসংগীতে'র যুগ, যখন "রুগ্ন হৃদয়টার আবদারে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের···সামঞ্জস্য ভাঙিয়া গেল"; ইহা হইতেছে কাব্যশ্রীর সহিত বিচ্ছেদের যুগ। অবশেষে একদিন রুদ্ধ দ্বার কোন্ ধাক্কায় হঠাৎ খুলিয়া গেল, তখন যাহাকে হারাইয়াছিলেন সেই মানসসুন্দরীকে পাইলেন; শুধু পাইলেন তাহা নহে, বিচ্ছেদের ব্যবধানের ভিতর দিয়া তাহার পূর্ণতর পরিচয় লাভ করিলেন। তাহাই হইল 'প্রভাতসংগীত'।

পুনর্মিলন কবিতাটিতে এই স্তরত্রয়ের বিশ্লেষণ পাই —

সেই—সেই ছেলেবেলা আনন্দে করেছি খেলা,
প্রকৃতি গো— জননি গো— কেবলি তোমারি কোলে!
তারপরে কি যে হল—কোথা যে গেলেম চলে!···
হৃদয় নামে সে এক বিশাল অরণ্য আছে
দিশে দিশে নাহিক কিনারা,

তারি মাঝে হনু পথহারা;
সে-বন আঁধারে ঢাকা, গাছের জটিল শাখা
সহস্র স্নেহের বাহু দিয়ে
আঁধার পালিছে বুকে নিয়ে;—···
কাটালেম কত শত দিন, ম্রিয়মাণ সুখশান্তিহীন।

ইহার পর হৃদয়-অরণ্য হইতে হইল নিষ্ক্রমণ—

"আজিকে একটি পাখী পথ দেখাইয়া মোরে আনিল এ অরণ্য বাহিরে, আনন্দের সমুদ্রের তীরে।"

১ মানুষের ধর্ম (Kamala Lectures) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৩।

২ মানবসত্য, প্রবাসী ১৩৪০ বৈশাখ পৃ ১-৫। ঐ জ্যৈষ্ঠ পৃ ২৬০-৬১। দ্র. মানুষের ধর্ম, পরিশিষ্ট।

জীবনস্মৃতিতে লিখিতেছেন, "যাহাকে হারাইয়াছিলাম, তাহাকে পাইলাম। আমার শিশুকালের বিশ্বকে 'প্রভাত-সংগীতে' যখন আবার পাইলাম তখন তাহাকে অনেক বেশি পাওয়া গেল। এমনি করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে সহজ-মিলন, বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলনে জীবনের প্রথম অধ্যায়ের একটা পালা শেষ হইয়া গেল।"

মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থে (১৩১০) প্রভাতসংগীতের সুরটির নামকরণ হইয়াছে 'নিষ্ক্রমণ'[১]; রবীন্দ্রনাথ কাব্যখণ্ডের ভূমিকার জন্য যে কবিতাটি (নৈবেদ্য ১৫) লিখিয়া দেন তাহার মধ্যেও ইহারই মর্মকথা আছে—

আঁধার আসিতে রজনীর দীপ
জ্বেলেছিনু যতগুলি—
নিবাও, রে মন, আজি সে নিবাও
সকল দুয়ার খুলি'!
আজি মোর ঘরে জানি না কখন
প্রভাত করেছে রবির কিরণ,
মাটির প্রদীপে নাই প্রয়োজন,
ধুলায় হোক সে ধূলি!…

শুন আজি প্রাতে সকল আকাশ
সকল আলোক সকল বাতাস
তোমার হইয়া গাহে সংগীত
বিরাট কণ্ঠ তুলি!
নিবাও নিবাও রজনীর দীপ
সকল দুয়ার খুলি।

রবীন্দ্রনাথ প্রভাতসংগীত সম্বন্ধে নানা বয়সে নানাভাবে নিজ মত প্রকাশ করিয়াছেন। জীবনস্মৃতি লিখিবার সময়ে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন। 'মানুষের ধর্ম' নামক বক্তৃতাগুচ্ছের পরিশিষ্টে মানবসত্য শীর্ষক প্রবন্ধে ইহার কবিতার ব্যাখ্যা আছে; রবীন্দ্ররচনাবলীর প্রথম খণ্ডে প্রভাতসংগীতের ভূমিকাস্বরূপ 'কবির ভণিতা' আছে; সেগুলি বাহুল্যজ্ঞানে উদ্ধৃত করিলাম না।

রবীন্দ্রনাথ কোনো ভাবনা তাহা যত সুন্দর, যত মহানই হউক,—কাহাকেও মনের কোণে স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধিতে দেন না। তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব বিচিত্র রসধারায় পুষ্ট। ক্ষীণ অস্পষ্ট শিশু ভাবনাগুলি ধীরে ধীরে রূপগ্রহণ করে, গতি ও শক্তি অর্জন করে, মনোরাজ্যে বৃহৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে,—সাহিত্যে নূতন পথ বাহিয়া সৃষ্টিধারা চলিতে থাকে। তাই প্রভাতসংগীতের আনন্দময় ভাবলোক হইতেও মুক্তির আকূতি শোনা গেল। কারণ সন্ধ্যাসংগীতই বলো, আর প্রভাত-সংগীতই বলো— উভয়ের মূল-উৎস হইতেছে হৃদয়, সে-হৃদয় কখনো দুঃখে ম্রিয়মাণ, কখনো বা আনন্দসুখে মত্ত। উভয় আন্দোলনেই হৃদয়ের চরম আতিশয্য প্রকাশ পাইয়াছে; তাই প্রভাতসংগীতের শেষে বাহিরে চলিবার জন্য এত উদ্‌বেগ:— "জগতস্রোতে ভেসে চল', যে যেথা আছ ভাই! চলেছে যেথা রবিশশী চল রে সেথা যাই। কিন্তু কবির চলিবার ইচ্ছা নাই; 'মনেতে সাধ যে দিকে চাই কেবলি চেয়ে রব। দেখিব শুধু দেখিব শুধু কথাটি নাহি কব।'[২] প্রভাতসংগীত 'সমাপন'[৩] করিলেন— "আজ আমি কথা কহিব না। আর আমি গান গাহিব না" বলিয়া। এবার তিনি দেখিবেন, কেবল দেখিয়া চাহিয়া আনন্দে নিমগ্ন থাকিবেন। সেই আনন্দআবেগে 'সাধ'[৪] হইতেছে—

আঁধার কোণে থাকিস তোরা জানিস কি রে কত সে সুখ, আকাশ পানে চাহিলে পরে আকাশ পানে তুলিলে মুখ।

নিজ হৃদয়ের দুঃখ সুখের উদ্‌বেগ-উচ্ছ্বাস হইতে মুক্তি পাইয়া বাহিরে মুখ তুলিতেই পৃথিবীর বিচিত্র ছবি তাঁহার মুগ্ধনেত্রে উদ্‌ভাসিয়া উঠিল, তখনই তাঁহার সাহিত্য মধ্যে নূতন রূপ ও নূতন সুরের উৎস দেখা দিল 'ছবি ও গানে'র মধ্যে।

১ 'নিষ্ক্রমণ' কাব্যখণ্ডে নিম্নলিখিত কবিতাগুলি আছে:—নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। প্রভাত-উৎসব। অনন্তজীবন। পুনর্মিলন। স্রোত। প্রাতধ্বনি। অধিকাংশই সম্পাদিত ও সংক্ষিপ্ত কৃত।

২ চেয়ে থাকা; প্রভাত সংগীত। র-র ১ম পৃ ৯৩।

৩ প্রভাতসংগীত, র-র ১ম পৃ ১০১।

৪ সাধ, ভারতী ১২৯০ বৈশাখ। প্রভাতসংগীত, র-র ১ম পৃ ৯৮।

আমরা এযাবতকাল রবীন্দ্রনাথের তিনটি কবিতার বই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি— শৈশবসংগীত, সন্ধ্যাসংগীত ও প্রভাতসংগীত। সবগুলিকেই 'সংগীত' আখ্যা দান করিবার বিশেষ কোনো তাৎপর্য আছে কিনা সন্ধান করা প্রয়োজন। সংগীত অর্থে সামান্যত গানই বুঝায়; কিন্তু আলোচ্য কাব্যগুলির মধ্যে কণ্ঠগেয় গীত নাই। অথচ তাহাদিগকে সংগীত বলা হইয়াছে। ইংরেজিতে যাহাকে লিরিক্ (lyria) বলে তাহার অনুবাদ করা হয় গীতিকাব্য; লিরিক শব্দটির মূল হইতেছে গ্রীক্; lyra বা একশ্রেণীর বীণা যন্ত্র সাহায্যে গ্রীক্‌রা সুর করিয়া ছন্দোময় পদ আবৃত্তি করিত বলিয়া ক্রমে অন্তর্বিষয়ী কবিতামাত্রকে লিরিক নামে অভিহিত করা হয়; সেইজন্যই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ লিরিকের অনুবাদ 'সংগীত দিয়া' করিলেন।

দার্জিলিং হইতে ফিরিবার পর তাঁহারা চৌদ্দ নম্বর সার্কুলার রোডে বাসাবাটিতে আছেন। সাহিত্য চর্চার জন্য 'সমালোচনী সভা' স্থাপন করিয়াছেন,— বিহারীলাল, প্রিয়নাথ প্রভৃতি অনেকে আসেন। পৌষ মাসের শেষাশেষি (১৮৮৩ জানু) সত্যেন্দ্রনাথ ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিলেন; বাড়িতে পার্টি, গানের মজলিস প্রায়ই চলিতেছে; মহা-আনন্দে আছেন সকলেই। এই সময়ে আর্ট্ ফর্ আর্ট্স্ সেক্ কথাটা বোধ হয় কবি জানিতে পারেন গোতিএর-রচিত Madmoiselle de Maupin নামক উপন্যাস হইতে; প্রিয়নাথ সেন রবীন্দ্রনাথকে বইখানি পড়িতে দেন। এই মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অবসর পুনরায় হইবে।

সুরহীন সংগীত বা লিরিক কবিতা লিখিলেও যথার্থ সুরসংগীতের সাধনা চলিতেছে যুগপৎ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুরসৃষ্টির সাধনায় ভাষা দান করিয়া সংগীতের সৃষ্টিকার্য কিভাবে শুরু হইয়াছিল, বাল্মীকিপ্রতিভার জন্ম-ইতিহাস আলোচনায় তাহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। গত দুই বৎসর বাল্মীকিপ্রতিভা কয়েকবারই বাড়ির ছেলেমেয়েদের দ্বারা অভিনীত হইয়াছিল। এবারও বিদ্বজ্জনসমাগম সভার বার্ষিক অধিবেশনে ঐ শ্রেণীর একটা গীতনাট্য অভিনয়ের কথা উঠিল; রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকিপ্রতিভার নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া 'কালমৃগয়া'[1] নামে নাটিকা রচনা করিলেন। রামায়ণে বর্ণিত দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধু বধের আখ্যান হইতেছে নাট্যের বিষয়। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তেতলার ছাদে স্টেজ বাঁধিয়া অভিনয় হইল।[2] রবীন্দ্রনাথ অন্ধমুনি এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দশরথের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন;

কালমৃগয়া এখন অচলিত গ্রন্থ; ১২৯২ সালে বাল্মীকিপ্রতিভার নূতন সংস্করণ তৈয়ারি করিবার সময়ে কালমৃগয়ার বহু গান ও দৃশ্য সুনিপুণভাবে বাল্মীকিপ্রতিভার সহিত মিশাইয়া দিয়া উহাকে পূর্ব হইতে বহুগুণে সুন্দর করিয়াছিলেন। ক্রিটিক রবীন্দ্রনাথেরই জয় হইয়াছিল, কিন্তু আর্টিস্ট রবীন্দ্রনাথেরও পরাজয় হয় নাই। দুইটি অসম্পূর্ণ নাটক মিলাইয়া একটি অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত নাটক তিনি রচনা করিলেন।

বাল্মীকিপ্রতিভার ন্যায়, কালমৃগয়ারও কয়েকটি গানের সুর সম্পূর্ণ বিলাতী সুরে ঢালা। বিলাতে থাকিতে তিনি যে কেবল বিলাতী সংগীত ও নৃত্যকলা শিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা নহে; এদেশে আসিয়াও সর্বোত্তম পাশ্চাত্য

১ কালমৃগয়া (গীতিনাট্য) অগ্রহায়ণ ১২৮৯ পৃ ৩৮। কালমৃগয়ার স্বরলিপি। বালক ১২৯২ ভাদ্র, আ-কা. পৌষ সংখ্যা। প্রথম তিনটি দৃশ্যের স্বরলিপি প্রতিভা দেবী কৃত। কালমৃগয়া পৃথকভাবে মুদ্রিত পাওয়া যায় না: রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে (পৃ ৩১৮-৩৮) পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

২ ১২৮৯ পৌষ ৯। ১৮৮৬ ডিসেম্বর ২৩ শনিবার। A Conversazione of Bengali authors was held at the house of Baboo Debendranath Tagore, at No 6 Dwarkanath Tagore's Street, Jorasanko on Saturday evening last. There was a large gathering of Bengali authors, editors and other gentlemen. A short melodrama named Kalamrigaya or the Fatal Hunt, was written for the occasion by Baboo Rabindranath Tagore well-known to the literary world. The drama was based upon a story from the Ramayan. The dramatis personae were represented by the members of the Tagore family, both male and female. All the parts were well sustained.—The Statesman 27 Dec. 1882 oted on 27 Dec, 1932.

সংগীত শ্রবণের জন্য তাঁহার উৎসাহ ম্লান হয় নাই। কলিকাতায় কোনো য়ুরোপীয় বিখ্যাত সংগীতাচার্য বা বাদক আসিলে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই তাঁহাদের গানবাজনা শুনিতে যাইতেন।[১]

সাধারণ গান ছাড়া ব্রহ্মসংগীত রচনারও প্রয়োজন হইল; সম্মুখে মাঘোৎসব। কালমৃগয়ার 'যাওরে অনন্তধামে মোহ মায়া পাসরি' গানটি উৎসবে ব্রহ্মসংগীতরূপে গীত হইল, এছাড়াও কয়েকটি নূতন গান রচনা করিয়া দেন।[২]

প্রকৃতির প্রতিশোধ

গ্রীষ্মকালে কিছুদিনের জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথদের সহিত রবীন্দ্রনাথ কারোয়ারে সমুদ্রতীরে আশ্রয় লইয়াছিলেন; সত্যেন্দ্রনাথ তখন সেখানকার জজ (১৮৮১ মে ২৯—১৮৮৪ জানুয়ারি)। কারোয়ার বোম্বাই প্রেসিডেন্সির দক্ষিণাংশে স্থিত, কর্ণাটের প্রধান শহর। জীবনস্মৃতিতে স্থানটি সম্বন্ধে আছে, "এই ক্ষুদ্র শৈলমালাবেষ্টিত সমুদ্রের বন্দরটি এমন নিভৃত এমন প্রচ্ছন্ন যে, নগর এখানে নাগরীমূর্তি প্রকাশ করিতে পারে নাই। অর্ধচন্দ্রাকার বেলাভূমি অকূল নীলাম্বুরাশির অভিমুখে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দিয়াছে— সে যেন অনন্তকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিবার একটি মূর্তিমতী ব্যাকুলতা। প্রশস্ত বালুতটের প্রান্তে বড়ো বড়ো ঝাউগাছের অরণ্য। এই অরণ্যের এক সীমায় কালানদী নামে এক ক্ষুদ্র নদী তাহার দুই গিরিবন্ধুর উপকূলরেখার মাঝখান দিয়া সমুদ্রে আসিয়া মিশিয়াছে।" জজসাহেবের বাড়ি ব্রহ্মদেশ হইতে আনিত কাষ্ঠ দিয়া নির্মিত, সুবৃহৎ না হইলেও সুন্দর; সমুদ্রতীরে তাহার ভিত্তিভূমি, এত কাছে যে বর্ষার সময় সমুদ্রের ঢেউ বাংলোর সীমানায় আসিয়া তর্জন গর্জন করিত।[৩]

কারোয়ারের প্রাকৃতিক দৃশ্য রবীন্দ্রনাথের মনকে যেমন নানা দিক হইতে স্পর্শ করিতেছিল, পারিবারিক মিলনোৎসবও মনকে তেমনি আনন্দে পূর্ণ করিয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কাদম্বরী দেবী আছেন; মেজোবৌঠান, সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবীকে[৪] লইয়া গ্রীষ্মের ছুটিতে কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন; সুতরাং আমোদ আহ্লাদ, আনন্দ কলহাস্যের অভাব নাই। তাহারই একটি চিত্র কবি জীবনস্মৃতিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যাহার প্রেরণায় 'পূর্ণিমায়'[৫] কবিতাটি রচিত হয়।

যাই যাই ডুবে যাই—আরো আরো ডুবে যাই, বিহ্বল অবশ অচেতন।
কোন্ খানে, কোন্ দূরে, নিশীথের কোন্ মাঝে কোথা হয়ে যাই নিমগন!

মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থে' এই কবিতাটি পরিত্যক্ত হয়, জীবনস্মৃতিতে কবি উহা উদ্ধৃত করেন। কাব্যরসের দিক হইতে উহা কেন শ্রেষ্ঠ কবিতা হইতে পারে না তাহা সমালোচক-রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

কারোয়ার বাসপর্বটা কবির কাব্যজীবনে সার্থক হইয়াছিল,— কবিতা, নাটক, গানে পূর্ণ। গদ্যরচনাও নিতান্ত

১ প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি পৃ ২৭৪। ১৮৮৫ জানুয়ারি ২১ বিখ্যাত বেহালাবাদক রেমিনির বাজনা শুনিতে যান।

২ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮০৪ শকাব্দ [১২৮৯] ফাল্গুন পৃ ২০৫-৬। ১ বড় আশা করে এসেছি। গী-বি (১ম সং) পৃ ১২৯। ২ আজি শুভদিনে পিতার ভবনে। ঐ পৃ ১২৯। ৩ দেখ চেয়ে দেখ তোরা জগতের উৎসব। ঐ নাই। ৪ কি করিলি মোহের ছলনে। ঐ পৃ ১৩৩। গীতবিতান (২য় সং)— কোনো গান নাই।

৩ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বোম্বাই প্রবাস পৃ ১১৫।

৪ প্রভাতসংগীত প্রকাশিত হয় (১৮৮৩ মে ১১)। 'শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রাণাধিকাসু'কে উপহার দেন। ইন্দিরা দেবীর বয়স তখন এগারো বৎসর মাত্র।

৫ পূর্ণিমায়, ভারতী ১২৯০ পৌষ। ছবি ও গান। র-র ১ম পৃ ১৪৮।

কম নহে ; তবে সেগুলি ব্যঙ্গ, শ্লেষে কণ্টকিত। কারোয়ার বাসকালে 'নিশীথ চেতনা'[১] 'নিশীথ জগৎ'[২] ও 'যোগী'[৩] কবিতা কয়টি লিখিত হয় বলিয়া আমাদের মনে হয় ; 'পূর্ণিমায়' কবিতার সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে ; 'ছবি ও গানে'র অন্য কবিতার সহিত সম্বন্ধ ক্ষীণ। কিন্তু কারোয়ার বাসকালে তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা হইতেছে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'।

প্রকৃতির প্রতিশোধ রবীন্দ্রনাথের "হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। এই বইটি কাব্যে এবং নাট্যে মিলিত।" এই কাব্যনাট্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বহুবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন ; সেসব কথা বিচার করিবার পূর্বে নাটিকাটির গল্পাংশ সংক্ষেপে বিবৃত করা প্রয়োজন। প্রকৃতির প্রতিশোধের গল্পাংশ অতি সামান্য।

সন্ন্যাসী অন্ধকার গুহাবাসী। সর্ব ইন্দ্রিয় বিজয়ী, মহাজ্ঞানী, সর্বভেদাভেদ চূর্ণ করিয়া নিষ্কাম। সমস্ত স্নেহবন্ধন মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে প্রয়াসী।

> বসে বসে চন্দ্র সূর্য দিয়েছি নিবায়ে
> একে একে ভাঙিয়াছি বিশ্বের সীমানা,
> দৃশ্য শব্দ স্বাদ গন্ধ গিয়েছে ছুটিয়া,
> গেছে ভেঙে আশা ভয় মায়ার কুহক।…
>
> ছায়াহীন নিষ্কলঙ্ক অনন্ত পুরিয়া
> যে আনন্দে মহাদেব করেন বিরাজ,
> পেয়েছি পেয়েছি সেই আনন্দ-আভাস।[৪]

তপস্যার বহুকাল পরে সন্ন্যাসী গুহা ত্যাগ করিয়া লোকালয়ে প্রবেশ করিয়া আজ অত্যন্ত অসোয়াস্তিঃবোধ করিতেছে।

> আলোক তো কারাগার, নিষ্ঠুর কঠিন বস্তু দিয়ে ঘিরে রাখে দৃষ্টির প্রসর।

সন্ন্যাসী অন্ধকার গুহায় বহুবর্ষ কাটাইয়াছে, সেই অন্ধগুহাই ছিল তাহার কাছে সত্য।

> অন্ধকার স্বাধীনতা, শান্তি অন্ধকার,
> অন্ধকার মানসের বিচরণ-ভূমি,
> অনন্তের প্রতিরূপ, বিশ্রামের ঠাঁই।
>
> এক মুষ্টি অন্ধকারে সৃষ্টি ঢেকে ফেলে,
> জগতের আদি অন্ত লুপ্ত হয়ে যায়।
> স্বাধীন অনন্ত প্রাণ নিমেষের মাঝে
> বিশ্বের বাহিরে গিয়ে ফেলে রে নিশ্বাস।

জনপথ দিয়া নানা লোক নানা কথা, নানা সমস্যার আলোচনা করিয়া চলিয়াছে ; সন্ন্যাসী দেখে 'বসে বসে সংসারের খেলা।' তাহার কাছে এসব অত্যন্ত অদ্ভুত চঞ্চলতা বলিয়া মনে হয়।

অপরাহ্ণে রাজপথে অস্পৃশ্য রঘুর কন্যাকে দেখা গেলে চারিদিক হইতে 'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওরে— অনাচারী রঘু— তাহারি দুহিতা ও যে!"—রব উঠিল। সকলের দ্বারা লাঞ্ছিতা হইয়া বালিকা সন্ন্যাসীর কাছে আশ্রয় লইল।

পথপার্শ্বে ভগ্নকুটিরে বালিকা থাকে। সন্ন্যাসী সেখানে গেল। বালিকাকে গভীর তত্ত্বকথা বুঝায়।

> সুখ দুঃখ সে তো বাছা জগতের পীড়া!
> জগৎ জীবন্ত মৃত্যু— অনন্ত যন্ত্রণা ;
>
> মরণ মরিতে চায় মরিছে না তবু
> চিরদিন মৃত্যুরূপে রয়েছে বাঁচিয়া।

বালিকা তত্ত্বকথা শুনিয়া বলে, "কী কথা বলিছ পিতা ভয় হয় শুনে"। সন্ন্যাসী সংসারী লোকেদের চপলতা লঘুতা দেখিয়া বিরক্ত ; সে নিজ গুহায় ফিরিয়া গেল। বালিকা সন্ন্যাসীকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করে, অনাথিনী তাহার স্নেহের প্রার্থী। সন্ন্যাসী হাসিয়া স্বগত বলে— "নিষ্কলঙ্ক এহৃদয় স্নেহরেখাহীন।" এই ক্ষুদ্র বালিকার স্নেহ তাহাকে স্পর্শ করিবামাত্র সে চঞ্চল হইয়া উঠে। বালিকা তাহাকে যে সুন্দর লতাগাছটি দেখাইতেছিল হঠাৎ ক্রোধভরে তাহাকে দলিয়া নষ্ট করিয়া দেয়। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী তখনি বুঝিল সে অন্যায় করিয়াছে।

১ ভারতী ১২৯০ আষাঢ়, র-র ১ম পৃ ১৫৮। ২ ঐ শ্রাবণ, ঐ পৃ ১৫২। ৩ ঐ আশ্বিন, ঐ পৃ ১২৩। ৪ র-র ১ম পৃ ১৬৪।

ক্ষুদ্র রোষ, অগ্নিজিহ্ব নরকের কীট !··· প্রাণ পেয়ে নাচিতেছে কঙ্কালের নাচ
এতদিন অনাহারে এখনো মরেনি।··· কেমনে নিশ্চিন্ত হয়ে রহি আমি আর !
হৃদয়-শ্মশান মাঝে মৃত প্রাণী যত

সন্ন্যাসী গুহা ছাড়িয়া পর্বতশিখরে চলিল; পথে দুইজন স্ত্রীলোক গান করিতেছে; সন্ন্যাসী শুনিয়া বলে "জগতেরে কেন আজ মনোহর হেরি"। গুহাদ্বারে ফিরিয়া সন্ন্যাসী দেখে বালিকা তাহারই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া। বালিকা গান গায়, সন্ন্যাসী ভাবে— "এ কী রে চলেছি কোথা,···এসেছি কোথায়, সহসা চরণে কোথা লাগিবে আঘাত···ওরে কোন অতলেতে যেতেছি তলায়ে···বিনাশের মাঝখানে উঠিবি জাগিয়া।" এইরূপে বালিকার স্নেহপাশ তাহাকে জড়াইতে থাকিলে একদিন সবলে সে পাশ ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া পড়িল;

চারিদিকে জড়াইছে অশ্রুর বাঁধন. ছিঁড়ে ফেল্—ভেঙে ফেল্ চরণের বাধা—
প্রতিদিন কমিতেছে চরণের বল।··· হেতা হতে চল ছুটে আর দেরি নয়।

সন্ন্যাসী দূরে চলিয়া গেল। চক্ষু মুদিয়া বলিতেছে—

হৃদয় রে শান্ত হও, যাক সব দূরে। এস এস অন্ধকার, প্রলয়-সমুদ্রে
যাক দূরে, যাক চলে মায়া-মরীচিকা। তপ্ত দীপ্ত দগ্ধ প্রাণ দাও ডুবাইয়া।

ইতিমধ্যে বালিকা গুহা হইতে বাহির হইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে সন্ন্যাসী সমীপে উপস্থিত হইল; সন্ন্যাসী বলিল—

আয় বাছা, বুকে আয়, ঢাল অশ্রুধারা,··· যেথা ছিনু ফিরে যাই সেই গুহামাঝে।

সন্ন্যাসীর হৃদয় স্নেহার্দ্র হইয়াছে; বালিকাকে লইয়া গুহার দ্বারে পুনরায় ফিরিল; কিন্তু মনে শান্তি নাই—

যে ধ্যানে অনন্তকাল মগ্ন হব বলে ক্রমে ক্রমে অন্ধকার মিলাইয়া যায়,
আসন পাতিয়াছিনু বিশ্বের বাহিরে. জগতের দৃশ্য ধীরে ফুটে ফুটে ওঠে।
আরম্ভ না হতে হতে ভেঙে গেল বুঝি। গাছপালা, সূর্যালোক, গৃহ, লোকজন,
তার মুখ জাগে মনে সমাধিতে বসে,··· কোথা হতে জেগে ওঠে গুহার মাঝারে।

সন্ন্যাসী নিজের পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া উত্তেজিত হইয়া ওঠে। বালিকাকে ত্যাগ করিয়া সবেগে গুহা হইতে বাহির হইয়া গেল, বালিকা মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকে। অরণ্যে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে রাত্রি কাটে। কিন্তু বালিকার কথা সন্ন্যাসীর মনে পড়ে,— "একটি কুটিরে মোরা রহিব দু-জনে, রামায়ণ হতে তারে শুনাব কাহিনী।" অল্পকাল পরে বালিকার সন্ধানে ফিরিয়া যায় গুহাভিমুখে, পথে লোককে বালিকার কথা শুধায়। গুহামুখে আসিয়া দেখে ধুলায় পতিতা বালিকা, "হিমদেহ— না পড়ে নিশ্বাস—।" সন্ন্যাসী চীৎকার করিয়া বলিয়া ওঠে,

নয়ন আনন্দ মোর, হৃদয়ের ধন, বাছা বাছা কোথা গেলি। কী করিলি রে—
স্নেহের প্রতিমা, ওগো মা, আমি এসেছি— হায় হায়, এ কী নিদারুণ প্রতিশোধ।
···

সন্ন্যাসী মনে ভাবিয়াছিল অনন্ত যেন সবকিছুর বাহিরে। কিন্তু সামান্য অস্পৃশ্য বালিকা স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে যখন তাহাকে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনিল, সন্ন্যাসী তখন দেখিল ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। "প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর মধ্যে একদিকে যতসব পথের লোক, যতসব গ্রামের নরনারী— তাহারা আপনাদের ঘর-গড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে; আর-একদিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘর-গড়া এক অসীমের মধ্যে কোনোমতে আপনাকে ও সমস্ত-কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।" রবীন্দ্রনাথের জীবনজিজ্ঞাসার সার কথা হইতেছে "বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়",— এই নাটকে

তাহার আভাস দেন প্রথম। পর যুগে গানের সুরে বলিয়াছেন, "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর"—সে তত্ত্বটিও এই নাটকের মধ্যে নিহিত আছে। তত্ত্বের কথা ছাড়িয়া দিলে, সাহিত্যের দিক হইতেও কাব্যখানি বিচার্য। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "এই আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। এই বইটি কাব্যে এবং নাট্যে মিলিত। সন্ন্যাসীর যা অন্তরের কথা তা প্রকাশ হয়েছে কবিতায়। সে তার একলার কথা। এই আত্মকেন্দ্রিত বৈরাগীকে ঘিরে প্রাত্যহিক সংসার নানারূপে নানা কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছে। এই কলরবের বিশেষত্বই হচ্ছে তার অকিঞ্চিৎকরতা। এই বৈপরীত্যকে নাট্যিক বলা যেতে পারে। এরই মাঝে মাঝে গানের রস[১] এসে অনির্বচনীয়তার আভাস দিয়েছে। শেষ কথাটা এই দাঁড়াল শূন্যতার মধ্যে নির্বিশেষের সন্ধান ব্যর্থ, বিশেষের মধ্যেই সেই অসীম প্রতিক্ষণে হয়েছে রূপ নিয়ে সার্থক, সেইখানেই যে তাকে পায় সেই যথার্থ পায়।"[২]

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রচিবার পূর্বে কবি পূর্ণিমায়, যোগী, নিশীথ-চেতনা, নিশীথ-জগৎ কবিতাগুলি লিখিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের ধারণা। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' আলোচনাকালে জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন, "আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম"— সে কথার আভাস পাই 'নিশীথ-জগতে'র মধ্যে; পাঠকগণ কবিতাটি পাঠ করিলে দেখিবেন এই নাটিকার একটা দিক ইহার মধ্যে নিতান্ত অস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় নাই। 'নিশীথচেতনা'র সুর অন্য রূপ হইলেও ইহার মধ্যেও 'নিশীথ জগতে'র দূরতর প্রতিধ্বনি শোনা যায়। 'যোগী' কবিতার যোগী যেন 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর সন্ন্যাসীর পূর্বাভাস। 'পূর্ণিমায়' কবিতাটির পরিপ্রেক্ষণা সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও ইহার সুরের সহিত সন্ন্যাসীর অনন্তের ধ্যানের মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। আমাদের মোট প্রতিপাদ্য হইতেছে যে কবির মন 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' লিখিবার জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতেছিল, এবং তাহার চিহ্ন তিনি এই কবিতাগুলির বক্ষে রাখিয়া গিয়াছেন।

ছবি ও গান

বর্ষার (১২৯০) শেষদিকে অথবা পূজার সময়ে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সকলে কারোয়ার ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ফিরিলেন; চৌরঙ্গির নিকটবর্তী সার্কুলর রোডের একটি বাগানবাড়ি ভাড়া লওয়া হইল। এই বাসার দক্ষিণের দিকে মস্ত একটা বস্তি ছিল। রবীন্দ্রনাথ অনেক সময়েই দোতলার জানালার কাছে বসিয়া সেই লোকালয়ের দৃশ্য দেখিতেন। তিনি লিখিয়াছেন, "তাহাদের সমস্ত দিনের নানাপ্রকার কাজ, বিশ্রাম, খেলা ও আনাগোনা দেখিতে আমার ভারি ভালো লাগিত—সে যেন আমার কাছে বিচিত্র গল্পের মতো হইত।" এই সময়ে লিখিতেছেন 'ছবি ও গান'-এর কবিতাগুলি এবং ভারতীর তাগিদে লিখিতেছেন গদ্য প্রবন্ধ। ভালো করিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে গদ্যরচনাগুলি যেন কবিতাগুলির antithesis; কবিতাগুলি অত্যন্ত গভীর, গদ্যগুলি অত্যন্ত লঘু। জগতকে ছবির ন্যায় দেখিতেছেন, শিল্পীর ন্যায় আঁকিতেছেন— রেখা কোথাও গভীর নয়, কিন্তু লঘুতা কোথাও নাই। কিন্তু গদ্যপ্রবন্ধগুলির কোনোটিই গভীর নহে, সবই হালকা সুরে বলা, সেইজন্য বলিতেছিলাম— গদ্যরচনাগুলি কবিতার antithesis। কিন্তু ইহাকে অন্য ভাবেও দেখা যাইতে পারে। কবি লিখিয়াছেন, "নানা জিনিসকে দেখিবার

১ প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর মধ্যে কয়েকটি উৎকৃষ্ট ও জনপ্রিয় গান আছে; গানগুলি :— ১ হেদে গো নন্দরানী, ২ বুঝি বেলা বয়ে যায়, ৩ বনে এমন ফুল ফুটেছে, ৪ মরি লো মরি, ৫ যোগী হে কে তুমি হৃদি আসনে, ৬ মেঘেরা চলে চলে যায়। এ ছাড়াও কয়েকটি হালকা গান আছে।

২ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১ম খণ্ড, প্রকৃতির প্রতিশোধ। কবির মন্তব্য (পৃ ১৭২-৭৩)।

যে-দৃষ্টি সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল।" সে-দৃষ্টি কেবল 'ছবি ও গান'-এর কবিতার মধ্যে সীমায়িত থাকে নাই, বিচিত্র বিষয়ের প্রতি সে-দৃষ্টি নিবদ্ধ এবং তাহার ফলে প্রবন্ধগুলি লিখিত হয়।

নিজের রচনাকে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন। 'ছবি ও গান' প্রকাশের সাত বৎসর পর জীবনের এই পর্বসম্বন্ধে সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়া যে পত্র তরুণ প্রমথনাথ চৌধুরীকে লেখেন[১], তাহা সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃতব্য।

"আমার 'ছবি ও গান' আমি যে কি মাতাল হয়ে লিখেছিলুম তোমার চিঠি পড়ে বোঝা গেল তুমি সেটি সম্পূর্ণ বুঝ্‌তে পেরেছ এবং মনের মধ্যে হয়ত অনুভবও করচ। আমি তখন দিনরাত পাগল হয়ে ছিলুম। আমার সমস্ত বাহ্যলক্ষণে এমন সকল মনোবিকার প্রকাশ পেত যে তখন যদি তোমরা আমাকে প্রথম দেখ্‌তে ত মনে করতে এ ব্যক্তি কবিত্বের ক্ষ্যাপামি দেখিয়ে বেড়াচ্চে। আমার সমস্ত শরীরে মনে নবযৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মতো এসে পড়েছিল। আমি জানতুম না আমি কোথায় যাচ্চি, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্চে। একটা বাতাসের হিল্লোলে একরাত্রির মধ্যে কতকগুলো ফুল মায়ামন্ত্রবলে ফুটে উঠেছিল তার মধ্যে ফলের লক্ষণ কিছু ছিলনা। কেবলি একটা সৌন্দর্য্যের পুলক, তার মধ্যে পরিণাম কিছুই ছিল না। তোমাদেরও বোধ হয় এ রকম অবস্থা হয়।

"উড়িতেছে কেশ উড়িতেছে বেশ,
উদাস পরাণ কোথা নিরুদ্দেশ,
হাতে লয়ে বাঁশি মুখে লয়ে হাসি
ভ্রমিতেছি আনমনে—

চারিদিকে মোর বসন্ত হাসিত,
যৌবন মুকুল প্রাণে বিকশিত,
সৌরভ তাহার বাহিরে আসিয়া
রটিতেছে বনে বনে।"

সত্যি কথা বল্‌তে কি, সেই নবযৌবনের নেশা এখনো আমার হৃদয়ের মধ্যে লেগে রয়েছে। 'ছবি ও গান' পড়তে পড়তে আমার মন যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে এমন আমার কোন পুরোণো লেখায় হয় না। তার থেকে বুঝ্‌তে পারি সে নেশা এখনো একজায়গায় আছে— তবে কি না, সে নেশা

Hath been cooled a long age In the deep-delved heart

আমি সত্যি সত্যি বুঝ্‌তে পারিনে আমার মনে সুখদুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ ভালবাসা প্রবল, না সৌন্দর্য্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আমার বোধ হয় সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিকজাতীয়, উদাসীন গৃহত্যাগী; নিরাকারের অভিমুখী। আর ভালবাসাটা লৌকিকজাতীয় সাকারে জড়িত। একটা হচ্চে Shelley-র Skylark আর একটা হচ্চে Wordsworthএর Skylark। একজন অনন্তসুধা প্রার্থনা করচে, আর একজন অনন্তসুধা দান করচে। সুতরাং স্বভাবতই একজন সম্পূর্ণতার এবং আর একজন অসম্পূর্ণতার অভিমুখী। যে ভালবাসে, সে অভাবদুঃখ-পীড়িত অসম্পূর্ণ মানুষকে ভালবাসে সুতরাং তার অগাধ ক্ষমা সহিষ্ণুতা প্রেমের আবশ্যক— আর যে সৌন্দর্য্য-ব্যাকুল, সে পরিপূর্ণতার প্রয়াসী, তার অনন্ত তৃষ্ণা। মানুষের মধ্যে দুই অংশই আছে, অপূর্ণ এবং পূর্ণ— যে যেটা অধিক ক'রে অনুভব করে। আমার বোধ হয় মেয়েরা আপনার পূর্ণতা অধিক অনুভব করে (এইজন্যে তারা যা'কে তা'কে ভালবেসে সন্তুষ্ট থাকতে পারে) পুরুষরা আপনার অপূর্ণতা অধিক অনুভব করে এইজন্যে জ্ঞান বল, প্রেম বল কিছুতেই তাদের আর অসন্তোষ ঘোচেনা। কবিত্বের মধ্যে মানুষের এই উভয় অংশ পাশাপাশি সংলগ্ন হয়ে থাক্‌লেই ভাল হয়, কিন্তু তেমন সামঞ্জস্য দুর্লভ। না, ঠিক দুর্লভ বলা যায় না— ভাল কবিমাত্রেরই মধ্যে সেই সামঞ্জস্য আছে— নইলে ঠিক কবিতাই হয় না। অসম্পূর্ণ Real এবং পরিপূর্ণ Idealএর মিলনই কবিতার সৌন্দর্য্য। কল্পনার Centrifugal force Idealএর দিকে Realকে নিয়ে যায় এবং অনুরাগের Centripetal force Realএর

১ সবুজপত্র ১৩২৪ শ্রাবণ। চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড পৃ ১৩২-৩৪। শান্তিনিকেতন, বোলপুর। ১৮৯০ মে ২১ [১২৯৭ জ্যৈষ্ঠ ৮]।

দিকে Idealকে আকর্ষণ করে— কাব্যসৃষ্টি নিতান্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে বাষ্প হয়ে যায় না এবং নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে কঠিন সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। তুমি ঠিক বলেছ— 'আর্তস্বর' এবং 'রাহুর প্রেম' ছবি ও গানের মধ্যে অসঙ্গত হয়েছে, এদের মধ্যে যে একটা তীব্রতা আছে অন্যান্য গানের মধুরতার সঙ্গে তার অনৈক্য হয়েছে। আরেকটা কবিতা আছে সেটা আর এক রকমে অসঙ্গত— যথা 'পোড়ো বাড়ি'।..."

জগতের নানা বস্তু ও বিষয়কে দেখিবার নূতন দৃষ্টিভঙ্গি এই সময়ে যেন রবীন্দ্রনাথ লাভ করিয়াছিলেন। "চোখ দিয়া মনের জিনিসকে ও মন দিয়া চোখের দেখাকে দেখিতে পাইবার ইচ্ছা" ছিল প্রবল। তার মূলে ছিল এক-একটি পরিস্ফুট চিত্র আঁকিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা। দুঃখ করিয়া জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন, "তুলি দিয়া ছবি আঁকিতে যদি পারিতাম তবে পটের উপর রেখা ও রং দিয়া উতলা মনের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতাম কিন্তু সে-উপায় আমার হাতে ছিল না। ছিল কেবল কথা ও ছন্দ। কিন্তু কথার তুলিতে তখন স্পষ্ট রেখার টান দিতে শিখি নাই, তাই কেবলই রং ছড়াইয়া পড়িত।"

'ছবি ও গান'এর সকল কবিতা যে একই ধরনের নহে, তাহা স্বয়ং লেখকই আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। তবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'রাহুর প্রেম'[১] কবিতাটি— অন্য সব কবিতা হইতে উহার সুর ভিন্ন, রূপ পৃথক। রাহুর তো প্রেম নহে, এ যেন প্রেমের অভিশাপ। প্রেমের এমন নির্দয় কল্পনা কবির অন্য কোনো কবিতার মধ্যে পাই না। নিষ্ফল প্রেমের নিষ্ঠুর বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার যে-ইচ্ছা মানুষের খুবই স্বাভাবিক, তাহার সকল প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া ভালোবাসা প্রণয়ীকে অনুসরণ করিতেছে; অভিশাপের ন্যায়, রাহুর ন্যায়, উপচ্ছায়ার ন্যায় সে সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে,— মুক্তি পাইবার সকল পথ রুদ্ধ।

শুনেছি আমারে ভালোই লাগে না,
নাই বা লাগিল তোর,
কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া, চিরকাল তোরে রব আঁকড়িয়া,
লৌহশৃঙ্খলের ডোর।
তুই তো আমার বন্দী অভাগিনী, বাঁধিয়াছি কারাগারে,
প্রাণের শৃঙ্খল দিয়েছি প্রাণেতে দেখি কে খুলিতে পারে।
জগৎ মাঝারে, যেথায় বেড়াবি,
যেথায় বসিবি, যেথায় দাঁড়াবি,
কি বসন্ত শীতে, দিবসে নিশীথে,
সাথে সাথে তোর থাকিবে বাজিতে
এ পাষাণ প্রাণ অনন্ত শৃঙ্খল
চরণ জড়ায়ে ধরে,
একবার তোরে দেখেছি যখন
কেমনে এড়াবি মোরে।

চাও নাই চাও, ডাক নাই ডাক,
কাছেতে আমার থাক নাই থাক,
যাব সাথে সাথে, রব পায় পায়,
রব গায় গায় মিশি,
এ বিষাদ ঘোর, এ আঁধার মুখ,
হতাশ নিশ্বাস, এই ভাঙা বুক,
ভাঙা বাদ্য সম বাজিবে কেবল
সাথে সাথে দিবানিশি।
অনন্ত কালের সঙ্গী আমি তোর
আমি যে রে তোর ছায়া,
কিবা সে রোদনে, কিবা সে হাসিতে,
দেখিতে পাইবি কখনো পাশেতে,
কখনো সমুখে কখনো পশ্চাতে,
আমার আঁধার কায়া।

ছবি ও গান-এর সুর যাহাতে ফুটে নাই সেরূপ কবিতা 'আর্তস্বর' ও 'পোড়াবাড়ি'। এ ছাড়াও হইতেছে, 'পূর্ণিমায়' 'নিশীথ-জগৎ' ও 'নিশীথ-চেতনা'। এগুলির মধ্যে বহির্বিষয়ী জাগতিক চিত্র অপেক্ষা অন্তর্বিষয়ী সংগ্রাম-চিত্র ফুটিয়াছে

১ রবীন্দ্র রচনাবলী ১ম খণ্ড পৃ ১৪০।

বেশি। বোধ হয় সেই অন্তর্বিষয়তার জন্য সেগুলি সংগীত বা লিরিক-ধর্মী এবং সেইজন্য ছবি ও গানের গান অংশ ইহারাই পূরণ করিয়াছে। ছবি ও গান কবির বয়ঃসন্ধিকালের লেখা, শৈশব যৌবন যখন সবেমাত্র মিলিতেছে। ইহাদের সম্বন্ধে কবির মন্তব্য হইতেছে, "ভাষায় আছে ছেলেমানুষি, ভাবে এসেছে কৈশোর। তার পূর্বেকার অবস্থায় একটা বেদনা ছিল অনুদ্দিষ্ট, সে যেন প্রলাপ বকে আপনাকে শান্ত করতে চেয়েছে। এখন সেই বয়স যখন কামনা কেবল সুর খুঁজছে না, রূপ খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু আলো-আঁধারে রূপের আভাস পায়, স্পষ্ট করে কিছু পায় না।·· ছবি ও গান কড়ি ও কোমলের ভূমিকা করে দিলে।"[১]

সাহিত্যের যে দুটি দিক আছে, রূপ ও রস, তাহা ছবি ও গান শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ গীতিকবি, গানই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। গীতিকবিরা তাঁহাদের রচনায় বিশেষভাবে রসের অনির্বচনীয়তা লইয়া কারবার করিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে বলিয়াছেন যে রসের স্বাদ যুগে যুগে লোকের মুখে সমান থাকে না; আর রসের অবতারণা সাহিত্যের একমাত্র অবলম্বন নয়। "তার আর-একটা দিক আছে যেটা রূপের সৃষ্টি। যেটাতে আনে প্রত্যক্ষ অনুভূতি, কেবলমাত্র অনুমান নয়, আভাস নয়, ধ্বনির ঝংকার নয়। বাল্যকালে একদিন আমার কোনো বইয়ের নাম দিয়েছিলেম 'ছবি ও গান'। ভেবে দেখলে দেখা যাবে এই দুটি নামের দ্বারাই সমস্ত সাহিত্যের সীমা নির্ণয় করা যায়। ছবি জিনিসটা অতিমাত্রায় গূঢ় নয়— তা স্পষ্ট দৃশ্যমান। তার সঙ্গে রস মিশ্রিত থাকলেও তার রেখা ও বর্ণবিন্যাস সেই রসের প্রলেপে ঝাপসা হয়ে যায় না। এইজন্য তার প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর।···ভাবের আকৃতি ·· ভুলতেও বেশি সময় লাগে না। কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে মানুষের মূর্তি যেখানে উজ্জ্বল রেখায় ফুটে ওঠে সেখানে ভোলবার পথ থাকে না"।[২] সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ বারেবারে রসসৃষ্টির সহিত রূপসৃষ্টি করিয়াছেন, গীতিকবিতা রচিয়া তৃপ্ত হন নাই— কাহিনী লিখিয়াছেন, গল্প লিখিয়াছেন,— তাহার মধ্যে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন।

ছবি ও গান মুদ্রিত হয় ১২৯০এর ফাল্গুন মাসে— তাঁহার বিবাহের তিন মাস পরে। কাব্যখানি উৎসর্গ করেন কাদম্বরীদেবী বৌঠাকুরানীকে। উপহারে নাম বা কোনো নির্দেশ না থাকিলেও উহা যে তাঁহার প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার নিদর্শন, তাহা স্পষ্ট। উৎসর্গে আছে, "গত বৎসকার বসন্তের ফুল লইয়া এ বৎসরকার বসন্তে মালা গাঁথিলাম। যাঁহার নয়ন-কিরণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি একটি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিত, তাঁহারি চরণে ইহাদিগকে উৎসর্গ করিলাম।"

ছবি ও গানের যুগের গদ্য

জীবনস্মৃতিতে কবি লিখিয়াছেন, "নিতান্ত সামান্য জিনিসকেও বিশেষ করিয়া দেখিবার একটা পালা এই ছবি ও গান-এ আরম্ভ হইয়াছে।" এই উক্তি যে কেবল তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য তাহা নহে, এযুগের তাঁহার সকল শ্রেণীর রচনার মধ্যেই উহা অত্যন্ত স্পষ্ট। যে-কোনো একটা সামান্য উপলক্ষ্য লইয়া সেইটিকে হৃদয়ের রসে রসাইয়া প্রকাশের চেষ্টা হইতেছে এ যুগের গদ্য রচনারও বৈশিষ্ট্য। বস্তুর তুচ্ছতা মোচন করিয়া তাহাকে মহৎ করিবার প্রয়াস যেমন দেখা যায় কবিতায়, তেমনি দেখা যায় সমসাময়িক গদ্য রচনায়—বিশেষভাবে 'আলোচনা' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধগুলির মধ্যে। কিন্তু হৃদয়ের রসে সামান্য বিষয় বা বস্তু যেমন তুচ্ছতা হইতে মুক্ত হইয়া মহান হইতে পারে, তেমনি মহৎ ও গম্ভীর বিষয় হৃদয়ের অন্যতম রসের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া তুচ্ছতা প্রাপ্ত হইতে পারে। কারণ বিষয়

১ ছবি ও গান, রবীন্দ্র রচনাবলী ১ম খণ্ড পৃ ১০৩, কবির মন্তব্য।

২ সাহিত্যের মূল্য. (শান্তিনিকেতন, উদয়ন ২৫ এপ্রিল ১৯৪১) সাহিত্যের স্বরূপ, বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ ১ পৃ ৩৫।

ও বস্তু বিচারের মানসূচী যখন হৃদয়ের মধ্যে, তখন সে উহাকে sublime বা rediculousএর যে-কোনো লোকে পরিচালনা করিতে পারে। এ যুগের গদ্য রচনাগুলি sublime হইতে পারে নাই।

তাই দেখি এযুগের গদ্য রচনার মধ্যে অতি সামান্য জিনিসকে অত্যন্ত ফলাও করিয়া প্রকাশের চেষ্টা। এই যুগের কাব্যরচনা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "তখন স্পষ্ট রেখার টান দিতে শিখি নাই, তাই কেবলই রং ছড়াইয়া পড়িত।" গদ্য রচনার সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা খাটে,— স্পষ্ট করিয়া বলিবার ব্যর্থতায়, কেবলই বাক্যচ্ছটা ছড়াইয়া পড়িত। এ বৎসরের প্রবন্ধগুলি সামান্য বিষয় ও বস্তু অবলম্বনে রচিত, অবান্তর বাক্যজালে পল্লবিত, তীব্র ব্যঙ্গে ও শ্লেষে কণ্টকিত; যে সামান্য সত্যের আলোক আছে, তাহা শব্দচ্ছটায় অস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ সূক্ষ্ম সমালোচক, তাই এযুগের প্রায় সমস্ত গদ্য প্রবন্ধই অকিঞ্চিৎকরজ্ঞানে তাঁহার স্থায়ী গদ্য সংগ্রহ হইতে নির্বাসিত করিয়াছিলেন।

তরুণ লেখকের সর্বগ্রাসী চিত্তে বিচিত্র সাহিত্যজিজ্ঞাসা, সমাজ ও রাষ্ট্রসমস্যা জাগিতেছে; কিন্তু সবগুলিই লঘুভাবে আলোচিত। বালক প্রথম রঙের বাক্স উপহার পাইয়া যেমন-তেমন করিয়া নানাপ্রকার ছবি আঁকিবার চেষ্টায় যেমন অস্থির হইয়া উঠে— রবীন্দ্রনাথও তাঁহার ভাষায় শক্তি পাইয়া আপনমনে কেবলই রকম-বেরকম রচনা লিখিতে চেষ্টা করিতেছেন। সামান্য বিষয়কে বড়ো ও গম্ভীর বিষয়কে লঘু করিয়া কেবল লেখার জন্যই যেন লিখিতেছেন। সামান্য বিষয়কে বড়ো করিয়া দেখানোর চেষ্টাই যদি এ যুগের বৈশিষ্ট্য হয়, তবে 'বাউলের গান'[১] শীর্ষক প্রবন্ধটাকে তাহারই অন্তর্গত করিতে হয়; কারণ অনেক অবান্তর কথা ও আলোচনার পর আসল বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। সমসাময়িক বাংলাদেশের আকাশ তখন রাজনৈতিক উত্তেজনায় ধূমাচ্ছন্ন, সাহিত্যক্ষেত্র অনুকরণে, অনুবাদে কণ্টকাকীর্ণ। এই প্রবন্ধের আরম্ভেই রবীন্দ্রনাথ কাব্যরচনাসম্বন্ধে যে মন্তব্যটুকু করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই কাব্যজীবনের কথা। তিনি লিখিয়াছেন "এমন কোন কোন কবির কথা শুনা গিয়াছে, যাঁহারা জীবনের প্রারম্ভভাগে পরের অনুকরণ করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন— অনেক কবিতা লিখিয়াছেন, অনেক ভাল ভাল কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি শুনিলে মনে হয় যেন, তাহা কোন একটি বাঁধা রাগিণীর গান, মিষ্ট লাগিতেছে, কিন্তু নূতন ঠেকিতেছে না।" অবশেষে সে একদিন নিজের মর্মস্থানে পৌঁছিয়া নিজেকে আবিষ্কার করিল। "যে ব্যক্তি নিজের ভাষা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, যে ব্যক্তি নিজের ভাষায় নিজে কথা কহিতে শিখিয়াছে, তাহার আনন্দের সীমা নাই।" ব্যক্তি-বিশেষের জীবনে ইহা যেমন সত্য, জাতির জীবনেও তাহা তেমনি সত্য। রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ যে "বাঙ্গালী জাতির প্রাণের মধ্যে ভাবগুলি কিরূপ আকারে অবস্থান করে, তাহা আমরা ভাল জানি না।…আধুনিক বাঙ্গালাভাষায় সচরাচর যাহা কিছু লিখিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে যেন একটি খাঁটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই না।…এখনো আমরা বাঙ্গালীর ঠিক ভাবটি, ঠিক ভাষাটি ধরিতে পারি নাই!…সংস্কৃত ব্যাকরণেও বাঙ্গালা নাই, আর ইংরাজি ব্যাকরণেও বাঙ্গালা নাই, বাঙ্গালাভাষা বাঙ্গালীদের হৃদয়ের মধ্যে আছে।" "ভাবের ভাষায় অনুবাদ চলে না। ছাঁচে ঢালিয়া শুষ্ক জ্ঞানের ভাষায় প্রতিরূপ নির্ম্মাণ করা যায়। কিন্তু ভাবের ভাষা হৃদয়ের স্তন্যপান করিয়া, হৃদয়ের সুখ দুঃখের দোলায় দুলিয়া মানুষ হইতে থাকে। সুতরাং তাহার জীবন আছে। ছাঁচে ঢালিয়া তাহার একটা নির্জ্জীব প্রতিমা নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারে না, ও হৃদয়ের মধ্যে পাষাণ-ভারের মত চাপিয়া পড়িয়া থাকে।"

রবীন্দ্রনাথ এইসব যুক্তি দেখাইয়া 'সঙ্গীত সংগ্রহ' নামে সামান্য একখানি গ্রন্থের সমালোচনা করিয়া উহার বৈশিষ্ট্য দেখাইলেন। আধুনিক কবিরা প্রেমের কবিতা, বিরহের কবিতা লেখেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে সে আন্তরিকতা নাই, যাহা এই লোকসাহিত্য সংগ্রহের কবিতায় দেখা যায়। ইহার কারণ তরুণ লেখক তখনো স্পষ্টভাবে আবিষ্কার করিতে

১ বাউলের গান, ভারতী ১২৯০ বৈশাখ পৃ ৩৪-৪১। দ্র সমালোচনা, র-র অচ ২য় খণ্ড।

পারেন নাই, কিন্তু যাহা বলিতে চাহিয়াছিলেন তাহার সারার্থ হইতেছে, লোকসাহিত্য সেই সাধারণ লোকেই সৃষ্টি করে যাহার ভাবধারার সহিত দেশের নাড়ীর বন্ধনযোগ ছিন্ন হয় নাই, যাহার ভাষা ইংরেজির অনুকরণে বিকৃত হয় নাই। "ইহাকে দেখিলেই এমনি আত্মীয় বলিয়া মনে হয়, যে, কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া ইহাকে প্রাণের অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিই।" এই প্রবন্ধে তিনি সবপ্রথম বাঙালিকে এই দেশীয় গান, কবিতা প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন ও প্রবন্ধশেষে নিজ সংগৃহীত তিনটি লোকসংগীত উদ্ধৃত করিয়া দেন। প্রবন্ধটির মধ্যে যথার্থত বাউলের গান সম্বন্ধে সামান্য তথ্যই আছে। এই বৎসরের প্রায় রচনাই যে সামান্য বিষয় লইয়াই লেখা, এইটি তাহারই অন্যতম উদাহরণ।

সাহিত্যের প্রশ্ন ওঠে— লিখলেই যদি আনন্দ সমাপ্ত হইত তো কাব্য ছাপিবার কী প্রয়োজন। 'প্রভাত সংগীত' মুদ্রণের পর 'লেখাকুমারী ও ছাপাসুন্দরী'[১] নামে এক প্রবন্ধে এই তুচ্ছ সমস্যার বিচার হইয়াছে। এই প্রবন্ধ হইতে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "গুটিকতক কবিতা লেখা ছিল, অনেক দিন ধরিয়া খাতায় পড়িয়াছিল,...সম্প্রতি সেগুলি ছাপা হইয়া গেছে। ধারণা ছিল, নিজের লেখা ছাপার অক্ষরে পড়িতে বুঝি বড়ই আনন্দ হইবে।"...কিন্তু যে মনোভাবগুলি কেবলমাত্র নিজের ছিল যাহার যাচাই বা বিচারের অধিকার বা সুযোগ বাহিরের কাহারও ছিল না, তাহারা যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া সকলের সমক্ষে উপস্থিত হইল, তখন কবির আর ভাল লাগিতেছে না। "কবিতাগুলি যখন খাতায় ছিল তখন আমার সুখের কি অভাব ছিল! এখন... কেহ বলিবে ভাল, কেহ বলিবে মন্দ, কেহ সম্মান করিবে, কেহ অপমান করিবে, কিন্তু ইহার ত্রুটি ত কেহই মার্জ্জনা করিবে না, ইহাকে আপনার লোক বলিয়া কেহই ত কোলে তুলিয়া লইবে না! আপনার ধন পরের সম্পত্তি হইয়া গেল,...যে যাহা বলে চুপ করিয়া সহিতেই হইবে।" 'গোঁফ এবং ডিম'[২] প্রবন্ধটি সমালোচকদের উদ্দেশেই লিখিত যাহারা নিজে কোনো উচ্চ ভাব বা কাব্য সৃষ্টি করিতে পারে না, কেবল অন্যকে আঘাত করিয়াই পরিতৃপ্ত। রচনাটি অত্যন্ত এলোমেলো,— ব্যঙ্গ ও শ্লেষ উচ্চ স্তরের নহে। 'তার্কিক'[৩] রচনাটিরও বিষয় এই সমালোচকদের সমালোচনা-স্পৃহার সমালোচনা। লেখকের অভিযোগ তার্কিক বা নৈয়ায়িকরা রসিকতার কৈফিয়ত চাহেন, উপমার সহিত উপমেয়ের তুলনা করিতে বস্তুকে হাজির করেন। মোটকথা সংসারের আবশ্যকবাদী ও তার্কিকদের নিন্দায় প্রবন্ধটি পূর্ণ। সমালোচকগণের ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার ঘোর আপত্তি; লেখকের ক্ষমতার অভাবে বা বুদ্ধির দোষে যেসব গ্রন্থ সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না, কঠোরভাবে সমালোচনা করিলে তাহাদের কী ভাল হয়, তাহা তিনি বুঝিতে অক্ষম। এই পর্যায়ে রচিত 'তৃতীয়পক্ষ' ও 'অনাবশ্যক' নামে প্রবন্ধ দুইটি বুঝিতে হইলে সমসাময়িক দুই চারিটা সংবাদ রাখা প্রয়োজন, তাই সংক্ষেপে একটু ভূমিকা করিতেছি।

য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে দেশমধ্যে সমাজ সম্বন্ধে চিন্তাধারা নানা পথ বাহিয়া চলিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের প্রাগ্রসরতম সম্প্রদায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ১৮৭৮ সালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক হইয়া যান ও ১৮৮১ সালের মে মাসে নিজ সম্প্রদায়ের জন্য মন্দির নির্মাণ করেন। আমাদের আলোচ্য পর্বে এই সমাজ খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের অনুকরণে ও অনুপ্রেরণায় বহুবিধ সমাজসংস্কারকর্মে ব্রতী ছিলেন। সমাজসংস্কার বিষয়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ কখনো কোনোপ্রকার প্রচারকার্য করেন নাই এবং ঐ ধরনের কার্যকে দেশের পক্ষে সুফলপ্রসূ বলিয়া বিশ্বাসও করিতেন না। নূতন সমাজের উৎসাহী যুবকেরা ছিলেন ভাঙনপন্থী। যেসব অর্থহীন সংস্কার হিন্দুসমাজকে

১ লেখাকুমারী ও ছাপাসুন্দরী, ভারতী ১২৯০ জ্যৈষ্ঠ পৃ ৭১-৭৪। ২ গোঁফ এবং ডিম, ভারতী ১২৯০ আষাঢ়, পৃ ১১৩-১৯।

৩ তার্কিক, ভারতী ১২৯০ আশ্বিন পৃ ২৪১-৪৬। দ্র সমালোচনা, র-র অচ ২য় খণ্ড।

অতীতের সহিত নিগড়বদ্ধ করিয়া ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হইবার বাধা সৃষ্টি করিতেছে, এবং যে বর্ণভেদ প্রথা সমাজদেহকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া মানুষে মানুষে দুরপনেয় ব্যবধান গড়িতেছে, তাহারই বিরুদ্ধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'সঞ্জীবনী' সাপ্তাহিক যেন জেহাদ ঘোষণা করিয়া চলিয়াছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের তরফ হইতে এইসব যুক্তি-জালের প্রতিবাদ করিবার কোনো কারণ ঘটে নাই। নব্য ব্রাহ্মের দল মহর্ষিকে তাঁহার ধর্মজীবনের পবিত্রতার জন্য শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু সমাজসংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার মতকে অচল জানিয়া কোনোদিন প্রত্যক্ষভাবে আঘাতও করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ 'অনাবশ্যক'[১] ও 'তৃতীয়পক্ষ'[২] প্রবন্ধ দুইটিতে এইসব প্রগতিশীল মতামতের মৃদু সমালোচনা করেন; তবে এইসব সমালোচনার মধ্যে না আছে আন্তরিকতা, না আছে গাম্ভীর্য, না আছে কঠোর যুক্তিবল; নিতান্তই রঙের বাক্স লইয়া বালকের খেলার মতন, লেখনীর রেখা দিয়া অস্পষ্ট বাক্য ও লঘু চিন্তার খেলামাত্র।

এইসব রচনা ছাড়া কয়েকটি আছে অর্ধরাজনৈতিক প্রবন্ধ। সেগুলিও এই লঘুভাবেই লেখা; এইসব রচনার জন্য সমসাময়িক ঘটনার উত্তেজনা দায়ী। সমসাময়িক ঘটনার সহিত রবীন্দ্রনাথের জীবনের কোনোই যোগ ছিল না; কেবল ঘটনার সহিত রচনার যোগ হইত সমালোচনার জন্য। এই সকল প্রবন্ধ যথার্থভাবে বুঝিতে হইলে তৎকালীন ঘটনাবলীর সহিত পাঠকদের সামান্য পরিচয় থাকা প্রয়োজনবোধেই আমরা নিম্নে তদ্‌বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থিত করিতেছি।

বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে যেসব ঘটনা রাজনৈতিক আন্দোলন সৃষ্টির জন্য মুখ্যত দায়ী তাহাদের অন্যতম হইতেছে ভারতীয়দের পক্ষে সিবিল সার্বিসে প্রবেশের জন্য নির্দিষ্ট নিম্নতম বয়সকে আরও কমাইয়া দেওয়ার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গত কয়েক বৎসর ধরিয়া এই ব্যবস্থা রদ করিবার জন্য আন্দোলন চালাইতে-ছিলেন। ভারতীয়রা সিবিল সার্বিস পাশ করিয়া, জেলার ম্যাজিস্ট্রেট বা জজ্ হইয়াও ইংরেজ সিবিলিয়ানের সমতুল্য অধিকারসকল পাইতেন না; গর্হিত অপরাধে অপরাধী ইংরেজ আসামীর বিচারের অধিকার দেশীয় সিভিলিয়ানদের ছিল না। এই অদ্ভুত নিয়ম পরিবর্তন করিবার জন্য তৎকালীন বড়লাট লর্ড রিপনের প্ররোচনায় আইনসদস্য স্যর কুর্টনি ইলবার্ট এক বিল আইনসভায় উপস্থিত করেন। বিল্ কিভাবে ব্যর্থ হয় তাহা ভারত-ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। ইলবার্ট বিল্ খসড়া যেভাবে করা হইয়াছিল এবং যেভাবে উহা আইনে পরিণত হইল, উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য; সংক্ষেপে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, আইন সংস্কারের উদ্দেশ্যই সংশোধিত প্রস্তাবরাশির দ্বারা নষ্ট হইয়াছিল। ২৮শে জানুয়ারি (১৮৮৪) তারিখে বিল পাশ হইয়া আইন হইল।

ইলবার্ট বিল রদ করিতে গিয়া বাঙালি সবপ্রথম বুঝিল, মুষ্টিমেয় ইংরেজ বণিক ও কর্মচারী সঙ্ঘবদ্ধভাবে বড়লাট তথা ইংলণ্ডেশ্বরীর মহামহিম প্রতিনিধির ইচ্ছা বা অভিপ্রায়কে কিভাবে বিপর্যস্ত করিতে সক্ষম হয়। 'অ্যাজিটেশন' বা সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন যে রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি মহা অস্ত্র তাহা বাঙালিরা এইবার বুঝিল। এই আন্দোলন যখন দেশব্যাপী তখন একটি অবান্তর ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়া সুরেন্দ্রনাথের কারাগার হইয়াছিল (৫ই মে হইতে ৪ঠা জুলাই ১৮৮৩)। কলিকাতা হাইকোর্টের কোনো জজের হুকুমে, আদালতগৃহে হিন্দুদের শালগ্রাম শিলাকে তাহার প্রাচীনত্ব পরীক্ষা করিবার জন্য হাজির করানো হয়। 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নে' এই সংবাদ প্রকাশিত হইলে সুরেন্দ্রনাথ 'বেঙ্গলি' পত্রিকায় তাহার সমালোচনা করেন। বিচারাধীন কালে কোনো মোকদ্দমার সমালোচনা আইনের চোখে আদালতের অপমানসূচক এই অজুহাতে সুরেন্দ্রনাথের জেল হয়। রাজনীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যাহাই লিখুন না কেন,

১ অনাবশ্যক, ভারতী ১২৯০ শ্রাবণ পৃ ১৪৫-৪৯। সমালোচনা, র-র অচ ২য় খণ্ড।

২ তৃতীয় পক্ষ, ভারতী ১২৯০ আশ্বিন পৃ ২৬৯-৭৫।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাবরণ সম্বন্ধে তাঁহাকে একটি ছত্র কোথায়ও লিখিতে না দেখিয়া মনে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে যে এতবড়ো একটা ঘটনা তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ কেন করিল না। রাজনৈতিক অপরাধের জন্য তখন পর্যন্ত কাহাকেও কারাবরণ করিতে হয় নাই; সেইজন্য সুরেন্দ্রনাথের ব্যাপার লইয়া দেশমধ্যে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা অভূতপূর্ব। রবীন্দ্রনাথের এই উপেক্ষার কারণ কী। আমাদের মনে হয় তখন তিনি কারোয়ারে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে ছিলেন, কলিকাতার ছাত্রজনতার উত্তেজনা তিনি দেখেন নাই, দেখিলে কবির স্পর্শচেতন মন নিশ্চয়ই সাড়া দিত।

৪ঠা জুলাই—যেদিন সুরেন্দ্রনাথের মুক্তি হয়—সেদিনটি আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার দিন। এই দিনে Indian Mirror কাগজে রাজনৈতিক আন্দোলনাদি ও দেশমাতৃকার সেবার জন্য একটি ধনভাণ্ডার— ন্যাশনল ফণ্ড— স্থাপনের প্রস্তাব প্রকাশিত হইল। বাঙালি দেখিল যে মুষ্টিমেয় প্রবাসী ইংরেজ নিজেদের অধিকার বজায় রাখিবার জন্য আত্মরক্ষাসমিতি গঠন করিয়া অল্পকালের মধ্যে প্রায় দেড়লক্ষ টাকা তুলিয়া একটি ধনভাণ্ডার স্থাপন করিয়া ফেলিয়াছে; বাঙালিদেরও রাজনৈতিক কার্য পরিচালনার জন্য ধনভাণ্ডার স্থাপন করিতে হইবে। ইহারই কয়েকমাস পরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি প্রমুখ যুবকদের প্রচেষ্টায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনল কন্‌ফারেন্স আহূত হয় (১৮৮৩ ডিসেম্বর ২৮-৩০)— জাতীয় মহাসভা বা কনগ্রেসের জন্ম তখনো হয় নাই।

এইসব সভাসমিতি স্থাপন ও ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল দেশে ও বিদেশে অ্যাজিটেশন বা আন্দোলন সৃষ্টি অর্থাৎ ভারতের অভাব অভিযোগ বিদেশী রাজপুরুষগণের নিকট গোচর করা— অথবা ইংরেজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ইংরেজেরই নিকট হইতে প্রতিকারের জন্য আন্দোলন, আবেদন ও আস্ফালন করা। এই সকল সভাসমিতিতে প্রায়ই কথার বাহুল্য, হৃদয়াবেগের আতিশয্য, ভাষার অসংযম প্রকাশ পাইত। দেশের ভাষায় দেশের লোকের কাছে কোনো বাণী পৌঁছাইয়া দিবার ইচ্ছা তখনো নেতাদের মধ্যে দেখা দেয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির যুবকরা এই নূতন রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে দূরে দূরেই থাকিতেন; তাঁহাদের আদর্শ ছিল অন্যরূপ; দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য দেশবাসীর সুপ্তচিত্তকে উদ্‌বুদ্ধ করাটাকেই তাঁহারা মনে করিতেন আসল কাজ; সে-কাজ ইংরেজি ভাষার মারফতে হইবে না এবং ইংরেজ রাজকর্মচারীর কাছে আবেদন করিলেও সফল হইবে না। রবীন্দ্রনাথ এইসব আন্দোলন হইতে দূরে রহিয়াও নীরব থাকিতে পারিলেন না, সমালোচনা করিতে লাগিলেন। সে-সমালোচনার ভাষা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও শ্লেষে পূর্ণ; অধিকাংশ ক্ষেত্রে অত্যুক্তিকে আঘাত করিতে গিয়া নিজেই সেই দোষে দুষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং সাহিত্য হিসাবে তাহাদের স্থান নগণ্য; একটি নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি—

"দেশহিতৈষিতা, আলো জ্বালিবার গ্যাসের মত যতক্ষণ গুপ্তভাবে চোঙের মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইতে থাকে, ততক্ষণ তাহা বিস্তর কাজে লাগে— কিন্তু যখন চোঙ্ ফুটা হইয়া ছাড়া পায় ও বাহির হইতে থাকে, তখন দেশছাড়া হইতে হয়।" "এখন 'ভ্রাতাগণ', 'ভগ্নিগণ', 'ভারতমাতা' নামক কতকগুলা শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা অনবরত হাওয়া খাইয়া খাইয়া ফুলিয়া উঠিতেছে— ও তারাবাজির মত উত্তরোত্তর আসমানের দিকেই উড়িতেছে অনেক দূর আকাশে উঠিয়া হঠাৎ আলো নিবিয়া যায়, ও ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। আমার মতে আকাশে এরূপ ছুঁশো তারাবাজি উড়িলেও বিশেষ কোন্ সুবিধা হয় না, আর ঘরের কোণে মিট্‌মিট্ করিয়া একটি মাটির প্রদীপ জ্বলিলেও অনেক কাজে দেখে।"[১]

দেশের উন্নতি করিতে হইলে যে কেবল রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করিতে হইবে, এ মত রবীন্দ্রনাথ

১ চেঁচিয়ে বলা, ভারতী ১২৮৯ চৈত্র পৃ ৫১১-১৬।

কোনো দিনই পোষণ করেন নাই। সমগ্র জীবনের সহিত যে আন্দোলনের যোগ নাই, যাহা মানুষের সমগ্র সত্তাকে উদ্‌বোধিত করিতে পারে না, সেরূপ এক-ঝোঁকা সংস্কার-আন্দোলনকে তিনি চিরদিনই অগ্রাহ্য করিয়াছেন। 'জিহ্বা-আস্ফালন'[১] নামে সামান্য একটি প্রবন্ধের মধ্যে তিনি লিখিয়াছিলেন যে এইসব আন্দোলনকারীরা চান সকলে "বঙ্গসাহিত্যে কেবলমাত্র দাঁত ও নখের চর্চা করিতে থাকুক্ আর কিছু নয়।" ইঁহারা "বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশকে অত্যন্ত ভয় করেন।"·· "সমাজের অন্তর্নিহিত বিচিত্র শক্তি চারিদিক হইতে বিকশিত হইয়া উঠিবে তাহা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে।"[২]

"আমাদের সমাজের পদে পদে এত শত প্রকার কর্ত্তব্য রহিয়াছে যে, কতকগুলা অস্পষ্ট বাঁধিবোল বলিয়া সময় ও উদ্যম নষ্ট করা উচিত হয় না।···এত সামাজিক শত্রু চারিদিকে রহিয়াছে তাহাদিগকে কে নাশ করিবে!" তিনি পরিষ্কার করিয়া কর্মপন্থা নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "আগে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে উদাহরণ সংগ্রহ কর, ভাবিতে আরম্ভ কর ও বলিতে শেখ, তাহা হইলে আর সকলে শুনিতে আরম্ভ করিবে। বেশী করিয়া বলিলে কিছুই হয় না, ভাল করিয়া বলিলে কি না হয়! আতিশয্যের দিকে যাইও না, কারণ যেখানেই যুক্তিহীন আতিশয্যপ্রিয় প্রজা, সেইখানেই স্বেচ্ছাচারী প্রভুতন্ত্র শাসনপ্রণালী।"

বিদেশীর শাসনের সহিত বিদেশী শব্দ, বিজাতীয় ভাবধারা ক্রমে ক্রমে বিজিতের জীবনের অন্তরঙ্গ বস্তু হইয়া উঠে; প্রথম প্রথম সেগুলি নূতন ঠেকে, কিন্তু কালে সেগুলি কেবল সহিয়া যায়, তাহা নহে,— সেগুলি জাতীয় জীবনের একান্ত অন্তরঙ্গ হইয়া পড়ে, এবং কোনো কালে যে তাহারা বিজাতীয় শব্দ বা ভাব ছিল, সেই বোধ পর্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়। নেশন, ন্যাশানলিজম্ কনগ্রেস, লীগ্ প্রভৃতি অসংখ্য শব্দ ভারতীয়দের রাষ্ট্রিক জীবনের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে, সেসব শব্দ ও প্রতিষ্ঠান যে বিদেশীয় তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। আমাদের আলোচ্য পর্বে দেশের মধ্যে 'ন্যাশনল' শব্দটির প্রচলন বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রনাথের চোখে এই শব্দটির বহুল প্রয়োগ অত্যন্ত খাপছাড়া ঠেকিতেছিল। "ন্যাশনল শব্দটার ব্যবহার অত্যন্ত প্রচলিত হইয়াছে। ন্যাশনল থিয়েটর, ন্যাশনল মেলা, ন্যাশনল পেপর ইত্যাদি।···সম্প্রতি ন্যাশনল ফণ্ড্ আর একটা কথা শুনা যাইতেছে।·· একমাত্র Political agitationই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য।"[২] রবীন্দ্রনাথ বলিতে চাহেন যে political agitation পদার্থটাই ন্যাশনল নহে। তারপর এই আন্দোলন চালাইবার ভার যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা জাতির বা নেশনের ভাষা অবহেলা করেন, ইংরেজি ভাষায় বাগ্মিতা প্রদর্শনই তাঁহাদের জীবনের অন্যতম চরম উদ্দেশ্য। সেইজন্য জাতীয় ধনভাণ্ডারের নামটি পর্যন্ত হইয়াছে ন্যাশনল ফণ্ড্, ইহার কাণ্ডকারখানা সবই চলে ইংরেজিতে। রবীন্দ্রনাথের মতে এই ধরনের কার্য দেশের মধ্যে ফলপ্রসূ হয় না। তিনি বলিলেন, "আমাদের দেশে political agitation করার নাম ভিক্ষাবৃত্তি করা।··· ভিক্ষুক মানুষেরও মঙ্গল নাই, ভিক্ষুক জাতিরও মঙ্গল নাই।··· ইংরেজদের কাছে ভিক্ষা করিয়া আমরা আর সব পাইতে পারি, কিন্তু আত্মনির্ভর পাইতে পারি না।··· ভিক্ষার ফল অস্থায়ী, আত্মনির্ভরের ফল স্থায়ী।" "যাহা আমরা নিজেই করিতে পারি, এবং যাহা কিছু আমরা নিজে করিব তাহা সফল না হইলেও তাহার কিছু-না-কিছু শুভ ফল স্থায়ী হইয়া থাকিবে।·· গবর্মেণ্টকে চেতনা করাইতে তাঁহারা যে পরিশ্রম করিতেছেন, নিজের দেশের লোককে চেতন করাইতে সেই পরিশ্রম করিলে যে বিস্তর শুভফল হইত।"·· রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতবাদের ইহাই হইতেছে মূল সূত্র এবং দেশসেবার এই আদর্শের কথাই তিনি বারে বারে নানা ভাবে বলিয়াছেন, "দেশকে জানো"। তিনি বলিলেন যে, যাহার কোনো বিষয়ে দাবি বা অধিকার নাই, সেই ভিক্ষা চায়। গবর্মেণ্টের নিকট হইতে আজ আমাদের ভিক্ষা চাহিতে হইতেছে কেন, এই প্রশ্নই তাঁহার মনে

১ জিহ্বা-আস্ফালন, ভারতী ১২৯০ শ্রাবণ পৃ ১৮-৮৪।
২ ন্যাশনল ফণ্ড, ভারতী ১২৯০ কার্তিক।

উঠিতেছে। ভারতবর্ষ বহু যাচ্ঞার পর 'স্বায়ত্তশাসন' পাইয়াছে; সে স্বায়ত্তশাসনের স্বরূপ কী তাহা আমাদের অজানা নাই। কিন্তু গবর্মেণ্ট দিয়াছেন ভিক্ষার মতো, অনুগ্রহের মতো, পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য; এ বিষয়ে যেন নানা সন্দেহ আছে, কাল যদি দেখা যায় এ প্রণালীতে ভারতবাসীরা ভালো করিয়া কাজ করিতে পারিতেছে না, তবে কালই হয়তো উহা বন্ধ করিতে হইবে।

আজ ষাট বৎসর পরেও ভারতশাসন সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের-যে কোনো চিত্তবিকার হইয়াছে তাহা তো মনে হয় না, ভারতীয়দের প্রতি তাহার অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস আজও যায় নাই। দেশের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন সফল করিতে হইলে রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষারই প্রচার সর্বাগ্রে প্রয়োজন; ইংরেজিতে যেসব উচ্চ ভাব শিক্ষিতেরা জানেন, দেশের মধ্যে বাংলাভাষার মাধ্যমে তাহা প্রচার করিতে হইবে। "বঙ্গবিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরেজিতে শিক্ষা কখনই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না।"[১]

আমরা রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত্র আলোচনা করিতে গিয়া দেখিব যে এই ব্রতটির কথা তিনি বরাবরই প্রচার করিয়াছেন এবং যখনই সুযোগ পাইয়াছেন তখনই কর্মে তাহাকে সফল করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রাজপুরুষদিগকে কেন্দ্র করিয়া স্বদেশের উন্নতি সাধনের জন্য সভাসমিতি করার ব্যর্থতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতেরকোনো অস্পষ্টতা ছিল না। এই স্বাদেশিকতার শিক্ষা তাঁহাদের পরিবারগত ধারা হইতে প্রাপ্ত। এই স্বাদেশিক আত্মসম্মান মাঝে মাঝে কী তীব্র আকার ধারণ করিত, তাহা আমরা 'টৌন্‌হলের তামাশা'[২] শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিতে পাই। উহার ভাষার শ্লেষ ও ব্যঙ্গ তীব্রতার চরমে উঠিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইহার আরম্ভ এইরূপ, "সেদিন টাউনহালে একটা মস্ত তামাশা হইয়া গিয়াছে। দুই চারিজন ইংরাজে মিলিয়া আশ্বাসের ডুগ্‌ডুগি বাজাইতেছিলেন ও দেশের কতকগুলি বড়লোক বড় বড় পাগ্‌ড়ি পরিয়া নাচন আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন।" অত্যন্ত তিক্তভাবে এই শ্রেণীর লোকদের সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, "যাহারা দেশকে অপমান করে দেশের কোনো সুপুত্র তাহাদের [ইংরেজদের] সহিত সম্পর্ক রাখিতে পারে না। একটুখানি সুযোগের প্রত্যাশায় যাহারা দাঁতের পাটি সমস্তটা বাহির করিয়া তাহাদের সহিত আত্মীয়তা করিতে যাইতে পারে তাহাদিগকে দেখিলে নিতান্তই ঘৃণা বোধ হয়।" বলা বাহুল্য কবির এ মনোভাব কখনো স্থায়ী হইতে পারে না; মনের উত্তেজিত অবস্থায় ইহা লিখিত।

সাবিত্রী[৩] লাইব্রেরির সংশ্লিষ্ট এক সভার অধিবেশনে 'অকালকুষ্মাণ্ড'[৪] নামে যে প্রবন্ধপাঠ করেন (১২৯০), তাহার ভাব ও ভাষা কোনোটিই সুন্দর নহে। লেখাটির অধিকাংশই রাজনীতি-আন্দোলনাদির সমালোচনা, অন্যান্য রচনার ন্যায় বিদ্রূপে ও শ্লেষে কণ্টকিত। এই অভাবাত্মক দিক বাদ দিলে দুই চারটা সত্য কথা রচনাটির মধ্যে পাওয়া যায়, তবে তার জন্য পনেরো-ষোলো পৃষ্ঠার প্রবন্ধ নিষ্প্রয়োজন। ইহাও রঙের বাক্স লইয়া বালকের যেমন-তেমন খেলার মতোই প্রচেষ্টা। কাজের কথার মধ্যে ছিল রাষ্ট্রনীতি ও সাহিত্যানুশীলনে আত্মনির্ভরশীলতার প্রয়োজনের তাগিদ। অনুকরণের দ্বারা রাষ্ট্র, সমাজ বা সাহিত্য গড়ে না বা টেঁকে না। "যাঁহারা খাঁটি হৃদয়ের কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদের কথা মরিবে না।"

মুক্তজীবনের সহজপ্রবাহ পদে পদে ক্ষুণ্ণ হইয়া অন্তরকে পীড়িত করিতেছে; নিশ্চেষ্টতার অবসাদ-জড়িমা হইতে বাহিরে আসিবার জন্য বেদনা মানুষের চিরন্তন, কবিচিত্তও তাহারই জন্য ব্যাকুল। অথচ তখনকার 'যে সমস্ত আত্মশক্তিহীন

১ ন্যাশনল ফণ্ড, ভারতী ১২৯০ কার্তিক পৃ ২৯৩। ২ টৌনহলের তামাশা, ভারতী ১২৯০ পৌষ পৃ ৪১৮-২১।

৩ সাবিত্রী লাইব্রেরী ও 'আলোচনা' নামে পত্রিকার সম্পাদক গোবিন্দলাল দত্ত, লেখিকা গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর দেবর। 'সাবিত্রী' অর্থাৎ বিখ্যাত সাহিত্য লাইব্রেরীর গত ছয় বৎসরের অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাবলী এবং সাবিত্রী লাইব্রেরী হইতে পুরস্কারপ্রাপ্ত নারীরচনা।... পিপেলস্ লাইব্রেরী, ৭৮ নং কলেজ স্ট্রীট। আশ্বিন ১২৯৩। রবীন্দ্রনাথ সাবিত্রী লাইব্রেরীতে ১২৯০ সালের ১১ই চৈত্র 'অকালকুষ্মাণ্ড' ১২৯১ সালের ১১ ভাদ্র 'হাতেকলমে' পাঠ করেন। ৪ অকালকুষ্মাণ্ড, ভারতী ১২৯০ চৈত্র, পৃ ৫২৯-৪৪।

রাষ্ট্রনৈতিক সভা ও খবরের কাগজের আন্দোলন প্রচলিত হইয়াছিল দেশের পরিচয়হীন ও সেবাবিমুখ যে দেশানুরাগের মৃদু মাদকতা তখন শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে' দেখা দিয়াছিল, তাহার প্রতি রবীন্দ্রনাথের চিত্ত কোনোদিন আকৃষ্ট হয় নাই। দেশ সম্বন্ধে সমস্যা তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, দেশবাসী সম্বন্ধে কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর রাষ্ট্রতত্ত্ব স্থাপিত নহে। 'হাতেকলমে'[১] নামক যে-প্রবন্ধটি কয়েক মাস পরে সাবিত্রী লাইব্রেরির অধিবেশনে পাঠ করেন, তাহাতে দেশসেবা সম্বন্ধে খুব মোটা কথা শক্ত ভাষায় দেশবাসীদের কর্ণগোচর করিবার চেষ্টা করেন।

রবীন্দ্রনাথের মতো দেশের কাজ বলিতে যে একটা রাজনৈতিক ধুয়া উঠিয়াছে তাহা শূন্যগর্ভ কথামাত্র; কারণ দেশবাসীর প্রতি কর্তব্য না করিলে দেশের উন্নতি হয় না; অথচ দেশবাসী যখন অত্যাচারে উৎপীড়িত, অপমানে লাঞ্ছিত, মারীভয়ে পীড়িত, অন্নবস্ত্রাভাবে ক্ষীণ, তখন রাজনৈতিক নেতারা ঐসব দুঃখ আধিব্যাধি নিরাকরণের জন্য ইংরেজের দরবারে উপস্থিত হন; দেশবাসীদের প্রতি যে দেশবাসীর কোনো কর্তব্য আছে, তাহা উদ্‌বুদ্ধ করিবার কোনো প্রয়াস তাঁহাদের মধ্যে দেখা যায় না; ইহাকেই তিনি দেশের পরিচয়হীন, সেবাবিমুখ আন্দোলন বলিয়া নিন্দা করেন। 'হাতেকলমে' কাজের একটি উদাহরণ তিনি দেশবাসীর সম্মুখে পেস করিলেন। তিনি বলিলেন "আজকাল প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়াই ইংরাজকর্তৃক দেশীয়দের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী একটা-না-একটা শুনিতেই হয়।" এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার যে শক্তি তাহাকেই তিনি যথার্থ দেশের জন্য 'হাতেকলমে' কাজ বলিলেন— সভা বা agitation নহে।

আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি তখন প্রায়ই ইংরেজ কর্মচারী, বণিক ও গোরারা ভারতবাসীর উপর কারণে-অকারণে উপদ্রব করিত, নিষ্ঠুর হত্যার কথাও সময়ে-সময়ে শোনা যাইত; কিন্তু তাহার প্রতিকার প্রায়ই হইত না। রবীন্দ্রনাথের মনে এই প্রশ্নটাই সেদিন বড়ো করিয়া দেখা দিয়াছিল; তাই স্বদেশীকাজ বলিতে কী বুঝায় তাহারই দৃষ্টান্ত দিয়া বলিলেন, "যতবার মফঃস্বলে একজন ইংরেজ একজন দেশীয়ের প্রতি অত্যাচার করে, যতবার এই দেশীয়ের পরাভব হয়, যতবার সে অদৃষ্টের মুখ চাহিয়া সেই অত্যাচার ও পরাভব নীরবে সহ্য করিয়া যায়, যতবার সে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে অসহায় বলিয়া অনুভব করে, ততবারই যে আমাদের দেশ দাসত্বের গহ্বরে এক-পা করিয়া আরও নাবিতে থাকে। কেবল কতকগুলা মুখের কথায় তুমি তাহাকে আত্মমর্য্যাদা শিক্ষা দিবে কি করিয়া ?... শিক্ষা দিতে চাও এক কাজ কর। একবার একজন ইংরেজের হাত হইতে একজন দেশীয়কে ত্রাণ কর। একবার সে বুঝিতে পারুক ইংরেজ ও অদৃষ্ট একই ব্যক্তি নহে।··· তখন আমাদের দেশের লোকের আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান বাস্তবিক হৃদয়ের মধ্যে অঙ্কুরিত হইতে থাকিবে।··· ইংরেজের প্রতিদিনকার ব্যবহারগত যথেচ্ছাচারিতা দমন করিয়া যখন দেশের লোকেরা আপনাদিগকে কতকটা তাহাদের সমকক্ষ জ্ঞান করিবে, তখনই আমাদের যথার্থ উন্নতি আরম্ভ হইবে, দাসত্বের থরথর-ভীতি দূর হইবে ও আমরা নতশির আকাশের দিকে তুলিতে পারিব। সে কখন হইবে, যখন আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরাও ইংরেজের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষার প্রত্যাশা করিতে পারিবে। সে শুভদিন বা কখন আসিবে! যখন স্বদেশের লোক স্বদেশের লোকের সাহায্য করিবে। এ যে শিক্ষা, এই যথার্থ শিক্ষা, এ জিহ্বার ব্যায়াম শিক্ষা নহে, ইহাই স্বদেশহিতৈষিতার প্রকৃত চর্চ্চা।"[২]

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন যে, সমাজের প্রথম অবস্থায় মহাপুরুষ কাজ করেন, তাহার পরিণত অবস্থায় মহামণ্ডলী [community] সেই কার্য সুসম্পন্ন করে। দেশের কাজ বলিতে রবীন্দ্রনাথ একটা দেশব্যাপী ভীষণাকার কাজের প্রোগ্রাম দিলেন না, তিনি বলিলেন, "ছোট কাজই বাস্তবিক দুরূহ, প্রকাণ্ড মূর্তি কাজের ভাণ ফাঁকিমাত্র। আমাদের

১ হাতেকলমে, ভারতী ১২৯১ আশ্বিন পৃ ২২৮-৪১।

২ ভারতী ১২৯১ আশ্বিন পৃ ২৩৪। সাবিত্রী লাইব্রেরির ৬ষ্ঠ অধিবেশনে ১২৯১ ভাদ্র ১১ (১৮৮৪ অগস্ট ২৬) তারিখে পঠিত হয়।

চারিদিকে আমাদের আশে-পাশে আমাদের গৃহের মধ্যে আমাদের কার্য্যক্ষেত্র।" পরযুগে লিখিত 'স্বদেশীসমাজ'-এর ইহাই পূর্বাভাস এবং গঠনমূলক কার্যের ইহাই প্রথম খসড়া।

আমরা রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতবাদ আলোচনা করিতে গিয়া সমকালীন অন্যান্য রচনার কথা বাদ দিতে বাধ্য হইয়াছি। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার কাব্যে ও অন্তরজীবনে অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। সমরেখায় কবির জটিল চিত্তের সকল আন্দোলন ও অনুভূতিকে দেখানো অসম্ভব। 'প্রভাতসংগীত' ও 'ছবি ও গান'-এর যুগে লিখিত গদ্য রচনা সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, যদি 'আলোচনা' নামে গ্রন্থের কথা এখানে না বলি। 'সন্ধ্যা সংগীত'-এর যুগে লেখা 'বিবিধপ্রসঙ্গ' ও এই যুগে লেখা 'আলোচনা'; "এই দুই গদ্যগ্রন্থে যে-প্রভেদ ঘটিয়াছে তাহা পড়িয়া দেখিলেই লেখকের চিত্তের গতি নির্ণয় করা কঠিন হয় না।" (জীবনস্মৃতি)। বাহিরের জগতের ছবি মনের দর্পণে পড়িয়া যে সুরের হিল্লোল জাগায়, ছন্দে তাহা রূপ পায় ছবি ও গান-এ। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই কাব্যরচনাকে বালকের রঙের বাক্স লইয়া খেলার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন; আমরা তাঁহার গদ্য রচনাকেও সেই রকম রঙিন বাক্য লইয়া খেলা বলিতে চাহি। কিন্তু চিন্তাশীল মানুষের মন কেবলমাত্র বহির্বিষয়ী জগতের রঙিন খেলায় তৃপ্ত থাকে না; সে মনো-জগতের অনন্ত লীলারাশিকে পর্যবেক্ষণ করিতে, বিশ্লেষণ করিতে ভালোবাসে, নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া হয়, লিখিতে লিখিতে তত্ত্ব উদ্‌ভাসিত হয়, তর্ক করিতে করিতে সত্য প্রকাশ পায়। সেইজন্য এক শ্রেণীর মনীষীরা নিরন্তর লেখেন, কথা বলেন,— সেটা পরের জন্য নহে, নিজের জন্যই মুখ্যত।

যৌবনের রচনা বলিয়া উপেক্ষা করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'আলোচনা' গ্রন্থখানিকে তাঁহার গদ্যগ্রন্থসংগ্রহ হইতে নির্বাসিত করিয়াছেন। কিন্তু তরুণ কবি ও মনীষীর এই রচনার মধ্যে যে গভীর মননশক্তির আভাস পাই, তাহাকে আমরা তাচ্ছিল্য করিতে পারি না। জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন, "আলোচনা নাম দিয়া যে ছোট ছোট গদ্য প্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলাম তাহার গোড়ার দিকেই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর ভিতরকার ভাবটির একটা তত্ত্বব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সীমা যে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা যে অতলস্পর্শ গভীরতাকে এককণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে ইহা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে।" আলোচনার অন্তর্গত 'ডুব দেওয়া' প্রবন্ধটির মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদ আছে, তাহাদের কয়েকটির মধ্যে প্রকৃতির প্রতিশোধের কথাই বহু বিস্তারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'আলোচনা'য় সবশুদ্ধ ছয়টি প্রবন্ধ আছে। যথা ডুব দেওয়া, ধর্ম, সৌন্দর্য্য ও প্রেম, কথাবার্ত্তা, আত্মা এবং বৈষ্ণব কবির গান। এই প্রবন্ধগুলি আবার ছোটো ছোটো উপপ্রবন্ধে বিভক্ত। এই বই-এর লিখনভঙ্গি 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র ন্যায় হইলেও সুরের পার্থক্য ইহাতে খুবই বিদ্যমান। 'আলোচনা'র রচনাগুলি 'বিবিধপ্রসঙ্গে'র লেখার মতন হালকা রচনা নয়, বয়স্ক চিন্তাশীল প্রায়-দার্শনিকের রচনার ন্যায় গভীর, গম্ভীর ও জটিল। আমরা একটি উপপ্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদাহরণরূপে উদ্ধৃত করিতেছি—

"এ জগতের সকল বস্তুরই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ এই তিনপ্রকারের আয়তন দেখা যায়। কিন্তু এই সকল আয়তনের অতীত, আর-এক প্রকার আয়তন তাহাদের আছে, তাহাকে···বলিব···অসীমায়তনতা, বা আয়তনের অসীম অভাব।" একটি বালুকণাকে জড়ভাবে দেখিলে তাহাকে কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি রূপে জানা হয়; কিন্তু তাহাকে অনন্তজ্ঞানের ও অনন্তকালের মধ্যে দেখিতে চেষ্টা করিলে, বালুকণার আকার আয়তন কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়, জানা যায় উহা অসীম। "আমরা যাহাকে সচরাচর ক্ষুদ্রতা বা বৃহত্ত্ব বলি, তাহা কোন কাজের কথা নহে। আমাদের চক্ষু যদি অণুবীক্ষণের মত হইত তাহা হইলেই এখন যাহাকে ক্ষুদ্র দেখিতেছি, তখন তাহাকেই অতিশয় বৃহৎ দেখিতাম। এই অণুবীক্ষণতা শক্তি কল্পনায় যতই বাড়াইতে ইচ্ছা কর ততই বাড়িতে পারে। অত গোলে কাজ কি, পরমাণুর বিভাজ্যতার ত আর কোথাও শেষ নাই; অতএব একটি বালুকণার মধ্যে অনন্ত পরমাণু আছে, একটি পর্ব্বতের মধ্যেও অনন্ত পরমাণু আছে,

ছোট বড় আর কোথায় রহিল! একটি পর্ব্বতও যা, পর্ব্বতের প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম অংশও তাই; কেহই ছোট নহে, কেহই বড় নহে, কেহই অংশ নহে সকলেই সমান। বালুকণা কেবল যে জ্ঞেয়তায় অসীম, দেশে অসীম তাহা নহে, তাহা কালেও অসীম, তাহারই মধ্যে তাহার অনন্ত ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান একত্রে বিরাজ করিতেছে। তাহাকে বিস্তার করিলে দেশেও তাহার শেষ পাওয়া যায় না, তাহাকে বিস্তার করিলে কালেও তাহার শেষ পাওয়া যায় না। অতএব একটি বালুকা অসীম দেশ অসীম কাল অসীম শক্তি, সুতরাং অসীম জ্ঞেয়তার সংহত কণিকামাত্র। চোখে ছোট দেখিতেছি বলিয়া একটা জিনিষ সীমাবদ্ধ নাও হইতে পারে। হয়ত ছোট বড়র উপর অসীমতা কিছুমাত্র নির্ভর করে না। হয়ত ছোটও যেমন অসীম হইতে পারে বড়ও তেমনি অসীম হইতে পারে। হয়ত অসীমকে ছোটই বল আর বড়ই বল সে কিছুই গায়ে পাতিয়া লয় না।

যাহা কিছু, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত সকলি,
বালুকার কণা, সেও অসীম অপার,
তারি মধ্যে বাঁধা আছে অনন্ত আকাশ—
কে আছে, কে পারে তারে আয়ত্ত করিতে!
বড় ছোট কিছু নাই সকলি মহৎ।"[১]

'ডুবদেওয়া'র উপপ্রবন্ধগুলিতে আমাদের প্রত্যেক জ্ঞেয় জিনিসের পিছনে যে অদৃশ্য অসীমতা আছে, লেখক তাহার মধ্যে মানুষকে ডুবিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন দার্শনিকের মতো। কিন্তু কিভাবে সেই ডুব দেওয়া সার্থক হইতে পারে তাহার উত্তর দিয়াছেন প্রেমিকের মতো। তিনি বলিলেন, আমাদিগকে অনুরাগের সেই স্তরে পৌঁছাইতে হইবে, যেখান হইতে বিদ্যাপতির ভাষায় বলা যাইতে পারে, 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল'। দৃষ্টিভঙ্গিই বদলাইয়া গেল। 'স্বদেশ,' 'কেন' প্রভৃতি প্রবন্ধে স্বদেশপ্রেমকে একটা নূতন আলোয় দেখার চেষ্টা হইয়াছে। 'ধর্মে'র প্রবন্ধগুলিতে তিনি মানুষের অপূর্ণতাকে এমন একটি বিশ্বজনীন সহানুভূতির স্তর হইতে দেখিয়াছেন যে উহা পাঠ করিলে আমাদের অপূর্ণতাকে দোষের বলিয়া মনে হয় না, মনে হয় যেন উহা পূর্ণতারই উল্টা পিঠ, অর্থাৎ পূর্ণাপূর্ণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পরের কয়েকটি প্রবন্ধে লেখক সেই মনোভাবকেই ধর্ম বলিয়াছেন যাহার দ্বারা আমরা প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্যকে মানিয়া চলি।

'সৌন্দর্য্য ও প্রেম' প্রবন্ধে তিনি সুন্দরের অর্থ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; আপনার মধ্যে যাহার পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যবোধ আছে, তাহাই সুন্দর। সমস্তটাই ছন্দোবদ্ধ, বি-সম কিছুই নাই। "যথার্থ যে সুন্দর সে প্রেমের আদর্শ, তাহার কোনখানে বিরোধ বিদ্বেষ নাই।...যাহাতে মিল নাই, তাহা সুন্দর নহে। যাহা সুন্দর তাহার জগতের সাধারণের সহিত আশ্চর্য্য মিল আছে। আমাদের মনই সৌন্দর্য্যপিপাসু। এইজন্য সুন্দরকে আমরা অবজ্ঞা করিতে পারি না। এখন যাহাদের মধ্যে এই সৌন্দর্য্যবোধ নাই, তাহাদের জন্য কে চেষ্টা করিবে?— কবি। তাঁহার কাজই হইতেছে আমাদের মনে সৌন্দর্য্য উদ্রেক করিয়া দেওয়া।" 'স্বাধীনতার পথ প্রদর্শক' নামে উপপ্রবন্ধে তিনি কবিদের কাজ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "কবিরা অমর, কেননা তাঁহাদের বিষয় অমর, অমরতাকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহারা গান গাহিয়াছেন। ফুল চিরকাল ফুটিবে, সমীরণ চিরকাল বহিবে, পাখী চিরকাল ডাকিবে, এবং এই ফুলের মধ্যে কবির স্মৃতি প্রবাহিত, এই পাখীর গানে কবির গান বাজিয়া উঠে।" এই সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রতীক লক্ষ্মী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে ক্ষুদ্র রচনাটি এই প্রবন্ধের শেষে যোজনা করেন, তাহাকে গদ্যকবিতা বলিলে ভুল হইবে না।

'কথাবার্ত্তা' প্রবন্ধে লেখক 'বিবিধপ্রসঙ্গ' গ্রন্থের একটু জের টানিয়াছেন। এখানকার 'সন্ধ্যাবেলায়' ও 'বিবিধ-প্রসঙ্গে'র 'প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল' দুইটি সমধর্মী প্রবন্ধ হইলেও ইহাদের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। 'প্রাতঃকাল ও

১ ভারতী ১২৯১ বৈশাখ। আলোচনা পৃ ২-৬।

সন্ধ্যাকাল' গভীর দার্শনিক প্রবন্ধ। কিন্তু 'সন্ধ্যাবেলায়'-এর দৃষ্টিভঙ্গি জ্যোতির্বিদ্যার পটভূমিকায় দার্শনিকতা, অর্থাৎ যে বাঁধা নিয়মে প্রকৃতি চলিতেছে, সেই নিয়মের উপলব্ধি ইহাতে আছে। 'আত্মা' প্রবন্ধসমষ্টিতে কবি আত্মার অসীমতার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। আত্মবিসর্জনের মধ্যেই আত্মার অমরতার লক্ষণ দেখা যায়, এই আত্মবিসর্জন দিয়া আমরা অসীমতায় পৌছাইতে পারি। 'বৈষ্ণব কবির গান' পূর্বোল্লিখিত 'সৌন্দর্য্য ও প্রেম' প্রবন্ধটির মূল বক্তব্যের পুনরুক্তি মাত্র।[১]

'আলোচনা' গ্রন্থখানি লেখক কবি তাঁহার পিতৃদেবকে উৎসর্গ করেন।

শোক ও সান্ত্বনা

কারোয়ার হইতে ফিরিবার কয়েক মাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হইল। জীবনস্মৃতিতে অতি সংক্ষেপে সংবাদটি দেওয়া আছে…"১২৯০ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণে আমার বিবাহ হয়। তখন আমার বয়স বাইশ বৎসর।"… বিবাহের দিনে প্রিয়নাথ সেনকে নিমন্ত্রণ করিয়া যে কৌতুকপূর্ণ পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহা পাওয়া গিয়াছে।[২]

বিবাহের ব্যবস্থা হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে মহর্ষি তাঁহাকে সংসারের কর্মরজ্জুতে বাঁধিবারও ব্যবস্থা করিলেন। বিবাহের দুই দিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ পিতার নিকট হইতে যে পত্র পাইলেন, তাহাতে তিনি খুশি হইয়াছিলেন কিনা বলা কঠিন। পিতার পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম, "এইক্ষণে তুমি জমীদারির কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রস্তুত হও; প্রথমে সদর কাছারিতে নিয়মিতরূপে বসিয়া সদর আমিনের নিকট হইতে জমাওয়াশিল বাকী ও জমাখরচ দেখিতে থাক এবং প্রতিদিনের আমদানি রপ্তানি পত্র সকল দেখিয়া তার সারমর্ম্ম নোট করিয়া রাখ। প্রতি সপ্তাহে আমাকে তাহার রিপোর্ট দিলে উপযুক্তমতে তোমাকে আমি উপদেশ দিব এবং তোমার কার্য্যে তৎপরতা ও বিচক্ষণতা আমার প্রতীতি হইলে আমি তোমাকে মফঃস্বলে থাকিয়া কার্য্য করিবার ভার অর্পণ করিব।"[৩] এইভাবে জমিদারি কার্যে রবীন্দ্রনাথের হাতে-খড়ির সূত্রপাত হইতেছে।

রবীন্দ্রনাথের বিবাহে মহর্ষি উপস্থিত হইতে পারেন নাই; তিনি তখন নদীপথে ভ্রমণ করিতে করিতে বাঁকিপুর পৌছাইয়াছিলেন। সেখানে সংবাদ পাইলেন যে ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে শিলাইদহের জমিদারিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা সারদাপ্রসাদের মৃত্যু হইয়াছে; ঐ দিনই কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের বিবাহ। সারদাপ্রসাদ মহর্ষির কাছে পুত্র অপেক্ষা কম প্রিয় ছিলেন না; যাবতীয় বৈষয়িক কর্মে তিনি ছিলেন তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ; জমিদারি কাজের অনেক হলাহল নিঃশব্দে পান করিয়া তিনি নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন; সকল অন্তর দিয়া, দেহ দিয়া কর্মের সকল গ্লানি বহন করিয়া প্রভুর কার্য যথাসাধ্য সম্পন্ন করিতেন। স্ত্রীবিয়োগের পর মহর্ষির এই প্রথম শোক। তিনি নৌকা ছাড়িয়া দিয়া পাটনা হইতে রেলপথে বোলপুর আসিলেন। সেখান হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া মাত্র তিনদিন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থাকেন ও তারপর সেই যে ঐ বাড়ি ত্যাগ করিয়া বাহির হইলেন, আর সেখানে আসিয়া কখনো বাস করেন নাই।

১ জীবেন্দ্রকুমার গুহ. রবীন্দ্র-প্রবন্ধের আদিপর্ব, বি-ভা-প ১ম বর্ষ ১৩৫০ বৈশাখ পৃ ৬৩৬-৩৯। আলোচনা [১৮৮৫ এপ্রিল ১৫]। ধর্ম, ভারতী ১২৯০ চৈত্র। ডুবদেওয়া, ভারতী ১২৯১ বৈশাখ। সৌন্দর্য্য ও প্রেম, ঐ আষাঢ়। কথাবার্ত্তা, ঐ শ্রাবণ। আত্মা, ত-বো-প ১৮০৬ শক (১২৯১) শ্রাবণ। বৈষ্ণবকবির গান, নবজীবন ১২৯১ কার্তিক। দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ ২য় খণ্ড, পৃ ১-৫১।

২ বিশ্বভারতী পত্রিকা ১ম বর্ষ ১৩৫০ বৈশাখ পৃ ৬১২ (ব্লককরা পত্র)। বিবাহ হয়— (১৮৮৩ ডিসেম্বর ৯) ১২৯০ অগ্রহায়ণ ২৪।

৩ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্র, ২২ অগ্রহায়ণ ৫৪ [ব্রাহ্ম অব্দ] বকসার হইতে লিখিত। দ্র. বি-ভা-প ১৩৫০ ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা। পৃ ২৯৬।

রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হইল বেণীমাধব রায় চৌধুরীর কন্যা ভবতারিণী দেবীর সহিত। খুলনাজিলার দক্ষিণডিহির শুকদেব রায়চৌধুরীর বংশের বেণীমাধব ছিলেন মহর্ষির এস্টেটের কর্মচারী,— সামাজিক আর্থিক আধ্যাত্মিক কোনো দিক হইতেই অভিজাত ঠাকুরপরিবারের সহিত ইঁহাদের তুলনা হইতে পারে না, তবুও বিবাহ সেইখানেই হইল। মহর্ষি যথারীতি কুল গোত্রাদি দেখিয়াই বিবাহ দিতেন, এক্ষেত্রেও তাহার ব্যত্যয় হয় নাই। অভিভাবকদের মতানুসারে, গতানুগতিকের বাঁধাপথ ধরিয়াই সমস্ত নিষ্পন্ন হইয়াছিল। বিবাহ হইল কলিকাতায়, মহর্ষির ব্যবস্থায়। কুলপঞ্জী-অনুসারে কন্যার নাম ছিল ভবতারিণী; বিবাহের সময়ে বধূর বয়স এগারো বৎসর মাত্র। ঠাকুরবাড়িতে নূতন বধূর ঐ পুরানো ধরনের নাম একেবারে অচল, সুতরাং নূতন নামকরণ হইল মৃণালিনী এবং সেই নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন। মনে হয় এই 'মৃণালিনী' নাম রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া, তাঁহার অতিপ্রিয় 'নলিনী' নামেরই প্রতিশব্দ। রবীন্দ্রনাথের বিবাহ আদিব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়।

রবীন্দ্রনাথের মনে জীবনসঙ্গিনী সম্বন্ধে যেসব কল্পনা বা স্বপ্ন ছিল, এই বিবাহের দ্বারা সেগুলি কতদূর সফল হইয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। তাঁহাকে বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের দরিদ্র গৃহস্থের, অল্পশিক্ষিত, দশ-এগারো বৎসরের বালিকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে হইল। রবীন্দ্রনাথ 'য়ুরোপ্রবাসীর পত্রধারা'য়, যথার্থ দোসর, গোলামচোর প্রভৃতি রচনায় জীবনসঙ্গিনী সম্বন্ধে যেসব মনোরম মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা যে বাস্তব জগতে সম্ভব নহে, তাহা প্রাচীনপন্থী পিতার শাসনব্যবস্থায় প্রমাণিত হইল। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রতিভাবান যুবকের উপযুক্ত নারী জগতে অলভ্য না হইলেও বাংলার ক্ষুদ্রগণ্ডি পিরালীসমাজের ব্রাহ্মণশাখার মধ্যে যে দুর্লভ তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা জানিয়াই তাঁহার অভিভাবকগণ তাঁহাদের মনোনীত বালিকাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিতে কবিকে বাধ্য করিলেন। কবিও ভবিতব্যের অমোঘ বিধানজ্ঞানে তাহা মানিয়া লইলেন ও অত্যন্ত স্নেহের সহিত নববধূকে গ্রহণ করিলেন। কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত স্ত্রীকে লিখিত 'চিঠিপত্র' হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি সংসার বিষয়ে কবি কী স্নেহশীল, কী কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন।

ঠাকুরপরিবারে আনন্দউচ্ছ্বাস যেন কানায় কানায় উছলিয়া পড়িতেছে; পরিবারের কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ হইয়া গেল— পুত্রকন্যাগণের বিষয়ে মহর্ষির এই শেষ সামাজিক কর্তব্য অনুষ্ঠান। 'ছোটোবউ'কে তিনি শিক্ষায় দীক্ষায় ঠাকুরপরিবারের অন্যান্য বধূ ও কন্যাদের সমতুল্য করিবার জন্য ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এমন কি বালিকাবধূকে লরেটো হাউসে গিয়া পড়িবারও অনুমতি দিলেন।[১]

পরিবারের সকলেই কলিকাতায়— কেহ জোড়াসাঁকোর ভদ্রাসনে, কেহ সার্কুলার রোডের ভাড়াটে বাড়িতে। আনন্দউল্লাসকে সম্পূর্ণভাবে সম্ভোগ করিবার জন্য একটি অভিনয় করিবার প্রস্তাব হইল; কিন্তু স্থির হইল এ নাটকের রচয়িতা হইবেন অভিনেতারা স্বয়ং। সেইজন্য মোটামুটিভাবে একটা প্লট খাড়া করিয়া অভিনয়ের অংশ নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল— একজন নিজ অংশ লিখিয়া দিলে অপর জন তাঁহার অংশ লিখিবেন, এইরূপে অভিনেতা-লেখকের হাতে হাতে ঘুরিয়া যে জিনিসটা খাড়া হইল, তাহাকে সাহিত্য নাম দেওয়া যায় না; নাটক রচনা এভাবে বারোয়ারি সমবায় পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন হয় না। শেষকালে রবীন্দ্রনাথকেই সেই খসড়াকে ছাটিয়া কাটিয়া একটা চলনসই নাটক খাড়া করিতে হইল। নাটকখানির নাম রাখা হইল, 'নলিনী', রবীন্দ্রনাথের প্রিয় নাম। ইহাই তাঁহার প্রথম গদ্য নাটক। ইহার মধ্যে 'ভগ্নহৃদয়ে'র ছাপ এবং 'মায়ার খেলা'র পূর্বাভাস আছে। 'মায়ের খেলা'র ভূমিকায় কবি বলিয়াছিলেন তাঁহার "পূর্ব্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্য নাটিকার সহিত এই গ্রন্থের সাদৃশ্য আছে।" সেই অকিঞ্চিৎকর গদ্যনাটিকা হইতেছে 'নলিনী', যাহার নাম পর্যন্ত তিনি জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেন নাই। এই নাটকের গল্পাংশ অতি সামান্য।

১ মহর্ষির পত্র, বি-ভা-প ১৩৫০ ২য় বর্ষ পৃ ২৯৭।

যুবক নীরদ নলিনী নামে বালিকাকে ভালোবাসে। নবীনও নলিনীর কাছে আসে, কিন্তু সে নীরদের ন্যায় উচ্ছ্বাসী নহে। তবে সে কথায় পটু, গানে সুকণ্ঠ, বিদ্রূপে চটুল। নলিনী নীরদকে ভালোবাসে; কিন্তু সে-ভালোবাসায় চাঞ্চল্য ছিল না বলিয়া নীরদকে তৃপ্তি দান করিতে পারিত না। নিরাশায় নীরদ দেশত্যাগী হইল। নীরদ চলিয়া গেলে নলিনীর কাছে সমস্ত জগৎ-শূন্য ঠেকিল; সে আপন মনে গাহিল— "মনে রয়ে গেল মনের কথা, শুধু চোখের জল প্রাণের বাথা!" নলিনী ঘর হইতে বাহির হয় না, নবীন তাহাকে ডাকে, প্রতিবেশিনীরা অনুরোধ করে, সে কাহারো কথায় কর্ণপাত করে না। এদিকে নীরদ বিদেশে নীরজা নামে এক যুবতীর প্রেমে আকৃষ্ট হইল; জোর করিয়া নলিনীকে সে ভুলিতে চায়, কিন্তু পারে না। অবশেষে নীরদ নীরজাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিল, সে নলিনীকে দেখাইতে চায় যে তাহাকে ভালোবাসিবার লোক জগতে দুর্লভ নহে। নলিনীর উদ্যানে বসন্ত-উৎসবে নীরদ-নীরজা আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইল। নলিনী তাহাদের সহিত কথাবার্তা বলিতে বলিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। কিন্তু নীরজার শুশ্রূষায় সারিয়া উঠিল। অল্পকাল মধ্যে নীরজাই স্বয়ং ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। মৃত্যুর পূর্বে নীরজা নীরদ ও নলিনীর হাতে হাত সমর্পণ করিয়া বলিল, "তবে আমি চল্লেম বোন্"।

গ্রন্থ রচিত হইল, কিন্তু অভিনীত হইল না। তাঁহাদের পরিবারের উপর দিয়া মৃত্যুর প্রবল ঝড় চলিয়া গেল,— প্রথমেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী অকস্মাৎ আত্মহত্যা করিলেন,[১] এবং সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথও অল্প বয়সে মারা[২] গেলেন। এই দুইটি ঘটনা মাসাধিক কালের মধ্যেই ঘটিয়াছিল, কিন্তু জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেন নাই, তাঁহার নূতন বৌঠাকুরানীর মৃত্যুই তাঁহার কাছে মর্মান্তিক হইয়াছিল বলিয়া ঐ ঘটনা সম্বন্ধে বহু বিস্তারে বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই বৌঠাকুরানীর প্রতি কী পরিমাণ অনুরক্ত ছিলেন তাহা রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠকের নিকট অবিদিত নাই। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন সাত বৎসর তখন কাদম্বরী দেবী বালিকা বধূরূপে এই গৃহে প্রবেশ করেন। তারপর মাতা সারদা দেবীর মৃত্যুর পর তিনিই মাতৃহীন শিশুদের মাতৃস্থান, বন্ধুস্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার সাহিত্যজীবনের পূর্ণাঙ্গ বিকাশে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যেমন সহায়তা করিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার পত্নী কাদম্বরী দেবী কনিষ্ঠ দেবরের সুকুমার চিত্তবৃত্তির সূক্ষ্ম অনুভাবগুলিকে স্নেহের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা উদ্‌বোধিত করিয়াছিলেন। ইনি ছিলেন তরুণ কবির নবীন সাহিত্যজীবনের নিত্য সহচর, শ্রোতা, সমালোচক, বন্ধু।[৩] ইঁহাকে ঘিরিয়াই প্রথম যৌবনের সাহিত্যসৃষ্টির অভিযান চলিয়াছিল। তাই এই মৃত্যুর আঘাত তাঁহাকে কিয়ৎকালের জন্য বিচলিত করিয়াছিল; এবং এই মৃত্যুবিচ্ছেদ তাঁহার অন্তরের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহারই বেদনায় প্রকাশ পায় বিচিত্র রচনা; তাহাদের অন্যতম হইতেছে 'পুষ্পাঞ্জলি'[৪] নামে গদ্য কবিতাগুচ্ছ। আমরা 'পুষ্পাঞ্জলি' হইতে নিম্নে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"হে জগতের বিস্মৃত আমার চিরস্মৃত, আগে তোমাকে যেমন গান শুনাইতাম এখন তোমাকে তেমন শুনাইতে পারি না কেন। এসব লেখা যে আমি তোমার জন্য লিখিতেছি। পাছে তুমি আমার কণ্ঠস্বর ভুলিয়া যাও, অনন্ত পথে চলিতে চলিতে যখন দৈবাৎ তোমাতে আমাতে দেখা হইবে তখন পাছে তুমি আমাকে চিনিতে না পার, তাই প্রতিদিন তোমাকে স্মরণ করিয়া আমার এই কথাগুলি তোমাকে বলিতেছি, তুমি কি শুনিতেছ না। এমন একদিন আসিবে

১ কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু ১২৯১ বৈশাখ ৮ (১৮৮৪ এপ্রিল ১৯)। ২ হেমেন্দ্রনাথের মৃত্যু ১২৯১ জ্যৈষ্ঠ ২৪।

৩ "আমার যে পরমাত্মীয় আত্মহত্যা করে মরেন শিশুকাল থেকে আমার জীবনে পূর্ণ নির্ভর ছিলেন তিনি।" পত্র ১৩২৪ আষাঢ় ৮ (১৯১৭ অক্টোবর ২৫)। অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অকাল বিয়োগে রবীন্দ্রনাথ বালক অমিয়চন্দ্রকে যে সান্ত্বনাপত্র দেন তাহা হইতে উদ্ধৃত। দ্র. কবিতা পত্রিকা ১৩৪৮ কার্তিক পৃ ৬।

৪ পুষ্পাঞ্জলি, ভারতী ১২৯২ বৈশাখ। র-র ১৭শ পৃ ৪৮৫-৯৫।

যখন এই পৃথিবীতে আমার কথার একটিও কাহারও মনে থাকিবে না—কিন্তু ইহার একটি-দুটি কথা ভালোবাসিয়া তুমিও কি মনে রাখিবে না! যে সব লেখা তুমি এতো ভালোবাসিয়া শুনিতে তোমার সঙ্গে যাহাদের বিশেষ যোগ, একটু আড়াল হইয়াছে বলিয়াই তোমার সঙ্গে আর কি তাহাদের কোনো সম্বন্ধ নাই! এত পরিচিত লেখার একটি অক্ষরও মনে থাকিবে না? তুমি কি আর এক দেশে আর এক নূতন কবির কবিতা শুনিতেছ।"…"আমাকে যাহারা চেনে সকলেই তো আমার নাম বলিয়া ডাকে, কিন্তু সকলেই কিছু একই ব্যক্তিকে ডাকে না, এবং সকলেই কিছু একই ব্যক্তিকে সাড়া দেয় না। এক একজনে আমার এক-একটা অংশকে ডাকে মাত্র, আমাকে তাহারা ততটুকু বলিয়াই জানে। এইজন্য আমরা যাহাকে ভালোবাসি তার একটা নূতন নামকরণ করিতে চাই; কারণ সকলের-সে ও আমার-সে বিস্তর প্রভেদ। আমার যে গেছে সে আমাকে কতদিন হইতে জানিত;— আমাকে কত প্রভাতে, কত দ্বিপ্রহরে, কত সন্ধ্যাবেলায়, সে দেখিয়াছে! কত বসন্তে, কত বর্ষায়, কত শরতে আমি তাহার কাছে ছিলাম! সে আমাকে কত স্নেহ করিয়াছে, আমার সঙ্গে কত খেলা করিয়াছে, আমাকে কত শতসহস্র বিশেষ ঘটনার মধ্যে খুব কাছে থাকিয়া দেখিয়াছে! যে-আমাকে সে জানিত সে সেই সতেরো বৎসরের খেলাধূলা, সতেরো বৎসরের সুখ দুঃখ, সতেরো বৎসরের বসন্ত বর্ষা। সে আমাকে যখন ডাকিত তখন আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের অধিকাংশই আমার এই সতেরো বৎসর তাহার সমস্ত খেলাধুলা লইয়া তাহাকে সাড়া দিত। ইহাকে সে ছাড়া আর-কেহ জানিত না, জানে না।"

"আমি কেবল ভাবিতেছি, এমন তো আরো সতেরো বৎসর যাইতে পারে!… কতশত দিনরাত্রি একে একে আসিবে কিন্তু তাহারা একেবারেই তিনি-হীন হইয়া আসিবে!…যদি অনেক দিন পরে সহসা দেখা হয়, তখন তাঁহার নিকটে আমার অনেকটা অজ্ঞানা, আমার নিকট তাঁহার অনেকটা অপরিচিত। অথচ আমরা উভয়ের নিতান্ত আপনার লোক।"[১]

'পুষ্পাঞ্জলি'র মধ্যে কাদম্বরী দেবীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ভক্তি ভালোবাসা সমস্তই সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। রচনার মধ্যে উচ্ছ্বাস আছে নিশ্চয়ই, কারণ তাহা আন্তরিক শোকাশ্রুতে পূর্ণ। শোকের অবস্থায় রচিত বলিয়া তাহা যথার্থ সাহিত্যধর্মী হইতে পারে নাই; সেইজন্যই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ ঐ রচনাকে কোনো গ্রন্থের মধ্যে স্থান দেন নাই।

এই ঘটনার প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে জীবনস্মৃতি লিখিবার সময়েও তিনি এই বিচ্ছেদবেদনার কথা খুবই বিস্তৃত করিয়া লিখিয়াছিলেন। "জীবনের মধ্যে কোথাও যে কিছুমাত্র ফাঁক আছে তাহা তখন জানিতাম না;… এমন সময় কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যখন এক মুহূর্তের মধ্যে ফাঁক করিয়া দিল তখন মনটার মধ্যে কি ধাঁধাই লাগাইয়া গেল! চারিদিকে গাছপালা মাটিজল চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা তেমনি নিশ্চিত সত্যেরই মত বিরাজ করিতেছে অথচ তাহাদেরই মাঝখানে তাহাদেরই মত যাহা নিশ্চিত সত্য ছিল, এমন কি, দেহ প্রাণ হৃদয় মনের সহস্রবিধ স্পর্শের দ্বারা যাহাকে তাহাদের সকলের চেয়েই বেশি সত্য করিয়াই অনুভব করিতাম সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে এক নিমেষে স্বপ্নের মত মিলাইয়া গেল, তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল একি অদ্ভুত আত্মখণ্ডন। যাহা আছে এবং যাহা রহিল না, এই উভয়ের মধ্যে কোনো মতে মিল করিব কেমন করিয়া।"

'পুষ্পাঞ্জলি' রচনার প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে লিখিত 'লিপিকা'র কয়েকটি রচনার ভাষায় ও ভাবের সহিত আশ্চর্য

১ রবীন্দ্র রচনাবলী ১৭শ খণ্ড গ্রন্থপরিচয় পৃ ৪৮৫-৯৫। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি হইতে ইহা সম্পাদিত। দ্র. ভারতী ১২৯২ বৈশাখ ৪-১০।

মিল দেখা যায়; আমাদের মনে হয় পুষ্পাঞ্জলির পুরাতন পাণ্ডুলিপি হাতে পাইয়া কবি নূতন ভঙ্গিতে পুরাতন ভাবকে ব্যক্ত করিলেন। লিপিকার এই রচনা কয়টি হইতেছে,—সতেরো বছর, প্রথম শোক, সন্ধ্যা ও প্রভাতে।

পুষ্পাঞ্জলির প্রথম পরিচ্ছেদ 'প্রভাত'। তাহাতে আছে, "সূর্যদেব তুমি কোন্ দেশ অন্ধকার করিয়া এখানে উদিত হইলে? কোন্খানে সন্ধ্যা হইল? এদিকে তুমি জুঁইগুলি ফুটাইলে, কোন্খানে রজনীগন্ধা ফুটিতেছে; প্রভাতের কোন্ পরপারে সন্ধ্যার মেঘের ছায়া অতি কোমল লাবণ্যে গাছগুলির উপরে পড়িয়াছে? এখানে আমাদিগকে জাগাইতে আসিলে, সেখানে কাহাদিগকে ঘুম পাড়াইয়া আসিলে?" লিপিকার 'সন্ধ্যা ও প্রভাতে'তে আছে "এখানে নামল সন্ধ্যা। সূর্যদেব, কোন্দেশে কোন্ সমুদ্রপারে তোমার প্রভাত হল?" পাঠক যদি লিপিকার কথিকাত্রয় পুনরায় এখন একবার পাঠ করেন তো দেখিবেন এই মহীয়সী নারীর প্রতি কবির কী গভীর প্রীতি ও ভক্তি ছিল, ও তাঁহার তিরোধানে মনে কী গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। ইঁহাকে জীবনে কবি কোনোদিন বিস্মৃত হন নাই; জীবনের গোধূলিতে তিনি তাঁহার কাব্য-জীবনের প্রথম আরাধ্যা দেবীকে নানাভাবে বারে বারে স্মরণ করিয়াছেন। 'আকাশপ্রদীপে'র শ্যামা, কাঁচা আম, 'নবজাতকে'র বধূ প্রভৃতি কবিতার মধ্যে তাঁহারই কথা নানা সুরে ধ্বনিয়াছে।

ইঁহার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বহু গ্রন্থ উৎসর্গ করেন, কতকগুলি তাঁহার জীবিতকালে, কতকগুলি তাঁহার মৃত্যুর পর। 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রে'র মধ্যে তাঁহারই কথা সব থেকে মনে হইত বলিয়া লেখা আছে। 'ভগ্নহৃদয়ে'র উৎসর্গ তাঁহাকে স্মরিয়া লেখা। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' আছে "তোমাকে দিলাম"; সে 'তুমি' ইনিই। 'বিবিধপ্রসঙ্গে'র 'সমাপনে' তাঁহারই কথা আছে। 'ছবি ও গান' তাঁহার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি উৎসর্গ করেন 'শৈশব সংগীত' ও 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। ভানুসিংহের পদাবলীর উৎসর্গে আছে— "ভানুসিংহের কবিতাগুলি ছাপাইতে তুমি আমাকে অনেকবার অনুরোধ করিয়াছিলে। তখন সে অনুরোধ পালন করি নাই। আজ ছাপাইয়াছি, আজ তুমি আর দেখিতে পাইলে না।" শৈশবসংগীতের উৎসর্গপত্রে আছে, "এ কবিতাগুলিও তোমাকে দিলাম। বহুকাল হইল, তোমার কাছে বসিয়াই লিখিতাম, তোমাকেই শুনাইতাম। সেই সমস্ত স্নেহের স্মৃতি ইহাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। তাই মনে হইতেছে তুমি যেখানেই থাক না কেন, এ লেখাগুলি তোমার চোখে পড়িবেই।"

যে মৃত্যুর আঘাত এক মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের জীবনের সমস্ত সজীবতা ও সরসতাকে সাময়িকভাবে শুষ্ক ও শীর্ণ করিয়া দিয়াছিল, তাহা সাহিত্যসৃষ্টিকল্পে সার্থক হইয়াছিল। কবিতাগুলি শোকের মুহূর্তে যে রচিত নহে তাহা বুঝা যায় কবিতার উৎকর্ষ হইতে; কালের একটু ব্যবধান না থাকিলে অন্তরের পরিপ্রেক্ষণা সত্য হয় না; চোখের অতি নিকটে জিনিস আনিলে তাহাকে দেখা যায় না, অনুভূতি সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। এই বিষাদঘন মনোভাবকে তিনি ব্যক্ত করেন 'কোথায়'[১] কবিতাটিতে। অজানা মৃত্যুপথের যাত্রীর উদ্দেশেই যে উহা রচিত, তাহা কবিতাটি একবার মাত্র পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। পুষ্পাঞ্জলির পাণ্ডুলিপির মধ্যে ইহার প্রথম খসড়া ছিল।

> হায়, কোথা যাবে!
> অনন্ত অজানা দেশ, নিতান্ত যে একা তুমি
> পথ কোথা পাবে! হায়, কোথা যাবে!…
> কঠিন বিপুল এ জগৎ,
> খুঁজে নেয় যে যাহার পথ।
> স্নেহের পুতুলি তুমি সহসা অসীমে গিয়ে
> কার মুখে চাবে। হায় কোথা যাবে!
> মোরা বসে কাঁদিব হেথায়, শূন্যে চেয়ে ডাকিব তোমায়;
> মহা সে বিজন মাঝে হয় তো বিলাপধ্বনি
> মাঝে মাঝে শুনিবারে পাবে, হায় কোথা যাবে।"

ইহার সহিত 'শান্তি', 'পাষাণী মা' ও 'আকুল আহ্বান'[২] কবিতাত্রয় পাঠ করিলে এই বিষাদমাখা ভাবেরই সন্ধান পাওয়া যাইবে। এই মনোভাবের কথাই জীবনস্মৃতিতে প্রকাশ পাইয়াছে; "কিছুদিনের জন্য জীবনের প্রতি আমার অন্ধ

১ কোথায়, ভারতী ১২৯১ পৌষ। দ্র. কড়ি ও কোমল।
২ বালক, ১২৯২ আশ্বিন। দ্র. কড়ি ও কোমল।

আসক্তি একেবারেই চলিয়া গিয়াছিল।·· কিছুকালের জন্য আমার একটা সৃষ্টিছাড়া রকমের মনের ভাব ও বাহিরের আচরণ দেখা দিয়াছিল। সংসারের লোকলৌকিকতাকে···মানিয়া চলিতে আমার হাসি পাইত। সে সমস্ত যেন আমার গায়েই ঠেকিত না।"

কিন্তু জীবনে কখনো কোনো ভাব— সে দুঃখই হউক, আর সুখই হউক— দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। Pure and complete sorrow is as impossible as pure and complete joy— টলস্টয়ের এই উক্তি অতি সত্য। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কালব্যবধানে দুঃখসুখের সকল অনুভূতি লোপ পায়; তাহারা শান্ত হইয়া মনের অবচেতনস্তরে তলাইয়া যায়; তারপর কোনো অনুকূল বায়ুহিল্লোলে তাহারা পল্লবিত, কুসুমিত, কণ্টকিত হইয়া উঠে এবং নব নব সাহিত্যসৃষ্টিতে সার্থক হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনের কোনো অবস্থাকেই চরম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাই মৃত্যুশোকে তাঁহাকে কর্মবিমুখ জড়তার মধ্যে নিমজ্জিত করিতে পারে নাই। তাঁহার বিবাহের মাত্র চারিমাস পরে নবীন জীবনের প্রথমে এই শোক। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই লিখিয়াছেন, "ভুলিবার শক্তি প্রাণশক্তির একটা প্রধান অঙ্গ;··· এইজন্য জীবনে প্রথম যে মৃত্যু কালো ছায়া ফেলিয়া প্রবেশ করিল, তাহা আপনার কালিমাকে চিরন্তন না করিয়া ছায়ার মতই একদিন নিঃশব্দপদে চলিয়া গেল।" 'যোগিয়া' ও 'ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি'র মধ্যে এই মুক্তিপ্রয়াসের ধ্বনি জাগিয়াছে। শেষোক্তটিতে বলিতেছেন—

মিছে শোক, মিছে এই বিলাপ কাতর
সম্মুখে রয়েছে পড়ে যুগ যুগান্তর।

অতীতের 'পুরাতন'[১] বিষাদকে বিদায় দিবার জন্য বলিলেন—

হেথা হতে যাও, পুরাতন!
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে।
আবার বাজিছে বাঁশি, আবার উঠিছে হাসি,
বসন্তের বাতাস বয়েছে।

মনের মধ্যে পুরাতন স্মৃতি বার বার আসিয়া উঁকি মারিতেছে তাই যেন কবি বলিতেছেন— 'তুমি কেন ঢাল আসি তারি মাঝে বিলাপ উচ্ছ্বাস।'[২] কবি পুরাতনকে বিদায় দিয়া নূতনকে আহ্বান করিয়া ঘরে লইলেন— সত্যই তো তাঁহার ঘরে আজ নূতন লোক আসিয়াছে—

এই যে রে মরুস্থল, দাবদগ্ধ ধরাতল,
এইখানে ছিল 'পুরাতন',
এক দিন ছিল তার শ্যামল যৌবনভার,
ছিল তার দক্ষিণ-পবন।
যদি রে সে চলে গেল, সঙ্গে যদি নিয়ে গেল
গীত গান হাসি ফুল ফল,
শুষ্ক-স্মৃতি কেন মিছে রেখে তবে গেল পিছে
শুষ্ক শাখা শুষ্ক ফুলদল।
···
নহে নহে, সে কি হয়! সংসার জীবনময়,
নাহি হেথা মরণের স্থান।
আয়রে, নূতন, আয়, সঙ্গে করে নিয়ে আয়
তোর সুখ, তোর হাসি গান।···
এ কি ঢেউ-খেলা হায়, এক আসে আর যায়,
কাঁদিতে কাঁদিতে আসে হাসি,
বিলাপের শেষ তান না হইতে অবসান
কোথা হতে বেজে ওঠে বাঁশি।...
নারে, করিব না শোক, এসেছে নূতন লোক,
তারে কে করিবে অবহেলা।
সেও চলে যাবে কবে, গীত গান সাঙ্গ হবে,
ফুরাইবে দু-দিনের খেলা।

রবীন্দ্রনাথের সদাপ্রবহমান মনের যে চিত্র তাঁহার কাব্যের মধ্যে দিয়া পাইলাম তাঁহার প্রায় সমকালীন একটি গদ্যরচনার মধ্যে মনের এই নিরাসক্ত ভাবের ব্যাখ্যা পাই। 'রুদ্ধগৃহ'[৩] শীর্ষক প্রবন্ধটির মধ্যে কবির এই

১ পুরাতন, ভারতী ১২৯২ চৈত্র। দ্র. কড়ি ও কোমল পৃ ২। ২ তু. মৃত্যুর পরে, ৫ বৈশাখ ১৩০১) চিত্রা।
৩ রুদ্রগৃহ, বালক ১২৯২ আশ্বিন-কার্তিক। পৃ ৩৩৬-৩৯। দ্র. বিবিধ প্রবন্ধ।

রুদ্ধমনের সংগ্রামের চিত্র পাই ; তিনি এই অস্বাভাবিক রুদ্ধতাকে জীবনে অতিস্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া স্বীকার করিলেন না। তিনি বলিলেন, "পৃথিবী মৃত্যুকেও কোলে করিয়া রাখে— জীবনকেও কোলে করিয়া রাখে— পৃথিবীর কোলে উভয়েই ভাইবোনের মতো খেলা করে।" "পৃথিবীতে যাহা আসে, তাহাই যায়" এই অতিসত্য কথা তাঁহার কাছে সেদিন নূতনভাবে মহাসত্যরূপেই দেখা দিয়াছিল ; তাই বলিলেন,— "এই প্রবাহেই জগতের স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। কণামাত্রের যাতায়াত বন্ধ হইলে জগতের সামঞ্জস্য ভঙ্গ হয়। জীবন যেমন আসে, জীবন তেমনি যায় ; মৃত্যুও যেমন আসে, মৃত্যুও তেমনি যায়। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা কর কেন ? হৃদয়টাকে পাষাণ করিয়া সেই পাষাণের মধ্যে তাহাকে সমাহিত করিয়া রাখ কেন।... ছাড়িয়া দাও, তাহাকে যাইতে দাও— জীবন মৃত্যুর প্রবাহ রোধ করিয়ো না। হৃদয়ের দুই দ্বার সমান খুলিয়া রাখ। প্রবেশের দ্বার দিয়া সকলে প্রবেশ করুক। প্রস্থানের দ্বার দিয়া সকলে প্রস্থান করুক।" এই দার্শনিক নির্বিকার মনোভাব অচিরেই ফিরিয়া আসিয়াছিল বলিয়া তাঁহার সাহিত্যধারা যথারীতি ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর, বিচিত্র হইতে বিচিত্রতর হইয়া সম্পদশালী হইতে লাগিল।

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর একমাস পরে 'সরোজিনীপ্রয়াণ'[১] রচিত ; এই রচনার মধ্যে যে লঘুভাব, যে সৌন্দর্যপ্রিয়তা, যে হাস্যোজ্জ্বল আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইয়াছে তাহার সহিত সেই যুগের 'কোথায়' 'পুরাতন', 'নূতন' প্রভৃতি কবিতার সুর বা জীবনস্মৃতিতে বর্ণিত মনোভাবের বা পুষ্পাঞ্জলির উচ্ছ্বাসের সম্বন্ধ আবিষ্কার করা কঠিন। আসল কথা, তাঁহার শোক বা সুখ কোনোটিই মনে স্থায়ী রেখাপাত করিত না— তাঁহার ভাবাবেগের পূর্ণ প্রকাশের জন্য— তাহা শোকই হউক বা সুখই হউক, তাহাকে উদ্‌বোধিত করিবার জন্য যতটুকু আঘাত (stimuli) প্রয়োজন হইত, ততটুকু মাত্র তিনি সহ্য করিতেন— তদতিরিক্তকে আমল দিতেন না। এই নিরাসক্তি তাঁহার চরিত্রে যে নৈর্ব্যক্তিকতা দান করিয়াছিল, তাহার জন্য তিনি অন্যকে দুঃখ দিয়াছেন। তাঁহার দুঃখ intellectualised emotionএর একটি রূপ মাত্র, তাঁহার কাব্যসৃষ্টির পক্ষে যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকুমাত্র ; তারপর সৃষ্টিসুখ সম্ভোগ হইয়া গেলে বিস্মৃতির চির পাথারে স্মৃতি ডুবিয়া মরিত।

কিন্তু ইহা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র পরিচয় নহে ; তাঁহার কর্মহীন রুদ্ধজীবন আত্মপ্রকাশের জন্য উদ্‌গ্রীব, কিন্তু পথ পায় নাই। তাই সমগ্র সৃজনীশক্তিকে অন্যের সমালোচনায় ও ভর্ৎসনায় ক্ষয়িত করিতে ব্যাপৃত হন, সমসাময়িক গদ্যরচনা তাহারই সাক্ষ্য। কিন্তু কল্পনা ও কাব্য, ছবি ও গান যেখানে বহুমুখী শোভায় মূর্তি লইয়াছে— সেইখানেই তিনি সার্থক।

কড়ি ও কোমলের কবিতা এই সময়ের অভিনব সৃষ্টি। কিন্তু স্রষ্টার পক্ষে চিত্র ফুটাইতে হইবে, মাঝে মাঝে গল্প বলা চাই,— শুধু অন্তর্বিষয়ী কাব্যরচনায় সাহিত্যসৃষ্টির আনন্দ সম্পূর্ণ হয় না। তাই লিখিলেন 'কাঙালিনী'[২] কবিতা ; গল্পের আভাস দিলেন 'ঘাটের কথা'[৩] ও 'রাজপথের কথা'[৪] রচনাদ্বয়ে। পর বৎসরে পূর্ণোদ্যমে গল্প উপন্যাস লিখিবেন এ যেন তাহারই উদ্‌বোধন।

ব্রাহ্মসমাজের সমর্থন

১২৯১ সালটা নানা কারণে বাংলার সামাজিক ইতিহাসে স্মরণীয়। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ এতকাল ব্রাহ্মসমাজ ও খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের যুগপৎ আক্রমণ হইতে কোনো রকমে আত্মরক্ষা করিয়া নিজ সত্তা ও সত্যকে বজায় রাখিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সংস্কারের প্রতিক্রিয়ায় সংরক্ষণের স্পৃহা মানুষের মধ্যে স্বভাবতই জাগে। প্রাচীন সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহকে সংরক্ষণ ও তাহার মতবাদ সমর্থন করিয়া শিক্ষিত হিন্দুসমাজ নব জাতীয়তাকে সুদৃঢ় করিতে উদ্যত

১ সরোজিনীপ্রয়াণ। রচিত ১২৯১ জ্যৈষ্ঠ ১১ [১৮৮৪ মে ৩] ভারতী ১২৯১ শ্রাবণ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ। দ্র বিচিত্র প্রবন্ধ দ্র ১ম সংস্কার (সংক্ষিপ্তীকৃত) ২ প্রচার ১২৯১ আশ্বিন। ৩ ভারতী ১২৯১ আশ্বিন। ৪ নবজীবন ১২৯১ অগ্রহায়ণ।

হইয়াছিল। এই নব আন্দোলনের যাজ্ঞিক হইলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁহার ন্যায় তেজস্বী চিন্তাশীল লেখক এই নূতন ভাবধারার কর্ণধার হওয়ায় সত্যই নব্যহিন্দুসমাজের জড়দেহে নবীন প্রাণ সঞ্চার হইল। এই সংরক্ষণ ও সমর্থন নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য 'নবজীবন' ও 'প্রচার' পত্রিকাদ্বয়ের যুগপৎ অবির্ভাব। নবজীবন (১২৯১ শ্রাবণ) সম্পাদন করিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার, প্রচার (১২৯১ শ্রাবণ ১৫) প্রকাশ করিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা রাখালচন্দ্র।

ব্রাহ্মসমাজে গত দশ বৎসরের মধ্যে বহু পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। যে-শাখা দেবেন্দ্রনাথের সমাজসংস্কার বিরোধী মনোভাবের জন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে কেশবচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া তথা-কথিত গুরুবাদের আশঙ্কা দেখা দিল। তখন তরুণ সাম্যবাদীর দল কেশবকে ত্যাগ করিয়া নূতন যে 'সমাজ' গঠন করিলেন তাহার ভিত্তি স্থাপিত হইল যুক্তিবাদ বা নিয়মতান্ত্রিকতার উপর— শাস্ত্র নয়, মহাপুরুষ নয়,— সংঘ হইল নিয়ামক। এই সমাজের অন্যতম নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র 'সঞ্জীবনী' নামে সাপ্তাহিক প্রকাশ করিলেন; তাহার মটো বা মন্ত্র ছিল 'সাম্য, মৈত্রী স্বাধীনতা', ফরাসিবিপ্লবের বুলি। ইঁহারা ছিলেন উগ্র সমাজসংস্কারকের দল,— সংস্কারকের সকল দোষ এবং গুণ সমভাবে ইঁহাদের মধ্যে ছিল। প্রাচীনের কুসংস্কারকে ভাঙিবার উৎসাহ-আতিশয্যে ইহারা সংরক্ষণ ও পরম্পরাগত ঐতিহ্যকে অবহেলা করিয়া এমনিভাবে আগাইয়া চলিলেন যে, যাহাদের জন্য সংস্কার প্রয়োজন, তাহারাই ক্রমে দূর হইতে দূরান্তরে পিছাইয়া পড়িতে লাগিল, কেবল সংস্কারের দল আগাইয়া চলিবার নেশায় চলিতে চলিতে সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন।

সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী[১] মাসিকপত্র, নবজীবন ও প্রচার হিন্দুসমাজের কল্যাণার্থে সনাতন পথ হইতে ভ্রষ্ট না হইয়া নূতনের পথে চলিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন: কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারপন্থীরা যেমন সংস্কার হইতে ভাঙনের পথেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বেশি, হিন্দুসমাজের নূতন সংস্কারকের দলও সংরক্ষণ ও সমর্থন-পন্থী হইয়া প্রগতির পথকে অবরুদ্ধ করিয়া দিলেন। ভাঙনপন্থীরা যেমন হিন্দুর সব কিছুকেই মন্দ বলিয়া বিসর্জন করিলেন, সংরক্ষণপন্থীরা তেমনি সব কিছুকেই দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক এমনকি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার দ্বারা সমর্থন করিতে লাগিলেন। সঞ্জীবনী ও বঙ্গবাসী এই দুই উল্টা পথের পথিক।

আদিব্রাহ্মসমাজ সমাজ-সংস্কারসম্বন্ধে কোনো প্রকার কালাপাহাড়ী বা radical মত পোষণ করিতেন না; তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্র ও তত্ত্ববিদ্যাদির আলোচনায় রত থাকিয়া মনে করিতেন তাঁহাদের ধর্মমতই হইতেছে মূল হিন্দুধর্মসম্মত, আদর্শ হিন্দুর অনুকরণীয়। সুতরাং হিন্দুর যাহা কিছু গৌরবের তাহার রক্ষী তাঁহারাই, নূতন সংস্কারপন্থী ও নূতন সংরক্ষণপন্থী উভয়েই ভ্রান্ত। সেইজন্য হিন্দুসমাজবিরোধী কোনো অনুষ্ঠান তাঁহাদের সমর্থন বা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিত না। কেশব-চন্দ্রের অসবর্ণবিবাহ বিলও (১৮৭২) তাঁহাদের সমর্থন পায় নাই; বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহও তাঁহারা অনুমোদন করিতে পারেন নাই। এতদ্ সত্ত্বেও বঙ্কিমপ্রমুখ নব্য হিন্দু নেতারা আদিব্রাহ্মসমাজের এই দাবি স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না; রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' বঙ্গদর্শনে সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত হয় নাই, এবং সে রচনার লেখক স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই। আদিসমাজের বিশ্বাসের মূলতত্ত্ব নিরাকার পরমেশ্বরের আরাধনা; নব্য হিন্দুরা এই তত্ত্বকেও পরম সত্য বলিয়া মানিতে একেবারে নারাজ। তাই অচিরেই নব্য হিন্দুসমাজের সহিত আদিসমাজের মধ্যে বিরোধ বাধিল। এই ইতিহাসটুকু বলা প্রয়োজন, কারণ অবশেষে এই বিবাদ বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মসীযুদ্ধে পরিণত হইয়াছিল।

বঙ্কিমের মন ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কোনোদিনই প্রসন্ন ছিল না, এমনকি বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের তিনি ছিলেন পরম বিরোধী। তাঁহার প্রবন্ধে, উপন্যাসে তিনি তাঁহার ব্রাহ্মবিদ্বেষ ও বিদ্যাসাগরের মতের প্রতি

১ বঙ্গবাসী সাপ্তাহিক, ১২৮৮, অগ্র ২৬ [১৮৮১, ডিসেম্বর ১০] প্রথম প্রকাশিত হয়।

অশ্রদ্ধা কারণে অকারণে প্রকাশ করিয়াছিলেন।[১] কালে সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র নিজ প্রতিভার রাজ্যে নিজ শক্তিকে সংকুচিত করিয়া আর রাখিতে পারেন নাই। সমাজসংস্কার বিষয়ে সংরক্ষণ ও সমর্থননীতি প্রচার করিয়া তিনি নিশ্চেষ্ট থাকিলেন না, ধর্মব্যাখ্যাতার ভূমিকায় বঙ্গসাহিত্যে অবতীর্ণ হইলেন; হিন্দুধর্মের বিশেষ ব্যাখ্যা আরম্ভ হইল। আদিব্রাহ্মসমাজের সহিত বিরোধ বাধিল এইখানে; এতদিন আদিসমাজ মনে করিতেন যে হিন্দুধর্মতত্ত্বের একমাত্র বোদ্ধা ও ব্যাখ্যাতা তাঁহারাই; এমন সময় বঙ্কিম কোম্‌ত-প্রমুখ-পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের মতের সহিত গীতার মতের একটা সমন্বয় খাড়া করিয়া বিশেষ একটি মতকে হিন্দুধর্ম বলিয়া প্রচার করিতে শুরু করিলেন। 'নবজীবনে'র (১২৯১ শ্রাবণ) ও 'প্রচারে'র (১২৯১ শ্রাবণ) প্রথম সংখ্যাতে ধর্মজিজ্ঞাসা ও হিন্দুধর্ম শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে বঙ্কিমের নিজস্ব ধর্মমত ব্যাখ্যাত হইয়াছিল।

বঙ্কিমের সহিত আদিসমাজের মতের পার্থক্য কোথায় এবং কিসের জন্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (১২৯১ ভাদ্র) বন্ধুর অমন উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন, তাহা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হইতে স্পষ্ট হইবে।

"সম্প্রতি···কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি একটি নূতন ধর্মমত উদ্ভাবিত করিয়াছেন। সে মত এই যে কোম্‌তের মতই প্রকৃত হিন্দুধর্ম। 'নবজীবন' নামক অভিনব সাময়িক পত্রিকায় এই মত সমর্থিত হইতে দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম।··লেখক এই মত সমর্থন করিয়াছেন যে চিরচমৎকৃতি ও সুখই ধর্ম এবং হিন্দুশাস্ত্রসকল এই মত প্রতিপাদন করিতেছেন। এই মত একটি অদ্ভুত মত বলিতে হইবে। আমরা যদি উক্ত প্রস্তাবের লেখক বঙ্কিমবাবুকে দিনরাত্রি চমৎকারভাবে দেখি তাহা কি ধর্ম বলা যাইতে পারে?"

বিবাদটা আরও ঘোরালো হইয়া উঠিল অন্য দিক দিয়া। নবজীবনের প্রথম সংখ্যায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সামান্য সমালোচনা ছিল। ঐ প্রবন্ধের উত্তর ও নবজীবনকে আক্রমণ করিয়া এক পত্র 'সঞ্জীবনী'তে (১২৯১ শ্রাবণ) বাহির হয়; লেখক বোধ হয় ছিলেন কৈলাসচন্দ্র সিংহ। এই পত্রের উত্তর দেন 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিকে চন্দ্রনাথ বসু এবং "গালাগালির রকমটা দেখিয়া 'ইতর' শব্দটা লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন।" তদুত্তরে সঞ্জীবনীতে আর একখানি বেনামী পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, পত্রশেষে ছিল 'র'। অনেকেই মনে করেন ঐ পত্রের লেখক রবীন্দ্রনাথ। লেখক 'ইতর' শব্দটাকে পাল্টাইয়া চন্দ্রনাথের উপর চতুরভাবে আরোপ করিলেন। মোট কথা কোনো পক্ষই হার মানিবার বা দমিবার পাত্র ছিলেন না।

আদিব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই আগ্রহ দেখিয়া মহর্ষি বোধ হয় মনে মনে খুশি হইলেন; মৃতকল্প আদিসমাজের মধ্যে পুনরায় প্রাণসঞ্চার করা যায় ভাবিয়া তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক ও রবীন্দ্রনাথকে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদে নির্বাচিত করাইলেন (১২৯১ আশ্বিন)। যুবক রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক পদে অধিরূঢ় হইয়া নিজ কর্তব্য অত্যন্ত আগ্রহ ও নিষ্ঠার সহিত সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই উৎসাহ ও আগ্রহাতিশয্যের ফলেই বঙ্কিমের সহিত তাঁহার মসীযুদ্ধ হয়।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি 'প্রচার' ও 'নবজীবনে' বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্ম,— যে-হিন্দুধর্ম তিনি খাড়া করিয়াছিলেন— তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নিয়মক্রমে লিখিতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রচারের প্রথম সংখ্যায় হিন্দুধর্ম নামক প্রবন্ধে দুইটি হিন্দুর তুলনা করেন। একজন আচারভ্রষ্ট কিন্তু যথার্থ ধর্ম বা সুনীতিপরায়ণ, আর একজন আচারশালী হইয়াও যথার্থ ধর্মভ্রষ্ট। প্রথমটির উদাহরণে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন, ঐ ব্যক্তি কখনো মিথ্যা বলে না, তবে যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানে কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্বক মিথ্যা

১ দ্র. বঙ্গদর্শন ১২৭৯ জ্যৈষ্ঠ, বিষবৃক্ষ ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ। তারাচরণ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ব্রাহ্মসমাজকে নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা দেখা যায়। এমনকি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকেও ঐ উপন্যাস মধ্যে আক্রমণ করিতে ছাড়েন নাই। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বঙ্কিমের মনোভাব সুপরিচিত।

কহেন। প্রবন্ধটি স্থিরভাবে পড়িলে তাহার মধ্যে অন্যায় কিছু আবিষ্কার করা যায় না। এই প্রবন্ধটি যখন প্রকাশিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথ 'প্রচার' ও 'নবজীবন' সম্বন্ধে কোনো বিরুদ্ধ মত পোষণ করিতেন বলিয়া মনে হয় না, কারণ উভয় পত্রিকাতেই তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইতেছিল। আশ্বিন মাসে আদিসমাজের সম্পাদক পদ গ্রহণ করার কিছুকাল পরে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'হিন্দুধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধের সমগ্র অর্থ গ্রহণ না করিয়াই এক দীর্ঘ সমালোচনা লিখিয়া ফেলিলেন। প্রবন্ধটির নাম দেন 'একটি পুরাতন কথা',— সিটি কলেজের হলে (১৫ নং মির্জাপুর স্ট্রীট) উহা পঠিত হয়। এই প্রবন্ধ লইয়া রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে যে লেখনী-দ্বন্দ্ব হয়, তাহা লোকে বিস্মৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সাময়িক সাহিত্য অনুসন্ধান করিলে এখনো তাহাদের পাওয়া যায়। তবে দুই মহৎ ব্যক্তি— একজন সাহিত্য সাম্রাজ্যের পীঠস্থানে অধিরূঢ় প্রবীণ লেখক, অপরজন সাহিত্যক্ষেত্রের দ্বারে উপনীত নবীন লেখক— এই দুই মহৎ ব্যক্তির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব হইয়াছিল, তাহা বর্তমান যুগের বাঙালি পাঠকদের নিকট কৌতুকপ্রদ লাগিবে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের উত্তরে লিখিয়াছিলেন, "সুবিধার অনুরোধে সমাজের ভিত্তিভূমিতে যাঁহারা ছিদ্র খনন করেন, ··· তাঁহারা এমন ভাব প্রকাশ করেন যে, মিথ্যাকথা বলা খারাপ, কিন্তু political উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলিতে দোষ নাই। ···উদ্দেশ্য যতই বৃহৎ হউক না কেন, তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর উদ্দেশ্য আছে। ···আমরা যদি সমস্ত জাতিকে কোনো উপকার সাধনের জন্য মিথ্যাচরণ শিখাই তবে সেই মিথ্যাচরণ যে তোমার ইচ্ছার অনুসরণ করিয়া কেবলমাত্র উপকারটুকু করিয়াই অন্তর্হিত হইবে, তাহা নহে, তাহার বংশ সে স্থাপনা করিয়া যাইবে। বৃহত্ত্ব একটিমাত্র উদ্দেশ্যের মধ্যে বদ্ধ থাকে না; তাহার দ্বারা সহস্র উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।" রবীন্দ্রনাথের মতে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত; তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশে লিখিলেন, "কোনখানেই মিথ্যা সত্য হয় না; শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।"[১]

বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধের উত্তর দেন,— 'আদিব্রাহ্মসমাজ ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায়'[২] শীর্ষক প্রবন্ধে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রতি কোনো আক্রমণ হইলে প্রায়ই তাহার কোনো জবাব দিতেন না। রবীন্দ্রনাথকে স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন বলিয়াই জবাব লিখিয়াছিলেন। "রবীন্দ্রবাবু প্রতিভাশালী সুশিক্ষিত সুলেখক মহৎস্বভাব এবং বিশেষ প্রীতি যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র। বিশেষতঃ তিনি তরুণ বয়স্ক। যদি তিনি দুই একটি কথা বেশি বলিয়া থাকেন, তাহা নীরবে শুনাই আমার কর্ত্তব্য, তবে যে কয় পাতা লিখিলাম, তাহার কারণ রবির পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি।" ছায়া অর্থে তিনি আদিব্রাহ্মসমাজ বুঝাইতেছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন যে আদিব্রাহ্মসমাজ ইতিপূর্বে তাঁহাকে তিনবার আক্রমণ করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের আক্রমণ চতুর্থ। "গড়পড়তায় মাসে একটি। এই সকল আক্রমণের তীব্রতা পরদায় পরদায় উঠিতেছে।" বঙ্কিমের অভিযোগ যে প্রচারে ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর রবীন্দ্রনাথ কয়েকবারই তাঁহার কলুটোলার বাসায় সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছুই আলোচনা করেন নাই। তার পর চারিমাস বাদে সহসা পরোক্ষে বক্তৃতার উৎস খুলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করাতে তিনি একটু আশ্চর্য হইয়াছিলেন। তিনি লিখিলেন, "তাই মনে করি এ উৎস তিনি নিজে খুলেন নাই, আর কেহ খুলিয়াছে।" রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের জবাবে 'কৈফিয়ৎ'-এ লেখেন,[৩] "আমি বঙ্কিম বাবুর সহিত মুখোমুখী উত্তর প্রত্যুত্তর করিবার যোগ্য নহি, তিনিই আমার স্পর্দ্ধা বাড়াইয়াছেন। তবে বঙ্কিমবাবুর হস্ত হইতে বজ্রাঘাত পাইবার সুখ ও গর্ব্ব অনুভব করিবার জন্যই আমি লিখি নাই, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া আমার জ্ঞান হইয়াছিল তাই আমার কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছি। নহিলে সাধ করিয়া বঙ্কিমবাবুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে আমার প্রবৃত্তি হয় না, ভরসাও হয় না।" বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ আদিব্রাহ্মসমাজের

১ ভারতী, ১২৯১ অগ্রহায়ণ পৃ ৩৪৮। ২ প্রচার ১২৯১ অগ্রহায়ণ পৃঃ ১৬১-১৮৪। ৩ ভারতী ১২৯১ পৌষ।

সম্পাদক হিসাবে নিজ কর্তব্য পালন করিয়াছেন, তাহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "আমি যে লেখা লিখিয়াছি বিশেষ রূপে আদিব্রাহ্মসমাজের হইয়া লিখি নাই।" জ্ঞানত তিনি তাহা না করিলেও অন্তরে অন্তরে তিনি বিশেষভাবেই আদিসমাজভুক্ত ব্রাহ্ম। আদিসমাজের সম্পাদক হইবার পরেই তিনি এই দ্বৈরথ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তৎপূর্বে তিনি বঙ্কিমের প্রবন্ধের মধ্যে বিচারণীয় বিষয় যে কিছু আছে তাহা আবিষ্কার করেন নাই বা করিলেও তাহা দ্বন্দ্বনীয় মনে করেন নাই। সমাজের সম্পাদক হইয়া কর্তব্যজ্ঞানবোধেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাস সমর্থনে প্রবন্ধাদি রচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি নিজেকে ব্রাহ্ম বলিয়া ঘোষণা করিতে কোনো সংকোচ করিতেন না।

বঙ্কিম-রবীন্দ্রের এই তর্কযুদ্ধ এইখানে সমাপ্ত হয়, কারণ বঙ্কিম কোনো জবাব দেন নাই এবং বোধ হয় রবীন্দ্রনাথও তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বহুবৎসর পরে জীবনস্মৃতিতে এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে— যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।" এই বিরোধের শেষ কণ্টকোৎপাটনে বঙ্কিমের বিপুল মহত্ত্ব ত আছেই, রবীন্দ্রনাথও উহা যেভাবে স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারও মহত্ত্ব কম সূচিত হয় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে ক্ষমা করিয়া গেলেও বাংলার সমালোচকবৃন্দ তাঁহাকে এই মসীযুদ্ধের জন্য তিরস্কৃত করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। অথচ বঙ্কিম তাঁহার মন হইতে এই হালকা ব্যাপারটাকে একেবারেই মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন; তাহায় প্রমাণ অনতিকাল মধ্যে 'ভারতী'য় লেখক শ্রেণীর মধ্যে তাঁহার নাম বিজ্ঞাপিত দেখিতে পাই। মনের মধ্যে কোনো কণ্টক থাকিলে যে ভারতী পত্রিকায় বারে বারে তাঁহাকে আক্রমণ করা হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার নাম বিজ্ঞাপনের সম্মতি দান কখনো করিতেন না।

রবীন্দ্রনাথ আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হইয়া নিজ কর্তব্য যে অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেছেন, সেবিষয়ে আদৌ প্রমাণাভাব নাই। আশ্বিন হইতে মাঘোৎসবের মধ্যে এই কয়মাসে ৩২টি নূতন ব্রহ্মসংগীত রচনা করিয়াছেন, বঙ্কিমের সহিত মসীযুদ্ধ করিয়াছেন ও অবশেষে 'রাজা রামমোহন রায়' সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসকে সমর্থন ও প্রচার করিলেন। সেদিন তাঁহার এ কথা লিখিতে কোনো সংকোচ হয় নাই "ব্রাহ্মধর্ম পৃথিবীর ধর্ম"। ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে তিনি লিখিলেন "প্রত্যেক জাতি বিশেষ সাধনা অনুসারে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হয়; সেই ফল তাহারা অন্য জাতিকে দান করে। এইরূপে সমস্ত পৃথিবীর উপকার হয়। আমাদের এত সাধনার ফল কি আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক অবহেলা করিয়া ফেলিয়া দিব? এই জন্যই বলি। ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীর ধর্ম্ম বটে, পৃথিবীকে আমার এ ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত করিতে পারিনা, চাহিও না; ব্রহ্মধর্ম্মের জন্য পৃথিবী ভারতবর্ষের নিকটে ঋণী।"[১]

এই দীর্ঘ প্রবন্ধের অনেকখানি লেখক পরবর্তীযুগে ('চারিত্রপূজার') মধ্যে মুদ্রিত করিবার সময়ে কাটিয়া বাদ দিয়াছিলেন; তিনি-যে এককালে বিশেষভাবে ব্রাহ্ম ছিলেন একথা সাহিত্যের বস্তু নহে বলিয়াই বোধ হয় এইসব অংশ বাদ দিয়াছিলেন। কিন্তু জীবনচরিতকার হিসাবে আমরা তেইশ বৎসর বয়সের রবীন্দ্রনাথের চিন্তাপ্রবাহ ও কর্মধারা জানিতে চাহি; পরবর্তীযুগে কিসব কারণে তিনি তাঁহার যৌবনের মতামতকে খণ্ডিত বা লুপ্ত করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা যথাস্থানে হইবে।

রাজা রামমোহন রায়ের পরিপূরক প্রবন্ধ 'সমস্যা'[২] এই সময়ে লিখিত। প্রথম প্রবন্ধে ব্রাহ্মধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইলেন সত্য; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে ব্রাহ্ম হইলেও কতকগুলি সংস্কারের দিক দিয়া তিনি বিশেষভাবেই হিন্দু।

১ ভারতী ১২৯১ মাঘ পৃ ৪৫৮-৭০। ত-বো-প ১৮০৬ শক (১২৯১) চৈত্র। রামমোহন রায় (প্রবন্ধ) পৃ ৩৪ [পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়]।

২ ভারতী ১২৯২ ফাল্গুন।

রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ যে নবীন ব্রাহ্মেরা (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ) উদারনীতির নামে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্দোষ ও অপৌত্তলিক অনুষ্ঠানাদি নির্বিচারে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত; ধর্ম সাধন হইতে ধর্মসংস্কারের উপর তাঁহাদের আকর্ষণ অধিক; প্রাচীন সংস্কারগুলি ভারতীয়দের সমগ্র সামাজিক জীবনের মধ্যে কী স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা তাঁহারা উৎসাহের আতিশয্যে অনুসন্ধান করিতে পরাঙ্মুখ। রবীন্দ্রনাথের লেখনী চিরদিনই অতিবাদ বা অতিব্যবহারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছে, এই প্রবন্ধে সংস্কারকদের মধ্যে অন্ধ গোঁড়ামিরই প্রতিবাদ করিলেন ও সকল দিক হইতে বিচার করিবার জন্য সামাজিক সমস্যাগুলিকে উপস্থিত করিলেন।

মোট কথা, যখনই তিনি কিছু লিখিয়া কোনো বিষয়ের সমর্থন করিয়াছেন, তখনই তাঁহার সন্দেহ হইয়াছে যে, যে-পক্ষকে তিনি সমর্থন করিলেন, তাহার সহিত বুঝি বা তিনি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত বা ঐ দলভুক্ত। এই সন্দেহ হইবামাত্র তিনি তাঁহার তথাকথিত সমর্থিত দলকে আঘাত করিয়াছেন। ইহা-যে কেবল সাহিত্যজীবনে হইয়াছে, তাহা নহে, বাস্তবজীবনেও বারে বারে ঘটিয়াছে। যখনই কোনো বিষয়, বস্তু, এমনকি ব্যক্তি, তাঁহার চিত্তের মধ্যে নিজের বাসা বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে তখনই কঠোর বৈরাগ্য, উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যের দ্বারা তাহাকে মন হইতে নির্বাসিত করিয়াছেন। তাই ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে প্রশংসাবাদ করিয়াই তাঁহার সমস্যাগুলি স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিলেন।

সাহিত্যের সঙ্গী ও সমালোচক

সৃষ্টির সঙ্গে সম্ভোগের যোগ অচ্ছেদ্য। সাধনা হয় নির্জনে; কিন্তু 'সুন্দর ভুবনে' 'মানবের মাঝে' ছাড়া সম্ভোগ সার্থক হয় না। ধর্মসাধনায় ধর্মবন্ধুসংঘ চাই, সাহিত্যসাধনায় অনুকূল রসচক্রের প্রয়োজন। সেইজন্য ধর্মক্ষেত্রে সম্প্রদায় গড়িয়াছে, সাহিত্যক্ষেত্রে অ্যাকাডেমি বা ক্লাব বা সভা সমিতি সৃষ্ট হইয়াছে। ক্রিটিক বা সমঝদারের স্তুতি নিন্দা কবিজীবনের স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্তভাবেই বাঞ্ছনীয়। জীবনে সেই সৌভাগ্য হইতে রবীন্দ্রনাথ বঞ্চিত হন নাই। জীবন-প্রত্যুষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কাদম্বরী দেবী ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সহৃদয় উৎসাহবাণী তাঁহার কাব্যপ্রতিভা বিকাশে যে কতখানি সহায়তা করিয়াছিল, তাহার আভাস আমরা পূর্বেই দিয়াছি। 'কবিকাহিনী' প্রকাশিত হইলে কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন; 'ভগ্নহৃদয়' বাহির হইলে ত্রিপুরার মহারাজা তাঁহাকে কিভাবে সম্মানিত করিয়াছিলেন, সেকথা কবি বহুস্থানে বলিয়াছেন। 'সন্ধ্যাসংগীত' প্রকাশিত হইলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে রমেশচন্দ্রের গৃহে যেভাবে সমাদৃত করেন, তাহাও জীবনস্মৃতিতে অতিবিস্তারে বিবৃত আছে। 'বৌঠাকুরানীর' হাট বাহির হইলেও বঙ্কিমের নিকট হইতে অপ্রত্যাশিত উৎসাহবাণীপূর্ণ পত্র পাইয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু রবীন্দ্রনাথের একজন বিশেষ সাহিত্যবন্ধু ও সমঝদার ছিলেন। উভয়ের মধ্যে সাহিত্যবিষয়ক বহু পত্রালাপ হইত; কয়েকখানি পত্র আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে। 'করুণার' ন্যায় সামান্য একটা অসম্পূর্ণ উপন্যাস সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ যে বিস্তৃত সমালোচনা-পত্র তাঁহাকে লেখেন তাহা দেখিয়া মনে হয় চন্দ্রনাথ সত্যই রবীন্দ্রনাথকে স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন।

এইরূপ দৃষ্টান্ত খুঁজিলে আরও পাওয়া যাইতে পারে। মোটকথা, জীবনের আরম্ভ হইতেই সাহিত্য-সৃষ্টির যে অনুকূলতা তিনি ঘরে ও বাইরে পাইয়াছিলেন, তাহা খুব কম সাহিত্যিকেরই ভাগ্যে জোটে। নির্দয় সমালোচনা যে তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় নাই, তাহা নহে, তবে তাহা বাল্যে ও কৈশোরে নহে— যৌবন হইতেই উহার সূত্রপাত হয়। স্পর্শকাতর কবিচিত্তে এইসব আঘাতের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত শোচনীয় হইত। কিন্তু আঘাতজাত বেদনা তাঁহার জীবনে নিষ্ফল হয় নাই। কারণ, বেদনাপ্রকাশেও একটি তৃপ্তি আছে; উহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও

জটিল মনস্তত্ত্বপূর্ণ প্রহেলিকা। সমবেদনা পাইলে মন খুশি হয় এবং সেই সমবেদনা দর্শাইবার মতো বন্ধু ও স্তাবকের অভাব তাঁহার দীর্ঘজীবনে কোনোদিন ঘটে নাই। তাই এইসব আঘাতগুলি সমবেদনায় পুষ্ট হইয়া চিত্তে গভীর রেখাপাত করিয়া রাখিত। পরবর্তীযুগে ইহাদের কথাই বারে বারে তীব্র করিয়া প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বলিয়া বলিয়া একদল লোকের মনে যে ক্ষুব্ধ বিরুদ্ধতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা তাহাদের মন হইতে কস্মিনকালেও দূর হয় নাই।

কবির যৌবনে কয়েকজন যথার্থ সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকের সহৃদয়তালাভের যে সৌভাগ্য হয়, তাহা তাঁহার সাহিত্যজীবনের ইতিহাস হইতে বাদ দেওয়া যায় না। বিলাত হইতে ফিরিবার পর গত কয়েক বৎসরের মধ্যে, তাঁহার কাব্যপ্রতিভা, সংগীতকুশলতা, মনস্বিতা প্রভৃতিতে আকৃষ্ট হইয়া কয়েকজন সাহিত্যিক তাঁহার মিত্রগোষ্ঠির চক্র মধ্যে ধরা দেন। ইঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন— প্রিয়নাথ সেন, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, আশুতোষ চৌধুরী ও লোকেন পালিত। প্রিয়নাথ সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন, "সন্ধ্যাসংগীত রচনার দ্বারাই আমি এমন একজন বন্ধু পাইয়াছিলাম যাঁহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মতো আমার কাব্যরচনার বিকাশচেষ্টায় প্রাণসঞ্চার করিয়া দিয়াছিল।···ভগ্নহৃদয় পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাসংগীতে তাঁহার মন জিতিয়া লইলাম। তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন, সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক তিনি। দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল ভাষার সকল সাহিত্যের বড়োরাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদাসর্বদা আনাগোনা। তাঁহার কাছে বসিলে ভাবরাজ্যের অনেক দূর দিগন্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা আমার পক্ষে ভারি কাজে লাগিয়াছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে পুরা সাহসের সঙ্গে তিনি আলোচনা করিতে পারিতেন— তাঁহার ভালোলাগা মন্দলাগা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রুচির কথা নহে। একদিকে বিশ্বসাহিত্যের রসভাণ্ডারে প্রবেশ ও অন্যদিকে নিজের শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস— এই দুই বিষয়েই তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আরম্ভকালেই যে কত উপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথম বয়সের চাষ-আবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতকটা হইত তাহা বলা শক্ত।" আর একটু কম বয়সে এই শ্রেণীরই সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন অক্ষয় চৌধুরীর নিকট হইতে।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় এই সময়ে; তিনি ছিলেন বৈষ্ণব, কবিসাধক বলরামদাস ঠাকুরের বংশধর। বৈষ্ণবকাব্যে তাঁহার প্রবেশ ছিল গভীর, তাঁহার নিকট হইতে কবি বৈষ্ণবসাহিত্যের রসবোধশিক্ষা বহুল পরিমাণে লাভ করেন; এঁরই সাহায্যে 'পদরত্নাবলী' সম্পাদিত হয় (১২৯২ বৈশাখ)। কবি লিখিতেছেন, "সন্ধ্যার সময় প্রায় আমার সেই ঘরের কোণে তিনি এবং প্রিয়বাবু আসিয়া জুটিতেন। গানে এবং সাহিত্যালোচনায় রাত হইয়া যাইত। কোনো-কোনোদিন দিনও এমনি করিয়া কাটিত।"

আর আসেন যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র নামে উৎসাহী যুবক। তখন তিনি সিটি স্কুলের সামান্য শিক্ষক। পরে নিজ প্রতিভাবলে বেঙ্গল গবর্মেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হইয়াছিলেন। ইনি দীক্ষিত ব্রাহ্ম না হইলেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত ইঁহার যোগ ছিল আজীবন। যৌবন হইতে তিনি ছিলেন সাহিত্যামোদী। তিনি তরুণ কবির গানগুলি সংগ্রহ করিয়া 'রবিচ্ছায়া' নামে গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। যোগেন্দ্রনারায়ণ প্রকাশকের বক্তব্যে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সমসাময়িক বাংলাসাহিত্যসেবীদের একাংশের মত কিরূপ ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। তিনি লিখিতেছেন;— "বিধাতা তাঁহাকে ক্ষমতা দিয়াছেন, অবকাশ দিয়াছেন, তিনি বিধাতার দানের সমুচিত সদ্ব্যবহার করিতেছেন।··· তাঁহার কবিতাগুলি সরল, সুমিষ্ট ও প্রাণস্পর্শী। তাঁহার ধর্মসঙ্গীতগুলি তানলয়

স্বরযোগে যখন গীত হয় তখন মনে হয় বুঝি স্বর্গ হইতে সে-সকল সঙ্গীত আকাশে ভাসিয়া ধীরে ধীরে পৃথিবীতলে এ সংসার দাব-দাহে দগ্ধ মানবমণ্ডলীকে শান্তি দিবার জন্যই নামিয়া আসিতেছে। এ ঘোর সংসার-কাননে 'তমস-ঘন-ঘোর-গহন রজনীর' নাম শুনিয়া কোন পান্থ-হৃদয় না ক্ষণকালের নিমিত্ত স্তম্ভিত হয়? বা সেই 'জীবনের ধ্রুবতারা'র উদ্দেশ পাইয়াই বা কোন্ অনুতপ্ত হৃদয় না আশ্বাস লাভ করে? বাস্তবিক সে সঙ্গীত শ্রবণে প্রাণ ইহলোকের অতীত হইয়া যায়, পাঠ করিলে অসাড় প্রাণে ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠে, ঘোর সংসার-মুগ্ধ প্রাণও ক্ষণকালের জন্য উদাসভাব ধারণ করে। তাঁহার স্বভাব-সঙ্গীত প্রকৃতিকে নব ভাবে সাজাইয়া হৃদয়ের সম্মুখে উপস্থিত করে, প্রকৃতি যেন কোমল জ্যোৎস্নায় স্নাত হইয়া দিব্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া চক্ষের সম্মুখে আগমন করে; তাঁহার প্রণয় সঙ্গীতগুলি সুমধুরভাবে হৃদয়তন্ত্রী আঘাত করে, প্রাণে বিশুদ্ধ প্রেমের সঞ্চার করে।"

কড়ি ও কোমলের যুগে তাঁহার সাহিত্যিক বন্ধুচক্রে প্রবেশ করেন আশুতোষ চৌধুরী। কিভাবে তাঁহার সহিত পরিচয় হয়, এবং পরিচয় বন্ধুত্বে ও আত্মীয়তায় পরিণত হয়, সে-আলোচনা জীবনস্মৃতিতে আছে। তিনি লিখিয়াছেন, "সাহিত্যের ভাবুকতা একেবারে তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মনের ভিতরে যে সাহিত্যের হাওয়া বহিত তাহার মধ্যে···সমুদ্রপারের অপরিচিত নিকুঞ্জের নানা ফুলের নিশ্বাস একত্র হইয়া মিলিত, তাঁহার সঙ্গে আলাপের যোগে আমরা যেন কোন একটি দূর বনের প্রান্তে বসন্তের দিনে চড়িভাতি করিতে যাইতাম।"

সমসাময়িক সাহিত্যিকদের সকলেই যে রবীন্দ্রনাথের সৌহার্দ ও সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। কিন্তু কেহই তাঁহার প্রতিভাকে তাচ্ছিল্য করিতে পারে নাই। অত্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে না-জানা জনৈক সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে কিভাবে দেখিতেন তাহার একটি উদাহরণ আমরা এইখানে দিব। 'পাক্ষিক সমালোচকে'র (১২৯০ ফাল্গুন) সম্পাদক ছিলেন ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।[১] তিনি বলিয়াছেন যে, এই পত্রিকার কোনো সামান্য ত্রুটির জন্য সাংবাদিক সমালোচকগণকে রবীন্দ্রনাথের তীব্র সমালোচনার পাত্র হইতে হইয়াছিল। সেই যুগের কথা স্মরণ করিয়া ঠাকুরদাস বহুবৎসর পরে লিখিয়াছিলেন, "প্রায় বঙ্কিমবাবুর লেখার মত রবীন্দ্রবাবুর রচনা পড়িতে ভালবাসিতাম। কেবল তাঁহার কবিতা বলিয়া নয়, তাঁহার গদ্য প্রবন্ধ ও সমালোচনা আমাকে সবিশেষ আমোদিত করিত। এজন্য তিনি তখন যেখানে যাহা কিছু লিখিতেন, তাহা দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইতাম। তাঁহার লেখায় আমার এত আমোদ ও ব্যগ্রতার কয়েকটি কারণ ছিল, এখনও অবশ্য আছে। প্রথমত তাহাতে আমার কেমন একটু অনির্ব্বচনীয় আরামের উদ্রেক হইত; দ্বিতীয়ত তাহাতে ভাবিবার বস্তু থাকিত; এবং সর্ব্বোপরি তাহাতে দু'কথা বলিবার বিষয় পাইতাম। মানসিক ব্যায়ামের একটা জীবন্ত বস্তু পাওয়া নিজেই এক অনির্ব্বচনীয় আমোদ।"[২]

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বাল্য ও যৌবনের সুহৃদদের সম্বন্ধে জীবনস্মৃতির বাহিরে খুব কম স্থানেই বলিয়াছেন। প্রিয়নাথ ও শ্রীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর কোনো পত্র বা প্রবন্ধ সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, যিনি তাঁহার প্রথম সংগীতগ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাঁহার নাম পর্যন্ত কখনো তাঁহার কাছে শুনি নাই। তাঁহার প্রথম কাব্য 'কবিকাহিনী' যিনি মুদ্রিত করিয়াছিলেন, সেই প্রবোধচন্দ্র ঘোষের নাম জীবনস্মৃতিতে উল্লেখমাত্র

১ ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের নিবাস খুলনা জিলার সাতক্ষীরা মহকুমায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা না পাইলেও, অধ্যবসায়গুণে তিনি সাহিত্য-সমাজে নিজ নাম সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 'বঙ্গবাসী' 'বঙ্গনিবাসী' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কিছুকাল কার্য করেন। নবজীবন, সাধারণী, সাহিত্য, সাধনা, নব্যভারত, প্রদীপ প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হয়। তিনি মালঞ্চ, সাহিত্যমঙ্গল, সাতনরী, বিজনবালা, উদ্ভটকাব্য, শারদীয়, সাহিত্য প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১২৯০ ফাল্গুন মাসে তিনি 'পাক্ষিক সমালোচক' প্রকাশ করেন। ১৯০৩ (১৩১০ কার্তিক) সালে মৃত্যু হয়। দ্র. জীবনীকোষ পৃ ৭৩৭।

২ সাহিত্য ১৩২৩ শ্রাবণ, পৃ ২৩৪।

করেন নাই ; কেবল সেই অজ্ঞাতনামা বন্ধুটি মৃদুপরিহাসভাগী হইয়া বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া মরিয়াছে। এইরূপে সাহিত্যের বহু জ্যোতিকণা কেন্দ্রানুগ শক্তিবলে রবিকক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু কালে সকলকেই কেন্দ্রাতিগ্ প্রবলতর শক্তিধর্মে কক্ষচ্যুত হইয়া অদৃশ্য জগতে প্রয়াণ করিতে হয়।[১]

মিত্রভাগ্য রবীন্দ্রনাথের ছিল, কিন্তু মিত্রত্ব স্থায়ী হইবার সৌভাগ্য ছিল না। বহুলোক তাঁহার প্রতিভা, সৌন্দর্য, সুকণ্ঠ, বাকচাতুর্য, মনস্বিতা প্রভৃতি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে নানা ভাবে নানা সময়ে পাইয়াছিল ; কিন্তু কেহই তাঁহার জীবনকাব্যে চিরদিনের স্থান লাভ করিতে পারে নাই। মৃত্যুর পর idealised হইয়া কেহ কেহ কবির মনে বাস করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সেখানে তাহারা আইডিয়া মাত্র, রক্তমাংসের মানুষ নহে। বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহারা বরাবর এই স্মরণের সৌভাগ্য-অধিকারী হইতেন কিনা সন্দেহ। অনেকেই কবির কাছে মরিয়া অমর হইয়াছেন ; তাঁহারাই যথার্থ ভাগ্যবান। কেন তাঁহার যৌবনের মিত্ররা পরযুগে ঘনিষ্ঠতার চক্র হইতে বাহিরে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার কারণ কবির একটি বাক্য হইতেই পরিষ্কার হয় ; "মানুষের 'আমি' বলিয়া পদার্থটা যখন নানাদিক হইতে প্রবল ও পরিপুষ্ট হইয়া না ওঠে তখন যেমন তাহার জীবনটা বিনা ব্যাঘাতে শরতের মেঘের মতো ভাসিয়া চলিয়া যায়, আমার তখন সেইরূপ অবস্থা।" অর্থাৎ ইংরেজিতে যাহাকে বলে self-conscious সেই ভাবটা জাগিবার পর হইতেই ব্যক্তিত্ববোধসম্পন্ন সুহৃদ্‌গণ ধীরে ধীরে সরিয়া যান।

রবীন্দ্রনাথের তেজস্বীমনের অসাধারণ প্রগতির সহিত পদক্ষেপ রক্ষা করিয়া চলা সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব। তাই যাঁহারা বাল্যে, কৈশোরে বা যৌবনে তাঁহার বন্ধুচক্রে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহারো এমন অসামান্য প্রতিভা ছিল না যে রবীন্দ্রনাথের সদা-চলমানচিত্তের সহিত চলিতে সক্ষম হইতেন। সুতরাং কালধর্মানুসারে তাঁহারা ঝরিয়া পড়িয়া যান। আমাদেরই ব্যক্তিগত জীবনে বাল্যের কয়জন সুহৃদকে এখন স্মরণ করি। কবি সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযোজ্য। দুঃখের বিষয় কেবলমাত্র প্রশংসা স্তুতি অনুকরণ দ্বারা রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন হইবার চেষ্টা চলিয়াছিল, আলোচনা তাঁহার কাব্যের মাধুর্য ও সৌন্দর্যটুকুতেই ছিল সীমাবদ্ধ। অযোগ্য শিষ্য, নিকৃষ্ট অনুকারক ও অলস স্তাবকদল সকল রচনাকে সমপর্যায় ফেলিয়া সমস্তকেই অপরূপ জ্ঞান করিত। কিন্তু কবির সকল রচনাই যে সমালোচনার ঊর্ধ্বে, এমন মত বুদ্ধিমান কবি স্বয়ং পোষণ করিতেন না। এই আতিশয্যের প্রতিক্রিয়ায় হইল নিছক নিন্দাবাদের জন্ম ; ইহারই নাম হইল নিরপেক্ষ সমালোচনা ! রবীন্দ্রনাথের প্রতিকূল সমালোচনা অনেক সময়েই রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়া হইত না— হইত তাঁহার স্তাবক, অনুকারী শিষ্যবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া। কালে এই সমালোচকের দল সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রবিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে, এই সমালোচকশ্রেণীর মধ্যে বাংলাসাহিত্যের মনীষীও ছিলেন এবং তাঁহাদের সকল মতামতই বিদ্বেষপ্রসূত বলিয়া উপেক্ষা করা সুস্থ দৃষ্টির চিহ্ন নহে।

কিন্তু এইখানে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে নিন্দাপ্রশংসামাত্রই আপেক্ষিক ; অর্থাৎ আর্টের বিষয়টিকে কে কিভাবে দেখিতে পারেন তাহারই উপর স্তুতিনিন্দা নির্ভর করে। আর্টের গুণাগুণ বিচারের অধিকার অর্জন করিতে যে মার্জিত শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা সকল শ্রেণীর সমালোচকের নিকট আশা করা যায় না। দৃষ্টিকোণও বিচারের একটি বড়ো জিনিস। পরিপ্রেক্ষণায় দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ বুঝিতে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে চিত্রসৌন্দর্য বুঝা যেমন কঠিন, ভাষা রস সুর অনুভাব বুঝিতে অপারক ব্যক্তির পক্ষে সাহিত্যবিচার করাও তেমনি কঠিন। বিশেষভাবে কাব্যাদি সমালোচনার জন্য মার্জিত রুচি, সুশিক্ষা, রসবোধাদি একান্ত প্রয়োজন।

১ প্রিয়নাথ ও শ্রীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর কোনো পত্র বা প্রবন্ধ সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীশচন্দ্রের মৃত্যু হয় 'গোরা'র দ্বিতীয় বর্ষে (১৩১৫), প্রিয়নাথের মৃত্যু হয় সবুজপত্রের যুগে (১৩২৩)। ১৩৪০ সালে কবির বাহাত্তর বৎসর বয়স কালে 'প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি' [প্রিয়নাথ সেনের কয়েকটি রচনা ও পত্রের সংগ্রহ] গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ একটি সামান্য ভূমিকা লিখিয়া দেন, কিন্তু সে লেখায় কোনো দীপ্তি নাই।

‘বালক’ পত্রিকা

১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে ঠাকুরবাড়ি হইতে ‘বালক’ নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইল। সম্পাদক হইলেন শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী। ছেলেমেয়ের শিক্ষার জন্য তিনি থাকেন কলিকাতায়; তাঁহার ইচ্ছা বাড়ির বালকবালিকাদের রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু কেবলমাত্র তাহাদের রচনার দ্বারা মাসিক-পত্র চলিতে পারে না বুঝিয়া রবীন্দ্রনাথের উপর ইহার পরিচালনাভার অর্পিত হইল। নূতন পত্রিকার আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে নূতন প্রেরণা আনে।[১] বিচিত্র রচনাসম্ভারে উহাকে অপরূপ করিয়া তোলেন। ‘বালকে’র জন্য গল্প, উপন্যাস, নাটিকা, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে সব্যসাচী সাহিত্যিক লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু বালকদের জন্য লিখিতেছেন বলিয়া কোনো রচনার মধ্যে তরলতা বা লঘুতা নাই, তিনি সাহিত্যের সুন্দর জিনিস সৃষ্টিতে মন দিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করিতেন যে বালক এককালে মানুষ হইয়া উঠিবে, সুতরাং তাহার মানসিক খাদ্য মনুষ্যোচিত হওয়া উচিত। মানুষের বিকৃতি শিশু নহে, শিশুর পরিণতি মানুষ— এ সহজ তত্ত্বটি তিনি মানিতেন। তাই সাহিত্যসৃষ্টির নূতন প্রেরণায় শিশুদের জন্য যেসব কবিতা লিখিলেন, সেগুলি উপদেশমূলক নীতিকবিতা নহে, সেসব কবিতা শিশুচিত্তের কল্পনার উদ্‌বোধক, শিশুর ব্যক্তিত্ববোধ উন্মেষের সহায়ক। তাঁহার প্রথম ‘শিশু’ কবিতা বাংলার বর্ষামুখর দিনের আদি ছড়া— ‘বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান’।[২] ইহার পরেও আরেকটি কবিতা ছড়া দিয়া শুরু— ‘সাত ভাই চম্পা।’[৩] অতঃপর হাসিরাশি, পুরানো বট, মালক্ষ্মী, আকুল আহ্বান ও কাঙালিনী[৪] লেখেন— সবগুলিই শিশুমনের উপযুক্ত কবিতা। এই কবিতাগুলির মধ্যে ভাবেরও একটি আত্মীয়তা আছে। প্রভাতসংগীতের ‘পুনর্মিলন’ কবিতার সুর শোনা যায় ‘পুরানো বটে’।

নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট,
ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে ওগো প্রাচীন বট।
মনে কি নেই সারাটা দিন বসিত বাতায়নে,
তোমার পানে রইত চেয়ে অবাক দু-নয়নে?

...

পাঠকদের কাছে মাসিকপত্রের প্রধান আকর্ষণ হইতেছে গল্প ও উপন্যাস। তাই রবীন্দ্রনাথকে মাসিকের চাহিদা পূরণ করিতে হইল। প্রথমেই লিখিলেন নাতিদীর্ঘ গল্প ‘মুকুট’ ও তৎপরেই শুরু করিলেন ধারাবাহিক উপন্যাস ‘রাজর্ষি।’ উভয়েরই বিষয়বস্তু সংগৃহীত হইল ত্রিপুরা রাজবংশের প্রাচীন কাহিনী হইতে। ত্রিপুরার ইতিহাস হইতেই দুইটি গল্পের আখ্যানভাগ গ্রহণের কোনো কারণ আছে কিনা, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান নিরর্থক নহে। স্বাধীন ত্রিপুরার ইতিহাস ‘রাজমালা’[৫] গ্রন্থের সম্পাদক কৈলাসচন্দ্র সিংহ (১২৫৮—১৩২১) এই সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহঃ সম্পাদক। তিনি আদিব্রাহ্মসমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্র ‘প্রচার’ পত্রিকার প্রবন্ধে ইঁহাকে ‘রবীন্দ্রবাবুর নায়েব’ বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ কৈলাসচন্দ্রের নিকট হইতে ত্রিপুরার আখ্যানগুলি সংগ্রহ করেন; কৈলাসচন্দ্র ‘রাজমালা’র মালমসলা বোধ হয় তখনই কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গল্পের ঐতিহাসিক কাঠামো সংগ্রহ করেন এইভাবে; কিন্তু রাজর্ষির প্রথমাংশের কাহিনীটুকু তাঁহার স্বপ্নলব্ধ, তাহা জীবনস্মৃতিতে কবি বিবৃত করিয়াছেন। রাজনারায়ণ বসুর সহিত দেওঘরে দেখা করিবার জন্য যাইতেছেন; ট্রেনে ভিড়; একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময়ে দেখিলেন কোনো এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর রক্তচিহ্ন; এই দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তাহার পিতাকে প্রশ্ন করিতেছে, "এ কি এযে রক্ত।" এই স্বপ্নের সঙ্গে ত্রিপুরারাজ গোবিন্দমাণিক্যের

১ তু: সাধনা, ভারতী, বঙ্গদর্শন, প্রবাসী, সবুজপত্র, বিচিত্রা, পরিচয় প্রভৃতির রচনা।
২ বালক ১২৯২, বৈশাখ। ৩ ঐ আষাঢ়। ৪ প্রচার ১২৯১ আশ্বিন।
৫ রাজমালা, ১৩০৩, [১৮৯৭] পৃ ১৩+৬১+৫২৬।

কাহিনী জুড়িয়া রাজর্ষি গল্পের শুরু হয়। 'বালকে' আষাঢ় মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত ধারাবাহিক ২৬টি অধ্যায় মুদ্রিত হয়, কিন্তু শেষ হয় নাই। ইহা শেষ করেন পর বৎসর। শেষাংশ লিখিবার জন্য উপাদান সংগ্রহার্থ রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার মহারাজকে এক পত্র দেন (১২৯৩ বৈশাখ ২৩)। ত্রিপুরাধিপতি ইতিপূর্বে ভগ্নহৃদয় কাব্য প্রকাশিত হইলে তরুণ কবিকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, আজও তাঁহার পত্রের উত্তরে ত্রিপুরার ইতিহাস সম্বন্ধে বহু তথ্য সরবরাহ করিয়া পত্র দিলেন।[1]

যে বৈশাখ মাসে (১২৯২) 'বালক' পত্রিকায় বালকদের উপযুক্ত 'মুকুট' গল্প ও শিশুদের উপযুক্ত কবিতা বাহির হইল, সেই মাসেই ভারতীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল 'পুষ্পাঞ্জলি' ও 'রসিকতার ফলাফল'। পুষ্পাঞ্জলি লিখিত হয় কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুস্মরণে। 'রসিকতার ফলাফল' একটি বিদ্রূপাত্মক রচনা। যাহাদের রসবোধ নাই তাহারা রসিকতার চেষ্টা করিলে পাঠকশ্রেণীর উপর কী ফল হইতে পারে, তাহারই রসালোচনা। পুষ্পাঞ্জলি ও রসিকতার ফলাফল সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের রচনা সেকথা বলাই বাহুল্য। ছোটোগল্প 'মুকুটে'র সহিত ভারতীর রচনার কোনো যোগ নাই।

মুকুটের গল্পাংশ সামান্য; ত্রিপুরার তিন রাজকুমারদের মধ্যে বিরোধের কাহিনী। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার বা যুবরাজ সর্বসহা, স্নেহশীল; কনিষ্ঠ ভ্রাতার চক্রান্তফলেই তাঁহার মৃত্যু হয়। গল্পের মধ্যে ইহারই চরিত্র আদর্শবাদীরূপে ফুটিয়াছে। আর ফুটিয়াছে কর্তব্যপরায়ণ সেনাপতি ঈসা খাঁর চরিত্র, খাঁটি মুসলমান চরিত্র, জান্‌ ও জবান্‌ যাহার এক।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি রাজর্ষির গল্পাংশ ত্রিপুরা-ইতিকাহিনী হইতে সংগৃহীত। রাজর্ষির গল্পের কিয়দংশ লইয়া কয়েক বৎসর পরে 'বিসর্জন' নাটক রচিত হয়। ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য একটি ক্ষুদ্র বালিকার কথায় মর্মাহত হইয়া ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে জীববলি নিষেধ করেন। মন্দিরের পুরোহিত বা চোন্তাই রঘুপতি পূজাদি ব্যাপারে রাজহস্তক্ষেপকে অনধিকার চর্চা মনে করিয়া রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। রঘুপতি রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়কে ত্রিপুরার রাজা করিবেন স্থির করিলেন ও তাহার দ্বারা রাজাকে হত্যার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু নক্ষত্র ভীরুস্বভাব; সে রাজহত্যা করিতে পারিল না। অবশেষে সে রঘুপতির প্ররোচনায় রাজার পালিত পুত্র ধ্রুবকে দেবীর সমক্ষে বলি দিবার জন্য অপহরণ করিলে, গোবিন্দমাণিক্য উভয়কে মন্দিরে গিয়া গভীর রাত্রে ধরিয়া ফেলেন। উভয়েই রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইলেন। ইতিমধ্যে রঘুপতি মন্দিরের সেবক জয়সিংহকে রাজহত্যায় প্ররোচিত করিয়াছিলেন। রঘুপতির নির্বাসনের পূর্বরাত্রে জয়সিংহ দেবী সমক্ষে আত্মহত্যা করিল। অতঃপর নির্বাসিত রঘুপতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য মুগল সুবেদার শাহ সুজার সহিত রাজমহলে গিয়া সাক্ষাৎ করিলেন ও ত্রিপুরা আক্রমণে তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন। নির্বাসিত নক্ষত্ররায়কে দলভুক্ত করিয়া মুগল বাহিনীর সঙ্গে রঘুপতি ত্রিপুরা আক্রমণ করিলেন। গোবিন্দমাণিক্য এই সংবাদ পাইয়া রাজ্য ছাড়িয়া সুদূর চট্টগ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন যে, ত্রিপুরার রাজকুমার পিতৃসিংহাসন লইতে আসিতেছে, তাহাকে বাধা দিয়া নররক্তপাত নিষ্প্রয়োজন। নক্ষত্ররায় ত্রিপুরার রাজা হইয়া অনতিকালের মধ্যেই শাসনব্যাপারে রঘুপতির হিতোপদেশ উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন অপমানিত হইয়া অনুতপ্ত রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্যের নিকট ফিরিয়া গিয়া আত্মঅপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন এবং তাঁহার নিকটেই রহিয়া গেলেন।

রাজর্ষি উপন্যাসের মধ্যে গোবিন্দমাণিক্য ও রঘুপতি দুই বিপরীত শক্তি বা ধর্মের প্রতীক। রাজা হইয়া ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করিয়া, লোকহিতার্থ ধন জন মান মুহূর্তে বিসর্জন করিবার শক্তি রাজা গোবিন্দমাণিক্যের ছিল বলিয়া তিনি যথার্থ ই রাজর্ষি। কিন্তু রঘুপতি সর্বত্যাগী হইয়াও সংস্কারাবদ্ধ; সংস্কারকেই সে ধর্ম বলিয়া জানিত। ছাগহত্যা বন্ধ হওয়াতে সে নরহত্যা করিতেও প্রস্তুত। ধর্মীয়তা বা আচারকে সে ধর্ম বলিয়া জানে; বিশুদ্ধ প্রেমের ধর্ম হইতে এই

১ রবি-পত্রিকা। আগরতলা ১৩৩৩ ত্রিপুরাব্দ। রাজর্ষি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১২৯৩ মাঘ [১৮৮৭ ফেব্রুয়ারি ১১]।

বুদ্ধিহীন হিংসাধর্মকে রবীন্দ্রনাথ পৃথক করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্র বারে বারে নানা নামে নানা সাজে প্রকাশ পাইয়াছে; ইনি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম আদর্শ চরিত্র, যিনি ভোগের মধ্যেও ত্যাগকে বরণ করিয়াছেন, যিনি যথার্থ 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' এই বেদবাণীকে জীবনে সার্থক করিয়াছেন।

মুকুট বা রাজর্ষি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের রচনা হইতেছে 'চিঠিপত্র'। 'রসিকতার ফলাফল' সত্যই নিষ্ফলই হইয়াছিল, কিন্তু ষষ্ঠিচরণ ও নবীনকিশোরের 'চিরঞ্জীবেষু' ও 'শ্রীচরণেষু' নামে পত্রধারা বাংলাসাহিত্যে রচনার নূতন আদর্শ স্থাপন করিল। পত্রগুলি কল্পিত ঠাকুর্দা ও নাতির মধ্যে সনাতন ও নূতনের সম্পর্ক লইয়া বিচার। ষষ্ঠিচরণ প্রাচীন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের পক্ষ লইয়া নবীনকিশোরের সহিত তর্কযুদ্ধ করিতেছেন। নবীনকিশোর স্ব-কালের ধর্ম কী তাহাই বৃদ্ধ পিতামহকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। যেখানে লেখক প্রাচীনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কিছু বলিতেছেন তাহা পাঠ করিলে মনে হয় যে সেগুলি চিরন্তন সত্য, তাহার বিরুদ্ধে যুক্তি নাই; আবার নবীনকিশোরের পক্ষ লইয়া বর্তমান কালকে সমর্থন, বর্তমান প্রগতিকে অনুমোদন করিতে দেখিলে মনে হয় লেখক ইঁহাদেরই অন্যতম। প্রাচীনেরা রবীন্দ্রনাথকে উগ্রপন্থী বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন, এবং নবীনেরা তাঁহাকে সংস্কারপন্থী বলিয়া তাচ্ছিল্য করিত। রবীন্দ্রনাথ যে-মধ্যপথ বা সাম্যপথ অনুসরণ করিতেন, তাহা সুন্দরের পথ, তাহা উগ্রতার পথ নহে, তাহা ভীরুতার পথ নহে,— তাহা সকলকে লইয়া চলিবার পথ। যাহাই হউক, রবীন্দ্রনাথের এই পত্রধারার মধ্যে কোনো পক্ষের মতামতকে পরাভূত করিবার জন্য পূর্বাহ্নে কোনোপ্রকার হাস্যকর দুর্বল যুক্তিজাল বিস্তার করা নাই; প্রতিপক্ষের যুক্তির সুষ্ঠু সমালোচনার দ্বারা নিজ পক্ষের মত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই পত্র কয়খানি তাহারই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।[১]

কবি বালকদের উপযোগী গল্প উপন্যাসও যেমন লিখিতেছেন, তেমনি তাহাদের চিত্তবিনোদনের জন্য ক্ষুদ্র নাটিকা রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র 'লোকরহস্যে' (১৮৭৪) বাঙালিকে নির্দোষ হাস্যরস উপভোগে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তবে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত হাস্যকৌতুক বা হেঁয়ালিনাট্য সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের হাস্যরসে রচিত। 'বালকে'র পৃষ্ঠায় এই নূতন ধরনের হাস্যকৌতুকময় নাট্যগুলি প্রকাশিত হইল।

ইংরেজিতে শারাড (charade) নামে একপ্রকার খেলা আছে— সান্ধ্য সভায় বিনোদনের জন্য তার অনুষ্ঠান করা হয়। সাধারণ নাট্য হইতে ইহার পার্থক্য হইতেছে এই যে ইহার দৃশ্যের মধ্যে এমন কয়েকটি শব্দ লুক্কায়িত থাকে, যাহা যোজিত করিয়া তৃতীয় একটি শব্দ গঠিত হয়। সেই পুরা শব্দটি অবলম্বন করিয়া নাটকটি রচিত। এই হেঁয়ালিনাট্য প্রবর্তনকালে তিনি লিখিয়াছিলেন, "সূর্যের আলো নহিলে গাছ ভালো করিয়া বাড়ে না, আমোদ-প্রমোদ না থাকিলে মানুষের মনও ভালো করিয়া বাড়িতে পারে না। ·· বিশুদ্ধ আমোদপ্রমোদ মাত্রকেই আমরা ছেলেমানুষী জ্ঞান করি— বিজ্ঞলোকের, কাজের লোকের পক্ষে সে-গুলো নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহা আমরা বুঝি না যে যাহারা বাস্তবিক কাজ করিতে জানে তাহারাই আমোদ করিতে জানে।"

ভ্রমণ করিতে রবীন্দ্রনাথের কোনোদিন ক্লান্তি ছিল না; এই বৎসরের গোড়ায় দিন দশেকের জন্য হাজারিবাগ বেড়াইতে যান; সঙ্গে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ ও আর-একজন ভদ্রলোক বয়সে কবির থেকে বড়ো, হাস্যোজ্জ্বল, গোলগাল মানুষটি। এই চারিজনে যাত্রা করেন। মধুপুরে গাড়ি বদল করিয়া গিরিধি যান ও সেখান হইতে মানুষে-ঠেলা (পুশপুশ্) গাড়ি করিয়া হাজারিবাগ গিয়াছিলেন। এই ছিল সে-যুগের পথ; তখনো গ্রাণ্ডকর্ড

১ বালক ১২৯২ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৭৭-৮১ চিরঞ্জীবেষু।— আষাঢ় পৃ ১৩৬-১৪০ শ্রীচরণেষু।— শ্রাবণ পৃ ১৮৯-১৯১ চিরঞ্জীবেষু।— ভাদ্র পৃ ২৪৮-২৫১, শ্রীচরণেষু।— আশ্বিন-কার্তিক পৃ ৩০৮-৩১২, চিরঞ্জীবেষু।— পৌষ পৃ ৪৩৬-৪৪০, শ্রীচরণেষু।— মাঘ পৃ ৪৯৬-৪৯৮ চিরঞ্জীবেষু।— চৈত্র পৃ ৫৬৭-৫৬৯ শ্রীচরণেষু। দ্র. চিঠিপত্র ১৮৮৭ (১২৯৪)। সমাজ, র-র গদ্য গ্রন্থাবলী ১৩শ খণ্ড ১৯০৮।

লাইনের হাজারিবাগ-রোড-স্টেশনের পথ হয় নাই। এই ভ্রমণের একটি সরস বর্ণনা 'বালকে' বাহির হয়; পরে সেটি অনেক কাটছাট হইয়া বিচিত্র প্রবন্ধের মধ্যে স্থানলাভ করে।

কিন্তু এবার পূজার সময়ে আরও দূরে যাত্রা করিলেন— মেজদাদার কাছে সোলাপুরে; সত্যেন্দ্রনাথ তখন সেখানকার জেলা-জজ। এই শরৎকালে (১২৯২) সোলাপুরে বাস পর্বটিকে তিনি অন্তরের সহিত উপভোগ করিয়াছিলেন। "বাড়ির প্রান্তে একটী ছোট্ট ঘরে একটী ছোট্ট ডেস্কের সম্মুখে বাস করিতাম। আরো দু'একটি ছোট্ট আনন্দ আমার আশে-পাশে আনাগোনা করিত। সে-বৎসর যেন আমার সমস্ত জীবন ছুটি লইয়াছিল। আমি সেই ঘরটুকুর মধ্যে থাকিয়াই জগতে ভ্রমণ করিতাম, এবং বহির্জগতের মধ্যে থাকিয়াও ঘরের ভিতরটুকুর মধ্যে যে স্নেহপ্রেমের বিন্দুটুকু ছিল তাহা একান্ত আগ্রহের সহিত উপভোগ করিতাম। আমি যেন এক প্রকার আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম। মনের উপর হইতে সমস্ত ভার চলিয়া গিয়া, আমি একপ্রকার লঘুভাবে জগতের সমস্ত মধুরতার মধ্য দিয়া অতি সহজে সঞ্চরণ করিতাম। বোধ হয় সেই বৎসরই শরৎকালের সহিত আমার প্রথম বন্ধুভাবে পরিচয় হইয়াছিল।"[১]

কিন্তু মনের এ তৃপ্তি কতক্ষণের! 'বালক পত্রিকার তাড়া রহিয়াছে।' তাহার মাসিক খাদ্যবরাদ্দ তাঁহাকেই বারোআনা সরবরাহ করিতে হয়। 'রুদ্ধগৃহ' শীর্ষক যে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া বালকের পৃষ্ঠায় 'উত্তর প্রত্যুত্তর'[২] শুরু হইল— প্রবন্ধটির অন্তর্নিহিত অর্থ বা ভাবের ব্যাখ্যা চাই। রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্রে রুদ্ধগৃহের মর্মকথা ব্যাখ্যা করিলেন; সেই ব্যাখ্যানের মধ্যে একটি বড়ো কথা ধরা পড়িয়াছে— যাহা রবীন্দ্রনাথের জীবনের অন্যতম মূলসূত্র। সেটি হইতেছে, ভুলিয়া যাইবার অসীম ক্ষমতা, বা বিস্মৃতি। অর্থাৎ অতীতের অনাবশ্যক আবর্জনাকে ভুলিয়া গিয়া নূতন সত্য গ্রহণে, নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারে, নূতন প্রেম অভিনন্দনের জন্য উন্মুখীনতা।

তিনি লিখিতেছেন, "মৃত্যুকে আমরা যেমন ভয় করি বিস্মৃতিকেও আমরা তেমনি ভয় করি।··· বিস্মৃতি মাঝে মাঝে আসিয়া স্মৃতির শৃঙ্খল কাটিয়া দিয়া যায়। আমাদিগকে কিছুক্ষণের জন্য স্বাধীন করিয়া দেয়।···প্রতি মুহূর্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মৃতি জমিয়া জমিয়া অবশেষে আমাদের বাতাস আটক করিতে চাহে, ·· বিস্মৃতি আসিয়া এই সকল বেড়া ভাঙিয়া দেয়। বিস্মৃতি আমাদের জীবনগ্রন্থের ছেদ, দাঁড়ি; মাঝে মাঝে আসিয়া উত্তরোত্তর আমাদের জীবনবিকাশের সহায়তা করে। একটি জীবনের মধ্যেও শত সহস্র বিস্মৃতি চাই তবেই জীবন সম্পূর্ণ হইতে পারে।"[৩] এই বিস্মৃতিতত্ত্ব হইতেছে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিকতার একটি বড়ো কথা।

কয়েক বৎসর পরে এই তত্ত্বটির ব্যাখ্যা করেন। "শরতের প্রভাতে যেন আমার বহুকালের স্মৃতি হৃদয়ের মধ্যে জাগিয়া উঠে। তাহাকে স্মৃতির অপেক্ষা বিস্মৃতি বলিলেই ঠিক হয়। কিন্তু যে বিস্মৃতি বলিলে একটি অভাবাত্মক অবস্থা বোঝায় এ তাহা নয়, এ একপ্রকার ভাবাত্মক বিস্মৃতি, নহিলে 'বিস্মৃতি জাগিয়া উঠা' কথাটা ব্যবহার হইতেই পারে না। এরূপ অবস্থায় স্পষ্ট যে কিছু মনে পড়ে তাহা নয়, কিন্তু ধীরে ধীরে পুরাতন কথা মনে পড়িলে যেমনতর মনের ভাবটি হয়, অনেকটা সেইরূপ ভাবমাত্র অনুভব করা যায়। যে-সকল স্মৃতি স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া একাকার হইয়াছে, যাহাদিগকে পৃথক করিয়া চিনিবার জো নাই, আমাদের হৃদয়ের চেতনরাজ্যের বহির্ভাগে যাহারা বিস্মৃতি মহাসাগররূপে স্তব্ধ হইয়া শয়ান আছে, তাহারা যেন এক সময়ে চঞ্চল ও তরঙ্গায়িত

১ আশ্বিন সপ্তমীপূজা ১৮৮৯। দ্র. মানসী ৫ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা ১৩২৩ আশ্বিন। পৃ ৬৯৮।

২ উত্তর প্রত্যুত্তর। (রুদ্ধগৃহ সম্বন্ধে) শ্রীঅ [অক্ষয় চৌধুরী ?] লিখিত পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ সোলাপুর হইতে ২৬ আশ্বিন [১২৯২] পত্র দেন। বালক ১২৯২ পৃ ৪২৭-৩০।

৩ ঐ পৃ ৪৩০।

হইয়া উঠে; তখন আমাদের চেতনহৃদয় সেই বিস্মৃতিতরঙ্গের আঘাত অনুভব করিতে থাকে, তাহাদেররহস্যময় অগাধ প্রবল অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়, সেই মহাবিস্মৃত, অতি বিস্তৃত বিপুলতার ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।"[১]

বিস্মৃতি ও ব্যবধান দূরকে মধুর করে; "Tis distance lends enchantment to the view And robes the mountain in its azure hue" একথা একজন কবিই লিখিয়াছেন। 'কাছে আছে দেখিতে না পাও' এ পংক্তি রবীন্দ্রনাথেরই রচিত। তাই আজ বাংলাদেশ হইতে দূরে গিয়া বাংলাদেশের সমস্তকেই সুন্দর করিয়া দেখিতেছেন। তথাকার যে রাজনৈতিক আন্দোলন তাঁহার নিকট উপহাসের ও তীব্র সমালোচনার বিষয় ছিল, আজ তাহা মহীয়ান হইয়া উঠিল। তাই আজ নবীনকিশোর ষষ্ঠিচরণকে লিখিতেছেন, "আজি এই সহস্র ক্রোশ ব্যবধান হইতে বঙ্গভূমির মুখের চতুর্দিকে এক অপূর্ব জ্যোতির্মণ্ডল দেখিতে পাইতেছি। বঙ্গদেশ আজ মা হইয়া বসিয়াছেন আজ ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে যে নব জাতির জন্ম-সংগীত গান হইতেছে, ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্ত পশ্চিমঘাটগিরির সীমান্ত দেশে বসিয়া আমি তাহা শুনিতে পাইতেছি। বঙ্গদেশের মধ্যে থাকিয়া যাহা কেবলমাত্র অর্থহীন কোলাহল মনে হইত এখানে তাহার এক বৃহৎ অর্থ দেখিতে পাইতেছি।"[২] এই দূর হইতে বঙ্গদেশের কেবল বর্তমান নহে ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ ঘটনাগুলিমাত্র নহে সুদূর সম্ভাবনাগুলি পর্যন্ত দেখিতে পাইতেছি। এই সময়ে কলিকাতায় রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা সুস্পষ্ট আকার গ্রহণ করিতেছিল, ন্যাশনল কন্‌ফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশনের আয়োজন চলিতেছে; প্রথমবারের সভায় বাংলার অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান যোগদান করেন নাই—এবার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান্ ইউনিয়ন, ন্যাশনল মহামেডান এসোসিয়েশন প্রভৃতি সভার কার্যে যোগদান করিলেন; নানাস্থান হইতে প্রতিনিধিও আসিবেন স্থির হইল। রবীন্দ্রনাথ এইসব সংবাদ পাইয়া বাংলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কবিজনোচিত আদর্শবাদের রঙে উজ্জ্বল করিয়া বাংলার রাজনীতিকে দেখিতেছেন।

অক্টোবরের মাঝামাঝি 'প্রবাসের পালা সাঙ্গ করিয়া' সোলাপুরের 'অগাধ আকাশ, অবাধ বাতাস, উদার মাঠ, বিমল শান্তি · পশ্চাতে' ফেলিয়া তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিলেন। কলিকাতা পৌঁছাইয়া[৩] (১ কার্তিক) শুনিলেন যে তাঁহাকে পুনরায় বোম্বাই যাইতে হইবে। এই সময়ে মহর্ষি অসুস্থ হইয়া পড়ায় সমুদ্রতীরের বায়ুপরিবর্তনের জন্য যাওয়া প্রয়োজন হয়। বোধ হয় তাহারই ব্যবস্থা করিতে তাঁহাকে বোম্বাই যাত্রা করিতে হয়। বন্দোরা বোম্বাই-এর দক্ষিণে সমুদ্রতীরে একটি শহর। মহর্ষি অগ্রহায়ণ কি পৌষমাসে তথায় যান এবং তৎপূর্বে কার্তিকের প্রথম সপ্তাহে রবীন্দ্রনাথকে তথায় যাইতে দেখি, এবং পৌষমাস কাটাইয়া বোধ হয় বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সাহিত্যসৃষ্টির দিক হইতে বন্দোরা-প্রবাস ব্যর্থ হয় নাই; ইন্দিরা দেবীকে লিখিত তিনটি কবিতাপত্র ছাড়া 'আহ্বানসংগীত' কবিতাটিও বোধ হয় এইখানে রচিত। পত্রকবিতা কয়েকটির সহিত এই কবিতাটি একত্র পাঠ করিলে উহাদের মধ্যে ভাবসংগতি পরিলক্ষিত হইবে। নবীন কিশোরের শেষ পত্রেও আছে "সম্মুখে আমাকে আহ্বান করিতেছে। আমি তোমার দিকে ফিরিয়া চাহিব না"। এই মনোভাব 'আহ্বানসংগীতে'র মধ্যে নিহিত। সোলাপুর বাসকালে সুদূর বাংলাদেশে বাঙালির কর্মপ্রচেষ্টা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু আজ বন্দোরায় (বোম্বাই) আসিয়া জীবনের বৃহত্তর কর্মবহুল পটভূমিতে বাঙালির ক্ষুদ্র জীবনের কথা ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথা বোধ করিতেছেন। বোম্বাই-এর শিল্পসৃষ্টিতে গুজরাটি, পারসি, বোরাহ প্রভৃতিদের কর্মতৎপরতার সহিত বাঙালির শিল্পবিমুখীনতা তুলনা করিতেছেন। রাজনীতিক্ষেত্রেও নিখিলভারতীয় প্রচেষ্টায় বাঙালির স্থান তখনো নগণ্য। বোম্বাই প্রদেশে প্রথম কংগ্রেস-অধিবেশনের কর্মকর্তা ও প্রযোজকদের মধ্যে মারাঠি গুজরাটি পারসিরা ছিলেন; সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Banerjee) ব্যতীত নাম করা

১ শ্রীচরণেষু, বালক ১২৯২ পৃ ৪৩৭। ২ চিঠিপত্র, সমাজ।
৩ ছিন্নপত্র পৃ. ৩। সোলাপুর [১১] অক্টোবর ১৮৮৫।

বাঙালি এই প্রথম অধিবেশনে কোনো বিশেষ অংশ গ্রহণ করে নাই। রবীন্দ্রনাথের মনে কি এই বেদনা ছিল, যখন তিনি লিখিলেন,

পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ, শুনিতে পেয়েছি ওই—
সবাই এসেছে লইয়া নিশান, কই রে বাঙালি কই।

এই কবিতাটি পাঠকগণ পুনরায় পাঠ করিলে কবির মনোভাবের নিখুঁত চিত্রটুকু পাইবেন। নিখিল ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙালির অসম্মান হইয়াছে বটে, কিন্তু কবির ভরসা বাঙালি তাহার শ্রেষ্ঠ আসন পাইবে গানের মধ্য দিয়া, মাতৃভাষার মধ্য দিয়া—

উঠ বঙ্গকবি, মায়ের ভাষায় মুমূর্ষুরে দাও প্রাণ—
জগতের লোক সুধার আশায় সে ভাষা করিবে পান।
চাহিবে মোদের মায়ের বদনে, ভাসিবে নয়নজলে,
বাঁধিবে জগৎ গানের বাঁধনে মায়ের চরণতলে।
বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাই ব'লে, কাঁদিছে বঙ্গভূমি,
গান গেয়ে কবি জগতের তলে স্থান কিনে দাও তুমি।
একবার কবি মায়ের ভাষায় গাও জগতের গান,
সকল জগৎ ভাই হয়ে যায়—ঘুচে যায় অপমান।[১]

একদিন কবিই বাঙালির সে-অপমান দূর করিয়া তাহাকে বিশ্বের সিংহাসনে বসিবার অধিকার দিয়া গেলেন।

নব্য হিন্দুসমাজ

বঙ্কিমের সহিত রবীন্দ্রনাথের মসীযুদ্ধ অল্পতেই শেষ হইয়া যায়; কিন্তু চন্দ্রনাথ বসুর সহিত যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়, তাহা বহুকাল বাংলার সাময়িক সাহিত্যাকাশকে কখনো ধূম্রে অন্ধকার, কখনো আলোকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। চন্দ্রনাথ 'নবজীবন' মাসিকপত্রে হিন্দুসমাজের জাতিভেদের জয়গান করিয়া এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন; ইহাতে রবীন্দ্রনাথের উদ্‌বেজিত হইবার কোনো কারণ ছিল না; সুতরাং, উহার কোনো জবাব তিনি লেখেন নাই। কিন্তু 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিকে প্রসঙ্গক্রমে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হইলে আদি ব্রাহ্মসমাজের তরুণ সম্পাদকের পক্ষে তাহা নীরবে উপেক্ষা করা সম্ভব হইল না; 'সঞ্জীবনী' সাপ্তাহিকে রবীন্দ্রনাথ তাহার এক কড়া জবাব লিখিলেন। নব্য হিন্দুসমাজের সহিত বিরোধের সূত্রপাত হয় এইভাবেই।

কিন্তু বিরোধের কারণ ছিল আরও গভীরে; চন্দ্রনাথ এই সময়ে শশধর তর্কচূড়ামণির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক নূতন ব্যাখ্যা দানে প্রবৃত্ত হইলেন। তর্কচূড়ামণি দিগ্বিজয়ীর ন্যায় কলিকাতায় আসিয়া শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুসমাজে আসর জমাইয়া বসিলেন। বাংলার তরুণদের উপর চূড়ামণির ন্যায় পণ্ডিতের প্রভাব কিরূপে সম্ভব হইল, তাহা ভাবিবার বিষয়; যে-লোকের না ছিল পাণ্ডিত্য, না ছিল আধ্যাত্মিক বল, সে-লোক কি জাদুবলে বাংলার চিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বঙ্কিমপ্রমুখ সকলেই চূড়ামণির আজগুবি ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিরোধী ছিলেন; স্বামী বিবেকানন্দ পরযুগে এইসব আন্দোলনের কঠোর সমালোচনা করেন। দুঃখের বিষয় শ্রোতাদের মধ্যে অধিকাংশের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানের সমতুল্য ছিল; সুতরাং তাঁহারা শাস্ত্র ও বিজ্ঞান, দুইই সমান বুঝিতেন বা কিছুই বুঝিতেন না; সেইজন্য নির্বিচারে সবই বিশ্বাস করিতেন। কারণ বিশ্বাস করিতে হইলে, সাধারণ মানুষের কোনপ্রকার মানসিক মেহন্নত করিতে হয় না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রদত্ত হইত, তাহা হইতে ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান ছাত্রদের আয়ত্ত হইত না,—

১ আহ্বান-গীত, কড়ি ও কোমল পৃ ১৬৮।

পাশ্চাত্ত্য দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাসই ছিল তাহাদের মানসিক উপজীব্য। বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা এদেশে তখনো প্রবর্তিত হয় নাই বলিয়া অধিকাংশ তথাকথিত শিক্ষিতদের বিজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। এই অবস্থায় তর্কচূড়ামণির আবির্ভাব হয়; হিন্দুর আচার ব্যবহার ও সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার আজগুবি কথাবার্তা বিজ্ঞানের নামে প্রচারিত হওয়ায় সকলে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। চন্দ্রনাথ তাঁহাকে লইয়া সবচেয়ে বেশি মাতামাতি করেন। চন্দ্রনাথ এককালে বাংলাদেশের নাস্তিক যুগের হাওয়ায় ভাসিয়াছিলেন। তিনি যখন পাল্টা হাওয়ায় ফিরিলেন, তখন তাঁহার যুক্তিবাদের অবসান হইয়া গিয়াছে। এই মানসিক প্রতিক্রিয়ার অবস্থায় তিনি লিখিলেন, "চূড়ামণি যেমন বলিলেন ধৃ ধাতু হইতে ধর্ম, অর্থাৎ যাহা ধারণ করে তাহাই ধর্ম, অমনি আমার সংশয় দূর হইল, বিশ্বের যাহা কিছু আছে সকলই ধর্মের অন্তর্গত দেখিলাম।... যাহা এত অন্বেষণে পাই নাই তাহা পাইলাম।"... (বঙ্গভাষার লেখক পৃ ৬৯১)।

যুক্তিহীন ধর্মবিশ্বাসের প্রতি যে তীব্র বিদ্রূপ ও গুরুবাদের প্রতি যে ব্যঙ্গ রবীন্দ্র-সাহিত্যে দেখা যায়, তাহার লক্ষ্যস্থল চূড়ামণি ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ। বঙ্কিমচন্দ্রকে নব্য হিন্দুমতের ব্যাখ্যাতা বলিলে তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রতি যথার্থ সম্মান দেখানো হয় না; তিনি নবযুগের প্রবর্তক। কিন্তু তিনি যে পজিটিভিজম্‌কে হিন্দুধর্ম বলিয়া মানিতেন, সে-ধর্ম তাঁহারই মনগড়া ধর্ম, তাহার সহিত রাজনারায়ণ বসুর আদি ব্রাহ্মসমাজীয় হিন্দুধর্ম বা তর্কচূড়ামণির আজগুবি হিন্দুধর্মের কোনো সামঞ্জস্য ছিল না। বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের কৃষ্ণ সাধারণ বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণ নহেন, তিনি আদর্শ মানব, দেবতা নহেন।

সামাজিক মত ও বিশ্বাসাদির সমালোচনা ছাড়িয়া নব্য হিন্দুর দল তথাকথিত নূতন আধ্যাত্মিক প্রেরণায় ব্রাহ্মসমাজের মূল ভিত্তি যে নিরাকারের উপাসনা— তাহারই বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করিলেন। তাঁহাদের মতে 'নিরাকার উপাসনা হিন্দুধর্মের বিরোধী' এবং সাকার উপাসনাই হিন্দুত্বের লক্ষণ। কিছুকাল হইতে এই মূলগত ধর্মবিশ্বাস লইয়াই তীব্র সমালোচনা চলিতেছিল, যাহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা'।[১]

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন যে, আধুনিক যুগে নিরাকার-উপাসনা-বিরোধীদের পক্ষে "প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি ও উপনিষদের প্রতি অসম্ভ্রম প্রকাশ করিতে পরম হিন্দুত্বের অভিমানে" আঘাত লাগে না। "হিন্দুধর্মের শিরোভূষণ যাঁহারা, আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে ধর্মশিক্ষা লাভ করি। অতএব ব্রাহ্ম ও হিন্দু বলিয়া দুই কাল্পনিক বিরুদ্ধ পক্ষ খাড়া করিয়া যুদ্ধ বাধাইয়া দিলে গোলাগুলির বৃথা অপব্যয় করা হয় মাত্র।" এই মুখবন্ধ লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ খুবই ব্যাপকভাবে দেখাইয়াছেন যে মানুষের পক্ষে অসীম ও অনন্তকে পূজা করাই স্বাভাবিক। "ঈশ্বরকে আমরা হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতাবশত সীমাবদ্ধ করিয়া ভাবিতে পারি, কিন্তু পৌত্তলিকতায় তাঁহাকে বিশেষ একরূপ সীমার মধ্যে বদ্ধ করিয়া ভাবিতেই হইবে। অন্য কোনো গতি নাই।...কল্পনা উদ্রেক করিবার উদ্দেশ্যে যদি মূর্তি গড়া যায় ও সেই মূর্তির মধ্যেই যদি মনকে বদ্ধ করিয়া রাখি তবে কিছুদিন পরে সে-মূর্তি আর কল্পনা উদ্রেক করিতে পারে না। ক্রমে মূর্তিটাই সর্বেসর্বা হইয়া উঠে।...ক্রমে উপায়টাই উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়।"

বঙ্কিমচন্দ্রপ্রমুখ শক্তিমান লেখকদের ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের আদর্শপরিপন্থী মত প্রচারের ফলে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশ্বরের নিরাকার চৈতন্যময় স্বরূপের বিরুদ্ধে একটি কঠিন মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছিল। পূর্বে হইলে রবীন্দ্রনাথ এইসব মতামতের প্রতি কোনোই মনোযোগ করিতেন না, কিন্তু এখন আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকরূপে তাঁহাকে কেবলমাত্র বিরোধীমতের খণ্ডন করিলেই চলিবে না, ব্রাহ্মধর্মের মতকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

বন্দোরা হইতে রবীন্দ্রনাথ বোধহয় পৌষ (১২৯২) মাসের শেষাশেষি কলিকাতায় ফিরিয়াছিলেন অর্থাৎ ১৮৮৬ সালের গোড়ায়, মাঘোৎসবের পূর্বে। এবার তরুণ-গীতশিল্পী কবির গীতধারায় যেন সুরের বন্যা আসিয়াছে; মাঘোৎসবের জন্য নূতন কুড়িটি গান রচনা করিতে দেখি। এবার মাঘোৎসবেও খুব জাঁক; গত বৎসর হইতে জোড়াসাঁকোর বাটিতে

১ ভারতী ১২৯২ শ্রাবণ, পুনর্মুদ্রণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১২৯২ ভাদ্র।

ব্রাহ্মসমাজের তিনটি শাখার যুক্ত অধিবেশন হইতেছে। বোধ হয় নব্য হিন্দুসমাজের নানাপ্রকারের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্যই ব্রাহ্মধর্মবিশ্বাসী সকল শ্রেণীর লোকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করাই ছিল উদ্দেশ্য। এ বৎসরের (১২৯২ মাঘ ৯) অনুষ্ঠানে আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ, নববিধান সমাজ হইতে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে শিবনাথ শাস্ত্রী ও উমেশচন্দ্র দত্ত বেদি গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথকে বেদিতে বসিতে দেখি নাই, এবারও কোনো ভাষণাদি দান করেন নাই, স্বাধ্যায় পাঠাদিতে সাহায্য করিয়াছিলেন মাত্র।

নব্য হিন্দুসমাজ আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য উদ্‌গ্রীব; কিন্তু কিসের উপর সে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবে, তাহাই সে জানে না। এই সময় হইতে প্রতিক্রিয়াপন্থী হিন্দুসমাজ নিখিল হিন্দুর প্রাণকেন্দ্র আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হন, এখন পর্যন্ত সেই মায়াকেন্দ্রের ব্যর্থ অনুসন্ধান চলিতেছে। প্রগতিপন্থী হিন্দুসমাজ বা আদি ব্রাহ্মসমাজ উপনিষদের ব্রহ্মসাধনাকে সর্ব বর্ণ সর্ব সম্প্রদায়ের হিন্দুর মিলনক্ষেত্র বলিয়া প্রচার করেন; হিন্দুসমাজ তাহা গ্রহণ না করিয়া নবতর সত্যের সন্ধানে যাত্রা করেন। তাঁহারা কখনো কোম্‌তের পজিটিভিজমের চিরচমৎকারিতাকে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া প্রচার করেন; কখনো হিন্দুসমাজের যুগযুগান্তের অন্ধ সংস্কারসমূহকে আজগুবি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার দ্বারা যুক্তিসিদ্ধ করিবার প্রয়াস করেন; কখনো 'আর্যামি'র অভিনব উপসর্গ আনিয়া বাঙালীর সহজউদ্দীপ্য ভাবোচ্ছ্বাসবহ্নিতে ইন্ধন যোগাইয়া আধ্যাত্মিক কুয়াশা সৃষ্টি করেন; কখনো বা সকল প্রকার মত ও বিশ্বাসের তথাকথিত সংশ্লেষণ দ্বারা 'সমন্বয়ে'র কথা বলিয়া গুরুবাদকে সকল সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাধির প্রতিশোধক ও নিরাময়ক বলিয়া ঘোষণা করেন।

রবীন্দ্রনাথের বয়স অল্প, ধৈর্য কম—তাঁহার পক্ষে এইসব অবাস্তবতাকে সহ্য করা কঠিন। তাই এইসব মতবাদের পৃষ্ঠপোষকগণকে সুবিধা পাইলেই আঘাত করেন। প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত কবিতা-পত্র[১] সঞ্জীবনীতে প্রকাশিত 'দামু ও চামু', বালকে প্রকাশিত হেঁয়ালি নাট্য 'আর্য ও অনার্য' প্রভৃতি এই শ্রেণীর রচনা— যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য নব্য হিন্দুয়ানীকে আঘাত করা।

বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম ও আর্যামির উপর নূতন উপসর্গ দেখা দিল— কল্কি অবতার। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ১২৯০ সালে কৃষ্ণানন্দ নাম লইয়া নূতন তন্ত্রসাধনা শুরু করিয়াছিলেন; তিনি ঘোষণা করিলেন যে তিনি কল্কি অবতার। 'অবতার' আসিলে চেলার অভাব হয় না, তাহা গত পঞ্চাশ বৎসরের বাংলার সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে খুবই স্পষ্ট হয়। কৃষ্ণানন্দের চেলারা শিক্ষিত (!) বাঙালি। এই কল্কি অবতারকেই বিদ্রূপ করিয়া প্রিয়নাথ সেনকে কবি একপত্রে লিখিয়াছিলেন—

ক্ষুদে ক্ষুদে আর্যগুলো ঘাসের মতো গজিয়ে ওঠে
ছুঁচোলো সব জিবের ডগা কাঁটার মতো পায়ে ফোটে।
তাঁরা বলেন 'আমি কল্কি' গাঁজার কল্কি হবে বুঝি
অবতারে ভরে গেল যত রাজ্যের গলিঘুঁজি।

Satireএ রবীন্দ্রনাথ যে কী ভয়ানকভাবে তীব্র হইয়া উঠিতে পারেন, তাহা এই কবিতা-পত্রখানি পাঠ করিলেই বুঝা যায়। কিন্তু 'শ্রীমান দামু বসু এবং চামু বসু সম্পাদক সমীপেষু' কবিতাটির তীব্র ব্যঙ্গ রূঢ়তায় অতুলনীয়। কালে জীবনের উগ্রতা হ্রাস পাইলে, সৌন্দর্যসাধক কবি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কবিতাটি সাহিত্যে স্থান পাইবার উপযুক্ত নহে এবং তজ্জন্য উহা 'কড়ি ও কোমলে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় হইতে বাদ দিয়া দেন। এই দামু ও চামু কে, তদ্‌বিষয়ে সমসাময়িক সাহিত্যে বহু গবেষণা হইয়াছে। আমাদের সন্দেহ হয় চন্দ্রনাথ বসু ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (১২৬১-১৩১২) ছিলেন এই কবিতার আক্রমণস্থল। চন্দ্রনাথের পরিচয় ও রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সম্বন্ধের কথা এই গ্রন্থমধ্যে বহুবার আলোচিত হইয়াছে। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিকের প্রতিষ্ঠাতা-

১ ভারতী ১২৯২ ফাল্গুন। কড়ি ও কোমল।

সম্পাদকরূপে বাংলাদেশের সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে সুপরিচিত। সকল প্রকার প্রগতির বিরোধীরূপে 'বঙ্গবাসী'র খ্যাতি বা অখ্যাতি ছিল। যোগেন্দ্রচন্দ্রের ব্রাহ্মবিদ্বেষ 'মডেল ভগিনী' (১৮৮৬-৮৮) নামে উপন্যাসে অত্যন্ত নগ্নভাবেই প্রকাশ পাইয়াছিল। এই গ্রন্থের বহু সংস্করণ হইয়াছিল; ইহাই তৎকালীন সাধারণ বাঙালি পাঠকের মতের ও রুচির পরিচায়ক। প্রগতিশীল ব্রাহ্ম ও বিশেষভাবে শিক্ষিত নারীসমাজ ছিল এই কুৎসিত আক্রমণের লক্ষ্য। চন্দ্রনাথ বসুর প্রগতি-পরিপন্থী রচনা কিছু কিছু বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হয়। এই দুই 'বসু'ই উল্লিখিত কবিতার দামু বসু ও চামু বসু বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের পরিত্যক্ত কবিতাটি হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

রব উঠেছে ভারতভূমে হিঁদু মেলা ভার,
দামু চামু দেখা দিয়েচেন ভয় নেইক আর।
ওরে দামু, ওরে চামু!
নাই বটে গোতম অত্রি যে যার গেছে সরে,
হিঁদু দামু চামু এলেন কাগজ হাতে করে।
আহা দামু আহা চামু!
লিখচে দোঁহে হিঁদুশাস্ত্র এডিটোরিয়াল,
দামু বলচে মিথ্যে কথা চামু দিচ্চে গাল।
হায় দামু হায় চামু!
এমন হিঁদু মিলবে নারে সকল হিঁদুর সেরা,
বোস্‌বংশ আর্য্যবংশ সেই বংশের এঁরা!
বোস্ দামু বোস চামু!
কলির শেষে প্রজাপতি তুলেছিলেন হাই,
সুড়্ সুড়িয়ে বেরিয়ে এলেন আর্য্য দুটি ভাই;
আর্য্য দামু চামু!
দন্ত দিয়ে খুঁড়ে তুল্‌চে হিঁদু শাস্ত্রের মূল,
মেলাই কচুর আমদানিতে বাজার হুলস্থুল।
দামু চামু অবতার!···

মেড়ার মত লড়াই করে লেজের দিক্‌টা মোটা,
দাপে কাঁপে থরথর হিঁদুয়ানির খোঁটা।
আমার হিঁদু দামু চামু!
দামু চামু কেঁদে আকুল কোথায় হিঁদুয়ানি!
ট্যাঁকে আছে, গোঁজ যেথায় সিকি দুয়ানি।
খোলের মধ্যে হিঁদুয়ানি।
দামু চামু ফুলে উঠল হিঁদুয়ানি বেচে,
হামাগুড়ি ছেড়ে এখন বেড়ায় নেচে নেচে!
ষেটের বাছা দামু চামু!
পড়াশুনো কর, ছাড় শাস্ত্র আষাঢ়ে,
মেজে ঘোষে তোলরে বাপু স্বভাব চাষাড়ে।
ও দামু ও চামু!
ভদ্রলোকের মান রেখে চল্ ভদ্র বল্‌বে তোকে,
মুখ ছুটোলে কুলশীলটা জেনে ফেলবে লোকে।
হায় দামু হায় চামু!
পয়সা চাও ত পয়সা দেব থাক সাধু পথে,
তাবচ্চ শোভতে কেউ কেউ যাবৎ ন ভাষতে!
হে দামু হে চামু!

সঞ্জীবনী সাপ্তাহিকে এই কবিতা প্রকাশিত হইলে কলিকাতার সাহিত্যিকমহলে বেশ একটু নাড়াচাড়া পড়ে যুবকমহলে এই কবিতা কৌতুক ও উষ্মা যুগপৎ সৃষ্টি করে; বহু তরুণ যুবক কবিতাটি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়া প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে প্রতিপক্ষের বিরক্তি উৎপাদনের জন্য প্রয়োগ করিতেন।[১]

কবিতাটি পাঠ করিবার পর উহা যে কেন রবীন্দ্র-কাব্যগ্রন্থ হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে, তদ্‌বিষয়ে প্রশ্ন উঠিবে না। কেবল কবিতায় নহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাটিকায় এই অবাস্তব হিন্দুয়ানীকে রবীন্দ্রনাথ কঠোরভাবে উপহাসাস্পদ করিলেন; 'আর্য ও অনার্য' নাটিকায় নূতন 'আর্যামি'কে বিদ্রূপ করিয়া লিখিতেছেন :— ১। তুমি কে? ২। আমি আর্য, আমি হিন্দু। ১। নাম কি? ২। চিন্তামণি কুণ্ডু। ১। কি অভিপ্রায়? ২। মহাশয়ের কাগজে আমি লিখব। ১। কি লিখবেন? ২। আমি আর্য— আর্যধর্মসম্বন্ধে লিখব। ১। আর্য জিনিষটা কি মহাশয়? ২। (বিস্মিত

১ দামু চামু প্রভৃতি রচনার প্রেরণায় কেহ একটি হেঁয়ালি নাট্য ভারতীতে (১২৯৩ মাঘ) লেখেন; তাহাতে দামু বোস, চিন্তামণি কুণ্ডু প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়; 'হাস্যকৌতুকে' চিন্তামণি কুণ্ডুর নাম আছে।

হইয়া) আজ্ঞে, আর্য কা'কে বলে জানেন না? আমি আর্য, আমার বাবা নকুড় কুণ্ডু আর্য, তাঁর বাবা ৺নফর কুণ্ডু আর্য, তাঁরা বাবা··· ইত্যাদি।··২। য়ুরোপীয়েরা অতি নিকৃষ্ট জাতি এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের পূর্বপুরুষ আর্যদের তুলনায় তারা নিতান্ত মূর্খ আমি প্রমাণ করে দেব। এখনো আর্যবংশীয়েরা তেল মাখবার পূর্বে অশ্বত্থামাকে শরণ করে ভূমিতে তিনবার তৈল নিক্ষেপ করেন। কেন করেন আপনি জানেন?··· ২। ম্যাগ্নেটিজম্! আর কিছু নয়। ইংরাজিতে যাকে বলে ম্যাগ্নেটিজম্। ১। আপনি ম্যাগ্নেটিজম্ সম্বন্ধে ইংরাজি বিজ্ঞান শাস্ত্র কিছু পড়েছেন? ২। কিছু না! দরকার নেই। বিজ্ঞান শিক্ষা কিম্বা কোনো শিক্ষার জন্য ইংরাজি পড়বার কিছু প্রয়োজন নেই। আমাদের আর্যেরা কি বলেন? প্রাণশক্তি, কারণশক্তি, এবং ধারণশক্তি এই তিন শক্তি আছে। তার উপরে তৈলের সাধারণ শক্তি যোগ হ'য়ে ঠিক স্নানের অব্যবহিত পূর্বেই আমাদের শরীরের মধ্যে ভৌতিক কারণশক্তির উত্তেজনা হয়— এই ত ম্যাগ্নেটিজম্।" এইভাবে নাটিকায় শশধর তর্কচূড়ামণির আজগুবি বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্মকে ও আর্যামিকে আক্রমণ করা হয়।

নব্যহিন্দুদের সহিত এই বিরোধ বেশ কয়েক বৎসরই চলিতে থাকে; রবীন্দ্রনাথ গদ্যে, পদ্যে, নাটিকায় নিরন্তরই তাহাদের আক্রমণ করিতেন। 'একান্নবর্তী পরিবার', 'সূক্ষ্মবিচার', 'আশ্রমপীড়া', 'গুরু বাক্য', (হাস্যকৌতুক) এবং 'নূতন অবতার' (ব্যঙ্গকৌতুক) প্রভৃতি এই শ্রেণীর রচনা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যে ও নাট্যে আর্যামিকে যে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস আধুনিক বাঙালী পাঠকের নিকট অস্পষ্ট; কারণ এখনকার শিক্ষিত যুবকরা ইতিহাস সম্বন্ধে যেসব গ্রন্থ পাঠ করেন তাহা হইতে তাঁহারা জানেন যে ভাষাতত্ত্বের দ্বারা জাতিতত্ত্বের সমস্যা সমাধান হয় না। অপরের ভাষা গ্রহণ করাটা নানা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মনৈতিক কারণের উপর নির্ভর করিতে পারে; কিন্তু উনবিংশ শতকের য়ুরোপীয় ভাষাবিদ্‌গণ সংস্কৃত ভাষার সহিত পারসিক ও য়ুরোপীয় ভাষাসমূহের কতকগুলি শব্দের মধ্যে ধাতুগত ঐক্য আবিষ্কার করিয়া ঐসকল ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে জাতিগত (racial) ঐক্যের সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সেই কল্পিত জাতির নাম দেওয়া হয় আর্য বা Aryan, ইংরেজ, জার্মান, রুশ, ভারতীয়, এমনকি বাঙালিরা সংস্কৃতজ ভাষা বলে; অতএব সকলেই 'আর্য' মহাজাতির শাখা। এই তত্ত্বকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিবার উপাদান তখনো য়ুরোপে আবিষ্কৃত হয় নাই, তাই য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মতামতকে আমরা স্বল্প বিদ্যা ও প্রচুর কল্পনার রঙে রাঙাইয়া গ্রহণ করিলাম এবং আমরা যে 'আর্য' এই মত প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম,— ইহাকেই বলে 'আর্যামি'। এই আর্যামিকে লক্ষ্য করিয়া কবি পরে লিখিয়াছিলেন—

"মোক্ষমূলর বলেছে" 'আর্য' সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য, মোরা বড়ো বলে করেছি ধার্য, আরামে পড়েছি শুয়ে।"

'ধর্মপ্রচারে'[১] আছে— "ওই শোনো, ভাই বিশু, পথে শুনি 'জয় যিশু' কেমনে এ নাম করিব সহ্য আমরা আর্যশিশু!"

ভারতে এই আর্য আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইতেছে আর্য সমাজ, আর্য দর্শন, আর্য মিশন প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি।

এই ধরনের মসীযুদ্ধের দৃষ্টান্ত কোনো সাহিত্যেই বিরল নহে; সুখের বিষয় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সৃজনী শক্তিকে এই ব্যর্থ সংস্কার প্রচেষ্টায় অধিক দিন নিয়োগ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ ধর্মসংস্কারক বা সমাজসংস্কারক নহেন— তিনি কবি তাই কবিহিসাবে যেখানে তিনি সত্য ও সার্থক সেই সাধনার ক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন।

১ বঙ্গবীর। ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮ মানসী।

কড়ি ও কোমল

আদি ব্রাহ্মসমাজের জন্য প্রবন্ধ রচনা, সাকার ও নিরাকার তত্ত্বের আলোচনা প্রভৃতি কার্য রবীন্দ্রনাথের আম দরবারের কাজ; খাশ দরবারে তিনি কবি, সুরস্রষ্টা, আর্টিস্ট। কাব্যরচনাই তাঁহার অন্তর্বিষয়ক জীবনধর্মের মূল প্রকাশ। নাট্যরচনা ও অভিনয় এই জীবন-আনন্দ প্রকাশের অন্যতম পথ। কাব্যরচনায় ও সুরসৃষ্টিতে যে আনন্দ তাহার ভোক্তা কবি স্বয়ং; কিন্তু নাট্য-অভিনয়ে যে আনন্দ তাহা বহুজনকে লইয়া রসসম্ভোগের আনন্দ। অন্তরের মধ্যে উপলব্ধ সুরকে বাহিরে রূপের আলোকে দেখা হইতেছে শিল্পীর ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ কবি ও শিল্পী। তাই নাটক লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ কখনো তৃপ্ত হন নাই, তাহাকে অভিনয় করিয়া নূতনভাবে পাইতে চাহিতেন।

ঠাকুরবাড়িতে এখন অনেকগুলি বালক ও যুবক; মাঘোৎসবের পর একটা কিছু নাটক অভিনয় করিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব; 'রবিকা', 'রবিমামা' ছাড়া সকলকে আনন্দ দান আর কে করিতে পারে। কিন্তু সময় অল্প, নূতন নাটক রচিবার সময় নাই; তাই 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' গীতি-নাটিকাদ্বয়কে ভাঙিয়া 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র নূতন রূপ দান করিলেন। কালমৃগয়া[১] হইতে ১০টি গান কোনোটি বিশুদ্ধ আকারে, কোনোটি কিছু পরিবর্তন করিয়া গৃহীত হইল। কালমৃগয়ার শিকারীদের প্রতি দশরথের আদেশ 'গহনে গহনে যারে তোরা' গানটিকে বাল্মীকিপ্রতিভায় দস্যুসর্দার রত্নাকরের মুখে বসাইয়া দিলেন। কালমৃগয়ার রাজবিদূষক রূপান্তরিত হইল প্রথম দস্যুতে। বনদেবীর অংশগুলি কালমৃগয়া হইতে গ্রহণ করিলেন। তাহাদের মুখেও একটি নূতন গান যোজনা করিয়া দিলেন, 'মরি ও কাহার বাছা'; আইরিশ সুরে গানটি বসানো হইল; এইরূপ পরিবর্তন ছাড়া ২০টি নূতন গান রচিত হইয়াছিল।

অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অবনীন্দ্রনাথ 'ঘরোয়া'য় বলিয়াছেন যে, এই অভিনয় করিয়া আদিব্রাহ্মসমাজের জন্য বহুশত টাকা ওঠে। যাহাই হউক, বাল্মীকিপ্রতিভা নূতন ভূষণে সজ্জিত হইয়া বাহির হইল। আমরা যে-বাল্মীকিপ্রতিভার সহিত পরিচিত তাহা (১২৯২ ফাল্গুন) এই সংশোধিত, পরিবর্ধিত সংস্করণ।

এদিকে কবির পক্ষে 'বালক' পত্রিকা চালনা কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে; চৈত্র সংখ্যা বাহির করিয়া পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল; উহা ভারতীর সহিত ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাস হইতে মিলিত হইয়া 'ভারতী ও বালক' নামে প্রকাশিত হইতে থাকিল। বালক যে-উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সফল হয় নাই; কারণ "বালক নামেমাত্র বালক— প্রকৃতপক্ষে ইহা বয়স্ক পাঠকদিগেরই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছিল।" পত্রিকা বন্ধ হইয়া গেলে রবীন্দ্রনাথ যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিতেছেন, "এতদিন মাথার উপরে বালক কাগজের বোঝাটা থাকাতেই মাথা যেন রুদ্ধ হয়ে ছিল, নেশা একেবারে ছুটে গিয়েছিল— এখন সমস্ত খোলাসা— দক্ষিণে বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা যেন চারিদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে।"[২] দায় নাই, দায়িত্ব নাই, পত্রিকার চাপ নাই, নিজ সংসারের ভাবনা ভাবিবার সময় হয় নাই, যেখানে সেখানে যাওয়া-আসার বাধা কম, সুতরাং বর্ষায় বেড়াইতে গেলেন নাসিকে— সত্যেন্দ্রনাথ তখন সেখানকার জজ (১৮৮৬ মার্চ জুন— অক্টোবর ৭); নাসিকে মেজোবৌঠান ও বালিকা ইন্দিরা আছেন, সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতায়। সেখান হইতে কলিকাতায় সুরেন্দ্রনাথকে কবি একখানি অতি কৌতুকপূর্ণ পত্র লিখিয়া পাঠান, পত্রখানি আধা-বাংলা আধা-হিন্দিতে লেখা। কবিতাটি তাঁহার কোনো গ্রন্থে স্থান লাভ করে নাই, পাঠকের জন্য সেটি উদ্ধৃত করিলাম,—

১ কালমৃগয়া হইতে গৃহীত গান— ১ আঃ বেঁচেছি এখন ২। এনেছি মোরা ৩। রিমঝিম ঘন ঘনরে ৪। এই বেলা সবে মিলে চল হো ৫। গহনে গহনে যা রে তোরা ৬। চল্ চল্ ভাই ত্বরা করে মোরা আগে যাই ৭। কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে ৮। প্রাণ নিয়ে তো সট্‌কেছি রে ৯। সর্দার মশায় দেরি না সয় ১০। কাজ কী খেয়ে তোফা আছি।

২ ছিন্নপত্র ১০ এপ্রিল ১৮৮৬ (১২৯৩ বৈশাখ ৫)।

কলকত্তামে চলা গয়ো রে সুরেনবাবু মেরা,
সুরেন বাবু, আসল বাবু, সকল বাবুকো সেরা।
খুড়া সাবকো কায়কো নহি পতিয়া ভেজো বাচ্ছা—
মহিনাভর, কুছ খবর মিলে না ইয়েত নহি আচ্ছা!
টপাল্, টপাল্[১] কঁহা টপালরে, কপাল হমারা মন্দ,
সকাল বেলাতে নাহি মিলতা টপাল্‌কো নাম গন্ধ!
ঘরকো যাকে কায়কো বাবা, তুম্‌সে হম্‌সে ফর্‌খৎ।
দো-চার কলম লীখ্ দেওঙ্গে ইস্মে ক্যা হয় হর্‌কৎ!
প্রবাসকো এক সীমাপর হম্ বৈঠ্‌কে আছি একলা—
সুরি বাবাকো বাস্তে আঁখসে বহুৎ পাণি নেকলা।
সর্বদা মন কেমন কর্‌তা কেঁদে উঠ্‌তা হির্দয়—
ভাত খাতা, ইস্কুল যাতা, সুরেনবাবু নির্দয়!
মন্‌কা দুঃখে হুহু করকে নিক্‌লে হিন্দুস্থানী—
অসম্পূর্ণ ঠেক্‌তা কানে বাঙ্গলাকো জবানী।
মেরা উপর জুলুম কর্‌তা তেরি বহিন বাই,
কি করেঙ্গা কোথায় যাঙ্গা ভেবে নাহি পাই!

বহুৎ জোরসে গাল টিপতা দোনো আঙ্গুলি দেকে,
বিলাতী এক পৈনি বাজনা বাজাতা থেকে থেকে,
কভী কভী নিকট আকে ঠোঁটমে চিমটি কাট্‌তা,
কাঁচি লেকর কোঁকড়া কোঁক্‌ড়া চুলগুলো সব ছাঁটতা,
জজ সাহেব কুচ বোল্‌তা নহি রক্ষা করবে কেটা
কঁহা গয়োরে কঁহা গয়োরে জজ সাহেবকি বেটা!
গাড়ি চড়কে লাঠিন পড়কে তুম্‌ত যাতা ইস্কিল্,
ঠোঁটে নাকে চিমটি খাকে হমরা বহুৎ মুস্কিল!
এদিকে আবার party হোতা, খেল্‌নেকোবি যাতা,
জিম্‌খানামে হিমঝিম এবং থোড়া বিস্কুট খাতা।
তুম ছাড়া কোই সম্‌জে নাত হম্‌রা দুরাবস্থা,
বহিন তেরি বহুৎ merry খিল খিল কর্কে হাস্তা!
চিঠি লিখিও মাকে দিও বহুৎ বহুৎ সেলাম
আজকের মত তবে বাবা বিদায় হোকে গেলাম।[২]

নাসিক হইতে শ্রাবণের গোড়ায় বোধ হয় কলিকাতায় ফেরেন, কারণ অগস্ট (১৮৮৬) মাসেই হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভা দেবীর সহিত আশুতোষ চৌধুরীর বিবাহ হয়।[৩] আশুতোষ চৌধুরীর সহিত রবীন্দ্রনাথের এইসময় হইতে যে ঘনিষ্ঠতা হয় সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। পাঠকের মনে আছে দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রার পথে জাহাজে রবীন্দ্রনাথের সহিত ইঁহার পরিচয় ঘটে। ১৮৮৬ সালে তিনি বিলাত হইতে ব্যারিস্টার হইয়া ফিরিয়া আসেন ও সেই বৎসরই তাঁহার বিবাহ হয়। এই বিবাহের দ্বারা ঠাকুরবাড়ির যে একজন উচ্চশিক্ষিত জামাতামাত্র লাভ হইল তাহা নহে, রবীন্দ্রনাথের এক অকৃত্রিম সাহিত্যিক বন্ধু লাভ হইল। ফরাসী কাব্যসাহিত্যের রসে আশুতোষের বিশেষ বিলাস ছিল এবং তিনি কবির সদ্যরচিত কবিতাগুলিতে ফরাসী কোনো কোনো কবির ভাবের মিল দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, মানব-জীবনের বিচিত্র রসলীলা কবির মনকে একান্ত করিয়া টানিতেছে, এই কথাটাই এই কবিতাগুচ্ছের ভিতর দিয়া নানা প্রকারে প্রকাশ পাইয়াছিল।

'ছবি ও গানে'র পরে রচিত কবিতা ও গানগুলি 'কড়ি ও কোমল' নামে কাব্যখণ্ডে প্রকাশিত হয় (১২৯৩ কার্তিক)। কয়েক বৎসরের রচিত কবিতা এই গ্রন্থ মধ্যে সংগৃহীত হওয়ায় ইহা হইতে বিচিত্র সুরঝংকার শ্রুত হয়। অনেকগুলি কবিতার মধ্যে তাঁহার জীবনের প্রথম শোকাঘাতের ছায়া সুস্পষ্ট। কতকগুলি কবিতা-যে স্বর্গতা কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশ্যেই রচিত, শোকাশ্রুতে আপ্লুত, তাহা সেগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যায়, আমরা সে কবিতা কয়টি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি; যথার্থভাবে তাহারা এ গ্রন্থের অন্তর্গত হইবার মতো কবিতা নহে। এই কাব্যের অবশিষ্ট গান ও কবিতা প্রথম কবিতাগুচ্ছের সুর ও ভাব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, এমনকি বিপরীতও বলা যাইতে পারে। মৃত্যুশোক পর্বে জীবনের প্রতি যে বৈরাগ্যভাব ঐ কবিতাগুলির মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা যে অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী

১ চিঠির ডাক। ২ নাসিক হইতে খুড়োর পত্র, ভারতী ১২৯৩ ভাদ্র-আশ্বিন ৩২৬-২৭।
৩ আশুতোষ চৌধুরী (১৮৬০-১৯৩১) বিলাতের কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৮১-১৮৮৫।

হৃদয়ালুতা প্রসৃত, তাহা আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি। আসল কড়ি ও কোমলের যুগ বলিয়া যদি কোনো যুগকে কল্পনা করা যায়, সে সময়টা জীবনস্মৃতির মৃত্যুশোক পরিচ্ছেদে বর্ণিত বৈরাগ্যের ও কৃচ্ছতার সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্বন্ধছিন্ন। কবি স্বয়ং এই পর্বটি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "গায়ে থাকৃত ধুতির সঙ্গে কেবল একটা পাত্‌লা চাদর, তার খুঁটে বাঁধা ভোরবেলার তোলা এক মুঠো বেলফুল, পায়ে এক জোড়া চটি।" শ্রীশচন্দ্রকে লিখিতেছেন, "এ সময়ে আমাকে যদি একটা বাগান দিতে পারতেন। নদীর তীর, গাছের ছায়া, মাঠের বাতাস, আমের বোল, কোকিলের কুহু, বসন্তী রঙের চাদর, বকুল ফুলের মালা, এবং সেই সঙ্গে আপনাকেও চাচ্ছি।" ইহা কবিকল্পনা নহে। সৌন্দর্য-সাধনাকে রবীন্দ্রনাথ একটি চারু কলায় পরিণত করিয়াছিলেন; তাঁহার বিলাসশোভা, কেশবিন্যাস কলিকাতা যুবসমাজের আকাঙ্খার ও অনুকরণের বিষয় ছিল।

সমসাময়িক এক উদীয়মান কবির লেখনী হইতে রবীন্দ্রনাথের একখানি চিত্র পাওয়া যায়, তাহা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। কবি দীনেশচরণ বসু বাংলা ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাত করেন। তিনি তাঁহার তরুণ বন্ধু দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিয়াছিলেন, "…বঙ্গ সাহিত্যজগতের উঠন্ত রবি রবিঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে… বিগত কল্য… গিয়াছিলাম। ঠাকুরবাড়ীর প্রকাণ্ড পুরীতে প্রবেশ করিয়া দোতলার সিঁড়ির মুখেই রবিঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নয়ন মুগ্ধ, মন আনন্দ সাগরে ডুবিল। কোনো ইংরাজী পুস্তকে অমর কবি মিল্টনের দেবমূর্তি দেখিয়াছ কি? দেখিয়া থাকিলে সেই মূর্তিতে রবিচ্ছায়া দেখিতে পাইবে। দেহ ছন্দ সুদীর্ঘ, বর্ণ বিশুদ্ধ গৌর, মুখাকৃতি দীর্ঘ, নাসা চক্ষু ভ্রূ সমস্তই সুন্দর, যেন তুলিতে আঁকা। গুচ্ছে গুচ্ছে কয়েকটি কেশতরঙ্গ (curls) স্কন্ধের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। পরিধানে ধুতি। কেন বলিতে পারি না, রবিঠাকুরের অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া বোধ হইল যেন এই অঙ্গে গৈরিক বসন অধিক শোভা ধারণ করিত। উনবিংশ শতাব্দীর Albert ইত্যাদি কেশরক্ষার ফ্যাশনের মধ্যে দীর্ঘ কেশ দেখিবার জিনিষ বটে এবং যে তাহা রক্ষা করে তাহাকেও সাহসী পুরুষ বলিতে হইবে। সাহিত্য সম্বন্ধে বহুক্ষণ আলাপ হইল। রবিঠাকুরের বয়স অল্প, তেইশের [২৫] অধিক হইবে না। কিন্তু স্বভাব স্থির। কলেজে থাকিতে মিল্টনকে তাঁহার সহপাঠিগণ 'Lady' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, রবিঠাকুরকেও সেই আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে। স্বর অতি কোমল ও সুমিষ্ট রমণীজনোচিত। রবিঠাকুরের গানের কথা শুনিয়াছিলাম কিন্তু গান শুনি নাই। তাঁহাকে একটি গান গাইতে অনুরোধ করা হইল। সাধাসাধি নাই, বনবিহঙ্গের ন্যায় স্বাধীন উন্মুক্ত কণ্ঠে অমনি গান ধরিলেন। গানটি এই: আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।"…[১]

আমরা কবিজীবনের সেই সন্ধিক্ষণে উপস্থিত যখন যৌবন তাহার প্রথম উচ্ছ্বাসের বিচিত্র আবেদন নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ করিতে প্রয়াসী। কড়ি ও কোমলের কেন্দ্রীয় কবিতাগুলি তাহারই প্রকাশ। গত বৎসরটি ছিল প্রধানত গদ্য রচনার যুগ, শেষদিকে সংগীত আসিয়া জীবনকে মধুময় করে বটে; তবে সে সংগীতে অন্তরের সুর ধ্বনিত হয় নাই; কতকগুলি মাঘোৎসবের জন্য রচিত ব্রহ্মসংগীত, আর কতকগুলি বাল্মীকিপ্রতিভার নাট্য সংগীত, অন্তরের অন্তঃস্থলের সহিত ইহাদের যোগ সামান্যই। মানবজীবনের বিচিত্র রসলীলা তরুণ কবির মনকে একান্ত করিয়া টানিতেছিল। "এই জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিবার ও তাহাকে সকল দিক দিয়া গ্রহণ করিবার জন্য একটি অপরিতৃপ্ত আকাঙ্খা এই কবিতাগুলির মূলকথা।"

কাব্যহিসাবে কড়ি ও কোমলকে আমরা একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ বলিতে পারি না, কারণ ইহার সকল কবিতা এক সময়ে রচিত নহে। কাব্যখানির মধ্যে শিশু কবিতা, প্রেম সংগীত, নারীসৌন্দর্য, ব্রহ্ম সংগীত, স্বদেশ সংগীত সবই

১ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, যৌবনে রবীন্দ্রনাথ, প্রবাসী ১৩৪৯ আষাঢ় পৃ. ২৪৩। দ্রঃ প্রদীপ ১৩০৫ ফাল্গুন, দীনেশচন্দ্র সেন লিখিত 'দীনেশচরণ বসু'।

আছে ; সমস্তগুলিকে খণ্ডভাবে গ্রথিত করিয়া একটি সমষ্টিগত রূপ দিবার চেষ্টা হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহা সফল হয় নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, সমগ্র মানবতার বিচিত্র সাধনরূপ কাব্যখানির মধ্যে দেখাইবার প্রয়াস হইয়াছে মাত্র। সংসার, স্বদেশ ও ঈশ্বর— এই তিনের মধ্যে সামঞ্জস্যকরণই হইতেছে মানবজীবনের পরিপূর্ণ আদর্শ—এই কাব্য সেই সমন্বয়ের অপূর্ণ আভাস দিয়াছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে তথা রবীন্দ্রজীবনে এই তিনটি হইতেছে মূলকথা,— সংসার, স্বদেশ ও ঈশ্বর ; অর্থাৎ নিকটের মানুষ, দূরের মানুষ এবং নিকট ও দূরকে যিনি মিলাইয়াছেন সেই পরমাত্মাকে বাদ দিয়া জীবনের সকল কর্ম নিরর্থক। কিন্তু এই কাব্যে নিকটের মানুষের সহিত আমাদের যে বিচিত্র সম্বন্ধ, তাহাকেই কবি নানা রূপে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, স্বদেশ ও ঈশ্বর গৌণ।

কড়ি ও কোমলের কেন্দ্রগত মূল কবিতাগুলি হইতেছে প্রায়ই সনেট জাতীয় কবিতা। 'ছোটো ফুল' হইতে আরম্ভ করিয়া 'চিরদিন' পর্যন্ত এই কবিতাগুলি কাব্যের অন্তরের বাণী বহন করিতেছে। এই গুচ্ছের বাহিরে আছে গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'প্রাণ' ও শেষ কবিতা 'শেষ কথা'। খুব অল্প সময়ের মধ্যে কড়ি ও কোমলের কবিতাগুলি রচিত— যেমন রচিত চৈতালি ও নৈবেদ্যের কবিতা। সেইজন্য এই বিশেষ কবিতাগুলির একটি মিলিত অখণ্ড রূপ হইয়াছে, সমস্ত গ্রন্থের হয় নাই। ইহাকেই আমরা কড়ি ও কোমলের কেন্দ্রগত কবিতা বলিতেছি।

কবির পূর্ণ যৌবনে এই কাব্যখণ্ড রচিত, তাই তিনি 'যৌবনস্বপ্ন' দেখিতে তন্ময়,—'আমার যৌবনস্বপ্নে ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ।' কে তাহারে 'করেছে পাগল ?' কিন্তু উহা স্বপ্নই ত ; কেননা প্রেমের সহিত মিলন হইয়াছে ক্ষণিকের তরে— দুইখানি মেঘের মতো বাষ্পময়, 'দোঁহার পরশ ল'য়ে দোঁহে ভেসে গেল, কহিল না কথা।' সৌন্দর্যের পূজারী কবি নারীকে তাঁহার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন করিলেন, নানা ভাবে নানা রূপে,— 'গীতোচ্ছ্বাসে' যেখানে 'নীরব বাঁশরীখানি বেজেছে আবার।' কিন্তু এখনো ব্যবধান ঘুচিল না—

দৃষ্টি তার ফিরে এলো— কোথা সে-নয়ন ? চুম্বন এসেছে তার— কোথা সে পরশ।

নারীর বিকশিত যৌবনই তাহাকে প্রথম মর্যাদা দান করে। তাহার দেহের লাবণ্য ও সৌন্দর্য দুইটি মূর্তিতে প্রকাশিত— এক প্রেয়সীরূপে, আরেক মাতৃরূপে। তাহার মাতৃত্ব তাহাকে পরিপূর্ণ অধিকার দান করে। এই যুগ্মরূপের একটি হইতেছে প্রেয়সী নারী,—

নারীর প্রাণের প্রেম মধুর কোমল,
বিকশিত যৌবনের বসন্ত সমীরে
কুসুমিত হয়ে ওই ফুটেছে বাহিরে,
সৌরভ সুধায় করে পরাণ পাগল। (স্তন ১)

যুগ্মরূপের অন্যটি হইতেছে মাতৃরূপী নারী,—

চিরস্নেহ উৎস-ধারে অমৃত নির্ঝরে
সিক্ত করি তুলিতেছে বিশ্বের অধর।
জাগে সদা সুখ-সুপ্ত ধরণীর পরে,
অসহায় জগতের অসীম নির্ভর। (স্তন ২)

নারীর সৌন্দর্যকে নানা রসে কবি বর্ণিয়াছেন, কিন্তু কোথায়ও তাহাকে কুৎসিত বস্তুতান্ত্রিক করিতে পারেন নাই। 'বিবসনা'র 'শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণ'কে 'লাজহীনা পবিত্রতা' বলিয়া আখ্যাত করিলেন ; সেই তেজোময় জীবনের যৌবনের লাবণ্যের নিকট 'অতনু ঢাকুক মুখ বসনের কোণে তনুর বিকাশ হেরি লাজে শির নত।' এই প্রেমসম্ভোগের সম্পূর্ণ কথাটি বলিলেন 'দেহের মিলনে'—

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন!···
সর্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে
দেহের রহস্য মাঝে হইব মগন।

প্রেম সার্থক হইল 'পূর্ণ মিলনে' যেখানে—

বিজন বিশ্বের মাঝে, মিলন শ্মশানে, লাজমুক্ত বাসমুক্ত দুটি নগ্নপ্রাণে
নির্বাপিত সূর্যালোক লুপ্ত চরাচর, তোমাতে আমাতে হই অসীম সুন্দর।

কিন্তু বিজন বিশ্বের মিলন-শ্মশানে সুখ আছে তৃপ্তি নাই, সম্ভোগ আছে আনন্দ নাই। সেই অনাদি প্রশ্ন জাগে তারপরে কী, তাহাতে হইল কী, ততঃ কিম্। কবির চিরবিরহী মন পূর্ণমিলনেও বলে, 'সুখশ্রমে আমি সখি শ্রান্ত অতিশয়'; কল্পনার অবাস্তব জগতের ন্যায়ই এই সৌন্দর্যসুখলিপ্ত সংসার।

ডুবিতে ডুবিতে যেন সুখের সাগরে এ যে সৌরভের বেড়া, পাষাণের নয়;
কোথাও না পাই ঠাঁই, শ্বাসরুদ্ধ হয়, কেমনে ভাঙিতে হবে ভাবিয়া না পাই,
পরাণ কাঁদিতে থাকে মৃত্তিকার তরে। অসীম নিদ্রার ভারে পড়ে আছে তাই।

সুতরাং এই 'বন্দী' জীবন হইতে মুক্তির জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা উঠিতেছে—

দাও খুলে দাও সখি ওই বাহুপাশ। ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরাণ।...
চুম্বন-মদিরা আর করায়োনা পান স্বাধীন করিয়া দাও বেঁধনা আমায়
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস, স্বাধীন হৃদয়খানি দিব তব পায়।

কবির মনে এই প্রশ্নই বারে বারে আঘাত করে নারীর জন্য 'কেন' এই 'মোহ'।

আজ হাতে তুলে নিয়ে ফেলে দিবে কাল এরি তরে এত তৃষ্ণা, এ কাহার মায়া।

'এ মোহ ক'দিন থাকে এ মায়া মিলায়।' তাই সত্য জগতকে, বাস্তব সত্যকে পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা—

এসো, ছেড়ে এসো, সখি, কুসুম শয়ন! চলো গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে,
বাজুক কঠিন মাটি চরণের তলে। সুখ দুঃখ লয়ে সবে গাঁথিছে আলয়,
কত আর করিবে গো বসিয়া বিরলে হাসি কান্না ভাগ করে ধরি হাতে হাতে
আকাশ-কুসুমবনে স্বপন চয়ন।... সংসার-সংশয়-রাত্রি রহিব নির্ভয়।

যৌবনের স্বপ্ন দেখিয়া কবি যাত্রা করিয়াছিলেন, সৌন্দর্য-মদিরা নিঃশেষে পান করিয়া দেখিলেন 'কুসুমের কারাগারে' যেখানে জীবন রুদ্ধ সেখানে তৃপ্তি নাই, আনন্দ নাই। তাই কবির অন্তরের অন্তর হইতে এই আকুতি উঠিল—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে এই সূর্যকরে, এই পুষ্পিত কাননে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই। জীবন্ত হৃদয়মাঝে যদি স্থান পাই।

কড়ি ও কোমলের এই কেন্দ্রীয় কবিতাগুচ্ছের মধ্যে কবির সর্বগ্রাসী মনের সকল অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার কথা বলা হইলেও মনে হইতেছে যেন সব কথা নিঃশেষে বলা হয় নাই,— কী যেন অব্যক্ত কথা, অনির্বচনীয় ভাবনা এখনো অন্তরের মধ্যে রুদ্ধ,—ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছে না। জটিল মানবমনের অতৃপ্ত আবেগ ও অসীম অনুভূতিকে প্রকাশ করিতে পারে এমন ভাষা আজও মানুষের আয়ত্তাধীন হয় নাই, তাই কবি বলিতেছেন—

মনে হয় কি একটা শেষ কথা আছে, সে কথা শুনিতে সবে আছে আশা করি,
সে কথা হইলে বলা সব বলা হয়।.. মানব এখনো তাই ফিরিছে না ঘরে।
সে কথা হইলে বলা নীরব বাঁশরী, সে কথায় আপনারে পাইব জানিতে,
আর বাজাব না বীণা চিরদিন তরে, আপনি কৃতার্থ হব আপন বাণীতে।

কবির বিশ্বাস ছিল যে 'মানুষের এই কোলাহলময় হাটে যেখানে কেনা-বেচার বিচিত্র লীলা চলে, এরি মধ্যে, এই মুখর কোলাহলের মধ্যেই তাঁর পূজার গীত উঠচে— এর থেকে দূরে সরে গিয়ে কখনই তাঁর উৎসব নয়।' একখানি

পত্রে তাঁহার কাব্যের এই মানব-প্রীতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন— "আমার সব অনুভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে। বারবার ডেকেছি দেবতাকে, বারবার সাড়া দিয়েছেন মানুষরূপে এবং অরূপে, ভোগে এবং ত্যাগে। সেই মানুষ ব্যক্তিতে এবং অব্যক্তে।···মানুষ যেখানে অমর সেখানেই বাঁচতে চাই। সেইজন্যেই মোটা মোটা নামওয়ালা ছোট ছোট গণ্ডিগুলোর মধ্যে আমি মানুষের সাধনা করতে পারি না। স্বাজাত্যের খুঁটিগাড়ি করে নিখিল মানবকে ঠেকিয়ে রাখা আমার দ্বারা হয়ে উঠল না— কেননা অমরতা তাঁরই মধ্যে যে-মানব সর্বলোকে। আমরা রাহুগ্রস্ত হয়ে মরি যেখানে নিজের দিকে তাকিয়ে তাঁর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াই।" শচীন সেন ঠিক বলিয়াছেন, "তাই 'কড়ি ও কোমল'-এ 'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই' হইতে 'চৈতালি' কাব্যের মধ্য দিয়া কবি 'নৈবেদ্য'-এর 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ'—এই সুরে পৌঁছিলেন।"

কড়ি ও কোমলের কবিতাগুচ্ছ একটি কাব্যযুগের অবসান ও নূতন যুগের আবির্ভাব ঘোষণা করিতেছে। এই নূতন যুগে কবি যাহাকে খুঁজিতেছেন সে হইতেছে তাঁহার মানসী, মানস-সুন্দরী—বাক্যের অতীতে তাহার বাণী, সৌন্দর্যের অতীতে তাহার রূপ; সে কায়া নয়, সে ছায়াও নয়,— সে মায়া। যৌবনের 'কুসুমের কারাগার' ভাঙিয়া 'মানুষের বৃহৎ জীবনকে বিচিত্রভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিবার ব্যথিত আকাঙ্খা' কবি-চিত্তকে পীড়ন করে; 'মানুষের মুক্ত জীবনের প্রবাহ যেখানে পাথর কাটিয়া জয়ধ্বনি করিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া সাগরযাত্রায় চলিয়াছে, তাহারই জলোচ্ছ্বাসের শব্দ' কবিকে চঞ্চল করে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যৌবনের নূতন অভিজ্ঞতা ও প্রেরণা হইতে যে সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, জীবনস্মৃতিতে তাহারই কথা বর্ষা ও শরৎ প্রভৃতি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন। তারপর বহু বর্ষ পরে জীবনসন্ধ্যায় আসিয়া সেই যুগকে পুনরায় বিশ্লেষণ করিবার সুযোগ মেলে; রবীন্দ্র-রচনাবলীতে কড়ি ও কোমলের ভূমিকা লিখিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া কবি লিখিয়াছিলেন, "যৌবন হচ্ছে জীবনে সেই ঋতুপরিবর্তনের সময় যখন ফুল ও ফসলের প্রচ্ছন্ন প্রেরণা নানা বর্ণে ও রূপে অকস্মাৎ বাহিরে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। 'কড়ি ও কোমল' আমার সেই নব যৌবনের রচনা। আত্মপ্রকাশের একটা প্রবল আবেগ তখন যেন প্রথম উপলব্ধি করেছিলুম।··· আপনার মধ্যে থেকে যা প্রকাশ পাচ্ছিল, সে আমার কাছেও ছিল নূতন এবং আন্তরিক।··· তখন হেম বাঁড়ুজ্জে এবং নবীন সেন ছাড়া এমন কোনো প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন না যাঁরা নূতন কবিদের কোনো একটা কাব্য-রীতির বাঁধাপথে চালনা করতে পারতেন। কিন্তু আমি তাঁদের সম্পূর্ণ ভুলে ছিলুম।··· বিহারীলালের··· প্রবর্তিত কবিতার রীতি ইতিপূর্বেই আমার রচনা থেকে সম্পূর্ণ স্খলিত হয়ে গিয়েছিল। বড়ো দাদার [দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের] 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র আমি ছিলুম অত্যন্ত ভক্ত, কিন্তু তাঁর বিশেষ কবিপ্রকৃতির সঙ্গে আমার বোধ হয় মিল ছিল না। সেইজন্যে ভালো-লাগা সত্ত্বেও তাঁর প্রভাব আমার কবিতা গ্রহণ করতে পারেনি। তাই কড়ি ও কোমলের কবিতা মনের অন্তঃস্তরের উৎসের থেকে উছলে উঠেছিল। তার সঙ্গে বাহিরের মিশ্রণ যদি ঘটে থাকে ত সে গৌণভাবে।"[১]

'কড়িও কোমল' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১২৯৩ সালের মাঘমাসে,— 'ছবি ও গান' প্রকাশের তিন বৎসর পরে। ছবি ও গানের সময় হইতে কবিতা অনেকটা সংহত আকার ধারণ করিলেও বাস্তব বলিতে যাহা বুঝায় তাহা এখনো হয় নাই। এই দুই কাব্যের মধ্যে প্রভেদ এই যে 'ছবি ও গানে' কল্পনার ভাগটি প্রবল, 'কড়ি ও কোমলে' হৃদয়াবেগ প্রচণ্ড। 'ছবি ও গানে'র পর রচিত কবিতাগুলি সমস্তই 'কড়ি ও কোমলে' সংগৃহীত। আশুতোষ চৌধুরী এই কবিতাগুলি যথোচিত পর্যায়ে সাজাইয়া প্রকাশ করেন। 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে' এই চতুর্দশপদ কবিতাটি তিনিই গ্রন্থের প্রথমে বসাইয়া দেন; তাঁহার মতে এই কবিতাটির মধ্যেই সমস্ত গ্রন্থের মর্মকথাটি আছে।

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী ২য় খণ্ড, কবির মন্তব্য।

সতেরো বৎসর পরে মোহিতচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ নূতনভাবে প্রকাশিত হইলে (১৩১০)। এই সময়কার কবিতাগুলিকে 'যৌবনস্বপ্ন' নাম দেওয়া হয়। এই কাব্যখণ্ডের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়া দেন যৌবনের মর্মকথাটি,—

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম
কস্তুরী মৃগসম।
ফাল্গুন রাতে দক্ষিণ বায়ে কোথা দিশা খুঁজে পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই যাহা পাই তাহা চাই না।[১]

আশুতোষ চৌধুরী 'কড়ি ও কোমল' পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, উহার কবিতার মধ্যে কোনো কোনো ফরাসী লেখকের প্রভাব দেখা যায়, সে কথাটি মুহূর্তমাত্র দাঁড়াইয়া চিন্তা করা প্রয়োজন। কড়ি ও কোমলের কেন্দ্রগত কবিতাগুলি পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়, তাহার মধ্যে য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব প্রবল, তবে প্রচ্ছন্ন। কিছুকাল হইতে ফরাসী একদল লেখক ও তাঁহাদের অনুকারকগণ সাহিত্যে ও কলায় এক নূতন বুলি প্রবর্তন করিয়াছিলেন। সেটি 'art for art's sake' অর্থাৎ আর্টেই আর্টের চরম সার্থকতা বা আর্টের খাতিরেই আর্ট। এই নূতন সম্প্রদায়ের মতে আর্টের প্রয়োজন অহেতুক, অর্থাৎ কোনো উদ্দেশ্য, কোনো নীতি ইহার দ্বারা সফল বা সার্থক হয় না।

রবীন্দ্রনাথের এ-সময়ে বন্ধুভাগ্য ছিল ভালো— প্রিয়নাথ সেন, লোকেন পালিত, আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতি ছিলেন বন্ধুচক্রে। ইংরেজি ও য়ুরোপীয় সাহিত্যে ইঁহাদের সকলেরই প্রবেশ ছিল অসাধারণ। অতি আধুনিক কাব্য ও মতবাদ সমন্বিত গ্রন্থের সন্ধান পাইতেন ইঁহাদের কাছ হইতে, বিশেষ ভাবে প্রিয়নাথের কাছে। আর্টেই আর্টের চরম সার্থকতা মতের প্রবর্তক থিওফিল গোতিয়ের-এর যে গ্রন্থে এই মতবাদ আছে সেই উপন্যাসের সহিত তিনি কবির পরিচয় ঘটাইয়া দেন, তাহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি।[২] রবীন্দ্রনাথের যৌবনারম্ভে দেহচর্যা ছিল একটি সুষ্ঠু কলা বা আর্ট, সৌন্দর্যচর্চা কাব্য-জীবনের একটি বিশেষ অঙ্গ। এই অবস্থায় আর্টসর্বস্ব মতবাদ পোষণ করা কবির পক্ষে স্বাভাবিক। তাই দেখি কাব্যসৃষ্টির আদি পর্বে আর্টের প্রতি কবির অহেতুকী আকর্ষণ, আবার দেখিব কাব্যসৃষ্টির শেষ পর্বেও আর্টের প্রতি অহেতুকী অনুরাগ।

মানুষের মন অনাদিকাল হইতে শব্দ ও রূপের মধ্য দিয়া সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে। কেন সে প্রতিকূল তপ্ত বিষবাষ্পের বিরুদ্ধেও নূতন-কিছু সৃষ্টি করিবার জন্য ব্যাকুল, শব্দ ও রূপের নিগড়ে অসীমকে বাঁধিবার জন্য কেন তাহার এত প্রয়াস, সৃষ্টির জন্য কেন এত আকুতি, কেন এত বেদনা— এই প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের মনে বারেবারে উঠিয়াছে ও তিনি নানাভাবে তাহার সমাধান করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। বহুবারই তিনি বলিয়াছেন নিজের ভালো লাগে বলিয়াই লিখি, সৃষ্টির আর কোনো প্রেরণা নাই, উদ্দেশ্য নাই। অন্যকে সুখী করা অপেক্ষা আত্মপ্রকাশের দ্বারা নিজের আনন্দ হয় বলিয়াই মানুষ সৃষ্টিকর্মে লিপ্ত হয়। সেই সৃষ্টির আনন্দ বা প্রেরণা (urge) কোনো প্রকার নীতি বা দর্শনের দ্বারা অথবা প্রচলিত ধর্মাধর্মবোধ দ্বারা প্রভাবান্বিত বা সংকুচিত হয় না, সে আপন রসে স্বয়ং-প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বে আর্টের এই নৈর্ব্যক্তিক রূপটি স্বীকৃত হইয়াছিল।

কিন্তু আদর্শ পবিত্রতাবোধের সঙ্গে সুসংগত সৌন্দর্যবোধ অন্তরের মধ্যে ফল্গু নদীর ন্যায় অন্তঃসলিলা ছিল বলিয়া তাঁহার লেখনী আর্টকে কখনো মসীলিপ্ত করে নাই ; অত্যন্ত স্থূল বিষয় ও বস্তু বর্ণনাকালে কবির ভাষা কখনো অসুন্দরের পথাশ্রয়ী হয় নাই ; আর্টকে বা সুন্দরকে কাব্যে ও কলায় উচ্চ স্থান দিয়াও সত্য ও মঙ্গলকে জীবন হইতে বেদিচ্যুত হইতে দেন নাই। উপনিষদের শিক্ষা তাঁহার মজ্জাগত সংস্কার, তাই তিনি বলিয়াছেন আনন্দ হইতে রসের উদ্ভব।

আর্টের নামে বাস্তবতাকে নগ্নরূপে প্রকাশ করিতে রবীন্দ্রনাথের যে স্বাভাবিক সংকোচ দেখা যায়, তাহা

১ দ্র উৎসর্গ। ২ প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি পৃ ২৭২।

সৌন্দর্যগত সংকোচ, নীতিগত বা পরম্পরাগত শিক্ষা বা বিশ্বাসপ্রসূত নহে। কবির এই অত্যন্ত স্বাভাবিক Æstheticismকে আর্টসর্বস্ব বে-আব্রুবাদীরা ভীরুতা বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে অচ্ছেদ্যরূপে যুক্ত বলিয়া বাস্তবকে আর্টের নামে অসুন্দর করিতে কবি সত্যই সংকোচ বোধ করিতেন।

এই কবিতাগুচ্ছের নামকরণ কবি কেন 'কড়ি ও কোমল' করিলেন। কড়ি ও কোমল সংগীতশাস্ত্রের শব্দ। এ যাবৎ তিনি যে কাব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সবগুলিরই নামের সহিত গান যুক্ত: সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, শৈশব সঙ্গীত, ছবি ও গান। 'কড়ি ও কোমল'ও সেই গানসংক্রান্ত শব্দ।[১]

কড়ি ও কোমলের পরে

'কানু ছাড়া গীত নাই' এই বাক্যটি যিনি রচিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তরের কথা আমরা জানি না; তবে একথা সত্য যে বাংলাভাষায় গীতসাহিত্যের অনেকখানি প্রেরণা কৃষ্ণপ্রেমলীলাসম্ভূত। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবসাহিত্য কেন ও কিভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা ইতিপূর্বে আমরা করিয়াছি। কাব্যরত্নের সন্ধানে তিনি পদামৃত সাগরে অবতরণ করিয়াছিলেন ও পদকর্তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভানুসিংহের পদাবলী রচনা করেন। আলোচ্য পর্বের বৎসরাধিক কাল পূর্বে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে 'পদরত্নাবলী' (১২৯২ বৈশাখ) নামে যে চয়নগ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহাও কবির বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রীতির পরিচায়ক। বাল্যকাল হইতে রবীন্দ্রনাথ এই বিরাট পদ-সাগরের তীরে তীরে কেবল উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিলে ভুল হইবে, তিনি রসামৃতসাগরে অবগাহন করিয়া কাব্যরত্ন পাইয়াছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রেম বিরহাদির সংগীতের ভাষা ও রূপকল্পনা এমন আশ্চর্যরূপে বৈষ্ণবীয়। কড়ি ও কোমলের কতকগুলি গান বৈষ্ণবীয় বিরহ-বেদনাকে নূতন ভাবে ও নূতন ভাষায় প্রকাশ করিয়াছে। রবীন্দ্রকাব্য-পাঠকদের নিকট সেগুলি খুবই পরিচিত জানিয়াও উল্লেখ করিতেছি: 'মথুরায়' কবিতাটিতে আছে 'বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কই?' কবিতার ছত্রে ছত্রে পদাবলীর ভাব।

> এ নহে কি বৃন্দাবন? কোথা সেই চন্দ্রানন। একা আছি বনে বসি, পীতধড়া পড়ে খসি,
> ওই কি নূপুরধ্বনি বনপথে শুনা যায়? সোঙারি সে মুখশশী পরান মজিল সই।

'বাঁশি'তে আছে 'ওগো শোন কে বাজায়'···'যমুনারি কলতান কানে আসে কাঁদে প্রাণ।' ···'বিরহ' কবিতাটি এই সুরেই বাঁধা। 'ওগো আছে সুশীতল যমুনার জল দেখে তারে আমি মরিব' এভাব বৈষ্ণবপদকর্তাদেরই উপযুক্ত। 'বিলাপ' রাধার অন্তরের—'আর নিয়ে যা' রাধার বিরহের ভার কত আর ঢেকে রাখি বল।' 'ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে' গানে বৈষ্ণবীয় ভাব পরিপূর্ণ।

বৈষ্ণব গান ও কবিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রীতি নানাভাবে প্রকাশ পায়। এই সময়ে তিনি 'বিদ্যাপতির পদাবলী' প্রকাশ করিতে মনস্থ করেন। 'সাবিত্রী'র বিজ্ঞাপনে বাহির হইয়াছিল, "প্রায় দশবৎসর কাল রবীন্দ্রবাবু বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী অধ্যয়ন করিয়া এই সম্পাদকীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।" কিন্তু 'বিদ্যাপতির পদাবলী' বিজ্ঞাপিত হইয়াও প্রকাশিত হইল না। প্রকাশ না-হইবার কারণ অনুসন্ধান অলস গবেষণা বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

১ ১২৯২ সালে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার গীতসূত্রসার গ্রন্থে 'কোমল ও কড়ি সুরের বিবরণ' দিয়াছিলেন। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থখানি পাঠ করেন। এ গ্রন্থ হইতে কি কবি তাঁহার নূতন গ্রন্থের নাম সংগ্রহ করেন?

এই সময়ে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১-১৯০৭) নামে উদীয়মান সাহিত্যিক The Poets of Bengal নামে একটি গ্রন্থমালা সম্পাদন করিবার সংকল্প করেন। ১২৯১ সালে তিনি তাঁহার সংকল্প তৎকালীন বড়লাট লর্ড রীপনকে জানাইয়া তাঁহার করকমলে উক্ত গ্রন্থমালা উৎসর্গ করিবার অনুমতি ভিক্ষা করেন। কিন্তু বোধ হয় অনুকূল অর্থ সাহায্য পান নাই বলিয়া সে-গ্রন্থ আর ছাপা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে রবীন্দ্রনাথ নিজ সম্পাদিত বিদ্যাপতির খাতাখানি তাঁহাকে দিয়া দেন। কবে দেন জানি না। তবে তিনি বহুবার একথা আমাদিগকে বলিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন তাঁহার সংকলিত 'বিদ্যাপতি' ১৩০১ সালের পূর্বে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩০৫) কাব্যবিশারদ লিখিয়াছিলেন,— "শ্রীমতিলাল চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে কয়েকটি পরামর্শ দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। রবীন্দ্রবাবু তাঁহার একখানি পুরাতন খাতা দিয়াও আমাকে বাধিত করিয়াছেন।" (ভূমিকা ১৩০৫ আশ্বিন ১)। রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে ঐ খাতা তিনি কখন পান তাহা তিনি বলেন নাই। তবে বোধহয় কালীপ্রসন্নের সংকলিত গ্রন্থমালা প্রকাশের কথা জানিতে পারিয়া তিনি 'বিদ্যাপতির পদাবলী' সম্পাদন করিয়া এবং প্রকাশের কথা বিজ্ঞাপিত করিয়াও প্রকাশ করিলেন না। কালীপ্রসন্ন রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে যে-খাতাখানি পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি কখনো ফেরত দেন নাই। সেটি পাওয়া গেলে রবীন্দ্র-প্রতিভার আর-একটি দিক আমাদের নিকট উদ্‌ভাসিত হইত।[১]

এবার শীতকালে কলিকাতায় খুবই উত্তেজনা। ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে কনগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন (১৮৮৬ ডিসেম্বর) হইতেছে; এবার বিভিন্ন প্রদেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও জনসভাসমূহ নিজ নিজ প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া পাঠাইয়াছেন। বোম্বাই-এর প্রথম অধিবেশনে সেরূপ সম্ভব হয় নাই। ব্রিটিশ ইনডিয়ান এসোসিয়েশনের অন্যতম পরিচালক ডক্টর রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র অভ্যর্থনা সভার সভাপতি; কনগ্রেসের সভাপতি দাদাভাই নৌরজী। কলিকাতার মধ্যে এই শ্রেণীর জনসমাগমাদি কর্মোপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণ হইত গানের জন্য; তাঁহার সুকণ্ঠ, তাঁহার নয়নমনমুগ্ধকর রূপ সকলের আকর্ষণের বিষয়। তিনি সভার উদ্‌বোধন সংগীত গাহিলেন 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।' শুনিয়াছি গানটি এই সভা উপলক্ষ্যে রচিত হয়। তখনকার কনগ্রেস অধিবেশনে আজিকার জনতা ছিল না; এবার মাত্র ৪০০ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

মাঘোৎসবের সময়ে নূতন গান[২] রচিলেন অনেক কয়টি। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি খুবই পরিচিত, যেমন, 'অনেক দিয়েছ নাথ', 'নয়ন তোমায় পায় না দেখিতে', 'বসে আছি হে কবে শুনিব' 'সত্য মঙ্গল প্রেমময়', 'আমায় ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় বলে' ইত্যাদি। এই গানগুলি শুনিলে আশ্চর্য হইয়া ভাবি, এ কি 'কড়ি ও কোমলে'র রচয়িতা যুবক কবির রচনা; না কোনো ধর্মসাধকের অন্তরের আকুতিভরা প্রার্থনা। ঈশ্বরের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাসপরায়ণতা ও আত্মনির্ভরশীলতা রবীন্দ্রনাথের জীবনেতিহাসের একটি বিশেষ কথা, সেটি তাঁহার জীবন আলোচনার কোনো অবস্থায় যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

১ "বিদ্যাপতির পদাবলী। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সম্পাদিত ও শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। "প্রায় দশ বৎসর কাল রবীন্দ্রবাবু বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী অধ্যয়ন করিয়া এই সম্পাদকীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং বিদ্যাপতির পদাবলী যথাসম্ভব নির্দোষ ও নির্ভুল হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে মুদ্রিত কয়েকটা সংস্করণে পদের বা টীকার যত ভুল আছে, এই গ্রন্থে প্রায় সে সমস্ত সংশোধিত হইল। ফল কথা, সেই প্রাচীন শ্রেষ্ঠ কবির কবিত্ব বুঝিতে হইলে— এবং যাবতীয় বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী ভাষা বুঝিতে হইলে— রবীন্দ্রবাবু কর্ত্তৃক সম্পাদিত এই সুন্দর, মনোহর পদাবলী সকলেরই ক্রয় করা উচিত।"... ১৫০ পৃষ্ঠায় উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা মাত্র। অগ্রহায়ণ মাসের ১৫ই তারিখের [১২৯৩] মধ্যে প্রকাশিত হইবে। পিপলস্ লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।" এই বিজ্ঞাপন 'সাবিত্রী'তে ১২৯৩ আশ্বিনে প্রকাশিত হয়।

২ ত-বো-প ১৮০৮ (১২৯৩) ফাল্গুন ২১১-২০।

সমসাময়িক আর-একটি সামাজিক আহ্বানের কথা এখানে বলিব। বাংলা বৎসরের শেষদিকে অধ্যাপক প্রসন্নকুমার রায় (Dr. P. K. Roy) কর্তৃক আহূত কলেজের ছাত্র-সম্মেলন উপলক্ষ্যে দুইটি গান রচনা করিয়া কবিকে গাহিতে হয়। গান দুইটি— 'আগে চল্ আগে চল্ ভাই' ও 'তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ'।[১] বিশ বৎসর পরে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে 'দেশনায়ক'[২] প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় গানটির কিয়দংশ উদ্‌ধৃত করিয়া দেশবাসীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে যদি আমরা সত্যই আবেদন ও নিবেদনের থালা নামাইয়া হাত খোলসা করিয়া থাকি, তবে পরের 'পরে অভিমানটুকু কেন রাখি। অভিমানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন দাবি থাকে এবং সে দাবি বলিষ্ঠের দাবি নহে। এই গীতদ্বয় রচনাকালেও যুবককবির মনে সেই ধিক্কারই জাগিয়াছিল। শেষোক্ত গানটির কয়েকটি পংক্তি—

মিছে কথার বাঁধুনি কাঁদুনির পালা
চোখে নাই কারো নীর,
আবেদন আর নিবেদনের থালা
ব'হে ব'হে নতশির।

কাঁদিয়ে সোহাগ ছিছি এ কী লাজ,
জগতের মাঝে ভিখারির সাজ,
আপনি করিনে আপনার কাজ,
পরের পরে অভিমান।

পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব না থাকিলেও ভারতীতে লেখা দেওয়ার দায় হইতে যে একেবারে মুক্ত হইয়াছেন, তাহা নহে। গত বৎসরের মতো অফুরন্ত রচনার প্রেরণা নাই, কিন্তু লেখনী বন্ধ নহে। ১২৯৩ সালের অন্যান্য রচনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'হেঁয়ালিনাট্য'; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনা হইলেও তাহাদের ধার ছিল ক্ষুরেরই মতো। নব্য হিন্দুদের সহিত বিরোধের অবসান এখনো হয় নাই, সময় ও সুযোগ পাইলেই রবীন্দ্রনাথ আঘাত করেন, প্রতিপক্ষও তাহার জবাব দেন; উভয় পক্ষেই মসীবর্ষণ চলে। তবে এখন রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সূক্ষ্ম পথ ধরিয়াছেন। হেঁয়ালি নাট্যগুলির মধ্য দিয়া ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, শ্লেষ করিয়া প্রতিপক্ষকে আঘাত করিতেছেন; গত বৎসরের 'বালকে' প্রকাশিত নাট্য হইতে এবারকার রচনাগুলি অন্য ধরনের। এবারকার রচনায় ব্যঙ্গাদি অত্যন্ত স্পষ্ট, উদ্দেশ্য প্রকট, কাহাকে আঘাত করিতেছেন তাহা বুঝা যায় সহজে; সেইজন্য সাহিত্যের দিক হইতে রচনাগুলি দুর্বল। এই সময়ের নাটক হইতেছে— অন্ত্যেষ্টি সংকার১, আশ্রমপীড়া২, রসিক৩, গুরুবাক্য৪, একান্নবর্তী পরিবার৫ প্রভৃতি[৩]।

যাহা হউক সাহিত্যসৃষ্টির দিক হইতে কবি একটি বড় কাজ এই বৎসর সমাধান করিলেন; গত বৎসর বালকে 'রাজর্ষি' উপন্যাসটির প্রকাশ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়— মাত্র ২৬টি অধ্যায় বাহির হয়। অবশিষ্ট ২৭শ হইতে ৪৪শ পরিচ্ছেদ লিখিয়া এবার গ্রন্থখানি শেষ করিলেন। ১২৯৩ সালের আশ্বিন (?) মাসে উহা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী সৌদামিনী দেবীকে উৎসর্গ করেন।[৩]...

আমাদের মনে হয় 'রাজর্ষি' উপন্যাসের প্রতি সাহিত্যিকদের যতটুকু মনোযোগ দেওয়া উচিত ছিল তাহা তাঁহারা দেন নাই। তাহার কারণ 'বিসর্জন' নাটক তাঁহাদের সকল মন হরণ করিয়া লয়। সেটি খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু 'রাজর্ষি'র মধ্যে যে জটিল মনস্তত্ত্ব, ঘটনার সমাবেশ আছে তাহাকে তুচ্ছ করা যায় না। বিসর্জনের বুনিয়াদ তো এইখানেই; বিচিত্র ও বিরুদ্ধ চরিত্রগুলি ইহারই মধ্যে প্রথম আবির্ভূত হয়। 'রাজর্ষি'র প্রথমাংশ হইতে বিসর্জনের

১ ভারতী ১২৯৪ বৈশাখ। গীতদ্বয়ের শেষটি গীতবিতানে স্থান লাভ করে নাই।

২ দেশনায়ক, সমূহ। র-র ১৬শ পৃ ৪৮৮।

৩ ১। অন্ত্যেষ্টি সংকার, ভারতী ও বালক ১২৯৩ ভাদ্র-আশ্বিন পৃ ১১৬-২০। ২। আশ্রমপীড়া, ঐ কার্তিক পৃ ৪২৪-৩১। ৩। রসিক, ঐ ফাল্গুন পৃ ৬৮০-৮৩। ৪। গুরুবাক্য, ঐ চৈত্র পৃ ৭১৮-২২। ৫। দৌলতচন্দ্র ও কানাই, ভারতী ও বালক ১২৯৪ বৈশাখ পৃ ৪৯-৫৬।

৩ রাজর্ষি, বালক ১২৯২ আষাঢ় ১-৩ পরিচ্ছেদ।—শ্রাবণ (৪-৬)। ভাদ্র (৭-৯)। আশ্বিন-কার্তিক (১০--১৮)। অগ্রহায়ণ (১৯-২২)।—পৌষ (২৩-২৪)।—মাঘ (২৫-২৬)। ১২৯৩ আশ্বিন মাসে ৪৪শ পরিচ্ছেদে ২৪২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ আকারে 'রাজর্ষি প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরীতে লিপিবদ্ধ হয় ১৮৮৭ ফেব্রুয়ারি ১১ [১২৯৩ মাঘ ৩০] দ্র. রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়।

আখ্যান অংশ সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া পাঠকদের সমস্ত চিত্ত সেইখানেই কেন্দ্রীত হইয়া থাকে; কিন্তু গ্রন্থের অবশিষ্ট অধিকাংশকে আমরা তুচ্ছ করিতে পারি না।

রাজর্ষি উপন্যাসের শেষ কয়েক পরিচ্ছেদে তরুণ লেখক বিল্বন নামে এক মহাপুরুষের অবতারণা করিয়াছেন। "বিল্বন কোন্ দেশী লোক কেহ জানে না। ব্রাহ্মণ কিন্তু উপবীত ত্যাগ করিয়াছেন। বলিদান প্রভৃতি বন্ধ করিয়া এক প্রকার নূতন অনুষ্ঠানে দেবীর পূজা করিয়া থাকেন; প্রথম প্রথম তাহাতে লোকেরা সন্দেহ ও আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু এখন সমস্ত সহিয়া গিয়াছে। বিশেষত বিল্বনের কথায় সকলে বশ। বিল্বন সকলের বাড়ি বাড়ি গিয়া সকলের সঙ্গে আলাপ করেন, সকলের সংবাদ লন, এবং রোগীকে যাহা ঔষধ দেন তাহা আশ্চর্য খাটিয়া যায়। বিপদে আপদে সকলেই তাঁহার পরামর্শমতে কাজ করে— তিনি মধ্যবর্তী হইয়া কাহারও বিবাদ মিটাইয়া দিলে বা কিছুর মীমাংসা করিয়া দিলে তাহার উপর আর কেহ কথা কহে না।" (২৯শ পরিচ্ছেদ) এই চরিত্রের আর একটি দিক হইতেছে তিনি শিশুদের মনোরঞ্জন করিতে পারিতেন। "বিল্বন ঠাকুর এক একদিন অপরাহ্নে রাজ্যের ছেলে জড়ো করিয়া তাহাদিগকে সহজ ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক গল্প শুনাইতেন। মাঝে মাঝে দুই একটা নীরস কথাও যথাসাধ্য রসসিক্ত করিয়া বলিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু যখন দেখিতেন ছেলেদের মধ্যে হাইতোলা সংক্রামক হইয়া উঠিতেছে— তখন তাহাদের মন্দিরের বাগানের মধ্যে ছাড়িয়া দিতেন।"

বিল্বনের এই যেমন একটি দিক, আর একটি দিক হইতেছে রাজ্যসেবা— রাজসেবা নহে। কোনো অযৌক্তিকতা ভীরুতা তাহাকে স্পর্শ করে না। নক্ষত্ররায় ত্রিপুরা আক্রমণ করিলে তিনিই রাজ্যময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া সৈন্য সংগ্রহ করেন। গোবিন্দমাণিক্যের যুদ্ধ-না-করিবার প্রবৃত্তিকে তিনি সমর্থন করিলেন না, তাঁহার মতে ধর্মযুদ্ধে পাপ নাই। সৈন্য সংগৃহীত হইল এবং কিভাবে দেশকে মোগল সৈন্যের হাত হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহার যে-ব্যবস্থা করিলেন, তাহা বিচক্ষণ সেনাপতিরই: যোগ্য কর্ম। যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব লইয়া তিনিই গেলেন নক্ষত্রের নিকট। রাজা যখন কিছুতেই যুদ্ধের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, তখন বিল্বন বলিলেন, 'অসহায় প্রজাদিগকে পরহস্তে ফেলিয়া দিয়া তুমি পলায়ন করিবে, ইহা স্মরণ করিয়া আমি কোনো মতেই প্রসন্ন মনে বিদায় দিতে পারি না।" রাজা ধ্রুবকে লইয়া বনে গিয়া বাস করিবেন শুনিয়া বিল্বন বলিলেন, "বনে কি কখনো মানুষ গড়া যায়! বনে কেবল একটা উদ্ভিদ পালন করিয়া তোলা যাইতে পারে। মানুষ মনুষ্যসমাজেই গঠিত হয় (৩৬শ)।" ইহার পর ত্রিপুরা ত্যাগ করিয়া বিল্বন নোয়াখালির নিজামৎপুরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে ভয়ংকর মড়কের প্রাদুর্ভাব হইলে তিনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যেরূপ সেবা করিয়াছিলেন তাহাতে উভয় সম্প্রদায়ের লোক তাঁহার বশ হইয়াছিল। পাঠক ৪১শ পরিচ্ছেদটি সমগ্র পাঠ করিলে দেখিবেন রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসের মধ্য দিয়া দেশসেবার কী আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। বিল্বনের কর্মযোগী চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে আদর্শ-মানুষের স্বপ্ন ছিল তিনি তাঁহার বহু নাটক উপন্যাসের মধ্য দিয়া তাহা প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন। গোবিন্দমাণিক্যের শান্ত সর্বসহা চরিত্র, 'গোরা'র পরেশ বাবু, 'ঘরে বাইরে'র নিখিলেশ প্রভৃতির মধ্যে নানাভাবে দেখা দিয়াছে। রঘুপতিও নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে প্রতিরোধের চরিত্রগুলিতে। বিল্বন হইতেছেন কর্মযোগীর মূর্তি; তিনি পৃথিবীর মধ্যে থাকিয়াও তাহার উর্ধ্বে বাস করেন; সব জিনিসকে তিনি স্পর্শ করেন, কিন্তু কোনো জিনিস তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। 'শারদোৎসবে'র রাজা, 'রাজা'র ঠাকুর্দা, 'অচলায়তনে'র গুরু, এমনকি 'চতুরঙ্গে'র জ্যেঠামশায় প্রভৃতি চরিত্র রবীন্দ্রনাথের এই তেইশ বৎসর বয়সের সৃষ্টি বিল্বনেরই রূপান্তর বলিলে দুঃসাহসিকতা হইবে না।

বিল্বনের চরিত্র বাংলাসাহিত্যে নূতন হইলেও সম্পূর্ণ নূতন নহে; কারণ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রায় উপন্যাসেই একটি করিয়া আদর্শ 'স্বামীজি' সৃষ্টি করিয়াছিলেন; দুর্গেশনন্দিনীতে অভিরাম স্বামী, চন্দ্রশেখরে রমানন্দ স্বামী প্রভৃতি

কর্মযোগী বীরগণ সাধারণত সন্ন্যাসী বলিলে যাহা বুঝায়' সে-শ্রেণীর মানব ছিলেন না। তবে প্রাচীন হিন্দুধর্মমতের প্রতি বঙ্কিমের অতিরিক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি থাকার জন্য তিনি তাঁহার সন্ন্যাসীদিগকে দৈবশক্তিসম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কোমৎ-এর মতবাদ প্রচার-করা সত্ত্বেও তিনি তাহাদিগকে বিশুদ্ধ যুক্তি-আশ্রয়ী কর্মযোগীরূপে সৃষ্টি করেন নাই, বরং রহস্যাশ্রয়ী করিয়াই গড়িয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজসম্মত হওয়ায় তিনি তাঁহার কোনো চরিত্রকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ এই চরিত্রসৃষ্টির প্রেরণা কোথা হইতে পাইয়াছিলেন, বলা কঠিন; তবে তাঁহার গদ্য প্রবন্ধের মধ্যে যখনই তিনি কোনো আদর্শ প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হইয়াছেন, তখনই মতের সঙ্গে কর্মের একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সুষ্ঠু সমন্বয়ের কথা প্রচার করিয়াছেন। বিল্বন তাহারই রক্তমাংসে গড়া মানবমূর্তি। বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' হইতে কবি তাঁহার আদর্শ মানবের প্রেরণা পাইয়াছিলেন কিনা, বলা কঠিন। কারণ, ইতিপূর্বে 'প্রচারে' (১২৯১-৯২) 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রকাশিত হয়; ১২৯৩এ গ্রন্থাকারে উহার প্রথমাংশ মুদ্রিত হয়। 'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিম কৃষ্ণকে যেরূপভাবে আদর্শ মানব সৃষ্টি করিয়াছিলেন, উপন্যাসের মধ্যে সেইরূপ আদর্শে রবীন্দ্রনাথ বিল্বনের চরিত্রও সৃষ্টি করিয়া থাকিতে পারেন। একথা ভুলিলে চলিবে না, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স চব্বিশ বৎসর মাত্র ও বঙ্কিম তখন সাহিত্য-সম্রাট। যাহাই হউক, 'রাজর্ষি'র বিল্বন মহৎ চরিত্র হইলেও, অত্যন্তই মহৎরূপে চিত্রিত হইয়াছেন; লেখক তাঁহাকে আদর্শ মহাপুরুষ করিতে গিয়া সাধারণ মানুষরূপে গড়িবার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন সুতরাং আদর্শটা কৃত্রিম হইয়া গিয়াছে। আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই দুর্বলতাকে আবিষ্কার করিয়া বিল্বনকে আর আসরে নামান নাই। রাজর্ষির মধ্যেই তাহার প্রথম ও শেষ কৃত্য সম্পন্ন করিয়া দেন।

কাব্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশের নূতন রীতি দেখা দিলে, সাহিত্য-জগতের সনাতনী স্বাস্থ্যরক্ষীর দল আগন্তুকদের আবির্ভাবকে চিরকালই অবজ্ঞার দ্বারা, রূঢ় সমালোচনার দ্বারা বিলোপ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। 'কড়ি ও কোমলে'র আবির্ভাব বাংলাসাহিত্যে বেশ একটু চঞ্চলতা সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার কবিতাগুলি বাংলাদেশের পরম্পরাগত সৌন্দর্য-বোধের দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করে নাই; নরনারীর প্রেমের গতানুগতিক বর্ণনা-পাঠে-অভ্যস্ত পাঠকদের কাছে ইহা কাব্যে বিপ্লবের ন্যায় প্রতিভাত হইল। অভ্যাসগত পরিচিত রীতি, রুচি ও রস হইতে এই কবিতা সম্পূর্ণ পৃথক, তজ্জন্য 'নবজীবনে'র সুবিজ্ঞ সম্পাদক এই কাব্যকে 'কাবিয়' বলিয়া ব্যঙ্গ করিলেন। আরও কিছুকাল পরে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 'মিঠে ও কড়া' লিখিয়া 'কড়ি ও কোমলে'র ব্যঙ্গ অনুকৃতি প্রকাশ করেন; তাঁহার নিষ্ঠুর আক্রমণ কবিকে সত্যই আহত করিয়াছিল, কিন্তু তিনি কোনো প্রত্যুত্তর দেন নাই— কেবল লিখিয়াছিলেন 'নিন্দুকের প্রতি' কবিতাটি।

কড়ি ও কোমল প্রকাশিত হইবার পর যে-সব সমালোচনা হয়, কবি তাহার জবাব দেন পরোক্ষভাবে। বিশুদ্ধ রস ও রীতির মাপকাঠিতে তিনি সাহিত্যকে বিচার করিতে চেষ্টা করিলেন, ধর্মনীতি বা প্রাচীন রীতির দিক দিয়া নহে। কবি 'কাব্যে— স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট'[১] শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখিলেন যে সাধারণত দেখা যায় একদল লোক অত্যন্ত স্পষ্ট কবিতা না পাইলে কবির কবিত্ব স্বীকার করেন না। স্পষ্টকাব্যের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক এক সমালোচক কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য হইতে নিম্নপংক্তিদ্বয় দুঃখ বর্ণনার চরম প্রকাশ জ্ঞানে উদ্ধৃত করিয়া রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ কাব্যের অস্পষ্টতা-বাদীদের সম্মুখে কাব্য সৌন্দর্যের আদর্শ স্থাপন করিলেন।

দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।

এই পংক্তিদ্বয় সম্বন্ধে উক্ত লেখক বলিলেন, 'সার্থক কবিত্ব, সার্থক কল্পনা, সার্থক প্রতিভা'। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টকাব্য-বাদীর এই উচ্ছ্বাস উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন,— কোনো দুঃখ অতিশয় স্পষ্ট হইলেই কবিতা হয় না তাহা হইলে, 'তুমি খাও

১ ভারতী ১২৯৩ চৈত্র

ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে' ইত্যাদিও কবিতা হইত। "প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে কবিতা কোথাও স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট, সম্পাদক এবং সমালোচকেরা তাহার বিরুদ্ধে দরখাস্ত এবং আন্দোলন করিলেও তাহার ব্যতিক্রম হইবার যো নাই।" "যাঁহারা মনোবৃত্তির সম্যক অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যেমন জগৎ আছে তেমনি অতিজগৎ আছে। সেই অতিজগৎ জানা এবং না-জানার মধ্যে, আলোক এবং অন্ধকারের মাঝখানে বিরাজ করিতেছে। মানব এই জগৎ এবং জগদতীত রাজ্যে বাস করে। তাই তাহার সকল কথা জগতের সঙ্গে মেলে না। এইজন্য মানবের মুখ হইতে এমন অনেক কথা বাহির হয় যাহা আলোকে-অন্ধকারে মিশ্রিত, যাহা বুঝা যায় না অথচ বুঝা যায়। যাহাকে ছায়ার মত অনুভব করি অথচ প্রত্যক্ষের অপেক্ষা অধিক সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। সেই সর্বত্রব্যাপী অসীম অতি-জগতের রহস্য কাব্যে যখন কোনো কবি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন, তখন তাঁহার ভাষা সহজে রহস্যময় হইয়া উঠে।" বলা বাহুল্য এ যুক্তি কবির নিজের রচনার সমর্থনে রচিত।

সাহিত্যের মধ্যে 'কাব্য— স্পষ্ট ও অস্পষ্ট' লইয়া আলোচনার সূত্র ধরিয়া ব্যাপকতর অনেকগুলি প্রশ্ন উঠিল— সাহিত্যের উদ্দেশ্য কী, সাহিত্যের সহিত মানব সভ্যতার সম্বন্ধ কী, সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা কোথায়? এই সমস্ত আলোচনার গৌণ উদ্দেশ্য অপরকে বুঝানো,— নিজের সঙ্গে নিজের বুঝাপাড়াই রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

আবেগের জোয়ারে সুন্দর আসিয়াছিল, আবেগের অন্তে ভাঁটার দিনে তাহার নগ্ন কঙ্কাল-মূর্তি যেন প্রকাশ না পায়। তাই নিজের সৃষ্টিকে কবি নিজেই বিচার করেন, সৌন্দর্যের কষ্টিপাথরে ঘষিয়া দেখেন যে তাঁহার সৃষ্টি বশিষ্ঠের জগৎ-সৃষ্টির ন্যায় অলীক কি না। সাহিত্যের উদ্দেশ্য কী— এই হইতেছে শাশ্বত প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথ বলিতে চান সাহিত্য-সৃষ্টির কোনোই উদ্দেশ্য নাই; স্রষ্টার আনন্দই সাহিত্য-সৃষ্টির কারণ ও উদ্দেশ্য; অনেকটা art for art's sake মতবাদের সমর্থন বলিয়া মনে হয়। "লিখিতে হইলে যে বিষয় চাইই এমন কোনো কথা নাই। বিষয় বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রাণ নহে। ·· বিশুদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে উদ্দেশ্য বলিয়া যাহা হাতে ঠেকে, তাহা আনুষঙ্গিক এবং তাহা ক্ষণস্থায়ী।"[১] সাহিত্য সম্বন্ধে এইমত যে তিনি বরাবর পোষণ করিয়াছিলেন তাহা নহে, এবং উহা যে অভ্রান্ত তাহাও বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, কবি এই সময়ে কিভাবে নিজ মতকে সমর্থন করিতেছেন, তাহাই দেখানো আমাদের কর্তব্য।

সাহিত্যসৃষ্টির অন্তরায় কোথায় এবং কোন অনুকূলতার মধ্যে উহা পূর্ণ বিকশিত হইতে পারে, এ প্রশ্ন প্রসঙ্গত উঠাই স্বাভাবিক। সভ্যতার সহিত সাহিত্যের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ এই যে বর্তমান মানুষের জীবন ও মন বহির্মুখীন উত্তেজনা ও অনবসরের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত; তাহার জীবন কেবল রাজনীতি ও সমাজনীতির সমস্যা সমাধান চেষ্টায় বিপর্যস্ত; তাহার না আছে অবসর, না আছে শান্তি। ইংরেজি সাহিত্যের মধ্যে ক্রমেই যে বিশুদ্ধ সাহিত্যরসের অভাব দেখা দিতেছে, তাহার কারণ ইংরেজের এই অস্বাভাবিক জীবন যাপন। তাই সেখানে সাহিত্যরসধারা পদে পদে বাধাগ্রস্ত। 'অসীম সৃষ্টিকার্য অসীম অবসরের মধ্যে নিমগ্ন' এই সহজ কথাটি ইংরেজ ভুলিয়া আছে; তাহার জীবনে অবসর তো নাই-ই, অবসরের প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব করে না।[২]

অবসরহীন জীবন সাহিত্যসৃষ্টির অন্তরায়, এই তত্ত্বটি বহুবৎসর পরে কানাডায় (১৯২৯, এপ্রিল) The Philosophy of Liesure নামে বক্তৃতায় ব্যাখ্যা করেন। পূর্বোক্ত প্রবন্ধে সেই কথাটিই অস্পষ্টভাবে বলিলেন। সাধারণ লোকে অবসর ও আলস্যকে প্রায় প্রতিশব্দ মনে করে। কবি এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য কোথায় তাহা খুব স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিলেন; "সাহিত্য মানবসমাজের জীবন, স্বাস্থ্য ও উদ্যমেরই পরিচয় দেয়। · সুশৃঙ্খল অবসর সে ত' প্রাণপণ পরিশ্রমের ফল,

১ সাহিত্যের উদ্দেশ্য, ভারতী ১২৯৪ বৈশাখ।

২ সাহিত্য ও সভ্যতা, ভারতী ১২৯৪ বৈশাখ।

আর উচ্ছৃঙ্খল জড়ত্ব অলসের অনায়াসলব্ধ অধিকার। উন্নত সাহিত্য উদ্যমপূর্ণ সজীব সভ্যতার সহিত সংলগ্ন, স্বাস্থ্যময়, সৌন্দর্যময়, আনন্দময় অবসর।"[১]

বহুকাল পরে শিলাইদহের পদ্মাতীরে বাসকালে এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে কবি একখানি পত্রমধ্যে লেখেন,[২] "কোনো জিনিস যথার্থ উপভোগ করতে গেলে তার চতুর্দিকে অবসরের বেড়া দিয়ে ঘিরে নিতে হয়— তাকে বেশ অনেকখানি মিলিয়ে দিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে চতুর্দিকে বিছিয়ে দিয়ে তবে তাকে ষোলআনা আয়ত্ত করা যায়।"

এই উক্তি রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সত্য উক্তি, কারণ তাঁহার ন্যায় নিরলস জীবন খুব কম ধনীর পুত্র যাপন করিয়াছেন ; 'সুশৃঙ্খল অবসর সে ত' প্রাণপণ পরিশ্রমের ফল'— এ কথা তাঁহারই লেখনী হইতে বাহির হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া উদগ্র কর্মপ্রচেষ্টাকেও জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া কখনো স্বীকার করেন নাই। কর্ম ও অবসর দিবা ও রাত্রির ন্যায় পরস্পরের পরিপূরকরূপে তাঁহার জীবনকে একটি সুষ্ঠু সমগ্রতা দান করিয়াছিল। সুসংগত জীবনযাপন ছিল তাঁহার আর্টিস্ট জীবনের কাম্য।

মানসীর প্রথমযুগ। 'হিন্দুবিবাহ'

'জীবন আছিল লঘু প্রথম বয়সে'— কবি আছেন পার্ক স্ট্রীটের বাসায়। দুই চারিটা কবিতা, বন্ধুবান্ধবকে দুই একখানি পত্র, সাহিত্য সম্বন্ধে দুটো একটা খাপছাড়া প্রবন্ধ ব্যতীত বিশেষ কিছু রচনা চোখে পড়ে না। যেসব কবিতা পরে 'মানসী' কাব্যখণ্ডে সংগৃহীত হয়, তার কয়েকটি ১২৯৪ এর গোড়ায় রচিত হয়, যেমন, 'ভুলে' 'ভুলভাঙা' ও শ্রীশচন্দ্রকে লিখিত 'পত্র'— সবগুলিই বৈশাখমাসে লেখা। জ্যৈষ্ঠমাসে 'বিরহানন্দ' ছাড়া কবিতা নাই ও আষাঢ়ে লেখেন 'শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা' ও 'সিন্ধুতরঙ্গ।' শেষ কবিতাটি পৃথক ধরনের রচনা, সম্পূর্ণ বিভিন্ন অভিঘাতে রচিত। অল্পকালের ব্যবধানে কবিতাগুলি রচিত বলিয়া এগুলিকে একই ভূমিকায় দেখিতে চেষ্টা করা স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বিচিত্ররূপী কবির সকল জীবনকথা বাহিরের দিক হইতে বিচার করিতে গেলে ভুলের সম্ভাবনা থাকিয়া যায় সত্য, আবার অন্তর্জগতের অনুভূতিলোকে যে সূক্ষ্ম ঘাতপ্রতিঘাত চলে তাহার সন্ধান দেওয়াও সুকঠিন। কিন্তু বাহিরের অভিঘাত বা প্রেরণা-যে লিরিক সৃষ্টির অন্যতম কারণ তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের জীবনে সেইরূপ কারণ ছিল কিনা, তাহা আবিষ্কার করা কঠিন হইতে পারে, কিন্তু কারণের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যাইতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বহু বৎসর পরে 'মানসী' কাব্যের আলোচনা উপলক্ষ্যে স্বীকার করিয়াছিলেন, 'মানসীর প্রথম পাঁচ-ছয়টি কবিতা বেদনার কবিতা।' এই কাব্য দুঃখের কথায় শুরু হইল কেন কবি বহু বিস্তারে তার বিচার করিয়াছেন বটে, তবে সে-বিচার হইয়াছে কাব্যপ্রেরণার মুহূর্ত হইতে অর্ধশতাব্দীর পরে ; সুতরাং স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ হইতে ক্রিটিক রবীন্দ্রনাথের ব্যবধান সত্যকার ব্যবধান। রবীন্দ্রনাথের মতে 'কবির চিত্তের দুটি পর্ব বা অধ্যায় থাকে। এক অধ্যায়ে সে তার জীবনের গভীর বেদনাকে প্রকাশ ক'রে বলতে চায়, সেই বলার জন্যে তার মন অস্থির হয়ে পড়ে। এই যে তার বেদনা প্রকাশের ব্যাকুলতা, এটা তাকে অতিমাত্রায় চঞ্চল করে তোলে। তার জীবনের আর একটা দিকও আছে ; সে-অধ্যায়ে সে বেদনার উৎস হতে প্রাপ্ত ভাবকে জীবনের সুখদুঃখের সঙ্গে মিশিয়ে প্রাণময় রসের সৃষ্টির জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এই যে সৃষ্টির আবেগ এটা তাকে এমন একটা রসোপলব্ধির মধ্যে নিয়ে যায় যেটা প্রকৃতপক্ষে দুঃখ নয়, বেদনাও নয়, তা হচ্ছে দুঃখ বেদনার অতীত এমন একটা বস্তু যা বর্তমানের সীমাকে অতিক্রম করে,

১ আলস্য ও সাহিত্য, ভারতী ১২৯৫ শ্রাবণ পৃ ২০৫।

২ ছিন্নপত্র পৃ ২১০। শিলাইদহ ১৮৯৩ জুলাই ২। ১৩০০ আষাঢ় ১৯।

চিরন্তনের মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা চায়। কবি তাঁর কাব্যে, রচনায়, জীবনের দৈনন্দিন সুখদুঃখের মধ্যে যা পান সেইটেকেই দৈনন্দিন গণ্ডির থেকে পার ক'রে নিয়ে চিরন্তনের সুরে তাঁকে দেন বেঁধে। এই চিরন্তনের মধ্যে নিজের জীবনের অনুভূতিকে প্রকাশ করাই কবির ধর্ম।"

'মানসী'র কবিতাগুলির মধ্যে যে স্তরভেদ আছে, তা কবি স্বীকার করিয়াছেন। প্রথম পর্বের সহিত দ্বিতীয় পর্বের তফাতটা কবি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন, "প্রথম পর্বে কবি নিজেকে ঘোষণা করেন অর্থাৎ কারও কাছে দরদ আদায় করবার ইচ্ছেটাই তাঁর তখন প্রবল। দ্বিতীয় পর্বে কবি বেদনাকে অবিকল ব্যক্ত করেন না, তখন তিনি সৃষ্টি করবার জন্য সুখ-দুঃখের সীমাকে অতিক্রম করে যান। প্রথম পর্বের মতন অন্যের কাছে নিজের বেদনার জন্য দরদ প্রার্থনা করেন না।"

মানসীর প্রথম দিকের কবিতাগুলিতে "কবির হৃদয়ের আবেগ রয়েছে। কিন্তু কবিতার শেষকথা তো তা নয়। হৃদয়ের আবেগ কবিতার উপকরণ বা মশলার মতন, সেই সব উপকরণ থেকে সৃষ্টি হয় সৌন্দর্যের, সেই সৌন্দর্য সৃষ্টি সুচারুরূপে সম্পন্ন করলে কবি তখন ভুলে যান তুচ্ছ দিকের কথা। তখন সেই আবেগকে উপলক্ষ্য ক'রে মনের বেদনার ভিত্তিভূমিতে সৃষ্টি করতে চান শিল্পকুশলতায় সুন্দরকে। অর্থাৎ তিনি শিল্পরচনা করেন যাতে তাঁর সুখদুঃখ, সাময়িক আবিলতামুক্ত হয়ে চিরন্তনের বুকে গেঁথে যায় নির্মাল্যে। এই শিল্পসৃষ্টিকে গৌণভাবে বলতে পারা যায় অটোবায়গ্রাফি, কিন্তু মুখ্যভাবে তা হচ্ছে আপনার রচনাকে আপনার সৃষ্টিকে চিরস্থায়ী করবার আগ্রহ।"[১]

মানসীর প্রথম স্তরের কবিতাগুলির মধ্যে যে একটি বিষাদমাখা ভাবনা চাপা রহিয়াছে, তাহা অস্পষ্ট নহে। 'কড়ি ও কোমলে' কবি বলিয়াছিলেন 'কাহারে জড়াতে চাহে দুটি বাহুলতা' কিন্তু আজ প্রেমের ভুল কি ভাঙিয়াছে। তাই কি কবি 'ভুল-ভাঙা' কবিতায় লিখিলেন,

'বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশ, বাহুতে মোর।'··· 'বসন্ত নাহি এ ধরায় আর / আগের মতো,
'স্বর শুনে আর উতলা হৃদয় / উথলি উঠে না সারা দেহময়', জ্যোৎস্না যামিনী যৌবন হারা, / জীবন-হত।'

কবির কাছে প্রেমের বিরহটাই আজ বড়ো হইয়া উঠিয়াছে, বৈষ্ণব কাব্যও বিরহের বর্ণনায় পূর্ণ। 'বিরহানন্দে' কবি লিখিতেছেন—"বিরহ সুমধুর হল দূর কেন রে? মিলন দাবানলে গেল জ্বলে যেন রে।

কিন্তু ইহাও কবিচিত্তের সত্য রূপ নহে; কবির হৃদয় শূন্য থাকিতে পারে না; শূন্য হৃদয়ে আকাঙ্খা জাগে, তাই তিনি বলিলেন, 'আবার মোরে পাগল করে দিবে কে?···'

'তাহার বাণী দিবে গো আনি / সকল বাণী বাহিয়া।
পাগল করে দিবে সে মোরে / চাহিয়া।'

লঘুভাবে রচিত 'পত্র'মধ্যে কবির অজ্ঞাতে, অকারণে এই বিরহের কথাটাই ঘনাইয়া উঠিয়াছে। 'মানসী'র কবিতাগুচ্ছ যেন 'কড়ি ও কোমলে'র সম্ভোগ ও শান্তির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া, ছন্দের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ।

'কড়ি ও কোমলে'র কেন্দ্রীয় কবিতাগুলি প্রায়ই চতুর্দশপদী; চৌদ্দটি পংক্তির মধ্যে বিশেষ এক ছন্দে ভাবরাশিকে সংযত, সংহত এমন কি খর্ব করিয়া প্রকাশ করিতে হইয়াছিল; 'মানসী'র নূতন কবিতা কবির সেই বন্ধনমুক্ত আনন্দের সৃষ্টি। প্রথমত কবিতাগুলি মাপ-করা স্থানের মধ্যে আবদ্ধ নহে; দ্বিতীয়ত ছন্দে স্বাধীনতা আসাতে রচনারীতিতে নূতন শক্তি আসিল।

১ 'মানসী' কাব্যপাঠের ভূমিকা। শান্তিনিকেতনে 'মানসী' অধ্যাপনাকালে কথিত। দেশ ১৩৪৭ হইতে প্রবাসী ১৩৪৭ আশ্বিন সংখ্যায় উদ্ধৃত। পৃ ৭৬৪-৬৫।

এ-বৎসরের গোড়ার দিকে কবিতা খুবই কম; আষাঢ় ও শ্রাবণে মাত্র তিনটি কবিতা— 'শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্খা' 'সিন্ধু তরঙ্গ' ও শ্রীশচন্দ্রকে লিখিত 'শ্রাবণের পত্র'। ১২৯৪ শ্রাবণ ১২)। 'সিন্ধুতরঙ্গ' পুরী তীর্থযাত্রী তরণীর নিমজ্জন উপলক্ষ্যে রচিত, ভারতীতে প্রকাশিত হয় 'মগ্নতরী' নামে (১২৯৪ শ্রাবণ)।[১]

কবিতা লিখিবার সময় কবিরা যে তীব্র আবেগ অনুভব করেন, তা যদি স্থায়ী হইত, তবে তাঁহারা কখনোই জীবনের শেষ পর্যন্ত সহজ ও প্রকৃতিস্থ মানুষ থাকিতে পারিতেন না। 'মগ্নতরী' লিখিবার কালে যে তীব্র বেদনা অনুভব করিয়া আবেগ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা কবিতা রচনার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া যায়। তারপর অত্যন্ত হালকা মনে আছেন। হঠাৎ শ্রাবণ মাসে মনে পড়িল জন্মদিনের কথা— দু-বছর আগে ছিলেন পঁচিশ, এইবার হইয়াছে সাতাশ। ঘটনাটি যেন অত্যন্ত অভাবনীয় বলিয়া তাঁহাকে হঠাৎ আঘাত করিতেছে। শ্রীশচন্দ্রকে একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "কিন্তু সাতাশ হওয়াই কি কম কথা! কুড়ির কোঠার মধ্যাহ্ন পেরিয়ে ত্রিশের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া।— ত্রিশ অর্থাৎ ঝুনো-অবস্থা; অর্থাৎ যে অবস্থায় লোকে সহজেই রসের অপেক্ষা শস্যের প্রত্যাশা করে— কিন্তু শস্যের সম্ভাবনা কই!··· পাকা-কথা কিছুতেই বেরোয় না শ্রীশবাবু। যাতে পাঁচ জনের কিছু লভ্য হয় এমন বন্দোবস্ত ক'র্‌তে পারচিনে। দুটো গান বা গুজোব, হাসি বা তামাসা এর চেয়ে বেশি আর কিছু হ'য়ে উঠল না।···পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত কোনো লোককে সম্পূর্ণ জানা যায় না···। কিন্তু সাতাশ বৎসরে মানুষকে একরকম ঠাহর করা যায়— বোঝা যায় তার যা হবার তা একরকম হ'য়েচে···এ লোকের জীবনে হঠাৎ আশ্চর্য হবার আর কোনো কারণ রইল না।...নূতন প্রেমের আশাও রইল না, নূতন বিরহের আশঙ্কাও গেল। অতএব এ এক রকম মন্দ নয়। জীবনের আরামজনক স্থায়িত্ব লাভ করা গেল।··"[২] 'জীবন আছিল লঘু',— তাই ঐ দীর্ঘ পত্র বন্ধুকে লিখিয়া, আবার উহারই কিয়দংশ কবিতায় রচনা করিলেন,— এত অবসর কয়জনের থাকে!

কিন্তু হঠাৎ একদিন বড়ো রকম এক কাজের আহ্বান আসিয়া হাজির। পার্ক স্ট্রীটের বাসায় আছেন; বাংলার উদীয়মান লেখক ও বাগ্মী, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম যুবক কর্মী ও নেতা বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৫-১৯৩২) আসিলেন রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে। তিনি বলিলেন, প্রতিক্রিয়াপন্থী নব্য হিন্দুদের সামাজিক মতামত যেভাবে প্রচার ও প্রসার লাভ করিতেছে, তাহার যথোপযুক্ত প্রতিরোধিতা হইতেছে না। এইসব সামাজিক মতবাদ কেবলমাত্র সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া ক্রমে বিশিষ্ট খ্রীস্টান, হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল জয়গোবিন্দ সোমের ন্যায় ব্যক্তিকেও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে; সুতরাং প্রতিবাদ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই সময়ে চন্দ্রনাথ বসু হিন্দুপত্নীর আদর্শ, হিন্দুবিবাহের বয়স ও উদ্দেশ্য প্রভৃতি আলোচনা করিয়া দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন (সাবিত্রী ১২৯৩)। এইসব প্রবন্ধের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথকে লেখনী ধারণ করিবার জন্য বিপিনচন্দ্র অনুরোধ আনিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুবিবাহ' নামে[৩] একদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিলেন ও সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের হলে[৪] ডাঃ মহেন্দ্রলাল

১ Retriever ও Sir John Lawrence নামে দুইখানি স্টীমার বঙ্গোপসাগরে প্রবল ঝড়ে পড়িয়া ডুবিয়া যায় (১৮৮৭ মে ২৫); প্রায় সাড়ে সাতশত লোকের প্রাণনাশ হয়।

২ ছিন্নপত্র পৃ ১৯-২১ [কলিকাতা] ২৭ জুলাই ১৮৮৭ [১২৯৪ শ্রাবণ ১২]

৩ হিন্দুবিবাহ, ভারতী ১২৯৪ আশ্বিন পৃ ৩১৪-৪৮। দ্র সমাজ, বি-ভা সং। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২শ খণ্ড। পৃ ৪১৩-৪৯।

৪ মহেন্দ্রলাল সরকার (১৮৩৩-১৯০৪)। কলিকাতা মেডিকাল কলেজ হইতে সগৌরবে M.D. পাশ করেন (১৮৬৩)। কিন্তু অল্পকাল পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উৎসাহে ও উপদেশে এলোপ্যাথি চিকিৎসা ত্যাগ করিয়া হোমিওপ্যাথি পদ্ধতি শুরু করেন এবং ঐ চিকিৎসা-বিদ্যায় অতুল যশ ও বিপুল ধন লাভ করেন। বাংলাদেশে তিনি সর্বপ্রথম হাতে-কলমে বিজ্ঞান-চর্চার জন্য সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করেন। সমাজ সংস্কারাদি ব্যাপারে ইনি অত্যন্ত আধুনিক মতামত পোষণ করিতেন; বাল্যবিবাহের ইনি বিরোধী ছিলেন।

সরকারের সভাপতিত্বে উহা পাঠ করেন; প্রবন্ধ পাঠান্তে সভাস্থ অনেকেই রচনার গুণাগুণ লইয়া আলোচনা করেন; পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (১৮৩৬-১৯০৬) উঠিয়া বলিলেন, 'আমি মহেশ, আমি চারি হস্তে লেখককে আশীর্বাদ করিতেছি।'

রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক সীলি-র (Seely) Natural Religion নামক গ্রন্থ হইতে একটি অংশ ও তাহার অনুবাদ ভূমিকারূপে উদ্ধৃত করিয়া 'হিন্দুবিবাহ' প্রবন্ধটি শুরু করেন। সীলির মত এই যে যাহারা কোনো পুরাতন ধর্মপ্রণালী অথবা সমাজতন্ত্রের জীর্ণ দশায় জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রাচীন সংস্কারের সহিত নূতন শিক্ষার বিরোধবশত বিশ্বাস ও বল হারাইয়া নৈতিক পঙ্গু অবস্থা প্রাপ্ত হন। য়ুরোপের নূতন শিক্ষার প্রভাবে বাংলায় অনেকগুলি নূতন কর্তব্য আসিয়াছে সত্য, কিন্তু আলস্যের দায়ে, সংস্কারের মোহে, সমাজের ভয়ে সেগুলি পালন করিতে না পারিয়া এই নূতনের উপর তাঁহাদের অবজ্ঞা আসিয়াছে।

চন্দ্রনাথ বাবু সংস্কৃত সাহিত্য হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া হিন্দুবিবাহের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথ এই পদ্ধতির খুবই নিন্দা করিয়া বলেন যে প্রয়োজন হইলে সংস্কৃত সাহিত্য হইতে অত্যন্ত কুৎসিত কথা নারীদের সম্বন্ধে চয়ন করা অসম্ভব নহে। সুতরাং বচন উদ্ধৃত করিলেই হিন্দুবিবাহের বা পত্নীর শ্রেষ্ঠ আদর্শ সপ্রমাণ করা যায় না। চন্দ্রনাথ বাবু লিখিয়াছিলেন যে হিন্দুবিবাহের প্রধান লক্ষ্য দম্পতির একীকরণতা। ইহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে ইহাই যদি মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে পুরুষদের পক্ষে বহুদার পরিগ্রহ সম্ভব হইতে পারে না; কৌলীন্য-বিবাহও সমাজে কোনোমতে স্থান পায় না। "বিবাহের যত কিছু আদর্শের উচ্চতা সে-কেবল পত্নীর বেলায়, পতিকে সে-আদর্শ স্পর্শ করিতেছে না। (ভারতী ১২৯৪, পৃ" ৩২২)। হিন্দু বিবাহের আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবু ও অক্ষয় সরকার খুবই উচ্ছ্বসিতভাবে লিখিয়াছেন। চন্দ্রনাথ বাবু লিখিয়াছিলেন যে, "ইংরেজ আত্মপ্রিয় বলিয়া তাহার বিবাহে প্রকৃত পক্ষে মহৎ উদ্দেশ্য নাই। মহৎ উদ্দেশ্য নাই বলিয়াই তাহার বিবাহ বিবাহই নহে।" লেখকের এই দাম্ভিক উক্তির তীব্র প্রতিবাদ রবীন্দ্রনাথ করেন। তিনি এই সম্পর্কে লিখিলেন, "শ্বশুর শাশুড়ি ননদ দেবর প্রভৃতির যথাবিহিত সেবা এবং পুরপ্রচলিত দেবকার্যের সহায়তা করিয়া স্ত্রী মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিলেই যে সকল স্বামীর সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি ঘটে তাহা নহে। স্বামী চায় মনের মত তাহারই বিশেষ প্রীতিকর রূপগুণসম্পন্ন স্ত্রী; এইজন্য রুচি অনুসারে স্বভাবতই মানুষ সৌন্দর্য, সংগীত প্রভৃতি কলাবিদ্যা এবং . . কতকগুলি মানসিক ও নৈতিক গুণ স্ত্রীর নিকট হইতে অনুসন্ধান করিতে থাকে।"

বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে দুইটি মত ছিল, চন্দ্রনাথবাবু বোধ হয় মনুর স্মৃতি মনে রাখিয়া যুবক ও শিশু-বালিকা বিবাহের পোষক ছিলেন; বালিকার পক্ষে পরিবারের সহিত সম্পূর্ণভাবে একীভূত হইয়া যাইবার পক্ষে এই বয়সই অনুকূল। ভূদেববাবুও বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী; তবে তিনি ছিলেন বালকবালিকার বিবাহের পক্ষে। সেইজন্য বাল্যবিবাহের সহিত একান্নবর্তী সংসার অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। একান্নবর্তী পরিবারেই বাল্যবিবাহ সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, নানা অনিবার্য কারণে এই প্রাচীন প্রথা ভাঙিতেছে; প্রথমে ভাঙিতেছে আর্থিক সমস্যার জন্য, বৃহৎ পরিবার পালন করা আর্থিক কারণে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে; দ্বিতীয়ত ভাঙিতেছে আদর্শের পার্থক্য হেতু। দুইটি কারণই প্রবল বেগে সমাজে ভাঙন ধরাইয়াছে।

স্বাধীন চিন্তা ইংরেজি শিক্ষার ফল। 'স্বাধীন চিন্তা যেখানে আছে, বুদ্ধির ভিন্নতা অনুসারে উদ্দেশ্যের ভিন্নতা জন্মিয়াই থাকে।' একান্নবর্তী পরিবারের মূল হইতেছে এক-কর্তৃত্ব। কিন্তু বর্তমানে সে কর্তৃত্ব নাই, সে ভক্তি ও নিষ্ঠা নাই। ইহার কারণ শিক্ষার বৈষম্য। পূর্বে বিদ্বান ও মূর্খের মধ্যে একজন বেশি জানিত, আর-একজন কম জানিত এইমাত্র প্রভেদ ছিল। এখন একজন একরূপ জানে, আরেকজন অন্যরূপ জানে। ইহা ইংরেজি শিক্ষার

ফল। একই পরিবারে শিক্ষার বৈষম্যহেতু মতের অমিল হয়। সুতরাং একান্নবর্তী পরিবারে যে পূর্বের সুখশান্তি থাকিতে পারে না, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এই প্রতিষ্ঠান ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বাল্যবিবাহও টিঁকিতে পারে না। যেখানে স্বতন্ত্র গৃহ করিতে হইবে সেখানে স্বামী স্ত্রীর বয়স অল্প হইলে চলিবে না।

রবীন্দ্রনাথ আরও দেখাইলেন যে কন্যার বিবাহের বয়স ধীরে ধীরে বাড়িয়া যাইতেছে; আর্থিক অবস্থার অসচ্ছলতা ইহার প্রধান কারণ। এছাড়া অনেক যুবক বিবাহ কার্য চটপট্ সারিয়া ফেলিতে চান না। বাঙালি যে কোনো কাজে সাহস করিয়া হাত দিতে পারে না, বহুশ্রমসাপেক্ষ পরীক্ষাদির মধ্যে যাইবার অবকাশ পায় না, তাহার কারণ অল্প বয়সে তাহার স্কন্ধে বৃহৎ পরিবারের দুঃসহ বোঝা চাপানো হয়; এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ অন্য কোনো কোনো প্রবন্ধেও জোর দিয়া বলিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ বাল্যবিবাহ উচ্ছেদের পক্ষপাতী; কিন্তু তিনি ইহাকে আইন দ্বারা উঠাইবার পক্ষে মত দিলেন না; তিনি লিখিয়াছিলেন, "বাল্যবিবাহকে বলপূর্বক উৎপাটন করিলে সমাজে সমূহ দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার প্রাদুর্ভাব হইবে। অল্পে অল্পে নূতন অবস্থার প্রভাবে সমাজের সমস্ত নিয়ম নূতন আকার ধারণ করিয়া সমাজের বর্তমান অবস্থার সহিত আপন উপযোগিতা-সূত্র বন্ধন করিতেছে। অতএব যাঁহারা বাল্যবিবাহের বিরোধী তাঁহাদিগকে অকারণ ব্যস্ত হইতে হইবে না।"

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য যে কত সত্য তাহা গত শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। বিধবাবিবাহ আইন দ্বারা সিদ্ধ হইলেও দেশমধ্যে প্রচার লাভ করে নাই; শারদা আইন দ্বারা বাল্যবিবাহ বন্দের চেষ্টা যে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা আজ কাহারও অবিদিত নাই; অথচ আইন-নিরপেক্ষই দেশ ধীরে ধীরে এইসব পুরাতন সংস্কার ভাঙিতেছে; রবীন্দ্রনাথের বিচার যে কী সত্যদৃষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা আজ আর প্রমাণসাপেক্ষ নহে।

চন্দ্রনাথ বসুকে সেযুগের প্রতিক্রিয়াপন্থীদের প্রতীক্ বলিলে ভুল করা হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষা ও প্রতিভার প্রতি কিছুমাত্র অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিয়া একথা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, বঙ্গের বহু সামাজিক সংস্কার তাঁহার দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ও চন্দ্রনাথ বসুর ন্যায় প্রতিভাবান পুরুষদিগকে ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়াপন্থী হইতে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের মনে বিশেষ আঘাত লাগে; কারণ উভয়কেই তিনি গভীর শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহাদের স্নেহ হইতেও তিনি কোনোদিন বঞ্চিত হন নাই। এক্ষেত্রে ইঁহাদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ তাঁহার পক্ষে পীড়াদায়ক; নিতান্ত কর্তব্যের খাতিরেই চন্দ্রনাথের অযৌক্তিক তর্কজালকে বারে বারে আঘাত করিয়া ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে হইয়াছিল। ইঁহারা এককালে বাংলার যুবমনকে প্রগতির পথে পরিচালনা করিয়াছিলেন, বিপ্লবের বাণী তাঁহারাই শুনাইয়াছিলেন; কিন্তু কালে তাঁহারাই প্রতিক্রিয়াপন্থী হইয়া প্রগতির ক্ষর স্রোতধারায় শাস্ত্রের আবর্জনা পুঞ্জীভূত করিয়া বাঙালির সহজ গতিবেগকে প্রতিহত করিলেন; তাঁহাদের জীবনে আদর্শের এমন জীবন্ত সমাধি দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ বড়ই দুঃখে বলিয়াছিলেন,—

মনে আছে সেই প্রথম বয়স,
নূতন বঙ্গভাষা
তোমাদের মুখে জীবন লভিছে
বহিয়া নূতন আশা।...
কোথা গেল সেই প্রভাতের গান,
কোথা গেল সেই আশা,

আজিকে বন্ধু, তোমাদের মুখে
এ কেমনতর ভাষা।...
তোমরা আনিয়া প্রাণের প্রবাহ
ভেঙেছ মাটির আল,
তোমরা আবার আনিছ বঙ্গে
উজান স্রোতের কাল।

নিজের জীবন মিশায়ে যাহারে
আপনি তুলেছ গড়ি
হাসিয়া হাসিয়া আজিকে তাহারে
ভাঙিছ কেমন করি ?[১]

মানসীর দ্বিতীয় স্তর। দার্জিলিঙে।

১২৯৪ সালের শরৎকালে (১৮৮৭ অক্টোবর) রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে দার্জিলিং গেলেন। সপরিবার বলিতে তখন বুঝায় স্ত্রী, বয়স চৌদ্দবৎসর ও একমাত্র কন্যা বেলা এক বৎসরের শিশু। তবে সঙ্গে ছিলেন সৌদামিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী ও তাঁহার দুই কন্যা হিরণ্ময়ী ও সরলা। তখনকার দিনে দার্জিলিঙ যাইতে হইলে দামুকদিয়া নামে একটি স্টেশনে নামিয়া স্টীমারযোগে পদ্মা পার হইতে হইত; পরপারে সারাঘাট; সেখান হইতে মিটার গেজের ছোটোলাইন শিলিগুড়ি পর্যন্ত। শিলিগুড়ি হইতে আরো ছোট এবং প্রায়-খোলা রেলগাড়ি চড়িয়া হিমালয়ের চড়াইপথে চলিতে হইত।

দার্জিলিঙ পৌঁছাইয়া রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে (১৫) এক পত্রে লিখিতেছেন— "সারাঘাটে স্টীমারে ওঠ্‌বার সময় মহা হাঙ্গাম। রাত্রি দশটা, জিনিষপত্র সহস্র, কুলি গোটাকতক, মেয়েমানুষ পাঁচটা এবং পুরুষ মানুষ একটি মাত্র।··· ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ছুটোছুটি নিতান্ত অল্প হয়নি তবু ন[দিদি] বলেন আমি কিছুই করিনি অর্থাৎ একখান আস্ত মানুষ একেবারে আস্ত রকম খেপলে যে-রকমটা হয় সেই প্রকার মূর্তি ধারণ করলে ঠিক পুরুষ মানুষের উপযুক্ত হতো। কিন্তু এই দুদিনে আমি এত বাক্স খুলেছি এবং বন্ধ করেছি এবং বেঞ্চির নীচে ঠেলে গুঁজেছি, এবং উক্ত স্থান থেকে টেনে বের করেচি, এত বাক্স এবং পুঁটুলির পিছনে আমি ফিরেচি এবং এত বাক্স এবং পুঁটুলি আমার পিছনে অভিশাপের মতো ফিরেচে, এত হারিয়েচে এবং এত ফের পাওয়া গেছে এবং এত পাওয়া যায়নি এবং পাবার জন্য এত চেষ্টা করা গেছে এবং যাচ্ছে যে, কোনো ছাব্বিশ বৎসর বয়সের ভদ্রসন্তানের অদৃষ্টে এমনটা ঘটেনি। আমার ঠিক বাক্স-phobia হয়েচে; বাক্স দেখ্‌লে আমার দাঁতে দাঁত লাগে।" "শিলিগুড়ি থেকে গাড়ি চল্‌তে লাগ্‌ল। ক্রমে ঠাণ্ডা, তারপরে মেঘ, তারপরে সর্দি, তারপরে হাঁচি, তারপরে শাল, কম্বল, বালাপোষ, মোটা মোজা, পা কন্‌ কন্‌, হাত ঠাণ্ডা, মুখ নীল, গলা ভার-ভার এবং ঠিক তারপরেই দারজিলিং। আবার সেই বাক্স, সেই ব্যাগ, সেই বিছানা, সেই পুঁটুলি, মোটের উপর মোট, মুটের উপর মুটে। ব্রেক থেকে জিনিষ পত্র দেখে নেওয়া, চিনে নেওয়া, মুটের মাথায় চাপান, সাহেবকে রসিদ দেখান, সাহেবের তর্ক বিতর্ক, জিনিষ খুঁজে না পাওয়া এবং সেই হারান জিনিষ পুনরুদ্ধারের জন্য বিবিধ বন্দোবস্ত করা, এতে আমার ঘণ্টা দুয়েক লেগেছিল।"[২]

পর বৎসর ভারতীতে (১২৯৫) স্বর্ণকুমারী দেবী এই দার্জিলিং ভ্রমণের একটি বিস্তৃত বর্ণনা প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি তাঁহাদের পুরুষ অভিভাবক অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের আনাড়িপনা সম্বন্ধে অনেক কথা সরসভাবে বলিয়াছিলেন। দার্জিলিঙে তাঁহারা যে-বাড়ি ভাড়া করেন তার নাম ছিল কাসলটন্ হাউস্। স্বর্ণকুমারী লিখিয়াছেন, 'লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্নরের বাড়ি ছাড়া দারজিলিং-এ শুনতে পাই এত বড় বাড়ী আর নেই।'···এই প্রবাসে তাঁহাদের এই সুখী পরিবারের সন্ধ্যাগুলি কিভাবে কাটিত তাহার একটি চিত্রও লেখিকা রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন, "বাড়ির ·· হলটা বড়। সেই মস্ত হলে··· সন্ধ্যাবেলা সমস্ত চৌকি একখানা কৌচের কাছে জড় হয়, আর মধ্যে একটা টিপয়ে আলো জ্বলে তার চারিদিকে কেহ চৌকিতে কেহ কৌচে সুবিধামত বসে শুয়ে নিলে আমাদের সঙ্গী অভিভাবকটি [রবীন্দ্রনাথ] টেনিসন থেকে, ব্রাউনিং থেকে··· কবিতা পোড়ে শোনান। বাস্তবিক তিনি কি সুন্দর করে পড়েন······ ব্রাউনিং-এর লেখা

১ মানসী। পরিত্যক্ত, ২৮ জ্যৈষ্ঠ [১২৯৫] (গাজিপুর)।

২ ছিন্নপত্র পৃ ২৮-৩০। দার্জিলিং ১৮৮৭।

কি জোয়াল। ·· ব্রাউনিং পড়তে পড়তে যে কান্না পায়— সে যেন জমাট বরফ গলতে আরম্ভ হয়, সে কান্না হঠাৎ থামান যায় না। তাঁর Blot in the Scutcheon একবার পড়ে দেখ। এমন সুন্দর কাব্যনাট্য আর পড়েছি মনে হয় না।"[১] তবে এই সান্ধ্য পাঠচর্চা খুব বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই ; স্বর্ণকুমারী দ্বিতীয় পত্রে লিখিতেছেন, "আমাদের সে পড়াশুনার মজলিস অনেকদিন বন্ধ হইয়াছে।"[২]

প্রায় একমাস কাল দার্জিলিঙে কাটাইয়া রবীন্দ্রনাথ একাই কলিকাতায় ফিরিলেন। শ্রীশচন্দ্রকে লিখিতেছেন, "স্ত্রী কন্যা দার্জিলিঙে, আমি কলকাতায় ঘরে বসে বিরহ ভোগ করচি— কিন্তু বিরহের চেয়ে কোমরের বাতটা বেশি গুরুতর বোধ হচ্চে।" পত্রখানি কবিতা ও বাত লইয়া কৌতুকে পূর্ণ। পত্রশেষে লিখিতেছেন, "বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে আপনি প্রশ্ন করেচেন সে বিষয় পরে উত্থাপন করা যাবে আপাতত এই ব'লে রাখচি বাল্যবিবাহ যে ইচ্ছে করুক—কিন্তু কোমরে বাত যেন কারো না হয়।" (ছিন্নপত্র)

দার্জিলিং বাস পর্বটা সাহিত্য সৃষ্টির দিক হইতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই। সখি সমিতির তরফ হইতে শ্রীমতী সরলা রায় রবীন্দ্রনাথকে কেবলমাত্র মেয়েদের দ্বারা অভিনয়-উপযোগী একটি গীতি-নাট্য রচনা করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। বোধ হয় সেই উপলক্ষ্যেই দার্জিলিঙ বাসকালে 'মায়ার খেলা'র গান রচনা শুরু করেন; কিন্তু নাটিকাটি লিখিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। ঠাণ্ডা লাগিয়া কোমরে ব্যথা, উঠিতে পারেন না, শুইয়া শুইয়া গান লেখেন ও সরলাদেবীকে শেখান। কার্তিকের শেষদিকে কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। পার্ক স্ট্রীটের বাসায় আছেন। অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি হইতে কবিকে নূতন কবিতার মধ্যে নূতনরূপে পাই। এই মাসে রচিত কবিতাগুলির তালিকা আমরা নিম্নে দিলাম।[৩] মুদ্রিত 'মানসী'র মধ্যে তাহারা এলোমেলোভাবে সাজানো— এবং সেরূপভাবে সাজানোর কোনো সংগত কারণ খুঁজিয়া পাই নাই।

এই কবিতাগুলি মানসী কাব্যগুচ্ছের অন্তর্গত দ্বিতীয় স্তর। ইহাদের মধ্যে একটি গভীর বিষাদের সুর ধ্বনিত হইয়াছে, পর পর পাঠ করিলেই তাহা বোঝা যায়। কিন্তু তৎসঙ্গে নূতন সুরও যে বাজিয়াছে, একটু মন দিয়া পড়িলেই তাহা ধরা পড়ে। প্রেমের মধ্যে কী একটি গভীর 'নিষ্ফল কামনা' কবিকে যেন পীড়িত করিতেছে; প্রেমকে বাস্তবের মধ্যে খুঁজিয়া তিনি ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন। 'জীবন্ত মানব' মাঝে নিজেকে পাইবার দুরাশা তাঁহার চিত্তকে একদা দোলাইয়াছিল; কিন্তু এখন দেখিতেছেন 'বৃথা এ ক্রন্দন।'··· "যেজন আপনি ভীত, কাতর, দুর্বল।···সে কাহারে পেতে চায় চিরদিন তরে?" "ক্ষুধা মিটাইবার খাদ্য নহে যে মানব, কেহ নহে তোমার আমার।" কবি ক্রমশই বুঝিতে পারিতেছেন বাসনা দগ্ধ না হইলে যথার্থ প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না, তাই বলিতেছেন—

> বিশ্বজগতের তরে ঈশ্বরের তরে শতদল উঠিতেছে ফুটি ;
> সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরি দিয়ে তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে ?···
> ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী, চেয়ো না তাহারে।

১ ভারতী, ১২৯৫ বৈশাখ পৃ ২৪

২ ভারতী, ১২৯৫ জ্যৈষ্ঠ পৃ ৯৬। দ্র শ্রীসরলাদেবী, রবিমামা না রবীন্দ্রনাথ, ভারতবর্ষ ১৩৪৮ কার্তিক পৃ ৬৬৯-৭৪।

৩

১২৯৪ অগ্রহায়ণ	১৩, নিষ্ফল কামনা পৃ ২৯	
„ „	১৪, বিচ্ছেদের শান্তি পৃ ৩৬	
„ „	১৫, সংশয়ের আবেগ পৃ ৩৩	
„ „	১৫, তবু পৃ ৩৯	
১২৯৪ অগ্রহায়ণ	১৮, নিষ্ফল প্রয়াস, হৃদয়ের ধন, নিভৃত আশ্রম পৃ ৭৩-৭৫	
„ „	২১, নারীর উক্তি পৃ ৭৬	
„ „	২৩, পুরুষের উক্তি পৃ ৮০	

আকাঙ্খার ধন নহে আত্মা মানবের।···
নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে, চলো ধীরে ঘরে ফিরে যাই।

কবি প্রেমকে যেন ধরিয়া ছুঁইয়া পাইতেছেন না। তাই 'বিচ্ছেদের শান্তি' কামনা করিতেছেন,

দেখেছি অনেক দিন বন্ধন হয়েছে ক্ষীণ ছেঁড় নাই করুণার বশে।
গানে লাগিত না সুর, কাছে থেকে ছিলে দূর, যাও নাই কেবল আলসে।
পরান ধরিয়া তবু পারিতাম না তো কভু তোমা ছেড়ে করিতে গমন।
প্রাণপণে কাছে থাকি দেখিতাম মেলি আঁখি পলে পলে প্রেমের মরণ।
তুমি তো আপনা হতে এসেছ বিদায় ল'তে সেই ভালো, তবে তুমি যাও।
যে প্রেমেতে এত ভয় এত দুঃখ লেগে রয় সে বন্ধন তুমি ছিঁড়ে দাও।···
মিছে কেন কাটে কাল ছিঁড়ে দাও স্বপ্নজাল, চেতনার বেদনা জাগাও,—
নূতন আশ্রয়-ঠাঁই, দেখি পাই কি না পাই,— সেই ভালো তবে তুমি যাও।

কিন্তু প্রেমকে জোর করিয়া বিদায় করিয়া দিয়াও অন্তরে বেদনা পাইতেছেন; তাই অতি করুণ সুরে বলিতেছেন,

তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলে··· নূতন এ প্রেম যদি হয় পুরাতন।

মনে রাখিবার জন্য আকুতি নিবেদন করিয়াও 'সংশয়ের আবেগে' চিত্ত আকুলিত—

ভালোবাস কি না বাস বুঝিতে পারি নে, তাই কাছে থাকি।
তাই তব মুখপানে রাখিয়াছি মেলি সর্বগ্রাসী আঁখি।

প্রেমকে লইয়া অনেক কল্পনা হইতেছে, প্রেমের অনেক মধুর চিত্র লেখনীর তুলিতে আঁকিতেছেন, কিন্তু সংশয় যায় না—

কেড়ে লও বাহু তব, ফিরে লও আঁখি, প্রেমে দাও দ'লে।
কেন এ সংশয়-ডোরে বাঁধিয়া রেখেছ মোরে, বহে যায় বেলা।
জীবনের কাজ আছে,— প্রেম নহে ফাঁকি, প্রাণ নহে খেলা।

সৌন্দর্য বা সুন্দরকে দেহের মধ্যে ধরিবার প্রয়াস ব্যর্থ—'নিষ্ফল প্রয়াস' মাত্র, 'রূপ নাহি ধরা দেয় বৃথা সে প্রয়াস'। সৌন্দর্যকে 'হৃদয়ের ধন' রূপে পাইবার চেষ্টা সফল হয় না,—

নাই, নাই,— কিছু নাই, শুধু অন্বেষণ।
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া।
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে— শ্রান্ত করে হিয়া।
প্রভাতে মলিন মুখে ফিরে যাই গেহে,
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে?

কবিচিত্ত সংযত হইয়া আসিতেছে— দেহের মধ্যে রূপকে অনুসন্ধান করিবার জন্য ব্যাকুলতা ম্লান হইয়া আসিতেছে; এখন কবি 'নিভৃত-আশ্রম' রচিবার স্বপ্ন দেখিতেছেন। তাহা

অনুপম জ্যোতির্ময়ী মাধুরী-মুরতি স্থাপন করিব যত্নে হৃদয়-আসনে।
লোকালয় মাঝে থাকি রব তপোবনে, একেলা থেকেও তবু রব সাথী সনে।

'নিষ্ফল প্রয়াস', 'হৃদয়ের ধন', 'নিভৃত আশ্রম'— এই তিনটি কবিতা চতুর্দশপদী, একই দিনে রচিত। এই কবিতাগুলির সহিত 'কড়ি ও কোমলে'র চতুর্দশপদী কবিতার তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, এক বৎসরের মধ্যে কবির কাব্যের রূপে কতখানি নূতনত্ব এবং সুরেও কতখানি অভিনবত্ব আসিয়াছে।

মানসীর দ্বিতীয় স্তরের শেষ দুইটি কবিতা— 'নারীর উক্তি' ও 'পুরুষের উক্তি', পরস্পরের পরিপূরক। প্রথম

কবিতাটি পড়িলে ইহাই আশ্চর্য লাগে যে নারী-হৃদয়ের এ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পুরুষের লেখনীতে কেমন করিয়া আসিল। নারী স্বভাবত একনিষ্ঠ; সে চায় একনিষ্ঠ প্রেম। তাই সে বলিতেছে—

অপবিত্র ও কর-পরশ সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে।
মনে কি করেছ বঁধু, ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলেও চলে শুধু হাসি দিলে।

পুরুষ নারীকে তাহার পুরানো প্রেমের কাহিনী শুনায়, কী নেশায় রঙিন হইয়া সে প্রেমকে দেখিয়াছিল, সেই কথা স্মরণ করে। কিন্তু নারীর চক্ষে কেন অশ্রু তাহা সে বুঝিতে পারে না। এই অহেতুকী অশ্রু পুরুষকে উদ্‌ভ্রান্ত করে, সে তাহার রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে অসমর্থ। সে বলে—

কাছে যাই তেমনি হাসিয়া নবীন যৌবনময় প্রাণে,
কেন হেরি অশ্রুজল হৃদয়ের হলাহল,
রূপ কেন রাহুগ্রস্ত মানে অভিমানে।

কাব্যজীবনের 'পরে এইখানে একটি ছেদ পড়িল। ইহার পর প্রায় চারিমাস আর কোনো কবিতা নাই।

মনের সম্পূর্ণ নূতন অবস্থায় পাই কবিকে মাসখানেক পরে,— লিরিক্যাল মনোভাবের ভারকেন্দ্র পরিবর্তিত হইয়াছে। মানসী বা মানবী প্রেমকে দেখি সাময়িকভাবে ঈশ্বর-প্রেমে রূপান্তরিত। মাঘোৎসবের জন্য এবার ১৮টি নূতন গান রচনা করেন, তাহার মধ্যে কয়েকটি খুবই পরিচিত— 'তোমারি ইচ্ছা হৌক পূর্ণ', 'নাথহে প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও' ইত্যাদি।[১] এই সব ব্রহ্মসংগীত পাঠ করিলে মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে এই সংগীতের মধ্যে সত্যই কি কোনো আধ্যাত্মিক আকুলতা প্রকাশ পাইতেছে, না সাময়িক প্রয়োজনের প্রেরণায় রচিত। অথবা অন্তরের মধ্যে যে বিষাদপূর্ণ বেদনার সংগ্রাম চলিতেছে— এই সব সংগীত তাহারই sublimated রূপ?

মানসীর তৃতীয় স্তর। গাজিপুরে

কাব্যময় জীবনকে সম্পূর্ণভাবে সম্ভোগ করিবার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের বাহিরের কোনো বাধা ছিল না। মহর্ষি পুত্রদের মতামত, চলাফেরা সম্বন্ধে বিশেষ বাধা দান করিতেন না। জীবনের কোনো বৃহৎ দায়িত্ব বা কর্তব্যভার গ্রহণ না করিয়া রবীন্দ্রনাথ বেশ সুখেই দিনাতিপাত করিতেছেন। এইবার ইচ্ছা হইল 'পশ্চিমের কোন রমণীয় স্থানে তিনি একটি নিভৃত কবিকুঞ্জ রচনা করিয়া জীবনটিকে সৌন্দর্যের স্রোতে ভরা কবিত্বের হাওয়ার মধ্যে ভাসাইয়া দেন।'[২]

এই উদ্দেশ্যে ১২৯৪ সালের শেষ দিকে তিনি সপরিবারে গাজিপুরে গিয়া বাস করিতে মনস্থ করিলেন। এত জায়গা থাকিতে গাজিপুর কেন তাঁহার পছন্দ হইল, সে-সম্বন্ধে কবি স্বয়ংই কৈফিয়ত দিয়াছেন। "বাল্যকাল থেকে পশ্চিম-ভারত আমার কাছে রোম্যান্টিক কল্পনার বিষয় ছিল।…অনেক দিন ইচ্ছা করেছি এই পশ্চিম ভারতের কোনো এক জায়গায় আশ্রয় নিয়ে ভারতবর্ষের বিরাট বিক্ষুব্ধ অতীত যুগের স্পর্শলাভ করব মনের মধ্যে।…শুনেছিলুম গাজিপুরে আছে গোলাপের খেত।· তারি মোহ আমাকে প্রবলভাবে টেনেছিল।"

রবীন্দ্রনাথের সপরিবার বলিতে এখনো বুঝায় পত্নী মৃণালিনী দেবী ও শিশুকন্যা বেলা। এই 'সংসার' লইয়া

১ দ্র ত-বো-প ১৮০৯ শক (১২৯৪) ফাল্গুন। ২ অজিত কুমার চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ পৃ ৩০।

কবি চলিলেন বিহারের রোম্যান্টিক শহরে কবি-জীবন যাপন অভিলাষে। ইস্ট-ইন্ডিয়ান রেলপথের দিলদারনগরে বেলা প্রায় দেড়টার সময় নামিতে হয়; খর রোদে ভাজা ভাজা হইয়া তপ্ত বালি পার হইয়া অল্পবয়স্কা স্ত্রী ও শিশুকে লইয়া তাড়িঘাটের ট্রেনে উঠিলেন। তাড়িঘাটে গঙ্গা পার হইতে হইল স্টীমার যোগে। গাজিপুর ঘাট শহরের ধারে। ঘোড়ার গাড়ি বিহারের প্রাচীন শহরের গলিঘুঁজি ছাড়াইয়া সাহেবপাড়ায় একটি ভাড়াকরা বাংলা-বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিল। রোম্যান্টিক পশ্চিম ভারতের শহরে আসিলেন এইভাবে।

যে-স্বপ্ন লইয়া পশ্চিম ভারতের প্রাচীন শহরে বাস করিতে গিয়াছিলেন, সে-স্বপ্ন ভাঙিতে বেশিক্ষণ লাগে নাই। "সেখানে গিয়ে দেখলুম ব্যবসাদারের গোলাপের খেত, এখানে বুলবুলের নিমন্ত্রণ নেই, কবিরও নেই; হারিয়ে গেল সেই ছবি।...তবু গাজিপুরে রয়ে গেলুম তার একটা কারণ এখানে ছিলেন দূর সম্পর্কের আত্মীয় গগনচন্দ্র রায়, আফিম-বিভাগের একজন বড়ো কর্মচারী। এখানে আমার সমস্ত ব্যবস্থা সহজ হল তাঁরি সাহায্যে।

"একখানা বড়ো বাংলা পাওয়া গেল, গঙ্গার ধারেও বটে, ঠিক গঙ্গার ধারেও নয়। প্রায় মাইলখানেক চর পড়ে গেছে, সেখানে যবের ছোলার শর্ষের খেত; দূর থেকে দেখা যায় গঙ্গার জলধারা, গুণটানা নৌকো চলেছে মন্থর গতিতে। বাড়ির সংলগ্ন অনেকখানি জমি, অনাদৃত, বাংলাদেশের মাটি হলে জঙ্গল হয়ে উঠত। ইঁদারা থেকে পুর চলছে নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কলকল শব্দে। গোলক-চাঁপার ঘনপল্লব থেকে কোকিলের ডাক আসত রৌদ্রতপ্ত প্রহরের ক্লান্ত হাওয়ায়। পশ্চিম কোণে প্রাচীন একটা মহানিম গাছ, তার বিস্তীর্ণ ছায়াতলে বসবার জায়গা। সাদা ধুলোর রাস্তা চলেছে বাড়ির গা ঘেঁষে, দূরে দেখা যায় খোলার চালওয়ালা পল্লী।"[১] মানসীর কতকগুলি কবিতার মধ্যে এই স্থানিক শোভার বর্ণনা বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে।

সপরিবারে এই গাজিপুরে বাসটা রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি বিশেষ পর্ব ও ঘটনা বলিয়া আমরা মনে করি। এতকাল স্ত্রী ও কন্যা লইয়া বৃহৎ ঠাকুরপরিবারের ক্ষুদ্র অংশরূপে বাস করিয়াছেন জোড়াসাঁকোর বিশাল পুরীতে; অথবা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর শাসনাধীন সুব্যবস্থিত গৃহশৃঙ্খলার মধ্যে আদরে যত্নে লালিত হইয়াছেন। কিন্তু স্বামীকে আপনার সংসারে, নিজের মত করিয়া, কেবলমাত্র নিজের করিয়া পাইবার যে-আকাঙ্ক্ষা নারীর পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক, তাহা পত্নী মৃণালিনী দেবীর সংসার-জীবনে এই প্রথম ঘটিল; রবীন্দ্রনাথও যৌবনের পরিপূর্ণতার মধ্যে স্ত্রীকে পাইলেন সঙ্গিনীরূপে, প্রেয়সীরূপে; 'আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে গড়ে তুলি মানস-প্রতিমা।'

গাজিপুরের অক্ষুণ্ণ অবসরের মধ্যে কবির মন নিমগ্ন হইল। তিনি লিখিয়াছেন, "আমার গানে আমি বলেছি, আমি সুদূরের পিয়াসী। পরিচিত সংসার থেকে এখানে আমি সেই দূরত্বের দ্বারা বেষ্টিত হলুম, অভ্যাসের স্থূল-হস্তাবলেপ দূর হবামাত্র মুক্তি এল মনোরাজ্যে। এই আবহাওয়ায় আমার কাব্যরচনার একটা নূতন পর্ব আপনি প্রকাশ পেল।...নূতন আবেষ্টনে এই কবিতাগুলি সহসা যেন নবদেহ ধারণ করল। পূর্ববর্তী কড়ি ও কোমল-এর সঙ্গে এর বিশেষ মিল পাওয়া যাবে না। আমার রচনার এই পর্বেই যুক্ত অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নূতন শক্তি দিতে পেরেছি। মানসীতে ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।"[১]

জীবনের এই নব অভিজ্ঞতায় সৃষ্টির বিচিত্র রহস্যকে সম্ভোগ করিবার সুযোগ ও অবসর মিলিল। নৈর্ব্যক্তিক রসের সাধনা, প্রেমের লীলা বাস্তব জগতে সম্পূর্ণ হয় না; দৈনন্দিন জীবনের প্রেম দৈনন্দিন সাংসারিক ঘাত-প্রতিঘাতে ম্লান হয়; নারীহৃদয়ে কত বিচিত্র সাধ, কত ইন্দ্রধনুর লীলাখেলা উঠে, অস্ত যায়। কবি অনুভব করেন দার্শনিকের ন্যায়, দেখেন শিল্পীর চোখে, প্রকাশ করেন কবির ভাষায়।

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী ২য় খণ্ড। মানসীর ভূমিকা।

গাজিপুরে বাসকালে ২৮টি কবিতা লেখেন (১১ই বৈশাখ হইতে ২৩শে আষাঢ় ১২৯৫ এর মধ্যে)। এইগুলিকেই আমরা মানসীর কেন্দ্রগত কবিতা বলিব, কারণ রবীন্দ্রনাথ যখনই মানসীর কথা বলিয়াছেন, তখনই গাজিপুর বাসকালে রচিত কবিতার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। এইগুলির মধ্যে কবির মানসলোকের যথার্থ সন্ধান পাওয়া যায়—ইহাতে কাল্পনিকতা কম, বৃহতের নিকট, অমোঘের কাছে আত্মসমর্পণের একটি ভাব সুস্পষ্ট। মাঘোৎসবের সময় যে রচিয়াছিলেন 'নাথ হে প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও'— সেই সুর ধ্বনিতে দেখা যায় কয়েকটি কবিতায়,— আত্মনিবেদন ও আত্মনির্ভরের ভাব সেখানে খুব স্পষ্ট; তাহার দ্বারা কাব্যের রসধারা ব্যাহত হইয়াছে কিনা তাহা গভীরভাবে বিচার্য। দুঃসাহসিক কল্পনা তীব্র আবেগের অভাবে অসহায়ভাবে প্রকাশ পায়, তাহা সাধারণ কবিতাকে দুর্বল করিয়া দেয়। 'জীবন মধ্যাহ্নে'র 'তাই আজ বার বার ধাই তব পানে, ওহে তুমি নিখিল-নির্ভর'-এ কথা বিশুদ্ধ কাব্যের বিষয় নহে। 'শূন্যগৃহে' 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' কবিতাতেও এই অসহায় আত্মনিবেদনের ভাব বেশ স্পষ্ট; বিশ বৎসরের যুবক প্রমথ চৌধুরী ঠিকই ধরিয়াছিলেন যে despair ও resignation কবিতাগুলির একটি বৈশিষ্ট্য।

মানসীর কবিতাগুলি এমন এলোমেলো ভাবে সাজানো কেন তাহা জানি না। গাজিপুরে রচিত কবিতা-গুলিকেও আমরা তিনটি স্তরে ভাগ করিতে পারি। প্রথমগুলি তথায় পৌঁছিয়া বৈশাখ মাসের মধ্যে রচিত; সেগুলি হইতেছে শূন্যগৃহে (১১ই বৈশাখ), নিষ্ঠুর সৃষ্টি (১৩ই), জীবন-মধ্যাহ্ন (১৪ই), প্রকৃতির প্রতি (১৫ই), শ্রান্তি (১৬ই), মরণস্বপ্ন (১৭ই), বিচ্ছেদ (১৯শে), মানসিক অভিসার (২১শে), কুহুধ্বনি (২২শে), পত্রের প্রত্যাশা (২৩শে বৈশাখ)। ইহার পর পনেরো দিন কোনো কবিতা নাই। ইহার পর যে কবিতাগুলি প্রায় জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি পুনরায় শুরু হইল, তাহাদের সুর ও রূপ বৈশাখী-গুচ্ছ হইতে বেশ তফাত। 'বধূ' এই কবিতাগুচ্ছের প্রথম। এ যেন কোনো বালিকা-বধূর জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতাকে নিখিল গ্রাম্য-বালিকার অন্তরের বেদনারূপে প্রকাশ। 'ব্যক্ত প্রেম', 'গুপ্ত প্রেম' ও 'অপেক্ষা' কবিতাত্রয়ে নারীপ্রেমের নূতন রূপ কবির লেখনীতে মূর্তি লইয়াছে। এ নারী কুলত্যাগিনী নহে— এ চিরন্তন নারী, যাহার কাছে প্রেমহীন ভালোবাসা 'আলোতে দেখায় কালো কলঙ্কের মতো।' পুরুষ তাহার বিদ্যা, বিত্ত, বীর্য লইয়া দৃপ্ত তেজে নারীর নিকট আসে, তাহার সুপ্ত যৌবনের যৌন আকাঙ্ক্ষাকে উতলা করে। কিন্তু পুরুষের অনুরাগ নানা পথচারী— তাই চিরন্তন নারী হয় অপমানিত, লজ্জিত, ক্ষুব্ধ। পুরুষের একনিষ্ঠ প্রেমের অস্ত হইলেই নারীর কলঙ্ক, তাহাতেই তাহার পরাভবের গ্লানি। 'গুপ্তপ্রেমে' কবি বলিতে চাহিয়াছেন যে প্রেমই নারীর ধর্ম; সে-নারী সুরূপাই হউক আর কুরূপাই হউক অন্তর তাহার প্রেমের জন্য লালায়িত; "আমি রূপসী নহি, তবু আমারো মনে প্রেমের রূপ সে তো সুমধুর;" "আমি আমার অপমান সহিতে পারি, প্রেমের সহে না তো অপমান।" এই হইতেছে যথার্থ প্রেমিকার সর্বোত্তম আদর্শ। চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্যে কবি কুরূপা চিত্রাঙ্গদার প্রেমনিবেদনের ব্যর্থতা দেখান। সেই পর্যন্ত 'গুপ্তপ্রেমে'র সহিত তাহার মিল আছে, কিন্তু নাট্যখানিতে কবি আরও আগাইয়া গিয়াছেন; সেখানে নারী এ কথা বলে নাই—

> তাই যদি সে কাছে আসে পালাই দূরে, আপন মন-আশা দলে যাই,
> পাছে সে মোরে দেখে থমকি বলে "এ কে!" দু-হাতে মুখ ঢেকে চলে যাই।
> পাছে নয়নে বচনে সে বুঝিতে পারে আমার জীবনের কাহিনী,
> পাছে সে মনে ভানে "এও কি প্রেম জানে! আমি তো এর পানে চাহি নি!"

চিত্রাঙ্গদার চরিত্রে এই পরাহত মনোভাব নাই। সেখানে নারী বিজয়িনী। 'অপেক্ষা' কবিতা এই কবিতাত্রয়ের পরিপূরক; সমাপ্তি হইল পরিপূর্ণ মিলনে। 'দোঁহার মাঝে ঘুচিয়া যাবে আলোর ব্যবধান।'

'আঁধারে যেন দুজনে আর দুজন নাহি থাকে।' ·· মৌন এক মিলনরাশি তিমিরে সব ফেলিল গ্রাসি,
হৃদয় দেহ আঁধারে যেন হয়েছে একাকার। প্রলয়তলে দোঁহার মাঝে দোঁহার অবসান।

বাস্তবতার এমন অপরূপ কাব্য-আবরণ রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সুদক্ষ আর্টিস্টের লেখনীরই উপযুক্ত।

এই গুচ্ছের প্রেমের শেষ কবিতা 'সুরদাসের প্রার্থনা', প্রথম কাব্যগ্রন্থাবলীতে ইহার (১৩০৩) নামকরণ করেন 'আঁখির অপরাধ'। ইহাকে 'গুরু গোবিন্দ', 'নিষ্ফল উপহার' প্রভৃতির সহিত কাহিনী-কবিতাগুচ্ছের অন্তর্গত করা যাইতে পারে; কিন্তু কাহিনী ইহার প্রধান বিষয়বস্তু নহে। সৌন্দর্যের প্রতি আঁখির যে স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাহারই সমর্থনে বা তাহারই জয়গান ছিল কবিতার অন্যতম উদ্দেশ্য। 'ফাল্গুনী'তে অন্ধ বাউল বলিতেছে— "আমি কেন ভয় করিনে বলি। একদিন আমার দৃষ্টি ছিল। যখন অন্ধ হলুম ভয় হ'ল দৃষ্টি বুঝি হারালুম। কিন্তু চোখওয়ালার দৃষ্টি অস্ত যেতেই অন্ধের দৃষ্টির উদয় হ'ল। সূর্য যখন গেল তখন দেখি অন্ধকারের বুকের মধ্যে আলো।" সুরদাসও বলিতেছে অন্ধ হইবার পর—

তোমাতে হেরিব আমার দেবতা, হেরিব আমার হরি,
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব অনন্ত বিভাবরী।

সমস্ত কবিতাটিতে নূতন সুর ও রূপ সংযোজিত হইল, যাহা ছিল sensuous লালসার সামগ্রী, তাহা হইয়া গেল দেহোত্তর আধ্যাত্মিক ধ্যানের ধন।

'প্রকৃতির প্রতিশোধে' সন্ন্যাসী জগতের রূপ রসকে দূরে নির্বাসিত করিয়াছিল, প্রকৃতির পীড়নের কথা সে জানিত না; আর সুরদাস সুন্দরকে রূপের মধ্যে দেখিয়াছে, এই তাহার আঁখির অপরাধ; তাই আজ তাহার প্রার্থনা—

যাক, তাই যাক! পারিনে ভাসিতে কেবলই মুরতি-স্রোতে,
লহ মোরে তুলি আলোক-মগন মুরতি-ভুবন হতে।
আঁখি গেলে মোর সীমা চলে যাবে একাকী অসীম ভরা,
আমারি আঁধারে মিলাবে গগন মিলাবে সকল ধরা।
আলোহীন সেই বিশাল হৃদয়ে আমার বিজন বাস,
প্রলয়-আসন জুড়িয়া বসিয়া রব আমি বারোমাস।

রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের পূজারী বটে, কিন্তু সৌন্দর্যোত্তরের সাধক।

'বধূ' প্রভৃতি চারিটি কবিতার মধ্যে কবি প্রেমের যে বেদনা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতেছে নারীর অন্তরের বেদনা— তাঁহার লেখনীতে ভাষা পাইয়াছে। ইহা একপ্রকার কাব্যীয় সুখসম্ভোগ, ইহাতে বীর্যবান যৌবনের পরিপূর্ণ আনন্দ নাই। তাই দেখি 'অপেক্ষা' রচিত হইবার চারিদিন ব্যবধানে লিখিত 'দুরন্ত আশা' প্রমুখ কবিতাত্রয়ের পরিপ্রেক্ষণা সম্পূর্ণ পৃথক। 'দুরন্ত আশা' (১৮ই) 'দেশের উন্নতি' (১৯শে) 'বঙ্গবীর' (২১শে) কবিতাত্রয় পৃথক অভিঘাতে সৃষ্ট, ইহারা লিরিক-ধর্মী নহে। এখান হইতে গাজিপুর-বাসকালে-রচিত কবিতার দ্বিতীয় স্তরের শুরু। এই নূতন অভিঘাতে সাময়িকভাবে নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যেন 'সর্পসম ফোঁসে'। তাই অত্যন্ত উচ্ছ্বাসভরে লিখিলেন, 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন'। 'দেশের উন্নতি' ও 'বঙ্গবীর' ব্যঙ্গে শ্লেষে কণ্টকিত হইলেও দেশের জন্য কবির যে সুগভীর প্রেম তাহা কবিতাগুলিতে প্রকাশ পাইয়াছে। এই ব্যঙ্গের

মধ্য দিয়া 'উন্টা করে' বলি আমি সহজ কথাটাই! ব্যর্থ তুমি কর পাছে ব্যর্থ করি তাই আপন ব্যথাটাই।' (ক্ষণিকা, ভীরুতা)।

রাজনীতির 'পোলিটিক্যাল অ্যাজিটেশন', নব্য হিন্দুদের 'আর্যামি' প্রভৃতির বিরুদ্ধে তীব্রভাবে লিখিলেন বটে, কিন্তু নিজের নিন্দা শুনিয়া যাহা লিখিলেন, তাহার মধ্যে 'রণং দেহি' ভাব তো নাই-ই, বরং অত্যন্ত দুর্বল পরাজিত মনের কাতরতায় তাহা পূর্ণ। 'নিন্দুকের প্রতি নিবেদন' বোধ হয় লেখেন 'কড়ি ও কোমলে'র প্রতি কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের আক্রমণের উত্তরে—

দুর্বল মোরা, কত ভুল করি, অপূর্ণ সব কাজ।
নেহারি আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতা আপনি যে পাই লাজ।
তা বলে যা পারি তাও করিব না? নিষ্ফল হব ভবে?
প্রেমফুল ফোটে, ছোটো হল বলে দিব না কি
... ... তাহা সবে?
যদি ভুল হয়, কদিনের ভুল! দুদিনে ভাঙিবে তবে।
তোমার এমন শাণিত বচন সেই কি অমর হবে?

'গুরু গোবিন্দ' ও 'নিষ্ফল উপহার' উপাখ্যানমূলক কবিতা হইলেও তত্ত্বই সেখানে আসল। উভয় কবিতা শিখগুরুর কাহিনী। গুরুর নির্জন সাধনার কাল উদ্‌যাপিত হয় নাই—

এখনো কেবল নীরব ভাবনা, কর্মবিহীন বিজন সাধনা,
দিবানিশি শুধু ব'সে ব'সে শোনা আপন মর্মবাণী।

তাই এখনো তাঁহার বিজনবাস চলিবে। গুরুগোবিন্দ ও নিষ্ফল উপহার একই দিনে লেখা (২৭ জৈষ্ঠ ১২৯৫)। প্রায় পাঁচ বৎসর পরে লিখিত 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধের উপসংহারে গুরুগোবিন্দের নির্জন সাধনার উল্লেখ করিয়াছিলেন।

সম্পূর্ণ বিভিন্ন পটভূমিতে পরদিনে রচিত 'পরিত্যক্ত' কবিতাটি। বাংলাদেশের মধ্যে সকল প্রকার প্রগতি ও সংস্কারের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে, এই কবিতাটি তাহারই ভর্ৎসনায় রচিত— কিন্তু এ ভর্ৎসনাও বেদনায় কাতর। আজ বঙ্কিমপ্রমুখ লেখকগণ, বাংলা ভাষার অরুণযুগে যাঁহারা ছিলেন পূর্বগগনের শুকতারা, তাঁহারা হইয়াছেন প্রতিক্রিয়াপন্থী, তাঁহাদেরি উদ্দেশ্যে কবি যাহা লিখিলেন, তাহা পূর্বে আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের স্বভাবমুক্ত প্রগতিপন্থী মন সমসাময়িকদের আগে আগে চলিত; তাই শিক্ষিত সমাজের এই চিত্তবিকৃতি, এই প্রতিক্রিয়া মূলক মনোবৃত্তি তাঁহাকে আঘাত দেয়; কিন্তু তাঁহার আদর্শ ধ্রুব তারকার ন্যায় চিত্ত মাঝে বিরাজিত, তাই তিনি নির্ভীক—

ভয় নাই যার কী করিবে তার এই প্রতিকূল স্রোতে।
তোমারি শিক্ষা করিবে রক্ষা তোমারি বাক্য হতে।

'ভৈরবী গান'টি 'পরিত্যক্ত' কবিতার পরিপূর্তি রূপেও দেখা যাইতে পারে; প্রাচীনেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন বা ত্যাগ করিতে উদ্যত; কারণ তাঁহাদের মতে রবীন্দ্রনাথের প্রগতিশীলতার সহিত প্রাচীন ভারতের যোগ সামান্যই। রবীন্দ্রনাথের মতে এই ভৈরবী গান গাওয়া বৃথা; মন উদাস করিবার চেষ্টা হয়, কিন্তু তৃপ্ত করিবার উপাদান উহাতে কম।

"ওগো কে তুমি বসিয়া উদাস মুরতি বিষাদশান্ত শোভাতে।
ওই ভৈরবী আর গেয়ো নাকো এই প্রভাতে—···
ওগো, থামো, যারে তুমি বিদায় দিয়েছ তারে আর ফিরে চেয়ো না।

আজি প্রথম প্রভাতে চলিবার পথ নয়ন বাষ্পে ছেয়ো না।···

তারা অলস বেদন করিবে যাপন অলস রাগিণী গাহিয়া,
রবে দূর আলো পানে আবিষ্ট প্রাণে চাহিয়া।
ওই মধুর রোদনে ভেসে যাবে তারা দিবস রজনী বাহিয়া।
সেই আপনার গানে আপনি গলিয়া আপনারে তারা ভুলাবে,
স্নেহে আপনার দেহে সকরুণ কর, বুলাবে।
সুখে কোমল শয়নে রাখিয়া জীবন ঘুমের দোলায় দুলাবে।
ওগো এর চেয়ে ভালো প্রখর দহন, নিঠুর আঘাত চরণে।
যাব আজীবন কাল পাষাণ কঠিন সরণে।
যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ, সুখ আছে সেই মরণে।

'পরিত্যক্ত' কবিতায় কবি যে অভিযোগ করিয়াছিলেন তাহাই এই কবিতাটিতে বলিলেন অন্যভাবে; দেশবাসী অতীতের মোহে, অথবা ভবিষ্যতের স্বপ্নে অর্ধজাগ্রত অবস্থায় থাকিতে চায়, বাস্তবের সহিত মুখোমুখী হইতে তাহাদের ভয়। বর্তমানের দৈনন্দিন সংগ্রাম দৃঢ় আদর্শবাদের অভাবে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইতেছে না। কবি এই পরাভবকে জাতির নৈতিক পরাজয় বলিয়া মনে করিতেন, তাই কবির যাহা করণীয় তাহাই তিনি করিতেন— ভাষার কাকলিতে আশাহীন জীবনে প্রাণের স্পন্দন আনিবার চেষ্টা।

গাজিপুর বাসকালে মানসীর দ্বিতীয় কবিতাগুচ্ছের শেষ কবিতা 'ধর্মপ্রচার' সম্পূর্ণ পৃথক অভিঘাতে রচিত; সাময়িক সংবাদপত্রে কবিতার ঘটনাটি বর্ণিত হয়। এই কবিতায় sublime and ludicrous সমভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। মুক্তি-ফৌজের গেরুয়াপরা সাহেব সন্ন্যাসীদের উপর নব্য হিন্দুয়ানীর স্বেচ্ছাব্রতীর দল হিন্দুধর্ম রক্ষার উৎসাহে যে'কাণ্ডটা করিয়াছিলেন, তাহা আদৌ সুন্দর নহে।

ওই শোনো, ভাই বিশু পথে শুনি 'জয় যিশু'! কিছু না বলিলে পড়িব তখন বিশ-পঁচিশ বাঙালি।
কেমনে এ নাম করিব সহ্য আমরা আর্যশিশু! তুমি আগে যেয়ো তেড়ে, আমি নেব টুপি কেড়ে।
আগে দিব ঢুয়োতালি, তারপর দেব গালি। গোলেমালে শেষে পাঁচজনে প'ড়ে মাটিতে ফেলিয়ো পেড়ে।

এই ludicrous চিত্রের পর যখন মুক্তি-ফৌজ বীরদের দ্বারা আহত হইয়া রুধিরাক্ত দেহে যীশুর জয়গান করিতেছে, তখন কবিতাটি কেবল sublime হয় নাই, নাটকীয় সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হইয়াছে।

এই কবিতা রচনার তেইশ দিন পরে লেখা 'নব-বঙ্গ-দম্পতীর প্রেমালাপ' কবিতাটির মধ্যে যে ব্যঙ্গ ও শ্লেষ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নব্য হিন্দুদের বাল্যবিবাহ সমর্থনের জবাব। আবার উহাকে কবির কাব্যজীবনের ব্যর্থতার রূপক হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

আমরা এতক্ষণ কবি রবীন্দ্রনাথের মানসলোকের বিচিত্র অনুভূতির সন্ধানে তাঁহার কাব্য বলাকার ছায়াহীন পথ বাহিয়া চলিয়াছিলাম। কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথকেও দেখা দরকার, যাহার ভিতর দিয়া কাব্য বলাকার অশ্রুতকাকলী অরূপের বাণী রূপে প্রকাশ পাইতেছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি রবীন্দ্রনাথের জীবনে গাজিপুর বাসপর্বটা একটি বিশেষ ঘটনা; তাহার কারণও বলিয়াছি। গাজিপুরে যে বরাবর ছিলেন তাহা নহে, বোধ হয় বার-দুই কলিকাতায় যান। একবার গিয়া সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবীকে আনেন; আষাঢ়ের শেষাশেষি (৭ই জুলাই ১৮৮৮) তাহাদের পুনরায় রাখিয়া আসেন ও শ্রাবণ মাসে ন দিদি স্বর্ণকুমারীকে লইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসেন। স্বর্ণকুমারীর 'গাজিপুর পত্র' ভারতীতে প্রকাশিত হয় (১২৯৬)। তাহাতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক কথা স্নেহের সহিত, কৌতুকের সঙ্গে লেখা। এখান হইতে ইঁহারা কয়েকদিনের জন্য কাশী বেড়াইতে যান, তাহার বর্ণনাও উক্ত প্রবন্ধে আছে। উক্ত প্রবন্ধে

রবীন্দ্রনাথ রচিত গাজিপুরের এক উদ্ভট ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে ; বলা বাহুল্য ইতিহাসটি রবীন্দ্রনাথের স্বকপোলকল্পিত, হাস্যরসসৃষ্টি তাহার উদ্দেশ্য।[১]

গাজিপুরে কবির বাসার নিকটে বাস করিতেন সিভিল সার্জেন ; তিনি ছিলেন মিলিটারী বিভাগের লোক। কবির সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয় এবং কবি কী লেখেন তাহা জানিতে তাঁহার কৌতূহল হয়। কবি আমাদের বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার কবিতা তর্জমা করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন। অধুনা আবিষ্কৃত 'নিষ্ফল কামনা'র অনুবাদ বোধ হয় এই সময়েই প্রথম করেন। সম্ভবত ইহাই কবির ইংরেজি অনুবাদের প্রথম প্রয়াস।[২]

সখীসমিতিতে মায়ার খেলা

গাজিপুর হইতে বোধ হয় বর্ষার শেষদিকে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে কলিকাতায় ফিরিলেন। কখনো থাকেন জোড়াসাঁকোর বাটিতে, কখনো জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সহিত উড স্ট্রীট বা বির্জিতলার বাসায়। সত্যেন্দ্রনাথের বাড়িতে জমে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, সাহিত্যিকদের মজলিস। 'পারিবারিক স্মৃতি' খাতায় সাহিত্যিকরা লেখেন নানা বিষয় সম্বন্ধে নিজ নিজ মত ও মন্তব্য ; একই বিষয়ে বহু জনের বহু মত হইতে পারে,— পক্ষে ও বিপক্ষে ; বিপরীত মত পোষণেও আপত্তি নাই ; অদ্ভুত ঘটনাও লিপিবদ্ধ হয়। রবীন্দ্রনাথ এই লেখকদের মধ্যে প্রধান— তাঁহার হাতে কোনো সাময়িক পত্রিকা নাই ; নানা কথা নানাভাবে মনে জাগে, এই খাতায় লিখিয়া যান আপন মনে ; কেহ বা তার মধ্যে খুঁত ধরে, টিপ্পনী করে— তাহাতে বাদ-প্রতিবাদ হয়, লেখার ঔজ্জ্বল্য বাড়ে। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আছেন জ্যেষ্ঠদের মধ্যে ; তা ছাড়া আসেন আশুতোষ চৌধুরী, তাঁহার ভ্রাতা যোগেশচন্দ্র, কবি অক্ষয় চৌধুরী, সিভিলিয়ান লোকেন পালিত ; ছোটোদের মধ্যে আছেন সুরেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ। এই পাণ্ডুলিপিখানি ভালো করিয়া পড়িলে বেশ বুঝা যায় যে উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ 'পঞ্চভূত' নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা মুখ্যত এই পাণ্ডুলিপির উপাদান হইতে সংগৃহীত। ১২৯৫ কার্তিক ২২ তারিখ হইতে পৌষের ৫ তারিখ পর্যন্ত প্রায়দিনই রবীন্দ্রনাথের লেখা[৩] চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সন্তান বা জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১২৯৫ সনের ১৩ অগ্রহায়ণ [১৮৮৮ নভেম্বর ২৭]।

১ ভারতী ও বালক ১২৯৬ শ্রাবণ পৃ ১৯৮-৯৯।

২ আমরা এই ইংরেজি কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম (দ্র Poems, Visvabharati 1942 ; p 4-5 ; p 196-97.)

All fruitless is the cry,
All vain this burning fire of desire.
The Sun goes down to his rest.
There is gloom in the forest
and glamour in the sky.
With downcast look and lingering steps

The evening star comes in the
wake of departing day
And the breath of the twilight
is deep with the fulness of a
farewell feeling.

৩ আমরা এই লেখাগুলির নাম ও তারিখ এইখানে দিতেছি,—

নং ৯। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালী চরিত্র [২২ কার্তিক ১২৯৫] দ্র ভারতী ১৩১২ বৈশাখ পৃ ৯০-৯৩।

" ২৩। হিন্দুদিগের জাতীয় চরিত্র ও স্বাধীনতা [দীর্ঘ প্রবন্ধ] [৩ অগ্রহায়ণ ১২৯৫]

" ২৬। স্ত্রী ও পুরুষের প্রেমে বিশেষত্ব [৫ অগ্র]

এইসব রচনা শখের লেখা, পত্রিকার তাগিদে লিখিত হয় নাই। তবে সখীসমিতির তরফ হইতে প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শনাধ্যাপক ডক্টর প্রসন্নকুমার রায়ের পত্নী শ্রীমতী সরলা রায়ের (Mrs. P. K. Roy) অনুরোধে যে একটি গীতনাটিকা লিখিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা পূরণ করিতে হইতেছে। পাঠকের স্মরণ আছে, গত বৎসর পূজার সময়ে দার্জিলিং বাসকালে 'মায়ার খেলা'র[১] গান রচনা শুরু করিয়াছিলেন, এবার সেটিকে শেষ করিলেন। অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে ছাপা শেষ করিতে হইল, কারণ পৌষের মাঝামাঝি মহিলা শিল্পমেলায় উহার অভিনয় হয়। এই গীতনাটিকার অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন সখীসমিতি, কিন্তু গান শেখানো প্রভৃতি কাজে রবীন্দ্রনাথকেই প্রধান অংশ গ্রহণ করিতে হয়, যদিও প্রতিভা দেবী যথেষ্ট সাহায্য করেন।

'জীবনস্মৃতি'তে বাল্মীকিপ্রতিভা গীতনাট্যের সহিত তুলনা করিয়া এই নাটিকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন যে 'মায়ার খেলা' গীতনাট্য হইলেও ভিন্ন জগতের জিনিস। "তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, 'মায়ার খেলা' তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের 'পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুত, 'মায়ার খেলা' যখন লিখিয়াছিলাম, তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়া ছিল।"

এই নাটিকার সমস্তই কেবল গান, পাঠোপযোগী কবিতা অতি অল্প। ইহার তিনটি গান কবির অন্য কাব্যে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিলেন, 'ইহার আখ্যান ভাগ কোনো সমাজবিশেষে দেশবিশেষে বদ্ধ নহে। সঙ্গীতের কল্পরাজ্যে সমাজ-নিয়মের প্রাচীর তুলিবার আবশ্যক বিবেচনা করে না।" লেখকের ভরসা, ইহাতে সাধারণ মানবপ্রকৃতিবিরুদ্ধ কিছু নাই। গল্পাংশের মধ্যেও নূতনত্ব কিছু নাই, পূর্বরচিত গদ্য-নাটক 'নলিনী'র ছায়াবলম্বনে ইহা রচিত।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি শ্রীমতী সরলা রায়ের অনুরোধক্রমে নাটিকাটি রচনা শুরু করেন; তাঁহাকেই গ্রন্থখানি উপহার দেন, উহার উপস্বত্বও সখীসমিতিকে দান করা হয়। কেবল মেয়েরাই শিল্পমেলায় অভিনয় করিবে বলিয়া বোধ হয় ইহার অধিকাংশ ভূমিকা মেয়েদেরই। আর যে-কয়েকটি পুরুষচরিত্র আছে, তাহারা এমনি নিরীহ যে মেয়েরা সে-অংশ গ্রহণ করিলেও বেমানান হয় না।

„ ২৮। আমাদের সভ্যতায় বাহ্যিক ও মানসিকের অসামঞ্জস্য। [৬ অগ্র]
„ ২৯। কবিতার উপাদান রহস্য (Mystery) (৬ অগ্র)
„ ৩০। সৌন্দর্য ও বল (৭ অগ্র)
„ ৩১। আবশ্যকের মধ্যে অধীনতার ভাব (৭ অগ্র)
„ ৩৫। ধর্ম ও ধর্মনীতির অভিব্যক্তি (৮ অগ্র)
„ ৩৯। সমাজে স্ত্রীপুরুষের প্রেমের প্রভাব (১০ অগ্র)
„ ৪১। আমাদের প্রাচীন কাব্যে ও সমাজে স্ত্রীপুরুষ প্রেমের অভাব। (১২ অগ্র)
„ ৪২। Chivalry (১২ অগ্র)
„ ৫২। [সঙ্গীত সম্বন্ধে কিয়দংশ ছিন্ন] জোড়াসাঁকো ৩০ অগ্র
„ ৫৫। সৌন্দর্য (৫ পৌষ)

১ মায়ার খেলার প্রথম সংস্করণে কবি স্বয়ং গীতনাট্যখানির গল্পাংশ সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছিলেন। পরবর্তী সংস্করণে সেটি পরিত্যক্ত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে (১ম খণ্ড) গল্পাংশ পুনর্যোজিত হইয়াছে। 'মায়ার খেলা'র স্বরলিপি শ্রীইন্দিরা দেবী কৃত। ১৩০২ আষাঢ়।

সখীসমিতির[১] উদ্‌যোগে 'মহিলা শিল্পমেলা' খোলা হয়; ১৫ই পৌষ (১২৯৫) কলিকাতা বেথুন স্কুল বাটিতে তদানীন্তন ছোটলাট বেলীর (Bailley) পত্নী লেডি বেলী মেলার দ্বার উন্মোচন করিবার পর তৎকালীন বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউনের পত্নী তথায় আগমন করেন। "মেলার পর বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত মায়ার খেলা নামে একখানি গীতিনাট্য বালিকাগণ কর্তৃক অভিনীত হইয়াছিল, দর্শক মহিলাগণ অনেকেই অভিনয় দর্শনে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।"[২]

বাংলাদেশের নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে মায়ার খেলার অভিনয় বিশেষ ঘটনারূপেই স্মরণীয়। সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যারা বোধ হয় এই সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধভাবে অভিনয়ে নামেন, অবশ্য তখন দর্শকেরা সবই ছিলেন মহিলা। সমসাময়িকের চোখে এই ঘটনাটি বিপ্লবেরই সমতুল্য। বহুবৎসর পরে শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী এই দিনের কথা স্মরণ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "বেথুনে (কলেজে) প্রথম উদ্‌ঘাটিত শিল্পমেলায় যেদিন মহিলাগণ কর্তৃক 'মায়ার খেলা' অভিনয় হয়, এবং মেয়েরা পুরুষদের মত সম্মুখে গ্যালারিতে বসিয়া সে-অভিনয় দর্শন করে, সে কি এক নূতন আমোদ সকলে অনুভব করিয়াছিলেন।"[৩]

'মায়ার খেলায়' কবি এই কথাটিই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন যে, আত্মসুখ ও প্রেম প্রতিশব্দবাচক নহে। দুরাশায় মানুষ যথার্থ প্রেমের স্বরূপ বুঝিতে পারে না, 'এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না।' কিন্তু শান্তা অপেক্ষা করিয়া আছে— প্রেমের প্রতীক্ষায় সেই জয়ী হইল। মায়াকুমারীগণ কুহকশক্তি-প্রভাবে মানবহৃদয়ে নানাবিধ মায়া সৃজন করে। হাসিকান্না মিলন বিরহ বাসনা লজ্জা প্রেমের মোহ এ সমস্ত মায়াকুমারীদের ঘটনা। একদিন নববসন্তের রাত্রে তাহারা স্থির করিল প্রমোদপুরের যুবক যুবতীদের নবীন হৃদয় নবীন প্রেম রচনা করিয়া তাহারা মায়ার খেলা খেলিবে।

গ্রন্থের নায়ক অমর শান্তাকে ভালোবাসে; শান্তার প্রেমে উচ্ছ্বাস নাই, সে প্রেম শান্ত সমাহিত। সে অন্তর দিয়া অমরকে ভালোবাসে। কিন্তু তাহার প্রেমে মত্ততা আনে না, সে বর্ষা, সে বসন্ত নহে। "নবযৌবন বিকাশে অমর সহসা হৃদয়ের মধ্যে এক অপূর্ব আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিতেছে। সে উদাসভাবে জগতে আপন মানসীমূর্তির অনুরূপ প্রতিমা খুঁজিতে বাহির হইতেছে। ... চিরদিন নিতান্ত নিকটে থাকাতে শান্তার প্রতি অমরের প্রেম জন্মিতে অবসর পায় নাই। অমর শান্তার হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া চলিয়া গেল।"

সুখভরা এ ধরায় মন বাহিরিতে চায় কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে।

অমর চলিয়া গেল; মায়াকুমারীগণ বড়ো সত্যকথা পরিহাসচ্ছলে গাহিল—

কাছে আছে দেখিতে না পাও। তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও।

শান্তার প্রেম এত গভীর যে সে তাহার প্রেমাস্পদকে আগুলিয়া রাখিল না; সে বলিতেছে—

তুমি সুখ যদি নাহি পাও যাও, সুখের সন্ধানে যাও।

১ ১২৯৩ এ স্বর্ণকুমারী দেবী 'সখীসমিতি' নামে একটি মহিলাসভা স্থাপন করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের একত্র সম্মিলনে পরস্পর সদ্ভাব বর্ধন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান। ইহা ছাড়া অক্ষম পিতার কন্যাদের শিক্ষা, অসহায় বিধবাদিগকে অর্থ সাহায্য ও আশ্রয় দান প্রভৃতি কার্যও ইহাদের কর্মপদ্ধতির অন্তর্গত ছিল। 'মহিলা শিল্পমেলা' এই সখিসমিতির অন্তর্গত অনুষ্ঠান। এই মেলা হইতে যে অর্থ লাভ হইত, তাহা 'সখীসমিতি'র ভাণ্ডারে যাইত। ভারতী ১২৯৮ পৌষ সংখ্যায় এই সমিতির উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়। সখীসমিতি ও শিল্পমেলার স্ত্রীসভার সখিগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পত্নী শ্রীমৃণালিনী দেবীর নাম Mrs. R. N. Tagore দেখিতে পাই। স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন সম্পাদিকা।

২ ভারতী ১২৯৫ পৌষ পৃ ৫৩২-৩৩। দ্র মহিলা শিল্পমেলা ঐ জ্যৈষ্ঠ পৃ ৪৯-৫১।

৩ ভারতী ১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ পৃ ২৪৪।

আরএকটি নারীচরিত্র হইতেছে প্রমদা— শান্তার বিপরীত, উভয়ের স্বভাব নামের অনুরূপ। "প্রমদার কুমারীহৃদয়ে প্রেমের উন্মেষ হয় নাই। সে কেবল মনের আনন্দে হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়। সখীরা ভালোবাসার কথা বলিলে সে অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দেয়।" সে বলে, 'মিছে কথা ভালোবাসা'; তাহার ধারণা প্রেম জীবনের সুখ নষ্ট করে। য়ুরোমেরিকার একশ্রেণীর কুমারীর জীবনাদর্শ। অশোক ও কুমার তাহার নিকট আপন প্রেম ব্যক্ত করে, কিন্তু সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করে না। মায়াকুমারীগণ হাসিয়া বলিল, তোমার এ গর্ব চিরদিন থাকিবে না।

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, গরব সব হায় কখন টুটে যায়,
কে কোথা ধরা পড়ে, কে জানে। সলিল বহে যায় নয়নে।

"অমর পৃথিবী খুঁজিয়া কাহারো সন্ধান পাইল না। অবশেষে প্রমদার ক্রীড়াকাননে আসিয়া দেখিল প্রমদার প্রেমলাভে অকৃতার্থ হইয়া অশোক আপন মর্মব্যথা পোষণ করিতেছে।" অমর বলিল,

ভালোবেসে যদি সুখ নাই তবে কেন, তবে কেন মিছে ভালোবাসা।

"কেন যে লোকে সাধ করিয়া ভালোবাসে অমর বুঝিতেই পারিল না। এমন সময় সখীদের লইয়া প্রমদা কাননে প্রবেশ করিল। প্রমদাকে দেখিয়া অমরের মনে সহসা এক নূতন আনন্দ নূতন প্রাণের সঞ্চার হইল।" প্রমদা দেখিল আর সকলেই তৃষিত ভ্রমরের ন্যায় তাহার চারিদিকে ফিরিতেছে কেবল অমর দূরে দাঁড়াইয়া আছে। সে আকৃষ্ট হৃদয়ে সখীদিগকে বলিল,

যা, তোরা যা সখি, যা শুধাগে, ওই আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে।

সখীদের প্রশ্নের উত্তরে অমরের অপরিস্ফুট হৃদয়ের ভাব স্পষ্ট ব্যক্ত হইল না। সখীরা কিছু বুঝিল না। কেবল মায়াকুমারীগণ বুঝিল এবং গাহিল—

প্রেমপাশে ধরা পড়েছে দুজনে, দেখ দেখ সখি চাহিয়া; দুটি ফুল খসে ভেসে গেল ওই, প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া।

"অমরের মনে ক্রমে প্রমদার প্রতি প্রেম প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রমদার হৃদয়ের ব্যাকুলতা বাড়িয়া উঠিল, বাহিরের চঞ্চলতা দূর হইয়া গেল। সখীরা প্রমদার অবস্থা বুঝিতে পারিল। ... অমরের প্রতি সখিদের বিশ্বাস নাই। সখিদের নিকট হইতে সখীর হৃদয় হরণ করিয়া লইতেছে জানিয়া অমরের প্রতি হয়ত অলক্ষ্যে তাহাদের ঈষৎ মৃদু বিদ্বেষের ভাবও জন্মিয়াছে। আর যখন প্রমদার নিকট আপনার প্রেম ব্যক্ত করিল প্রমদা কিছু বলিতে না বলিতে সখীরা বলিল—

তুমি কে গো, সখীরে কেন জানাও বাসনা? কে জানিতে চায় তুমি ভালোবাস কি ভালোবাস না!

"সরল হৃদয় অমর প্রকৃত অবস্থা কিছু না বুঝিয়া হতাশ্বাস হইয়া ফিরিয়া গেল— ব্যাকুল-হৃদয় প্রমদা লজ্জায় বাধা দিবার অবসর পাইল না। মায়াকুমারীগণ গাহিল—

নিমেষের তরে সরমে বাধিল, মরমের কথা হল না।
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে রহিল মরম বেদনা।

"অমরের অসুখী অশান্ত আশ্রয়হীন হৃদয় সহজেই শান্তার প্রতি ফিরিল। এই দীর্ঘ বিরহে এবং অন্য সকলের প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অমর শান্তার প্রতি নিজের এবং নিজের প্রতি শান্তার অচ্ছেদ্য গূঢ় বন্ধন অনুভব করিবার অবসর পাইল।" শান্তা তাহারই জন্য অপেক্ষা করিয়া ছিল; সে উদ্বেগহীন ভাষায় বলিল,

দেখো, যেন ভুল করে ভালোবেসো না; আমি ভালোবাসি ব'লে কাছে এসো না।

"এদিকে প্রমদার সখীরা দেখিল অমর আর ফিরে না; তাহারা প্রত্যাশা করিয়াছিল বাধা পাইয়া অমরের প্রেমানল দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে; তাহাতে নিরাশ হইয়া তাহারা নানা কথার ছলে অমরকে আহ্বান করিতে

লাগিল— অমর ফিরিল না। সখিদের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিল না। ভগ্নহৃদয়া প্রমদা অমরের প্রেমের আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিল। মায়াকুমারীগণ গাহিল—

বিদায় করেছ যারে নয়নজলে, এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে।

"শান্তা ও অমরের মিলনোৎসবে পুরনারীগণ কাননে সমবেত হইয়া আনন্দগান গাহিতেছে। অমর যখন পুষ্প-মালা লইয়া শান্তার গলে আরোপণ করিতে যাইতেছে এমন সময় ম্লান ছায়ার ন্যায় প্রমদা কাননে প্রবেশ করিল। সহসা অনপেক্ষিতভাবে উৎসবের মধ্যে বিষাদ-প্রতিমা প্রমদার নিতান্ত করুণ দীনভাব অবলোকন করিয়া নিমেষের মতো আত্মবিস্মৃত অমরের হস্ত হইতে পুষ্পমালা খসিয়া পড়িয়া গেল। উভয়ের এই অবস্থা দেখিয়া শান্তা ও অমর সকলের মনে বিশ্বাস হইল যে, অমর ও প্রমদার হৃদয় গোপনে প্রেমের বন্ধনে বাঁধা আছে। তখন শান্তা ও সখিগণ অমর ও প্রমদার মিলন সংঘটনে প্রবৃত্ত হইল। প্রমদা কহিল,

আর কেন আর কেন! ফুরায়ে গিয়াছে বেলা, এখন এ মিছে খেলা,
দলিত কুসুম বহে বসন্ত সমীরণ। নিশান্তে মলিন দীপ কেন জ্বলে অকারণ।"

এই বলিয়া প্রমদা মালা তাহাদিগকেই পরাইয়া দিল। "অমর শান্তার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিল, 'আমি মায়ার চক্রে পড়িয়া আপনার সুখ নষ্ট করিয়াছি এখন আমার এই ভগ্নসুখ এই ম্লান মালা কাহাকে দিব, কে লইবে?' শান্তা ধীরে ধীরে বলিল—

যদি কেহ নাহি চায়, আমি লইব। আমার হৃদয় মন সব দিব বিসর্জন
তোমার সকল দুখ আমি সহিব। তোমার হৃদয়ভার আমি বহিব।

অমর ও শান্তার এইরূপে মিলন হইল। প্রমদা শূন্যহৃদয় লইয়া কাঁদিয়া চলিয়া গেল। মায়াকুমারীগণ কহিল—

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না। শুধু সুখ চলে যায়। এমনি মায়ার ছলনা।

ইহাই 'মায়ার খেলা'র আখ্যানবস্তু। প্রেমের এই দ্বন্দ্ব কবি এই গীতনাট্যে প্রকাশ করিলেন; স্পষ্টতর করিলেন 'রাজা ও রানী'তে; অখণ্ড প্রেমের রূপ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পাইল 'বিসর্জনে'। যথাসময়ে সে আলোচনা হইবে। মানসী প্রেম মানুষী প্রেম নহে। দুরাশায় মানুষ বাস্তব প্রেমকে অবজ্ঞা করিয়া বেদনা পাইয়াছে। 'মানসী'র একটি কবিতায় আছে,

নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে, চল ধীরে ঘরে ফিরে যাই।

অমরও তাহার বাসনা-বহ্নি নয়নের নীরে নিবাইয়া ঘরে ফিরিয়া শান্তাকেই গ্রহণ করিল।

বলিতে গেলে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নাট্যের প্রথম রচনা 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', দ্বিতীয় রচনা 'মায়ার খেলা'। এই গীতনাট্য লিখিত হইল 'মানসী' যুগে। 'কড়ি ও কোমলে'র যৌবনসৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ ও 'মানসী'র মানস সুন্দরীর জন্য অন্বেষণজনিত দুঃখবাদ— এই দুই-এর মাঝে যখন কবির মন দোল খাইতেছে— তখনই 'মায়ার খেলা' রচিত হয়; তাহার লিখিবার কারণ যাহাই হউক না কেন— লিখিবার সময় সে-যুগের মনের প্রধানতম সুরটি কবি না প্রকাশ করিয়া থাকিতে পারেন নাই। এই নাট্যে উচ্ছ্বাস প্রবল, কল্পনা ক্ষীণ।

মানসীর যুগ। 'রাজা ও রানী'।

১২৯৬ সালের বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে সোলাপুরে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে যান। সপরিবার বলিতে এখন বুঝায় স্ত্রী, আড়াইবৎসরের কন্যা বেলা ও চারিমাসের 'খোকা' রথীন্দ্রনাথ। সোলাপুরে মাসাধিক কাল ছিলেন, তারপর যান পুণার অন্তঃপাতী খিড়কিতে; তাঁহারা ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু অধ্যাপক গোবিন্দ বিট্‌ঠল কড়কারের একখানি বাড়িতে। ফিরিবার সময়ের কথায় ছিন্নপত্রের একস্থলে লিখিয়াছেন, "খিড়কি স্টেশনের কাছাকাছি আমাদের সেই আকের ক্ষেত, গাছের সার, টেনিস ক্ষেত, কাঁচের জানালামোড়া বাড়ি দেখতে পেলুম···।"

বোম্বাই প্রদেশে তাঁহার প্রবাসপর্বটা সাহিত্যসৃষ্টির দিক হইতে বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁহার প্রথম নাটক 'রাজা ও রানী' 'একমাসের অনধিককালে সোলাপুরে রচিত হইয়াছিল।'[১] 'মানসী' কবিতাগুচ্ছের একটিমাত্র কবিতা 'প্রকাশবেদনা' (৬ বৈশাখ, ১২৯৬) তথায় রচিত।[২] এই কবিতাটির মধ্যে যে অস্ফুট হৃদয়-বেদনার কথা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা যেন 'রাজা ও রানীর' অন্তর্গত লিরিক-ধর্মী রূপটিরই কথা, এ যেন বিক্রমদেবের অন্তরের অনন্ত প্রেমতৃষ্ণার ভাষা।

আমি চেয়ে থাকি শুধু মুখে ক্রন্দনহারা দুখে;
শিরায় শিরায় হাহাকার কেন ধ্বনিয়া উঠে না বুকে?
তীরের মতন পিপাসিত বেগে ক্রন্দনধ্বনি ছুটিয়া
হৃদয় হইতে হৃদয়ে পশিত মর্মে রহিত ফুটিয়া।
আজ মিছে এ কথার মালা মিছে এ অশ্রু ঢালা।
কিছু নেই পোড়া ধরণীমাঝারে বোঝাতে মর্মজ্বালা।

এই তীব্র আকাঙ্ক্ষারই একটি রূপ বিক্রমের মধ্যে ফুটিয়াছে। 'রাজা ও রানী' রচনা শেষ করিয়া খিড়কিতে যখন বাস করিতেছিলেন তখনো দেখি এই দুঃখবাদ কবিতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতেছে; যে অকারণ বেদনা রাজা বিক্রম-দেবকে, যে দুর্জয় অভিমান সুমিত্রাকে, যে ব্যর্থপ্রেম কুমার ও ইলাকে শান্তি দান করিতে পারে নাই, সেই মায়ামরীচিকা দুঃখের রূপ কবিতায় ভাষা পাইয়াছে—

বৃথা এ বিড়ম্বনা!
কিসের লাগিয়া এতই তিয়াষ,
কেন এত যন্ত্রণা!
ছায়ার মতন ভেসে চলে যায়
দরশন পরশন,
এই যদি পাই এই ভুলে যাই
তৃপ্তি না মানে মন।

এই ছায়া লাগি' কত নিশি জাগি'
কাঁদায়েছে কাঁদিয়াছে,
মহাসুখ মানি' প্রিয় তনুখানি
বাহুপাশে বাঁধিয়াছে।
এত সুখদুখ, তীব্র কামনা
জাগরণ হাহুতাশ
যে রূপ-জ্যোতিরে সদা ছিল ঘিরে
কোথা তা'র ইতিহাস?

'মায়া'র বিষাদ-সুর বিক্রমের উক্তিতে 'রাজা ও রানী'র মধ্যে ধ্বনিয়াছে,— 'হায় প্রিয়ে, আজ কেন মনে হয় সে সুখের দিন।' অপর দু'টি কবিতার মধ্যেও এই হতাশভাবের প্রতিধ্বনি বর্ষার দিনের বিরহী-চঞ্চল মনের ব্যথায় নিবিড়। মানসী কাব্যের শুরুতে যে বিষাদ সুর আরম্ভ হয়, তাহা এখানে সমে আসিয়া শুরু হয়।

১ ব্যারিস্টার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র ১৩০২, অগ্রহায়ণ ৯। সোলাপুর হইতে একখানি পত্রে প্রিয়নাথ সেনকে জানাইতেছেন যে তিনি একখানি নাটক লিখিয়াছেন, তাহার নামকরণ তখনো হয় নাই। দ্র আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৫২ শারদীয়া সংখ্যা। রবীন্দ্রনাথের চিঠি নং ৬।

২ মায়া (১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬) বর্ষার দিনে (৩ জ্যৈষ্ঠ), মেঘের খেলা (৭ জ্যৈষ্ঠ) খিড়কি-পুণা বাসকালে এই তিনটি কবিতা রচিত হয়। ফরমাইশি গান কবিতা চিরদিনই কবিদের লিখিতে হয়। বিহারীলাল গুপ্তের কন্যা স্নেহলতার বিবাহোৎসব (১৮৮৯ মে), তজ্জন্য একটি গান লিখিয়া পাঠাইলেন। গানটি— "সুখে থাকো আর সুখী করো সবে" (গী-বি ১ম সং পৃ ১৭৬)।

পুণাবাসকালে কবির জীবনে একটি নূতন অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। তিনি একদিন বিখ্যাত বিদুষী রমা-বাইয়ের[১] বক্তৃতা শুনিতে যান। একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "অনেকগুলি মহারাষ্ট্রী ললনার মধ্যে গৌরী নিরাভরণা শ্বেতাম্বরী ক্ষীণতনুযষ্টি উজ্জ্বলমূর্তি রমা-বাইয়ের প্রতি দৃষ্টি আপনি আকৃষ্ট হল।"

রমাবাই কে এবং কেনই বা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন সে বিষয়ে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, কারণ এই পত্রে তিনি এই মহিলার মতামত সম্বন্ধে দীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতা রমাবাইকে ভারতীয় নারীপ্রগতির একটি উল্কা বলিলে ভুল হইবে না। কোঙ্কনস্থ মঙ্গলুব জিলার ক্ষুদ্র এক গ্রামে ইঁহার জন্ম (১৮৫৮) হয়। বাল্যে মরাঠি ও সংস্কৃত ভাষাদ্বয় উত্তমরূপে শিক্ষা করেন; পিতৃমাতৃহীন হইয়া মাত্র সতেরো বৎসর বয়সে একমাত্র ভাইকে সঙ্গে লইয়া ভারতভ্রমণে বাহির হন। কলিকাতায় তাঁহার সংস্কৃত-বাগ্মিতা দেখিয়া পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 'সরস্বতী' উপাধি দেন। শ্রীহট্ট ভ্রমণকালে তথাকার এক তরুণ বাঙালি উকিলের সহিত প্রণয় ও পরিণয় হয়; কিন্তু ১৮৮২ সালে বিবাহের ষোলমাস পরে বিধবা হইয়া দেশে ফিরিয়া যান এবং 'আর্য মহিলা সমিতি' স্থাপন করেন। পর বৎসর ইংলন্ডে গিয়া খ্রীস্টধর্ম অবলম্বন করেন ও য়ুরোমেরিকার নানা স্থান ঘুরিয়া দেশে ফিরিয়া হিন্দু বিধবাদের জন্য 'সারদা সদন' স্থাপন করেন (১৮৮৯, মার্চ ১১)।

বলা বাহুল্য মহারাষ্ট্রদেশীয় ব্রাহ্মণশ্রেণী এই প্রগতিপরায়ণা তেজস্বিনী নারীর কর্মাবলী আদৌ পছন্দ করিতেন না। রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতাসভায় উপস্থিত ছিলেন সে-সভাও শেষ পর্যন্ত ভাঙিয়া যায়; রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "রমাবাইয়ের বক্তৃতাও খুব দীর্ঘ হতে পারত, কিন্তু এখানকার বর্গির উৎপাতে তা আর হয়ে উঠল না। রমাবাই বলতে আরম্ভ করতেই তারা ভারি গোল করতে লাগল। শেষকালে বক্তৃতা অসম্পূর্ণ রেখে রমাবাইকে বসে পড়তে হল।

"স্ত্রীলোকের পরাক্রম সম্বন্ধে রমণীকে বক্তৃতা করতে শুনে বীর পুরুষেরা আর থাকতে পারলেন না, তাঁরা পুরুষের পরাক্রম প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন; তর্জন গর্জনে অবলার ক্ষীণ কণ্ঠস্বরকে অভিভূত করে জয়গর্বে বাড়ি ফিরে গেলেন। আমি মনে মনে আশা করতে লাগলুম আমাদের বঙ্গভূমিতে যদিও সম্প্রতি অনেক বীরপুরুষের অভ্যুদয় হয়েছে কিন্তু ভদ্র রমণীর প্রতি রূঢ় ব্যবহার করে, এতটা প্রতাপ এখনও কারও জন্মায়নি।"

রবীন্দ্রনাথ সভার শ্রোতাদের সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়া যেমন লিখিলেন, তেমনি রমাবাইয়ের অসম্পূর্ণ বক্তৃতার অংশ বিশেষ লইয়া দীর্ঘ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন; তিনি বক্তা বা শ্রোতা কাহাকেও ছাড়িলেন না। রমাবাই বক্তৃতায় বলেন যে মেয়েরা সকল বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ, কেবল মদ্যপানে নয়। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ পত্র-প্রবন্ধ নরনারীর সমকক্ষতার বিচার। তাঁহার মতে পুরুষ বল ও বুদ্ধিতে নারী অপেক্ষা যেমন শ্রেষ্ঠ, নারী তেমনি সৌন্দর্যে ও হৃদয়াবেগে পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং কে কাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সে প্রশ্ন উঠে না। জাগতিক বিধানে Law of compensation আছে— যাহা একের নাই, তাহা অন্যের আছে। সেইজন্যই 'স্ত্রী পুরুষ দুই জাতি পরস্পর পরস্পরকে অবলম্বন করতে পারছে।' রবীন্দ্রনাথের মতে নারীদের মধ্যে বড়ো কবি ও সংগীতাচার্য এ পর্যন্ত জন্মায় নাই; বিশুদ্ধ আর্টেও তাহাদের শক্তি প্রকাশ পায় নাই। সৃষ্টিব্যাপারে তাহাদের শক্তি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাঁহার মতে মেয়েরা সংসারের বাহিরে কাজের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। তাহারা মাতৃজাতি; "যতদিন মানবজাতি থাকবে, ততদিন স্ত্রীলোকদের সন্তান গর্ভে ধারণ এবং সন্তান পালন করতেই হবে। এ-কাজটা এমন কাজ যে, এতে অনেক দিন ও অনেক ক্ষণ গৃহে রুদ্ধ থাকতে হয়, নিতান্ত বলসাধ্য কাজ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।" লেখকের মতে "এই রকম সন্তানকে উপলক্ষ্য করে ঘরের মধ্যে থেকে পরিবার সেবা মেয়েদের স্বাভাবিক হয়ে পড়ে; এ পুরুষদের অত্যাচার নয়

১ রমাবাই— দ্রঃ বামাবোধিনী পত্রিকা ১২৯৬। ভারতী ১২৯৬ শ্রাবণ পৃ ২৪৩-৪৬। রবীন্দ্রনাথ, রমাবাইয়ের বক্তৃতা-উপলক্ষে পত্র, ১২৯৬ জ্যৈষ্ঠ। পুণা। ভারতী ১২৯৬ আষাঢ়। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২শ খণ্ড। সমাজ পরিশিষ্ট পৃ ৪৫০-৫৫।

প্রকৃতির বিধান।" এইজন্যই পুরুষদের উপর তাহাদের নির্ভরশীল হইতে হয়। সেই নির্ভরশীলতাকে 'যদি অধীনতা হীনতা বলে আমরা ক্রমাগত অনুভব করি তাহলেই আমরা বাস্তবিক হীন হয়ে যাই এবং সংসারের সহস্র অসুখের সৃষ্টি হয়। তাকে যদি ধর্ম মনে করি তাহলে অধীনতার মধ্যেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করি।' রবীন্দ্রনাথের এ যুক্তির সদুত্তর এখনো পাওয়া যায় নাই।

বর্ষা পড়িলে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে পুণা হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন। ছিন্নপত্রে (জুন ১৮৮৯) পথের বর্ণনা আছে; সংসারী রবীন্দ্রনাথের জীবনচিত্র এই বর্ণনার মধ্যে লেখকের অজ্ঞাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কলিকাতায় আসিয়া কবি 'রাজা ও রানী' প্রকাশের ব্যবস্থা করিলেন। গ্রন্থখানি তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর দ্বিজেন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন (১২৯৬ শ্রাবণ ২৫)।

মানসী পর্বের দুঃখবাদ সকল কবিতার মধ্যেই যেমন নিহিত রহিয়াছে, এই যুগে রচিত নাটকের মধ্যেও সেই অন্তর্বেদনা,— সেই দ্বন্দ্বও অপ্রকট নহে। 'রাজা ও রানী'র আলোচনায় সেই তত্ত্বটি আরও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইবে।

রাজা ও রানী

জলন্ধরের রাজা বিক্রমদেব তাঁহার বয়স্য বন্ধু দেবদত্তের সহিত নারীর প্রেমরহস্য লইয়া আলোচনায় রত। রানী সুমিত্রা কাশ্মীর রাজদুহিতা। রাজা রূপসী যুবতী রানীর প্রেমসম্ভোগ মানসে উন্মত্তপ্রায়; রাজকার্য পর্যন্ত অবহেলিত। মন্ত্রীকে আসিতে দেখিয়া বলিতেছেন,— 'হেরো ওই আসিছেন মন্ত্রী, স্তূপাকার রাজ্যভার স্কন্ধে নিয়ে, পলায়ন করি।' মন্ত্রী আসিয়া দেবদত্তকে দুঃখ করিয়া বলিতেছেন—

রানীর কুটুম্ব যত বিদেশী কাশ্মীরী
দেশ জুড়ে বসিয়াছে। রাজার প্রতাপ
ভাগ করে লইয়াছে খণ্ড খণ্ড করি,
বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন মৃত সতীদেহ সম।
বিদেশীর অত্যাচারে জর্জর কাতর
কাঁদে প্রজা। অরাজক রাজসভামাঝে
মিলায় ক্রন্দন। বিদেশী অমাত্য যত
বসে বসে হাসে।

ইহাই আখ্যানবস্তুর জটিলতা সৃষ্টির কারণ। রাজকর্মচারী শোষকদের অত্যাচারে চারিদিকে প্রজাবিদ্রোহের লক্ষণ দেখা দিয়াছে, রাজা সে সবে কর্ণপাত করেন না। তিনি চান অন্তঃপুরের প্রমোদ-কাননে রানীর সহিত প্রেমলীলা। তিনি রানীকে বলেন— "থাক্ গৃহে গৃহকাজ। সংসারের কেহ নহ, অন্তরের তুমি; অন্তরে তোমার গৃহ— আর গৃহ নাই— বাহিরে কাঁদুক পড়ে বাহিরের কাজ।" কিন্তু নারী এই নিরবচ্ছিন্ন প্রেমলীলাকে যথার্থ প্রেমের দ্যোতক বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। "জীর্ণ রাজকার্যরাশি চূর্ণ হয়ে যায় তোমার চরণ তলে ধূলির মাঝারে।" বিক্রমের এই কথা শুনিয়া রানীর নারীত্ব অপমানিত হয়, সে বলে— 'শুনিয়া লজ্জায় মরি— একি ভালোবাসা? আমারে বেসো না ভালো রাজশ্রীর চেয়ে।' যথার্থ রানীর উক্তি, নারীর উক্তি। রাজা নিবিড়ভাবে সৌন্দর্যসাগরে আকণ্ঠ ডুবিয়া প্রেমসুধা পান করিতে চান— এমন সময়ে রাজমন্ত্রী দর্শনপ্রার্থী, রাজা বলিলেন 'ধিক রাজকার্য! রাজ্য রসাতলে যাক মন্ত্রী লয়ে সাথে।' কিন্তু সুমিত্রা কেবল রাজার প্রেয়সী নহেন, তিনি রাজমহিষী; এই তাঁহার গর্ব, এই তাঁহার পরিচয়। তিনি দেবদত্তকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন ও রাজ্যের অরাজক অবস্থার কথা সমস্তই অবগত হইলেন। রানী রাজাকে উৎপীড়কদের হাত হইতে প্রজাদের রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন— "আমার প্রজারে যারা করেছে পীড়ন রাজ্য হতে দূর করে দাও তাহাদের।"

কিন্তু এই উৎপীড়কের দল রানীরই আত্মীয়— সকলেই শক্তিশালী সামন্ত— বিনাযুদ্ধে তাহাদের কবল হইতে জালন্ধর উদ্ধার করা যাইবে না। রানী মন্ত্রীকে বলিলেন, "বিদেশী নায়ক এরাজ্যে যতেক আছে করহ

আহ্বান ··· কালভৈরবের পূজোৎসবে করো নিমন্ত্রণ। সে দিন বিচার হবে।" কিন্তু রাজা সে কথা শুনিবেন না, কোনো বিরোধ অশান্তি তিনি চান না। রাজ্য যাক প্রজা যাক তাঁহার চিরতৃষিত অন্তর চায় প্রেয়সীর প্রেম— নিরবচ্ছিন্ন প্রেমরসলীলা। সুমিত্রা রাজার প্রেমবাহুর বন্ধন ছিন্ন করিলেন রাজ্যশ্রীর সম্মানের জন্য,— তিনি যে রানী। তাই ছদ্মবেশে চলিলেন কাশ্মীরে পিত্রালয়ে; সেখান হইতে সাহায্য আনিয়া দুষ্কৃতকারীদিগকে দূর করিবেন। বিক্রমদেব এই সংবাদে স্তম্ভিত। তিনি বলিতেছেন, "পলায়ন! রাজ্য ছেড়ে পলায়ন! এ রাজ্যেতে··· সব দিয়ে পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ়বলে ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়?"

এই আঘাতে রাজার মোহ ছিন্ন হইল, স্বপ্ন ভাঙিল, অন্ধ প্রেমের প্রতিক্রিয়ায় প্রতিহিংসার বিষবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

তবে দাও, ফিরে দাও ক্ষাত্রধর্ম মোর;
রাজধর্ম ফিরে দাও; পুরুষহৃদয়
মুক্ত করে দাও; এই বিশ্বরঙ্গ মাঝে!
কোথা কর্মক্ষেত্র! কোথা জনস্রোত! কোথা
জীবন-মরণ! ···স্বপ্ন ছুটে গেছে,···
সৈন্যদল করহ প্রস্তুত, যুদ্ধে যাব,
নাশিব বিদ্রোহ।

সুমিত্রা কাশ্মীরে পৌঁছিয়া ভ্রাতা কুমারসেনের সহিত সাক্ষাৎ করিল। কুমারসেনের পিতৃব্য চন্দ্রসেন অভিভাবকরূপে রাজ্য শাসন করিতেছেন। তাঁহার পত্নী রেবতী অত্যন্ত হিংস্রপ্রকৃতির নারী। কুমারসেন জালন্ধরের কথা পিতৃব্যকে জানাইলে রেবতী তাহাকে সৈন্য লইয়া যুদ্ধযাত্রায় প্ররোচিত করিলেন। রেবতীর অভিপ্রায় ছিল অন্যরূপ। প্রথমত ত্রিচূড়ের রাজকন্যা ইলার সহিত কুমারসেনের বিবাহ পণ্ড করা; দ্বিতীয়ত কুমারকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য নানা প্রকার কূট অভিসন্ধি তাঁহার অন্তরে চলিতেছে। ত্রিচূড়ে গিয়া কুমার ইলার নিকট বিদায় লইল— ইলার মন যেন বলিল— "আমার এ জীবনের সুখ আজি দিবসের সাথে ডুবিল পশ্চিমে।"

এদিকে বিক্রমদেব রণোন্মত্ত; বিদ্রোহী বিদেশীরা বন্দীকৃত; কিন্তু যুদ্ধের নিবৃত্তি নাই। আজ ক্ষাত্রতেজেরও সেই ব্যভিচার, প্রেমেও যাহা দেখা দিয়াছিল একদিন। বিক্রমদেব বলিতেছেন—

এ কী মুক্তি! এ কী পরিত্রাণ! কী আনন্দ
হৃদয় মাঝারে! অবলার ক্ষীণ বাহু
কী প্রচণ্ড সুখ হতে রেখেছিল মোরে
বাঁধিয়া বিবর মাঝে।···আমি ছিনু অন্তঃপুরে
পড়ে; ···কোথা ছিল লোকলাজ,
কোথা ছিল বীরপরাক্রম! ···কে বলিবে
অন্তঃপুরচারী! ···
এ প্রবল হিংসা ভালো, ক্ষুদ্র প্রেম চেয়ে,
প্রলয় তো বিধাতার চরম আনন্দ!
হিংসা এই হৃদয়ের বন্ধন-মুক্তির
সুখ! হিংসা জাগরণ! হিংসা স্বাধীনতা!

প্রেমও যেমন মোহাচ্ছন্ন হইয়া বিকৃত ছিল, আজ রাজধর্ম, ক্ষাত্রধর্মও তেমনি হিংসায় কুৎসিত হইয়াছে, অসত্য জীবন হইতে অসত্য জীবনেরই জন্ম হয়।

এমন সময়ে সংবাদ আসিল রানী সুমিত্রা বিদ্রোহী যুধাজিৎকে বন্দী করিয়া রাজ-শিবিরে উপস্থিত। বিক্রমদেব হঠাৎ রানীর আগমনের কথা শুনিয়া—

সহসা জাগিয়া আজ দেখিব কি
সেই ফুলবন, সেই মহারানী, সেই
পুষ্পশয্যা, সেই সুদীর্ঘ অলস দিন,
দীর্ঘনিশি বিজড়িত ঘুমে জাগরণে?

বিদ্রোহী হইয়া উঠিল ক্ষত্রিয়ের মন। নারী শত্রুকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া আনিয়াছে! অসহ্য এ নারীর দম্ভ! রাজা ঘোষণা করিলেন, 'রমণীর সনে সাক্ষাতের এ নহে সময়।' '··· এ শিবিরে শিবিকার প্রবেশ নিষেধ।'

রাজা বিক্রমের সমস্ত ক্রোধ গিয়া পড়িল সুমিত্রা ও কুমারের উপর। সুমিত্রা ও কুমারসেন অপমানিত হইয়া

কাশ্মীরে ফিরিয়া গেল। বিক্রমদেব প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য কাশ্মীর আক্রমণ করিবেন মনস্থ করিলেন। কুমারসেন পিতৃব্যের নিকট হইতে সৈন্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে চাহিলে রেবতী আপত্তি জানাইলেন। বলিলেন—

তোমারে করিয়া বন্দী অপরাধীভাবে
জালন্ধর-রাজ করে করিব অর্পণ।
মার্জনা করেন ভালো, নতুবা যেমন
বিধান করেন শাস্তি নিয়ো নতশিরে।

কুমার বুঝিতে পারিল কাশ্মীররাজা বিক্রমদেবের হিংস্র প্রতিহিংসা হইতে রক্ষা পাইবে না। ত্রিচূড় গিয়া কুমার ইলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে বিক্রমদেবের ভয়ে অমরুরাজ বলিয়া উঠিলেন,

পালাও, পালাও, এসো না আমার রাজ্যে! আপনি মজিবে তুমি আমারে মজাবে।

কুমার তথায় আশ্রয়প্রার্থী হইয়া যায় নাই, সে কেবল অনির্দিষ্ট জগতে বাহির হইবার পূর্বে ইলার সহিত দেখা করিতে চায়; তাহার সে-প্রার্থনা পূরণ হইল না।

এদিকে কাশ্মীরে শিবিরে বিক্রমদেব জয়সেন ও যুধাজিৎ প্রভৃতি যোদ্ধারা কুমারকে ধরিয়া আনিবার ষড়যন্ত্রে রত। 'ধরিবারে তারে পুরস্কার করেছি ঘোষণা'। বিক্রমদেব বলিতেছেন— "এ কী দৃঢ়পাশে আমারে করেছে বন্দী শত্রু পলাতক।…শীঘ্র আনো তারে জীবিত কি মৃত।' এমন সময়ে চন্দ্রসেন ও রেবতী বিক্রম সমীপে উপস্থিত হইলেন। হিংস্র সর্পিনীর মূর্তি রেবতী; সে বলিল "প্রজাগণ লুকায়ে রেখেছে তারে। আগুন জ্বালাও ঘরে ঘরে তাহাদের। শস্যক্ষেত্র করো ছারখার। ক্ষুধা-রাক্ষসীর হাতে সঁপি দাও দেশ, তবে তারে করিবে বাহির।" বিক্রমদেবের অকস্মাৎ চমক ভাঙিল এই নারীর কথা শুনিয়া—

ওরে হিংস্র নারী! ওরে নরকাগ্নি শিখা!
বন্ধুত্ব আমার সনে! এতদিন পরে
আপনার হৃদয়ের প্রতিমূর্তিখানা
দেখিতে পেলেম ওই রমণীর মুখে।…
একদিন দিব বুঝাইয়া, নহি আমি
তোমাদের কেহ। নিরাশ করিব এই
গুপ্ত লোভ, বক্র রোষ, দীপ্ত হিংসাতৃষা।
দেখিব কেমন করে আপনার বিষে
আপনি জ্বলিয়া মরে নর-বিষধর।

কুমারসেন অরণ্যে অরণ্যে ঘুরিতেছে, সঙ্গে সুমিত্রা। অরণ্যবাসীরা ইহাদের সহায়। কুমার ইলার ধ্যানে মগ্ন। কিন্তু এদিকে ত্রিচূড়ে বিক্রমদেবের করে ইলাকে সমর্পণ করিবার জন্য অমরুরাজ প্রস্তুত। বিক্রম কুমারসেনের দুর্ভাগ্যের কথা ইলাকে শুনাইয়া বলিলেন, 'তাহার সৌভাগ্য-রবি গেছে অস্তাচলে, ছাড়ো তার আশা।' '…বিদ্রোহী সে, রাজসৈন্য ফিরিতেছে সদা সন্ধানে তাহার।' ইলার উৎকণ্ঠা, তাহার কাতরতা বিক্রমদেবের অন্তরে নূতন সুর ধ্বনিয়া তুলিল।

কী প্রবল প্রেম! ভালোবাসো ভালোবাসো
এমনি সবেগে চিরদিন। যে তোমার
হৃদয়ের রাজা, শুধু তারে ভালোবাসো।
প্রেমস্বর্গচ্যুত আমি তোমাদের দেখে
ধন্য হই! দেবি, চাহিনে তোমার প্রেম;…
চলো মোর সাথে, আমি তারে এনে দেব,
সিংহাসনে বসায়ে কুমারে— তার হাতে
সঁপি দিব তোমারে কুমারি!…
… … … যুদ্ধ নাহি
ভালো লাগে। শান্তি আরো অসহ্য দ্বিগুণ,
গৃহহীন পলাতক, তুমি সুখী মোর
চেয়ে! এ সংসারে যেথা যাও, সেথা থাকে
রমণীর অনিমেষ প্রেম, দেবতার
ধ্রুবদৃষ্টিসম,…আমি কোন সুখে ফিরি
দেশ-দেশান্তরে স্কন্ধে বহি জয়ধ্বজা,
অন্তরেতে অভিশপ্ত হিংসাতপ্ত প্রাণ!
কোথা আছে কোন স্নিগ্ধ হৃদয়ের মাঝে
প্রস্ফুটিত শুভ্রপ্রেম শিশির শীতল।
ধুয়ে দাও, প্রেমময়ি, পুণ্য অশ্রুজলে
এ মলিন হস্ত মোর, রক্তকলুষিত।

এদিকে বনমধ্যে কুমারসেন ও সুমিত্রার পক্ষে এভাবে জীবন ধারণ করা ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিতেছে ; তাহাদের জন্য কত পল্লী ছারেখারে গেল, কত লোক প্রাণ দিল ! অবশেষে কুমার স্থির করিল, সুমিত্রা তাহার ছিন্ন মুণ্ড লইয়া রাজাকে উপঢৌকন দিবে। তাহাই হইল। কাশ্মীর রাজসভায় বিক্রমদেব, চন্দ্রসেন প্রভৃতি সকলে সমবেত ; সংবাদ আসিল 'শিবিকার দ্বার রুদ্ধ করি প্রাসাদে আসিছে যুবরাজ।' সকলে বিস্মিত হইয়া গেল। এমন সময়ে শিবিকা হইতে স্বর্ণথালে কুমারের ছিন্নমুণ্ড লইয়া সুমিত্রা বাহিরে আসিলে, সহসা রাজসভার সমস্ত বাদ্য নীরব হইয়া গেল। সুমিত্রা বলিল, "আতিথ্যের উপহার আপনি ভেটিলা যুবরাজ। পূর্ণ তব মনস্কাম, এবে শান্তি হোক, শান্তি হোক, এ জগতে, নিবে যাক নরকাগ্নি শিখা, সুখী হও তুমি !" সুমিত্রার প্রাণ-বায়ু নির্গত হইল। ছুটিয়া আসিয়া ইলা এই দৃশ্য দেখিয়া মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল। বিক্রমদেব নতজানু হইয়া কহিলেন, "দেবি, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের, তাই বলে মার্জনাও করিলে না ? রেখে গেলে চির অপরাধী করে ? ইহজন্ম নিত্য-অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি ক্ষমা তব ; তাহারো দিলে না অবকাশ ? দেবতার মতো তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর, অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান।" এইখানে নাটিকার যবনিকা।

'রাজা ও রানী'র দ্বিতীয়সংস্করণে কবি বিস্তর পরিবর্তন করেন, আয়তনে অর্ধেক হয় ; অর্থাৎ প্রথম সংস্করণে বহু অবান্তর বিষয় ছিল , সেটা কাটিয়া ছাটিয়া ছোটো করেন ; আমরা সেই পরিবর্তিত সংস্করণই গ্রন্থাবলীতে পাই।

'রাজা ও রানী' রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক বলা যাইতে পারে ; ইতিপূর্বে যাহা নাটকাকারে লিখিয়াছিলেন, তাহাকে যথার্থ নাটক আখ্যা দান করা যায় না। বাল্মীকি-প্রতিভা, কালমৃগয়া, মায়ার খেলা গীতনাট্য, নলিনী অকিঞ্চিৎকর গদ্য নাটক। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'কে নাটক বলা চলে না, উহা নাট্যকাব্যের প্রথম পরীক্ষা ; উহাতে তত্ত্ব আছে, নাট্যিক বিষয় কমই। 'রাজা ও রানী'তে হৃদয়াবেগ প্রবল হইলেও কল্পনার ক্ষেত্র বেশ প্রশস্তই , আখ্যানাংশে বিষয়বস্তু প্রচুর ও ঘটনাবৈচিত্র্য যথেষ্ট, বরং একখানি নাটকের পক্ষে বিষয়বস্তু বেশি বলিয়া মনে হয়। ইহাতে সৃষ্টি-স্থাপত্য দৃঢ়তর হইয়াছে ; সংসারের সহিত কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের আভাস পাই।

রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধবয়সে এই নাটক সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, ইহার "নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাজমি। ঐ লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ। সেটা অত্যন্ত শোচনীয়রূপে অসংগত। এই নাটকে যথার্থ নাট্যপরিণতি দেখা দিয়েছে যেখানে বিক্রমের দুর্দান্ত প্রেম প্রতিহত হয়ে পরিণত হয়েছে দুর্দান্ত হিংস্রতায়, আত্মঘাতী প্রেম হয়ে উঠেছে বিশ্বঘাতী।"[১]

'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র সঙ্গে 'রাজা ও রানী'র এক জায়গায় মিল কবি স্বয়ং দেখাইয়া দিয়াছেন। "অসীমের সন্ধানে সন্ন্যাসী বাস্তব হতে ভ্রষ্ট হয়ে সত্য হতে ভ্রষ্ট হয়েছে, বিক্রম তেমনি প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে। এই তত্ত্বকে যে সজ্ঞানে লক্ষ্য ক'রে লেখা হয়েছে তা নয়, এর মধ্যে এই কথাটাই প্রকাশ পাবার জন্যে স্বত-উদ্যত হয়েছে যে, সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত ক'রে আনলে সে আপনার রস আপনি জোগাতে পারে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে। 'এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না, শুধু সুখ চলে যায় এমনি মায়ার ছলনা'।"[১]

রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রেমের মূল কথা হইতেছে সংযম। প্রেমে সংযমের অভাব হইলে উহা কী নিষ্ঠুর, কী কুৎসিত হয়, তাহা এই নাট্যে বিক্রমের মুগ্ধ ভালোবাসায় প্রকাশ পাইয়াছে। মোহবশে রাজা বিক্রম তাঁহার মানস প্রেমকে দেহের মধ্যে খুঁজিয়া ফিরিতেছেন ; সুতরাং তাহা পদে পদে পরাভূত হইতেছে, এবং যতই সে প্রতিহত হইতেছে

১ দ্র কবির মন্তব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১ম খণ্ড ১৩৪৬ আশ্বিন।

ততই তাহাকে পাইবার জন্য জিদ্ বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহারই পাশাপাশি কবি ফুটাইয়াছেন সুমিত্রাকে। যথার্থ প্রেমের মর্যাদা রক্ষার জন্য নারী কতদূর আত্মসংযম ও আত্মত্যাগ করিতে পারে, তাহাই দেখি এই মহীয়সী নারীর চরিত্রে। প্রেমকে কেবল আপনার ভোগের সামগ্রী করিব বলিয়া চাপিয়া ধরিলে সে-প্রেম নিবিয়া যায়। 'রূপ নাহি ধরা দেয় বৃথা সে প্রয়াস'— এ বাণী মানসী যুগেরই। 'কড়ি ও কোমলে'ও সেই সুর শুনিয়াছিলাম 'পবিত্র প্রেম' ও 'পবিত্র জীবন' কবিতাদ্বয়ে ; মানসীর মধ্যেও সেই সুরটি বারে বারে নানা ছন্দে ঝংকৃত হইতেছে।

চল্লিশ বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ 'রাজা ও রানী' ভাঙিয়া গদ্য নাটক 'তপতী' রচনা করেন। সেই গ্রন্থের ভূমিকায় কবি 'রাজা ও রানী' সম্বন্ধে যে সমালোচনা স্বয়ং করিয়াছিলেন (১৯ ভাদ্র ১৩৩৬) তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"সুমিত্রা এবং বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিরোধ আছে— সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে-প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হ'লো, এইটেই রাজা ও রানীর মূলকথা।

"রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয়নি। কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েচে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে-অসংগত প্রাধান্য লাভ ক'রেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হ'য়েছে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধা-বিভক্ত। এই নাটকের অন্তিমে কুমারের মৃত্যুদ্বারা চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে— এই মৃত্যু আখ্যান-ধারার অনিবার্য পরিণাম নয়।"

১২৯৬ সনের শ্রাবণ মাসের শেষদিকে ও ভাদ্রের গোড়ায় রচিত কবিতা কয়টি 'মানসী' কবিতাগুচ্ছের পৃথক একটি স্তরে, বিশেষ পরিপ্রেক্ষণায় বিচারণীয়— ধ্যান (২৬ শ্রাবণ), অনন্ত প্রেম (৯ই ভাদ্র), ক্ষণিক মিলন (৯ই ভাদ্র), আত্মসমর্পণ (১১ই ভাদ্র) ও আশঙ্কা (১৪ই ভাদ্র)। কবি জোড়াসাঁকোয় আছেন— মন যেন বেশ তৃপ্ত ; এমন শান্ত মন বহুদিন দেখা যায় নাই ; মানসীর পূর্বেকার কবিতাগুচ্ছ হইতে ইহাদের সুর কত পৃথক্।

নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া বরণ করি ;
তুমি আছ মোর জীবনমরণ হরণ করি। (ধ্যান)

এ মনোভাব পূর্বের অস্থির আক্ষেপ ও হতাশ্বাস হইতে সম্পূর্ণ অন্য রূপের—'যতদূর হেরি দিগদিগন্তে তুমি আমি একাকার।' কাব্যের মধ্যে কবি যাহাকে খুঁজিতেছেন সে কে। সে কি তাঁহার মানসী, মানস-সুন্দরী, জীবনদেবতা। এই মানসীর উদ্দেশেই কি 'অনন্ত প্রেম' কবিতায় বলিলেন—

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শত রূপে শতবার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে' মুগ্ধ হৃদয় গাঁথিয়াছে গীতহার,
কতরূপ ধরে' পরেছ গলায় নিয়েছ সে উপহার,
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।...
আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হতে।

এই শান্ত মনোভাব এই তৃপ্তি সম্বন্ধে 'আশঙ্কা' জাগে। প্রশ্ন উঠে 'কে জানে এ কি ভালো? আকাশভরা কিরণ ধারা আছিল মোর তপন-তারা, আজিকে শুধু একেলা তুমি আমার আঁখি আলো, কে জানে এ কি ভালো?" বিচিত্র প্রেম, বিচিত্র সুখ সব আজ নিশ্চিহ্ন, "কোথায় তা'রা, সকলে আজি তোমাতেই লুকাল। কে জানে এ কি ভালো?..."

'মানসী'র গোড়ার দিকের মনোভাব হইতে ইহার কত পার্থক্য—

সকল গান, সকল প্রাণ তোমারে আমি করেছি দান,
তোমারে ছেড়ে বিশ্বে মোর তিলেক নাহি ঠাঁই।

'রাজা ও রানী' প্রকাশের পর এই কবিতা কয়টি রচিত হয়। গদ্য রচনা খুব কম, একটি মাত্র প্রবন্ধ 'নব্যবঙ্গের আন্দোলন'[১] চোখে পড়ে। প্রবন্ধ হিসাবে ইহাতে নূতন কিছু নাই। রাজনীতি সমাজনীতি সম্বন্ধে মামুলি সমালোচনা যাহা এতদিন অস্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন— তাহাকেই আরও একটু স্পষ্ট করিবার চেষ্টা মাত্র দেখা যায়। তখনকার রাজনীতিতে Representative government ছিল আলোচনার প্রধান বিষয়। রাজনীতিকদের এইসব বিষয় লইয়া আন্দোলনকে লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সাহিত্য রচনা হিসাবে সুন্দর নহে সত্য, কিন্তু তত্ত্ব ও তথ্য হিসাবে তাহাদের মূল্য না দিয়া পারা যাইবে না।

মানসীর যুগ। 'বিসর্জন'

আমরা যে-সময়ের কথা বলিতেছি, তখনো রবীন্দ্রনাথের 'জীবন আছিল লঘু', যদিও প্রথম বয়স কাটিয়া গিয়াছে। সংসারের কোনো দায়ে বা দায়িত্বে তেমনভাবে বাঁধা পড়েন নাই। অকারণ ঘুরিয়া বেড়ানো সহজ ছিল। মহর্ষি জমিদারির 'কাজের ডোরে' কবিকে বাঁধিবার চেষ্টা অল্পসল্প করেন; কিন্তু তেমনভাবে ধরা তিনি দেন না; দুই-এক মাস জমিদারিতে গিয়া বাস করেন। সমসাময়িক একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "শিলাইদহের অপর পারে একটা চরের সাম্‌নে আমাদের বোট লাগানো আছে। প্রকাণ্ড চর— ধূ ধূ ক'রুচে— কোথাও শেষ দেখা যায় না···। গ্রাম নেই, লোক নেই, তরু নেই, তৃণ নেই—,বৈচিত্র্যের মধ্যে জায়গায় জায়গায় ফাটলধরা ভিজে কালো মাটি, জায়গায় জায়গায় শুক্‌নো শাদা বালি।··· এমনতর Desolation কোথাও দেখা যায় না।··· পৃথিবী বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাক্‌লে ভুলে যেতে হয়।" নূতন অভিজ্ঞতা বটে।

"সন্ধ্যাবেলায় এই বৃহৎ চরের মধ্যে ছাড়া পেয়ে অনুচর সমেত ছেলেরা একদিকে যায়, বলু একদিকে যায়, আমি একদিকে যাই, দুটি রমণী [তাহার মধ্যে একজন মৃণালিনী দেবী] আর এক দিকে যায়।··· গতকল্য এই মায়া উপকূলে অনেকক্ষণ ধ'রে বিচরণ ক'রে বোটে ফিরে গিয়ে দেখি ছেলেরা ছাড়া আমাদের দলের আর কেউ ফেরেন নি— আমি একখানি কেদারায় স্থির হ'য়ে ব'সলুম— Animal Magnetism নামক একখানা অত্যন্ত ঝাপসা subject-এর বই একটা বাতির ঝাপসা আলোতে ব'সে পড়তে আরম্ভ করলুম।" কিন্তু মেয়েরা সময়মত ফেরেন না; কবি উদ্‌বিগ্ন হইয়া খোঁজ শুরু করিলেন; সেই খোঁজাখুঁজির সময়ে রবীন্দ্রনাথের অন্তরের মানুষটি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ছিন্নপত্রের[২] সেই বর্ণনাটি উপভোগ্য। এইভাবেই দিন যায়।

মাঘোৎসবের সময়ে কলিকাতায় আসিয়া দেখেন বাড়ির ছেলেরা নূতন একটা অভিনয় করিবার জন্য ব্যস্ত। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কে তাহাদের আবদার সহজে পূরণ করিতে পারে! সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার নিজের

১ নব্যবঙ্গের আন্দোলন, ভারতী ১২৯৬ আশ্বিন। ইহাই একমাত্র প্রবন্ধ ১২৯৫ ও ১২৯৬ এর মধ্যে রচিত, যাহা ভারতীতে প্রকাশিত হয়।

২ ছিন্নপত্রের তারিখটি ভুল। উহা হইবে ১৮৮৯। পারিবারিক স্মৃতি পুস্তকে বলেন্দ্রনাথের বর্ণনা হইতে জানিতে পারি ১৩ অগ্রহায়ণ ১২৯৬ (১৮৮৯ নভেম্বর ২৭) ঘটনাটি ঘটে। ১৮৮৮ সালের ২৭ নভেম্বর রথীন্দ্রনাথের জন্মের তারিখ।

হাতে বাঁধানো একখানি খাতা 'রবিকা'র হাতে দিয়া বোধ হয় নাটক লিখিবার 'বায়না' করিলেন। উৎসবের পর কবি একাই সাহাজাদপুরের জমিদারিতে চলিয়া গেলেন; এইখানে তিনি তাঁহার অমর নাট্যকাব্য 'বিসর্জন' রচনা করেন। আশ্চর্যের বিষয় ভাদ্রমাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত এই দীর্ঘকালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গদ্য পদ্য রচনা প্রায় চোখে পড়ে না; 'মানসী'র মধ্যেও এখানে মস্ত ফাঁক। মাঘোৎসবে একটিও নূতন গান রচিতে দেখি না, অন্য গান লিখিয়াছিলেন কিনা বলা কঠিন। মনে হয় একটা বৃহৎ সৃষ্টির পূর্বে, এ যেন শিল্পীর নীরব সাধনা, সংযম ও প্রতীক্ষা। আবার ইহাও হইতে পারে,— সংসার ও জমিদারির উভয়বিধ চাহিদা পূরণ করিতে মন এতই ব্যাপৃত যে, কাব্য কোনো রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় নাই। মোটকথা রচনার দুর্ভিক্ষ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

নাটকের জন্য নূতন আখ্যানবস্তু সন্ধানের সময় নাই; তাই বোধ হয় 'রাজর্ষি' উপন্যাসের গল্পাংশ লইয়া নাটক রচনা শুরু করিলেন। নাটক রচনা হইয়া গেলে সুরেন্দ্রনাথকে উহা উৎসর্গ করিয়া যে কবিতা লেখেন তাহা 'বিসর্জন'-নাটিকার পুরোভাগে মুদ্রিত আছে। তাহাতে আছে—

তোরি হাতে বাঁধা খাতা তারি শ-খানেক পাতা অক্ষরেতে ফেলিয়াছি ঢেকে,
মস্তিষ্ক-কোটর-বাসী চিন্তা কীট রাশি রাশি পদচিহ্ন গেছে যেন রেখে।
প্রবাসে প্রত্যহ তোরে হৃদয়ে স্মরণ ক'রে লিখিয়াছি নির্জন প্রভাতে,
মনে করি অবশেষে শেষ হোলে ফিরে দেশে জন্মদিনে দিব তোর হাতে।...
সম্মুখে দাঁড়াব যবে 'কী এনেছ' বলি' সবে যদ্যপি শুধাস্ হাসিমুখ,
খাতাখানি বের ক'রে বলিব 'এ পাতা ভ'রে আনিয়াছি প্রবাসের সুখ।'......
তারপরে দিনকত কেটে যায় এই মতো তারপরে ছাপাবার পালা।
মুদ্রাযন্ত্র হতে শেষে বাহিরায় ভদ্রবেশে তারপরে মহা ঝালাপালা।
রক্তমাংস-গন্ধ পেয়ে ক্রিটিকেরা আসে ধেয়ে চারিদিকে করে কাড়াকাড়ি,
কেহ বলে, 'ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক, লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি।' ....
হাসিমুখে স্নেহভরে সঁপিলাম তোর করে বুঝিয়া পড়িবি অনুরাগে।
কে বোঝে কে নাই বোঝে ভাবুক তা নাহি খোঁজে ভালো যার লাগে তা'র লাগে।

'বালকে' প্রকাশিত রাজর্ষি উপন্যাসের প্রথম ১৮টি পরিচ্ছেদ পর্যন্ত গল্পাংশ 'বিসর্জনে'র বিষয়বস্তু। নক্ষত্ররায়ের বিদ্রোহ কাহিনী সংযোজিত অংশের (৩২,৩৩,৩৬,৩৭ পরিচ্ছেদ) অন্তর্গত। রঘুপতি কর্তৃক কালী প্রতিমার বিসর্জন ঘটিয়াছে ৪০শ পরিচ্ছেদে। রাজর্ষির অন্যান্য অংশের সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক নাই। উহার অন্তর্গত হাসি, হাসির কাকা কেদারেশ্বর, ভিখারিনী অপর্ণার অন্ধ পিতা প্রভৃতি বিসর্জনের প্রথম সংস্করণে ছিল। ১৩০৩এর সংস্করণে তাহারা পরিত্যক্ত হয়। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে গুণবতী, অপর্ণা, নয়নরায়, চাঁদপাল প্রভৃতি বিসর্জনের নূতন সৃষ্টি, রাজর্ষিতে ইহারা নাই। বিসর্জনের পাঠে বহু পরিবর্তন হইয়াছে; ১৩০৩এর কাব্যগ্রন্থাবলী সম্পাদন কালেই উহার যথার্থ পরিবর্তন সাধিত হয়। অনেকগুলি দৃশ্য সংক্ষিপ্ত হয়, নূতন লিখিত কোনো কোনো অংশ যোজিত হয়, কোনো কোনো অংশ পরিবর্তিত হয় ও কয়েকটি দৃশ্য সম্পূর্ণ বর্জিত হয়।[১]

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী ২য় খণ্ড পৃ ৬৫০-৫১

'বিসর্জন'

ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের মহিষী গুণবতী নিঃসন্তান। কালীর মন্দিরে দেবীসমক্ষে পুত্রকামনা করিয়া অন্তর্বেদনা জানাইতেছেন, "ব'সে আছি তপ্তবক্ষে শুধু এক শিশুর পরশ লালসিয়া, ..."। মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতিকে ডাকিয়া বলিলেন 'এ-বৎসর পূজার বলির পশু আমি নিজে দিব।' মহাদেবীসমক্ষে পশুবলিকে কেন্দ্র করিয়া 'বিসর্জন' নাটকের আখ্যানটি জটিল হইয়াছে।

অপর্ণা ভিখারিনী বালিকা, সে রাজার কাছে একদিন আসিয়া সাশ্রুনয়নে অভিযোগ করিল যে, তাহার পালিত ছাগশিশু রাজ-অনুচরগণ কাড়িয়া আনিয়া দেবীর কাছে বলি দিয়াছে। রাজা মন্দিরের সেবক রঘুপতির পুত্রস্থানীয় অনুচর জয়সিংহকে ডাকাইয়া এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। বালিকার মাতৃহৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ছিল এই ছাগশিশু। মহাকালীর মাতৃস্নেহ সম্বন্ধে এই অশিক্ষিতা বালিকার সরল হৃদয়ে প্রথম সন্দেহ প্রবেশ করিল। সে-ই প্রশ্ন করিল, 'কে তোমার বিশ্বমাতা। মোর শিশু চিনিবে না তারে। ... আমি তা'র মাতা।' একদিকে চিরবন্ধ্যা নারীর ক্রন্দন; অজাত শিশুকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতা। আর অন্যদিকে মূঢ় বালিকার হৃদয়ে মাতৃস্নেহ উদ্‌বেলিত হইতেছে মূক ছাগশিশুর জন্য। একজন একটি মানবশিশুর লোভে দেবীসমক্ষে শত শত মহিষ ও ছাগশিশু বলি দিবার জন্য প্রস্তুত, অপরজন একটিমাত্র ছাগশিশু হত্যার জন্য দেবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। সে বলে, "মা তাহারে নিয়েছেন? মিছে কথা। রাক্ষসী নিয়েছে তারে।" এইখানে দুইটি নারীহৃদয়ের বিপরীত আবেদন ও আকাঙ্ক্ষা। আখ্যায়িকার শেষ পর্যন্ত এই বিপরীত সংগ্রাম চলিয়াছে দুই নারীর মধ্যে। এই মন্দির প্রাঙ্গণে জয়সিংহ ও অপর্ণার প্রথম পরিচয় হইল; প্রথম অস্পষ্ট প্রেম উভয়ের হৃদয়ে দেখা দিল। অপর্ণা বলে 'তুমি চলে এসো জয়সিংহ এ মন্দির ছেড়ে, দুইজনে চলে যাই।' জয়সিংহ বলে, 'কোথা যাব এমন্দির ছেড়ে! এসো তুমি আমার কুটীরে।' এযেন খাঁচার পাখি ও বনের পাখির মিলন। কেহই নিজ সংস্কার ছাড়িতে পারিতেছে না।

ছাগশিশু হত্যার এই সামান্য বিষয়টি রাজার মনে যে বিপ্লব সৃষ্টি করিল, তাহাতেই আখ্যানটি নাটকীয় রূপ লইয়াছে। রাজা রাজসভায় ঘোষণা করিলেন, "মন্দিরেতে জীববলি এ বৎসর হতে হইল নিষেধ। বালিকার মূর্তি ধরে স্বয়ং জননী মোরে ব'লে গিয়েছেন জীবরক্ত সহে না তাঁহার।" সামান্য ঘটনা মানুষের চিরন্তন ধর্মবিশ্বাসে কী বিপ্লব সাধন করিতে পারে এইটি তাহারই নিদর্শন। কিন্তু বিসর্জনের প্রথম সংস্করণে কারণটি আরও বস্তুতান্ত্রিক ছিল। 'রাজর্ষি'তে বর্ণিত হাসি ও তাতা উহাতে ছিল এবং হাসির মৃত্যুকালে বারে বারে 'এত রক্ত কেন' এই কথাটি রাজার অন্তরে শেলের মতো বিঁধিয়া যায়। হাসির মৃত্যুর পর তাতাকে তিনি রাজসংসারে গ্রহণ করেন ও পুত্রের ন্যায় পালন করেন, বিসর্জনে তাতা হইতেছে ধ্রুব। রবীন্দ্রনাথ বিসর্জনের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রণয়নকালে হাসি ও তাতার আখ্যানটি বর্জন করেন; এবং হাসির মৃত্যুর দ্বারা রাজার অন্তরের পরিবর্তনটাকে না ঘটাইয়া আরও সূক্ষ্ম কারণ দর্শাইলেন; রাজার মনের পরিবর্তনটা বহির্বিষয়ী ঘটনার উপর না রাখিয়া অন্তর্বিষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়া দেখাইলেন; বলিবন্ধের প্রেরণাটা তাতার মৃত্যুর ন্যায় নাটকীয় অভিঘাতে উদ্‌বুদ্ধ না হইয়া, আরও সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বমূলক করিলেন।

দেবপূজাদি ব্যাপারে রাজশক্তির হস্তক্ষেপ রঘুপতির বিবেচনায় অনধিকার চর্চা। তাহার যুক্তি—"বাহুবল রাহুসম ব্রহ্মতেজ গ্রাসিবারে চায়— সিংহাসন তোলে শির যজ্ঞবেদী 'পরে।" Church ও State-এর বিবাদ—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কলহ চিরন্তন।

জয়সিংহ ও অপর্ণা মন্দিরপ্রাঙ্গণে অস্পষ্ট প্রেমবিনিময়ে মগ্ন, এমন সময়ে ক্রুদ্ধ অপমানিত ব্রাহ্মণ ফিরিয়া

আসিল। জয়সিংহ সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিল; গোবিন্দমাণিক্যকে সে আদর্শ মানব বলিয়া অন্তর দিয়া শ্রদ্ধা করে, গুরুকে সে সমস্ত বিশ্বাস দিয়া ভক্তি করে। সত্য ও সংস্কার— এই দুইএর দ্বন্দ্ব চলে জয়সিংহের অন্তরে; তাই সে বলে 'এ প্রাণ থাকিতে অসম্পূর্ণ নাহি রবে জননীর পূজা।' এবং তাহার এই বাক্যই সে বর্ণে বর্ণে পালন করিয়াছিল।

গোবিন্দমাণিক্যের আদেশে মন্দিরে বলি নিষেধ, 'মন্দিরের দুয়ার হইতে রানীর পূজার বলি' ফিরিয়া আসিল। রাজার যে সংগ্রাম এতক্ষণ বাহিরে চলিতেছিল রঘুপতি ও সভাসদদের সহিত, এখন তাহা দেখা দিল অন্দরে রানীর সহিত মতানৈক্যে। অন্ধসংস্কারমোহাচ্ছন্ন নারীর দৃষ্টি স্বভাবতই ক্ষীণ; তাই সে বলে, "মন্দিরের বাহিরে তোমার রাজ্য, যেথা তব আজ্ঞা নাহি চলে, সেথা আজ্ঞা নাহি দিয়ো।" সভাসদাদি প্রাকৃতজনেরই চিন্তার প্রতিধ্বনি যেন রানীরও মুখে শোনা গেল। রাজা ও রানীর মধ্যে সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রঘুপতির অভিশাপের ভয়, দেবীকে প্রতিশ্রুত বলি উৎসর্গ করিতে না পারায়, পাপসঞ্চয়ের ভয়— রানীকে সত্য ধর্ম হইতে ক্রমেই বিচ্যুত করিতেছে। রানীর সকল সাধ্য সাধনা ব্যর্থ হইল— রাজা যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছেন তাহা পালন করিবেনই। তিনি দেবীআজ্ঞা শুনিয়াছেন; 'দেবী-আজ্ঞা নিত্যকাল ধ্বনিছে জগতে। সেই তো বধিরতম, যে-জন সে-বাণী শুনেও শুনে না।' গুণবতীর নারীত্বের, মহিষীত্বের অভিমান ক্ষুণ্ণ হইল; এইবার নারীর হিংস্রমূর্তি প্রকাশ পাইল— "আর নহে প্রেমখেলা, সোহাগ ক্রন্দন! বুঝিয়াছি আপনার স্থান—হয় ধূলিতলে নতশির—নয় ঊর্ধ্বফণা ভুজঙ্গিনী আপনার তেজে!"

সংসারের জটিলতা বাড়িয়া চলিল। রঘুপতি প্রজাদের মধ্যে, সৈনিকদের মধ্যে, বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত করিবার চেষ্টা শুরু করিলেন। মহারানীও রাজার আদেশ অমান্য করিয়া মন্দিরে বলি পাঠাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাজা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া উহা ফিরাইয়া দিলেন। রঘুপতি রাজার বিরুদ্ধে প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করিবার জন্য দেবী-প্রতিমার মুখ ফিরাইয়া দিলেন।— ঘোষণা করিলেন দেবী বিমুখ। জয়সিংহের মনে সন্দেহ হইল; সে প্রশ্ন করিল, 'সমস্তই কি বিশ্বাস করিব?' রঘুপতি বলিলেন, 'হাঁ'। অপর্ণা আসিয়া দূর হইতে বলিল, "শীঘ্র এসো এ-মন্দির ছেড়ে।" নারীর সরল হৃদয় বুঝিতেছে রঘুপতি অসত্যের পথে অধর্মের পথে জয়সিংহকে টানিতেছেন। তাই যেন সে আতঙ্কিত হইয়া জয়সিংহকে মন্দির ত্যাগ করিবার জন্য আবেগভরে অনুরোধ জানায়।

অপর্ণা আসিয়া দেবী প্রতিমার মুখ ফিরাইয়া প্রজাদের দেখাইল যে সত্যই দেবী বিমুখ হইতে পারে না। সংস্কারহীন ভিখারিনীর পক্ষে সত্য সহজবোধ্য। গুরুর এই শঠতায় জয়সিংহের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার দুর্বল অন্তঃকরণ সংস্কারে আবদ্ধ বলিয়া শৃঙ্খল ভাঙিতে পারিল না।

এদিকে রঘুপতি নক্ষত্ররায়কে রাজহত্যার জন্য প্ররোচিত করিতেছে। দেবতার নামে রাজহত্যা, ভ্রাতৃহত্যার প্ররোচনা জয়সিংহের নিকট অত্যন্ত বীভৎস বলিয়া মনে হয়। ধর্মের নামে এই হীন ষড়যন্ত্রের সে প্রতিবাদ করিল। রঘুপতি বুদ্ধিমান, পণ্ডিত; তাহার পক্ষে হত্যার সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করা কঠিন নহে। হত্যা সম্বন্ধে এই দার্শনিক ব্যাখ্যা বাংলা কাব্য-সাহিত্যে একটি অপরূপ সম্পদ; কিন্তু রঘুপতির এই কূট ব্যবহারে, ধর্মের এই অসৎ ব্যাখ্যা-প্রদানে জয়সিংহের চিত্ত গুরু হইতে আরও সরিয়া গেল।

রাজা অল্পকালের মধ্যে জানিতে পারিলেন নক্ষত্ররায় তাঁহাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। রাজা সে-সংবাদ পাইয়া স্বয়ং নক্ষত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমারে মারিবে? বুকে ছুরি দিবে···এই বন্ধ করে দিনু দ্বার··· এই নে আমার তরবারি, মার্ অবারিত বক্ষে, পূর্ণ হোক মনস্কাম।" নক্ষত্র ভাঙিয়া পড়িল, রাজা ক্ষমা করিলেন। কিন্তু পুনরায় গুণবতী নক্ষত্ররায়কে ধরিয়া বুঝাইলেন যে ধ্রুবকেই রাজা ভবিষ্যতে ত্রিপুরার রাজা করিবেন, তাহার রাজা হইবার আশা নাই; অতএব ধ্রুবকে ধ্বংস করাই তাহার স্বার্থ। রানী পরামর্শ দিলেন যে 'অর্ধরাত্রে আজি গোপনে লইয়া তারে দেবীর চরণে মোর নামে করো নিবেদন। তার রক্তে নিবে যাবে দেবরোষানল।'··· নির্বোধ

নক্ষত্ররায় ও রঘুপতি শিশুকে হরণ করিয়া দেবীর সমক্ষে বলির ব্যবস্থা করিল। কিন্তু রাজা সংবাদ পাইয়া মন্দিরে উপস্থিত হইয়া উভয়কে বন্দী করিলেন। বিচারে উভয়ে নির্বাসিত হইল। এইবার রঘুপতির চাতুরী চরমে আত্মপ্রকাশ করিল। 'জোড় করে নতজানু আজ আমি প্রার্থনা করিব তোমা কাছে, দুই দিন দাও অবসর শ্রাবণের শেষ দুইদিন।" এই দুইদিন ভিক্ষা চাহিবার কারণ ছিল; জয়সিংহ দেবীর চরণ ধরিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে সে 'রাজরক্ত শ্রাবণের শেষরাত্রে দেবীর চরণে' আনিয়া দিবে। রঘুপতি জানিতেন, ক্ষত্রিয়কুমার জয়সিংহ প্রতিজ্ঞা পালন করিবেই, সে রাজরক্ত আনিবেই, গোবিন্দমাণিক্যকে সে হত্যা করিবে; তাই তাহার এই কপট বিনয়।

এদিকে মোগলসৈন্য আসাম আক্রমণ করিতে যাইতেছে। পথিমধ্যে তাহারা নির্বাসিত নক্ষত্রের সহিত যুক্ত হইল এবং ত্রিপুরা অধিকারমানসে গোবিন্দমাণিক্যকে পত্র পাঠাইল। পত্র লিখিয়াছিলেন নক্ষত্র; তিনিই গোবিন্দমাণিক্যকে নির্বাসন আদেশ দিয়াছেন, 'নতুবা ভাসাবে রক্তস্রোতে সোনার ত্রিপুরা— দগ্ধ করে দিবে দেশ, বন্দী হবে মোগলের অন্তঃপুর তরে ত্রিপুর-রমণী।" গোবিন্দমাণিক্য স্থির করিলেন, 'ত্রিপুরার রাজপুত্র রাজা হতে করিয়াছে সাধ, তা'র তরে যুদ্ধ কেন?" রাজা যুদ্ধ করিবেন না ঘোষণা করিলেন, নিজেই নির্বাসনে চলিলেন।

নাটকের শেষ পরিণতি হইল জয়সিংহের আত্মবিসর্জনে। দেবীমন্দিরে রঘুপতি অপেক্ষা করিতেছেন, আজ শ্রাবণের শেষরাত্রি, জয়সিংহ রাজহত্যা করিয়া রক্ত আনিবে। জয়সিংহ ঝড়ের মতো গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, 'রাজরক্ত চাই তোর, দয়াময়ী, জগৎপালিনী মাতা! নহিলে কিছুতে তোর মিটিবে না তৃষা? আমি রাজপুত ...রাজরক্ত আছে দেহে। এই রক্ত দিব।" এই কথা বলিয়া জয়সিংহ আত্মঘাতী হইল, তাহার শেষ নিবেদন "এই যেন শেষ রক্ত হয় মাতা, এই রক্তে শেষ মিটে যেন অনন্ত পিপাসা তোর, রক্ততৃষাতুরা।"

এতদিনে রঘুপতির চৈতন্যোদয় হইল— যে হত্যাকে সে এতদিন নানাভাবে সমর্থন করিয়া আসিতেছিল, আজ তাহার বিকটমূর্তি প্রকাশ পাইল; যে-দেবীকে সে অন্ধভাবে এতকাল সেবা করিয়াছিল, আজ তাহা-যে কী মিথ্যা, তাহা প্রতিভাত হইল। দেবীকে গোমতী নদীতে বিসর্জন দিয়া বলিল— 'দেবী নাই।...কোথাও সে নাই। ঊর্ধ্বে নাই, নিম্নে নাই, কোথাও সে ছিল না কখনো।" "এ সংসারে কোথাও থাকিত দেবী—তবে সেই পিশাচীরে দেবী বলা কভু সহ্য কি করিত দেবী? মহত্ত্ব কি তবে ফেলিত নিষ্ফল রক্ত হৃদয় বিদারি' মূঢ় পাষাণের পদে? দেবী বলো তারে? পুণ্যরক্ত পান ক'রে সে মহারাক্ষসী ফেটে মরে গেছে।"

গোবিন্দমাণিক্য দেবীর নিকট হইতে বিদায় লইতে আসিয়া দেখিলেন, 'জয়সিংহ নিবায়েছে নিজরক্ত দিয়ে হিংসারক্তশিখা।' তিনি তাহার উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলেন। গুণবতী বলিলেন 'আজ দেবী নাই— তুমি মোর একমাত্র রয়েছ দেবতা।' উভয়ে নির্বাসনে চলিয়া গেলেন। অপর্ণা আসিয়া রঘুপতিকে ডাকিল, 'পিতা চলে এসো।' রঘুপতি বলিল, "পাষাণ ভাঙিয়া গেল,—জননী আমার এবারে দিয়াছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা। জননী অমৃতময়ী।"

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় বলিতেছেন "বিসর্জন আমাদের ধর্মের একটা অর্থবিহীন নিষ্ঠুর সংস্কার ও আচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ, আর এই প্রতিবাদ প্রথম দেখা দিয়াছে একটি বালিকার ক্ষীণ কণ্ঠ হইতে এবং সেই প্রতিবাদকে ভাষা দিয়াছেন গোবিন্দমাণিক্য। নাটকটির প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত চিরাচরিত প্রথার সঙ্গে এই সংগ্রাম সর্বত্র মুখর হইয়া আছে। জয়-পরাজয়ের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত তাহার বিরাম নাই।[১]" বিসর্জনের মধ্যে বিচিত্র চরিত্রের দ্বন্দ্বচিত্র এমনভাবে ফুটিয়াছে যাহা ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে প্রকাশ পায় নাই। গোবিন্দমাণিক্য আদর্শবাদী; আদর্শরক্ষার জন্য সে সর্বস্ব ত্যাগ করিল। তাহার সংগ্রাম অন্তরে ও বাহিরে, গৃহে ও রাজসভায়। বাহির হইতে দেখিলে রাজার জীবন একটা প্রকাণ্ড ট্রাজেডি; কিন্তু নির্মল সত্যের জ্যোতি তাঁহার অন্তরকে এমনি স্বর্গীয় আভায় উজ্জ্বল,

১ রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা ১ম সং পৃ ৩১৫।

এমনি শক্তিশালী করিয়াছে যে বাহিরের দ্বন্দ্ব কঠিন বেদনাময় হইলেও তিনি তাহার উপর জয়ী হইয়াছেন। রাজার সর্বাপেক্ষা বড়ো সংগ্রাম রানীর সহিত; এইখানে 'রাজা ও রানী'র সহিত মেলে এবং মেলে না ও বটে। সুমিত্রা ও গুণবতী দুইটি পৃথক আইডিয়ার বাহন; সুমিত্রা রানীর মর্যাদা রক্ষার জন্য, রাজ্যশ্রীর সম্মানের জন্য আত্মত্যাগ করিল; গুণবতী নারীর অন্ধ instinctকে চরিতার্থ করিবার জন্য প্রলয়ংকরী মূর্তি ধারণ করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। গোবিন্দ-ম্যাণক্য ও গুণবতীর প্রেম গভীর; অথচ যে অহিংসাকে রাজা সত্যধর্ম বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহার জন্য রানীর প্রেম তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই, সেখানে সে অচল অটল; বা অসত্যের সহিত কোনো প্রকার আপোশ দরকষাকষি করিতে নারাজ। রানীর সংস্কারমূলক ধর্মবোধ প্রেমের মর্যাদা রাখে নাই, কারণ মিথ্যা ধর্মবোধ মানুষকে অসত্যের পথে, অন্যায়ের মধ্যে টানে। সেইজন্যই রানী শিশু ধ্রুবকে দেবীর সম্মুখে বলিদান দিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। ধর্মান্ধতা সত্যের আলোক দেখিতে পায় না। সংসার-জীবনে রানী গুণবতীর প্রেমের কোনো পরীক্ষা হয় নাই; সত্যের সঙ্গে মতের, ধর্মের সঙ্গে সংস্কারের যখন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল, তখনই রানীর প্রেমের মধ্যে যে স্বার্থান্ধতা ছিল, তাহা আত্মপ্রকাশ করিল। কিন্তু রানীর এত বিরুদ্ধতার মধ্যে রাজার মনে তিলমাত্র ক্ষোভ জাগে নাই, কারণ যথার্থ প্রেম সর্বসহা, তাহা ব্যথা পায়, ব্যথা দেয় না,— দেহের অতীতে তাহার ধ্যানযোগ, সংস্কারের বাহিরে তাহার সম্ভোগ।

জয়সিংহ ও অপর্ণার প্রেমের মধ্যেও বিরোধ; জয়সিংহ সংস্কার-আবদ্ধ, ধর্মান্ধ। কঠোর গুরুর নিকট আনুষ্ঠানিক ধর্মকে অভ্যাস করিয়াছিল। আর অপর্ণা ভিখারিনী; কোনোপ্রকার সংস্কার তাহার চিরচলমান জীবনকে বাঁধিতে পারে নাই। সে তাহার বালিকা-হৃদয় দিয়া, তাহার নারীসুলভ স্বাভাবিক প্রেরণা হইতে জয়সিংহকে ভালোবাসে। জয়সিংহ কঠোর কর্তব্যবোধ ও আনুষ্ঠানিক ধর্মভাব হইতে সেই প্রেমকে কিছুতে নিজস্ব করিতে পারিতেছে না; যাহা নিত্য প্রেম তাহাকে সে অন্তরে পাইয়াছে। কিন্তু পিতৃস্নেহের ঋণশোধের জন্য সে সেই প্রেমকে দলিত করিল, নিজেকেও সেইসঙ্গে বিসর্জন দিল। জয়সিংহের প্রেম এত গভীর, এমনি নিষ্ঠুর সংযমের দ্বারা তাহা অবরুদ্ধ যে উহা পাঠককে পীড়িত করে। এই নিষ্ঠুর সংযম— যাহা প্রায় অস্বাভাবিকত্বের কোঠায় গিয়া পড়ে, তাহা কবির বহু গল্প উপন্যাসের মধ্যে বারে বারে দেখা দিয়াছে।

বিসর্জনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিপুল সৃষ্টিশক্তির পরিচয় পাই। যথার্থ প্রতিভাবান লেখক নিজ রচিত নাট্যে বা উপন্যাসে তাঁহার নায়ককে যেমন বড়ো করেন নানা দিক হইতে, তেমনি বড়ো করিয়া সৃষ্টি করেন নায়কের প্রতিপক্ষকে। প্যারাডাইস লস্‌টের শয়তান ও বিয়ালজিবাব ঈশ্বরের উপযুক্ত প্রতিপক্ষ। প্রতিপক্ষকে দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করিয়া লেখকরা নিজেদেরই দুর্বলতা প্রকাশ করেন; প্রতিপক্ষ যুক্তিতে শক্তিতে যত বড়ো হইবে, সংগ্রাম যতই তীব্র ও তীক্ষ্ণ হইবে,— নায়ক ততই মহান্ হইবে। রবীন্দ্রনাথ গোবিন্দমাণিক্যের প্রেমের ধৈর্যের সত্যের প্রতি অচলা নিষ্ঠার মাহাত্ম্য স্বীকার করেন, তাঁহার মতকে বিশ্বাস করেন অথবা বলিতে পারি তাঁহার অন্তরের আদর্শে রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া বিসর্জনের অন্যতম নায়ক রঘুপতিকে দুর্বল করিয়া গড়েন নাই। রঘুপতি জটিল মানবমনের একটি অপরূপ সৃষ্টি।

মন্ত্রী অভিষেক

বিসর্জনের প্রকাশ ও মুদ্রণ লইয়া মন বেশ মশগুল, হঠাৎ কোথা হইতে রাষ্ট্রনীতির কালবৈশাখী আসিয়া তাঁহার কাব্য, গান, রসরচনাকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিল। আবার দমকা চলিয়া গেলে আকাশ তেমনি শুভ্র, তেমনি শান্ত। এই উত্তেজনার মুহূর্তে লেখেন 'মন্ত্রী অভিষেক'[১]। সেটি পাঠ করেন কলিকাতার এমারেল্ড থিয়েটারে। কী রাষ্ট্রনৈতিক কারণসমূহ রবীন্দ্রনাথকে এই বক্তৃতা পাঠ করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা ১৮৬১ সালে গঠিত হইয়াছিল, তারপর ত্রিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে রাষ্ট্রকাঠামোতে কোনো পরিবর্তন হয় নাই। এতকাল পরে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যবস্থাপক সভাকে বৃহত্তর ও কথঞ্চিৎ প্রতিনিধিমূলক করিবার শুভসংকল্প প্রকাশ করিলেন। সেযুগে সদস্যেরা সরকার কর্তৃক মনোনীত হইতেন, প্রতিনিধিমূলক নির্বাচনের কথা কেহ কল্পনাতে আনিতেন না। এ ছাড়া ভারতীয়দিগকে রাজকার্যে অধিকতর নিযুক্ত করা যায় কি না, তদ্‌বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য কয়েক বৎসর পূর্বে পাবলিক সার্বিস কমিশন (১৮৮৬ অক্টোবর) বসিয়াছিল। পাবলিক সার্বিস কমিশনের সভাপতি হন স্যর চার্লস এটকিনসন্। ভারতীয়দিগকে অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ উচ্চতর রাজকর্মে নিয়োগ করা যায় কিনা তাহাও ছিল কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য। ১৮৮৮ জানুয়ারি মাসে উক্ত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন ও অক্টোবর মাসে তদুপরি ভারত গবর্নমেণ্টের মন্তব্যলিপি প্রকাশিত হইল। এইসব প্রতিবেদন ও মন্তব্যের উপর ভারতসচিবের মহামূল্য মতামত বাহির হইল পর-বৎসরে (১৮৮৯ সেপ্টে)। আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি, তখন ভারত-সচিব ছিলেন লর্ড ক্রস[২] (১৮৮৬-৯১)। লর্ড ক্রস ছিলেন বিলাতের প্রতিক্রিয়াপন্থী দলের লোক; ভারতীয়দের পক্ষে রাজপদে প্রবেশের ও উচ্চতর পদে উন্নীত হইবার পরিপন্থী বহু নিয়ম নিষেধ অত্যন্ত চাতুরীর সহিত তিনি সৃষ্টি করেন। তখন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যাকে একত্রে বলা হইত বঙ্গদেশ; এই দেশের ছয়টি জেলার জজের পদ ও চারিটি জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের পদ প্রভিন্সিয়াল সার্বিসের যোগ্যতম দেশীয় ব্যক্তিদের জন্য খোলা ছিল। উচ্চপদস্থ ভারতীয় রাজকর্মচারীদের হস্তে যথার্থ দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য সমর্পণ করা বৃটিশ রাজনীতির যে অভিপ্রেত নহে, তাহা এই তদন্ত বৈঠকের প্রতিবেদনে ঢাকিয়া রাখা যায় নাই।

'মন্ত্রী অভিষেক' লর্ড ক্রসের মন্তব্যলিপির প্রতিবাদে রচিত প্রবন্ধ। এছাড়াও এই সময়ে (১৮৯০) কথা ওঠে যে বড়লাটের "মন্ত্রীসভায় (Executive Council) আরো গুটিকতক ভারতবর্ষীয় লোক নিযুক্ত করা যাইতে পারে। এখন কথাটা দাঁড়াইতেছে, নির্বাচন কে করিবে? গবর্ণমেণ্ট করিবেন, না আমরা করিব?" রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বলিতে চাহিয়াছিলেন "গবর্ণমেণ্টের দ্বারা মন্ত্রিনিয়োগ অপেক্ষা সাধারণ লোকের দ্বারা মন্ত্রিঅভিষেক অনেক কারণে আমাদের নিকট প্রার্থনীয় মনে হয়।' "মীমাংসা করিবার পূর্বে সহজ বুদ্ধিতে এই প্রশ্ন উদয় হয়, কাহার সুবিধার জন্য এই নির্বাচনের আবশ্যক হইয়াছে? আমাদেরই সুবিধার জন্য।" "অতএব সকলেই বলিবেন ভারত শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতবর্ষেরই উন্নতি। আমাদেরই সুবিধা, আমাদেরই কাজ। সেই আমাদের কাজের জন্য আমাদের লোকের সাহায্য প্রার্থনীয় হইয়াছে। সহজেই মনে হয় আমরা বাছিয়া দিলে কাজটাও ভাল হইবে. আমাদের মনেরও সন্তোষ হইবে।" কিন্তু আজও যেমন তখনও তেমন অবস্থা— বদল হইয়াছে নামকরণে। ইংরেজ পত্রিকাওয়ালারা 'অতিরিক্ত বুদ্ধিপ্রভাবে বলিতে লাগিলেন যে ভারতবর্ষীয়েরা প্রাচ্যজাতীয় অতএব তাহাদের হস্তে মন্ত্রিঅভিষেকের ভার দিলে তাহারা নিজেরাই অসন্তুষ্ট হইবে।'

১ ১২৯৭ জ্যৈষ্ঠ ২ [১৮৯০ মে ১৫] পঠিত। দ্র. ভারতী, ১২৯৭ বৈশাখ। রবীন্দ্র-রচনাবলী অচ ২য়।

২ Sir Richard Assheton Cross (1823-1914) পার্লামেণ্টের নির্বাচনে গ্লাডস্টোনকে ১৮৬৮ সালে পরাজিত করেন। ১৮৭৪এ ডিসরেলির মন্ত্রী-মণ্ডলে হোম্ সেক্রেটারি। ১৮৮৬ হইতে ১৮৯১ পর্যন্ত ভারতসচিব। তখন প্রধান, মন্ত্রী লর্ড সেলিসবেরি (১৮৮৬-১৮৯২)।

তাঁহারা আরও বলেন 'যুদ্ধপ্রিয় জাতিরা এই মন্ত্রিঅভিষেক প্রথায় ক্ষুব্ধ হইবেন।' ইংরেজ সম্পাদকদের এই অদ্ভুত উক্তির দীর্ঘ সমালোচনা এই প্রবন্ধে আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "পূর্ব এবং পশ্চিম যদিও বিপরীত দিক তথাপি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য মানবপ্রকৃতি সম্পূর্ণ বিরোধী ধর্মাবলম্বী নহে।...আমাদের মানবপ্রকৃতির এতদূর পর্যন্ত বিকার হয় নাই যে, তোমরা যখন মহৎ অধিকার আমাদের হস্তে তুলিয়া দিবে তখন আমরা অসন্তুষ্ট হইব!

"আর কিছু না হউক তোমাদের নিকটে আমাদের বেদনা, আমাদের অভাব জানাইবার অধিকার আমাদের হস্তে সমর্পণ করিলে অধিকতর সুখ-সম্ভোগের কারণ হইবে এটুকু আমরা পূর্বদিকে বাস করিয়াও এক রকম বুঝিতে পারি। অপেক্ষাকৃত পশ্চিমবাসী যোদ্ধৃজাতীয়দের মানসিক প্রকৃতি যে এ বিষয়ে আমাদের হইতে কিছুমাত্র পৃথক্ তাহাও মনে করিতে পারি না। অতএব দুঃখনিবেদনের স্বাধীন অধিকার পাইলে ভারতবর্ষ যে অসন্তুষ্ট হইবে ইংলণ্ডবাসী ভারত-হিতৈষীগণকে এরূপ গুরুতর দুশ্চিন্তা হইতে ক্ষান্ত থাকিতে অনুরোধ করিতে পারি।"

রবীন্দ্রনাথ এই বক্তৃতায় ইংরেজদিগের শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়দের বহু উপকারের কথা বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। রাজকার্যে আমাদের যোগ্যতা প্রদর্শনের অবসর ইংরেজ দিয়াছে, রাজশক্তির নিকট প্রার্থনা করিবার উপায়মাত্র যখন জানিতাম না, তখনও ইংরেজ স্বেচ্ছায় আমাদের উন্নত-অধিকারের ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছিলেন। তাহারা ইচ্ছাপূর্বক আমাদিগকে বৃহৎ অধিকার দিতে স্বীকার করিয়াছে এবং কিছু কিছু দিয়াছে। "কিন্তু তোমাদের প্রতিজ্ঞাপত্রের আশ্বাস-অনুসারিণী অধিকারপ্রার্থনাকে তোমরা রাজভক্তির অভাব বলিয়া অত্যন্ত উষ্ণতা প্রকাশ কর।" রবীন্দ্রনাথ বলিলেন যে যখনই ভারতীয়রা ইংরেজদের নিকট হইতে অধিকার প্রত্যাশা করে, তখনি ইংরেজের মহৎ মনুষ্যত্বের প্রতি আমাদের গভীর আন্তরিক ভক্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে! মোট কথা সমস্ত বক্তৃতাটি ইংরেজকে সম্মুখে রাখিয়াই কথা বলা; অর্থাৎ কন্‌গ্রেসের প্রথম যুগের রাজনীতিক আদর্শ-অনুযায়ী মত এই বক্তৃতায় ব্যক্ত হইয়াছিল। ভারতের অভাব অভিযোগ ইংরেজকে বুঝাইবার দিকেই রাষ্ট্রনীতির সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইত। "ইংরেজেরই মহৎ উজ্জ্বল অপূর্ব নিঃস্বার্থ প্রীতি কন্‌গ্রেসের মর্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়া তাহাকে অলৌকিক বলে বলীয়ান করিয়াছে।" এই ছিল তখনকার রাজনীতিকদের বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ পুনরায় বলিতেছেন, "তোমাদের প্রতি ভক্তি আছে বলিয়াই কথা কহি, নহিলে নীরব হইয়া থাকিতাম।"... "এই বক্তৃতায় কন্‌গ্রেসের তৎকালোচিত মনোভাব ও রবীন্দ্রনাথের কন্‌গ্রেস প্রীতির কথাই স্পষ্ট হইয়াছে; তিনি বলিলেন, 'কন্‌গ্রেসের বিরোধী পক্ষে যোগ দিতে পারিব না।'...[১]

এই প্রবন্ধ লিখিবার প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "যখন 'মন্ত্রী অভিষেক' লিখেছিলুম, তারপরে এখন কালের প্রকৃতি বদলে গেছে, তাই এ লেখাটি এখনকার মনের মাপে মিল্‌বে না। দুই কালের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে তখন রাজদ্বারে আমাদের ভিক্ষার দাবি ছিল অত্যন্ত সঙ্কুচিত। আমরা ছিলুম দাঁড়ের কাকাতুয়া, পাখা ঝাপটিয়ে চেঁচালুম পায়ের শিকল আরো ইঞ্চি কয়েক লম্বা করে দেবার জন্যে। আজ বল্‌ছি দাঁড়ও নয় শিকলও নয়— পাখা মেলব অবাধ স্বারাজ্যে। তখন সেই ইঞ্চি দুয়েকের মাপের দাবি নিয়েও রাজপুরুষের মাথা গরম হয়ে উঠত। আমি সেই চোখ রাঙানির জবাব দিয়েছিলুম গরম ভাষায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে এ ছিল আমার ওকালতি সেকালের পরিমিত ভিক্ষার প্রার্থীদের হয়ে।"[২]

১ ১২৯৭ পৌষ (১৮৯০ ডিসেম্বর) কলিকাতা কন্‌গ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে সভাপতি ফিরোজ শাহ মেহতা, রবীন্দ্রনাথ, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিদের যুক্ত ফোটো আছে।

২ পত্র। ১৯৪০ জানুয়ারি ৫। শনিবারের চিঠি ১৩৪৬ মাঘ পৃ ৪৭৫।

কিন্তু এই রাজনৈতিক উত্তেজনা, উচ্ছ্বাস কোথায় গেল? কয়েকদিনের মধ্যে কবিকে দেখি শান্তিনিকেতনে, একলা দোতলার বাড়িতে আছেন, সম্পূর্ণ পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিক, নূতন পটভূমে কল্পনাবিলাসী মনের নবতর বিচরণভূমি। বহুকাল পরে লিখিলেন কয়েকটি লিরিক্, 'ভালো করে বলে যাও' (৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭), মেঘদূত (৮ই), অহল্যার প্রতি (১২ই)।

শান্তিনিকেতনে এই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম গ্রীষ্মযাপন। জ্যৈষ্ঠ মাসেও কালবৈশাখীর ঝোড়ো খেলার শেষ হয় নাই, কবির নূতন অভিজ্ঞতা। তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লিখিতেছেন, "এখানে আজকাল ঝড়বৃষ্টি বাদলের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। এ জায়গাটা ঠিক ঝড়বৃষ্টির উপযুক্ত। সমস্ত আকাশময় মেঘ করে, অর্থাৎ সমস্ত আকাশটা দেখতে পাওয়া যায়, ঝড় সমস্ত মাঠটাকে আপনার হাতে পায়— বৃষ্টি মাঠের উপর দিয়ে চলে চলে আসে, দূরে থেকে বারেন্দায় দাঁড়িয়ে দেখা যায়। ··· ··· মাঠের মাঝখানে আমাদের বাড়ি— সুতরাং চতুর্দিকের ঝড় এরি উপরে এসে পড়ে ঘুরপাক খেতে থাকে;··· বহুকাল এরকম রীতিমতো ঝড় দেখিনি। এখানকার লাইব্রেরিতে একখানা মেঘদূত আছে; ঝড়বৃষ্টি-দুর্যোগে, রুদ্ধদ্বার গৃহপ্রান্তে তাকিয়া আশ্রয় করে দীর্ঘ অপরাহ্ণে সেইটি সুর করে করে পড়া গেছে— কেবল পড়া নয়— সেটার উপর ইনিয়ে বিনিয়ে বর্ষার উপযোগী একটা কবিতা লিখেও ফেলেছি।"···[১]

অন্ধকার রুদ্ধগৃহে একেলা বসিয়া
পড়িতেছি মেঘদূত ; ··
আজি অন্ধকার দিবা, বৃষ্টি ঝরঝর,
দুরন্ত পবন অতি, আক্রমণে তার
অরণ্য উদ্যতবাহু করে হাহাকার।
বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ে মেঘভার
খরতর বক্র হাসি শূন্যে বরষিয়া।

বোলপুর হইতে শিলাইদহ যান— কলিকাতায় বেশিদিন থাকেন নাই। ৩রা জুন (১৮৯০) শিলাইদহ হইতে প্রমথ চৌধুরীকে একখানি পত্রে তিনি জানাইতেছেন তিনি জর্মান ভাষায় মূল ফাউস্ট (Faust) পড়িতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু দুঃখ করিয়া লিখিতেছেন, "পড়ার মাঝে মাঝে মৌলবীর বক্তৃতা নায়েবের কৈফিয়ৎ প্রজাদের দরখাস্ত এসে পড়লে জর্মান ভাষা বুঝে ওঠা কিরকম ব্যাপার হয় তা তুমি সহজেই অনুমান করতে পারবে।" জমিদারিতে বাসকালে সাহিত্যিক কাজ করিবার জন্য তাঁহাকে ফুরসতের জন্য কী পরিমাণ সংগ্রাম করিতে হয়, তাহার একটু আভাস পাই আর একখানি পত্র হইতে। "ক্ষণিক অবসরে একরকম শ্রান্ত মুহ্যমান মস্তিষ্কে বিছানায় পড়ে পড়ে নিতান্ত অলসভাবে লিখে যাই।" পত্র হইতে জানিতে পারা যায় 'অনঙ্গ আশ্রম' নামে একটা কী লেখা লিখিবেন। নাম দেখিয়া বোঝা যায় না, সেটি 'চিত্রাঙ্গদা'রও খসড়া হইতে পারে, 'গোড়ায় গলদে'র আরম্ভ হইতে পারে ![২]

১ পত্র। প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত, ১৮৯০ মে ২৪ [১২৯৭ জ্যৈষ্ঠ ১১]। সবুজপত্র ১৩২৪ শ্রাবণ। চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড পৃ ১৩৮-৩৯। দ্র মানসী, মেঘদূত, ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ [১৮৯০ মে ২১] শান্তিনিকেতন।

২ চিঠিপত্র (৫) পৃ ১৩৬। শিলাইদা ২১ জুন, ১৮৯০ (১২৯৭ আষাঢ় ৮)।

বিলাতে দ্বিতীয়বার। মানসীর শেষ পালা

১২৯৭, শ্রাবণের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ সোলাপুরে সত্যেন্দ্রনাথের নিকট। সত্যেন্দ্রনাথ বিশেষ ছুটি লইয়া বিলাত যাইতেছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠিক করিলেন তাঁহার সঙ্গে তিনিও বিলাত যাইবেন। সোলাপুরে যে কয়দিন ছিলেন তিনটি কবিতা লেখেন— গোধূলি (১ ভাদ্র), উচ্ছৃঙ্খল (৫ই) ও আগন্তুক (৫ই)। শেষ কবিতা দুটি লিখিবার দুই দিনের মধ্যে বোম্বাই হইতে বিলাত যাত্রা করেন (১৮৯০ অগস্ট ২২)।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিতারাজির মধ্যে যে বিষাদ সুরের কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি, তাহার রেশ্ এখনো মিটে নাই; তাঁহার চঞ্চল মন কোথায়ও যেন তৃপ্তি পাইতেছে না। কিসের শ্রান্তি, কিসের ক্লান্তি, কিসের বিষাদ— বাহির হইতে আবিষ্কার করা যায় না। 'গোধূলি'তে কবি চাহিতেছেন 'আয়, নিদ্রা, আয় ঘনাইয়ে শ্রান্ত এই আঁখির পাতায়।'··· 'হৃদয়ের হত আশা যত অন্ধকারে কাঁদিয়া বেড়ায়। আয় শান্তি, আয় রে নির্বাণ আয় নিদ্রা, শ্রান্ত প্রাণে আয়।' এত হতাশ্বাস কেন। 'উচ্ছৃঙ্খল'-কবিতায় আকুলভাবে বলিতেছেন।

এ মুখের পানে চাহিয়া রয়েছ কেন গো অমন করে।
তুমি চিনিতে নারিবে, বুঝিতে নারিবে মোরে।···
কোথা হতে এত বেদনা বহিয়া এসেছে পরান মম
বিধাতার এক অর্থবিহীন প্রলাপবচন সম।···
জগৎ বেড়িয়া নিয়মের পাশ, অনিয়ম শুধু আমি।

বাসা বেঁধে আছে কাছে কাছে সবে
কত কাজ করে কত কলরবে,
চিরকাল ধ'রে দিবস চলিছে দিবসের অনুগামী,
শুধু আমি নিজবেগ সামালিতে নারি
ছুটেছি দিবস যামী!

এই কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য, ইহা যে কেবল কাব্য নহে, ইহা যে কবির অন্তরের কথা তাহা তাঁহার চঞ্চলগতি জীবনপ্রবাহের দিকে তাকাইলেই বুঝা যায়। 'আগন্তুক' কবিতার মধ্যেও সেই অভিমান, সেই অভিযোগ; ইহা 'উচ্ছৃঙ্খলে'র পরিপূরক কবিতা। একটিতে আছে

কোথাকার এই শৃঙ্খলছেঁড়া সৃষ্টিছাড়া এ ব্যথা
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, গাহিয়া গাহিয়া,
অজানা আঁধার সাগর বাহিয়া মিশায়ে যাইবে কোথা
এক রজনীর প্রহরের মাঝে ফুরাবে সকল কথা।

দ্বিতীয়টিতে আছে আগন্তুক

কি বলিতে গিয়ে বলিল না আর, দাঁড়ায়ে রহিল দ্বারে,
দীপালোক হাতে বাহিরিয়া গেল বাহির অন্ধকারে।
তারপরে কেহ জান কি তোমরা কী হইল তার শেষে।
কোন্ দেশ হতে এসে চলে গেল কোন্ গৃহহীন দেশে।

উভয় কবিতাই সোলাপুরে ৫ই ভাদ্র রচিত। দুইদিন পরে কবি 'অকূলসাগরমাঝে চলেছে ভাসিয়া'। সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন লোকেন পালিত। লোকেন পালিত রবীন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু, যৌবনের সুহৃৎ, সাহিত্যের রসজ্ঞ সমালোচক; কিন্তু চারিত্রজীবনে রবীন্দ্রনাথের বিপরীত লোকে ছিল তাঁহার বাস। বোম্বাই হইতে 'শ্যাম' (Siam) জাহাজে রওনা হইলেন (২২ অগস্ট ১৮৯০)। কবি ডায়ারিতে লিখিতেছেন, "তখন সূর্য অস্তপ্রায়। জাহাজের ছাদের উপর হালের কাছে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের তীরের দিকে চেয়ে রইলুম।· সন্ধ্যা রাত্রির দিকে এবং জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে ক্রমশই অগ্রসর হচ্চে।"

জাহাজে সী-সিকনেস প্রভৃতিতে যেভাবে কষ্ট পান, তাহার যে রসবর্ণনা 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'তে লিখিয়াছেন তাহা উপভোগ্য। সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ডায়ারিতে যাহাই লিখুন, মানুষ রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীকে যেটি লিখিতেছেন, সেইটি মনের কথা। সমুদ্র পীড়ার সময়ে বাড়ির কথা খুবই মনে হইতেছিল; স্ত্রীকে লিখিতেছেন, "রবিবার দিন রাত্রে আমার

ঠিক মনে হল আমার আত্মাটা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে জোড়াসাঁকোয় গেছে। .. যখন ব্যামো নিয়ে পড়েছিলুম তোমরা আমাকে মনে করতে কি! তোমাদের কাছে ফেরবার জন্যে ভারি মন ছট্‌ফট্‌ করত। আজকাল কেবল মনে হয় বাড়ির মত এমন জায়গা আর নেই— এবার বাড়ি ফিরে গিয়ে আর কোথাও নড়ব না।" দেশ হইতে বাহির হইবার জন্য যেমন ব্যস্ততা, বাহির হইয়াই ঘরে ফিরিবার জন্য তেমনি ব্যাকুলতা।

এডেনে পৌছাইলেন। "জ্যোৎস্না রাত্রি।··· নিস্তরঙ্গ সমুদ্র এবং জ্যোৎস্নাবিমুগ্ধ পর্বতবেষ্টিত তটচিত্র আমাদের আলস্য বিজড়িত অর্ধনিমিলিত নেত্রে স্বপ্ন মরীচিকার মতো লাগচে।" "এমন সময়ে শোনা গেল এখনি নূতন জাহাজে চড়তে হবে। সে জাহাজ আজ রাত্রেই ছাড়বে। তাড়াতাড়ি ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশপূর্বক স্তূপাকার বিক্ষিপ্ত জিনিসপত্র যেমন তেমন করে চর্মপেটকের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তার উপরে তিন চার জনে দাঁড়িয়ে নির্দয়ভাবে নৃত্য করে বহু কষ্টে চাবি বন্ধ করা গেল।" কল্পনায় দৃশ্যটি উপভোগ্য! অস্ট্রেলিয়ান যাত্রী-জাহাজ 'ম্যাসীলিয়া'তে সকলে গিয়া উঠিলেন। জাহাজখানি খুবই বড়ো এবং ভিড়ও বেশি। জাহাজের জনতা তাঁহাকে বিব্রত করে। তিনি একখানি পত্রে লিখিতেছেন— "নিচেকার ডেকে বিদ্যুতের প্রখর আলোক, আমোদপ্রমোদের উচ্ছ্বাস, মেলামেশার ধুম, গান-বাজনা এবং কখনো কখনো ঘূর্ণীনৃত্যের উৎকট উন্মত্ততা। এদিকে আকাশের পূর্বপ্রান্তে ধীরে ধীরে চন্দ্র উঠছে, তারাগুলি ক্রমে ম্লান হয়ে আসছে, সমুদ্র প্রশান্ত ও বাতাস মৃদু হয়ে এসেছে, ; অপার সমুদ্রতল থেকে অসীম নক্ষত্রলোক পর্যন্ত এক অখণ্ড নিস্তব্ধতা এক অনির্বচনীয় শান্তি নীরব উপাসনার মতো ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। আমার মনে হতে লাগল, যথার্থ সুখ কাকে বলে এরা ঠিক জানে না। সুখকে চাবকে চাবকে যতক্ষণ মত্ততার সীমায় না নিয়ে যেতে পারে ততক্ষণ এদের যথেষ্ট হয় না। প্রচণ্ড জীবন ওদের যেন অভিশাপের মতো নিশিদিন তাড়া করেছে; ওরা একটা মস্ত লোহার রেলগাড়ির মতো চোখ রাঙিয়ে, পৃথিবী কাঁপিয়ে, হাঁপিয়ে, ধুঁইয়ে, জ্বলে, ছুটে প্রকৃতির দুই ধারের সৌন্দর্যের মাঝখান দিয়ে হুস করে বেরিয়ে চলে যায়। কর্ম বলে একটা জিনিস আছে বটে কিন্তু তারই কাছে আমাদের মানব-জীবনের সমস্ত স্বাধীনতা বিকিয়ে দেবার জন্যেই আমরা জন্মগ্রহণ করিনি— সৌন্দর্য আছে, আমাদের অন্তঃকরণ আছে, সে দুটো খুব উঁচু জিনিস।"[১]

জাহাজখানি য়ুরোপের মধ্যধরণী সাগরে প্রবেশ করিয়া আইওনিয়া দ্বীপাবলির ভিতর দিয়া গেল। ব্রিন্দিসিতে নামিয়া পূর্ববারের ন্যায়ই ইতালির মধ্য দিয়া চলিয়াছেন। বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ও বিবিধ অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে করিতে অবশেষে প্যারিসে পৌছাইলেন। প্যারিসে একদিন থাকা হয়, ইহারই মধ্যে সদ্যনির্মিত (১৮৮৯) বিখ্যাত ঈফেল তোরণের উপর উঠিয়া (৯৮৪ ফুট) মহানগরীর উপর চোখ বুলাইয়া লইবার অবকাশ করিয়া লইলেন।

লন্ডনে পৌছাইয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কৈশোরের পরিচিত লন্ডনকে খুঁজিতে গেলেন। এ যেন 'খুঁজিতে গেছিনু কবে··· মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে' পূর্বে যে বাড়িতে স্কট পরিবার থাকিত, বোধ হয় সেই বাড়িতে যান, কিন্তু সে বাড়িতে তখন অন্য ভাড়াটিয়ারা থাকে। মনে কল্পনা উদয় হইল, "মৃত্যুর বহুকাল পরে আবার যেন পৃথিবীতে ফিরে এসেচি।··· আমি মনে করেছিলুম কেবল আমিই চলে গিয়েছিলুম, পৃথিবী-শুদ্ধ আর সবাই আছে! আমি চ'লে যাওয়ার পরেও সকলেই আপন আপন সময় অনুসারে চলে গেচে। তবে তো সেই সমস্ত জানা লোকেরা আর কেহ কারো ঠিকানা খুঁজে পাবে না! জগতের কোথাও তাদের আর নির্দিষ্ট মিলনের জায়গা রইল না!··· একবার ইচ্ছে হল, অন্তঃপুরের সেই বাগানটা দেখে আসি; আমার সেই গাছগুলো কত বড় হয়েচে। আর সেই ছাতের উপরকার দক্ষিণমুখো কুঠরি, আর সেই ঘর এবং সেই আর একটা ঘর।··· পুরাতনের স্মৃতি কল্পনার রঙে রঙিন হইয়া তাঁহার অন্তরে বাস করিতেছিল; কিন্তু বাহিরের জগতে

১ জীবনস্মৃতি ১৩৫১ সং। গ্রন্থপরিচয় পৃ ২০৩.

আজ যেমন পরিবর্তন অন্তরের জগতেও পরিবর্তন কম হয় নাই; কবি সেই দীর্ঘ বারো বৎসরের ব্যবধানকে বিস্মৃত হইয়া তাঁহার প্রথম যৌবনের রঙিন জীবনকে খুঁজিতেছিলেন! কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবি, আর্টিস্ট; তিনি জীবনকে দেখেন সৌন্দর্যের চোখে, নীতির শুষ্কতার মধ্যে নহে। তাই তাঁহাকে একদিন ডায়ারিতে লিখিতে দেখি "এখানে রাস্তায় বেরিয়ে সুখ আছে। সুন্দর মুখ চোখে পড়বেই।... ইংরাজ মেয়ে সুন্দরী বটে। শুভানুধ্যায়ীরা শঙ্কিত এবং চিন্তিত হবেন এবং প্রিয় বয়স্যেরা পরিহাস করবেন। কিন্তু এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে সুন্দর মুখ আমার সুন্দর লাগে। তাই যদি না লাগতো বিধাতার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হত। সুন্দর হওয়া এবং মিষ্ট করে হাসা মানুষের একটি পরমাশ্চর্য ক্ষমতা। আমার ভাগ্যক্রমে ঐ হাসিটা এদেশে এসে কিছু বাহুল্য পরিমাণে পেয়ে থাকি।" ইহার কারণ ছিল; রবীন্দ্রনাথ এবার যখন বিলাতে যান ইংরেজি-পোশাক পরেন নাই, অর্থাৎ কলার নেকটাই, টুপি ব্যবহার করেন নাই। গলাবন্ধ কোট ও মাথায় পিরালি টুপি পরিতেন। ইহার উপর ছিল সামান্য লম্বা চুল ও অল্প অল্প দাড়ি। সমস্তটা মিলিয়া লন্ডনবাসী আধুনিকাদের কাছে একটা অদ্ভুত মনে হইত; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনো দিন তাহার নিজস্ব পোশাক ত্যাগ করিয়া বিলাতী পোশাক পরেন নাই।

প্রবাসের সময় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লিখিতেছেন, (৬ অক্টোবর ১৮৯০) "আমি আর এখানে পেরে উঠ্‌চিনে।...আমার এখানে ভালো লাগচে না। অতএব স্থির করেচি এখন বাড়ি ফিরব।" "এখন আমি বাড়ি যেতে পারলে বাঁচি। সেখানে আমি সকলকে চিনি, সকলকে বুঝি; সেখানে সমস্ত বাহ্যাবরণ ভেদ করে মনুষ্যত্বের আস্বাদ সহজে পাই।"

৭ই অক্টোবর 'টেমস্' জাহাজে ফিরিবার জন্য ক্যাবিন্ ঠিক করিলেন, ৯ই রওনা হইলেন। এই দিনই একখানি পত্রে ইন্দিরা দেবীকে যাহা লিখিতেছেন, তাহা নিজের এই খামখেয়ালির সমর্থন মাত্র। "মানুষ কি লোহার কল, যে ঠিক নিয়ম অনুসারে চলবে? মানুষের মন এত বিচিত্র এবং বিস্তৃত কাণ্ড কারখানা, তার এতদিকে গতি এবং এত রকমের অধিকার যে এদিকে ওদিকে হেলতেই হবে। সেই তার জীবনের লক্ষণ, তার মনুষ্যত্বের চিহ্ন, তার জড়ত্বের প্রতিবাদ। এই দ্বিধা, এই দুর্বলতা যার নেই তার মন নিতান্ত সঙ্কীর্ণ এবং কঠিন এবং জীবনবিহীন। যাকে আমরা প্রবৃত্তি বলি এবং যার প্রতি আমরা সর্বদাই কটুভাষা প্রয়োগ করি সেই তো আমাদের জীবনের গতিশক্তি— সেই আমাদের নানা সুখ দুঃখ পাপ পুণ্যের মধ্যে দিয়ে অনন্তের দিকে বিকশিত ক'রে তুলচে।"... (ছিন্নপত্র। লণ্ডন। ১০ই অক্টোবর ১৮৯০)

অকস্মাৎ ফিরিয়া আসিবার কারণও যাহা, অকস্মাৎ বিলাত যাইবার কারণও তাহাই; সেটি হইতেছে নিজ মনের অস্থির চঞ্চলতা। দেশ হইতে বাহির হইবার সময় মনে হইয়াছিল দূরে,-সুদূরে,— বহুদূরে যাইতে পারিলেই বুঝি মনে শান্তি আসিবে! কিন্তু বহুদূরও নিকটে আসে, ভবিষ্যতও বর্তমানে উপনীত হয়; বাস্তবের রূঢ় আঘাতে স্বপ্নলোক ভাঙিয়া যায়। বিলাত যাত্রা সেই উদ্দেশ্যহীন, আশাহীন, কর্মহীন জীবনের একটি উপসর্গ মাত্র।

ফিরিবার সময় মালটাদ্বীপ ও তথাকার বিখ্যাত Catacombগুলি দেখিলেন। লন্ডনে জাহাজে চড়িবার একমাস পরে বোম্বাই পৌঁছাইয়া দুই দিন পরে কলিকাতায় ফিরিলেন। রবীন্দ্রনাথ ২২ অগস্ট বোম্বাই হইতে যাত্রা করেন; ১০ সেপ্টেম্বর লন্ডন পৌঁছান; ৯ অক্টোবর লন্ডন ছাড়েন ও ৩ নভেম্বর রাত্রে বোম্বাই-এ জাহাজ পৌঁছায়।

বিলাত বাসকালে 'বিদায়' নামে একটি মাত্র কবিতা লেখেন; তবে ফিরিবার সময় রেড সীতে চারিটি কবিতা রচনা করেন,— সন্ধ্যায় (৭ কার্তিক ১২৯৭) শেষ উপহার (৯ কার্তিক), মৌনভাষা (১০ কার্তিক),

আমার সুখ (১১ কার্তিক) ইহার মধ্যে 'শেষ উপহার' কবিতাটি লোকেন পালিতের কোনো ইংরেজি কবিতার ভাবানুবাদ।

মানসী কাব্যগুচ্ছের এই কয়টিই শেষ কবিতা। সকল কবিতার মধ্যে সেই একই বেদনা, সেই একই অভিযোগ যে তিনি নিঃসঙ্গ, তিনি ভরা মনে দিতে চান, নিতে কেহ নাই। কবি কাহার উদ্দেশ্যে 'আমার সুখ' কবিতায় বলিতেছেন,—

দেখিতে পাও নি যদি দেখিতে পাবে না আর, মিছে মরি ব'কে।
আমি যা পেয়েছি, তাই সাথে নিয়ে ভেসে যাই, কোনোখানে সীমা নাই ও মধুমুখের।
শুধু স্বপ্ন, শুধু স্মৃতি, তাই নিয়ে থাকি নিতি— আর আশা নাহি রাখি সুখের দুখের।
আমি যাহা দেখিয়াছি, আমি যাহা পাইয়াছি এ জনম-সই—
জীবনের সব শূন্য আমি যাহে ভরিয়াছি তোমার তা' কই!

বিলাত হইতে ফিরিবার অল্পকালের মধ্যেই 'মানসী' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইল (১২৯৭ পৌষ ১০)। মানসীর মধ্যে কবির চারি বৎসরের কবিতা সংগৃহীত। ১২৯৭ সালের গোড়ার দিকে বোধ হয় কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন এবং তজ্জন্য একটি 'উপহার' লেখেন (১২৯৭ বৈশাখ ৩০)। উপহারটি কাহার উদ্দেশে লিখিত তাহা জানা যায় না; অনুমানের আশ্রয় লইয়া বলিতে ইচ্ছা হয় এই 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের 'উপহার' কবিতাটি তাঁহার পত্নীর উদ্দেশে রচিত। রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবন যথার্থ মূর্তি লইতে আরম্ভ করে এই সময়ে। মানবী ও মানসীর মধ্যে প্রভেদ সামান্যই। বাহিরের দৈনন্দিন জীবনে যে-নারীকে পাওয়া যায়, তাহাকে দেখা যায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দিয়া; সংসারজীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে, তুচ্ছতায় এই প্রেমের জীবন ম্লান হইয়া যায়; প্রতিদিনের মানবী ক্রমে সাধারণ মানুষের কাছে হয় দানবী, না-হয় দেবী হয়। কিন্তু কবির কাছে সে হয় মানসী, নৈর্ব্যক্তিক নারীর পরিশুদ্ধ প্রেমে অভিসার সম্পূর্ণ হয়। 'মানসী' কবিতাগুচ্ছ মানবী প্রেমকে sublimate করিয়া প্রেমের নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। মানবীর ভালোবাসা মানসীর প্রেমে রূপান্তরিত হইয়াছে; তাই আমাদের মনে হয় এই কাব্যখানি কবি তাঁহার স্ত্রীকেই উপহার দেন।

সুখ দুঃখ গীতস্বর ফুটিতেছে নিরন্তর, ধ্বনি শুধু, সাথে নাই ভাষা;
বিচিত্র সে কলরোলে ব্যাকুল করিয়া তোলে জাগাইয়া বিচিত্র দুরাশা।
এ চিরজীবন তাই আর কিছু কাজ নাই রচি শুধু অসীমের সীমা;
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা।

'মানসী' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিকে আমরা বিশেষ কোনো যুগের বিশেষ মনোভাবাঙ্কিত রূপে পাই না; মোটা-মুটিভাবে বলা হয় ইহাদের মধ্যে একটা বিষাদমাখা নৈরাশ্য ফুটিয়াছে। গ্রন্থের আরম্ভ হয় ১২৯৪ এর বৈশাখে, ১২৯৭ এর বৈশাখে 'উপহার' লিখিয়া বইখানি ছাপাইবার ব্যবস্থা হয়, কিন্তু তখন ছাপানো হয় নাই। বিলাত হইতে ফিরিবার পর প্রকাশের ব্যবস্থা হইল; তখন ১২৯৭এর মধ্যে রচিত কবিতাগুলি সংযোজিত করিয়া দেওয়া হয়। এই দীর্ঘ সাড়ে তিন বৎসরের মধ্যে কবির জীবনের ও মনের ইতিহাস প্রভূত পরিবর্তিত হইয়াছিল। মনে হয় তজ্জন্যই এই কাব্যের মধ্যে বিচিত্র ছন্দ ও বিবিধ রসের সমাবেশ ঘটিয়াছে। সেইজন্য মোহিতচন্দ্র সেন 'কাব্যগ্রন্থে' (১৩১০) মানসীর কবিতাগুলিকে নানা ভাবানুসারে বিচ্ছিন্ন করিয়া সাজাইয়াছিলেন; অবশ্য কবির অনুমোদনেই তাহা সম্পন্ন হয়। মানসীর যুগের মধ্যে মায়ার খেলা, রাজা ও রানী এবং বিসর্জন রচিত হয়।

মানসী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে উহা-যে বাংলা সাহিত্যে একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য এ-কথা সর্ববাদীসম্মতরূপে

স্বীকৃত হইয়াছিল। এই কাব্যখানি যে কেবল রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনে নূতন পন্থার প্রবর্তক, তাহা নহে,—উহা সমসাময়িক বাংলা কাব্যের পক্ষেও রীতির দিক দিয়া নূতন আদর্শ স্থাপন করিল। এ-কথা নিশ্চিত যে বাংলাছন্দের নূতন মুক্তির পথ মানসীই সর্বপ্রথম বাঙালি কবিদের কাছে ধরিয়াছিল। তাঁহার রচনার এই পর্বেই যুক্ত অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়া ছন্দকে নূতন শক্তি দিতে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন। মানসীতে কবির ছন্দেরও নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করে।[১]

সে-যুগের কবিদের মধ্যে নামডাক ছিল অনেকেরই, যেমন দেবেন্দ্রনাথ সেন, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী, সরোজকুমারী দেবী, বনোয়ারিলাল গোস্বামী, গোবিন্দচন্দ্র দাস, অক্ষয়চন্দ্র বড়াল প্রভৃতি। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের নাম করিলাম না, কারণ তাঁহাদের স্থান সাহিত্যে সুনির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আজ বাঙালি এইসব কবিদের সম্বন্ধে প্রায় উদাসীন হইয়াছে। কিন্তু সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইতে কেহই সাহসী হন নাই। সমসাময়িকের চোখে রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যগুচ্ছ কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা গিরীন্দ্রমোহিনীর 'মানসী এবং রাজা ও রানী'- প্রবন্ধ পাঠেই বুঝা যায়। লেখিকা মানসী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "মানসী পাঠ করিতে করিতে চোখের সম্মুখে যে একখানি স্বপ্নরাজ্য ভাসিয়া আসে; ···ইহাতে যেন আধ-আলো আধ-ছায়া, আধ-স্বর্গ আধ-মর্ত্ত্য দেখিতেছি।" মানসী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে সমস্ত কবিতাগুলিকে একত্র দেখিতে পাইয়া উহাদের যথার্থ একটা রূপ ও সুর যেন কবিও দেখিতে পাইলেন; তাই এখন কবিতাগুলিকে সমালোচকের চোখে দেখিতেছেন।

এই সময়ে তাঁহার তরুণ বন্ধু প্রমথ চৌধুরী[২], তাঁহাকে এক পত্রে জানান যে মানসী কবিতাগুচ্ছের মধ্যে despair ও resignation-এর ভাবটাই প্রবল হইয়া ফুটিয়াছে। সেই পত্রের উত্তরে[৩] রবীন্দ্রনাথ যাহা লেখেন, তাহা মানসী'র একটি উৎকৃষ্ট সমালোচনা হিসাবে পঠনীয়। "মানসী সম্বন্ধে যে লিখেছ, যে তার মধ্যে একটা Despair এবং Resignation-এর ভাব প্রবল, সেই কথাটা আমি ভাবছিলুম। প্রতিদিনই আমি দেখতে পাচ্চি নিজের রচনা এবং নিজের মনসম্বন্ধে সমালোচনা করা ভারি কঠিন। আমি বের করতে চেষ্টা করছিলুম এই Despair এবং Resignation-এর মূল্যটা কোন্‌খানে। আমার চরিত্রের কোন্‌খানে সেই কেন্দ্রস্থল আছে যেখানে গিয়ে আমার সমস্তটার একটা পরিষ্কার মানে পাওয়া যায়। কড়ি ও কোমলের সমালোচনায় আশু যখন বলেছিলেন, জীবনের প্রতি দৃঢ় আসক্তিই আমার কবিত্বের মূলমন্ত্র, তখন হঠাৎ একবার মনে হয়েছিল হতেও পারে। আমার অনেকগুলো লেখা তাতে করে পরিস্ফুট হয় বটে। কিন্তু এখন আর তা মনে হয় না। এখন এক একবার মনে হয় আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চলচে। একটা আমাকে সর্বদা বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করচে, আর একটা আমাকে কিছুতে বিশ্রাম করতে দিচ্চে না। আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করচে— সেইজন্যে একদিকে বেদনা আর একদিকে বৈরাগ্য। একদিকে কবিতা আর একদিকে ফিলজাফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালবাসা আর একদিকে দেশ-

১ দ্র কবিলিখিত মানসীর ভূমিকা। ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে দু-চারটি কথা, পরিচয় ১৩৪২ শ্রাবণ। আবদুল কাদের, বাংলা ছন্দ ও ভারতচন্দ্র, দেশ ৯ম বর্ষ ১৩৪৮, ২৮ চৈত্র পৃ ৪১৭-৯।

২ প্রমথ চৌধুরী হইতেছেন আশুতোষ চৌধুরীর ভ্রাতা। আশুতোষের সহিত যখন ঠাকুরবাড়ির বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় (১৮৮৬) তখন প্রমথনাথ কলেজের ছাত্র। রবীন্দ্রনাথের সহিত বাক্যালাপের সাহস ও শক্তি তখন হয় নাই। ১৮৯০ সালে তিনি এম. এ. পাশ করেন, তাহার পূর্ব হইতে রবীন্দ্রনাথের সহিত পত্র ব্যবহার আরম্ভ হয়; কলিকাতায় আসিলেই উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ হইত। মোট কথা রবীন্দ্রনাথ এই তরুণ যুবকের মধ্যে সাহিত্যের প্রতিভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং প্রমথবাবুর সমালোচনা শক্তিকে তখন হইতে শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করেন। সুতরাং সদ্যপ্রকাশিত 'মানসী' কাব্যখণ্ড সম্বন্ধে আলোচনা পত্র পাইয়া কবি তাহার যথাযথ উত্তর দান করিলেন। এই পত্রে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

৩ সবুজপত্র ৫ম বর্ষ ১৩২৫ জ্যৈষ্ঠ। চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড ১৮৯১ জানুয়ারি ২৯ (১২৯৭ মাঘ ১৭)।

হিতৈষিতার প্রতি উপহাস। একদিকে কর্মের প্রতি আসক্তি আর একদিকে চিন্তার প্রতি আকর্ষণ। এইজন্যে সবশুদ্ধ জড়িয়ে একটা নিষ্ফলতা এবং ঔদাস্য। এটা তোমার কি রকম মনে হয়? তুমি কি ভাবে দেখো সেটা আমাকে একটু পরিষ্কার করে লিখো— তোমাদের দ্বারা আমার নিজেকে objectively দেখতে ইচ্ছে করে। নিজের মধ্যে নিজেকে দেখতে চেষ্টা করা দুরাশা— কারণ আমার প্রতি-মুহূর্তই আমার নিজের কাছে এমনি জীবন্ত এবং বলবান, যে, মোটের উপরে আমি যে কি তা দেখতে পাইনে। কখনো আশা কখনো নৈরাশ্য কখনো গর্ব কখনো গ্লানি অনুভব করি কিন্তু নিজের ঠিক পরিমাণটা পাইনে। আমি যখন আমার কাব্য সমালোচনা করতে চেষ্টা করি তখন বর্তমান মুহূর্তটাই ক্রিটিক হয়ে বসেন— কিন্তু তার কথা কিছুমাত্র বিশ্বাসযোগ্য নয়, তোমরা যখন সমালোচনা কর তখন আমার পূর্বের সঙ্গে পর এবং একটার সঙ্গে আরেকটা মিলিয়ে দেখতে পার।" আর একখানি পত্রে লিখিলেন 'ভালো করে ভেবে দেখতে গেলে মানসীর ভালোবাসার অংশটুকু কাব্য-কথা— বড় রকমের সুন্দর রকমের খেলামাত্র— ওর আসল সত্যি কথাটুকু হচ্ছে এই যে মানুষ কি চায় তা কিছু জানে না।··· মানুষের মনে ঈশ্বরের মতো অসীম আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু ঈশ্বরের মতো অসীম ক্ষমতা নেই।···তাই আকাঙ্ক্ষার রাজ্যে বসেই অর্ধ-নিরাশ্বাসভাবে কল্পনা পুত্তলী গড়িয়ে তাকে পুজো করচে। একেই বল ভালোবাসা? আমার ভালোবাসার লোক কই? আমি ভালোবাসি অনেককে— কিন্তু মানসীতে যাকে খাড়া করেছি সে মানসেই আছে, সে artistএর হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা। ক্রমে সম্পূর্ণ হবে কি?"

এই বৎসর গল্পরচনা খুব কমই চোখে পড়ে। যা-কিছু লেখেন তা সব ছাপাও হয় নাই। য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি ১২৯৮ এ সাধনায় প্রকাশিত হয়। পারিবারিক স্মৃতিপুস্তকে[১] যে-গুটিচার লেখা চোখে পড়ে, সেগুলি ভাঙিয়া চুরিয়া পরে "পঞ্চভূত" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন।

'হিতবাদী' ও পরে

বোধ হয় ১২৯৭ সনের চৈত্র মাসের কোনো সময়ে রবীন্দ্রনাথ জমিদারি হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন। তখন সাহিত্যিক মহলে 'হিতবাদী' নামে এক সাপ্তাহিক প্রকাশের জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। আমরা যে-যুগের কথা বলিতেছি, তখন উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক ছিল 'বঙ্গবাসী' ও 'সঞ্জীবনী'। প্রথমখানি সনাতনীদের কাগজ, বাংলার হিন্দু গোঁড়ামির প্রশ্রয়দাতা ও প্রচারক,—যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু কর্তৃক তাহা সম্পাদিত। দ্বিতীয়খানি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম যুবকনেতা কৃষ্ণকুমার মিত্রের কাগজ,— যাহা-কিছু পুরাতন তাহাকেই উহা ভাঙিবার জন্য উদ্যত। মোটকথা উভয় কাগজেই সর্ববিষয়ে আতিশয্য প্রকাশ পাইত। বাংলাদেশে যথার্থ সাহিত্যিক সাপ্তাহিক ছিল না; সেই অভাব মোচন করিবার জন্য 'হিতবাদী' প্রকাশিত হয়; উদ্‌যোগীরা কেবল সংবাদসাহিত্য প্রকাশ করিবেন না, তাঁহারা সংবাদ ও সাহিত্য সরবরাহ করিবেন।

১৮৯১ সালের গোড়ার দিকে 'হিতবাদী' প্রচারের জন্য একটি যৌথ কারবার গঠিত হয়। নবীনচন্দ্র বড়াল, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ৫০০৲ টাকা করিয়া দেন; ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল দত্ত,

১ পারিবারিক স্মৃতিলিপির যে কয়টি রচনা এই সময়ের, তাহার তালিকা:— ১ "কাব্যের আসল জিনিষ···" [দীর্ঘ প্রবন্ধ]—বির্জিতলাও। ১২ জানুয়ারি ১৮৯১ [২৯ পৌষ ১২৯৭] ২ "National Selectionএর নিয়ম···"—বির্জিতলাও। ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১ [১৪ ফাল্গুন ১২৯৭] ৩ "ঘানির বলদ যদি মনে করে···"—বির্জিতলাও। ৬ এপ্রিল ১৮৯১ [২৪ চৈত্র ১২৯৭] ৪ "মানুষকে দেখলে আমার অনেক সময় মনে হয়"— ৬ এপ্রিল ১৮৯১। দ্র পারিবারিক স্মৃতিলিপি, আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৫২, পৃ. ৯-১৬। শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত।

বৈকুণ্ঠনাথ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, জানকীনাথ ঘোষাল প্রভৃতি ১৫ জন ২৫০৲ টাকা করিয়া দিলেন; কয়জন ১০০৲টাকা দেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর নামকরণ করেন ও motto দেন 'হিতং মনোহারী চ দুর্লভং বচঃ।' রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বন্ধু শ্রীশচন্দ্রকে লিখিতেছেন, "আমাদের হিতবাদী বলে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বেরোচ্ছে। একটি বড় রকমের কম্পানি খুলে কাজে প্রবৃত্ত হওয়া যাচ্ছে। ২৫,০০০৲ টাকা মূলধন। ২৫০৲ করে প্রত্যেক অংশ এবং একশ অংশ আবশ্যক। প্রায় অর্ধেক অংশের গ্রাহক ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। কৃষ্ণকমল [ভট্টাচার্য] বাবুকে প্রধান সম্পাদক, আমাকে সাহিত্যবিভাগের সম্পাদক এবং মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে রাজনৈতিক সম্পাদক করা হয়েছে। বঙ্কিম, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি অনেক ভাল ভাল লোক লেখায় যোগ দিতে রাজি হয়েছেন।"[১]

কর্তব্য ঘাড়ে পড়িলে রবীন্দ্রনাথ সেকার্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত করেন। হিতবাদীর সাহিত্যসম্পাদক হইয়া তিনি প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া ছোটোগল্প লিখিয়া দিতে লাগিলেন; বোধ হয় ছয় সপ্তাহে ছয়টি লেখেন। ছোটোগল্প রচনায় হিতবাদীতেই রবীন্দ্রনাথের হাতে খড়ি; ইহার পূর্বে যে দুইটি ছোটোগল্প লেখেন,—'ঘাটের কথা' ও 'রাজপথের কথা'—তাহাদিগকে গল্প বলা যায় না, গল্পের আভাসমাত্র বলা যাইতে পারে। সেইজন্য এই রচনা দুটিকে ১৩১৪ সালে 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র অন্তর্গত করা হয়। ১৩৩৩ সালে 'গল্পগুচ্ছে' সব প্রথম তাহা গল্প বলিয়া স্বীকৃত হয়। 'মুকুট' 'বৌঠাকুরানীর হাট', 'রাজর্ষি'র মানুষগুলি কবিকল্পনার মানুষ, অথবা ইতিহাসের মানুষ, তাঁহার চোখেদেখা মানুষ তাহারা নয়, কল্পনার সৃষ্ট জীব তাহারা। বাস্তবের সহিত পরিচয় হইয়াছে এতদিনে। পদ্মাতীরে বাসকালে মানুষের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। জমিদারি পরিচালনা করিতে আসিয়া তিনি বাস্তব জগতকে স্বচক্ষে দেখিলেন। অসীম কল্পনাশ্রয়ী মনে বাস্তবের যেটুকু ছায়াপাত হইয়াছিল, তাহারই প্রতিক্রিয়ায় ছোটোগল্পের সৃষ্টি। হিতবাদীতে ছয়টি গল্প বাহির হয়— দেনাপাওনা, গিন্নী, পোস্টমাস্টার, তারাপ্রসন্নের কীর্তি, ব্যবধান এবং রামকানাই-এর নির্বুদ্ধিতা। প্রত্যেকটি গল্পের উপাদান পরিচিত জগৎ হইতে সংগৃহীত। 'পোস্টমাস্টারে'র কথা ছিন্নপত্রে আছে (১৮৯১ ফেব্রু। ১৮৯২ জুন ২৯)। 'গিন্নী' গল্পের কথা তিনি জীবনস্মৃতির প্রথম খসড়ায় বিবৃত করিয়াছিলেন; নর্মাল স্কুলে যে-শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথ দিতেন না, সেই হরনাথ পণ্ডিত ক্লাসের ছেলেদের অদ্ভুত নামকরণ করিতেন, 'গিন্নী' নামক গল্পে তাহাই লিপিবদ্ধ করেন। কালে পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তনে, তাঁহার ছোটো গল্পের প্রকৃতিরই বদল হইয়া যায়, তাহা তাঁহার গল্প-সমালোচকগণ অবশ্যই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। শেষ জীবনেই 'তিন সঙ্গী' গল্প লেখা সম্ভব হয়। তখন 'ছুটি' 'কাবুলিওয়ালা'র যুগের পটপরিবর্তন হইয়া গিয়াছিল।

হিতবাদীর সহিত রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ মাস তিনেকের বেশি ছিল না; কর্মকর্তাগণের ফরমাশ হইয়াছিল যে গল্পগুলি আরও লঘুভাবে লিখিলে ভালো হয়। তাঁহারা সাপ্তাহিকের জন্য বোধ হয় হালকা গল্প চাহিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় আর্টিস্টের পক্ষে ফরমাইশি গল্প লেখা অসম্ভব; অল্পদিনের মধ্যে হিতবাদীর সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন হইল।

হিতবাদীর জন্য গল্প রচনা ছাড়া প্রবন্ধাদিও লেখেন। একটি প্রবন্ধের নাম ছিল 'অকাল বিবাহ'। য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারির ভূমিকারূপে যাহা তিনি চৈতন্য লাইব্রেরিতে পাঠ করেন তাহাতে বহু সামাজিক প্রশ্ন— বিশেষভাবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নারীসমাজের তুলনামূলক আলোচনা ছিল। নারী সমাজের আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় হইতেছে বিবাহ। হিতবাদীতে 'অকাল বিবাহ' প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা ছিল। মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহের বিরুদ্ধে বহু আলোচনা ইতঃপূর্বে 'হিন্দুবিবাহ' প্রবন্ধে হইয়া গিয়াছিল। অকাল বিবাহ বলিতে যে কেবল মেয়েদের অসময়ে বিবাহ বুঝায় তাহা নহে, পুরুষদের পক্ষেও অকাল বিবাহ সম্ভব; সেটা কেবল বালক বয়সে বিবাহ নহে—

১ পত্রাবলী। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ শ্রাবণ, পৃ ৩০।

আর্থিক স্বাধীনতা লাভ না করিয়া বা উপার্জনক্ষম না হইয়া বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়াকেও অকাল বিবাহ বলা যাইতে পারে। একান্নবর্তী পরিবারে উপার্জন-অক্ষম কোনো কোনো ব্যক্তির বিবাহকরাটা দূষণীয় নহে। কিন্তু যেখানে নানা আর্থিক ও মানসিক কারণে একান্নবর্তী পরিবারপ্রথা প্রায় উচ্ছেদ হইয়া আসিয়াছে, সেখানে বৃত্তিহীন যুবকের পক্ষে বিবাহ যুক্তিসংগত নহে, কারণ পরিবার পোষণের সামর্থ্য তাহার তখনো হয় নাই। এই অকাল বিবাহের ফলে যুবকদের পক্ষে সকল প্রকার নূতন দায়িত্বপূর্ণ কার্যভার গ্রহণকরা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়; এক কথায় তাহাদের সকলপ্রকার initiative নষ্ট হইয়া যায়। বিবাহের যে নানাদিক আছে, তাহা রবীন্দ্রনাথ সম্যক্ প্রকারে এই প্রবন্ধে আলোচনা করিতে পারেন নাই। বহুবৎসর পরে 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' শীর্ষক প্রবন্ধে এই কঠিন বিষয়টির সম্যক্ আলোচনা করেন।

আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ কয়েক দিন পূর্বে চন্দ্রনাথ বসুকে বিবাহ সম্বন্ধে কোনো পত্র দেন; তাহারই উত্তরে চন্দ্রনাথ তাঁহাকে লেখেন "হিতবাদীতে এই বিষয়টার আলোচনা কর না কেন? ·· তোমার সমালোচনাগুলির পারিপাট্য দেখিয়া বড়ই অনন্দলাভ করিতেছি। তোমার সকল কথা আমি অনুমোদন করি না সত্য।"[১] ইহার পরই বোধ হয় শ্রাবণের গোড়ার দিকে 'অকালবিবাহ' প্রবন্ধ হিতবাদীতে প্রকাশিত হয়। চন্দ্রনাথ আলোচনা পড়িয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। উভয়ের মধ্যে এই লইয়া পত্র বিনিময় হয়।[২] একখানি পত্রে চন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের লেখায় 'য়ুরোপীয় ছাঁচের প্রকৃতি' দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ পত্রোত্তরে বলেন যে এবিষয়ে "নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তের সময় এখনো উপস্থিত হয় নাই। কারণ, আজকাল আমরা যেন একটি যুগপরিবর্তনের সন্ধিস্থানে দণ্ডায়মান আছি। প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র বল্লালসেন হইয়া উঠিয়া নিজ নিজ ঘরগড়া আদর্শ অনুসারে হিন্দু অহিন্দু শ্রেণী নির্ণয়পূর্বক তাহাই কেবল গলার জোরে দেশের লোকের উপর জারি করিবার চেষ্টা করিতেছি। আশ্চর্য নাই কালক্রমে পরিবর্তন বিপ্লব শান্ত হইয়া বুদ্ধি স্থির হইলে দেখা যাইবে যথার্থ হিন্দুপ্রকৃতির সহিত য়ুরোপীয় প্রকৃতির তেমন বিরোধ নাই, কেবল বর্তমানকালের হীনদশাগ্রস্ত ভারতের নির্জীব গোঁড়ামি ও কিম্ভুতকিমাকার বিকৃত হিন্দুয়ানীই যথার্থ অহিন্দু।"

নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে চন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ আংশিকভাবে সত্য। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কিছুদিন পূর্বে প্রমথচৌধুরীকে এক পত্রে লিখিয়াছেন, "আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করছে।"

হিতবাদীতে গল্পলেখার পালা কিভাবে ও কেন শেষ হইয়াছিল, তাহার কারণ আমরা ইতিপূর্বেই বলিয়াছি; ফরমাইশি গল্প বা উদ্দেশ্য ও উপদেশমূলক কাহিনী রচনাকে কবি সাহিত্যসৃষ্টি বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তাই তরুণ সাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁহার নূতন মাসিকপত্র 'সাহিত্যে'র জন্য রচনা চাহিলে, রবীন্দ্রনাথ যে দুইটি ব্যঙ্গকৌতুক লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন, তাহা হিতবাদীর পরিচালকগণের মনোভাবের প্রত্যুত্তর বলিয়া মনে হয়; 'লেখার নমুনা,' 'প্রত্নতত্ত্ব'[৩] ও 'সারবান সাহিত্য' পাঠকগণ পাঠ করিলে দেখিবেন এই ব্যঙ্গ ও শ্লেষ কাহাদের উপর প্রযুক্ত হইয়াছিল। 'প্রত্নতত্ত্ব' রচনাটি বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্মবাদীদের ব্যঙ্গ-সমালোচনা।

১২৯৮ এর গ্রীষ্মের কয়টা মাস কলিকাতায় কাটাইয়া বর্ষারম্ভে কবি পুনরায় উত্তরবঙ্গের জমিদারিতে আসেন; আষাঢ় মাসটা নদীতে নদীতে ও সাহাজাদপুরের কুঠির সামনে নৌকায় কাটিয়া যাইতেছে। নৌকায় থাকেন, সেখান হইতে কুঠিতে যান কাজকর্ম করিতে। জমিদারির কাজ দেখা বলিতে বুঝায় নানা জিনিস—কখনো অত্যাচারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রজাদের অভিযোগ, কখনো বা উদ্ধত প্রজার বিরুদ্ধে কর্মচারীদের অভিযোগ। এই সব শোনা ও

১ পত্র। ১৭ আষাঢ় ১২৯৮। বি-ভা-প ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৩৫১, পৃ ৪২৬।

২ চিঠিপত্র। ২১ শ্রাবণ ১২৯৮। পারিবারিক স্মৃতিপুস্তকে পত্রখানির অনুলিপি ছিল। বি-ভা-প ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা। ১৩৫২

৩ সাহিত্য ২য় বর্ষ ১২৯৮ কার্তিক, পৌষ

মীমাংসা করা ছিল প্রধান কাজ; এছাড়া সেরেস্তার কাজকর্মও দস্তুরমতো দেখিতে হয়; রবীন্দ্রনাথের কোনোটাতেই ক্লান্তি নাই। নূতন অভিজ্ঞতা অর্জনে তাঁহার আনন্দ।

সাহিত্যসৃষ্টিকার্য নাই বলিলেই চলে। এখন কোনো পত্রিকার চাহিদা নাই, সম্পাদকের তাগিদ নাই—হিতবাদীর সহিত সম্বন্ধ চুকিয়া গিয়াছে। জমিদারির কাজকর্ম করিয়া যে সময় পান পড়াশুনা করেন; আর তারপর পত্র লেখেন; এইসব পত্র 'ছিন্নপত্রে' সংশোধিত আকারে সম্পাদিত হয় বহু বৎসর পরে। যাহা দেখেন, যাহা ভাবেন, তাহাই লেখেন—[১] অনেকটা ডায়ারির মতো—পত্রলেখাটা উপলক্ষ্য মাত্র। নির্জনে চরের মধ্যে নৌকাবাসকালে প্রকৃতিকে অন্তর দিয়া দেখিবার ও জমিদারির দৈনন্দিন কাজের ভিতর দিয়া মানুষকে গভীরভাবে বুঝিবার যে অবসর লাভ করেন তাহা জীবনে বা সাহিত্যে ব্যর্থ হয় নাই। দৃশ্যমান জগতের ক্ষুদ্র ঘটনারাজি একজন স্পর্শচেতন কবির চিত্তমাঝে কতভাবে ছায়া ও মায়া সৃষ্টি করিতে পারে তাহা 'ছিন্নপত্র' পড়িলেই জানা যায়; কিন্তু চলমান দৃশ্যের অনেকখানিই অবচেতনের গভীরে তলাইয়া যায়; বাহিরের আঘাতে অভিঘাতে তাহারা কবির চিত্তপটে উদ্‌ভাসিত হইয়া সাহিত্যের রূপরেখায় প্রাণ পায়। এই নদীপথের ও গ্রাম্য সংসারের বহু দৃশ্য ও ঘটনা 'সাধনা'র যুগে গল্পমধ্যে রূপ লইয়াছিল।

উত্তরবঙ্গ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া অনতিকালের মধ্যে অকস্মাৎ তাঁহাকে জমিদারি তদারক কার্যে উড়িষ্যায় যাইতে হইল। উড়িষ্যায় দেবেন্দ্রনাথের জমিদারি ছিল; আমরা যে-সময়ের কথা বলিতেছি তখনও ঠাকুরবাড়ির এস্টেট অখণ্ড; অর্থাৎ দেবেন্দ্রনাথের মৃতভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের পৌত্র গগনেন্দ্রনাথদের সম্পত্তি এবং তাঁহার মৃতপুত্র হেমেন্দ্রনাথের সম্পত্তি প্রভৃতি সমস্তই এজমালিতে ছিল; সেই এজমালি সম্পত্তির কিয়দংশ ছিল পাণ্ডুয়ায়, উড়িষ্যাপ্রদেশে কটকের কাছে।

সে-যুগে উড়িষ্যা যাইবার রেলপথ নির্মিত হয় নাই; কলিকাতা হইতে খালে খালে নদীতে নদীতে যাইবার পথ। স্টীমার যোগে যাইবার সময়ে তাঁহাকে যেরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহার একটি সুন্দর বর্ণনা 'ছিন্নপত্রে'র মধ্যে আছে। কিন্তু কেন তাঁহাকে এত কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহার কারণ কিছুই বলেন নাই। কটকে হঠাৎ এইভাবে উপস্থিত হওয়ার জন্য, বীরেন্দ্রনাথের সহপাঠি 'মোটাসোটা বর্ধিষ্ণু চেহারার লোকটি'র নিকট কবি তিরস্কৃত হন। 'কারো পরামর্শের অপেক্ষা না রেখে অকস্মাৎ অসময়ে এখানে আসা সম্বন্ধে আমার বালকোচিত অবিবেচনার উল্লেখ করলেন।' পরদিনই নৌকাযোগে তিরন রওনা হইলেন। "বালিয়ার ঘাটটি বেশ দেখতে। দুই ধারে বেশ বড়ো বড়ো গাছ— সবশুদ্ধ খালটা দেখে সেই পুণার ছোটো নদীটি মনে পড়ে। এই খালটাকে যদি নদী ব'লে জানতুম তাহলে ঢের বেশি ভালো লাগত।" বেলা চারটের সময় তারপুরে পৌঁছাইয়া পালকি চড়িয়া অর্ধরাত্রে পাণ্ডুয়ার কুঠিতে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। ছিন্নপত্রে অতি বিস্তৃতভাবেই এই যাত্রাপথের বর্ণনা আছে।

এই পাণ্ডুয়ার কুঠিতে কবি সপ্তাহখানেক ছিলেন। পৌঁছিবার দুইদিন পরে লিখিতেছেন, "অনেকদিন পরে কাল মেঘবৃষ্টি কেটে শরতের সোনার রোদ্দুর উঠেছিল। পৃথিবীতে যে রোদ্দুর আছে সেকথা যেন একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম; হঠাৎ যখন কাল ··· রোদ্দুর ভেঙে পড়ল তখন যেন একটা নূতন জিনিস দেখে মনে অপূর্ব বিস্ময়ের উদয় হল। দিনটা বড় চমৎকার হয়েছিল। ··· খুব একটা নিঝুম নিস্তব্ধ নিরালা ভাব।"[২] এই নিরালায় বসিয়া কবি তাঁহার অমর নাট্যকাব্য 'চিত্রাঙ্গদা'র প্রথম খসড়া প্রস্তুত করিলেন (২৮ ভাদ্র ১২৯৮)।

১ লিখিত পত্রগুলি—চুহালি জলপথে; ১৬ জুলাই ১৮৯১ [১২৯৮ আষাঢ় ৩)। ঐ ১৯ জুন, ১৮৯১ [১২৯৮ আষাঢ় ৬]। সাজাদপুর। জলপথে ২০ জুন [আষাঢ় ৭]। ঐ ২২ জুন [আষাঢ় ৯]। ২২ জুন [আষাঢ় ১০]। সাজাদপুর [তারিখ নাই। ছুটি গল্পের ঘটনা] সাজাদপুর, জুন ১৮৯১ (১২৯৮ আষাঢ়। অদ্ভুত স্বপ্নের কথা)। সাজাদপুর ৪ জুলাই, ১৮৯১ (১২৯৮ আষাঢ় ২১]

২ উড়িষ্যা বাসকালে পত্র। কটক ৬ই সেপ্টেম্বর ১৮৯১। তিরণ ৭ই। তিরণ ৯ই [১২৯৮ ভাদ্র ২১, ২২, ২৪] ছিন্নপত্র পৃ ৮৯-৯৮।

বাহিরে চলাফেরাতে সাধারণ লোককে যে পরিমাণে চঞ্চল করে, রবীন্দ্রনাথের মন সে পরিমাণ উদ্‌বেলিত হয় না। তাঁহার মন সুন্দরের পিয়াসী, নিত্যনব শোভা, নিত্য নূতন পরিচয় তাঁহাকে নব সৃষ্টিতে উদ্‌বোধিত করে। ঝড়ে ঝঞ্ঝায় নদীবক্ষে রেলপথের কর্মকোলাহলের মধ্যে তাঁহার চিত্ত একটি শান্তপদকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই শান্তির মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টিকার্য সকলের অগোচরে চলিতে থাকে; বরং নূতন পারিপার্শ্বিকের রূঢ় অভিঘাতে অন্তরের শতদলকোরক প্রস্ফুটিত হইবার অবকাশ পায়। পত্রধারা পাঠ করিলে দেখা যায় যে একটি গভীর সৌন্দর্যদ্যুতি তাঁহার মনকে শুদ্ধ মুক্ত শান্ত আনন্দে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল।

উড়িষ্যা হইতে ফিরিয়া আবার উত্তরবঙ্গে আসিয়াছেন—এবার নৌকায় শিলাইদহের ঘাটে। বিচিত্র চিন্তাধারা পদ্মার জলধারার ন্যায় মনের উপর চলমান। অন্তরে-বাহিরে বিচিত্রের পুলক অনুভূতি। তিনি লিখিতেছেন, "পৃথিবী যে কী আশ্চর্য সুন্দরী এবং কী প্রশস্তপ্রাণে এবং গভীরভাবে পরিপূর্ণ তা এইখানে না এলে মনে পড়ে না। যখন সন্ধ্যাবেলা বোটের উপর চুপ ক'রে বসে থাকি, জল স্তব্ধ থাকে, তীর আবছায়া হয়ে আসে এবং আকাশের প্রান্তে সূর্যাস্তের দীপ্তি ক্রমে ক্রমে ম্লান হয়ে যায়, তখন আমার সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনের উপর নিস্তব্ধ নতনেত্র প্রকৃতির কী একটা বৃহৎ উদার বাক্যহীন স্পর্শ অনুভব করি! কী শান্তি, কী স্নেহ, কী মহত্ত্ব, কী অসীম করুণাপূর্ণ বিষাদ ..কেবল মৌলবীটা পাশে দাঁড়িয়ে অবিশ্রাম বক বক ক'রে আমাকে ব্যথিত করে তোলে।"[১] আর এক দিন পত্রধারায়[২] লিখিতেছেন, "পৃথিবীতে জানলার ধারে একলা বসে চোখ মেলে' দেখলেই মনে নতুন সাধ জন্মায়—নতুন সাধ ঠিক নয়, পুরানো সাধ নানা নতুন মূর্তি ধারণ করতে আরম্ভ করে।" একটি যুবককে ছোটো একখানি ডিঙিতে একলা দাঁড় বাহিয়া গান করিয়া যাইতে দেখিয়া লিখিতেছেন, "হঠাৎ মনে হল, আবার যদি জীবনটা ঠিক সেইদিন থেকে ফিরে পাই। আর একবার পরীক্ষা করে দেখা যায়— এবার তাকে আর শুষ্ক অপরিতৃপ্ত করে ফেলে রেখে দিইনে— কবির গান গলায় নিয়ে একটি ছিপ্‌ছিপে ডিঙিতে জোয়ারের বেলায় পৃথিবীতে ভেসে পড়ি, গান গাই এবং বশ করি এবং দেখে আসি পৃথিবীতে কোথায় কী আছে; আপনাকেও একবার জানান দিই, অন্যকেও একবার জানি; জীবনে যৌবনে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বাতাসের মতো একবার হু হু করে বেড়িয়ে আসি, তারপরে এসে পরিপূর্ণ প্রফুল্ল বার্ধক্যটা কবির মত কাটাই। ...উপবাস ক'রে, আকাশের দিকে তাকিয়ে অনিদ্র থেকে সর্বদা মনে মনে বিতর্ক করে, পৃথিবীকে এবং মনুষ্যহৃদয়কে কথায় কথায় বঞ্চিত করে স্বেচ্ছাচরিত দুর্ভিক্ষে এই দুর্লভ জীবন ত্যাগ ক'রতে চাইনে। পৃথিবী যে সৃষ্টিকর্তার একটা ফাঁকি এবং শয়তানের একটা ফাঁদ তা না মনে করে একে বিশ্বাস করে, ভালোবেসে ভালোবাসা পেয়ে মানুষের মতো বেঁচে এবং মানুষের মতো মরে গেলেই যথেষ্ট; দেবতার মতো হাওয়া হ'য়ে যাবার চেষ্টা করা আমার কাজ নয়।" রবীন্দ্রনাথের এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছিল; তিনি 'মানবের মাঝে'ই পরিপূর্ণভাবে বাঁচিয়াছিলেন।

কার্তিক মাসের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিলেন; বাড়িতে নূতন পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন হইতেছে, সুতরাং তাঁহাকে চাই-ই।

১ ছিন্নপত্র। পৃ ১০১ শিলাইদহ, ১লা অক্টোবর ১৮৯১ [১২৯৮ আশ্বিন ১৫]

২ ছিন্নপত্র পৃ ১০৪। শিলাইদহ। ১৮৯১ অক্টোবর।

য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি—ভূমিকা

বিলাত হইতে ফিরিবার কয়েক মাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে জমিদারির কার্যভার গ্রহণ করিয়া উত্তরবঙ্গে যাত্রা করিতে হইল। গত কয়েক বৎসর হইতে মাঝে মাঝে জমিদারি পরিদর্শনের জন্য স্থানে স্থানে যাইতে হইতেছিল বটে, কিন্তু পরিচালনার ভার তখনো তাঁহার উপর ন্যস্ত হয় নাই। মহর্ষির জ্যেষ্ঠ জামাতা সারদাপ্রসাদের মৃত্যুর পর জমিদারি তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ও পৌত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের হস্তে সমর্পিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ বিদেশে রাজকার্যোপলক্ষে ব্যাপৃত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্ত্রীবিয়োগের পর সাংসারিক কাজেকর্মে বীতশ্রদ্ধ; হেমেন্দ্রনাথ মৃত; বীরেন্দ্রনাথ ও সোমেন্দ্রনাথ বায়ুরোগগ্রস্ত। সুতরাং জমিদারির কাজকর্ম হয় জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথ, না-হয় কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের উপর বর্তাইতে বাধ্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ দার্শনিক ও কবি; তাঁহার পক্ষে বৈষয়িক কাজকর্ম দেখাশুনা করা অসম্ভব ছিল; সুতরাং পরিচালনাভার তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্রের উপর গিয়া পড়ে। কিন্তু তাঁহার হাতে এস্টেটের কাজকর্ম অত্যন্ত শিথিল হইয়া যায়। জমিদারির তদারক ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার অবশেষে রবীন্দ্রনাথের উপর আসিয়া পড়িল; তখন ঠাকুরএস্টেট সমস্তই এজমালিতে ছিল, সুতরাং খুবই বড়ো জমিদারি।

ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথকে জীবনের কোনো কঠিন দায় বা দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় নাই। সাহিত্যজীবনের বিচিত্র মাধুর্যের মধ্যে হঠাৎ আসিয়া পড়িল বিপুল জমিদারি তদারকের কাজ। কিন্তু কবি হইলেও তাঁহার সহজবুদ্ধি এত প্রখর ছিল যে তিনি আশ্চর্য নিপুণতার সহিত নূতন কর্তব্যকে জীবনের সঙ্গে মানাইয়া লইলেন; শুধু মানাইয়া লইলেন না, তাহাকে নিপুণভাবে সুসম্পন্ন করিতে লাগিলেন— যেমন নিজের পারিবারিক জীবনের প্রত্যেকটি ছোটোখাটো খুঁটিনাটি কাজকর্ম পালন করিতেছিলেন তেমনভাবেই। দেবেন্দ্রনাথের বিষয় ছিল, কিন্তু বৈষয়িকতা ছিল না; তাই বলিয়া বিষয়বুদ্ধির অভাবও ছিল না। রবীন্দ্রনাথ জমিদারিবিদ্যায় ও বিষয়-বুদ্ধিতে বাংলার জমিদারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিতেন একথা পূর্ববঙ্গের কোনো জমিদারের মুখে শোনা।

জীবনের দিক হইতে এই ঘটনাটি খুবই বড়ো। বাস্তবকে প্রকৃতির সহিত জীবনে মিশাইয়া এমন নিবিড়ভাবে পাইবার সুযোগ ইতিপূর্বে হয় নাই। প্রকৃতি ও মানুষে মিলিয়া বিশ্বের সৃষ্টি-সৌন্দর্য সম্পূর্ণ হইয়াছে; রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতে প্রকৃতিকে অন্তরঙ্গভাবে জানিয়াছিলেন, মানুষকে তেমন নিবিড়ভাবে পাইবার সুযোগ লাভ করেন নাই। জমিদারি পরিদর্শন ও পরিচালনা করিতে আসিয়া, তিনি হাসিকান্না সুখদুঃখভরা মানুষকে তাহার যথার্থ স্থানে দেখিতে পাইলেন। উত্তর-বঙ্গে বাস করিতে আসিয়া বাংলার অন্তরের সঙ্গে তাঁহার যোগ হইল— মানুষকে তিনি পূর্ণদৃষ্টিতে দেখিলেন। তাঁহার কাব্যের মধ্যে হৃদয়াবেগের আতিশয্য এযুগে বহুল পরিমাণে মৃদু হইয়া আসিল; পদ্মা তাঁহার কাব্যে ও অন্যান্য রচনায় নূতন রস, নূতন শক্তি, নূতন সৌন্দর্য দান করিল।

কবি এই সময়ের মনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন পত্রধারায়। পত্রগুলি লেখা হয় ইন্দিরা দেবীকে। তিনি পত্রগুলিকে নকল করিয়া রাখেন; সেই পত্রগুলি অবলম্বন করিয়া ১৩১৪ সালে রবীন্দ্রনাথ 'বিচিত্র-প্রবন্ধে' জলেস্থলে-ঘাটে পরিচ্ছেদটি সংযোজন করেন এবং ১৩১৯ সালে পুনরায় বাছিয়া এবং বহুল পরিমাণে ভাষা পরিবর্তন করিয়া 'ছিন্নপত্র' প্রকাশ করেন। এইখানে রবীন্দ্রনাথ যতখানি নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে নিজেকে ও জগতকে দেখা সম্ভব, সেইভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথেরও কথা জানা যায় মূল পত্রগুলি এবং তাঁহার পত্নীকে লেখা চিঠিপত্র হইতে। মূল পত্রগুলি বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যশিল্পী বলিয়া পত্রমধ্যে যেসব অংশ সাহিত্যের বা তত্ত্বের দিক হইতে সুন্দর নহে তাহা ছিন্নপত্র সম্পাদন কালে নির্মমভাবে কাটিয়া দেন।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি বিলাত হইতে আসিবার কয়েকমাসের মধ্যে কবিকে উত্তর বঙ্গে যাইতে হয়। তথায়

তিনটি পরগণা— বিরাহিমপুর, ইহার কাছারি শিলাইদহে; কালিগ্রাম, ইহার কাছারি পতিসর; সাহাজাদপুর গ্রামের নামেই পরগণা। এবার শীতকালেই তাঁহাকে কালিগ্রাম যাইতে হয়; পতিসর কাছারি চলনবিলের অনতিদূরে নাগর নদীর উপর। এই জায়গার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম পরিচয়; তাই নূতন পারিপার্শ্বিকের সহিত মনের খাপ খাওয়াইতে কষ্ট হইতেছে। স্ত্রীকে লিখিত একখানি পত্রে মনের এই ভাব গোপন করিতে পারিতেছেন না। চলন বিলটা তাঁহার মোটেই ভালো লাগে নাই। পতিসরে পৌঁছাইতে নদীপথে তিন দিন কাটে; আবার সেই পথে বিরাহিমপুর পরগণায় যাইতে হইবে। সেটা তাঁহার মনঃপূত হইতেছে না। "এখানকার নদীতে একেবারে স্রোত নেই। শেওলা ভাস্‌ছে, মাঝে মাঝে জঙ্গল হয়েছে— পাড়াগেঁয়ে পুকুরের যে একরকম গন্ধ পাওয়া যায়, সেই রকম গন্ধ— তা ছাড়া রাত্তিরে বোধ হয় যথেষ্ট মশা পাওয়া যাবে। নিতান্ত অসহ্য হলে এইখান থেকেই কলকাতায় পালাব।" কলিকাতায় যাবার জন্য মন কেমন করে 'মিষ্টি বেলুরানী'র জন্য; খোকাকে স্বপ্নে দেখিয়া মন আরও ব্যাকুল হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্নেহশীল পিতা ছিলেন, তাই সন্তানদের জন্য এত উৎকণ্ঠা। রক্তমাংসের সাধারণ মানুষের সকল আশা আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার ছিল।

পতিসরের বর্ণনা পাই 'ছিন্নপত্রে'। সে বর্ণনায় বাহিরের প্রকৃতি-কথা যেমন আছে, তেমনি আছে কবির অন্তরের কথা। জমিদারি কাজের দস্তুরে এখনো তেমন অভিজ্ঞতা হয় নাই বলিয়া বাহিরের আদর আপ্যায়ন সম্মান অসংকোচে গ্রহণ করিতে বাধো বাধো ঠেকে। মানুষ-রবীন্দ্রনাথের দরদীমন মানুষের নিকট হইতে কাতর, কৃত্রিম স্তুতিবাদ শুনিতে তখনো তেমন অভ্যস্ত হয় নাই, তাই একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "সকালে উঠে…লিখছিলুম…এমৎ কালে…রাজকার্য উপস্থিত হল— প্রধান মন্ত্রী মৃদুস্বরে বললেন, একবার রাজসভায় আসতে হচ্চে। কি করা যায় লক্ষ্মীর তলব শুনে সরস্বতীকে ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠতে হল— সেখানে ঘণ্টাখানেক দুরূহ রাজকার্য সম্পন্ন করে এইমাত্র আসচি। আমার মনে মনে হাসি পায়— আমার নিজের অপার গাম্ভীর্য এবং অতলস্পর্শ বুদ্ধিমানের চেহারা কল্পনা করে সমস্তটা একটা প্রহসন বলে মনে হয়। প্রজারা যখন সসম্ভ্রম কাতরভাবে দরবার করে, এবং আমলারা বিনীত করযোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আমার মনে হয় এদের চেয়ে এমনি আমি কি মস্ত লোক যে আমি একটু ইঙ্গিত করলেই এদের জীবনরক্ষা এবং আমি একটু বিমুখ হলেই এদের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। আমি যে এই চৌকিটার উপরে বসে বসে ভাণ করছি যেন এই সমস্ত মানুষের থেকে আমি একটা স্বতন্ত্র সৃষ্টি, আমি এদের হর্তাকর্তা বিধাতা, এর চেয়ে অদ্ভুত আর কি হতে পারে! অন্তরের মধ্যে আমিও যে এদেরই মতো দরিদ্র সুখদুঃখকাতর মানুষ, পৃথিবীতে আমারও কত ছোট ছোট বিষয়ে দরবার, কত সামান্য কারণে মর্মান্তিক কান্না, কত লোকের প্রসন্নতার উপরে জীবনের নির্ভর! এই সমস্ত ছেলেপিলে-গরুলাঙ্গল-ঘরকন্না-ওয়ালা সরলহৃদয় চাষাভুষোরা আমাকে কি ভুলই জানে! আমাকে এদের সমজাতি মানুষ বলেই জানে না। সেই ভুলটি রক্ষে করবার জন্যে কত সরঞ্জাম রাখতে এবং কত আড়ম্বর করতে হয়। …কি জানি যদি ঐ ভুলে আঘাত লাগে! Prestige মানে হচ্ছে মানুষ সম্বন্ধে মানুষের ভুল বিশ্বাস! আমাকে এখানকার প্রজারা যদি ঠিক জানত, তাহলে আপনাদের একজন বলে চিনতে পারত, সেই ভয়ে সর্বদা মুখোষ পরে থাকতে হয়।"[১]

এই পত্রখানি মানুষ রবীন্দ্রনাথের লেখা, জমিদার রবীন্দ্রনাথের নয়। এমনকি কবি রবীন্দ্রনাথেরও নয়। কয়েকদিন পূর্বে যখন তাঁহার নৌকা দেখিয়া কোনো গ্রামবৃদ্ধ প্রশ্ন করিয়াছিল যে, জমিদারবাবুর নৌকা এখানে বাঁধা কেন, মাল্লারা উত্তর দেয় 'হাওয়াখাওয়ার জন্য'। এই ঘটনাটি উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন, "এসেছি হাওয়ার চেয়ে ঢের বেশি কঠিন

১ ছিন্নপত্র। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫১ তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা পৃ. ৭৪-৭৫।

জিনিসের জন্য।"[১] এ উক্তিটির মধ্যে নিজের প্রতি শ্লেষ আছে। মোট কথা ছিন্নপত্রের লেখাগুলিকে পত্র না বলে, বলা উচিত ডায়ারি, নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা ও ভাবনার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ।[২]

এবার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর হইতে রবীন্দ্রনাথের মনে দেশের সমস্যা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জাগিতেছে। য়ুরোপ ভ্রমণকালে যে ডায়ারি লিখিয়াছিলেন তাহারই এক বিরাট ভূমিকায় এইসব আলোচনা করেন; বোধ হয় উত্তর বঙ্গ ভ্রমণকালে উহা রচিত হয়। 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' গ্রন্থের প্রথম ভাগ বা ভূমিকা-অংশ ছাপা হয় আসল ডায়ারি গ্রন্থাকারে প্রকাশের আড়াই বৎসর পূর্বে। রবীন্দ্রনাথের গদ্যগ্রন্থাবলী প্রকাশকালে য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি-অংশ 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র অন্তর্গত করা হয়, এবং ভূমিকাটাকে দুটি অংশে ভাগ করিয়া একাংশ 'নূতন ও পুরাতন' নামে 'স্বদেশ' খণ্ডে, এবং অপরাংশ 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' নামে 'সমাজ' খণ্ডে প্রকাশিত হয়। 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'র প্রথম খণ্ড প্রথম সংস্করণ অপ্রচলিত হওয়ায় গদ্যগ্রন্থাবলীর পাঠকগণের নিকট এই প্রবন্ধদ্বয়ের পটভূমি নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল। অথচ প্রবন্ধ দুইটি স্থিরভাবে পড়িলে বেশ বুঝা যায় যে য়ুরোপ হইতে সদ্য ফিরিয়া আসিবার পর রবীন্দ্রনাথের মনে এই উভয় সভ্যতার সার্থকতা সম্বন্ধে জটিল প্রশ্ন উঠিয়াছে। য়ুরোপের অন্ধ গতি ও ভারতের অন্ধ স্থিতির মধ্যে সত্য কোথায়। রবীন্দ্রনাথ ত্রিশ বৎসর বয়সে যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন, পরবর্তী যুগে অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া বারেবারে তাহা আলোচনার জন্য তুলিয়াছেন এবং যথাসাধ্য সমাধানের চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। কলিকাতায় আসিয়া চৈতন্য লাইব্রেরির এক বিশেষ অধিবেশনে উহা পাঠ করেন।[৩]

এই বক্তৃতাটি নূতনপন্থী ও পুরাতনপন্থী, গতিপন্থী ও স্থিতিপন্থী সমাজসংস্থানের একটি সুষ্ঠু সমালোচনা। কোনো পক্ষের আতিশয্য নীতি বা গোঁড়ামিকেই লেখক এই প্রবন্ধে সমর্থন করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা ও শান্ত জীবনযাত্রার মধ্যে নূতনের আবির্ভাব হওয়াতে হঠাৎ ভারতীয়গণকে অনাবৃত বিশাল কর্মক্ষেত্রের মধ্যে কে বা কিসে যেন ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। ভারতের সমাজ কালস্রোত বন্ধ করিয়া যেন শুদ্ধ হইয়া একটা জায়গায় দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। এমন সময়ে কে যেন "পুরাতনের মধ্যে নূতন মিশিয়ে, বিশ্বাসের মধ্যে সংশয় এনে, সন্তোষের মধ্যে দুরাশার আক্ষেপ উৎক্ষিপ্ত করে দিয়ে সমস্ত বিপর্যস্ত করে দিলে।" কালস্রোতকে রোধ করিতে আমরা পারি নাই, পরিবর্তনকে মানিয়া লইতেই হইতেছে। স্বীকার করি আর না-করি মানবস্রোত চলিয়াছে, ও সেই সঙ্গে বিচিত্র কল্লোল, উদ্দাম বেগ, প্রবল গতি, অবিশ্রাম কর্ম আমাদের মনকে মাতাইয়া তুলিতেছে। ইচ্ছা করে বহুযুগের সংস্কারবন্ধন ছিন্ন করিয়া আমরাও বাহির হইয়া পড়ি, কিন্তু তারপরেই রিক্ত হস্তের দিকে চাহিয়া ভাবি পাথেয় কোথায়, নূতনের সহিত সন্ধি করিতে গিয়া নূতনকে অনুকরণ করাই কি উদ্দেশ্য। য়ুরোপীয়তাকে গ্রহণকরাই কি কাম্য। এই প্রশ্নের উত্তরে লেখক বলিতেছেন, "ভারতবর্ষ সুখ চায়নি, সন্তোষ চেয়েছিল, তা পেয়েওছে এবং সর্বতোভাবে সর্বত্র তার প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেছে।" কিন্তু য়ুরোপের উন্মাদ জীবনউৎসব দেখিয়া তাহাদের সভ্যতার চরম সফলতা সম্বন্ধে ভারতীয়দের মনে সংশয় জাগে। য়ুরোপের সভ্যতা কি কোনো দিন একটি শান্তি ও মাধুর্যের মধ্যে সমাপ্তিলাভ করিবে এই প্রশ্ন কবির মনে উঠিয়াছে। অথবা, "কল যে রকম হঠাৎ বিগড়ে যায় উত্তরোত্তর অতিরিক্ত বাষ্প ও তাপ সঞ্চয় ক'রে এঞ্জিন যে-রকম সহসা ফেটে যায়, একপথবর্তী দুই বিপরীতমুখী রেলগাড়ি পরস্পরের সংঘাতে যেমন অকস্মাৎ বিপর্যস্ত হয় সেই রকম প্রবলবেগে একটা নিদারুণ অপঘাত প্রাপ্ত হবে?" য়ুরোপের সভ্যতা যে আজ কোথায় আসিয়া নিজেকে দাঁড় করাইয়াছে, তাহা আজ এত প্রকট ও স্পষ্ট যে রবীন্দ্রনাথের এই ঋষিবাক্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার কিছুই নাই।

১ ছিন্নপত্র। পতিসর। ৭ই মাঘ ১২৯৭। ১৯ জানুয়ারি। ১৮৯১। পৃ. ৫০।

২ ছিন্নপত্র। এই সময়ে লেখা ৯ খানি পত্র ইহাতে আছে। পৃ. ৪৫-৬৬।

৩ য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি ভূমিকা ১ম খণ্ড। ১৬ বৈশাখ ১২৯৮। পৃ. ৭৮।

কিন্তু য়ুরোপীয় সভ্যতা যতই মন্দ হউক, সে সুনিশ্চিতভাবে আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; সুতরাং প্রাচীনকে কিয়ৎপরিমাণে ত্যাগ করিতেই হইবে। কিন্তু ব্যাপারটা হইয়াছে এই যে আমরা প্রাচীনকে দৈনন্দিন জীবনের মধ্য হইতে বিদায় দিয়াছি, কিন্তু মনের ভাবের পরিবর্তন করিতে পারি নাই, মন বাঁধা আছে প্রাচীনের নিগড়ে। আমরা মহোৎসাহে প্রাচ্য প্রাচীনের জয়গান করিব তাহাকে অনুসরণ করিব না; পাশ্চাত্ত্য নবীনের নিন্দা করিব, কিন্তু তাহাকে অনুকরণ করিব। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি, "তোমার আমার মতো লোক যারা তপস্যাও করিনে, হবিষ্যও খাইনে, জুতোজামা পরে ট্রামে চড়ে পান চিবোতে চিবোতে নিয়মিত আপিসে ইস্কুলে যাই, যাদের আদ্যোপান্ত তন্ন তন্ন করে দেখে কিছুতেই প্রতীতি হয় না এরা দ্বিতীয় যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, গৌতম, জরৎকারু, বৈশম্পায়ন কিংবা ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন; ছাত্রবৃন্দ, যাদের বালখিল্য তপস্বী বলে এ-পর্যন্ত কারও ভ্রম হয়নি; একদিন তিনসন্ধ্যা স্নান করে একটা হরীতকী মুখে দিলে যাদের তার পরে একাদিক্রমে কিছুকাল অপিস কিংবা কলেজ কামাই করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে; তাদের পক্ষে এ রকম ব্রহ্মচর্যের বাহ্যাড়ম্বর করা পৃথিবীর অধিকাংশ উদ্‌যোগপরায়ণ মানুজাতীয়ের প্রতি খর্ব নাসিকা সীট্‌কার করা কেবলমাত্র যে অদ্ভুত অসংগত, হাস্যকর তা নয় কিন্তু সম্পূর্ণ ক্ষতিজনক।" লেখক বলেন, অতএব প্রাণ ও মান রক্ষার জন্য নবীনের সহিত যোগ দিতেই হইবে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচারবিচার লইয়া খুঁতখুঁত করা নিরর্থক। আধ্যাত্মিক পবিত্রতার জন্য আমাদের এই ব্যবহারকে কবি নাম দিয়াছেন, আধ্যাত্মিক বাবুয়ানা,— other-worldiness-এর অনুবাদ। অতিরিক্ত বাহ্যসুখপ্রিয়তাকে বিলাসিতা বলে, আর অতিরিক্ত বাহ্যপবিত্রতা-প্রিয়তাকে আধ্যাত্মিক বিলাসিতা বলে। লেখকের মতে সমাজ-জীবনে সংকীর্ণতা এবং নির্জীবতা অনেকটা পরিমাণে নিরাপদ; কারণ যে-সমাজে মানবপ্রকৃতির সম্যক্ স্ফূর্তি এবং জীবনের প্রবাহ আছে, সে-সমাজকে বিস্তর উপদ্রব সহ্য করিতে হয়। "যেখানে জীবন অধিক, সেখানে স্বাধীনতা অধিক, এবং সেখানে বৈচিত্র্য অধিক। সেখানে ভালো মন্দ দুই প্রবল।" সমাজ যতই উন্নতি লাভ করে ততই তার দায়িত্ব এবং কর্তব্যের জটিলতা স্বভাবতই বেড়ে উঠতে থাকে। "সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের প্রতি যদি আমাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকে তাহলে মানবের প্রবল বেগবান্ সভ্যতাকে আমরা নিতান্ত নিরীহ নিবিরোধ নির্বিকার নিরাপদ নির্জীবভাবে কল্পনা করিব না।" লেখকের মোট কথা এই যে প্রগতিধর্মে বাধা বিস্তর, মেহন্নতও দুস্তর; তাই বলিয়া পুরাতনকে আঁকড়াইয়া থাকিলে নূতনকে পাওয়া যাইবে না। নূতনকে নবীনভাবে গ্রহণ করিবার সময় আসিয়াছে। প্রাচীনের প্রতি যদি সত্যই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অচলা থাকে, তবে তাহাকে যথাসাধ্য অনুসরণ করাই উচিত; কিন্তু দেখা যায় লোকের সে-শ্রদ্ধা নিষ্ঠার একান্ত অভাব;— অথচ তাহাদের ভানের ও ভণিতার অন্ত নাই। ফলে সমাজজীবন দুর্বল, তাহার আদর্শ নিষ্প্রভ, এবং মানবচরিত্র চাতুরীপূর্ণ হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলিলেন, নির্জীবতাকে সাধুতা ও অক্ষমতাকে সর্বশ্রেষ্ঠতার ভান করা নিরর্থক; সময় আসিয়াছে যখন নবীনকে স্বচ্ছন্দ চিত্তে গ্রহণ করিয়া সবল ও সুস্থ মনোভাব পোষণ করাই প্রয়োজন।

কিন্তু নবীন বলিতে বুঝায় পাশ্চাত্ত্য ও য়ুরোপীয় জগত। এবার বিলাত হইতে সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতা লইয়া আসিয়াছিলেন। বিলাতকে মুগ্ধ নেত্রে দেখিবার বয়স এখন নাই; বারো বৎসর পূর্বে বিলাত বাসকালে লিখিত পত্রধারার মধ্যে সমাজকে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিয়াছিলেন, তাহার সবিশেষ পরিবর্তন হইয়াছে। বিলাতী সমাজের উপরিতলের মুষ্টিমেয় নরনারীর সুখের ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য চরম চেষ্টা চালিত সভ্যতা-যন্ত্র কী নিদারুণভাবে বহুকে পেষণ করিতেছে, এই কথাটি কবির মনে এবার বিশেষভাবে লাগিয়াছে। কিন্তু "প্রকৃতির আইন অনুসারে, উপেক্ষিত ক্রমে আপনার প্রতিশোধ নেবেই।"···(প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, সমাজ পৃ ১৩৬) বলিয়া যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন, তাহা কালের ইতিহাসে পূর্ণ হইয়াছে। ডায়ারির ভূমিকার

শেষাংশে (প্রাচ্য ও প্রতীচ্য) প্রধানত য়ুরোপীয় ও ভারতীয় নরনারীর সম্বন্ধ বিশ্লিষ্ট হইয়াছে। তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন বিলাতে নারীদের জীবনে পুরুষের সহধর্মতা ও সহযোগিতা হইতে সমকক্ষতা ও প্রতিযোগিতা-স্পৃহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। উহা যে সমগ্র সমাজের কল্যাণকর হইতে পারে না, ইহা এই প্রবন্ধাংশে বহুবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। ভারতের নারীদের জীবনাদর্শের সহিত তুলনা মনে স্বভাবতই জাগিতেছে। য়ুরোপীয় আদর্শে এতদ্দেশীয় নারীদের জীবন সংসারপিঞ্জরে আবদ্ধ, নিরানন্দময়। রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন পাশ্চাত্ত্য দেশের 'যেসকল মেয়ে প্রমোদের আবর্তে অহর্নিশি ঘূর্ণ্যমান কিংবা পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত, কিংবা দুটো একটা কুকুর-শাবক এবং চারটে পাঁচটা সভা কোলে করে একাকিনী কৌমার্য কিংবা বৈধব্য যাপনে নিরত, তাঁদের চেয়ে' কি আমাদের অন্তঃপুরচারিণীরা অসুখী। "ভালোবাসাহীন বন্ধনহীন শূন্য স্বাধীনতা নারীর পক্ষে অতি ভয়ানক।" কবি একথাটি নীতির দিক হইতে আলোচনা করেন নাই, তিনি জীবনের আদর্শ ও অভিপ্রায়ের দিক হইতেই কথাটা তুলিয়াছিলেন।

তবে পরিবর্তনটা যে কেবল প্রতীচ্য জগতে ঘটিতেছে তাহা নহে ; প্রাচ্য সমাজেও ঘটিতেছে। "দেশের আর্থিক অবস্থার এমন পরিবর্তন হয়েছে যে, জীবনযাত্রার প্রণালী স্বতই ভিন্ন আকার ধারণ করছে এবং সেই সূত্রে আমাদের একান্নবর্তী পরিবার কালক্রমে কথঞ্চিৎ বিশ্লিষ্ট হবার মতো বোধ হচ্চে। সেই সঙ্গে ক্রমশ আমাদের স্ত্রীলোকদের অবস্থা পরিবর্তন আবশ্যক এবং অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। কেবলমাত্র গৃহলুণ্ঠিত কোমল হৃদয়রাশি হয়ে থাকলে চলবে না, মেরুদণ্ডের উপর ভর ক'রে উন্নত উৎসাহী ভাবে স্বামীর পার্শ্বচারিণী হোতে হবে।" "অতএব স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত না হোলে বর্তমান শিক্ষিত সমাজে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়। আমাদের দেশে বিদেশী শিক্ষা প্রচলিত হওয়াতে, ইংরেজি যে-জানে এবং ইংরেজি যে-জানে-না তাদের মধ্যে একটা জাতিভেদের মতো দাঁড়াচ্ছে, অতএব অধিকাংশ স্থলেই আমাদের বরকন্যার মধ্যে যথার্থ অসবর্ণ বিবাহ হচ্ছে। একজনের চিন্তা, চিন্তার ভাষা, বিশ্বাস এবং কাজ আর-একজনের সঙ্গে বিস্তর বিভিন্ন।" এইসব যুক্তি দ্বারা রবীন্দ্রনাথ দেখাইলেন যে ভারতীয় সংস্কৃতি আমরা ত্যাগ করিতে পারিব না এবং ইংরেজি শিক্ষাও শিরোধার্য করিয়া লইতে হইবে। আমরা দুই বিপরীত শক্তির মধ্যে দোদুল্যমান, উভয় শক্তিকেই স্বীকার করিয়া তাহাদের যথাযথ স্থান নির্দেশ করিতে হইবে।

সাধনা পত্রিকা ১২৯৮

১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদকত্বে 'সাধনা' নামে মাসিকপত্র ঠাকুরবাড়ি হইতে প্রকাশিত হইল। সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর দ্বিজেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র। ১৮৯০ সালে ইনি বি. এ. পাশ করিয়াছেন ; সাহিত্যিক প্রতিভা ও রসগ্রাহীতা অসামান্য না থাকিলেও, যথেষ্ট ছিল। এখন তাঁহার বয়স বাইশ বৎসর, নবীন উৎসাহে পত্রিকা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সম্পাদক ও উৎসাহদাতারা সকলেই জানিতেন যে রবীন্দ্র-নাথের সহায়তা ব্যতীত মাসিকপত্র চলিতে পারে না। শিলাইদহ হইতে কার্তিকের গোড়ায় তিনি কলিকাতায় আসিয়া 'সাধনা'র জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিলেন। নূতন পত্রিকা নূতন প্রেমের ন্যায়ই তাঁহাকে টানে, এবং তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা এই নূতনের আকর্ষণে শতদলে পদ্মের ন্যায় ফুটিয়া ওঠে। সাধনার প্রথম সংখ্যা হইতে ছোটোগল্প, প্রবন্ধ, সাময়িক সারসংগ্রহ, বৈজ্ঞানিক সংবাদ ও সাময়িকসাহিত্য আলোচনা প্রভৃতি বিচিত্র রচনাসম্ভারে উহা পূর্ণ হইল।

রবীন্দ্রনাথের একান্ত ইচ্ছা কাগজখানিকে সর্বতোভাবে মাসিকপত্রের আদর্শস্থানীয় করিয়া তুলিবেন। একখানি পত্রে তাঁহার বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিতেছেন, "অনেকগুলো কথা বলা আবশ্যক অথচ বড় বড় লোক সবাই নীরব,

এবং তাঁদের মধ্যেও দুইএকজন নতুন নতুন বুলি বের করচেন। একে ত' বাঙালীর বুদ্ধি খুব পরিষ্কার তা নয়, তারপর সম্প্রতি হঠাৎ একটা আধ্যাত্মিক কুয়াশা উঠে চারিদিক আচ্ছন্ন করে দিয়েছে— সাহিত্য থেকে সৌন্দর্য এবং বৈচিত্র্য এবং সত্য একেবারে লোপ পেয়েচে।... দিনকতক খুব কঠিন কথা পরিষ্কার করে বলা দরকার হয়েচে।"[১]

সাধনার প্রথম সংখ্যা হইতে 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী' ধারাবাহিক প্রকাশিত হইতে থাকিল। সেই-যে আড়াইমাসের জন্য বিদেশে গিয়াছিলেন, তাহারই বিস্তৃত কাহিনী দিনপঞ্জী বা রোজনামচাহিসাবে লেখা। প্রথমবারের বিলাতের পত্রধারা হইতে এ রচনা সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। কবি যাহা দেখিতেছেন, যাহা ভাবিতেছেন এই দিনপঞ্জীতে তাহা লেখনীর রেখায় আঁকিয়া যাইতেছেন, ইহার মধ্যে কৃত্রিমতা নাই, অন্যকে তাক লাগাইবার কোনোই প্রচেষ্টা নাই, কেবল কথার রঙে ছবি আঁকাই যেন একমাত্র উদ্দেশ্য। এই ডায়ারির ভূমিকা 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' ভূমিকা নামে এই বৎসরের বৈশাখমাসে প্রকাশিত হয়, সে সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি।

পত্রিকা পরিচালনা তো জীবনের একটিমাত্র কাজ; লেখকসত্তা ছাড়াও কবির অনেক সত্তা আছে, প্রত্যেকটিরই চাহিদা তাঁহাকে পূরণ করিতে হয়। জমিদারির কথা তো বলিয়াছি। এছাড়া তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, সে-সত্তারও কাজ বা কর্তব্য পালন করিতে হয়। আমরা যে সময়ের কথা আলোচনায় প্রবৃত্ত, সেটা দশবার্ষিকী আদমসুমারের উদ্‌যোগপর্ব (১৮৯০)। সকল বর্ণ বা 'জাত'ই জাতি-সুমারের ফর্দে নিজবর্ণের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ, প্রচার ও প্রতিষ্ঠাকল্পে আন্দোলনে বদ্ধপরিকর। হিন্দু সমাজের মধ্যে আত্মশক্তি ও আত্মসম্মান অর্জনের ক্ষীণ আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে দেখা দিতেছে। কিন্তু তাহা সমগ্রের জন্য মূর্তি পরিগ্রহ না করিয়া কেবলমাত্র বর্ণচেতনায় আত্মপ্রকাশ করিল। এই আত্মচেতনার প্রেরণায় ব্রাহ্মসমাজও সেদিন হিন্দুজাতির নানা বর্ণ, সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে আপনাকে পৃথকভাবে নির্ণীত হইবার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করে।

ব্রাহ্মসমাজ পৃথক ধর্ম না হিন্দুধর্মের একটি শাখা বা সম্প্রদায় মাত্র, এ তর্কের মীমাংসা এখনো হয় নাই; কারণ 'হিন্দু কে' এবং 'হিন্দুধর্ম কী' তাহার সংজ্ঞা এখনো পর্যন্ত সর্ববাদীভাবে স্বীকৃত হয় নাই। এই সংজ্ঞা বা পরিচয়ের অভাবে একদল লোক ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের অন্যতম সম্প্রদায় এবং উক্ত সমাজকে হিন্দুজাতির অসংখ্য বর্ণের অন্যতম 'জাত' হিসাবে দেখিতে চান। কিন্তু নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত লোকেদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্মকে বিশ্বজনীন ধর্ম ও হিন্দুধর্ম হইতে পৃথক ধর্মরূপে দেখিতে ও দেখাইতে উৎসুক। যে সংজ্ঞানুসারে লোককে সাধারণভাবে 'হিন্দু' বলা হয়, তাহার দ্বারা বিচার করিলে ব্রাহ্মগণকে হিন্দু বলা যায় না। কারণ, যদি বিরাট সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্য হইতে কেবলমাত্র বেদের অপৌরষেয়তা স্বীকার করা, মনুষ্যজাতির মধ্যে একমাত্র ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব ও দেবত্ব মানা, এবং অসংখ্য জীবজন্তুর মধ্য হইতে গোজাতির প্রতি বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন ও তাহার পবিত্রতা স্বীকার করাই হিন্দুত্বের পরখ হয়,— যদি বর্ণভেদ, ভোজ্যাভোজ্য, উচ্ছিষ্ট-অনুচ্ছিষ্ট, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য প্রভৃতি আচার রক্ষাই হিন্দুত্বের আবশ্যিক সর্ত হয়,— তবে ব্রাহ্মদের মধ্যে অনেকেই 'হিন্দু' আখ্যা গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন। কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজ বিবাহাদি বিষয়ে বর্ণবিচার করিতেন, উপনয়নাদি বিষয়ে কুলাচার পালন করিতেন; এতদ্‌ব্যতীত অপৌত্তলিক, নির্দোষ আচারবিচার সম্বন্ধে নবীন সমাজীদের ন্যায় কোনো গোঁড়ামি পোষণ করিতেন না। এইসব কারণে তাঁহারা আপনাদিগকে 'হিন্দু' বলিতে কুণ্ঠিত তো হইতেনই না, বরং মনে করিতেন হিন্দুর শ্রেষ্ঠ আদর্শ তাঁহারাই প্রচার করিতেছেন।

১৮৯১ সালের আদমসুমার গ্রহণের সময়ে ব্রাহ্মরা সেন্সাসে পৃথক্‌ভাবে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত ও গণিত হইবার দাবি জ্ঞাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ সেন্সাসের সর্বাধ্যক্ষকে জানাইয়া দেন যে আদি ব্রাহ্মসমাজের লোকদিগকে 'হিন্দুব্রাহ্ম'

১ পত্রাবলী [শিলাইদহ ১২৯৮ অগ্রহায়ণ] বিশ্বভারতী পত্রিকা ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৩৪৯ শ্রাবণ পৃ. ৩১।

বলিয়া যেন অভিহিত করা হয়, এবং সাধারণভাবে সকল ব্রাহ্মের উদ্দেশেই এই অনুরোধ পত্রিকাদিতে বিজ্ঞাপিত করিলেন।

বহুকাল পরে যখন আর একবার ব্রাহ্মরা হিন্দু কিনা প্রশ্ন উঠে, তখনও রবীন্দ্রনাথ এই মতই দৃঢ়তার সঙ্গে প্রচার করেন যে ব্রাহ্মরা হিন্দু জাতির অন্তর্গত শাখা। কিন্তু তিনি নিজেকে 'হিন্দু' বলিতেন বলিয়া কেহ যেন তাঁহাকে সামান্যভাবে হিন্দু মনে না করেন; রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ধর্ম' ও 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার ধর্মমত অতি স্পষ্টভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে তিনি যে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্ম ছিলেন তদ্‌বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না; নিজের ধর্মমত বিষয়ে অন্যের সহিত সহজে কখনো তিনি আপোস করিতে পারিতেন না।

এই বৎসরের একটি ঘটনা তাঁহার পরবর্তী জীবনেতিহাসের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত বলিয়া এইখানে উল্লেখ করিতেছি। ১২৯৮ সালের ৭ই পৌষ [১৮৯১ ডিসেম্বর ২২] শান্তিনিকেতনের মন্দির বা মঠের প্রতিষ্ঠা হয়; সেদিন কলিকাতা হইতে বহুলোক উপস্থিত হন, রবীন্দ্রনাথ 'সঙ্গীতকার্যে যোগদান করিয়া উপাসক মণ্ডলী'কে পরিতৃপ্তি দান করেন।[১] বোলপুরের সহিত কিভাবে মহর্ষির সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সে বিষয়ের ইতিহাস আলোচনা পূর্বেই করিয়াছি। মন্দির প্রতিষ্ঠার চারি বৎসর পূর্বে (১২৯৪) ট্রাস্টডীড করিয়া মহর্ষি শান্তিনিকেতনের বাড়ি জমি সর্বসাধারণের জন্য উৎসর্গ ও নিজ জমিদারির কিয়দংশ দেবত্র করিয়া দেন; দেবত্রের আয় হইতে শান্তিনিকেতনের অতিথিসেবা, ব্রহ্মোপাসনা, পৌষ-উৎসবাদির ব্যয় নির্বাহ হইত। ট্রাস্টডীড-অনুসারে তথায় কোনো মূর্তি বা প্রতিমা বা প্রতীকের পূজা হইতে পারে না; ধর্মের নিন্দা, মদ্য-মৎস্য-মাংস সেবন, নিন্দনীয় আমোদ আহ্লাদ প্রভৃতি বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। এই মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনে রবীন্দ্রনাথ কল্পনাও করেন নাই যে এইখানেই তাঁহার ধর্মসাধনার ও কর্মজীবনের কেন্দ্র হইবে।

শান্তিনিকেতনের উৎসবের পর রবীন্দ্রনাথকে জমিদারিতে ফিরিতে হয়— সম্পূর্ণ পৃথক জগতে। কোথায় ব্রহ্মমন্দির, ব্রাহ্মোৎসব ও শান্তিনেকেতনের জগৎ— আর পুনরায় আসিয়া পড়িলেন বস্তুতান্ত্রিক জগতের কর্মচক্রে। শিলাইদহ হইতে শ্রীশচন্দ্রকে লিখিতেছেন, "আমাদের এই বিরাহিমপুরের সেরেস্তা সবচেয়ে বিশৃঙ্খল— আমি মাস দুয়ের অধিককাল এটাকে আয়ত্ত করবার চেষ্টায় আছি। এখনো পেরে উঠলুম না। এককালে এই পরগণা নীলকরদের ইজারাধীন ছিল সেই সময়ে তারা অনাদরে কাগজপত্র সমস্ত নষ্ট করে বসে আছে। সেই অবধি এ-পর্যন্ত এখানে গোলমাল চলেই আসছে।"[২] এই পত্রেই তিনিই লিখিয়াছিলেন 'দিনকতক খুব কঠিন কথা পরিষ্কার করে বলা দরকার হয়েছে।' কারণ 'আধ্যাত্মিক কুয়াশা উঠে চারিদিক আচ্ছন্ন করে দিয়েছে।' এই আধ্যাত্মিক কুয়াশার স্রষ্টা চন্দ্রনাথ বসুপ্রমুখ নব্যহিন্দুর দল। এই সময়ে 'সাহিত্য'[৩] পত্রিকায় চন্দ্রনাথ 'আহারতত্ত্ব' সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধ উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'র (১২৯৮) পৌষ সংখ্যায়—'আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বসুর মত' শীর্ষক প্রবন্ধে এক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গত এইখানে বলিয়া রাখি চন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ বহুবার পত্রিকার মধ্যে আক্রমণ করিলেও উভয়ের মধ্যে পত্র ও প্রীতির বিনিময় চিরদিন সমভাবেই ছিল। সাধনার অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্প পড়িয়া চন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে যে পত্র লেখেন (২৫ পৌষ ১২৯৮) তাহাতে এই প্রবন্ধের কোনো উল্লেখ নাই।

১ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮১৩ শক (১২৯৮) মাঘ পৃ ১৯২।

২ পত্রাবলী, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত। বি-ভা-প ১৩৪৯ শ্রাবণ পৃ ৩১।

৩ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্তৃক সম্পাদিত মাসিক পত্র 'সাহিত্য' ১২৯৯ সালের বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হয়। সুরেশচন্দ্রের বয়স (জন্ম ১২৭৬—মৃত্যু ১৩২৭) এই সময়ে ২১ বৎসরমাত্র।

'আহারতত্ত্ব' প্রবন্ধে চন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছিলেন যে আহারের দুই উদ্দেশ্য, দেহের পুষ্টিসাধন ও আত্মার শক্তিবর্ধন। তিনি বলেন আহারে দেহের পুষ্টি হয় একথা সকল দেশের লোকই জানে, কিন্তু আত্মার শক্তি বর্ধনও যে উহার একটা কার্যের মধ্যে এ-রহস্য কেবল ভারতবর্ষেই বিদিত। কেবল ইংরেজি শিখিয়া এই নিগূঢ় তত্ত্ব ভুলিয়া ইংরেজি-শিক্ষিতগণ লোভের তাড়নায় পাশব আহারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন এবং ধর্মশীলতা, শ্রমশীলতা, ব্যাধিহীনতা, দীর্ঘজীবিতা, হৃদয়ের কমনীয়তা, চরিত্রের নির্মলতা, সাত্ত্বিকতা, আধ্যাত্মিকতা সমস্ত হারাইতে বসিয়াছেন। তিনি আরও বলেন 'নিরামিষ আহারে দেহমন উভয়েরই যেরূপ পুষ্টি হয়, আমিষযুক্ত আহারে সেরূপ হয় না।'

চন্দ্রনাথ বাবুর মত ও রবীন্দ্রনাথের মত উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি সত্য— সে আলোচনা আমাদের কর্তব্য নহে; কিন্তু এই লইয়া একদিন সাহিত্যের কুঞ্জবনে যে মাতামাতি হইয়াছিল এবং এইসব বিষয় লইয়া যে একদিন সাহিত্যিকরা মসীযুদ্ধ করিতেন, তাহাই দেখাইবার জন্য আমরা এই ঘটনাটির উল্লেখ করিলাম। রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথবাবুর জবাবে লিখিলেন, "এক সময়ে ব্রাহ্মণেরা আমিষ ত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু একমাত্র ব্রাহ্মণের দ্বারা কোনো সমাজ রচিত হইতে পারে না।...প্রাচীন ভারতবর্ষে ধ্যানশীল ব্রাহ্মণও ছিল এবং কর্মশীল ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রও ছিল, মগজও ছিল মাংসপেশীও ছিল; সুতরাং স্বাভাবিক আবশ্যকতা অনুসারে আমিষও ছিল, নিরামিষও ছিল; আচারে সংযমও ছিল, আচারে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা ছিল। যখন সমাজের ক্ষত্রিয়তেজ ছিল, তখনই ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিকতা উজ্জ্বলভাবে শোভা পাইত। অবশেষে সমাজ যখন আপনার যৌবনতেজ হারাইয়া আগাগোড়া সকলে মিলিয়া সাত্ত্বিক সাজিতে বসিল, কর্মনিষ্ঠ সকল বর্ণ ব্রাহ্মণের সহিত লিপ্ত হইয়া লুপ্ত হইয়া গেল; এই বৃহৎ ভূভাগে কেবল ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের পদানুবর্তী একটা ছায়ামাত্র অবশিষ্ট রহিল, তখনি প্রাচীন ভারতবর্ষের বিনাশ হইল। তখন নিস্তেজতাই আধ্যাত্মিকতার অনুকরণ করিয়া অতি সহজে যন্ত্রাচারী এবং কর্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া উঠিল। ভীরুর ধৈর্য আপনাকে মহতের ধৈর্য বলিয়া পরিচয় দিল, নিশ্চেষ্টতা বৈরাগ্যের ভেক ধারণ করিল।"

খাদ্যরসের সহিত আত্মার যোগ কোথায়, এই প্রশ্ন তুলিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "আহারের অন্তর্গত কোনো কোনো উপাদান বিশেষরূপে আধ্যাত্মিক, বিজ্ঞানে তাহা এ পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয় নাই।...একথা সত্য বটে স্বল্পাহার এবং অনাহার প্রবৃত্তিনাশের একটি উপায়। সকল প্রকার নিবৃত্তির এমন সরল পথ আর নাই। কিন্তু প্রবৃত্তিকে বিনাশ করার নামই যে আধ্যাত্মিক শক্তির বৃদ্ধিসাধন তাহা নহে।...প্রবৃত্তিকে রিপুজ্ঞান করিয়া থাক তবে শত্রুহীন হইতে গেলে আত্মহত্যা করা আবশ্যক, কিন্তু তদ্দ্বারা শক্তি বাড়ে কিনা তাহার প্রমাণ দুষ্প্রাপ্য।...কর্মেই মানুষের কর্তৃশক্তি বা আধ্যাত্মিকতার বলবৃদ্ধি হয়। কর্মেই মনুষ্যের সমুদয় প্রবৃত্তি পরিচালনা করিতে হয় এবং সংযতও করিতে হয়। কর্ম যতই বিচিত্র বৃহৎ এবং প্রবল,আত্মনিয়োগ এবং আত্মসংযমের চর্চা ততই অধিক।...প্রবৃত্তির সাহায্যে কর্মের সাধন এবং কর্মের দ্বারা প্রবৃত্তির দমনই সর্বোৎকৃষ্ট।" (সাধনা ১২৯৮ পৌষ, পৃ: ১৭৬)। প্রবন্ধের মধ্যে যেসব অবান্তর কথা-কাটাকাটি ছিল সেসব অংশ উদ্ধৃত করিয়া কোনো লাভ নাই।

সমসাময়িক অনেকের বিশ্বাস ছিল বঙ্কিমচন্দ্র শশধর তর্কচূড়ামণির দল ও মতাবলম্বী। রবীন্দ্রনাথ জানিতেন এ কথা সত্য নহে। চন্দ্রনাথপ্রমুখ নব্য-হিন্দুসমাজের নেতাদের উপর রবীন্দ্রনাথের যেরূপই মনোভাব থাকুক না কেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা অগাধই ছিল— যদিও বঙ্কিমচন্দ্রই বলিতে গেলে এই নব্য আন্দোলনকে যথার্থ প্রাণশক্তি দান করিয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে লেখেন "বঙ্কিমবাবু যে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ও শশধর তর্কচূড়ামণির ধুয়া ধরিয়া হিন্দুধর্মের পক্ষপাতী হইয়াছেন একথা মুহূর্তকালের জন্যও প্রণিধানযোগ্য নহে।" (সাধনা ১২৯৮ পৌষ, পৃ: ১৮৩)।

চন্দ্রনাথবাবুর আহারতত্ত্বের জবাবে রবীন্দ্রনাথ কর্মসম্বন্ধে যে-কথাগুলি প্রসঙ্গত উথাপন করেন তাহাই বোধ হয়

'কর্মের উমেদার' নামক একটি প্রবন্ধে বিষদ করিবার চেষ্টা করেন। য়ুরোপীয় সংসারযাত্রায় স্তূপীকৃত বস্তুভার ক্রমশই কিভাবে দুঃসহ হইয়া উঠিতেছে ইহা লইয়া আলোচনা শুরু হয়। সেখানে শোওয়া বসা চলাফেরা অশন বসন ভূষণ সকলদিকেই তাহাদের এত সহস্র সরঞ্জামের সৃষ্টি হইয়াছে যে, ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিতে গেলে অবাক্ হইতে হয়। রবীন্দ্রনাথের মতে বস্তুভারের চাপে মানুষের হৃদয় এবং বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষাকৃত অকর্মণ্য হইবার উপক্রম হইতেছে। "সভ্যতার অসংখ্য আসবাব যোগাইয়া ওঠা দিন দিন অসামান্য চেষ্টাসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। কল বাড়িতেছে এবং মানুষও কলের মত খাটিতেছে।...লোহার কলের সঙ্গে রক্তমাংসের মানুষকে সমান খাটিতে হইতেছে। কেবল বণিক সম্প্রদায় লাভ করিতেছেন ও ধনীসম্প্রদায় আরামে আছেন।" লেখক বলিলেন যে য়ুরোপের মানুষকে এরূপভাবে বেশিদিন পিষিয়া মারা যাইবে না। "য়ুরোপের মনুষ্যত্ব এইরূপ জীবন্ত এবং প্রবল থাকাতেই সহজে কোনো বিকারের আশঙ্কা হয় না। কোনোরূপ বাড়াবাড়ি ঘটিলেই আপনিই তাহার সংশোধনের চেষ্টা জাগিয়া উঠে।...মানুষ যেখানে স্বাধীন এবং স্বাধীনতাপ্রিয় সেখানে সত্বরেই হৌক বিলম্বেই হৌক সংশোধনের পথ মুক্ত আছে।"

ইহারই সহিত তুলনা করিলেন ভারতবর্ষের স্থিতিশীল জড়তামূর্তি। এ দেশের লোক সম্বন্ধে লিখিলেন, "যাহারা আপনার ধর্মবুদ্ধি এবং সংসারবুদ্ধি, দেহ এবং মনের প্রত্যেক স্বাধীনতাই বহুদিন হইতে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া জড়বৎ বসিয়া আছে, গ্রন্থবৎ আচার পালন করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কোনো একটা নূতন বিপৎপাত হইলে স্বাধীন প্রতিকার চেষ্টা প্রবল হইয়া উঠে না, উত্তরোত্তর তাহার চরম ফল ফলিতে থাকে।" "য়ুরোপ যেমন মেশিনযন্ত্রের ভার বহন করিয়া চলিতেছে, তেমনি ভারতবর্ষ শাস্ত্রের ও বিধিনিষেধের ভার বহন করিতেছে।" "আমাদের মানসিকরাজ্যে আমরা যন্ত্রের রাজত্বই বহন করিয়া আসিতেছি।" আমাদের ধর্মকার্য দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এমনি বাঁধা নিয়মে চলিয়া আসিতেছে যে মন হইতে স্বাধীনতার অঙ্কুর পর্যন্ত লোপ পাইয়াছে— স্বাধীনভাবে চিন্তাও করিতে পারে না, স্বাধীনভাবে কার্যও করিতে পারে না। নব্য হিন্দুসমাজকে সর্বপ্রকার গতিশীলতার বিমুখীজ্ঞানে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে তাঁহাদিগকে মৃদু তিরস্কার ও শ্লেষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। (সাধনা, ১২৯৮ মাঘ)

মাঘ সংখ্যায় 'স্ত্রীমজুর' নামে সংকলন-প্রবন্ধ ও 'দালিয়া' নামে ছোটো গল্প বাহির হয়। রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই দেশী ও বিদেশী সাময়িকপত্র প্রচুর পাঠ করিতেন; বিলাতী বহু শ্রেষ্ঠ পত্রিকার তিনি গ্রাহক এবং নিয়মিত পাঠক ছিলেন। এই সময়কার কোনো বিলাতী কাগজে য়ুরোপের কল ও মজুরদের সম্বন্ধে আলোচনা পাঠ করিয়া তিনি 'স্ত্রীমজুরদে'র সমস্যা লইয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন; ইতঃপূর্বে 'স্ত্রী-মজুরে'র সমস্যা সম্বন্ধে আর কেহ আলোচনা করিয়াছিলেন কিনা আমরা জানিনা।

সোনার তরী

বসন্তের অকালবোধন হয় শরতে; 'ক্ষ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এলো আশ্বিনেরই আঙিনায়'; আর ফাগুন দিনে-'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা' হইতেই বাধা কিসের? 'সোনার তরী' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের প্রবাহপথে একটা বড়ো রকমের বাঁকে তাঁহাকে উত্তীর্ণ করিল; কাব্যলক্ষ্মীর নূতন বীথি মানসলোকে প্রকাশিত হইল। 'মানসী' কাব্যগুচ্ছের শেষ কবিতা রচনার প্রায় পনেরো মাস পরে শিলাইদহ বাসকালে লিখিলেন 'সোনার তরী' (১২৯৮ ফাল্গুন) যদিও উহা লোকচক্ষু গোচর হয় প্রায় দেড় বৎসর পরে।[১] কী কুক্ষণে তিনি যে এই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ভাগ্যবিধাতা জানেন। নহিলে এই কবিতা লিখিত হইবার প্রায় চৌদ্দ বৎসর পরে

১ সোনার তরী, সাধনা ২য় বর্ষ ১৩০০ আঁষাঢ়। দ্র: সোনার তরী ১৩০০ [পৌষ] র-র ৩য় খণ্ড।

ইহাকে কেন্দ্র করিয়া বাংলার সাময়িক-সাহিত্যে যে পরিমাণ রস ও বিষ মথিত হইয়াছিল, তাহা রবীন্দ্রনাথের কোনো একটি কবিতা সম্বন্ধে পূর্বে বা পরে কখনো হয় নাই। সে কি কবিতার দোষ, না কবিতা লেখকের ভাগ্য।

'সোনার তরী' কবিতাটিকে যদি আমরা কেবল একখানি চিত্র হিসাবে দেখিতাম, তবে তাহাতে কোনো ক্ষতি ছিল না। লোকে শুধু রসে তৃপ্ত হয় না, তাহারা অর্থ চায়, ভোজনের পর দক্ষিণার ন্যায়। তরী কখনো সোনার হয় না, এবং সোনার নৌকায় করিয়া কোনো চাষী ধান কাটিতে যায় না। সুতরাং কবিতার চিত্র ও নামকরণ দুইই অবাস্তব পরী-কল্পনা সদৃশ। সুতরাং চিত্রহিসাবে দেখিলে কোনোই দোষ ছিল না। কিন্তু বাংলাসাহিত্যের এমন একদিন আসিয়াছিল, যখন এই কবিতার অর্থ আবিষ্কার করিবার জন্য সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক সকলেই লেখনী ধারণ করিলেন। অবশেষে কবিই স্বয়ং নিজের কাব্যের মল্লিনাথ হইয়া ব্যাখ্যাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন, সেও অবশ্য কবিতা রচনার সতেরো বৎসর পরে।

কবিতা লিখিবার সময় কবির মনে দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশের কোনো উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না; তদুপরি ইহাও বলিতে চাই যে কবির ব্যাখ্যাই যে এই কবিতার একমাত্র সংগত অর্থ, তাহা মানিবারও কোনো প্রয়োজন নাই। 'পঞ্চভূতে' কাব্যের তাৎপর্য অধ্যায়ে 'বিদায় অভিশাপ' আলোচনা উপলক্ষে কবি এই তত্ত্বটি ভালো করিয়া দেখান যে কাব্যের অর্থ বহু এবং বিচিত্র হইতে কোনো বাধা নাই। আমরা আজও দেখিতে পাইতেছি যে প্রাচীন মহাকবিদের কাব্যের ব্যাখ্যা ও ভাষ্য এখনো পর্যন্ত নিঃশেষিত হয় নাই। সুতরাং এযুগের কবির কাব্যেরও ব্যাখ্যা অসংখ্যরূপ হইতে পারে। ভিন্নকালে, ভিন্নপাত্রে, ভিন্ন পারিপার্শ্বিকে কাব্যের রূপব্যাখ্যা ভিন্ন হইতে বাধ্য। যে-কাব্য সেই বিচিত্রের দৃষ্টিসম্পাতে নানারূপে, নানাভাবে সাড়া না দেয়, সে-কাব্য সাময়িক, সে-কাব্য স্থানিক, সে-কাব্য গ্রাম্য। তাই বলিতেছিলাম 'সোনার তরী'র বহু ব্যাখ্যা হইয়াছে, এবং বহু ব্যাখ্যা হইবে, রবীন্দ্রনাথ সেই ব্যাখ্যাতাদের অন্যতম। পরিপূর্ণ যৌবনে যে কবিতা রচিত, প্রৌঢ়ত্বের অন্তে আসিয়া তাহাকে কবি কিভাবে দেখিয়াছিলেন তাহা আমরা পাঠকদের সম্মুখে পেশ করিতে পারি মাত্র, কিন্তু ফাগুন দিনে কবির মনে এই বরিষন-মুখরিত দিনের সুর কেমন করিয়া ধ্বনিল, তাহার সমসাময়িক ইতিহাস কবি রাখিয়া যান নাই।[১]

কবিতাটি লিখিত হয় ফাল্গুনমাসে, কিন্তু কবির চোখে ইহার ছবি ফুটিয়াছিল শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন দিনে; "যে দিন

১ কবি 'সোনার তরী'র ব্যাখ্যায় বলিতেছেন, "মানুষ সমস্ত জীবন ধ'রে ফসল চাষ করছে। তার জীবনের ক্ষেতটুকু দ্বীপের মতো—চারিদিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত—ঐ একটুখানিই তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে ···। যখন কাল ঘনিয়ে আসছে, যখন চারিদিকের জল বেড়ে উঠছে, যখন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ঐ চরটুকু তলিয়ে যাবার সময় হল তখন তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা কিছু নিত্য ফল তা সে ঐ সংসারের তরণীতে বোঝাই ক'রে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না— কিন্তু যখন মানুষ বলে ঐ সঙ্গে আমাকেও নাও, আমাকেও রাখ, তখন সংসার বলে তোমার জন্য জায়গা কোথায়? তোমাকে নিয়ে আমার হবে কি? তোমার জীবনের ফসল যা কিছু রাখবার তা সমস্তই রাখব, কিন্তু তুমি ত রাখবার যোগ্য নও।"

"প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু না কিছু দান করছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, রক্ষা করছে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না, কিন্তু মানুষ যখন সেই সঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে। এই যে জীবনটি ভোগ করা গেল, অহংটিকেই তার খাজনাস্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে— ওটি কোনোমতেই জমাবার জিনিস নয়।" (শান্তিনিকেতন ৭ম খণ্ড। তরী বোঝাই। ৪ চৈত্র ১৩১৫)। শান্তিনিকেতন মন্দিরের উপদেশ দানের কয়েকমাস পূর্বে লিখিত 'পূর্ব ও পশ্চিম' (প্রবাসী ১৩১৫, ভাদ্র ২৮৮-৯৬। দ্র. সমাজ) নামক প্রবন্ধে কবি মহাকালকেই সোনার তরীর নেয়ে বলিয়াছিলেন— "গ্রীস ও রোম মহাকালের সোনার তরীতে নিজের পাকা ফসল সমস্ত বোঝাই করিয়া দিয়াছে; কিন্তু তাহারা নিজেও সেই তরণীর স্থান আশ্রয় করিয়া আজ পর্যন্ত যে বসিয়া নাই তাহাতে কালের অনাবশ্যক ভার লাঘব হইয়াছে মাত্র, কোনো ক্ষতি করে নাই।" দ্র রবিরশ্মি। পৃ. ২২২-৭১। সোনার তরী কবিতা সম্বন্ধে বহুবিস্তারে আলোচনা আছে।

বর্ষার অপরাহ্ণে খরস্রোত পদ্মার উপর দিয়ে কাঁচা ধানে ডিঙিনৌকা বোঝাই করে মগ্নপ্রায় চর থেকে চাষীরা এপারে চলে আসছে · সেই দিনই সোনার তরী কাব্যের সঞ্চার হয়েছিল মনে··।" "আমার মনে সোনার তরীর যে ইতিহাসটা সত্য হয়ে আছে সেটা হচ্ছে সেই শ্রাবণদিনের ইতিহাস, সেটা কোন্ তারিখে লিখিত হয়েছিল সেইটেই আকস্মিক,— সে দিনটা বিশেষ দিন নয়।"— (রবিরশ্মি পৃ. ২৩০) অবচেতন মনে সেই চিত্রখানি ছিল, তারপর একদিন ফাগুনের উতলা হাওয়ার মৃদু স্পর্শে স্মৃতিপটের পরদা অপসারিত হইলে কবিতাটি লেখনীমুখে উৎসারিত হইল।

কর্মসম্বন্ধে কবির এমন নির্বিকার ভাব হইবার কি কোনো কারণ আছে। 'কর্মের উমেদার' প্রবন্ধে ও 'স্ত্রীমজুর' সম্বন্ধে প্রসঙ্গকথায় কবি কর্মসম্বন্ধে বহু তথ্য ও তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছিলেন; কর্মশীলতার পরিণাম কোথায় সেই প্রশ্নই কি মনে জাগিতেছিল, যাহার উত্তরে এই সোনার তরী কবিতা লিখিলেন? ইহার উত্তর পাওয়া যাইবে না।

কবির মনে জাগিতেছে কোন্ 'শ্রাবণ গগনের' স্মৃতি। কিন্তু আজ এই আত্মীয়শূন্য আবেষ্টনীতে আরও সুদূর অতীতের ছবিও মনে হইতেছে, শৈশব সন্ধ্যার কথা। "মনে পড়ে সেই সন্ধ্যাবেলা শৈশবের; কত গল্প, কত বাল্যখেলা, এক বিছানায় শুয়ে মোরা সঙ্গী তিন; সে আজিকার কথা হ'ল কত দিন।" ইহার সঙ্গে কল্পনায় জাগিতেছে— "কতশত নদীতীরে, কত আম্রবনে, কাংস্যঘণ্টামুখরিত মন্দিরের ধারে, কত শস্যক্ষেত্রপ্রান্তে, পুকুরের পাড়ে গৃহে গৃহে জাগিতেছে নব হাসিমুখ, নবীন হৃদয়ভরা নব নব সুখ, কত অসম্ভব কথা, অপূর্ব কল্পনা, কত অমূলক আশা, অশেষ কামনা, অনন্ত বিশ্বাস।" (শৈশবসঙ্গীত, সোনার তরী)।

শৈশব সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে, 'এক বিছানায় শুয়ে মোরা সঙ্গী তিন।' এই সময়ে লিখিতেছেন, 'আমরা তিন বাল্যসঙ্গী যে ঘরে শয়ন করিতাম, তাহার পাশের ঘরের দেওয়ালে একটি আস্ত নরকঙ্কাল ঝুলানো থাকিত। রাত্রে বাতাসে তাহার হাড়গুলা খট্‌খট্ শব্দ করিয়া নড়িত।" এই স্মৃতি অবলম্বন করিয়া 'কঙ্কাল' গল্পের কাহিনীটির সূত্রপাত হয়— বাস্তবে-অবাস্তবে মিশিয়া অপরূপ লিরিসিজমের রসেগড়া ছোটোগল্প। সেখানেও অপূর্ব কল্পনা, অমূলক আশা, অশেষ কামনার ব্যর্থ পরিণতি। 'কঙ্কাল' গল্পটি ফাল্গুন মাসের (১২৯৮) সাধনায় বাহির হয়— 'শৈশব সন্ধ্যা' কবিতাটি রচিত এই মাসেই।

এই কবিতাটির একটি ভাবব্যাখ্যা কবি স্বয়ং পত্রধারার মধ্যে প্রকাশ করেন। "আমার 'শৈশব সন্ধ্যা' কবিতায় বোধ হয় কতকটা এই ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছিলুম। কথাটা সংক্ষেপে এই যে, মানুষ ক্ষুদ্র এবং ক্ষণস্থায়ী, অথচ ভালোমন্দ এবং সুখদুঃখপরিপূর্ণ জীবনের প্রবাহ সেই পুরাতম সুগভীর কলস্বরে চিরদিন চলচে ও চলবে— নগরের প্রান্তে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই চিরন্তন কলধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্চে। মানুষের দৈনিক জীবনের ক্ষণিকতা ও স্বাতন্ত্র্য এই অবিচ্ছিন্ন সুরের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্চে, সবশুদ্ধ খুব একটা বিস্তৃত আদিঅন্তশূন্য প্রশ্নোত্তরহীন মহাসমুদ্রের একতান শব্দের মতো অন্তরের নিস্তব্ধতার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ ক'রচে। এক এক সময়ে কোথাকার কোন্ ছিদ্র দিয়ে জগতের বড়ো বড়ো প্রবাহ হৃদয়ের মধ্যে পথ পায়— তার যে একটা ধ্বনি শোনা যায় সেটাকে কথায় তর্জমা করা অসাধ্য।"[১]

বৎসর প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, দারুণ গ্রীষ্ম। শিলাইদহের সম্মুখে বোটে আছেন। সেখান হইতে ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন, "এখানে এসে আমি এত এলিমেন্টস্ অফ পলিটিক্স এবং প্রব্লেমস্ অফ দি ফ্যুচার পড়ছি শুনে বোধ হয় খুব আশ্চর্য ঠেকতে পারে।" আমাদের আশ্চর্য লাগে না, কারণ রবীন্দ্রনাথ যে কত বড়ো 'পড়ুয়া' ত্রিশ বৎসরের উপর তাহা লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। ঐ পত্রমধ্যে কবি লিখিতেছেন, "ঠিক এখানকার উপযুক্ত কোনো কাব্য নভেল খুঁজে পাইনে।" ইংরেজি নভেলের উগ্রতা পদ্মাচরের স্নিগ্ধ শোভাকে

১ সাহাজাদপুরের পথ, জুলাই, ১৮৯৪ [১৩০১ আষাঢ়] ছিন্নপত্র পৃ. ২৬৯।

চারিদিকের নিস্তব্ধতাকে নষ্ট করে। "এখানে পড়বার উপযোগী রচনা ... ... এক বৈষ্ণব কবিদের ছোটো ছোটো পদ...।" ইহারই সঙ্গে মনে হইতেছে "বাংলায় যদি কতকগুলি ভালো ভালো মেয়েলি রূপকথা জানতুম এবং সরল ছন্দে সুন্দর ক'রে ছেলেবেলাকার ঘোরো-স্মৃতি দিয়ে সরস ক'রে লিখতে পারতুম তাহলে ঠিক এখানকার উপযুক্ত হোত।" এই সময়েই বোধ হয় লেখেন মেয়েলি রূপকথা 'বিম্ববতী' (১২৯৮ ফাল্গুন) ও 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' (চৈত্র)। 'বিম্ববতী' সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন যে তাঁহার ভাইঝি অভিজ্ঞার নিকট হইতে গল্পটি সংগৃহীত। হেমেন্দ্রনাথের কন্যা অভিজ্ঞা কবির খুব প্রিয় ছিল; যখন-তখন সে কাকার ঘরে ঢুকিয়া অনেক উপদ্রব করিত; তাহার কণ্ঠও ছিল খুব মিষ্ট। কৈশোরেই তাহার মৃত্যু হয়; তাহার স্মৃতি বহন করিয়া চৈতালিতে কয়েকটি কবিতা আছে।

'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' কবিতাটির পরিপূরক হইতেছে 'নিদ্রিতা' ও 'সুপ্তোত্থিতা'— মাসদেড় পরে বোলপুরে রচিত। কবিতা তিনটি পরপর পড়িলে উহাদের মধ্যে একটি মিলনসূত্র সহজেই পাঠকের চোখে পড়িবে। দারুণ গ্রীষ্মে সপরিবারে বোলপুর আসিলেন; এখন কবির বয়স একত্রিশ; মৃণালিনী দেবী এখন তিনটি সন্তানের জননী— বেলা (৬), রথীন্দ্র (৪) ও রেণুকা (২)। তাঁহারা থাকেন 'শান্তিনিকেতন' দ্বিতল বাড়িতে। এই সময়কার কতকগুলি পত্র আছে 'ছিন্নপত্রে'র মধ্যে; অধুনা-প্রকাশিত আরও কতকগুলি পত্রে (বিশ্বভারতী পত্রিকা ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা) রবীন্দ্রনাথের গার্হস্থ্য-জীবন ও সন্তানদের প্রতি তাঁহার পরম করুণা ও স্নেহ অকৃত্রিমভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। গ্রন্থাকারে যে 'ছিন্নপত্র' বাহির হইয়াছে, তাহা কবি সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন; গ্রন্থ প্রকাশের জন্য যেটুকু কৃত্রিমতা একজন সুতীক্ষ্ণ আর্টিস্ট করিতে পারেন, তাহা যে করা হইয়াছিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র জলেস্থলেঘাটে শীর্ষক রচনাগুলির সহিত 'ছিন্নপত্রের' পাঠের তুলনার দ্বারা; আবার ছিন্নপত্রের পাঠের সহিত অধুনা প্রকাশিত ছিন্নপত্রগুলির পাঠের তুলনা করিলে এই মত আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। নূতন 'ছিন্নপত্র' গুলি সম্পাদিত নহে, তাহাতে মানুষ রবীন্দ্রনাথের মনের সবটাই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। সে-লেখা ছাপাখানায় যাইতে পারে বা যাইবে, সে আত্মচেতনা কবির তখনো হয় নাই। তাই এই লেখাগুলির মধ্যে আসল মানুষটিকে 'অসম্পাদিত' ভাবে পাই।

সাধনার নিত্যনৈমিত্তিক গদ্য লেখা প্রচুর লিখিতে হয় সত্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এবার শান্তিনিকেতনে বাসকালে যে কয়েকটি কবিতা লিখিলেন, তাহার মধ্যে কয়েকটি রূপকথারই অনুক্রমণ। 'নিদ্রিতা' (১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯) ও 'সুপ্তোত্থিতা'র (১৫ই) কথা পূর্বেই বলিয়াছি। উভয় কবিতা পরস্পরের পরিপূরক এবং 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' কবিতার সহিত একত্র পঠনীয়। রাজার ছেলে ও মেয়ে রাজার হইলেও তাহারা চিরন্তন পুরুষ ও চিরন্তন নারী,— পুরুষের ভাষায় 'আমরা ও তোমরা'। কিছুকাল হইতে কবির নানা লেখার মধ্যে নরনারীর চারিত্রগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের ও সমাজে নরনারীর যথাযথ স্থান-নির্দেশের চেষ্টা চলিতেছে। সে-বিশ্লেষণ কখনো জীবতত্ত্ব, কখনো ধনতত্ত্ব, কখনো সৌন্দর্যতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া হইয়াছে। 'তোমরা এবং আমরা' (১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯) কবিতায় আছে—

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও কুলুকুলু কল নদীর স্রোতের মতো।
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি, মরমে গুমরি' মরিছে কামনা কত।

এ বিশ্লেষণ পূর্বোল্লিখিত কোনো তত্ত্বের অন্তর্গত নহে— ইহার নামকরণ করা হউক সুখতত্ত্ব। কিছুদিন পূর্বে শিলাইদহে নৌকাবাসকালে কবি নদীতীরে নরনারীর দৈনন্দিন জীবনের জললীলামাধুরী লক্ষ্য করিবার সুযোগ পান; সেই সঙ্গে তাহাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যও তাঁহার চোখে পড়ে। "মেয়েদের যেন জলের সঙ্গে বেশি ভাব। পরস্পরের যেন একটা সাদৃশ্য এবং সখিত্ব আছে— জল এবং মেয়ে উভয়েই বেশ সহজে ছল্ ছল্ জল জল ক'রতে থাকে, একটা

বেশ সহজ গতি ছন্দ তরঙ্গ,.........। মেয়েরা জল ভালোবাসে কেননা উভয়ে স্বজাত। অবিশ্রাম সহজ প্রবাহ এবং কলধ্বনি জল এবং মেয়ে ছাড়া আর কারো নেই।"[১]

সুতরাং 'তোমরা এবং আমরা' কবিতা লিখিবার পূর্ব হইতেই পুরুষ ও নারীর মধ্যে স্বভাবগত পার্থক্য সম্বন্ধে তুলনা মনে জাগিয়াছিল। কিন্তু 'তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া' যাবে— বলিলে নারীকে ক্ষুণ্ণ করা হয়; কারণ সে শুধু চলে না, সে বাঁধনেও ধরা দেয়। যে-নারী ভালোবাসে সেই তো 'সোনার বাঁধন' পরে। তাই আমাদের মনে হয় 'সোনার বাঁধন' কবিতাটি যেন পূর্বোক্ত কবিতাটির উত্তর বা সমাধান। "তুমি বদ্ধ স্নেহ প্রেম করুণার মাঝে,— শুধু শুভকর্ম, শুধু সেবা নিশিদিন।" দুইটি কবিতা পরস্পরের পরিপূরক, 'তোমরা এবং আমরা'য় আছে নারীচরিত্রের নেতির দিক, 'সোনার বাঁধনে' আছে তাহার পরিণতি ও সার্থকতার দিক।

'তোমরা ও আমরা' কবিতাটি লিখিবার পর একখানি পত্রে ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন, "একটি কবিতা লিখে ফেল্লে যেমন আনন্দ হয়, হাজার গদ্য লিখলেও তেমন হয় না কেন তাই ভাবচি। কবিতায় মনের ভাব বেশ একটি সম্পূর্ণতা লাভ করে, বেশ যেন হাতে ক'রে তুলে দেবার মতো।... রোজ রোজ যদি একটি ক'রে কবিতা লিখে শেষ ক'রতে পারি তাহলে জীবনটা বেশ একরকম আনন্দে কেটে যায়—কিন্তু এতদিন ধ'রে সাধনা ক'রে আসচি ও জিনিষটা এখনো তেমন পোষ মানেনি"।[২]

নাটকেরও প্লট মাথায় ঘুরিতেছে। আবার 'বর্ষা যাপনে' (১৭ জ্যৈষ্ঠ) লিখিতেছেন—

> ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত গল্প লিখি একেকটি ক'রে।
> ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা ছোটো ছোটো দুঃখকথা নিতান্তই সহজ সরল;
> সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি' তারি দু'চারিটি অশ্রুজল।

কবির বিচিত্র সাধ, শিশুমনের ন্যায়ই নূতনের জন্য আবেগময় ও লালায়িত। পরদিন লিখিলেন 'হিং টিং ছট্'[৩] ও তৎপর দিবসে 'পরশ-পাথর'— সম্পূর্ণ বিপরীত রসের দুই কবিতা। 'হিংটিংছট' রসাত্মক কবিতা বটে, তবে তাহা তীব্র ব্যঙ্গ রস, পাঠকের উপভোগ্য হইলেও যাহার বা যাহাদের লক্ষ্য করিয়া উহা রচিত হইয়াছিল, তাহাদের পক্ষে আদৌ শ্রুতিসুখকর হয় নাই। কবির মনে অকস্মাৎ এই তীব্র ব্যঙ্গের উদ্ভব কেন হইল, তাহা আমরা বলিতে পারি না। এই ব্যঙ্গ কবিতাটির লক্ষ্যস্থল কে, তাহা লইয়া সমসাময়িক পত্রে এককালে বহু গবেষণা হইয়াছিল। তৎকালীন লেখকদের ধারণা হইয়াছিল যে কবিতাটি চন্দ্রনাথ বসুকে লক্ষ্য করিয়া রচিত; কারণ যে মাসের 'সাধনা'য় হিং টিং ছট্ বাহির হয়, সেই সংখ্যায় 'চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব' নামে এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন; আমাদের মনে হয় এই প্রবন্ধটি সাধনার 'নিত্যনৈমিত্তিক লেখার' অন্যতম। চন্দ্রনাথ বসুর 'লয়তত্ত্ব' প্রবন্ধ যে তাঁহার অবচেতন মনে কাজ করিতেছিল না, তাহা বলা সুকঠিন। কিন্তু ইহা যে চন্দ্রনাথ বসুকে লক্ষ্য[৪] করিয়া

১ ছিন্নপত্র পৃ ১১৯-২০। ৭ এপ্রিল ১৮৯২ [১২৯৮ চৈত্র ২৬] ২ ছিন্নপত্র পৃ ১৩৪। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯।

৩ হিং টিং ছট ১৮ জ্যৈষ্ঠ। শান্তিনিকেতন। পরশপাথর ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯। সাধনা ১২৯৯ আষাঢ়।

৪ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, তর্কবৈচিত্র্য, সাহিত্য, ১২৯৯ ফাল্গুন। "কবিতার লক্ষ্যস্থল চন্দ্রনাথ বসু।" তিনি রবীন্দ্রনাথকেই এই বিরোধের জন্য দায়ী করেন। নবীনচন্দ্র সেন, 'আমার জীবন' পুস্তকে চন্দ্রনাথ বসুর উল্লেখ যেখানেই করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহাকে 'হিংটিংছট' বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। দ্র রবিরশ্মি ২৩৯।

চন্দ্রনাথ বাবু বলিয়াছিলেন যে শশধর তর্কচূড়ামণি যেমন বলিলেন ধৃ ধাতু হইতে ধর্ম, অর্থাৎ যাহা ধারণ করে তাহাই ধর্ম তেমনি আমার সংশয় দূর হইল, বিশ্বের যাহা কিছু আছে সকলই ধর্মের অন্তর্গত দেখিলাম।...যাহা এত অন্বেষণে পাই নাই তাহা পাইলাম। (বঙ্গভাষার লেখক পৃ. ৬৯১) এই শ্রেণীর যুক্তিরই ব্যঙ্গ উত্তর হইতেছে— "স্বপ্নকথা শুনি' মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল গৌড়ীয় সাধু প্রহর ধরিয়া, নিতান্ত সরল, অর্থ, অতি পরিষ্কার, বহু পুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার।" ইত্যাদি

রচিত, তাহা একখানি পত্রযোগে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেন। আমাদের মনে হয় রূপকথা লিখিতে গিয়া জিনিসটা এই রূপ লইয়াছিল; মনের অবচেতনে যে বিরুদ্ধতা ছিল, তাহা তাঁহার অজ্ঞাতেই প্রকাশ পাইয়াছিল।

'হিং টিং ছটে'র পরদিন লিখিলেন 'পরশপাথর'। ইহা যে কবির শ্রেষ্ঠ কবিতারাজির অন্যতম, তাহা প্রায় সর্ববাদীসম্মত। শান্তিনিকেতন বাসকালে ইহাই এবারকার মতো শেষ কবিতা রচনা; ইহার পরে প্রায় একমাস তাঁহার সহিত কাব্যলক্ষ্মীর আর দেখাশুনা হয় নাই। শান্তিনিকতনে বাসের 'ছেলেবেলাকার ঘোরো-স্মৃতি' ঘিরিয়া 'পরশপাথর' কবিতাটির কল্পনা উদয় হয় বলিয়া আমাদের মনে হয়। তাঁহাদের এক ফরাসি পাচক 'একটা ছোটো হাতুড়ি নিয়ে আর একটা থলি কোমরে ঝুলিয়ে খোয়াইয়ে দুর্লভ পাথরের সন্ধান করে বেড়াত। একদিন একটা বড়গোছের স্ফটিক সে পেয়েছিল।... আমিও সমস্ত দুপুরবেলা খোয়াইয়ে প্রবেশ ক'রে নানারকম পাথর সংগ্রহ করেছি, ধন উপার্জনের লোভে নয়, পাথর উপার্জন করতেই।"[১] কবির মনে শান্তিনিকেতনের পুরানো স্মৃতি, ভোরের পাখির অকারণ ডাক, সব ছিল মনের অবচেতন স্তরে। 'পরশপাথরে'র মধ্যে উপমাচ্ছলে যে লিখিয়াছিলেন,

বিরহী বিহঙ্গ ডাকে সারা নিশি তরুশাখে, যা'রে ডাকে তা'র দেখা পায় না অভাগা।
তবু ডাকে সারাদিন আশাহীন শ্রান্তিহীন একমাত্র কাজ তা'র ডেকে ডেকে জাগা।

এই চিত্রটি সেদিনের পত্রধারার[২] মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। পরশপাথর সন্ধানের মধ্যে যে ব্যর্থতা পরিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা যেন পাখির ডাকের অর্থহীন পুনরাবৃত্তির মধ্যে রূপ লইয়াছে।

মানুষ খ্যাপার মতো জীবনের দুর্লভ ক্ষণের অনুসন্ধানে ছুটিয়া চলিয়াছে; সে সদাই ভাবিতেছে স্পর্শমণি পাইলে জীবন সার্থক হইবে। অর্থাৎ জীবনকে পাইতে হইলে বিশেষ সময়ে বিশেষ কোনো পদার্থের স্পর্শ প্রয়োজন। কিন্তু কর্মপ্রবাহের মধ্যেই যে তাহার জীবন পরিপূর্ণ হইয়া চলিয়াছে, তাহা সে জানে না; দৈনন্দিন কর্মঅভ্যাসের ফলে জীবনের পরম সুন্দর মুহূর্তগুলিকে সে উপেক্ষা করিয়া চলে, তাহাদের দিকে ফিরিয়া তাকায় না। অকস্মাৎ সে আবিষ্কার করে তাহার অন্তহীন কর্মশৃঙ্খলের মধ্য দিয়া জীবনের চরম সার্থকতাকে সে কোনো দুর্লভ ক্ষণে লাভ করিয়া গিয়াছে। সে জানে না কেমনভাবে তাহা সাধিত হইল। সে জানিতে পারে নাই, কখন্ তাহার কঠিন লৌহসমান জীবন স্বর্ণময় হইয়াছে। জীবনপ্রবাহে কিসের আঘাতে, কখন্ যে জীবন সার্থক হয়, তাহা বলা বড়ো কঠিন। প্রতিদিনের অভ্যস্ত কর্মের ব্যস্ততায় তাহা সে লক্ষ্য করে নাই। যে-স্পর্শমণির সন্ধানে সে জীবন ব্যাপিয়া কর্মসাগরকে মন্থন করিয়া বেড়াইয়াছিল, সেই পরশ পাথরকে সে পাইয়াছে বটে, কিন্তু জ্ঞানত নহে। তাই সে এক সময়ে জানিতে চায় কোন্ মুহূর্তে কিসের স্পর্শে জীবন তাহার স্বর্ণময়, সুন্দর ও সার্থক হইয়াছে। খ্যাপা বুঝে না যে, সে যাহার সন্ধানে ফিরিতেছে, তাহা কোনো বিশেষ বস্তু নহে,— সেটি জীবনধারার সমগ্র সাধনা, বিশেষের মধ্যে তাহার অনুসন্ধান নিরর্থক।

জ্যৈষ্ঠের শেষদিকে রবীন্দ্রনাথ একাই উত্তরবঙ্গে চলিলেন, পরিবার কলিকাতায় রাখিয়া গেলেন। কবির চিত্ত হঠাৎ কেন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল বুঝি না। বেশ একটা সুস্থ সবল উন্মুক্ত অসভ্যতার জন্য আকাঙ্ক্ষা কেন। ইন্দিরা দেবীকে শিলাইদহ হইতে লিখিতেছেন, "আমি অন্তরে অসভ্য অভদ্র— আমার জন্যে কোথাও কি একটা ভারি সুন্দর অরাজকতা নেই।"[৩] একটা দ্বিধাহীন চিন্তাহীন প্রাণ লইয়া খুব একটা প্রবল জীবনের আনন্দ লাভ করিবার জন্য তীব্র আবেগ; তার সঙ্গে বুদ্ধির, বুদ্ধির সঙ্গে ইচ্ছার, ইচ্ছার সঙ্গে কর্মের যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব তাহা হইতে মুক্তি চাহিতেছেন।

কিন্তু কবির মন অল্প আঘাতেই ম্লান, অল্প কারণেই উত্তেজিত হয়; আবার অল্পকাল মধ্যেই শান্ত স্বাভাবিক হয়।

১ আশ্রমবিদ্যালয়ের সূচনা, প্রবাসী ১৩৪০, আশ্বিন পৃ. ৭৪১।

২ ছিন্নপত্র। বোলপুর, ৩১ মে ১৮৯২ (১২৯৯, জ্যৈষ্ঠ ১৯)

৩ ছিন্নপত্র। শিলাইদহ। ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৮৯২ জুন ১২। পুনশ্চ—শিলাইদহ ২রা আষাঢ় '১২৯৯।

তাই দেখি পরদিনই ভ্রাতুষ্পুত্রীকে পত্রমধ্যে লিখিতেছেন, "সহজভাবে আপনার জীবনের প্রাত্যহিক কাজ ক'রে যাওয়ার চেয়ে সুন্দর এবং বৃহৎ আর কিছু হতে পারে না।"[১] কয়েকদিন পরে পুনরায় তাঁহাকে লিখিতেছেন, "বড়ো বড়ো দুরাশার মোহে জীবনের ছোটো ছোটো আনন্দগুলিকে উপেক্ষা করে আমাদের জীবনকে কী উপবাসী ক'রেই রাখি।"[২] কিন্তু মনের মধ্যে যতই দ্বন্দ্ব চলুক, "ঢুল্‌তে ঢুল্‌তে গড়াতে গড়াতে সাধনার কাজ"[৩] করিতেই হইতেছে। জমিদারির কর্মচারীরাও বড়ো বড়ো কাগজের তাড়া লইয়া আসে, নানাবিধ প্রার্থনা জানায়। আবার স্ত্রীর চিঠি আসে না, মন ব্যস্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ কবি হইলেও সাধারণ মানুষের ন্যায়ই রক্তমাংসেগড়া দেহমন লইয়া সংসার করেন; স্ত্রীকে লিখিতেছেন, "তোমাদের মত এত অকৃতজ্ঞ আমি দেখিনি! পাছে তোমাদের চিঠি পেতে এক দিন দেরি হয় বলে কোথাও যাত্রা করবার সময় আমি একদিনে উপরি উপরি তিনটে চিঠি লিখেচি।...চিঠি লিখে লিখে কেবল তোমাদের অভ্যাস খারাপ করে দেওয়া হয়।" স্ত্রী কন্যা পুত্রের জন্য রবীন্দ্রনাথের কী উৎকণ্ঠা, কী উদ্‌বেগ যখন দূরে থাকেন।

কবির অন্তরের আকাঙ্ক্ষা,—জীবনের প্রতিদিনের অযাচিত ছোটোখাটো আনন্দগুলিকে উপভোগ করেন। অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন কী প্রেমলীলা। দেবতার দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখেন সেখানেও অনন্ত প্রেম। ভক্তেরা যে স্বর্গলোক সৃষ্টি করিতেছে, সেখানেও প্রেমলীলা। তাই কবির মনে হইতেছে, দেবতার মধ্যে এই যে প্রেমলীলার তত্ত্ব, ইহা তো মানুষের মনেরই কল্পনা, কবিরাই তো ইহার স্রষ্টা। কবির অন্তরের এই প্রেমছবি, পৃথিবীর প্রণয়-অভিজ্ঞতা হইতেই তো দেবলীলা পরিকল্পিত। আজ কবির চোখে দেবতা (is made after the image of man) মানুষের মনের সৃষ্টি বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। মানব মনের পটভূমিতে যে প্রেমাকাঙ্ক্ষা নিত্য জাগিতেছে, তাহাই বৈষ্ণবকবি দেবতাতে আরোপ করিয়াছেন। তাই কবি যেন তাঁহাকে শুধাইতেছেন—

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?
পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ মিলন,
বৃন্দাবনগাথা, এই প্রণয় স্বপন,
শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে,
চারিচক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
শরমে সম্ভ্রমে,— একি শুধু দেবতার।

...

সত্য ক'রে কহ মোরে হে বৈষ্ণবকবি
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ তাপিত? হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিলো মনে?

......এত প্রেমকথা,
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হ'তে?...এই প্রেম-গীতি-হার
গাঁথা হয় নরনারী-মিলন-মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে— প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

এই কথাই 'চৈতালি'তে বলেন 'যারে বলে ভালোবাসা, তারে বলে পূজা।' (পুণ্যের হিসাব)। 'পঞ্চভূতে'র মধ্যে 'মনুষ্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই প্রেমতত্ত্ব অন্যভাবে আলোচনা করিয়াছেন; "যাহাকে আমরা ভালোবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। অনন্তকে অনুভব করারই নাম ভালোবাসা; প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্যসম্ভোগ। সমস্ত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে।" 'দেবতারে প্রিয় করি,

১ ছিন্নপত্র। শিলাইদহ, ১৬ই জুন ১৮৯২, ১২৯৯ আষাঢ় ৩

২ ছিন্নপত্র। ২৮ জুন ১৮৯২

৩ চিঠিপত্র ১ পৃ ২১

প্রিয়েরে দেবতা'-র মধ্যে বেশ একটু দ্বৈতবোধ, এমনকি দ্বন্দ্বও আছে। এক দিকে দেবতা অপর দিকে মানব, একদিকে বিশ্ব, অপর দিকে পরিবার; অসীম ও সীমা, ব্যষ্টি ও সমষ্টির চিরন্তন দ্বন্দ্ব।[১]

পুরুষ ও প্রকৃতির এই চিরন্তন দ্বন্দ্বের সমাধান এ নয় যে প্রকৃতিকে বাদ দেওয়া, "তোমাদের আমি চাহি না কারেও, শশী চাই করতলে"— বলিয়া ক্রন্দন। যে মানুষ নিজের অন্তরের মাঝে জগতের এই আপাত-প্রতীয়মান দ্বন্দ্বের সমাধান করিতে অসমর্থ, সেই হয় অসম্ভবের জন্য ব্যাকুল— সেই চায় abstraction কে; সে বলে জগত মিথ্যা—

হাতে তুলে দাও আকাশের চাঁদ— এই হল তার বুলি। দিবস রজনী যেতেছে বহিয়া, কাঁদে সে দু'হাত তুলি।

কিন্তু এই মিথ্যা দৃষ্টি দূর হইলে,

দেখিল চাহিয়া জীবন পূর্ণ সুন্দর লোকালয়, প্রতিদিবসের হরষে বিষাদে চির-কল্লোলময়

যাহাদের পানে নয়ন তুলিয়া চাহেনি কখনো ফিরে, নবীন আভায় দেখা দেয় তা'রা স্মৃতি-সাগরের তীরে।...

দু'বাহু বাড়ায়ে ফিরে যেতে চায় ওই জীবনের মাঝে। যাহা পেয়েছিলো তাই পেতে চায় তা'র বেশি কিছু নহে।

ইহারই কয়দিন পূর্বে কবি পত্রধারায় ইন্দিরা দেবীকে লিখিয়াছিলেন, "এই সমস্ত সুলভ আনন্দের অপরিতৃপ্তি জীবনের হিসাবে প্রতিদিন বেড়ে উঠ্‌চে— এর পরে এমন একটা দিন আসতেও পাবে যখন মনে হবে যদি আবার জীবনটা সমস্তটা ফিরে পাই তাহলে আর কিছু অসাধ্যসাধন করতে চাইনে কেবল জীবনের এই প্রতিদিনের অযাচিত ছোটো ছোটো আনন্দগুলি প্রতিদিন উপভোগ ক'রে নিই।"[২]

এবারকার শেষ কবিতা 'গানভঙ্গে'র (২৪ আষাঢ় ১২৯৯) কাঠামোটা স্বপ্নে পান।[৩] ছিন্নপত্রে তাহা বিবৃত আছে।

পদ্মার জীবন যে কেবল কবিতারচনা ও কাব্যসম্ভোগ তা নয়; জমিদারির হাজারো রকমের ঝঞ্ঝাটের কথা বাদ দিলাম, কারণ যখন জমিদারি করেন, তখন তাহার ফুল ও কাঁটা দুইই স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু মাঝে মাঝে পদ্মার রুদ্রমূর্তি তরঙ্গলীলার উপর জীবনমরণের সন্ধিক্ষণেও দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। একখানি পত্রে স্ত্রীকে লিখিতেছেন— "আজ আর একটু হলেই আমার দফা নিকেশ হয়েছিল। তরীর সঙ্গে দেহতরী আর একটু হলেই ডুবেছিল।" "এ যাত্রায় দু তিনবার এই রকম বিপদ ঘটবে।"

১ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন— "আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটি বন্ধন-অসহিষ্ণু স্বেচ্ছাবিহারপ্রিয় পুরুষ এবং গৃহবাসিনী অবরুদ্ধা রমণী দৃঢ় অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে। একজন সমগ্র জগতের নূতন নূতন দেশ ঘটনা অবস্থার মধ্যে নব নব রসাস্বাদ করিয়া আপন অমর শক্তিকে বিচিত্র বিপুলভাবে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য সর্বদা ব্যাকুল, আর একজন শত সহস্র অভ্যাসে বন্ধনে প্রথায় আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন এবং পরিবেষ্টিত। একজন বাহিরের দিকে লইয়া যায়, আর একজন গৃহের দিকে টানে। একজন বনের পাখী, আর-একজন খাঁচার পাখী। এই খাঁচার পাখাটাই বেশি গান গাহিয়া থাকে, কিন্তু ইহার গানের মধ্যে অসীম স্বাধীনতার জন্য একটি ব্যাকুলতা, একটি অভ্রভেদী ক্রন্দন বিবিধভাবে ও বিচিত্র রাগিণীতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।" (আধুনিক সাহিত্য পৃ. ২৪)।

২ ছিন্নপত্র। সাহাজাদপুর ২৮ জুন ১৮৯২।

৩ ছিন্নপত্র। সাহাজাদপুর ৩রা জুলাই ১৮৯২। (২০ আষাঢ় ১২৯৯)।

সাধনার ছোটোগল্প

'সাধনা' যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি হইতেছে ছোটোগল্প। 'হিতবাদী'তে (১২৯৮ বৈশাখ) ছোটোগল্পের যে নূতন ধারা রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তন করিয়াছিলেন, কী কারণে তাহা কয়েক মাসের মধ্যেই বন্ধ হইয়া যায়, সে-কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। সাধনার টানে ছোটোগল্প পুনরায় দেখা দিল;[১] প্রথম বৎসরে প্রতি মাসে একটি করিয়া গল্প লেখেন।

এইসব গল্পের নায়কনায়িকা— যদি তাহাদের সে আখ্যা দেওয়া যায়— তাহারা কবির চোখে দেখা মানুষ, কানে-শোনা তাহাদের কাহিনী। উত্তরবঙ্গের জমিদারিতে বাসকালে ও নদীপথে বেড়াইবার সময়ে বিচিত্র লোকের সংস্পর্শে তাঁহাকে আসিতে হয়; যেসব সমস্যা লইয়া গল্পের সৃষ্টি, তাহার অনেকখানিই সেইসব মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সংগ্রাম-কাহিনী, দুঃখের ইতিহাস। কিছুটা দেখিয়া কিছুটা শুনিয়া— অবশিষ্টটা অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে বুঝিয়া, অপরূপ কল্পনার রঙে রাঙাইয়া, অতুলনীয় ভাষার সাহায্যে যাহা প্রকাশ করিলেন, তাহাই হইতেছে ছোটো গল্প। এখানে বলা আবশ্যক গল্প ছোটো হইলেই 'ছোটোগল্প' হয় না; ছোটোগল্পের একটি বিশেষ রীতি আছে। 'ছোটোগল্প' ও উপন্যাসের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা কেবল আকারগত নহে, অনেকটা প্রকৃতিগত। তাছাড়া আমাদের দেশে উপন্যাস হইতে ছোটোগল্পেরই উপাদান পাওয়া যায় বেশি। রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক প্রতিভা আবিষ্কার করিয়াছিল যে, আমাদের সমাজের "জীবনযাত্রা যেরূপ সংকীর্ণপরিসর ও বৈচিত্র্যহীন, তাহাতে ছোটোগল্পের সহিতই ইহার একটা স্বাভাবিক সংগতি ও সামঞ্জস্য আছে।" "আমাদের জীবন যে সমস্ত ক্ষুদ্র বিক্ষোভের দ্বারা আন্দোলিত হয়, তাহা ছোটোগল্পের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সহজেই সীমাবদ্ধ হইতে পারে; যতটুকু মাধুর্য ও ভাবগভীরতা আমাদের সাধারণ প্রাত্যহিক কার্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তাহা ছোটোগল্পের ক্ষুদ্র পেয়ালার মধ্যে অনায়াসেই ধরিয়া রাখা যায়। তাহার জন্য উপন্যাসের ব্যাপ্তি ও বিস্তারের প্রয়োজন নাই।"[২]

এই যুগের প্রথম গল্প হইতেছে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'। পদ্মার রাক্ষসে ছবি দিয়া গল্পের আরম্ভ ও মানুষের ব্যর্থ জীবনের হাহাকারে পরিসমাপ্তি। বিশ্বপ্রকৃতির অতুলনীয় শোভা ও জড়ের নির্বিকার নিষ্ঠুরতার সঙ্গে মানবপ্রকৃতির স্নেহ প্রেম বাৎসল্য এবং তাহার মূঢ় হৃদয়হীনতার এমন অদ্ভুত সমাবেশ খুব কম গল্পেই দেখা যায়। পরমাসে লিখিত 'সম্পত্তি সমর্পণ'ও নিষ্ঠুর ট্রাজেডি, সেখানে কাহারো বিন্দুমাত্র সুখ বা আনন্দ নাই। উভয় গল্পের মধ্যে ঘটনা সমাবেশের বৈপরীত্যে যেন মিল আছে। রাইচরণ নিজ কর্তব্যপালনের অনবধানতার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ জানিয়া শুনিয়া শান্ত চিত্তে, দুঃখকে বরণ করিয়া লইল; নিজ পুত্রকে অনুকূলের হস্তে সমর্পণ করিয়া সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। অপরদিকে অনুকূল পরের ছেলেকে নিজের আত্মজ বলিয়া গ্রহণ করিয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত ঘরসংসার করিতে লাগিলেন,— এইখানে নিদারুণ ট্রাজেডির মধ্যেও একটু বিদ্রূপ চাপা থাকিয়া গেল। দ্বিতীয় গল্পে যজ্ঞনাথ নিজ পৌত্রকে না চিনিতে পারিয়া ক্ষিপ্ত অবস্থায় স্বহস্তে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিয়া ফিরিয়া আসিল; উন্মত্তের সান্ত্বনার প্রয়োজন নাই; কিন্তু বৃন্দাবন ওরফে দামোদর পালের জন্য লেখক কোনো সান্ত্বনা, এমনকি মিথ্যা সান্ত্বনারও ব্যবস্থা না করিয়া হাহাকারের মধ্যে গল্পটিকে সমাপ্ত করিলেন।

'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পটি প্রকাশিত হইলে চন্দ্রনাথ বসু রবীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন, 'গল্পটি আমাকে

১ সাধনা ১২৯৮ অগ্রহায়ণ, ১ খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন।—পৌষ, ২ সম্পত্তি সমর্পণ।—মাঘ, ৩ দালিয়া।—ফাল্গুন, ৪ কঙ্কাল।—চৈত্র, ৫ মুক্তির উপায়।— ১২৯৯ বৈশাখ, ৬ ত্যাগ।—জ্যৈষ্ঠ, ৭ একরাত্রি।—আষাঢ়, ৮ একটা আষাঢ়ে গল্প।—শ্রাবণ-ভাদ্র, ৯ জীবিত ও মৃত—১০ রীতিমতো নভেল।— আশ্বিন, ১১ স্বর্ণমৃগ।—কার্তিক, ১২ জয়পরাজয়।

২ অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প। কবি পরিচিতি পৃ. ৮৬

বড়ো সুন্দর বোধ হইয়াছে।…পরিমাণে যৎকিঞ্চিৎ, গুণে অপূর্ব।…এ ছবিটা মনে এমনি বসিয়া গিয়াছে,…যে কখনই মুছিয়া যাইবে না। এটা প্রতিভার তুলিতে আঁকা। তোমার তুলিতেও বোধ হয় আর এমন ছবি উঠে নাই।"[১] সমসাময়িকদের মত হিসাবে যে এইটি কেবল উদ্ধৃত হইল তা'হা নহে, চন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে কী স্নেহ করিতেন, ইহা তাহারও নিদর্শন।

সাধনার গল্পগুলি অধিকাংশই ট্রাজেডি। কতকগুলির পরিসমাপ্তি অত্যন্ত নিষ্ঠুর—যেমন সম্পত্তি সমর্পণ, কঙ্কাল, জীবিত ও মৃত, স্বর্ণমৃগ ও জয়পরাজয়। ছোটোবেলাকার পড়ার ঘরে টাঙানো নর-কঙ্কালের স্মৃতি হইতে 'কঙ্কাল' গল্পের উদ্ভব। বিধবা যুবতীর প্রেমের শেষ পরিণতি যাহা সংসারে প্রায়ই ঘটে, সাহিত্যস্রষ্টার হাতে পড়িয়া কী অপরূপ সৌন্দর্যে প্রকাশ পাইতে পারে, তাহারই নিদর্শন হইতেছে 'কঙ্কাল' গল্পটি।

'জীবিত ও মৃত' গল্পটি কিভাবে তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল সে সম্বন্ধে কবি নিজেই বলিয়াছেন; একদা বাড়িতে বহু কুটুম্বিনীর ভিড় হওয়ায়, তাঁহাকে গভীর রাত্রে বাহিরের ঘরে শুইতে যাইতে হয়। অন্ধকারে জোড়াসাঁকোয় আসিতে আসিতে তাঁহার মনের মধ্যে এই অদ্ভুত কল্পনা জাগে, তিনি যেন ফিরিয়া গিয়া বলিতেছেন 'ছোট বউ, আমি যাই নাই'। এই কল্পনার সূত্র ধরিয়া গল্পটির সৃষ্টি। 'কঙ্কাল' এবং 'জীবিত ও মৃত' গল্পদ্বয়ই মৃত্যু যবনিকাতে পরিসমাপ্তি হইয়াছে।

দুইটি গল্পেই নারীহৃদয়ের নিদারুণ দুঃখের কাহিনী প্রকাশ পাইয়াছে; কঙ্কালের নারী দলিতা ফণিনীর ন্যায় নিষ্ঠুরা, সে-নারী সহজে মরে নাই, যাহাকে ভালোবাসিয়াছিল তাহাকে মারিয়া সে মরিল। 'মুক্তির উপায়' ও 'স্বর্ণমৃগ' গল্পদ্বয়েও নারী-চরিত্রগুলি বড়ো মনোহারিণী নহে; তাহারা সুরাপাত্রে গোপনে বিষ প্রয়োগ করে নাই সত্য কিন্তু প্রতিদিনের বাক্যরসে হতভাগ্য পুরুষদের জীবনকে এমনি জর্জরিত করিয়াছিল যে উভয়কেই গৃহছাড়া করিয়া তাঁহারা তবে শান্তি পাইয়াছিল।

'দালিয়া'[২] গল্পটি ইতিহাসের ক্ষীণধারা অবলম্বনে আরম্ভ; ভীষণ ট্রাজেডিতে পরিসমাপ্তির মুখেই তাহাকে অনির্বচনীয় মিলনোৎসবে শেষ করিলেন; কোনো চরিত্রই আতিশয্য দোষে দুষ্ট হয় নাই, কোনো চরিত্র ফোটেও নাই। 'ত্যাগ' গল্পেও বহু দুঃখবেদনাপূর্ণ ঘটনা আছে; হিংসা প্রতিহিংসা স্বল্পপরিসর গল্পে অত্যন্ত ঠাসা; গল্পের ধারা যেভাবে শুরু ও ঘটনাপরম্পরা যেভাবে চলিয়াছিল, তাহাতে শেষ পর্যন্ত আশঙ্কা ছিল বুঝি প্রেমেরই পরাজয় হইবে; কিন্তু লেখক অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে হেমন্তের মুখ দিয়া বলাইলেন, "আমি স্ত্রীকে ত্যাগ করিব না ··· আমি জাত মানি না।" 'সাহসের সঙ্গে'—ইচ্ছা করিয়া ব্যবহার করিয়াছি; কারণ, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিতে বা বড়ো গল্পে যেসব প্রণয়ীরা পরস্পরের প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছিল তাহারা সকলেই স্বজাতীয়। অর্থাৎ 'জাত' ভাঙিয়া কাহাকেও বিবাহ করিতে হয় নাই। তাই হেমন্তের মুখে 'আমি জাত মানি না' কথাটায় খুবই সৎসাহসের সমর্থন হইয়াছে। তাছাড়া ট্রাজেডি বা মেলোড্রামাটিক করিবার লোভ যে সংবরণ করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের পরিচায়ক। 'মুক্তির উপায়' গল্পটি পড়িলে ফকিরচাঁদের উপর করুণা হয়। রবীন্দ্রনাথ এই গল্পটিকে পরে অভিনয়োপযোগী নাটকে পরিবর্তন করেন।

১ চিঠিপত্র। বিশ্বভারতী পত্রিকা ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৩৫১ পৃ ৪২৭।

২ চল্লিশ বৎসর পরে এই গল্পটি অবলম্বন করিয়া The Maharani of Arakan নামে একখানি নাটক ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয় (১৯১২); Calderon তাহার রচয়িতা; কেদারনাথ দাশ গুপ্তের উদ্‌যোগে উহা অনুদিত, প্রকাশিত ও অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন বিলাতে; এই নাটকটির জন্য একটি ইংরেজি মূল গান রচনা করিয়া দেন—বোধহয় ইহাই তাঁহার একমাত্র Rhymed ইংরেজি কবিতা। শাহ সুজার কন্যারা কিভাবে তাহাদের পিতার সহিত আরাকানে পৌঁছায় সে-কাহিনী রবীন্দ্রনাথ 'রাজর্ষি' উপন্যাসে ইতিপূর্বে বলিয়াছিলেন।

সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের গল্প হইতেছে 'একটি আষাঢ়ে গল্প'। আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যে সময়ে 'সুপ্তোত্থিতা', 'নিদ্রিতা', 'হিং টিং ছট্', 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' প্রভৃতি রূপকথাঘেঁষা কবিতা লিখিতেছিলেন, এই গল্পটি সেই সময়ের রচনা (সাধনা ১২৯৮ আষাঢ়)। এই গল্পের মধ্যে এক দিকে আছে রূপকথার আমেজ, আর-এক দিকে আছে রূপকের প্রয়াস। সমাজজীবনের গতানুগতিকের বিদ্রূপটাই রূপক রূপ গ্রহণ করিয়াছে এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ 'চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব' সম্বন্ধে কঠিন সমালোচনা করিতেছেন। তাই রূপকথাটি উদ্দেশ্যমূলক রূপক কথায় রূপান্তরিত হইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ পরযুগে লিখিত 'অচলায়তনে' প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্ব সুন্দর নাটকীয় ঘটনারাজির মধ্য দিয়া প্রকাশ করেন; এই আষাঢ়ে গল্পের মধ্যে তাসের দেশের মানুষদের যে বিদ্রূপ রহিয়াছে, তাহা যথার্থভাবে প্রগতিহীন সমাজের নিয়মদেবতার পূজারই বিদ্রূপ। বহু বৎসর পরে (১৩৪০ ভাদ্র) রবীন্দ্রনাথ এই গল্পটিকে অবলম্বন করিয়া 'তাসের দেশ' নাটিকা রচনা করেন। কিন্তু এই গল্প বা নাটিকার মধ্যে রচনায় উদ্দেশ্যটা এতই প্রকট যে, উহাকে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যসৃষ্টি বলা যাইতে পারে না।

'সাধনা'য় বারো মাসে বারোটি গল্প বাহির হয়; শ্রাবণ মাসে কোনো গল্প নাই। আমাদের মনে হয় এই সময়ে কবি 'গোড়ায় গলদ' প্রহসনখানির প্রথম খসড়া করেন। এসম্বন্ধে অন্য পরিচ্ছেদে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিব।

সাধনায় সমালোচনা

সাধনা প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র বিষয় সম্বন্ধে গদ্য রচনা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সেকথা পূর্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি। সাহিত্যের ধর্ম বা লক্ষণ কি, বিশুদ্ধ সাহিত্য-বিচারের মানসূচী কি, প্রভৃতি বিষয় পূর্ব পূর্ববারের ন্যায় এবারও তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্যে নূতন কোনো রূপসৃষ্টিতে ব্যাপৃত থাকেন, তখন সেই রীতি বা পদ্ধতিকে কেবল শিল্পীর চোখে দেখেন না, দার্শনিক ও ক্রিটিকের দৃষ্টিতে তাহাকে যাচাই করিতে ভালোবাসেন, নিজের সৃষ্টিকেই নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিতে চেষ্টা করেন। 'সাধনা' প্রকাশের মাস তিনের মধ্যে তিনি ও তাঁহার বন্ধু লোকেন পালিত এই শ্রেণীর সাহিত্যের রসবিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। সাধনার পৃষ্ঠায় স্রষ্টার ও রসজ্ঞের যুগ্ম সাহিত্যবিচার এখনো উপভোগ্য। রবীন্দ্রনাথ লোকেনকে এক পত্রে লিখিতেছেন, "লেখা সম্বন্ধে তুমি যে প্রস্তাব করেছ সে অতি উত্তম। মাসিক পত্রে লেখা অপেক্ষা বন্ধুকে পত্র লেখা অনেক সহজ। ··· কাজটা দুরকমে নিষ্পন্ন হোতে পারে। এক, কোনো একটা বিশেষ বিষয় স্থির করে দুজনে বাদ প্রতিবাদ করা। ··· আর এক, কেবল চিঠি লেখা। অর্থাৎ কোনো উদ্দেশ্য না রেখে লেখা। কেবল লেখার জন্যেই লেখা। ··· দস্তুরমতো রাস্তায় চলতে গেলে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলবার জো থাকে না। কিন্তু প্রাপ্য জিনিষ চেয়ে 'ফাউ' যেমন বেশি ভালো লাগে তেমনি অধিকাংশ সময়েই অপ্রাসঙ্গিক কথাটায় বেশি আমোদ পাওয়া যায়। ··· অবশ্য সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক কথা বললে একেবারে পাগলামি করা হয়; কিন্তু তাই ব'লে নিজের নাসাগ্রভাগের সমসূত্রে ধরে ভূমিকা থেকে উপসংহার পর্যন্ত একেবারে সোজা লাইনে চললে নিতান্ত কলে তৈরি প্রবন্ধের সৃষ্টি হয়, মানুষের হাতের কাজের মতো হয় না।" এই ধরণের আঁটাআঁটির রচনায় লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় সত্য, কিন্তু তাহা সাধারণ পাঠকের মনে স্থায়ী ফলপ্রদ হয় কিনা সন্দেহ। এই জন্য সত্যকে মানবের জীবনাংশের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া দিলে সেটা লোকের ভালো লাগে। গল্প, উপন্যাস মহাকাব্যের মধ্য দিয়া মানবের জীবনাংশরূপে যে সত্য প্রকাশিত হয়, তাহাই মানুষ মনে রাখে। রবীন্দ্রনাথ এখন

গল্প লিখিতেছেন, তাই আমাদের মনে হয় এইসব গল্পের মধ্য দিয়া যে বিচিত্র সত্য আত্মপ্রকাশ করিতেছিল, তাহারই সমর্থনে এই যুক্তি প্রযুক্ত হয়।

এই পত্রের একস্থানে তিনি বলিতেছেন যে ইংরেজি কাগজ এবং বইগুলোর মধ্যে বক্তব্য বিষয়কে বাড়াইয়া তুলিয়া কোনো একটা কথাকে একটা প্রবন্ধে এবং একটা প্রবন্ধের বিষয়কে একটা গ্রন্থে পরিণত করিবার চেষ্টা দেখা যায়। সহজ কথাকে অত্যন্ত ঘোরালো প্যাঁচালো করিয়া তোলা হয়; ফলে সত্যটুকুকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ছোটোগল্পের মধ্যে অনেক কথা অল্পের মধ্যে বলা যাইতে পারে, ইহা যেন তাহারই সমর্থনে লেখা। ইংরেজি নভেল সম্বন্ধে লেখকের এই মতের সহিত 'ছিন্নপত্রে'র অন্তর্গত সমসাময়িক একখানি পত্র তুলনীয় (১৮৯২ এপ্রিল ৮) ছিন্নপত্রে আছে, "যেটা খুলি দেখি···ইংরেজি সমাজ, লণ্ডনের রাস্তা এবং ড্রয়িংরুম, এবং যত রকম হিজিবিজি হাঙ্গামা।···কেবল প্যাঁচের উপর প্যাঁচ, অ্যানালিসিসের উপর অ্যানালিসিস—কেবল মানবচরিত্রকে মুচড়ে নিংড়ে কুঁচকে মুচ্‌কে, তাকে সজোরে পাক দিয়ে দিয়ে তার থেকে নূতন নূতন থিওরি এবং নীতিজ্ঞান বের করবার চেষ্টা।" রবীন্দ্রনাথের মতে "বঙ্কিমবাবুর নভেলগুলি ঠিক নভেল যত বড়ো হওয়া উচিত তার আদর্শ। ভাগ্যে তিনি ইংরেজি নভেলিস্টের অনুকরণে বাংলায় বৃহদায়তনের দস্তুর বেঁধে দেননি, তা হ'লে বড়ো অসহ্য হ'য়ে উঠত। এক একটা ইংরেজি নভেলে···কেবল মানবচরিত্রকে মুচড়ে নিংড়ে কুঁচকে মুচকে, তাকে সজোরে পাক দিয়ে দিয়ে তার থেকে নূতন নূতন থিওরি এবং নীতিজ্ঞান বের করবার চেষ্টা।"

লোকেন পালিতকে যে-পত্র লেখেন তাহাতে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমার মনে হয় বঙ্কিমবাবুর নভেলগুলি ঠিক নভেল যত বড়ো হওয়া উচিত তার আদর্শ। ভাগ্যে তিনি ইংরেজি নভেলিস্টের অনুকরণে বাঙলায় বৃহদায়তনের দস্তুর বেঁধে দেন নি, তা হ'লে বড় অসহ্য হ'য়ে উঠত। এক একটা ইংরেজি নভেলে এত অতিরিক্ত বেশি কথা, বেশি ঘটনা, বেশি লোক যে আমার মনে হয় ওটা একটা সাহিত্যের বর্বরতা। এমনকি জর্জ ইলিয়টের নভেল যদিও আমার খুব ভালো লাগে, তবু এটা আমার বরাবর মনে হয় জিনিসগুলো বড়ো বেশি বড়ো— এত লোক, এত ঘটনা, এত কথার হিজিবিজি না থাকলে বইগুলো আরো ভালো হত। ক্ষমতা দেখে মানুষ আশ্চর্য হয় বটে, কিন্তু সৌন্দর্য দেখে মানুষ খুশি হয়। স্থায়িত্বের পক্ষে সহজতা সরলতা সৌন্দর্য যে প্রধান উপকরণ তার আর সন্দেহ নেই।" (সাধনা ১২৯৮, পৃ ৩২৪)।

এই পত্রে সাহিত্যের আদর্শসম্বন্ধে তিনি যেকথা বলিলেন, তাহা লইয়া অনেক সমালোচনা সাহিত্যক্ষেত্রে হইয়াছে। "সত্যকে এমনভাবে প্রকাশ করা যাক্ যাতে লোকে অবিলম্বে জানতে পারে যে, সেটা আমারই বিশেষ মন থেকে বিশেষভাবে দেখা দিচ্ছে। আমার ভালোলাগা মন্দলাগা, আমার সন্দেহ এবং বিশ্বাস, আমার অতীত এবং বর্তমান তার সঙ্গে জড়িত হয়ে থাক্, তা হলেই সত্যকে নিতান্ত জড়পিণ্ডের মতো দেখাবে না।" (ঐ পৃ ৩২৫)। রবীন্দ্রনাথের মূল কথা ছিল সাহিত্য হইতেছে লেখকের আত্মপ্রকাশ। কিন্তু কথাটা তিনি যেভাবে বলিলেন, তাহা পরিষ্কার হয় নাই— লেখকের খামখেয়ালী বা তাহার ভালোলাগা মন্দলাগাই সত্যের একমাত্র মাপকাটি এ তত্ত্ব সকলে মানিতে নাও পারে। সুতরাং তাঁহার প্রতিপাদ্য তত্ত্বটি আরও পরিষ্কার করিয়া লিখিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি 'সাহিত্য' নামে এক পত্র-প্রবন্ধ লেখেন (সাধনা ১২৯৯, বৈশাখ)। এই প্রবন্ধে তিনি লিখিলেন, "সাহিত্যের কার্যকে দুই অংশে ভাগ করা যেতে পারে। আত্মপ্রকাশ এবং বংশরক্ষা। গীতিকাব্যকে আত্মপ্রকাশ এবং নাট্যকাব্যকে বংশপ্রকাশ নাম দেওয়া যাক্। লেখকের নিজের অন্তরে একটি মানবপ্রকৃতি আছে এবং লেখকের বাহিরের সমাজে একটি মানবপ্রকৃতি আছে, অভিজ্ঞতাসূত্রে, এবং প্রীতি-সূত্রে, এবং নিগূঢ় ক্ষমতাবলে এই উভয়ের সম্মিলন হয়; এই সম্মিলনের ফলেই সাহিত্যে নূতন নূতন প্রজা

জন্মগ্রহণ করে। সকল প্রজার মধ্যে লেখকের আত্মপ্রকৃতি এবং বাহিরের মানবপ্রকৃতি দুইই সম্বদ্ধ হয়ে আছে, নইলে কখনই জীবন্ত সৃষ্টি হতে পারে না।” তিনি বলিলেন কালিদাসের শকুন্তলা ও মহাভারতের শকুন্তলা এক নহে, তার প্রধান কারণ কালিদাস এবং বেদব্যাস এক লোক নহেন; উভয়ের অন্তরপ্রকৃতি একই ছাঁচে গঠিত নয়। সেইজন্য তাঁহারা বাহিরের মানবপ্রকৃতি হইতে যে দুষ্মন্ত শকুন্তলা গঠিত করিয়াছেন তাহাদের আকার প্রকার ভিন্ন রকমের হইয়াছে। তাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথ একথা স্বীকার করিতে রাজি নহেন যে কালিদাসের দুষ্মন্ত অবিকল কালিদাসের প্রতিকৃতি; কিন্তু এটুকু তাঁহাকে মানিতে হইল এই নাটকের মধ্যে কালিদাসের ব্যক্তিত্বের অংশ আছে, নহিলে সব জিনিসটাই অন্যরূপ হইত। তিনি লিখিলেন, “ভালো নাট্যকাব্যে লেখকের আত্মপ্রকৃতি এবং বাহিরের মানবপ্রকৃতি এমনি অবিচ্ছিন্ন ঐক্য রক্ষা ক’রে মিলিত হয় যে উভয়কে স্বতন্ত্র করা দুঃসাধ্য।” রবীন্দ্রনাথের মতে যেখানে বুদ্ধি, প্রবৃত্তি এবং রুচি সম্মিলিতভাবে কাজ করে বা এক কথায় যেখানে আদত মানুষ আপনাকে প্রকাশ করে সেখানেই সাহিত্যের জন্মলাভ হয়। পর্যবেক্ষণকারী মানুষ বিজ্ঞান রচনা করে, চিন্তাশীল মানুষ দর্শন রচনা করে আর সমগ্র মানুষটি সাহিত্য রচনা করে।

মানুষ সাহিত্য সৃষ্টি করিল; কিন্তু সে-সাহিত্যের স্বরূপ কি, সাহিত্যের সত্য পদার্থ কি ইহাও বিচরণীয়। রবীন্দ্রনাথ তাহাও স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি লিখিয়াছেন— লেখাপড়া দেখাশুনা, কথাবার্তা ভাবনা চিন্তা— সবশুদ্ধ জড়িয়ে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের সমগ্র জীবন দিয়ে নিজের সম্বন্ধে একটা মোট সত্য পাই। সেইটেই আমাদের জীবনের মূল সুর। সমস্ত জগতের বিচিত্র সুরকে আমরা সেই সুরের সঙ্গে বাঁধি, সেই সুরের মূলতত্ত্ব অনুসারে। আমরা সংসারে বিরক্ত অথবা অনুরক্ত, স্বদেশবদ্ধ অথবা সার্বভৌমিক, পার্থিব অথবা আধ্যাত্মিক, কর্মপ্রিয় অথবা চিন্তাপ্রিয়। আমার জীবনের মধ্যে সেই যে একটি জীবন্ত ব্যক্তিগত পরিণতি লাভ করেচে সেইটি আমার রচনার মধ্যে প্রকাশ্যে অথবা অলক্ষিতভাবে আত্মস্বরূপে বিরাজ করছেই। আমি গীতি-কাব্যই লিখি আর যাই লিখি কেবল তাতে যে আমার ক্ষণিক মনোভাবের প্রকাশ হয় তা নয়, আমার মর্মসত্যটিও তার মধ্যে আপনার ছাপ দেয়। মানুষের জীবনকেন্দ্রগত এই মূলসত্য সাহিত্যের মধ্যে আপনাকে নানা আকারে প্রতিষ্ঠিত করে, এই জন্যে এ-কেই সাহিত্যের সত্য বলা যেতে পারে, জ্যামিতির সত্য কখনো সাহিত্যে সত্য হতে পারে না। এই সত্যটি বৃহৎ হ’লে পাঠকের স্থায়ী এবং গভীর তৃপ্তি হয়, এই সত্যটি সংকীর্ণ হ’লে পাঠকের বিরক্তি জন্মে।” (সাধনা ১২৯৯, বৈশাখ পৃ ৫০৬-৭)

লোকেন্দ্রনাথ ‘সাহিত্যের উপাদান’ কি এ বিষয়ে এক পত্র-প্রবন্ধ লেখেন; তাহারই জবাবে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের প্রাণ কি এ বিষয়ে আলোচনা করিলেন। তিনি এক স্থানে লিখিলেন, “যতই আলোচনা করছি ততই অনুভব করছি যে সমগ্র মানবকে প্রকাশের চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ। * * * মানুষের প্রবাহ হু হু করে চলে যাচ্ছে; তার সমস্ত জীবনের সমষ্টি আর কোথাও থাক্‌বে না কেবল সাহিত্যে থাক্‌বে। সঙ্গীতে চিত্রে বিজ্ঞানে দর্শনে সমস্ত মানুষ নেই। এই জন্যই সাহিত্যের এত আদর। এইজন্যই সাহিত্য সর্বদেশের মনুষ্যত্বের অক্ষয় ভাণ্ডার।” আরও কিছুদিন পরে তিনি এই প্রসঙ্গেই লিখিলেন, “নিজের সুখ দুঃখের দ্বারাই হোক্, আর অন্যের সুখ দুঃখের দ্বারাই হোক্, প্রকৃতির বর্ণনা করেই হোক্, আর মনুষ্যচরিত্র গঠিত করেই হোক্ মানুষকে প্রকাশ করতে হয়। আর সমস্ত উপলক্ষ্য।”

“প্রকৃতি-বর্ণনাও উপলক্ষ্য, কারণ প্রকৃতি ঠিকটি কিরূপ তা নিয়ে সাহিত্যের কোনো মাথাব্যথা নেই— কিন্তু প্রকৃতি মানুষের হৃদয়ে, মানুষের সুখদুঃখের চারিদিকে কি রকম ভাবে প্রকাশিত হয় সাহিত্যে তাই দেখায়। সৌন্দর্য প্রকাশও সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র।” পত্রের শেষে আরও পরিষ্কার করিয়া বলিলেন,

"আমার বলা উচিত ছিল, লেখকের নিজত্ব নয়, মনুষ্যত্ব-প্রকাশ সাহিত্যের উদ্দেশ্য। কখন নিজত্ব দ্বারা, কখন পরত্ব দ্বারা। কখনো স্বনামে, কখনো বেনামে। কিন্তু একটা মনুষ্য-আকারে। লেখক উপলক্ষ্য মাত্র, মনুষ্যই উদ্দেশ্য।" (সাধনা ১২৯৯, পৃ ৩৪৫)।

লোকেন্দ্রনাথের সহিত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের বিষয় লইয়া আলোচনার ফলে তাঁহার নিজের কাছেই সাহিত্যের নিত্যলক্ষণ সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইল— একথা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। পাঠকের স্মরণ আছে কিশোর বয়সে তিনি 'ভারতী'তে সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন; এবার হইল 'সাধনা'র পৃষ্ঠায়।[১] প্রৌঢ়ে জাতীয় শিক্ষাপরিষদে বক্তৃতাকালে যে আলোচনা করেন তাহা 'সাহিত্য' গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। বার্ধক্যে এবিষয়ে বিচার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতারাজিতে পুনরায় পাওয়া যাইতেছে।

সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আলোচনাটি আমরা একস্থানেই বিচার করিলাম; সুতরাং কালানুক্রমিক ইতিহাস বলিতে গেলে আমাদিগকে পুনরায় একটু পিছাইয়া যাইতে হইবে।

সাহিত্য সম্বন্ধীয় আলোচনা ব্যতীত 'সাধনা'য় অন্যান্য গদ্য রচনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে চন্দ্রনাথ বসুর 'লয়তত্ত্বে'র সমালোচনা। সাহিত্য পত্রিকায় (১২৯৮ মাঘ) চন্দ্রনাথের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের জবাব 'চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব'—সাধনায় পাঁচ মাস পরে বাহির হয়, (১২৯৯ আষাঢ়) ও তাহার পর পুনরায় লেখেন 'সাহিত্যে নব্য লয়তত্ত্ব'। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বাসকালে এই 'নিত্যনৈমিত্তিক' লেখাটি রচনা করেন এবং তাঁহার অজ্ঞাতেই হিং টিং ছটের মধ্যে লয়তত্ত্বের ব্যঙ্গ প্রকাশ হইয়া পড়ে।

চন্দ্রনাথবাবু বলিয়াছিলেন, হিন্দুর লয়তত্ত্বের আদর্শ সগুণ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। কিন্তু এই নির্গুণ অবস্থা হইতে গেলে যে একেবারেই সংসার-বিমুখ হইতে হইবে তাহা নহে, বরঞ্চ সংসারধর্ম পালন সেই অবস্থা প্রাপ্তির মুখ্য সোপান। "কারণ, যাঁহারা মনে করেন নির্গুণ অবস্থা লাভের অর্থ আত্মনাশ তাঁহারা বড়ো ভুল বুঝেন— তাঁহারা বোধ হয় তাঁহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সংকীর্ণতা বা বিকৃতিবশত আমাদের লয়তত্ত্বে প্রবেশ করিতে একেবারেই অসমর্থ।" তাঁহার মতে নির্গুণতা প্রাপ্তির অর্থ "আত্মসম্প্রসারণ।" স্বার্থপরতা হইতে পরার্থপরতা এবং পরার্থপরতা হইতে ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনের সাহায্যে ক্রমশ নির্গুণতারূপ আত্মসম্প্রসারণ, ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় মাত্র। অতএব পরার্থপরতার সম্যক্ অভ্যাসের জন্য সংসারধর্ম পালন অত্যাবশ্যক। আবার যাঁহারা বলেন লয়তত্ত্ব মানিয়া চলিতে গেলে বিজ্ঞানশিক্ষা সৌন্দর্যচর্চা দূর করিতে হয় তাঁহারাও ভ্রান্ত। কারণ, "পদার্থবিদ্যা প্রাণীবিদ্যা প্রভৃতি যাহাতে সৃষ্টিকৌশল ব্যাখ্যাত হয়, বিশ্বনাথের বিপুল বিচিত্র লীলা বর্ণিত হয় সে সকলই লয়প্রার্থীর অনুশীলনের জিনিস। বিশ্বের সৌন্দর্য ..... ব্রহ্মভক্ত যেমন অনুভব করিবেন আর কেহই তেমন করিবেন না। প্রকৃত সৌন্দর্যে মানুষকে ব্রহ্মেই মজাইয়া দেয়।"[২]

রবীন্দ্রনাথ ইহার জবাবে প্রথমেই লিখিলেন যে চন্দ্রনাথবাবু সগুণে নির্গুণে এমন একটা খিচুড়ি পাকাইয়া তুলিয়াছেন যাহা অভূতপূর্ব। "প্রথম কথা। ক্ষুদ্র অনুরাগ হইতে বৃহৎ অনুরাগ বুঝিতে পারি, কিন্তু বৃহৎ অনুরাগ হইতে নিরনুরাগের মধ্যে ক্রমবাহী যোগ কোথায় বুঝিতে পারি না। দ্বিতীয় কথা। 'সৃষ্টি কৌশলে'র মধ্যে 'বিশ্বনাথের বিপুল বিচিত্র লীলা' দেখিয়া লয়প্রার্থী কি করিয়া ব্রহ্মের নির্গুণস্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ

১ রবীন্দ্রনাথ ও লোকেন পালিতের মধ্যে পত্র বিনিময়:—রবীন্দ্রনাথ—আলোচনা...সাধনা ১২৯৮ ফাল্গুন। সাহিত্য...১২৯৯ বৈশাখ। লোকেন্দ্রনাথ—সাহিত্যের উপাদান...১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ—সাহিত্যের প্রাণ...১২৯৯ আষাঢ়। লোকেন্দ্রনাথ—সাহিত্যের নিত্য লক্ষণ...১২৯৯ শ্রাবণ। রবীন্দ্রনাথ—মানবপ্রকাশ ১২৯৯...ভাদ্র-আশ্বিন।

২ সাধনা ১২৯৯, আষাঢ়, পৃ ১২৭।

হন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। 'লীলা' কি নিগুর্ণতা প্রকাশ করে? 'লীলা কি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা-শক্তির বিচিত্র বিকাশ নহে? 'সৃষ্টিকৌশল' জিনিসটা কি নিগুর্ণ ব্রহ্মের সহিত কোনো যুক্তিসূত্রে যুক্ত হইতে পারে? সৌন্দর্যের একমাত্র কার্য চিত্তাহরণ করা অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার করিয়া দেওয়া। যাঁহারা প্রেমস্বরূপ সগুণ ঈশ্বরের বিশ্বাস করেন সৃষ্টির সৌন্দর্যে তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের প্রেম স্মরণ করাইয়া দেয়। ঈশ্বর যে আমাদিগকে ভালোবাসেন এই সৌন্দর্য বিকাশ করিয়াই যেন তাহার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে কেবল আমাদিগকে অনেক নিয়মপাশে বাঁধিয়া আমাদিগকে বলপূর্বক কাজ করাইয়া লইতে চান তাহা নহে, আমাদের মনোহরণের প্রতিও তাঁহার প্রয়াস আছে। এই বিশ্বের সৌন্দর্যে তিনি আমাদিগকে বংশিস্বরে আহ্বান করিতেছেন— তিনি জানাইতেছেন তিনিও আমাদের প্রীতি চান। বৈষ্ণবদের কৃষ্ণরাধার রূপক এই বিশ্বসৌন্দর্যে ও প্রেমের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সৌন্দর্য বিরাট লয়প্রার্থীদিগকে যে কি করিয়া নিগুর্ণ ব্রহ্মে 'মজাইতে' পারে তাহা বুঝিতে পারিলাম না।"

"যাঁহারা যথার্থ লয়তত্ত্ববাদী তাঁহারা লয়কে লয়ই বলেন, ইংরেজি শিখিয়া তাহাকে আত্মসম্প্রসারণ বলেন না। তাঁহাদের কাছে সৌন্দর্য কদর্য কিছুই নাই, এইজন্য তাঁহারা অতি কুৎসিৎ বস্তু ও চন্দনকে সমান জ্ঞান করেন। জগৎ তাঁহাদের কাছে যথার্থ ই অ-সৎ, মায়া, বিশ্বনাথের সৃষ্টি কৌশল ও লীলা নহে।"

নব্য সম্প্রদায়ের নিকট অদ্বৈতবাদ ও বৈষ্ণব-আরাধনা, ব্রহ্মের নিগুর্ণত্ব ও প্রতিমাপূজা প্রভৃতি বিরুদ্ধ মতবাদের মধ্যে যে কোনো পার্থক্য আছে তাহা গভীরভাবে চিন্তার বিষয় ছিল না। সমস্তকে সমভাবে গ্রহণ করার নাম ছিল সাম্যভাব বা synthesis। রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর একীকরণতাকে কখনো শ্রদ্ধা করিতে পারেন নাই।

এই সময়ের নব্য আন্দোলনের ভিতরে গুরুবাদ, শাস্ত্রের অভ্রান্ততা, বেদের অভ্রান্তবাদ প্রভৃতি এমন কতকগুলি মত প্রচারিত হইতেছিল, যেগুলি কোনো সুবুদ্ধিমান স্বাধীনচিন্তাপ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করা কঠিন। চন্দ্রনাথবাবু প্রমুখ শিক্ষিত সাহিত্যিকগণ ও 'বঙ্গবাসী'র লেখকগণ বাংলাদেশে স্বাধীন চিন্তা ও কর্মের প্রবর্তক না হইয়া তাহার বিরোধী হইয়া উঠিতেছিলেন, এই ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত তীব্রভাবেই বিঁধিতেছিল। দেশের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, চন্দ্রনাথবাবু উপলক্ষ্য মাত্র।

তিনি একটি প্রবন্ধে বলিলেন, "যে জাতি নূতন জীবন আরম্ভ করিতেছে, তাহার বিশ্বাসের বল পাকা চাই। বিশ্বাস বলিতে কতকগুলো অমূলক বিশ্বাস কিম্বা গোঁড়ামির কথা বলি না। কিন্তু কতকগুলি ধ্রুব সত্য আছে, যাহা সকল জাতিরই জীবনের মূলধন, যাহা চিরদিনের পৈতৃক সম্পত্তি।"

অন্য কেহ জোর করিয়া কিছু করাইতেছে এই ভাবনাই তাঁহার পক্ষে অসহ্য। তাঁহার মতে, যে এক-জনের কর্তৃত্ব সহ্য করিতে পারে, সে আদিম মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে। তবে কি তিনি কোনো কাজেই কর্তৃত্বকে বিশ্বাস করেন না? তাহা নহে। তিনি মানুষকে অপরিসীম স্বাধীনতা দান ও বিশ্বাস করিয়া তাহার ভিতরের যথার্থ মানুষকে জাগ্রত করিয়া সেই মানুষের কাছ হইতে কাজ চান— দাসের কাছ হইতে নয়; সেইজন্য তিনি যুক্তির উপর জোর দিয়াছেন— গুরুবাদের উপর নহে। 'আদিম সম্বল' প্রবন্ধটিতে তিনি বলিলেন যে মানুষের যুক্তির পথ, রুদ্ধ করিয়া তাহাকে কলের মতো চালাইয়া নির্বিরোধে কাজ আদায় করা যাইতে পারে, কিন্তু মানুষের চরম সম্পদ মনুষ্যত্ব সেখানে লুপ্ত হইয়াছে। "সেখানে চিন্তা, যুক্তি, আত্মকর্তৃত্ব এবং সেই সঙ্গে ভ্রম বিরোধ সংশয় প্রভৃতি মানবের ধর্ম লোপ পাইয়া যাইবে, কেবল কলের ধর্ম কাজ করা তাহাই চলিতে থাকিবে।"

(সাধনা ১২৯১, আষাঢ় পৃঃ ১৮০) "কিন্তু নির্ভুল কল এবং ভ্রান্ত মানুষের মধ্যে যদি পছন্দ করিয়া লইতে হয়, তবে মানুষকেই বাছিতে হয়। ভ্রম হইতে অনেক সময় সত্যের জন্ম হয়, কিন্তু কল হইতে কিছুতেই মানুষ বাহির হয় না।"

রবীন্দ্রনাথের এই মতের চরমদৃষ্টান্ত হইতেছে তাঁহার শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী। উহা নির্ভুল কলের সাহায্যে গঠিত নহে, ভ্রমপরিপূর্ণ মানুষকে লইয়া গঠিত। সেইজন্য শান্তিনিকেতনে আসিয়া লোকে কলীয়তার ত্রুটি ধরিতে পারেন বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অনুভব করেন যে উহা দোষেগুণেসম্পন্ন মানবহৃদয়ের জীবন্ত সামগ্রী, ছাঁচেঢালা জিনিস নহে।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে কেবল ভাবের দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়াছেন তাহা নহে। ভাবের বাহন ভাষা, ভাষার ঐশ্বর্য শব্দ। শব্দের যথাযথ অর্থনির্ণয়, নূতন নূতন শব্দসৃষ্টি ও প্রয়োগ প্রভৃতি ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের দান সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত। সাধনায় এক বৎসরের মধ্যে তিনি শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে আটটি আলোচনা করেন।[১]

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁহার 'শব্দকথা' (১৩২৪) গ্রন্থের মুখবন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিকট ধ্বন্যাত্মক শব্দ আলোচনার জন্য তিনি কি পরিমাণে ঋণী তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ·· ডক্টর শহীদুল্লা লিখিয়াছেন রবীন্দ্রনাথই 'সর্বপ্রথম বাঙ্গালা উচ্চারণ-তত্ত্বের কয়েকটি বিশেষ নিয়ম আবিষ্কার করেন।' তিনি আরও বলেন যে স্বরসাম্যের নিয়মও তাঁহার আবিষ্কার।[২]

বাংলা ছন্দ সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথকে এই যুগে আলোচনা করিতে দেখি। 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ' প্রবন্ধটি সাধনায় (১২৯৯ শ্রাবণ) প্রকাশিত হয়। তিনি পরযুগে বহু প্রবন্ধে ও পত্রে ছন্দের আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু ইহাই বোধহয় ছন্দ সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ। ১২৯০ সালের ভারতীতে নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিত 'সিন্ধুদূতের' সমালোচনা-প্রসঙ্গে বাংলাছন্দের কিছু কিছু আলোচনা ছিল, এ রচনাটি রবীন্দ্রনাথের বলিয়া কাহারো কাহারো বিশ্বাস। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধে কবি লিখিলেন, "বাঙ্গালা শব্দ উচ্চারণের মধ্যে কোথাও ঝোঁক নাই, অথবা যদি থাকে সে এত সামান্য যে, তাহাকে নাই বলিলেও ক্ষতি হয় না। এইজন্যই আমাদের ছন্দ অক্ষর গণিয়া মাত্রা নিরূপিত হইয়াছে। কথার প্রত্যেক অক্ষরের মাত্রা সমান। কারণ, কোনো স্থানে বিশেষ ঝোঁক না থাকাতে অক্ষরের বড়ো ছোট প্রায় নাই। সংস্কৃত উচ্চারণে যে দীর্ঘ হ্রস্বের নিয়ম আছে তাহাও বাঙ্গলায় লোপ পাইয়াছে। এই কারণে উচ্চারণ হিসাবে বাঙ্গালা ভাষা বঙ্গদেশের সমতল-প্রসারিত প্রান্তর ভূমির মতো সর্বত্র সমান। * * শব্দের সহিত শব্দের সংঘর্ষণে যে বিচিত্র সংগীত উৎপন্ন হয়, তাহা সাধারণত বাংলা ভাষায় অসম্ভব।"··· "বাংলা শব্দের মধ্যে এই ধ্বনির অভাববশত বাংলায় পদ্যের অপেক্ষা গীতের প্রচলনই অধিক। কারণ, গীতে সুরের সাহায্যে প্রত্যেক কথাটিকে মনের মধ্যে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট করিয়া দেয়। কথার যে অভাব আছে সুরে তাহা পূর্ণ হয়। যতক্ষণ চিত্ত না জাগিয়া উঠে, ততক্ষণ সংগীত ছাড়ে না। এই জন্য প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে গান ছাড়া আর কবিতা নাই বলিলে হয়।"

সংস্কৃত সম্বন্ধে ঠিক উল্টা কথা খাটে; সংস্কৃতে সংগীত নাই, কারণ, "সংস্কৃত শব্দ এবং ছন্দ ধ্বনিগৌরবে পরিপূর্ণ, সুতরাং সংস্কৃত কাব্যে রচনার সাধ গানে মিটাইতে হয় নাই, বরং গানের সাধ কাব্যে মিটিয়াছে।"

হিন্দি সম্বন্ধে বলিলেন, "কথাকে সামান্য উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া সুর শুনানই হিন্দি গানের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু বাংলায় সুরের সাহায্য লইয়া কথার ভাবে শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করাই কবির উদ্দেশ্য। কবির গান, কীর্তন,

১ সাধনা ১২৯৮ চৈত্র 'নিছনি'। (১) (১২৯৯ বৈশাখ, 'নিছনি' ২)। জ্যৈষ্ঠ···পঁহু। আষাঢ়···স্বরবর্ণ অ। শ্রাবণ— [পঁহু] প্রত্যুত্তর (১) কার্ত্তিক···স্বরবর্ণ এ। অগ্রহায়ণ···টাটোটে। চৈত্র, [পঁহু] প্রত্যুত্তর (২)। দ্রঃ রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯ম; শব্দতত্ত্বের পরিশিষ্ট।

২ বাংলার বাণী ১৩১৮। ভাষা ও সাহিত্য পৃ. ১০৩-৫

রামপ্রসাদী গান, বাউলের গান প্রভৃতি দেখিলেই ইহার প্রমাণ হইবে। অতএব কাব্যরচনাই বাংলা গানের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুর সংযোগ গৌণ। এই সকল কারণে বাংলা সাহিত্য-ভাণ্ডারে রত্ন যাহা কিছু পাওয়া যাও তাহা গান।"

সংস্কৃত, হিন্দি ও বাংলা ভাষা ও কাব্যের বৈশিষ্ট্য এমন সুন্দরভাবে তিনি আর কোথাও বলিয়াছেন বলিয়া জানি না। দুঃখের বিষয় তাঁহার গদ্য গ্রন্থাবলীতে এই প্রবন্ধটি নাই।

চিত্রাঙ্গদা

সাধনার বিচিত্র রচনাসম্ভার সরবরাহের মধ্যে শীর্ণ অবসরের ফাঁকে দুইখানি বিপরীত প্রকৃতির নাটক যুগপৎ ভাদ্রমাসে (১২৯৯) প্রকাশিত হইল—'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্য ও 'গোড়ায় গলদ' প্রহসন। চিত্রাঙ্গদা রচিত হয় এক বৎসর পূর্বে (১২৯৮ ভাদ্র ২৮)— উড়িষ্যার জমিদারি তদারক কার্যে নিযুক্তকালে পাণ্ডুয়ার কুঠিতে। এক বৎসর গ্রন্থখানি না ছাপাইয়া ফেলিয়া রাখা হয় কেন— তাহা আমরা জানি না; বোধহয় খশড়ার পরে অনেকখানি মাজাঘসা করেন। তাছাড়া তরুণ শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ কাব্যখানির জন্য ছবি আঁকিতেছিলেন বলিয়াও এই বিলম্ব হইতে পারে।

অবনীন্দ্রনাথের বয়স তখন কুড়ি কি একুশ বৎসর মাত্র; সাধারণ কলেজের পড়া ছাড়িয়া কলিকাতা গভর্মেণ্ট আর্ট স্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপাল ও. গিল্‌হার্ডির কাছে বিলাতী রীতিতে ছবি আঁকা শিখিতেছেন। সুতরাং 'চিত্রাঙ্গদা'র ছবির মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের কোনো বৈশিষ্ট্য আশা করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ও উপদেশে তিনি এই কাব্যের জন্য ছবি আঁকেন। তজ্জন্য তিনি এই গ্রন্থ তাঁহাকেই উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ পত্রে তিনি লেখেন, "বৎস তুমি আমাকে তোমার যত্নরচিত চিত্র উপহার দিয়াছ, আমি তোমাকে আমার কাব্য এবং স্নেহআশীর্বাদ দিলাম।" (১২৯৯ শ্রাবণ ১৫)।

মহাভারতে চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের যে সামান্য কাহিনী আছে, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া এই অপরূপ কাব্যনাট্য লিখিত হয়। নরনারীর পরস্পরকে যৌন-অনুরাগে পাইবার শাশ্বত আকাঙ্ক্ষা, এই কাব্যে ভাষা পাইয়াছে। মানব বুভুক্ষার আদিম প্রেরণাকে কবি স্থূল হস্তে স্পর্শ করেন নাই,— যদিও তাহার অবসর ছিল যথেষ্ট; উহাকে লইয়া সৌন্দর্যলোকের একটি নূতন স্বর্গ, নারীচিত্তের একটি অপরূপ মহিমা সৃষ্টি করিলেন। ভাষার মধ্য দিয়া শব্দের কুহকজালে কী অসীম সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যাইতে পারে, তাহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হইতেছে চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্য।

রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদার কাহিনীটি যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা তাহাই অনুসরণ করিব। অনঙ্গ-আশ্রমে মদন ও বসন্ত আছেন; চিত্রাঙ্গদা উপস্থিত হইয়া তাহার ইতিহাস বলিতেছেন—

আমি চিত্রাঙ্গদা। মণিপুর-রাজ-সুতা
মোর পিতৃবংশে কভু কন্যা জন্মিবে না
দিয়াছিলা হেন বর দেব উমাপতি
তপে তুষ্ট হয়ে। আমি সেই মহাবর
ব্যর্থ করিয়াছি। অমোঘ দেবতা-বাক্য
মাতৃগর্ভে পশি' দুর্বল প্রারম্ভ মোর

পারিল না পুরুষ করিতে শৈবতেজে,
এমনি কঠিন নারী আমি।...
তাই পুরুষের
বেশে, যুবরাজরূপে, করি রাজকাজ,
ফিরি স্বেচ্ছামতে; নাহি জানি লজ্জা ভয়,
অন্তঃপুরবাস; নাহি জানি হাবভাব,
বিলাস-চাতুরী; শিখিয়াছি ধনুর্বিদ্যা,
শুধু শিখি নাই, দেব, তব পুষ্পধনু
কেমনে বাঁকাতে হয় নয়নের কোণে।
... ...একদিন
গিয়েছিনু মৃগ অন্বেষণে...দেখিনু সহসা
রুধিয়া সংকীর্ণ পথ রয়েছে শয়ান
ভূমিতলে, চীরধারী মলিন পুরুষ।
উঠিতে কহিনু তারে অবজ্ঞার স্বরে
সরল সুদীর্ঘ দেহ
মুহূর্তেই তাঁর বেগে উঠিল দাঁড়ায়ে
সম্মুখে আমার,...। শুধু ক্ষণেকের তরে
চাহিল আমার মুখপানে...
সেই মুহূর্তেই জানিলাম মনে, নারী
আমি। সেই মুহূর্তেই প্রথম দেখিনু
সম্মুখে পুরুষ মোর।"
পরদিন প্রাতে দূরে ফেলে দিনু
পুরুষের বেশ। পরিলাম রক্তাম্বর,
কঙ্কণ কিঙ্কিণী কাঞ্চি।...গোপনে গেলাম সেই বনে
অরণ্যের শিবালয়ে দেখিলাম তাঁরে।—
মনে নাই ভালো,
তার পরে কী কহিনু আমি, কী উত্তর
শুনিলাম। শেষকথা তাঁর
কর্ণে মোর বাজিতে লাগিল তপ্ত শূল—
'ব্রহ্মচারীব্রতধারী আমি।' পতিযোগ্য
নহি বরাঙ্গনে।

নারীর আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল; পুরুষের ব্রহ্মচর্য! ক্ষত্রিয়ের ব্রহ্মচর্য! তাই চিত্রাঙ্গদা মদনের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছে—"এক দিবসের তরে ঘুচাইয়া দাও, জন্মদাতা বিধাতার বিনা দোষে অভিশাপ, নারীর কুরূপ। করো মোরে অপূর্ব সুন্দরী।"

চিত্রাঙ্গদার পুরুষ-কঠিন নারী রূপ অর্জুনকে মুগ্ধ করে নাই; তাই সে আজ মদন ও বসন্তের আশীর্বাদে বর্ষকালব্যাপি নারীর অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী হইল। কুরূপ পরিবর্তিত হইয়া গেল। চিত্রাঙ্গদা বলিতেছে, 'হায়, আমারে করিল অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা, মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ ক্ষণস্থায়ী।'

অর্জুন একদা তাহাকে দেখিলেন 'সরোবর-গোপনের শ্বেত শিলাপটে।' অর্জুন অরণ্যের শিবালয়ে আছেন, সহসা যেন চিত্রাঙ্গদা সেখানে উপস্থিত হইল। চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের পরিচয় গ্রহণ করিল, কিন্তু নিজের পরিচয় দিবার প্রয়োজন হইল না, অর্জুন তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া কহিলেন— 'তোমার হৃদয় দ্বারে প্রেমার্ত অতিথি।' চিত্রাঙ্গদা বিস্মিত, এ কী পরিবর্তন! সেদিন যে পুরুষ তাহার নারীত্বকে তাচ্ছিল্য করিয়াছিল, আজ রূপের কাছে আত্মাহুতি দিতে সেই প্রস্তুত। তাই সে কহিল, 'ধিক্, পার্থ, ধিক্ কে আমি, কী আছে মোর, কী দেখেছ তুমি, কী জানো আমারে। কার লাগি আপনারে হতেছ বিস্মৃত।"

পুরুষের ব্রহ্মচর্য! ক্ষত্রিয়ের ব্রহ্মচর্য! সত্যই আজ রূপের মোহে অর্জুন সমস্ত জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত! চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে ভালোবাসিয়াছে বলিয়াই সে চাহে না যে অর্জুন কামনার বহ্নিতে সমস্ত সাধনা দগ্ধ করেন; তাই সে বলিতেছে, "মিথ্যারে কোরো না উপাসনা। শৌর্য বীর্য মহত্ত্ব তোমার দিয়ো না মিথ্যার পদে। যাও, ফিরে যাও।" চিত্রাঙ্গদা জানে তাহার এই রূপ ক্ষণকালের। কিন্তু অনতিকাল পরেই মদন ও বসন্তের কৃপায় চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে স্বামীরূপে লাভ করিল। কিন্তু ইহাতে তাহার অন্তরের বেদনা ঘুচিল না। সে জানে অর্জুন যাহাকে

গ্রহণ করিয়াছে, সে তাহার সৌন্দর্য রূপকে, তাহার বহিরাবরণকে, একটি রূপসী নারীকে, তাহার ছদ্মরূপকে। সে যখন কেবল সাধারণ নারীরূপে অর্জুনকে পতিত্বে বরণ করিতে চাহিয়াছিল তখন তিনি ব্রহ্মচর্যের অছিলায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন আজ তাহাকেই গ্রহণ করিলেন; কিন্তু তিনি জানেন না যে এই সেই উপেক্ষিতা কুরূপা নারী। আজ চিত্রাঙ্গদা বসন্তের সহায়তায় অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া তাহাকে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সৌন্দর্য চিরস্থায়ী নহে। তাই সে মদনকে বলিতেছে— 'এই ছদ্মরূপিণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আমি শতগুণে।' মানুষ প্রেমকে বহু বন্ধনে বাঁধিতে চায়, মানব লোকালয়ে প্রেয়সীকে পাইতে চায়। তাই চিত্রাঙ্গদা বলিতেছে—

'যা দেখিছ তাই আমি, আর কিছু নাই
পরিচয়। প্রভাতে এই যে দুলিতেছে
কিংশুকের একটি পল্লব— প্রান্তভাগে
একটি শিশির এর কোনো নাম ধাম
আছে? এর কি শুধায় কেহ পরিচয়?
তুমি যারে ভালোবাসিয়াছ, সে এমনি
শিশিরের কণা, নামধামহীন।...যারে বাঁধিবারে চাও
কখনো সে বন্ধন জানেনি। সে সকল
মেঘের সুবর্ণচ্ছটা, গন্ধ কুসুমের,
তরঙ্গের গতি।'

সত্যই তো সৌন্দর্যের কোনো নাম নাই— বস্তুনিরপেক্ষ সৌন্দর্য তো নাই। অর্জুন সহজনারী চিত্রাঙ্গদাকে একদা পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু আজ তাহার কৃত্রিম সুন্দরী রূপকে সম্ভোগের জন্য বীরের হৃদয় তাহার আজন্মের অর্জিত পুণ্যকে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হইল না। অর্জুন তো চাহেন নাই সামান্য নারীকে, তিনি চাহিয়াছিলেন, নারীর বিশ্বমোহন রূপকে— অনঙ্গ বসন্তের কৃপায় ক্ষণকালের জন্য যাহার উদ্ভব। কিন্তু 'রূপ নাহি ধরা দেয়, বৃথা এ প্রয়াস।'

এমন সময়ে বনচরগণের নিকট হইতে চিত্রাঙ্গদার নাম ও তাহার যথার্থ পরিচয় লাভ করিয়া অর্জুনের বীর হৃদয় সেই বীরাঙ্গনাকে জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। ছদ্মরূপী চিত্রাঙ্গদা বলিতেছে—

কুৎসিত, কুরূপ! এমন বঙ্কিম ভুরু
নাই তা'র এমন নিবিড় কৃষ্ণতারা।
কঠিন সবল বাহু বিঁধিতে শিখেছে
লক্ষ্য, বাঁধিতে পারে না বীর তনু, হেন
সুকোমল নাগপাশে।...
যামিনীর নর্মসহচরী,
যদি হয় দিবসের কর্মসহচরী,
সতত প্রস্তুত থাকে বামহস্ত সম
দক্ষিণ হস্তের অনুচর, সে কি ভালো
লাগিবে বীরের প্রাণে?

পুরুষের হৃদয় নারীকে চায় নারীরূপে, দেবীরূপে নহে, মায়ারূপে নহে। অতৃপ্ত থাকে তাহার অন্তর অসম্পূর্ণ হয় তাহার জীবন।

বর্ষশেষে চিত্রাঙ্গদা নিজ মানবী রূপ ফিরাইয়া পাইল। সৌন্দর্যের অবগুণ্ঠন আজ তাহার নাই, আজ সে চিত্রাঙ্গদা, রাজকুমারী, মণিপুররাজদুহিতা। অর্জুনকে বিদায়ের ক্ষণে বলিতেছে—

"আমি চিত্রাঙ্গদা। রাজেন্দ্রনন্দিনী।
হয়তো পড়িবে মনে, সেই একদিন
সেই সরোবর তীরে, শিবালয়ে দেখা
দিয়েছিল এক নারী, বহু আবরণে
ভারাক্রান্ত করি' তার রূপহীন তনু।
কী জানি কী বলেছিল নির্লজ্জ মুখরা,
পুরুষেরে করেছিল পুরুষ প্রথায়
আরাধনা, প্রত্যাখ্যান করেছিলে তারে।
ভালোই করেছ। সামান্য নারীরূপে
গ্রহণ করিতে যদি তারে, অনুতাপ
বিঁধিত তাহার বুকে আমরণকাল।
প্রভু, আমি সেই নারী। তবু আমি সেই
নারী নহি; সে আমার হীন ছদ্মবেশ।
তার পরে পেয়েছিনু বসন্তের বরে
বর্ষকাল অপরূপ রূপ। দিয়েছিনু
শ্রান্ত করি' বীরের হৃদয়, ছলনার

ভারে। সে-ও আমি নহি। আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি' রাখিবে মাথায়, সে-ও আমি
নই, অবহেলা করি' পুষিয়া রাখিব
পিছে সে-ও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখো
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি করো
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে করো সহচরী,
আমার পাইবে পরিচয়।"...

নারীত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, সংসার জীবনের চরম সার্থকতা প্রকাশ পাইয়াছে এই কয়টি পংক্তির মধ্যে। 'চিত্রাঙ্গদা' প্রকাশিত[১] হইবার প্রায় সতেরো বৎসর পরে (১৩১৬), এই নাট্যকাব্যের মধ্যে কতখানি অশ্লীলতা আছে, নায়িকার মধ্যে উপযাচিকার প্রেমনিবেদন কতখানি আছে, তাহা লইয়া সাময়িকসাহিত্যে গভীর আলোচনা উত্থাপিত হয়। কিন্তু এই কাব্যখানি পাঠ করিবার পর কোনো সাহিত্যরসিক লোকের মনে কোনো কুৎসিত কল্পনা কী করিয়া আসে তাহা সহজবুদ্ধিতে আবিষ্কার করা কঠিন। যৌনআকাঙ্খা প্রকাশ যদি সাহিত্যধর্মের রুচি অসঙ্গত হয়, তবে অভিজ্ঞান শকুন্তলাকে দুর্নীতিমূলক গ্রন্থ বলিয়া অপাংক্তেয় করা প্রয়োজন; সে হিসাবে দুনিয়ার অনেক সেরা কাব্য ও উপন্যাস আবর্জনাস্তূপে নিক্ষিপ্ত হইত। রসজ্ঞ সমালোচক ও পাঠক দেখে নারীর সমগ্র রূপখানি কীভাবে ফুটিয়াছে। সেদিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে এই কাব্যনাট্যখানি সৌন্দর্যে অতুলনীয়। নারী যথার্থভাবে পুরুষের সহধর্মিণী, প্রয়োজনবোধে সমধর্মিনী, স্নেহে নারী, বীর্যে সে পুরুষ।' অর্ধনারীশ্বরের আদর্শ এই হিন্দুভারতের।

সংগীত সমাজ ও গোড়ায় গলদ

আমরা যে সময়ের (১২৯৯) কথা আলোচনা করিতেছি, তখন কলিকাতায় 'ভারতীয় সংগীত-সমাজ' লইয়া খুবই মাতামাতি চলিতেছে। এতকাল বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গের সংগীতের কদর ও আদর ছিল ধনীর বৈঠকখানায়; আর লৌকিক সংগীত আশ্রয় পাইয়াছিল বাউল-বৈষ্ণবের আখড়ায়। তাহারও নিচের স্তরে ছিল 'কবি', তরজা, খেউড়, লোটো, খেমটা ঝুমরোর গান। মোটকথা পাশ্চাত্য নব্য শিক্ষায় দীক্ষিত মধ্যবিত্তদের পক্ষে বিশুদ্ধ সংগীতের রসগ্রহণের স্থান ছিল যেমন রুদ্ধ, লৌকিক সংগীত সম্বন্ধে তাঁহাদের স্পৃহা ও জ্ঞান ছিল তেমনি সংকীর্ণ। তদুপরি রুচির প্রশ্নও ছিল। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মসমাজ সংগীতকে ধনীর প্রমোদশালা হইতে বাহির করিয়া ও বাউল-বৈষ্ণব-কীর্তনিয়াদের আখড়া হইতে শোধন করিয়া আনিয়া সাধারণের মধ্যে নির্বিচারে পরিবেশন করিতে শুরু করেন। বাংলাদেশে সংগীতকে সর্বসাধারণের জন্য মুক্তিদান করিল ব্রাহ্মসমাজ। কারণ মন্দিরের দ্বার সকলের জন্যই মুক্ত। কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে ধনীর বৈঠকখানায় বা ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে বা বাউল-বৈষ্ণবের আখড়ায় গিয়া শিক্ষাভিমানী ও বিলাতফেরতা নব্যদের পক্ষে সংগীতরসতৃষ্ণা মিটানো সম্ভব ছিল না। ধনীর গৃহে যাইতে তাঁহাদের আপত্তি ছিল, কারণ বর্তমান যুগের ডিমোক্রেটিক আইডিয়ার উহা পরিপন্থী; ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের গান বিশেষ কোনো অভিপ্রায় লইয়া রচিত, তাহা সর্বদা আর্টিস্ট চিত্তকে তৃপ্তি দিতে পারে না। বাউল-কীর্তনিয়ার আখড়ায় যাইতে মর্যাদায় বাধে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের উপযোগী মিলনক্ষেত্র ছিল না।

১ চিত্রাঙ্গদা (নাট্য) সচিত্র। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। [১২৯৯ ভাদ্র ২৮। [১৮৯২ সেপ্টেম্বর ২] এমারেল্ড থিয়েটারে (১৮৯২, ডিসেম্বর ১৭) কৃষ্ণকান্তের উইল অভিনয়ের পর 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনীত হয়। হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, ভারতীয় নাট্যমঞ্চ পৃ ৪৬। ১৯১৩ সালে চিত্রাঙ্গদার ইংরেজি Chitra নামে বিলাতে প্রকাশিত হয়, ১৯৩৬ সালে (১৩৪২ ফাল্গুন) কবি এই নাটিকাটিকে নৃত্যনাট্যে পরিণত করেন। যথাস্থানে এইসব গ্রন্থের আলোচনা হইবে।

এতকাল ধনীর গৃহে মুসলমানী দরবারের কায়দায় নৃত্যগীতের পোষণ ছিল বংশাভিজাত্যের অন্যতম অঙ্গ; কলিকাতার নূতন ধনীরাও নবলব্ধ ধনাভিজাত্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে কলিকাতার সাহেবী-থিয়েটারের অনুকরণে নিজ নিজ গৃহে শখের থিয়েটার শুরু করিলেন। সংগীতের ন্যায় ইহাও হইল exclussive, অর্থাৎ এইসব স্থানে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। ধনী, ধনীদের বন্ধুবান্ধব, আশ্রিত ও চাটুকাররাই নিমন্ত্রিত হইত।

বাংলা থিয়েটারের প্রথম বিশবৎসর এইভাবে ধনীদের গৃহে উহা আবদ্ধ থাকিল। কিন্তু যে ডিমোক্রাটিক আইডিয়া বা সাম্যবাদ যুগধর্মের ন্যায় দেশের সর্ব প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠানে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল তাহা সাহিত্যে, শিল্পে, কলাতেও দেখা দিল। পাবলিক রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইল; 'ন্যাশানাল থিয়েটার'১ (১৮৭২, ডিসেম্বর ৭ ১২৭৯ অগ্রহায়ণ ২৩) সর্বসাধারণকে টিকিট বিক্রয় করিয়া রঙ্গালয়ে প্রবেশাধিকার দান করিল। ন্যাশানাল থিয়েটার বাঙালির সাধারণ নাট্যশালা হইল। ক্রমে বেঙ্গল, গ্রেট ন্যাশানাল প্রভৃতি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইল; এইসকল নাট্যশালা উন্মোচিত হওয়ায় তথাকথিত পতিতা নারীদের মধ্যে যাহাদের অভিনয়ে ও সংগীতে শক্তি ছিল, তাহারা নাট্যমঞ্চে অচিরে নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশের প্রশস্ত ক্ষেত্র পাইল। এখন হইতে তাহাদের পক্ষে অনন্যকর্মা হইয়া সংগীত সাধনা, নাট্যকলা চর্চা, ও রূপপ্রসাধনাদি সম্ভব হইল। শখের থিয়েটারে অভিনেতাদের নাট্যসাধনার অবসর অল্পই মিলিত; নাট্যকলা 'অ্যামেচিওর'দের হাত হইতে ক্রমেই 'প্রোফেশানাল' নটনটীদের হাতে গেল। তদুপরি নাট্যব্যবসায়ীরাও শ্রোতাদর্শকের মনোরঞ্জনার্থে নানাভাবে রঙ্গালয়কে আকর্ষণীয় করিতে চেষ্টান্বিত হইলেন।

থিয়েটারের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সিন্, স্টেজ, রঙ্গালয় প্রভৃতির অভাবে সাধারণভাবে অভিনয় করিতে গিয়া 'যাত্রাপালা' নূতন রূপ গ্রহণ করিল। অনেক সময়ে তাহাদিগকে 'অপেরা' বলা হইত। থিয়েটারে সিন্ স্টেজ প্রভৃতির সাহায্যে দর্শকের মনে যেসব ভাব সহজে উদ্রেক করা যায়, যাত্রায়,— তদভাবে, বাক্যের দ্বারা, সেসব ভাবকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইল। ফলে থিয়েটার ও যাত্রার নাটক ও পালাগানের টেক্‌নিক বা রচনারীতি পৃথক হইয়া গেল, যেমন আজ 'টকি'র নাটক, রঙ্গমঞ্চে অভিনেতব্য পুরাতন নাটক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক টেকনিকে রচিত হইতেছে।

বাংলা নাট্যশালা ও নাটকের ইতিহাস বিবৃত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, তবে রবীন্দ্রনাথ নাট্যরচনায় ও নাটকাভিনয়ের যে ধারা পারম্পর্যসূত্রে উত্তরাধিকারী হন, তাহার কথা বলা আদৌ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শখের থিয়েটারে ফরমাইসি নাটক, অনূদিত নাটক প্রভৃতি অভিনীত হইত। কখনো কখনো ধনীদের মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান ও প্রতিভাবান তাঁহারা নিজেরাই নাটক রচনা করিয়া নিজ গৃহে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব আশ্রিতদের লইয়া অভিনয় করিতেন। স্বগৃহে অভিনয় ব্যাপারে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার বিশেষ একটি স্থান অধিকার করিয়াছেন। এই পরিবারের অনেকেই নাটক রচনায়, সংগীত প্রণয়নে ও নাট্য অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন; ইঁহাদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নামই সর্বাগ্রে স্মরণীয়, কারণ তিনি যে পথ উন্মোচন করিয়া দেন, রবীন্দ্রনাথ তাহাই প্রশস্ততর করেন। রবীন্দ্রনাথ ১৮৮১ সাল হইতে প্রায় ষাট বৎসর কাল এই নাট্যধারাকে পরিচালনা করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলাদেশে নাটক রচনার ও অভিনয়ের ইতিহাস খুব দীর্ঘকালের নহে, মাত্র ত্রিশ

১ ১২৭৯ সালে কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক 'সুলভসমাচার' সংবাদপত্র, ও বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। ন্যাশানাল থিয়েটারও এই বৎসরে স্থাপিত হইল বাংলার ইতিহাসে তিনটি ঘটনাই স্মরণীয়।

বৎসরের ইতিহাস। মধুসূদনকে যে বাংলা সাহিত্যের যুগপ্রবর্তক বলা হয়, একথা একাধিকভাবে সত্য। তিনি যে কেবল যুরোপীয় সাহিত্যের অনুকরণে, পাশ্চাত্য রীতিতে বাংলা এপিক, লিরিক, সনেট প্রভৃতি কাব্যরীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি পাশ্চাত্য আদর্শে নাটকও রচিয়াছিলেন; 'কৃষ্ণকুমারী' নাটককে বাংলাভাষার প্রথম তথাকথিত ঐতিহাসিক, 'শর্মিষ্ঠা'কে পৌরাণিক এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'কে প্রথম যুগের সামাজিক প্রহসন বলা যাইতে পারে। দীনবন্ধুর নামও এই সঙ্গেই স্মরণীয়।

ন্যাশানাল থিয়েটার স্থাপন ও গিরিশচন্দ্র বসুর নাট্যমঞ্চে আবির্ভাব প্রায় সমসাময়িক ঘটনা। গিরিশ আসিয়া দেখেন বাংলাসাহিত্যে অভিনেতব্য নাটক নাই। হয় মাইকেল, দীনবন্ধুর নাটক অভিনয় করিতে হয়, না-হয় বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্রের উপন্যাসকে নাট্যরূপ দিয়া থিয়েটার করিতে হয়। কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে যথার্থ নাটকীয় রসসৃষ্টি করা কঠিন। তখন তিনি স্বয়ং নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

পেশাদারী থিয়েটার গৃহ স্থাপিত হইলেও শখের থিয়েটার নষ্ট হইল না। কলিকাতার রঙ্গালয় বহুকাল পর্যন্ত তেমন আকর্ষণের স্থান হয় নাই। রঙ্গমঞ্চ, গৃহসজ্জা, সিন, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির মধ্যে বিলাতী থিয়েটারের নিকৃষ্ট অনুকরণ ছাড়া বৈশিষ্ট্য ছিল সামান্যই। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের চারিত্রিক আদর্শ তখনকার শিক্ষিত সমাজের নিকট আদৌ বরণীয় ছিল না। তাই দেখি ঠাকুরবাড়িতে শখের থিয়েটার বন্ধ হইল না। রবীন্দ্রনাথের বিলাত হইতে আসিবার পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারীর গীতনাট্য ও নাটিকা তাঁহাদের বাড়িতে অভিনীত হইয়াছিল। মোটকথা পেশাদারী থিয়েটার বা প্রাইবেট থিয়েটার মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের আর্টিস্ট চিত্তের চাহিদা পুরণ করিতে পারিতেছিল না। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকদের সান্ধ্যবিনোদনের জন্যই সঙ্গীত সমাজের প্রতিষ্ঠা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্‌যোগেই ইহা স্থাপিত হয়। কিছুকাল পূর্বে পুণা নগরীতে বাসকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মহারাষ্ট্রদের 'গায়েন সমাজ' দেখিয়াছিলেন; তখনই তাঁহার সঙ্গীত সমাজ স্থাপনের পরিকল্পনা আসে।[১]

সঙ্গীত সমাজ হইল বিলাতী ক্লাব ও বাবুদের বৈঠকখানার সংমিশ্রণ ফরাশ তাকিয়া, জাজিম, গড়গড়া, তাস, পাশার সঙ্গে থাকিল পিয়ানো, টেবিল অর্গান, বিলিয়ার্ড টেবিল প্রভৃতি। জমিদার ও ধনীরা আসিলেন, বিলাতফেরত ব্যারিস্টার ডাক্তার আসিলেন। কণ্ঠসঙ্গীতে ওস্তাদ কেহ কলিকাতায় আসিলে যেমন তাঁহাকে সমাজভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাঁহার কৃতিত্ব উপভোগ করিবার সুযোগ সভ্যদের দেওয়া হইত, তেমনি আনন্দ ও শিক্ষার জন্য সুসংস্কৃত প্রণালীতে অভিনয়ের ব্যবহার হইত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথই সঙ্গীত সমাজের প্রথম সম্পাদক। পরে অন্যতম সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এই সঙ্গীত সমাজে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অশ্রুমতী, অলীক বাবু, প্রভৃতি বহু নাট্য ও গীতনাট্যের অভিনয় হয়। সমাজের সভ্যদিগকে লইয়া অভিনয়ের আয়োজন হইত। কোনো মহিলা সভ্য না থাকায় স্ত্রী-চরিত্র অভিনয় করিবার জন্য কয়েকজন বেতনভোগী কিশোর স্থায়ীরূপে প্রতিপালিত হইয়া সমাজের বিশিষ্ট অভিনয়ভঙ্গিতে দীক্ষিত হইত। সঙ্গীত সমাজের সৃষ্টি হইতে রবীন্দ্রনাথ পরম উৎসাহের সহিত ইহাতে যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথের স্বভাব যাঁহারা জানেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, যখন তিনি কোনো বিষয়কে ধরিতেন, তাহাকে পরিপূর্ণভাবে, সমস্ত অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতেন। সঙ্গীত সমাজের অভিনয় উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ কিরূপ পরিশ্রম করিতেন তাহার সামান্য আভাস আমরা পাই তাঁহার স্ত্রীকে লিখিত পত্র হইতে। সভ্যশ্রেণীভুক্ত বিলাতফেরতাদের মধ্যে অনেকে বাংলা ভাষা সহজভাবে উচ্চারণ করিতে পারিতেন না; রবীন্দ্রনাথ দ্বিপ্রহরে কখনো বা

১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের (২০৯ নং) বাড়িতে এই সঙ্গীত সমাজ উঠিয়া আসিবার পূর্বে পর্যন্ত ইহার মধ্যে অনেক গণ্ডগোল ছিল, এমনকি মামলা মোকদ্দমা পর্যন্ত হইয়া যায়। সে সমস্ত অপ্রিয় আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নাই।

তাঁহাদের বাটিতে গিয়া কখনো বা সমাজভবনে আসিয়া তাঁহাদের উচ্চারণ সংশোধন করিতেন; আবার সন্ধ্যার পর মিলিত হইয়া তাঁহাদের ভূমিকা পাঠের আবৃত্তি গ্রহণ করিতেন, সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গভঙ্গি-আদি শিক্ষা দিতেন। এক এক দিন রিহার্সলে রাত্রি দেড়টা দুইটা বাজিয়া যাইত তখন সংকীর্ণ গলিপথ ধরিয়া হাঁটিয়া বাড়ি ফিরিতেন।

সঙ্গীত সমাজে অভিনয়ের জন্যই তিনি গোড়ায় গলদ'[১] রচনা করেন। শান্তিনিকেতন হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসে (১২৯৯) লিখিত একখানি পত্রে আছে, "দুটো তিনটে ভাবী নাটকের উমেদার মাঝে মাঝে দরজা ঠেলাঠেলি করচে। শীতকাল ছাড়া বোধ হয় সে গুলোতে হাত দেওয়া যাবে না" (ছিন্নপত্র)। কিন্তু শীতকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলেন না; বোধহয় সংগীত সমাজের উৎসাহী সদস্যদের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহাকে অভিনয়ের জন্য প্রহসনটি খাড়া করিয়া তুলিতে হইল। নটরাজ অমৃতলাল বসু মনে করিয়াছিলেন যে 'গোড়ায় গলদে'র লেখক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।[২]

পাণ্ডুলিপি হইতে যথাযথ ভূমিকা শিক্ষা দেওয়া হয়; কিন্তু পালা খাড়া করিয়া দেখা গেল যে নাটকীয় রস তেমন তেমন জমিতেছে না। তখন রবীন্দ্রনাথ অভূতপূর্ব অধ্যবসায় ও ক্ষিপ্রতার সহিত উহার আমূল সংশোধন করিলেন। 'গোড়ায় গলদ' অভিনয়কে সর্বাঙ্গ সুন্দর ও অত্যন্ত স্বাভাবিক করিবার জন্য অটলকুমার সেন যিনি শিবু ডাক্তারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তিনি নাকি সামনের গোটা দুই দাঁত তুলিয়া কৃত্রিম দন্ত ব্যবহার করিয়াছিলেন। অভিনেতারা যাহাতে দর্শকের মন হইতে সকল প্রকার কৃত্রিমতার আভাস বিলুপ্ত করিতে পারেন, ও কথাবার্তায় হাবভাবে চালচলনে গলার স্বরে ও শব্দের উচ্চারণে অভিনয়ে সহজ ঘরোয়া ভাবভঙ্গি ফুটাইতে পারেন, ইহাই ছিল সঙ্গীত সমাজের অভিনয়-ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদানের বিশেষ লক্ষ্য। পটলডাঙ্গার হেমচন্দ্রবসু মল্লিক— নিবারণ, ব্যরিস্টার ভুবনমোহন চাটুজ্জে—ললিত চাটুজ্জে ও শ্রীশচন্দ্র বসু—চন্দ্রবাবুর ভূমিকায় নামেন। শ্রীশবাবু গান করিতে পারিতেন না, তাই রবিবাবু নিজ নামেই স্টেজে বাহির হইয়া উহা গাহিয়া দিলেন। তাঁহার অবতারণার জন্য নাটকীয় কথোপকথনে কিছু যোগ করিয়া দেওয়া হয়। চন্দ্রবাবু তাঁহার বন্ধুদের রবিবাবুর গান শুনিবার জন্য একটু বসিতে বলেন, কারণ সেইদিনই তাঁহার দেখা করিতে আসিবার কথা আছে। পরে রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করিলে সকলের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় করাইয়া দেওয়া হইল; তিনিই শেষ গানটি গাহিলেন, 'যার অদৃষ্টে যেমনি জুটুক তোমরা সবাই ভালো।'

অতঃপর আমরা এইখানে রবীন্দ্রনাথের সহিত রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করিব। বাংলাদেশের রঙ্গমঞ্চের জন্য—সে রঙ্গমঞ্চ প্রাইবেটই হউক আর পাবলিকই হউক—বহু লেখক গীতনাট্য, কাব্যনাট্য, প্রহসন, গদ্যনাটক রচনা করিয়াছিলেন। এই অসংখ্য গীতকার নাট্যকারদের অন্যতম হইতেছেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা নাটকের অতীত বা তৎসাময়িক ইতিহাস হইতে তাঁহাকে পৃথক করিয়া দেখিতে গেলে তাহাকে যথার্থভাবে পাওয়া যাইবে না। এমন কি সমগ্রের পরিপ্রেক্ষণীতে তাঁহাকে না দেখিলে তাঁহার ব্যক্তিত্বের যথাযথ স্থান নির্দেশও হইবে না।

রবীন্দ্রনাথ বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার এক বৎসর পরে 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১ ফেব্রুয়ারী) তাঁহাদের বাড়িতে অভিনীত হইল। প্রায় দুই বৎসর পরে কালমৃগয়ার (১৮৮২ ডিসেম্বর) অভিনয় হয়। উভয় নাটকই বিদ্বজ্জন সমাগম সভার সম্বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে রচিত হয়; পাবলিকের চিত্তবিনোদনের জন্যই লিখিত, তবে সে পাবলিক নিমন্ত্রিত ভদ্রসমাজ।

কয়েক বৎসর পরে বাল্মীকি প্রতিভা নূতন করিয়া লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে উহার অভিনয় করাইলেন।[৩] অতঃপর আদি ব্রাহ্মসমাজের জন্য টাকা তুলিবার প্রয়োজন হইলে স্টার থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে টিকিট

১ গোড়ায় গলদ প্রকাশিত ১২৯৯ ভাদ্র। প্রিয়নাথ সেনকে উৎসর্গ করেন।

২ অমৃত মদিরা। গোড়ায় গলদ ও সঙ্গীতসমাজ সম্বন্ধে তথ্যগুলি খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'রবীন্দ্রকথা' হইতে গৃহীত।

৩ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত (১২৯২ ফাল্গুন ১৩।৮ ১৮৮৬ ফেব্রুয়ারী ২৪।

বিক্রয় করিয়া অভিনয় করা হয় ; আমাদের মনে হয় পাবলিক রঙ্গমঞ্চে কবির অভিনয়ও এই প্রথম এবং টিকিট বেচিয়া অর্থসংগ্রহও এই প্রথম।[১]

ইহার তিন বৎসর পরে পুনরায় তাঁহাকে ফরমাইসি গীতিনাট্য লিখিয়া দিতে হইল, সখীসমিতির মহিলা মেলায় অভিনয়ের উপযোগী গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা'। বেথুনস্কুলে গৃহস্থ ঘরের কন্যারা কেবলমাত্র মহিলা দর্শকের সম্মুখে সর্বপ্রথম ইহার অভিনয় করেন। মোটকথা পাবলিকের সম্মুখে অভিনয় করিবার জন্যই 'মায়ার খেলা' সৃষ্টি (১২৯৫ পৌষ)।

প্রত্যক্ষভাবে রঙ্গমঞ্চের সহিত রবীন্দ্রনাথের কোনো যোগ ছিল না সত্য, কিন্তু রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটকের উপর তাঁহার পরোক্ষ প্রভাবের কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। পাঠকের স্মরণ আছে রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরানীর হাট' ১২৮৯ সালের পৌষমাসে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। কয়েক বৎসর পরে এই উপন্যাসের নাট্যরূপ 'রাজা বসন্তরায়' নামে পাবলিক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইল।[২] ন্যাশনাল থিয়েটারের কেদারনাথ চৌধুরী বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', (১৮৮৩ মে ৭) অভিনয় করান; তৎপরে 'ছত্রভঙ্গ' নামে নিজ রচিত নাটকও তথায় অভিনীত হইয়াছিল। 'রাজা বসন্তরায়' বহুবার কলিকাতায় অভিনীত হইয়াছিল।[৩] কেদারনাথের 'রাজা বসন্তরায়' সম্বন্ধে অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবনীতে লিখিয়াছেন "এই সময়ে যে কয়েকখানি নাটক অভিনীত হয়, তন্মধ্যে কেদারবাবু কর্তৃক নাটকাকারে পরিবর্তিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বউঠাকুরানীর হাট' খুব জমিয়াছিল। প্রবীণ অভিনেতা স্বর্গীয় রাধামাধব কর 'বসন্তরায়ে'র ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সুমধুর সংগীতে দর্শকগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।"[৪]

কাব্যনাট্য রচনায় রবীন্দ্রনাথের কোনো বৈশিষ্ট্য আছে কিনা তাহা বিচার্য। এতাবৎকাল পৌরাণিক ও অর্ধ-ঐতিহাসিক কাহিনীই ছিল নাটক রচনার উপাদান। গিরিশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ প্রভৃতি নাট্যকারগণ প্রায়শই রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি হইতে নাটকের উপাদান সংগ্রহ করিতেন। অর্থাৎ বাংলার পারম্পর্যগত যাত্রাপালাগানের প্রভাব হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার প্রথম দুই গীতিনাট্যের বিষয়বস্তু রামায়ণ হইতেই সংগ্রহ করেন। কিন্তু তিনি অচিরেই এই মধ্যযুগীয়তাকে অতিক্রম করিয়া নূতন ধরণের কাব্যনাট্য রচনায় মন দিলেন ; 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'মায়ার খেলা', 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন' নূতন ধরনের নাটক, তাহারা পৌরাণিকও নহে, ঐতিহাসিকও নহে, তাহারা কেবলমাত্র নাট্যকাব্য। রবীন্দ্রনাথের যথার্থ কাব্য-নাটক হইতেছে 'রাজা ও রানী' ১২৯৬ সালের গ্রীষ্মকালে সোলাপুরে রচিত। বই ছাপা হয় শ্রাবণ মাসে (১৮৮৯ অগস্ট ১০)। বোধ হয় পূজার ছুটিতে সত্যেন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিলে তাঁহাদের পার্কস্ট্রীটের বাড়িতে উহার অভিনয় হয়। রবীন্দ্রনাথ বিক্রমদেবের, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সুমিত্রার এবং মৃণালিনী দেবী নারায়ণীর ভূমিকায় নামেন। মৃণালিনী দেবী ইতিপূর্বে বা অতঃপরে কখনো অভিনয় করেন নাই ; নারায়ণীর ভূমিকা তিনি নাকি অপূর্ব সফলতার সহিত করিয়াছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ঘরোয়া'য় (পৃ. ১২৩-৪) বলিয়াছেন যে থিয়েটারের অভিনেতা অভিনেত্রীর কোনোক্রমে পার্কস্ট্রীটের বাড়ির অভিনয় দেখিয়া যায় এবং কয়েকদিন পরে এমারেলডে যে অভিনয় হয় (১৮৮৯ নভেম্বর ৩০)। তাহাতে অভিনেত্রীরা

১ গিরিশ প্রতিভা পৃ. ৫৮৭। অবনীন্দ্রনাথ ঘরোয়া

২ ১৮৮৬ জুলাই ৩।১২৯৩ আষাঢ় ২০। দ্র: হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ভারতীয় নাট্যমঞ্চ পৃ. ৩৭। বসন্তরায়—রাধামাধব কর ; প্রতাপাদিত্য—মতিসুর ; উদয়াদিত্য—মহেন্দ্র বসু ; বিভা—সুকুমারী (পরে হরি, বিভাহরি), রামচন্দ্র—নীলমাধব ; রানী—ভবতারিণী ; মোহন—পূর্ণ ঘোষ, মঙ্গলা—ক্ষেত্রমণি।

৩ ১৯০১ এপ্রিল ৬— মিনার্ভা থিয়েটারে রাজা বসন্ত রায় পুনরায় অভিনীত হয়। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ভারতীয় নাট্যমঞ্চ পৃ. ৫৭।

৪ অবিনাশচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র পৃ ৩৩৭ দ্র প্রবোধচন্দ্র সেন ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ পৃ ২২৪।

ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের অভিনয়ের ঢং আশ্চর্যরূপে অনুকরণ করিয়াছিল। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর পোশাকপরিচ্ছদ, গলার স্বর, বলিবার ভঙ্গি, প্রভৃতি যেভাবে অনুকৃত হইয়াছিল, তাহা অবর্ণনীয়। রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা এই অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন।

'রাজা ও রানী' যখন অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত হইয়াছিল, তখন বাংলা কাব্যনাটকে গৈরিশ-ছন্দের যুগ চলিতেছে। আট বৎসর পূর্বে (১২৮৮) রবীন্দ্রনাথ যখন 'সন্ধ্যা সংগীতে'র কবিতায় ছন্দের যুক্তি সাধনায় নিরত, সেই সময়ে গিরিশ-চন্দ্রের পৌরাণিক নাট্য 'রাবণ বধ' 'সীতার বনবাস' 'অভিমন্যুবধ' প্রভৃতি রচনা করিতেছিলেন। এই নূতন ছন্দে নাটক প্রকাশিত হইলে ভারতীতে (১২৮৮ মাঘ) যে সমালোচনা বাহির হয় তাহাতে ছিল 'ইহাই যথার্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দ। ইহাতে ছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা এ ছন্দের মিষ্টতা উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। কি মিত্রাক্ষরে কি অমিত্রাক্ষরে অলংকার শাস্ত্রোক্ত ছন্দ না থাকিয়া হৃদয়ের ছন্দ প্রচলিত হয়, ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা ও ইহাই আমরা করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। গিরিশবাবু এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করাতে আমরা অতিশয় সুখী হইলাম।'

রবীন্দ্রনাথ মুক্তছন্দের পক্ষপাতী, লিরিকে তিনি তাহা পরীক্ষা করিলেন, নাট্যকাব্যে নহে। আমাদের মনে হয় বাংলাসাহিত্যের নাট্যকাব্যে যখন গৈরিশ ছন্দে রচনা একপ্রকার mannerism হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখনই রবীন্দ্রনাথ নাট্যকাব্যে মধুসূদনের ও গিরিশের রীতির মধ্যপথ অবলম্বন করিলেন। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন যথার্থ বলিয়াছেন, "রবীন্দ্রনাথের ছন্দে প্রবহমানতার দিকে ঝোঁক বেশি এবং গৈরিশ ছন্দ অপেক্ষাকৃত কম প্রবহমান, পঠিতব্য কবিতা ও অভিনেতব্য নাট্যের প্রয়োজনেই এই ছন্দ দুজনের হাতে দুই রূপ ধারণ করেছে।" (ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ পৃ ২২৪)। আমাদের মতে রবীন্দ্রনাথ 'রাজা ও রানী' নাটকে ছন্দের পরীক্ষা করিলেন। এ ছাড়া অভিনয়মঞ্চে পৌরাণিক ও অর্ধ-ঐতিহাসিক নাটক ব্যতীত অন্য শ্রেণীর রোমান্টিক নাটক চালানো যায় কিনা তাহার পরীক্ষাও করিলেন 'রাজা ও রানী' এবং পরে বিসর্জন লিখিয়া।

'বিসর্জন' রচিত হয় বাড়ির ছেলেদের তাগিদে সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি; উহা অভিনয় হয় সত্যেন্দ্রনাথের বাড়িতে (১৮৯০ অক্টোবর)। কিন্তু পাবলিক থিয়েটারে সেযুগে উহার অভিনয় হয় নাই। না হইবার কারণ বেশ বুঝা যায়, কালী মূর্তিকে দূরে নিক্ষেপকরা থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে সম্ভব নহে। কিন্তু দুই বৎসর পরে 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২ সেপ্টেম্বর ২২) প্রকাশিত হইলে তাহা এমারেল্ড থিয়েটারে[১] কৃষ্ণকান্তের উইল' অভিনয়ের পর অভিনীত হইয়াছিল। (১৮৯২ ডিসেম্বর ১৭) সেদিন উহাকে অশ্লীল বা দুর্নীতিমূলক বলিয়া কেহ নিন্দা করিয়াছিলেন কিনা আমরা জানিনা।

ইতিমধ্যে কলিকাতায় ভারতীয় সঙ্গীতসমাজ স্থাপিত হইল। গান বাজনা আমোদ আহ্লাদের সঙ্গে মাঝেমাঝে নাট্য অভিনয়ের আয়োজন হইল। রবীন্দ্রনাথ এই সমাজের প্রতিষ্ঠামুখে মহোৎসাহে যোগদান করিয়াছিলেন এবং শুরু হইতে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় স্থাপন কাল পর্যন্ত প্রায় দশ বৎসর ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, ১৩০৮ সালের পর তাঁহার সম্বন্ধ ক্ষীণ হইয়া আসে। এই সঙ্গীতসমাজের যুবক বন্ধুদের উৎসাহে অভিনয়ের জন্য তিনি 'গোড়ায় গলদ' প্রহসন লিখিলেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি বাংলাসাহিত্যে প্রহসন রচনার ইতিহাস খুব প্রাচীন নহে; মধুসূদন ও দীনবন্ধুকে ইহার প্রধান আচার্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তবে তাঁহাদের ও তাঁহাদের পরবর্তী অনেক নাট্যকারের নাটকের মধ্যে হাস্য রস wit ও humour প্রচুর থাকিলেও satire বা বিদ্রূপ ছিল রচনার উদ্দেশ্য। রঙ্গমঞ্চে হাস্যরস সৃষ্টি করিবার জন্য কাহাকেও-না-কাহাকে বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গ করাটাই ছিল রীতি। নাট্যকারদের আক্রমণের বাঁধা কয়েকটি বিষয় ছিল। শিক্ষিত মেয়েদের লইয়া বিদ্রূপ এবং ব্রাহ্মদের আচার ব্যবহার ও ধর্মবিশ্বাস লইয়া ব্যঙ্গই ছিল আক্রমণের প্রশস্ত ক্ষেত্র। গোঁড়াহিন্দু এবং নব্য বিলাতফেরতদেরও লাঞ্ছনা হইত প্রচুর পরিমাণে। গিরিশ

১ হেমেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ভারতীয় নাট্যমঞ্চ পৃ ৪৬)

চন্দ্রের নাট্যমঞ্চে আবির্ভাবের পর হইতে গত পনেরো বৎসরের মধ্যে (১৮৭৭-১৮৯২) বাংলাদেশের সাধারণ অভিনয়ের বিষয় ও রুচির যুগান্তর হইয়াছিল। কিন্তু প্রহসন বিষয়ে এখনো বিশুদ্ধ হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা তেমন ভাবে দেখা যায় নাই, সুরুচিসংগত হাস্যসৃষ্টির প্রয়াসেই 'গোড়ায় গলদে'র জন্ম। একথা বলাই বাহুল্য যে সমসাময়িক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকাদির সহিত রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল ; নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধেও তাঁহার অজ্ঞতা কল্পনা করার কোনো কারণ নাই। সমসাময়িক প্রহসনাদি পাঠ করিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল, কোনো সম্প্রদায় বা ব্যক্তি বিশেষকে বিদ্রূপ না করিয়াও রঙ্গমঞ্চে হাস্যরসের অনাবিল আনন্দস্রোত বহানো যায় ; বিদ্রূপের কশাঘাতে কাহাকে বিপন্ন না করিয়া যে সহজ আনন্দ রঙ্গমঞ্চে সৃষ্টি করা যায় তাহারই মধ্যে যথার্থ আর্টিস্টমনের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য রচনাকালে নিজ আর্টিস্টসত্তাকে কখনো খর্ব হইতে দিতেন না। নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন কুরুচি আছে, তাহা কবিচিত্তকে আঘাত করিত বলিয়া তাঁহার পক্ষে জনপ্রিয় satire লেখা সম্ভব হয় নাই। বিশেষ এক শ্রেণীর দর্শকশ্রোতার মার্জিত রুচি ও সৌন্দর্যগ্রাহী মনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রবীন্দ্রনাথের এই প্রহসন রচিত হইয়াছিল, ইহার কোথাও কণামাত্র vulgarity বা বিদ্রূপের রূঢ়তা নাই ; উহা বিশুদ্ধ হাস্যরসের নির্ঝর।

রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে হেঁয়ালিনাট্য ও নানা ব্যঙ্গ কৌতুকে হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছিলেন ; কিন্তু হেঁয়ালি-নাট্যগুলি সাধারণত বালকদের অভিনয়ের জন্য রচিত ; স্বল্পপরিসর নাট্যের মধ্যে হাস্যমুখর রসিকতার স্থান খুবই সংকীর্ণ। কতকগুলি নাটক বিদ্রূপের বাণে তীক্ষ্ণ ও স্পষ্টতার জন্য অসুন্দর। যাহাই হইক, এইসব রচনাকেই প্রহসনের আদি প্রয়াস বলা যাইতে পারে।

এই হাস্যদ্যোতক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাটিকাগুলি ব্যতীত তাঁহার গীতনাট্য ও কাব্যনাট্যের মধ্যে হাস্যরসের যথেষ্ট খোরাক আছে। প্রকৃতির প্রতিশোধ, রাজা ও রানী, বিসর্জনের জনতার মধ্যে এমনকি বাল্মীকিপ্রতিভার দস্যুদল ও কালমৃগয়ার বিদূষক ও শিকারীদের মধ্যে কবি প্রচুর হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন। কোনো প্রকার হাসির আমেজ নাই, এমন গীতনাট্য হইতেছে 'মায়ার খেলা'। রবীন্দ্রনাথের নাটকের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় যে জনতার হাস্যচটুল রসিকতাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, নাটকীয় action অভিনয় নহে। একএক সময়ে মনে হয়, মূল রচনার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ খুবই ক্ষীণ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয়। তবে আবার মনে হয়, নিষ্ঠুর ট্রাজেডির বেদনা হইতে শ্রোতাদর্শকের চিত্তকে কিয়দপরিমাণে মুক্তি দিবার জন্য কবি যেন এইসব জনতার অবতারণা করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে এইসব ট্রাজেডি পড়া বা দেখা খুবই কষ্টকর হইত। তবে উচ্চাঙ্গ কাব্যনাট্যের বা নাটকের মধ্যে সাধারণ দর্শকের চিত্তবিনোদনের চেষ্টা না করিলে কবির যশোসৌরভ ম্লান হইত না। এইসব জনতা যেখানে কবির লেখনীর নিকট প্রশ্রয় পাইয়াছে, সেইখানেই তাহারা কলহে ও কোলাহলে নাটকটিকে দুর্বল করিয়া দিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি যে বাংলা নাট্যসাহিত্যে জনতার স্থান সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণার বিশাল ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অনাবিল হাস্যরস সৃষ্টি ; রচনার মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধির স্বল্পমাত্র আমেজ না থাকাতে উহা কালকে অতিক্রম করিয়া এখন পর্যন্ত দর্শক ও শ্রোতাকে আনন্দ দিতেছে ; এরূপ সৌভাগ্য খুব কম নাটকেরই হয়।

'গোড়ায় গলদ' দোষ শূন্য নহে। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে ইহার মধ্যেও অবান্তর দৃশ্য আছে, সংলাপে বহুস্থানে সংক্ষিপ্ত করিবার অবসরও আছে। তাহা ছাড়া কতকগুলি ঘটনা বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের পক্ষে কৃত্রিম বলিয়া মনে হয়। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে-মেয়ে অপরিচিত ও অনাত্মীয় যুবকদের সহিত হরদম 'সোসাইটি'তে মিশিতে তেমন অভ্যস্ত নহে, তাহার পক্ষে একটি ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় উপবিষ্ট কোনো সুবেশ সুদর্শন যুবককে গৃহকর্তার ভৃত্যরূপে সম্বোধন করা ও পাল্‌কির খোঁজ করিতে বলা— খুব

স্বাভাবিক নহে। এমনকি বাঙালি ঘরের যুবতী কুমারীর মুখে তাহা বাচালতার মতো শোনায়। বিলাতি সমাজে এটি মানানসই। এতদ্‌সত্ত্বেও একথা অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করিতেই হইবে যে বাংলাসাহিত্যে এরূপ হাস্যোজ্জ্বল সুরুচিসম্পন্ন রসিকতাপূর্ণ নাটক ইতিপূর্বে রচিত হয় নাই। এতবড়ো নাটকে সর্বশেষে মাত্র একটি গান থাকায়, ইহা সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। গান না থাকিবার কারণ ছিল; এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যলক্ষ্মী বা গীতশ্রী অন্তর্হিতা ছিলেন; 'সাধনা' খুঁজিয়া কবিতা পাওয়া যায় না, গানও দুর্লভ।

এই নাটক রচনার ছত্রিশ বৎসর পর (১৩৩৫) সাতষট্টি বৎসর বয়সে কবি পাবলিক থিয়েটরে নাটকখানি অভিনয়ের উপযুক্ত করিবার জন্য নূতন করিয়া লিখিয়া দেন। আখ্যানের গোড়ার দিকে নায়ক-নায়িকারা সকলেই গলদ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু শেষের দিকে সকলেই সামলাইয়া রক্ষা পাইলেন, তাই ইহার নূতন নামকরণ করিলেন, 'শেষ রক্ষা'। ইহাতে আটটি নূতন গান সংযোজিত করেন। 'গোড়ায় গলদ' নাটকের গল্পাংশ সংক্ষেপে বিবৃত হইল:

যুবক উকিল চন্দ্রকান্তের বাসায় রবিবার দিন সকালে বিনোদবিহারী, নলিনাক্ষ বসিয়া বিবাহাদি বিষয়ে গল্প হাসি ঠাট্টা করিতেছে। চন্দ্রকান্ত বিবাহিত, তাঁহার স্ত্রীর নাম ক্ষান্তমণি। শিবচরণ ডাক্তারের ছেলে নিমাই ইহাদের বন্ধু, সেও আসিয়া জুটিল। নিমাই মেডিকাল কলেজের ছাত্র; সে প্রেমকে একটা রোগ বলিয়া জানে। সে বলে অসুস্থ শরীরেই প্রেমব্যাধি দেখা দেয়। কোন্ দিন এই ব্যাধি সারাইবার ঔষধ আবিষ্কৃত হইবে। পাশের বাড়িতে থাকেন নিবারণবাবু ও তাঁহার কন্যা ইন্দুমতী; আর সেখানে থাকে কমলমুখী,—নিবারণবাবুর বন্ধু আদিত্যবাবুর কন্যা। আদিত্যবাবু মারা গেলে কমলমুখী ইন্দুমতীর সহিত একত্র নিবারণ বাবুর কাছে লালিত হয়। নিবারণবাবু খানিকটা আধুনিক ভাবাপন্ন লোক; মেয়ে দুইটিকে লেখাপড়া শেখান; অল্প বয়সে বিবাহও দেন নাই। সেদিন প্রাতে কমলমুখীর গান শুনিয়া বিনোদবিহারী ঠিক করিল, তাহাকেই বিবাহ করিবে। বিনোদ এম. এ. বি. এল. পাশ, ওকালতি শুরু করিয়াছে বটে, তবে পসার জমে নাই বলিয়া পটলডাঙার মেসেই থাকে। চন্দ্রকান্ত বিবাহবিষয়ে কথাবার্তা বলিবার জন্য নিবারণবাবুর বাসায় গেল; চন্দ্রকান্তের সঙ্গে ছিল বিনোদ ও নিমাই। নিবারণবাবু বিনোদের তত্ত্ব লইতে এত ব্যস্ত হইলেন যে নিমাই-এর পরিচয় পর্যন্ত লইতে ভুলিয়া গেলেন। নিমাই সুপুরুষ। আড়াল হইতে দেখিয়া ইন্দুমতীর তাহাকে ভালো লাগিল, পরিচয় জানিবার জন্য সে গেল ক্ষান্তমণির বাড়ি। বর্ণনা শুনিয়া ক্ষান্ত বলিলেন, সে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ললিতবাবু। গলদ শুরু হইল এখান থেকেই। ইন্দুমতী আমুদে মেয়ে, ক্ষান্তমণির সহিত রহস্য করিবার জন্য চন্দ্রকান্তের চোগা চাপকান পাগ্‌ড়ি পরিয়া হৈচৈ করিতেছে। হঠাৎ বাহির হইতে চন্দ্রকান্তের আহ্বান শুনিয়া ইন্দুমতী পলায়নপর হইল। ক্ষান্তমণিকে বলিয়া গেল চন্দ্রকান্ত আসিলে যেন বলে বাগবাজারের চৌধুরীবাড়ির কাদম্বিনী আসিয়াছিল, তাহার পরিচয় যেন না দেয়। বাহিরের ঘর দিয়া পলাইতে গিয়া দেখে সেখানে বসিয়া নিমাই (বা ললিত)। ইন্দুমতী তাড়াতাড়ি চোগা চাপকান তাহার হাতে দিয়া বলিল, 'তোমার বাবুর জিনিস; যথাস্থানে রাখিয়া দিয়ো। চট্ করিয়া দেখিয়া আইস বাগবাজারের চৌধুরীবাড়ি থেকে পাল্‌কি আসিয়াছে কিনা।' ইন্দু কোনোমতে পলায়ন করিল, কিন্তু নিমাই তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং মনে মনে ঠিক করিল, 'বিবাহ যদি করিতে হয় তবে চৌধুরীবাড়ির এই বুদ্ধিমতী মেয়েটিকেই বিবাহ করিব।'

এদিকে শিবচরণ বন্ধু নিবারণের কন্যা ইন্দুমতীর সহিতই নিমাই-এর বিবাহ ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু নিমাই বিবাহসম্বন্ধে ঘোর আপত্তি তুলিল এবং অবশেষে বলিল, 'বাগবাজারের চৌধুরীবাড়ির মেয়ে' ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না। শিবচরণ খুব রাগারাগি করিলেন ও অবশেষে বহু সন্ধানে ও চেষ্টায় সেই ব্যবস্থাই করিলেন।

বিবাহের পর বিনোদবিহারীর মোহ কাটিয়া গিয়াছে; পসারহীন উকিলের পক্ষে কলিকাতায় বাসা চালানো কঠিন। সে কমলমুখীকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিল। কমলমুখীর পিতা আদিত্যবাবু কন্যার জন্য বিপুল ঐশ্বর্য রাখিয়া গিয়াছিলেন; সেকথা নিবারণবাবু এতদিন বলেন নাই। বিবাহ বা প্রাপ্তবয়স্কা না হইলে সে-অর্থ কমলের হাতে দেওয়া ছিল নিষেধ। নিবারণ এতদিন পরে তাহা কমলমুখীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। কমল এইবার স্বামীকে বশ করিবার এক ফন্দি আঁটিল। সে এক বাড়ি ভাড়া করিয়া উত্তমরূপে সাজাইয়া লইল। তাহার পরে বিনোদবিহারীকে তাহার এস্টেট প্রভৃতি দেখিবার জন্য উকিল নিয়োগ করিল। কমলমুখী অন্তরাল হইতে বিনোদের সহিত কথাবার্তা বলে বটে, কিন্তু মুখ দেখায় না, আত্মপরিচয়ও দেয় না। অবশেষে একদিন কমলমুখী বিনোদের স্ত্রীকে তথায় আনিবার জন্য অনুরোধ করিল। বিনোদ মহা মুশকিলে পড়িল; কী করিয়া নিবারণবাবুর কাছে মুখ দেখাইবে এবং স্ত্রীকে আনিবার প্রস্তাব করিবে!

এদিকে ইন্দুমতীকে বিবাহের জন্য ললিতকে অনুরোধ করা হইল। বিবাহের প্রস্তাবে ললিত বিনোদকে খুবই অপমান করিল। সে পুরা সাহেব, তাহার আকাঙ্ক্ষা উচ্চ। সে বলিল, 'তুমি wife select করবে আর আমি marry করব। I admire your cheek বিনু!' ইন্দুমতীর ধারণা ছিল ললিতবাবু কাদম্বিনীর নাম শুনিলেই বিবাহ করিবে। তিনি ত 'কদম্বে'র নামে কবিতা পর্যন্ত লিখিয়াছেন! কিন্তু ললিতের সহিত তো তাহার দেখা হয় নাই, হইয়াছিল নিমাইএর সঙ্গে; সেই ভুলই চলিতেছে। অবশেষে বহু সাধ্যসাধনার পর ইন্দুমতীকে নিমাই-এর সম্মুখে আনা গেল। ইন্দু জানে উনি ললিত বাবু। কথাবার্তার মধ্যে উভয়ের ভুল ভাঙিয়া গেল। নিমাই ইন্দুমতীকে বিবাহ করিতে রাজি হইল। কিন্তু কাদম্বিনীর দশা কী হয়। শিবচরণের মুখ রক্ষা হয় কী করিয়া। চন্দ্রকান্ত সে সমস্যা পূরণ করিয়া দিল। ললিত কাদম্বিনীকে বিবাহ করিতে রাজি হইল। কাদম্বিনী অত্যন্ত কুরূপা ছিল বটে কিন্তু তাহার অভিভাবকের রূপার জোর ছিল। সেই গুণে ললিত বিবাহে রাজি হইল; সে টাকা লইয়া বিলাত যাইবে।

এদিকে কমলমুখী বিনোদকে বেশ নাকাল করিয়া আত্মপরিচয় দিল; ইন্দুমতীও নিমাইকে বিবাহ করিয়া সুখী হইল। গোড়ায় গলদ থাকিলেও শেষ রক্ষা হইল।

সাধনার দ্বিতীয় বর্ষ

কাব্যলক্ষ্মী বা গীতশ্রী কবিহৃদয়ে বহুকাল আবির্ভূতা হন নাই। পত্রিকা পরিচালনার খাতিরে নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য করিতে হয়; গদ্য প্রবন্ধ, গদ্য গল্প, ব্যাকরণের বিশ্লেষণ, দেশবিদেশের পত্রিকার সারসংগ্রহ, সাময়িকপত্রের সমালোচনা লিখিতে হয়; ছন্দোময়ী ভাষা কোনো রন্ধ্রপথে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। শতকর্মে ব্যাপৃত থাকিলেও রবীন্দ্রনাথ যে কবি, এই সামান্য কথাটি তাঁহার অন্তর্দেবতা ভুলিতে পারেন না; তাই তাঁহার গদ্য গল্পগুলিই অন্তর্বিষয়ী লিরিকধর্মী হইয়া ফুটিয়া ওঠে।

মানুষ যখন এইরূপ কর্মের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে, তখন মনে হয় জগতে ব্যবহারিকতারই জয়; তখন বাস্তবতাকে লোকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে,— পাণ্ডিত্যকে জ্ঞান বলিয়া ভ্রম করে। তখন তাহার মনে হয় কাব্য মিথ্যা, ছন্দ নিরর্থক, সুর অলীক,— সত্য কেবল তথ্য, তত্ত্ব, শব্দ, অলংকার, ব্যাকরণ সংখ্যা প্রভৃতি। কিন্তু যথার্থ কবির অন্তর তাহাতে সাড়া দিতে পারে না, জ্ঞানগর্ভবাক্য অন্তরে সম্ভ্রম সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু রসপূর্ণ বাক্য চিত্তে প্রেমস্বপ্ন জাগায়। রসই প্রাণ, রসাত্মক বাক্যই কাব্য, এবং সেই কাব্যই বিরহে তৃপ্তি, বেদনায় শান্তি আনিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের মনে যখন এই সংগ্রামই চলিতেছিল, তখন তিনি 'জয়পরাজয়' (সাধনা ১২৯৯ কার্তিক) লেখেন। এই গল্পে তিনি Defence of poesy করিলেন। বৈয়াকরণরা শব্দ সৃষ্টি করেন; কিন্তু মানুষ যে ভাষা অন্তর দিয়া অনুভব করে তাহা কেবল শব্দ নহে, সেই বাক্যে প্রাণ সঞ্চার করেন কবিরা। শব্দের কোলাহলে মানুষ ত্রস্ত হয়,— রসাত্মক বাক্য তাহাকে তৃপ্তি দান করে। তাই দিঙ্‌নাগের দল চিরদিনই কালিদাসদের লাঞ্ছনা করিয়াছে। পুণ্ডরীক পণ্ডিতের হাতে শেখর কবির অপমান হইল; সেইজন্যেই রাজাও তাহাকে কোনো আশ্রয় দান করিলেন না। রাজসভায় পাণ্ডিত্যের বিচার হইতে পারে; কিন্তু কাব্যবিচারের মানদণ্ড তো বাহিরে নাই, কারণ, কাব্য বিচারণীয় বস্তু নহে, —উহা বোধের ও সম্ভোগের বিষয়। তাই দেখি, শেখর কবি পুণ্ডরীকের পাণ্ডিত্যের দ্বারা অভিভূত হইয়া, পরদিন রাজসভায় প্রবেশ করিয়া 'গান আরম্ভ করিয়া দিলেন, বৃন্দাবনে প্রথম বাঁশি বাজিয়াছে, তখনো গোপিনীরা জানে না, কে বাজাইল— জানে না, কোথায় বাজিতেছে।...বাঁশি কী বলিতেছে তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না, এবং বাঁশির উত্তরে হৃদয় কী বলিতে চাহে, তাহাও কেহ স্থির করিতে পারিল না; কেবল দুটি চক্ষু ভরিয়া অশ্রুজল জাগিয়া উঠিল, এবং একটি অলোক-সুন্দর শ্যামস্নিগ্ধ মরণের আকাঙ্খায় সমস্ত প্রাণ যেন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।...সভা ভুলিয়া, রাজা ভুলিয়া, আত্মপক্ষ প্রতিপক্ষ ভুলিয়া, যশ অপযশ, জয় পরাজয়, উত্তর প্রত্যুত্তর, সমস্ত ভুলিয়া শেখর আপনার নির্জন হৃদয়কুঞ্জের মধ্যে যেন একলা দাঁড়াইয়া এই বাঁশির গান গাহিয়া গেলেন।... লোকে ক্ষণিকের জন্য সব ভুলিয়া ছিল; কিন্তু পুণ্ডরীক 'রাধা' শব্দের ব্যাখ্যায় সকলকে মুগ্ধ করিয়া দিলেন; তাঁহার অদ্ভুত শব্দচাতুরী বাগ্‌আড়ম্বর দেখিয়া সভাস্থ লোক বিস্ময় রাখিতে স্থান পাইল না। রাজা নিজের কণ্ঠ হইতে মুক্তার মালা খুলিয়া পুণ্ডরীকের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন, কবির পরাজয় হইল। কুটিরে ফিরিয়া শেখর তাঁহার সমস্ত পুঁথিগুলি পড়িলেন; নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, সমস্ত জীবনের এই কি সঞ্চয়। কতকগুলা কথা এবং ছন্দ এবং মিল।" অতঃপর গ্রন্থগুলি অগ্নিতে সমর্পণ করিয়া মধুর সঙ্গে একটা উদ্ভিদের বিষরস মিশাইয়া নিশ্চিন্ত মুখে পান করিলেন। এমন সময়ে রাজকন্যা অপরাজিতা আসিয়া মৃত্যুপথ-যাত্রীর উদ্দেশে বলিলেন, 'তোমারই জয় হইয়াছে, কবি, তাই আমি আজ তোমাকে জয়মাল্য দিতে আসিয়াছি।' অপরাজিতা নিজের কণ্ঠ হইতে স্বহস্তরচিত পুষ্পমালা খুলিয়া কবির গলায় পরাইয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথ কাব্যাদর্শকে কাব্যসরস্বতীর হস্তে জয়টীকা পরাইয়া লইলেন। কিন্তু যথার্থ এই রোমান্টিক গল্পটির মধ্যে বিশুদ্ধ আর্টের উদ্দেশে যে জয়মাল্য উৎসর্গ করিলেন তাহা কিছুকাল পরে 'পুরস্কার' কবিতার মধ্যে আরও পরিস্ফুট ভাবে প্রকাশ পায়; সেখানে কবিই জিতিয়াছিল রাজকণ্ঠের পুষ্পমালা পাইয়া। যথাস্থানের জন্য সে আলোচনা স্থগিত থাকিল।

বহুদিন কবিতা সুন্দরী দেখা দেন নাই; হঠাৎ কোনো বিদায়ের ক্ষণকে স্মরণ করিয়া অথবা কোনো সত্যকার বিচ্ছেদ বেদনার আঘাতে একটি কবিতা উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিল— 'যেতে নাহি দিব' (১৪ কার্তিক ১২৯৯)। চারি বৎসরের কন্যার তুচ্ছ একটি কথা, কবির মনে কী অপরূপ চিন্তাধারা আনিতে পারে, এই কবিতাটি তাহারই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই কবিতাটিতে বাঙালি সংসারিক জীবনের যে চিত্রটি আঁকিয়াছেন তাহাও যেমন সত্য, মানবজীবনের যে তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও তেমনি গভীর। প্রকাশভঙ্গির অনবদ্যতা কবিতাটির কোথাও ম্লান হয় নাই— তত্ত্ব, কলা ও কাব্য আশ্চর্যরূপ ভাবে, ভাষায় ও ছন্দে মিশিয়া অপরূপ হইয়াছে। মানুষের চিরন্তন ক্রন্দনধ্বনি যেতে নাহি দিব— চলমান জগতের ঘর্ঘর শব্দের নিকট বৃথায় আছড়াইয়া মরে।

এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা, সবচেয়ে
গভীর ক্রন্দন 'যেতে নাহি দিব'। হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চ'লে যায়।...

'দিব না দিব না যেতে' ডাকিতে ডাকিতে
হুহু ক'রে তীব্রবেগে চ'লে যায় সবে
পূর্ণ করি' বিশ্বতট আর্ত কলরবে।...
...ম্লান মুখ, অশ্রু আঁখি,

দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটিছে গরব
তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব,
তবু বিদ্রোহের ভাবে রুদ্ধ কণ্ঠে কয়
'যেতে নাহি দিব।'...তখনি দেখিতে পায়
শুষ্ক তুচ্ছ ধূলিসম উড়ে চ'লে যায়
একটি নিশ্বাসে তার আদরের ধন,—
অশ্রুজলে ভেসে যায় দুইটি নয়ন,
ছিন্নমূল তরুসম পড়ে পৃথ্বীতলে
হতগর্ব নতশির।[১]

'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির মধ্যে জীবনের যে ট্রাজেডিটুকু প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, নীরব অশ্রুতে যাহার প্রকাশ— সেই কথাটিই আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইল 'প্রতীক্ষা'[২] কবিতায়। প্রথম কয়টি পংক্তিতেই দীর্ঘ কবিতাটির মর্মকথা ব্যক্ত হইয়াছে—

ওরে মৃত্যু, জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে বেঁধেছিস বাসা।
যেখানে নির্জন কুঞ্জে ফুটে আছে যত মোর স্নেহ ভালোবাসা
গোপন মনের আশা, জীবনের দুঃখ সুখ, মর্মের বেদনা,
চিরদিবসের যত হাসি-অশ্রু-চিহ্ন আঁকা বাসনা সাধনা;
যেখানে নন্দন ছায়ে নিঃশঙ্কে করিছে খেলা অন্তরের ধন,
স্নেহের পুত্তলিগুলি, আজন্মের স্নেহস্মৃতি, আনন্দ-কিরণ;
কত আলো, কত ছায়া, কত ক্ষুদ্র বিহঙ্গের গীতিময়ী ভাষা,
ওরে মৃত্যু, জানিয়াছি, তারি মাঝখানে এসে বেঁধেছিস বাসা।

যে মাসে 'যেতে নাহি দিব' সাধনায় (১২৯৯ অগ্র) বাহির হয়, সেই মাসেই 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটিও ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির রচনা হইলেও ইহাদের মধ্যে একটি সম্বন্ধ যে আছে তাহা আবিষ্কার করা কঠিন হয় না।

'কাবুলিওয়ালা' গল্পের মধ্যে খোঁকির বিবাহ দিনে শরৎ-আকাশের মধ্যেও 'যেতে নাহি দিব'র বেদনাই সুপ্ত ছিল। খোঁকির প্রতি দুর্ধর্ষ রহমতের স্নেহ ও তাহার বুকের মধ্যে মেয়ের হাতের ছাপ-দেওয়া লুকানো মলিন কাগজটুকরা ও চারি বৎসরের[৩] কন্যাটির প্রতি কবির স্নেহ— উভয়ের মধ্যে কোথায় একটা ভাবের মিল আছে। 'কাবুলিওয়ালা' দরদী পাঠকের চক্ষুকে অকারণ অশ্রু-সিক্ত করিয়া তোলে,— কোথায় যেন জীবনের মধ্যে ট্রাজেডি প্রচ্ছন্ন আছে তাহা ধ্রুবসত্যের ন্যায় অমোঘ, অনিবার্য; তেমনি 'যেতে নাহি দিব'।

শিক্ষার হেরফের

রবীন্দ্রনাথ একা আছেন শিলাইদহের বোটে। স্ত্রী, পুত্রকন্যারা সোলাপুরে সত্যেন্দ্রনাথের নিকট। রাজসাহীতে তখন লোকেন পালিত জেলাজজ। বন্ধুর কাছে বেড়াইতে গেলেন, সঙ্গে ছিলেন তরুণ সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী। এমন সময়ে নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনারায়ণ রাজসাহীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রবীন্দ্রনাথ লোকেনের অতিথি হইয়া দিন পনেরো ছিলেন। এই সময়টা তাঁহাদের সহিত আসিয়া জুটিতেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, কুমার শরৎকুমার রায় প্রভৃতি যুবকের দল। সান্ধ্যসভায় আলোচনা চলে নানা বিষয়ের; প্রমথ চৌধুরী বলেন এই সময় হইতে কবির মাথায়

১ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (ডি. এল. রায়) 'কাব্যের উপভোগ' নামে প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন ৭ম বর্ষ ১৩১৪ মাঘ পৃ. ৪৯৭-৯৮) 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির বহু বিস্তারে প্রশংসা করিয়া রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য দুর্বোধ, অর্থহীন, অশ্লীল প্রভৃতি প্রমাণ অভিযানের উদ্‌বোধন করেন।

২ প্রতীক্ষা ১৭ই অগ্রহায়ণ ১২৯৯। শিলাইদহ বোট। র-র ৩য় খণ্ড। কিন্তু ঐ দিন (১ ডিসেম্বর ১৮৯২) কবি নাটোরে ছিলেন। সুতরাং সোনার তরীর তারিখে কিছু ভুল আছে। আমাদের মনে হয় 'যেতে নাহি দিব' ১৪ কার্তিক ও প্রতীক্ষা ১৭ কার্তিক ১২৯৯ লিখিত হয়।

৩ কবিতার মধ্যে আছে 'কন্যা মোর চারি বছরের'। ইহাকে ব্যক্তিগত করিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যা বেলার বয়স ৬ বৎসর, পুত্র রথীন্দ্রনাথের বয়স ৭ বৎসর, দ্বিতীয় কন্যা ২ বৎসরের হয় নাই।

পঞ্চভূতের ডায়ারির আইডিয়াটা ঘুরিতেছে, এবং হয়তো এইখানেই তাহা শুরু করেন, কারণ মাঘ (১২৯৯) মাসের সাধনায় পঞ্চভূতের ভূমিকা অংশ বাহির হয়।

রাজসাহীতে বাসকালে তথাকার এসোসিয়েশন হইতে শিক্ষা সম্বন্ধে কোনো প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য তাঁহার আহ্বান আসিল এবং তদনুসারে কবি 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করিলেন। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করিবার পর বাংলাদেশের লোকে এবং বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হইলে বিদেশের লোকে রবীন্দ্রনাথকে একজন শিক্ষাশাস্ত্রী বলিয়া জানিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ একত্রিশ বৎসর বয়সে শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার অর্জন করেন নাই। কিন্তু মনীষীর লেখনী যাহা কিছুই স্পর্শ করুক না কেন তাহাকে নূতন রূপ দান করিতে পারে। আজ অর্ধশতাব্দীর ব্যবধানেও দেখা যাইতেছে 'শিক্ষার হেরফের' সম্বন্ধে কবির রচনার সত্যতা ও ঔজ্জ্বল্য কণামাত্র ম্লান হয় নাই। যেসব কার্য কারণের ফলে বাংলার শিক্ষা পঙ্গু ও বাঙালির চিত্ত তমসাচ্ছন্ন তাহার মূল কারণগুলি পঞ্চাশ বৎসরের ব্যবধানে এখনো অপরিবর্তিত। তবে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, কালধর্মানুসারে শিক্ষার পদ্ধতি ও শিক্ষণীয় বিষয়ের অনেকখানি পবিবর্তন হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের শিক্ষার যে সমালোচনা করিলেন তাহাতে স্পষ্ট বলিলেন যে, দেশীয় ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচার ব্যতীত শিক্ষা সর্বব্যাপী হইতে পারিবে না। রবীন্দ্রনাথ কখনো বিদেশী ভাষা সাহিত্য শিক্ষার বিরোধী নহেন। কিন্তু ইংরেজি না শিখিলে কাহারো জ্ঞান বিকাশ হইবে না, এই অদ্ভুত অবস্থার যে অবসান হওয়া প্রয়োজন, এই কথাটাই খুব জোর দিয়া বলিয়াছিলেন।

'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে শিক্ষার মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু কথারই আলোচনা ছিল। তিনি বলেন যে একথা স্বতঃসিদ্ধ যে মানুষ সর্বদাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তু চায়; যতটুকু অত্যাবশ্যক তাহারই পরিমাণে মাপিয়া যদি আমাদের খাদ্য, পরিধেয় বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত, তবে কখনো দেহ ও মন তৃপ্ত হইত না। অত্যাবশ্যকের উপরে অনাবশ্যকটাকে প্রয়োজন বেশি; এবং সেই বেশিটাই মানুষকে মনুষ্যপদবাচ্য করিয়াছে। শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। "অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হয় না।" দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙালি ছেলের হাতে স্বাধীন পাঠের সময় নাই, কারণ বিদেশী ভাষায় সকল জ্ঞান সমাধিস্থ— জ্ঞানে তাহার অধিকার নাই। এ ছাড়া আমাদের দেশে শিক্ষা নিরানন্দময়। আমোদের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণ-শক্তি, ধারণাশক্তি চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বল লাভ করে। বাল্যকাল হইতে চিন্তা ও কল্পনা এই দুই বৃত্তির চর্চা শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এই কল্পনাশক্তির উদ্‌বোধনের কথা তিনি পূর্বে অন্যান্য প্রবন্ধেও বলিয়াছেন। কারণ সমস্ত বৃহৎ কর্মের পশ্চাতে,অনেকখানি কল্পনার জোর থাকে; সাহসিক কল্পনা ও আন্তরিক মনন ব্যতীত জগতে কোনো বৃহৎ কর্ম সফল হয় নাই।

বাংলাভাষা শিক্ষার সমর্থনে লেখক বলিলেন যে, যাহারা সামান্য বাংলা শেখে, তাহারা রামায়ণাদিও পাঠ করিতে পারে; কিন্তু যাহারা এদেশে সামান্য ইংরেজি শেখে তাহারা তো কিছুই আয়ত্ত করিতে পারে না। বিশ বাইশ বছর ধরিয়া আমরা যে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা পাই, তাহা আমাদের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। জীবনের সহিত যে সংযোগ হয় তাহা আদৌ রাসায়নিক সংযোগ নহে, উহা একেবারে বাহিরের অলংকার থাকিয়া যায়। সেইজন্যই দেখা যায় ছাত্রদিগের জীবনে গ্রন্থজগৎ এক প্রান্তে, আর তাহাদের বসতি জগৎ অন্যপ্রান্তে। ফলে "তাহাদের বিদ্যা এবং ব্যবহারের মধ্যে সত্যকার দুর্ভেদ্য ব্যবধান আছে, উভয়ে কখনো সুসংলগ্ন ভাবে মিলিত হইতে পারে না।" আমাদের শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য কিভাবে হইতে পারে তাহার আলোচনা করিয়া বলিলেন, এ মিলন সাধন হইতে পারে কেবল বাংলাভাষা ও বাংলাসাহিত্যের অনুশীলন দ্বারা।

'শিক্ষার হের-ফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যেসব মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা দেশের ও দশের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী না হইলেও, তাহা-যে সে যুগের পক্ষে নির্ভীক সমালোচনা তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

বাংলার তৎকালীন মনীষীরা একবাক্যে রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধের সুখ্যাতি করিলেন। কারণ এযাবৎ এদেশের শিক্ষাসম্বন্ধে ক্রিটিসিজম্ তেমনভাবে হয় নাই। শিক্ষার গলদ কোন্‌খানে তিনি ঠিক সেই স্থানটিই নির্দেশ করিয়া দেখাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে লিখিলেন যে তিনি প্রবন্ধটি দুইবার পাঠ করিয়াছেন, 'প্রতিছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে'। জাস্টিস (১৮৮৮) গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চানসেলর (১৮৯০-৯২), তিনি লেখকের মতামত অনুমোদন করিয়া পত্র দেন; আনন্দমোহন বসু ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম র‍্যাংলার, তিনিও কবির মত সমর্থন করিলেন।

এই প্রবন্ধের অনুবৃত্তিরূপে রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিলেন তাহাও অমোঘ সত্য, তিনি বলিলেন, "দেশের অধিকাংশ লোকের শিক্ষার উপর যদি দেশের উন্নতি নির্ভর করে, এবং সেই শিক্ষার গভীরতা ও স্থায়িত্বের উপর যদি উন্নতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে, তবে মাতৃভাষা ছাড়া যে আর কোনো গতি নাই একথা কেহ না বুঝিলে হাল ছাড়িয়া দিতে হয়।" "রাজা কত আসিতেছে, কত যাইতেছে, পাঠান গেল, মোগল গেল, ইংরেজ আসিল, আবার কালক্রমে ইংরেজও যাইবে— কিন্তু ভাষা সেই বাঙ্গালাই চলিয়া আসিতেছে এবং বাঙ্গালাই চলিবে। ... ইংরেজ যদি কাল চলিয়া যায়, তবে পরশু ঐ বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বড় বড় সৌধ বুদ্‌বুদের মত প্রতীয়মান হইবে" (সাধনা ১২৯৯ পৃ. ৪৪৯-৫৪)। বিজাতীয় ভাষায় শিক্ষার ফলে আমাদের মন যেমন যথার্থভাবে ও যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞানান্বেষণের ঔৎসুক্য বোধ করিতে পারিতেছে না, তেমনি স্বজাতীয় শাস্ত্রের শিক্ষায়, আচারের অত্যাচারেও আমাদের মন জড়ত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। নূতনের অন্ধ অনুকরণ ও প্রাচীনের মূঢ় অনুসরণ যুগপৎ বাঙালির চিত্তকে চাপিয়া মারিতেছে। যুববঙ্গে সেই শাস্ত্রীয় অনুশাসন নবভাবে, নবনামে, নবপরিচ্ছদে পুনর্প্রতিষ্ঠ করিবার জন্য একদল শিক্ষিত লোক সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই তাহাদিগকে ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখেন নাই, আজও দেখিলেন না। চন্দ্রনাথ বসুর 'কড়াক্রান্তি'[১] নামক এক প্রবন্ধের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন 'কড়ায় কড়া, কাহনে কানা'[২]। 'শিক্ষার হের ফের' যে মাসে সাধনায় প্রকাশিত হইল, এই প্রবন্ধটিও সেই মাসে বাহির হয়। সাধারণত লোকে ইংরেজি শিক্ষার কুফলের জন্য বিদেশীয়কেই দায়ী করে, কিন্তু শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় আচারের অত্যাচারে মানুষের মন যে কী পরিমাণ পঙ্গু, তাহার বুদ্ধি যে কী পরিমাণ জড় হয় তাহার জন্য কাহাকে দায়ী করা হইবে? মন্দ বিদেশ হইতে আসিলেও নিন্দনীয়, মন্দ দেশজ শাস্ত্রসম্ভূত লোকাচার-প্রসূত হইলেও অশ্রদ্ধেয়। আমরা সমাজব্যবহারে 'কড়ায় কড়া, কাহনে কানা' অর্থাৎ কড়ার প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টি রাখিতে গিয়া কাহনের প্রতি ঢিলা হইয়া গিয়াছি। ইংরেজিতে যাহাকে বলে পেনিওয়াইজ পাউণ্ড ফুলিশ অর্থাৎ 'বজ্র আঁটন ফস্কা গিরো'— প্রাণপণ আঁটুনির ত্রুটি নাই, কিন্তু গ্রন্থিটি শিথিল। "আমাদের দেশেও হইয়াছে তাই। বিধিব্যবস্থা, আচার ব্যবহারের প্রতি অত্যধিক মনোযোগ করিতে গিয়া মনুষ্যত্বের স্বাধীন উচ্চ অঙ্গের প্রতি অবহেলা করা হইয়াছে।"

মোটকথা শিক্ষার সহিত বিশ্বাসের, মতের সহিত ব্যবহারের সামঞ্জস্য রক্ষা না করায় আমাদের নৈতিক আদর্শ কখনো লজ্জিত হয় না। 'বাঙ্গলা লেখক' (সাধনা ১২৯৯ মাঘ) নামে এক প্রবন্ধে এইসব কথা অন্যভাবে আলোচনা করিলেন; তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে যে লেখক ও পাঠকের মনের ও মতের কোনো যোগ নাই। লেখকের কোনো সুযুক্তি শুনিয়া কেহ আপন জীবনযাত্রার লেশমাত্র পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন এমন ঘটনা সুদুর্লভ। ফলে লেখকরা কিছুমাত্র দায়িত্ব অনুভব করেন না। "সত্যকথা বলা অপেক্ষা চতুর কথা বলিতে ভালবাসেন।" ইহার কারণ আমাদের দেশে ভাবের প্রতি আন্তরিক আস্থা নাই। এই প্রসঙ্গটাই রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বহু উদাহরণ ও

১ সাহিত্য ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা ১২৯৯, কার্তিক

২ কড়ায় কড়া, কাহনে কানা 'সমাজ' গ্রন্থে 'আচারের অত্যাচার' নামে পরিচিত। সাধনা ১২৯৯ পৌষ পৃ. ১৫৬-৬৫।

উপমার দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সাহিত্যে ও জীবনে সমালোচনার অভাবে যে যেমনভাবে চিন্তা করিতেছে, বিশ্বাস করিতেছে, রচনা করিতেছে; কারণ লেখক ও পাঠক কেহই কাহারও মতামতের জন্য দায়ী নহে। তাই বলিলেন, "এখন আমাদের লেখকদিগকে অন্তরের যথার্থ বিশ্বাসগুলিকে পরীক্ষা করিয়া চালাইতে হইবে, নিরলস এবং নির্ভীকভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে, আঘাত সহিতে কুন্ঠিত হইলে চলিবে না।"

কিন্তু সুখের বিষয় কবির এই যুদ্ধং দেহি মনোভাব স্থায়ী হয় না, তিনি সংস্কারকের রুদ্র বেশ অচিরে ত্যাগ করিয়া সাহিত্যিকের শুভ্র বেশ পরিয়া কাব্যলক্ষ্মীর উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হন, তখনই তাঁহাকে সুন্দর দেখায়।

মানসসুন্দরী

মহারাজ জগদিন্দ্রনারায়ণের নিমন্ত্রণে রাজসাহী হইতে লোকেন ও রবীন্দ্রনাথ নাটোর যান (১৬ অগ্র ১২৯৯)। সেখান হইতে ইন্দিরা দেবীকে লিখিত একখানি পত্রে এই পথটি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।[১] নাটোর হইতে দুইদিন পরে লিখিত আর একখানি পত্রে সৌন্দর্যপিয়াসী কবিমনের একটি পরিপূর্ণ চিত্র ফুটিয়াছে। এই সময়ের লিখিত পত্রগুলি যথার্থভাবে কবির আত্মজীবনীর ন্যায়; অন্তরের কথাই যদি কবিজীবনের প্রধান বিষয়বস্তু হয় তবে তাঁহার আবাল্যরচিত পত্রধারাই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। কিন্তু নাটোরে সৌন্দর্য সম্ভোগে অচিরেই বাধা পড়িল; কবিও অসুস্থ হইয়া পড়েন, তাঁহার দাঁতের ব্যথা হয়। যাহাই হউক মহারাজার কর্মচারী যদুনাথ লাহিড়ী[২] তাঁহাকে অক্লান্তভাবে সেবা করিয়া সুস্থ করিয়া তুলিলেন। শিলাইদহে ফিরিয়া গিয়া ইন্দিরা দেবীকে (১৮ ডিসেম্বর ১৮৯২) নাটোরে বাসকালে দাঁতের ব্যথার উল্লেখ করিয়া বেশ রসাইয়া লিখিতেছেন, "তোরা এমন দুর্লভ বেদনাটা যদুবাবুর উপর দিয়েই কাটালি।... ব্যামো করে আজকাল কোন ফল নেই, তাই আজকাল শরীর ভাল রাখবার প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি আছে।" এটুকু লিখিবার তাৎপর্য ছিল মৃণালিনী দেবী তখন সোলাপুরে। নাটোরে দিন সাতের বেশি ছিলেন না। শিলাইদহে ফিরিয়া 'সাধনা'র নিত্যনৈমিত্তিক লেখায় মন দিয়াছেন, অগ্রহায়ণ হইতে দ্বিতীয় বর্ষ শুরু হইয়াছে। এছাড়া জমিদারির কাজ দেখেন, ইন্দিরা দেবীকে পত্রধারায় মনের কথা লিখিয়া যান। কিন্তু কবির মন ইহাতে সুখ পায় না, কাব্যশ্রীর অদর্শনে কবিচিত্ত উতলা। প্রমথ চৌধুরীকে লিখিতেছেন, "কবিতা অন্যান্য ললনার মত একাধিপত্য প্রয়াসিনী।... এইজন্যে আমি কিছু মনের অসুখে আছি। বাস্তবিক এ জীবনে কবিতাই আমার সর্ব প্রথম প্রেয়সী—তার সঙ্গে বেশি দিন বিচ্ছেদ আমার সহ্য হয় না।' পরদিন পুনরায় লিখিতেছেন, "কবিত্বের অনবসর সম্বন্ধে দুঃখ করে কাল তোমাকে এক চিঠি লিখেচি—লিখে ভাবলুম বসে বসে দুঃখকরার চেয়ে দুঃখমোচনের চেষ্টা করা ভাল!"[৩]

ইহার পর লিখিলেন 'মানসসুন্দরী' (৪ পৌষ, '২৯৯)। কবিতাটি লেখা হইয়া গেলে প্রমথ চৌধুরীকে লিখিতেছেন 'সমস্ত দিন পৃথিবীর মোটা মোটা মজুরির কাজ করে আঙুল এমন ভোঁতা হয়ে যায় যে কোন রকম সূক্ষ্ম শিল্পের কাজ নিতান্ত অবহেলা ভরে করে উঠতে পারিনে—বেশ একটু সময় নিতে হয়। কবিতা লেখাটা নিতান্ত আমার আজন্মকাল

১ ছিন্নপত্র। বিশ্বভারতী পত্রিকা ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা। ১৩৫১ পৃ. ৮১

২ প্রমথ চৌধুরী, আত্মকথা, বি-ভা-প ১৩৪৯ পৃ. ৫১৩

৩ চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড। পৃ. ১৫৮। শিলাইদা ১৫ ডিসেম্বর ১৮৯২ [.লা পৌষ ১২৯৯]।

নেশা— মাঝে মাঝে যখন মৌতাতের সময় আসে তখন না লিখতে পারলে সমস্ত মনটা যেন বিকল হয়ে যায় এবং জীবনটা দুর্ভর বোধ হয় কিন্তু তাই লিখতে সময় পাইনে।"[১]

মানসসুন্দরী দীর্ঘ কবিতা; ইহা পাঠের পর এই কথাই বারবার মনে হয় যে আমাদের জীবনে কোথায় একটা বে-সুর সর্বদা বাজিতেছে; সেই বে-সুরের বেদনা বাজে স্পর্শচেতন কবিচিত্তে। মানুষের শুষ্ক কর্মময় জীবনে কাব্যশ্রী ব্যতীত আর কেহই যথার্থ সুর ধ্বনিয়া তুলিতে পারে না। সৌন্দর্যের যে অনির্বচনীয়তা শিল্পীর মানসপটে আঁকা থাকে তাহার নামকরণ করা কঠিন; আর কোনো নাম খুঁজিয়া না পাইয়া যেন কবি তাহাকে মানসসুন্দরী বলিলেন। আরও কত নামে ইনি আখ্যাত হইয়াছেন। ইংরেজি সাহিত্যে শেলীর Alastor এর সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। উভয় কবির কাছে আদর্শ সৌন্দর্য হইতেছে দৈহিক, মানসিক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সমন্বয়; সেই সংশ্লিষ্ট সৌন্দর্যকে রবীন্দ্রনাথ একটি রমণী মূর্তির মধ্যে আকার পরিগ্রহ করাইয়া দেখিতে চাহিতেছেন। একটি নারী মূর্তিতে সমগ্র জীবনের সৌন্দর্য-অনুভূতিকে স্তরে স্তরে কল্পিত হইয়াছে। নারীজীবনের সকল অবস্থায় সে কবিচিত্তকে স্পর্শ করিয়াছে; 'প্রতিবেশিনীর মেয়ে ধরার অস্থির এক বালকের সাথে কী খেলা' সে খেলিত; তারপর 'যৌবন-বসন্তে' 'খেলাক্ষেত্র হতে কখন অন্তর লক্ষ্মী' এসেছিল 'অন্তঃপুরে গৌরবের ভরে' 'মহিষীর মতো'। 'ছিলে খেলার সঙ্গিনী এখন হয়েছ মোর মর্মের গেহিনী'। এইখানেই কবির আকাঙ্খার নিবৃত্তি হয় নাই—

মানসীরূপিনী ওগো, বাসনাবাসিনী
আলোকবসনা ওগো, নীরবভাষিণী,
পরজন্মে তুমিই কি মূর্তিমতী হয়ে
জন্মিবে মানবগৃহে নারীরূপ লয়ে
অনিন্দ্য সুন্দরী।...
সেই তুমি
মূর্তিতে দিবে কি ধরা...
তুমিও কি মনে মনে
চিনিবে আমারে, আমাদের দুইজনে
হবে কি মিলন।...
কার এত দিব্যজ্ঞান,
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ
পূর্বজন্মে নারীরূপে ছিলে কি না তুমি
আমারি জীবনবনে সৌন্দর্যে কুসুমি
প্রণয়ে বিকশি। মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু এক ঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।

রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ কল্পনা ও মনন শক্তি প্রেমকে অনির্বচনীয় বিশ্বানুভূতির মধ্যে লইয়া গিয়াছে; সকলের মধ্যে তাহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতা। মানসসুন্দরী কবিতার এই ভাবরাজি কবির বহু রচনায় বারেবারে দেখা দিয়াছে নবতর বেশে। এই মানস সুন্দরী এই ধরিত্রীর বুকে থাকিয়া সার্থক হইয়াছে। অসংখ্য বন্ধনে সে-প্রেম আবদ্ধ। কিন্তু 'উর্বশী' কবিতায় কবি প্রেমকে সকল বন্ধন হইতে মুক্তরূপে অবচ্ছিন্নভাবে কল্পনা করিয়াছেন। সেখানে সবই 'নেতি' 'নেতি'— 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী।' কোনো মানবীয় সম্বন্ধের বন্ধনে তাহাকে বাঁধা যায় না। তাই বলিতে ইচ্ছা করে 'উর্বশী' কবিতাটি যেন 'মানসসুন্দরী'র antithesis বৈপরীত্যের পরিপূরক। সৌন্দর্যের শেষ কথা হইয়াছে 'বিজয়িনী' কবিতায়, যথাস্থানে তাহার আলোচনা হইবে। মানসসুন্দরী কবিতাটি শিলাইদহের বোটে বসিয়া লিখিত। পৌষমাসের (১২৯৯ পৌষ ৪) গোড়ায় কয়েকমাস পরে জন্মদিনের দিন নিজ জীবনের মূলসূত্রটি কী তাহারই প্রশ্ন মনে জাগিতেছে। সেদিন পত্রধারায়[২] লিখিতেছেন, "কবিতা আমার বহু কালের প্রেয়সী— বোধ হয় যখন আমার রথীর মতো বয়স ছিল তখন থেকে আমার সঙ্গে বাক্‌দত্তা হয়েছিল। তখন থেকে আমাদের

১ চিঠিপত্র ৫ দ্র পৃ ১৬৭-৬৮। শিলাইদা ১৫ ডিসেম্বর ১৮৯২ [১২৯৯ পৌষ ৫]।

২ ছিন্নপত্র পৃ. ১৯৭-৯৮

পুকুরের ধারে বটের তলা, বাড়িভিতরের বাগান, বাড়িভিতরের একতলার অনাবিষ্কৃত ঘরগুলো, এবং সমস্ত বাহিরের জগৎ, এবং দাসীদের মুখের সমস্ত রূপকথা এবং ছড়াগুলো, আমার মনের মধ্যে ভারি একটা মায়াজগৎ তৈরি করছিল। তখনকার সেই আবছায়া অপূর্ব মনের ভাব প্রকাশ করা ভারি শক্ত,— কিন্তু এই পর্যন্ত বেশ বলতে পারি কবিকল্পনার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। যাকে বরণ করেন তাকে নিবিড় আনন্দ দেন কিন্তু এক সময় কঠিন আলিঙ্গনে হৃৎপিণ্ডটি নিংড়ে রক্ত বের করে নেন। যে লোককে তিনি আপন করেন, গৃহস্থ হয়ে স্থির হয়ে আয়েস্ করে বসা সে লক্ষ্মীছাড়ার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কিন্তু আমার আসল জীবনটি তার কাছেই বন্ধক আছে। সাধনাই লিখি আর জমিদারিই দেখি যেমনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি অমনি চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি— আমি বেশ বুঝতে পারি এই আমার স্থান। জীবনে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অনেক অনেক মিথ্যাচরণ করা যায় কিন্তু কবিতায় কখনো মিথ্যা কথা বলিনে— সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান।"

এমন সময়ে কবি স্ত্রীর পত্র হইতে জানিতে পারিলেন যে সোলাপুরে তাঁহার আর ভালো লাগিতেছে না, যথা সত্বর কলিকাতায় ফিরিবেন। এই পত্র পাইয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন, "আজ শিলাইদহ ছাড়বার আগেই তোমার চিঠিটা পেয়ে মন খারাপ হয়ে গেল। তোমরা আসচ এক হিসাবে আমার ভালই হয়েচে, নইলে কলকাতায় ফিরতে আমার মন যেত না এবং কলকাতায় ফিরেও আমার অসহ্য বোধ হত।··· আমি বেশ জানি যতদিন তোমরা সোলাপুরে থাকবে ততদিন তোমাদের পক্ষে ভাল হবে। ছেলেরা অনেকটা শুধরে এবং শিখে এবং ভাল হয়ে আসবে এই রকম আমি খুব আশা করেছিলুম। যাই হোক সংসারের সমস্তই ত নিজের সম্পূর্ণ আয়ত্ত নয়।"[১]

সাংসারিক অশান্তি মনকে নানা দিক হইতে ক্লান্ত করে তবুও তাহার ঊর্ধ্বে উঠিবার জন্য যত্ন করেন প্রাণপণ। ঐ পত্র মধ্যেই উড়িষ্যা ভ্রমণকালে স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। কিন্তু পিতার অনুমতি বোধ হয় পান নাই এবং সেইজন্য উড়িষ্যায় লইয়াও যাওয়া হয় নাই অথবা কনিষ্ঠা কন্যা মীরার জন্ম হইল (১২ জানুয়ারি ১৮৯৩), শীতকালে তাহার জন্য যাওয়া সম্ভব না হইতে পারে কারণ কবি ফেব্রুয়ারি মাসে কটক যান।

উড়িষ্যা ভ্রমণ

উত্তরবঙ্গ হইতে সময়মতো ফিরিলে কবিকে নিশ্চয়ই শান্তিনিকেতনের মঠপ্রতিষ্ঠা উৎসবের প্রথম সাম্বৎসরিকে (১২৯৯ পৌষ ৭) উপস্থিত হইতে হইত। কিন্তু ফিরিতে পারেন নাই। শান্তিনিকেতনের উৎসবে তিনি নাই। পৌষমাসেই কলিকাতায় ফিরিয়াছিলেন; কারণ মাঘের শেষ দিকে তাঁহার তৃতীয়া কন্যা মীরার জন্ম হয়। (১৮৯৩ জানুয়ারি ১২) এই সময়ে তিনটি শিশুর তদারক করিবার অনেকখানি ঝুঁকি তাঁহাকে বহন করিতে হয়; সংসারের কাজে কোনো দিন তিনি অবহেলা করেন নাই।

মাঘোৎসবের সময় যে সব নূতন সংগীত গীত হইল, তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচিত গান হইতেছে পাঁচটি; পূর্বের ন্যায় গানের বন্যা এখন নাই। গানগুলি এই[২]। ১। জয় রাজরাজেশ্বর ২। চির বন্ধু, চির নির্ভর, চির শক্তি, ৩। এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণেশ হে, ৪। হৃদয় মন্দিরে, প্রাণাধীশ, আছ গোপনে। ৫। আনন্দ-লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর। গানগুলিকে দেখিলেই বুঝা যাইবে যে এগুলি 'রচিত' গান, উচ্ছ্বসিত গীত নহে।

১ চিঠিপত্র ১ পৃ. ৩১

২ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮১৪ শকাব্দ (১২৯৯) ফাল্গুন পৃ. ২১৫-১৭। দ্র, গীতবিতান ১ম সং পৃ. ১৭২-৭৩।

মাঘোৎসবের অল্পকাল পরে (১৮৯৩) ফেব্রুয়ারির গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ (২২) জমিদারি তদারক করিবার জন্য উড়িষ্যা যাত্রা করিলেন। নৌকা করিয়া খালে খালে কটকে যাওয়া যায়, ইঁহারা নৌকাযোগে যান।

কটকে তাঁহারা গিয়া উঠিয়াছিলেন বিহারীলাল গুপ্তের বাসায়। বিহারীলাল (B. L. Gupta) তখন কটকের ডিস্ট্রিক্ট জজ। বাঙালি সিভিলিয়ানদের দ্বিতীয় দলে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্ত। প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি রমেশচন্দ্র দত্তের পরামর্শে বিহারীলাল হাওড়ার জজ থাকার সময়ে যে মন্তব্য-লিপি বঙ্গীয় গবর্নমেণ্টকে লিখিয়া পাঠান তাহারই ফলে ইলবার্ট বিলের জন্ম ও তদানীন্তন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। বিহারীলালের সহিত ঠাকুর পরিবারের পূর্ব হইতেই ঘনিষ্ঠতা ও রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচয় ছিল। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। এই শ্রদ্ধার নিদর্শন ও কটকভ্রমণের স্মৃতিকে অক্ষয় করিবার জন্য তাঁহার ছোটোগল্পের প্রথম সংগ্রহ গ্রন্থ 'ছোটগল্প'[১] এক বৎসর পরে তঁহাকে উৎসর্গ করেন।

কটক হইতে রবীন্দ্রনাথ মৃণালিনী দেবীকে যে পত্র লেখেন তাহাতে বিহারীবাবুর একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। "বিহারীবাবুর অনেকটা আমার মত ধাত আছে দেখলুম। তিনি সকল বিষয়েই ভারি ব্যস্ত এবং চিন্তিত হয়ে পড়েন।···তিনি আমার মত খুঁৎখুঁৎ খিটখিট করেন না— সেটা তাঁর স্ত্রীর পক্ষে একটা মহা সুবিধে। সমস্ত খুব চুপচাপ প্রশান্ত ভাবে সহ্য করতে পারেন। এ রকম স্বামী আমার বোধ হয় পৃথিবীতে অতি দুর্লভ। বিহারীবাবু ভারি গৃহস্থ প্রকৃতির লোক— ছেলেপুলেদের খুব ভালোবাসেন, আমার দেখতে বেশ লাগে। আমাদের এমন যত্ন করেন— ঠিক যেন ঘরের লোকের মত— খুব যে বেশি আদর দেখিয়ে ব্যস্ত করে তোলা তা নয়— আমরা আমাদের ঘরে সমস্ত দিন যা-খুশি তাই করতে সময় পাই। যে যত্নটুকু করেন বেশ সহজ স্বাভাবিকভাবে। কিচ্ছু বাড়াবাড়ি নেই।"[২]

কটকে বাসকালে রবীন্দ্রনাথের এমন একটি নূতন অভিজ্ঞতা লাভ হয় যাহার কথা তিনি জীবনে কখনো ভুলেন নাই ও কয়েকবারই সেই স্মৃতি তাঁহার গদ্য রচনায় স্থান পাইয়াছে। বিহারীবাবুর বাড়িতে এক ভোজসভায় স্থানীয় সরকারী (Ravenshaw) কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ নিমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন। সেই দিন সন্ধ্যায় যে ঘটনাটি ঘটে সে-সম্বন্ধে তিনি ইন্দিরা দেবীকে যে একখানি পত্র লেখেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।[৩] "জানিস বোধ হয় গবর্মেণ্ট আমাদের দেশের জুরি প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছিল বলে চারিদিকে ভারি একটা আপত্তি উঠেচে। লোকটা জোর করে সেই বিষয়ে কথা তুলে··· তর্ক করতে লাগল। বললে এ দেশের moral standard low— এখানকার life এর sacredness সম্বন্ধে যথেষ্ট বিশ্বাস নেই, এরা জুরি হবার যোগ্য নয়। আমার যে কি রকম করছিল সে তোকে কি বলব! আমার বুকের মধ্যে রক্ত একেবারে ফুটছিল কিন্তু কথা খুঁজে পাচ্ছিলুম না।······একজন বাঙ্গালীর নিমন্ত্রণে এসে বাঙ্গালীর মধ্যে বসে যারা এরকম করে বলতে কুণ্ঠিত হয় না তারা আমাদের কি চক্ষে দেখে!"··· এই পত্রখানিতে কবির অত্যন্ত উত্তেজিত মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাহেবদের প্রতি কবির অবজ্ঞা পত্রের প্রতি ছত্রে। বলা বাহুল্য পত্রলেখার সময় এই মনোভাব ছিল; এক সপ্তাহ পরে-লেখা আর একখানি পত্রে

১ ছোটগল্প। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। ১৫ই ফাল্গুন ১৩০০ [১৮৯৪ ফেব্রুয়ারি ২৬] উৎসর্গ। "পূজনীয় জ্যেষ্ঠ সোদরোপম শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত আই. সি. এস, মহাশয় করকমলেষু।"

২ চিঠিপত্র ১ পৃ. ৩৬–৩৭।

৩ ছিন্নপত্র। ১০ই ফেব্রুয়ারি [১৮৯৩] বিশ্বভারতী পত্রিকা তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ১৩৫১ পৃ. ১৪৪।

লিখিতেছেন, "তোকে কি লিখেছিলুম কিছু মনে নেই, হয়তো মনের আক্ষেপে কিছু বেশি মাত্রায় বলে থাকব। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এই যে, এখন বহুকাল আমাদের অজ্ঞাতবাস বিজনবাস আবশ্যক। এখন আমাদের প্রস্তুত হবার সময়।" ভোজসভায় যে জুরিপ্রথা লইয়া তর্কটা উঠিয়াছিল, সে-সম্বন্ধে এতটা তিক্ততা কেন হইয়াছিল সে বিষয়ে দুই একটা কথা বলা প্রয়োজন।

১৮৬২ সালে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা-আসামসমন্বিত বঙ্গ দেশের সাতটি জেলায় জুরিপ্রথা সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হয়। ত্রিশ বৎসরের মধ্যে জুরিপ্রথার ক্ষেত্র অন্য জেলায় প্রসারিত হয় নাই। ১৮৯০ সালে ভারত-গবর্মেণ্ট এই প্রথার সফলতা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া প্রতিবেদন পাঠাইবার জন্য প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট ও হাইকোর্টের নিকট অনুরোধ পাঠান। বাংলার তদানীন্তন লেফটেনেণ্ট গভর্নর স্যর চার্লস আলফ্রেড ইলিয়ট (১৮৯০-৯৫) বিভাগীয় কমিশনর ও পুলিস বিভাগ হইতে জুরিপ্রথার ফলাফল সম্বন্ধে যেসব রিপোর্ট পাইলেন, তাহা মোটেই ঐ প্রথার অনুকূল নহে; হাইকোর্টও এই প্রথা যেভাবে চলিতেছে, তাহার ঘোর নিন্দা করিলেন। ছোটলাট বাহাদুর ভারত-গবর্মেণ্টের নিকট যে রিপোর্ট পাঠাইলেন তাহাতে তিনি বলিলেন যে, যেভাবে জুরির কাজ মফঃস্বলের আদালতে চলিতেছে তাহা আদৌ শুভ ফলপ্রদ নহে, তাহাকে সমর্থন করা কঠিন। তবে রাজনৈতিক দিক হইতে বিচার করিলে ইহাকে উঠাইয়া দেওয়া যায় না। প্রাদেশিক গবর্মেণ্টসমূহ ও কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের মধ্যে পত্রাদি ব্যবহারের পর যাহা স্থির হইল তাহা 'received by an influential section of the public with much dissatisfaction'। সাতটি জেলার বাহিরে অন্যত্র জুরিপ্রথা প্রসারিত হইল বটে, কিন্তু হত্যাদি জটিল মামলার বিচার জুরিদের হস্তে অর্পিত হইল না।[১]

এই সব আলোচনায় যখন পাবলিক খুবই মত্ত, তখনই কটকে পূর্বোক্ত বিসদৃশ ঘটনাটি ঘটে। সেই দিনের ঘটনা তাঁহার মনে এমনি বিঁধিয়াছিল যে দেড়বৎসরের পরে 'অপমানের প্রতিকার' শীর্ষক প্রবন্ধ শুরু করেন এই ঘটনার বিবৃতি দ্বারা।[২]

'পূর্ণ পরিণত জনবৃষ' ইংরেজ অধ্যক্ষ সম্বন্ধে মন্তব্যপূর্ণ পত্রখানি লিখিবার পর দিনই (১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩) রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ ও বিহারীলাল পুরী যাত্রা করেন। তখন ট্রেনপথ হয় নাই। ফিটন গাড়িতে কাঠযুড়ি পর্যন্ত গিয়া পালকিতে চড়িতে হইল। কটক হইতে পুরী পর্যন্ত পথটি খুব ভালো। 'ছিন্নপত্রে' এই পথের সুন্দর বর্ণনা আছে। কবি লিখিতেছেন, "যত পুরীর নিকটবর্তী হচ্ছি তত পথের মধ্যে যাত্রীর সংখ্যা বেশি দেখতে পাচ্ছি। ঢাকা গরুর গাড়ি সারি সারি চলেছে। রাস্তার ধারে, গাছের তলায়, পুকুরের পাড়ে লোক শুয়ে আছে, রাঁধছে, জটলা ক'রে রয়েছে।··· হঠাৎ এক জায়গায় গাছপালার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়েই সুবিস্তীর্ণ বালির তীর এবং ঘন নীল সমুদ্রের রেখা দেখতে পাওয়া গেল।"···"পুরীতে এসে পৌঁছে সামনে অহর্নিশি সমুদ্র দেখছি, সেই আমার সমস্ত মন হরণ করেছে।"[৩]

পুরীর সমুদ্র ও ভুবনেশ্বর মন্দির প্রভৃতি দর্শন কবিজীবনে সার্থক হইয়াছিল। তাঁহার স্পর্শচেতন মনে এই নূতনের দৃশ্য সাড়া দিয়াছিল। এই মন্দিরাদির কথা স্মরণ করিয়া লিখিয়াছিলেন, 'উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের মন্দির যখন প্রথম দেখিলাম, তখন মনে হইল, একটা যেন কি নূতন গ্রন্থ পাঠ করিলাম। বেশ বুঝিলাম, এই পাথরগুলির মধ্যে কথা আছে; সেকথা বহু শতাব্দী হইতে স্তম্ভিত বলিয়া, মূক বলিয়া, হৃদয়ে আরো যেন বেশি করিয়া আঘাত করে।"[৪]

১ Buckland, Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. I. p. 822; II p. 797, 945-48.

২ সাধনা ১৩০১ ভাদ্র। দ্র. রাজা ও প্রজা।

৩ মন্দিরের কথা, ভারতবর্ষ। মন্দির, বিচিত্র প্রবন্ধ ১ম সংস্করণ পৃ. ৭৬।

৪ ছিন্নপত্র। পুরী ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩

পুরীতে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সিভিলিয়ানদের সম্বন্ধে কবির আর একটি অভিজ্ঞতা হয় যার কথা তিনি 'ছিন্নপত্রে'র মধ্যে ব্যক্ত করিয়া যান নাই। একদিন বিহারী বাবু, তাঁহার স্ত্রী এবং রবীন্দ্রনাথ স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট মিস ওয়াল্‌স্‌-এর সঙ্গে সামাজিক শিষ্টতা রক্ষার জন্য দেখা করিতে যান। "মিনিট পাঁচেক পরে খবর এল তার পরদিন সকালে এলে সাহেবের সঙ্গে মুলাকাত হবে। বিহারীবাবু মিসেস গুপ্ত অবাক হয়ে গেলেন। আমরাও সুড় সুড় করে ম্যাজিস্ট্রেটের দরজা থেকে বেরিয়ে চলে গেলুম।" পরে 'জজ সাহেব আসিয়াছিলেন' জানিতে পারিয়া সাহেব ও মেম ভারি দুঃখিত হইয়া পত্র দেন বটে। কিন্তু কবি ইহার থেকে অনেকখানি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। "আমাদেরই দেশের লোকের দোষ তারা পেটের দায়ে মানের দায়ে উমেদারী করতে সেলাম করতে যায়, সাহেবের আদিষ্ট সময়ে দ্বারদেশে অপেক্ষা করে থাকে সুতরাং আমি বঙ্গনামধারী এক ব্যক্তি যে আস্ফালন করে ম্যাজিস্ট্রেট এবং ম্যাজিস্ট্রেটের পত্নীর উপর সামাজিক কর্তব্যরক্ষাস্বরূপ 'কল' করতে যাব এ তাদের মনেও উদয় হয়নি।"…"পুরীর ম্যাজিস্ট্রেট আমার সঙ্গে পরদিন সাক্ষাৎ করলে এবং আমাকে নিমন্ত্রণ করলে আমি কি তাতে ভারি খুসি হয়েছিলুম?… নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করলে বড় বেশি স্পষ্ট অভিমান প্রকাশ করা হয় এবং তাতে যথার্থ অভিমানের খর্বতা হয়— তা ছাড়া বিহারীবাবুদের বিশেষ ক্ষুন্ন করা হয়।" নিমন্ত্রণ সভার বর্ণনাটুকু 'ছিন্নপত্রে' আছে (কটক। মার্চ, ১৮৯৬); "তারপরে সাহেবের গান শুনলুম সাহেবকে গান শোনালুম, তালি দিলুম এবং তালি পেলুম।" এই কৃত্রিম দম্ভরহাস্য সভ্যতার সহিত ভারতের হীন অবস্থার তুলনা করিয়া মন অত্যন্ত ব্যথিত ও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই পত্র মধ্যে লিখিলেন, "হে মৃৎপাত্র ঐ কাংস্য পাত্রের কাছ থেকে দূরে থেকো; ও যদি রাগ ক'রে তোমাকে আঘাত করে তাতেও তুমি চূর্ণ হয়ে যাবে, আর ও যদি সোহাগ করে' তোমার পিঠে চাপড় মারে তাতেও তুমি ফুটো হয়ে অতলে মগ্ন হয়ে যাবে— অতএব বৃদ্ধ ঈশপের উপদেশ শোনো, তফাৎ থাকাই সার কথা।"

কবি পুরী হইতে কটকে ফিরিয়াছেন। বিহারী বাবুদের বাড়িতে আছেন, 'সাধনা'র লেখা 'হুহু করে এগিয়ে' যাইতেছে। একখানি পত্রে সাময়িক ও ভাবী জীবনের কথা যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য ও সার্থক হইয়াছে বলিয়া পত্রখানি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।[১]

"যখন মন একটু খারাপ থাকে তখনই 'সাধনাটা' অত্যন্ত ভারের মত বোধ হয়। মন ভাল থাকলে মনে হয়, সমস্ত ভার আমি একলা বহন করতে পারি। তখন মনে হয়, আমি দেশের কাজ করব এবং কৃতকার্য হব। তখন লোকের উৎসাহ এবং অবস্থার অনুকূলতা কিছুই আবশ্যক মনে হয় না, মনে হয় আমার নিজের কাজের পক্ষে আমি নিজেই যথেষ্ট। তখন এক এক সময়ে আমি নিজের খুব দূর ভবিষ্যতের যেন ছবি দেখতে পাই—আমি দেখতে পাই, আমি বৃদ্ধ পক্ককেশ হয়ে গেছি, একটি বৃহৎ বিশৃঙ্খল অরণ্যের প্রায় শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁচেছি, অরণ্যের মাঝখান দিয়ে বরাবর সুদীর্ঘ একটি পথ কেটে দিয়ে গেছি এবং অরণ্যের অন্য প্রান্তে আমার পরবর্তী পথিকেরা সেই পথের মুখে কেউ কেউ প্রবেশ করতে আরম্ভ করেচে, গোধূলির আলোকে দুই একজনকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্চে। আমি নিশ্চয় জানি 'আমার সাধনা কভু না নিষ্ফল হবে।' ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে আমি দেশের মন হরণ করে আনব নিদেন আমার দুচারটি কথা তার অন্তরে গিয়ে সঞ্চিত হয়ে থাকবে। এই কথা যখন মনে আসে তখন আবার সাধনার প্রতি আকর্ষণ আমার বেড়ে ওঠে। তখন মনে হয় সাধনা আমার হাতে কুঠারের মত; আমাদের দেশের বৃহৎ সামাজিক অরণ্য ছেদন করবার জন্যে একে আমি ফেলে রেখে মরচে পড়তে দেব না, একে আমি বরাবর হাতে রেখে দেব। যদি আমি আরো আমার সহায়কারী পাই ত ভালই, না পাই ত কাজেই আমাকে একলা খাটতে হবে।"

সামাজিক কর্তব্য পালনের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোয় যেমন যাইতে হয় আদিব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক বলিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরেও হাজিরা দিতে হয়। ২৬ ফাল্গুন রবিবার কটকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে গিয়া

১ ছিন্নপত্র। কটক, ২৫শে ফেব্রুয়ারি [১৮৯৩]। বিশ্বভারতী পত্রিকা। ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা ১৩৫১ পৃ. ৮২।

আচার্যের সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়া কিরূপ মন বিরক্ত হইয়াছিল, তাহা একখানি পত্রে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। "লোকে মনে করে ধর্মের কথা কানে উঠলেই যেন একটা পুণ্য আছে···। এইজন্যে ধর্মবক্তা সম্বন্ধে আর যোগ্যতা বিচার হয় না। আমার ত' মনে হয়, এ নিতান্ত অন্যায়।···যাদের ধর্মবোধ ও সাহিত্যবোধ কিছু আছে তারা যে ভাবহীন রসহীন অনর্গল পুরানো বাজে কথা কি রকম করে সহ্য করে আমি ত ভেবে পাইনে। নিয়মিত বেসুরো গান শোনা মানুষের পক্ষে যেমন অশিক্ষা, নিয়মিত অনুপযুক্ত ধর্মবক্তৃতা শোনা মানুষের পক্ষে তেমনি একটা ক্ষতিজনক কাজ।"[১]

কটক হইতে বালিয়া যান ফেব্রুয়ারির শেষে।[২] পাণ্ডুয়ার কুঠিতে দিন তিন চারির বেশি ছিলে না। বাড়ি হইতে প্রায় একমাস বাহির হইয়াছেন, ঘুরিয়াছেনও বিস্তর। একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "আমার কিন্তু আর ভ্রমণ করতে ইচ্ছে করচে না। ভারি ইচ্ছা করচে একটি কোণের মধ্যে আড্ডা করে একটু নিরিবিলি হয়ে বসি। · ঘরের কোণও আমাকে টানে ঘরের বাহিরও আমাকে আহ্বান করে। খুব ভ্রমণ করে দেখে বেড়াব ইচ্ছে করে আবার উদ্‌ভ্রান্ত শ্রান্ত মন একটি নীড়ের জন্যে লালায়িত হয়ে ওঠে।···থাকবার জন্যে যেমন ছোট্টো নীড়টি, ওড়বার জন্যে তেমনি মস্ত আকাশ। আমি যে কোণটি ভালোবাসি সে কেবল মনকে শান্ত করবার জন্যে।"

মফঃস্বলে যখনই যান, কবির সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি ও অনেক রকমের বই যায়। এবার ফাল্গুনমাসে বর্ষা দেখা দিলে কটক হইতে একখানি 'মেঘদূত' সংগ্রহ করিয়া পাণ্ডুয়ায় লইয়া যান। তিনি লিখিতেছেন, "অনেকগুলি বই সঙ্গে নিতে হয়, তার সবগুলিই যে প্রতিবার পড়ি তা নয়, কিন্তু কখন কোনটা দরকার বোধ হবে আগে থাকতে জানবার যো নেই, তাই সমস্ত সরঞ্জাম হাতে রাখতে হয়। সেইজন্য আমার সঙ্গে নেপালীজ বুদ্ধিস্টিক লিটারেচরেরথেকে আরম্ভ করে শেকসপীয়র পর্যন্ত কত রকমেরই যে বই আছে তার আর ঠিকানা নেই। এর মধ্যে অধিকাংশ বইই ছোঁবনা কিন্তু কখন কী আবশ্যক হবে বলা যায় না। অন্যবার বরাবর আমার সঙ্গে বৈষ্ণব কবি এবং সংস্কৃত বই আনি, এবার আনিনি সেই জন্যে ঐ দুটোরই প্রয়োজন বেশি অনুভব হচ্ছে। যখন পুরী খণ্ডগিরি প্রভৃতি ভ্রমণ করছিলুম তখন যদি মেঘদূতটা হাতে থাকত ভারি সুখী হতুম। কিন্তু মেঘদূত ছিল না তার বদলে Caird's Philosophical Essays ছিল।"[৩] রবীন্দ্রনাথের মনীষা, বিচিত্র রসের সৃষ্টিসম্ভোগ ও বিচারশক্তি কেবলমাত্র intuition বা প্রতিভাপ্রসূত নহে, তাহার পশ্চাতে গভীর অধ্যয়ন রহিয়াছে।

পাণ্ডুয়ার কুঠি হইতে ফিরিবার সময় পথে বেশ ঝড়বৃষ্টি পান। লিখিতেছেন, "ছোট্ট বোটখানি। আমার মতো লম্বা লোকের দৈর্ঘ্যগর্ব খর্ব করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য দেখতে পাচ্চি। ভ্রমক্রমে মাথা একটুখানি তুলতে গেলেই অমনি কাষ্ঠ ফলকের প্রচণ্ড চপেটাঘাত মাথার উপর এসে পড়ে— হঠাৎ একেবারে দমে যেতে হয়; সেইজন্যে কাল থেকে নতশিরে যাপন করচি।"

পাণ্ডুয়া হইতে কটক ফিরিবার পথে রবীন্দ্রনাথকে বহুকাল পরে তিনটি কবিতা লিখিতে দেখি, আনাদৃত (২২শে ফাল্গুন ১২৯৯), নদীপথে ও দেউল (২৩শে)। কটকে ফিরিলেন ৬ই মার্চ (২৪শে) এবং তারপর দিনই বোধ হয় 'উড়িষ্যা' স্টীমারযোগে কলিকাতা রওনা হইলেন। স্টীমারে বসিয়া 'বিশ্বনৃত্য' (২৬শে ফাল্গুন) কবিতাটি রচনা করেন।

কলিকাতায় পৌঁছিয়া তথায় বেশি দিন ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ ১১ই চৈত্র (২৩ মার্চ) তাঁহাকে

১ ছিন্নপত্র। কটক, ২৭শে ফেব্রুয়ারি [১৮৯৩] ১৭ ফাল্গুন ১২৯৯। বিশ্বভারতী পত্রিকা ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা ১৩৫১ পৃ. ৮৩।

২ মঙ্গলবার, ১৮ ফাল্গুন ১২৯৯। [২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩] দ্র ছিন্নপত্র। বালিয়া পৃ, ১৭৪।

৩ ছিন্নপত্র। তীরণ, মার্চ ১৮৯৩ [.২৯৯ ফাল্গুন]।

'মিনো' ষ্টীমারে করিয়া রাজসাহী অভিমুখে লোকেন পালিতের নিকট যাইতে দেখি। 'দুর্বোধ' কবিতাটি ষ্টিমারে বসিয়া লেখা। রাজসাহীতে গিয়া ঝুলন (১৫ই চৈত্র) ও সমুদ্রের প্রতি (১৭ই চৈত্র) লেখেন। এইখানে পুনরায় বহুদিনের জন্য কাব্যরচনায় ছেদ পড়িল।

উড়িষ্যা ভ্রমণের পর

পাণ্ডুয়া হইতে কটকে ফিরিবার পথে তালদণ্ডা খালে নৌকায় বসিয়া যে তিনটি কবিতা লেখেন, তাহাদের মধ্যে 'অনাদৃত' কবিতাটি সম্বন্ধে কবি বহুবিস্তারে 'ছিন্নপত্রে' ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বোধ হয় জলধারে কোনো জেলের জালফেলা দেখিয়া মনের মধ্যে এই ভাবটির উদয় হয়, এবং সেইজন্য কবিতাটির প্রথমে নাম দেন 'জালফেলা'। কবি জীবন ভরিয়া কথার জালে যেসব সুর ও রূপ বাঁধিলেন, তাহা কাহার জন্য? যাহাকে সমর্পণ করিলেন সে তাঁহার প্রেয়সী হইতে পারে, স্বদেশও হইতে পারে। তাহারা এই সব সুর ও রূপকে দেখে দেখে কহিল 'চিনিনে কিছু'।' জেলেও ভাবে, সত্যই ত জালে যেসব জিনিস উঠাইয়াছে, তাহারা ত কিছুই নহে। "এক কথায়, এ বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি কিছুই নয় এ কেবল কতকগুলা রঙীন ভাবমাত্র, তারও যে কোনটার কী নাম কী বিবরণ তাবও ভালো পরিচয় পাওয়া যায় না।" তখন সে সেই আহৃত সামগ্রীগুলি রাস্তায় ফেলিয়া দেয়, পথিকরা সেই বহুমূল্য জিনিসগুলি দেশে বিদেশে আপন আপন ঘরে লইয়া যায়। কেহ জানিল না কে এইগুলি সংগ্রহ করিয়া পথের উপর ছড়াইয়া দিয়াছে। অতীতের ইতিহাসের দিকে তাকাইলে কি এই কথাই মনে হয় না। এই যে অজস্র জ্ঞানরত্ন আজ আমরা সহজ আনন্দে ভোগ করিতেছি, কোথায় তাহার উদ্‌ভব, কে তাহার স্রষ্টা, দ্রষ্টা— তাহা কি আমরা জানি। না, জানিবার জন্য কখনো কুতূহলী হই? দেশবিদেশ হইতে এইসব জ্ঞানরত্ন আসিয়াছে, যুগে যুগে সেসব সঞ্চিত হইয়াছে। আজও জ্ঞানী গুণীরা জ্ঞানের জালে যেসব মণিমুক্তা উঠাইতেছেন, তাহাদের দশা সেইরূপ হইতে পারে। 'সোনার তরী'র ব্যর্থ ক্রন্দন এখানেও। জগৎপ্রবাহে 'সোনার তরী'তে সোনার ধান রূপ কর্ম বোঝাই করিয়া মহাকাল অন্ধবেগে চলিয়া যায়, বিস্মৃতির অতলে পড়িয়া থাকে মানুষ। সে বঞ্চিত হয়, ভবিষ্যত ভোগ করে তাহারই সঞ্চিত ফসল, কিন্তু তাহাকে কি কেহ স্মরণ করে।

পূর্বোল্লিখিত পত্রখানির মধ্যে কবিরও একটু অভিমান প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি লিখিতেছেন, "বোধ হচ্চে এই কবিতাটি যিনি লিখছেন তিনি মনে করবেন তাঁর গৃহকার্যনিরতা অন্তঃপুরবাসিনী জন্মভূমি, তাঁর সমসাময়িক পাঠকমণ্ডলী, তাঁর কবিতাগুলির ঠিক ভাবগ্রহ করতে পারবে না, তার যে কতখানি মূল্য সে তাদের জ্ঞানগোচর নয়, অতএব এখনকার মতো এসমস্ত পথেই ফেলে দেওয়া যাচ্চে, তোমরাও অবহেলা কর আমিও অবহেলা করি, কিন্তু এ রাত্রি যখন পোহাবে তখন 'পস্টারিটি' এসে এগুলি কুড়িয়ে নিয়ে দেশে বিদেশে চলে যাবে। কিন্তু তাতে ঐ জেলে লোকটার মনের আক্ষেপ কি মিটবে?" (ছিন্নপত্র পৃ. ২২৮-২৯)।

পরদিন খালপথে ঝড়বৃষ্টি পান ভালো রকমেই। পত্রধারায় লিখিতেছেন, "এই মেঘবৃষ্টি পাকা কোঠার মধ্যে অতি ভালো কিন্তু ছোট বোটটির মধ্যে দুইটি রুদ্ধ প্রাণীর পক্ষে মনোরম নয়। একে তো উঠতে বসতে মাথা ঠেকে, তার উপরে আবার যদি মাথায় জল পড়তে থাকে, তা হলে বেদনার উপশম হতেও পারে কিন্তু আমার 'দুর্দশার পেয়ালা' একেবারে পূর্ণ হয়ে ওঠে।"... (ছিন্নপত্র। তীরন। মার্চ ১৮৯৩) এই অবস্থায় 'নদীপথে' (২৩ ফাল্গুন ১২৯৯) কবিতাটি রচিত।

বসিয়া তরণীর কোণে
একেলা ভাবি মনে মনে
মেঝেতে শেজ পাতি
সে আজি জাগে রাতি
নিদ্রা নাহি দু-নয়নে।
বসিয়া ভাবি মনে মনে।

চকিত আঁখি দুটি তার
মনে আসিছে বারবার।
বাহিরে মহা ঝড়,
বজ্র কড় মড়,
আকাশ করে হাহাকার।
মনে পড়িছে আঁখি তার।

কবিতাটিকে অত্যন্ত বাস্তবভাবে দেখিতে কোনো দোষ নাই। রবীন্দ্রনাথ যে প্রকার স্নেহশীল তাঁহার মনে এরূপ উদ্‌বেগ ও ভাবনা হওয়া স্বভাবিক; সুতরাং কবিতাটিকে তাহার শাব্দিক মূল্যেই গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপের কবিতা হইতেছে 'দেউল', সেই দিনই রচিত। কয়েক দিন আগে পুরী ভুবনেশ্বর খণ্ডগিরি প্রভৃতির মন্দির দেখিয়া কবির মনে যেসব ভাবের উদয় হয় তাহারাই প্রকাশ পায় 'দেউল' কবিতায়। মানুষ অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে দেবতার পূজায় রত। প্রকৃতির অতুল সৌন্দর্যকে মন্দির বাহিরে রাখিয়া, মনগড়া রূপ সৃষ্টি করে মন্দির ভিতরে।

নিদ্রাহীন বসিয়া এক চিতে
চিত্র কত এঁকেছি চারিভিতে
স্বপ্নসম চমৎকার

কোথাও নাহি উপমা তা'র,
কত বরণ, কত আকার
কে পারে বরনিতে,
চিত্র যত এঁকেছি চারিভিতে।[১]

মানুষ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া 'শব্দহীন গৃহের মাঝখানে' ধ্যানরত। মন্দিরের বাহিরে অনন্ত সমুদ্র, অসীম আকাশ ও লীলাময় প্রকৃতির প্রকাশ; সেই সৌন্দর্যকে মানুষ জ্ঞানত উপভোগ করিতে অসমর্থ। বিশ্বকে দূরে ঠেলিয়া বিশ্বনাথের পূজা অসম্পূর্ণ। সৌন্দর্যকে নির্বাসিত করিয়া অন্ধকার মন্দিরে পরমসুন্দরের ধ্যান অর্থশূন্য। এই নিষ্ঠানিবেদনের প্রতিক্রিয়ায় সত্য দৃষ্টি খোলে। কিন্তু তাহা আসে বিধাতার বজ্ররূপে। মিথ্যার আবরণ ছিন্ন হয় রুদ্রের আঘাতে।

একদা এক বিষম ঘোর স্বরে
বজ্র আসি পড়িল মোর ঘরে।
ফলে "পাষাণ রাশি সহসা গেল টুটি
গৃহের মাঝে দিবস উঠে ফুটি'।"
তখন "দেউলে মোর দুয়ার গেল খুলি',
ভিতর আর বাহিরে কোলাকুলি।"

রবীন্দ্রনাথ ইহার ব্যাখ্যা লিখিতেছেন, "যখন কোণে ব'সে ব'সে কতকগুলো কৃত্রিম কল্পনার দ্বারা আপনার দেবতাকে আচ্ছন্ন ক'রে নিজের মনটাকেও একটা অস্বাভাবিক সুতীব্র অবস্থায় নিয়ে যাওয়া গেছে এমন সময় যদি হঠাৎ একটা সংশয়বজ্র পড়ে, সেই সমস্ত সুদীর্ঘকালের কৃত্রিম প্রাচীর ভেঙে যায় তখন হঠাৎ প্রকৃতির শোভা, সূর্যের আলোক এবং বিশ্বজনের কল্লোল গান এসে তন্ত্রমন্ত্র ধূপধুনার স্থান অধিকার করে, এবং তখন দেখতে পাই সেই যথার্থ আরাধনা এবং তাতেই দেবতার তুষ্টি।"[২]

১ 'মন্দির' প্রবন্ধে আছে, "দেখিলাম, মন্দির ভিত্তির সর্বাঙ্গে ছবি খোদা। কোথাও অবকাশমাত্র নাই। যেখানে চোখ পড়ে এবং যেখানে চোখ পড়ে না, সর্বত্রই শিল্পীর নিরলস চেষ্টা কাজ করিয়াছে। ছবিগুলি বিশেষভাবে পৌরাণিক ছবি নয়; মানুষের ছোটবড়ো ভালোমন্দ প্রতিদিনের ঘটনা ··· বিচিত্র আলেখ্যের দ্বারা মন্দিরকে বেষ্টন করিয়া আছে।···চিত্রশ্রেণীর ভিতরে এমন অনেক জিনিষ চোখে পড়ে, যাহা দেবালয়ে অঙ্কনযোগ্য বলিয়া হঠাৎ মনে হয় না। ইহার মধ্যে বাছাবাছি কিছুই নাই— তুচ্ছ এবং মহৎ, গোপনীয় এবং ঘোষণীয়, সমস্তই আছে।" বঙ্গদর্শন ১৩১০ পৌষ। বিচিত্র প্রবন্ধ ১ম সং (১৩১৪)

২ ছিন্নপত্র, সাজাদপুর ৩০ আষাঢ় ১৩০০

দেউল যখন ভাঙিল, 'বিশ্বজনের কল্লোল গান' তখন ছন্দে পড়িল ধরা ; নিখিল বিশ্ব নৃত্যদোলায় স্পন্দিত হইয়া উঠিল কবির ছন্দে। 'বিশ্বনৃত্য' কবিতাটির মধ্যে কবি যে অনুভূতির আবেগ সঞ্চারিত করিয়াছেন, তাহা অশান্ত সাগরের কলকল্লোল— কবির ভাষায় ছন্দোবদ্ধ কবিতারূপে মুক্তি লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই কবিতাটির মধ্যে কবির অন্তরের যে বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে তাহার কতকগুলি বস্তুতান্ত্রিক কারণ[১] আছে বলিয়া আমাদের সন্দেহ হয়। বাংলার সমাজের প্রাণহীন রসহীন অবস্থা তাঁহাকে বহুকাল হইতে পীড়িত করিতেছিল। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস দেখিয়া বাঙালি জীবনের দৈনন্দিন ক্ষুদ্রতা কবিচিত্তকে ক্ষুব্ধ ও কাতর করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাকেই মনের সম্মুখে রাখিয়া তাহারই উদ্দেশে যেন ইহা রচনা করিয়াছিলেন। রুদ্ধ জীবনকে মুক্তিমন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ করিবার এই সংগীত।

শুধু হেথা কেন আনন্দ নাই;
কেন আছে সবে নীরবে ?
তারকা না দেখি পশ্চিমাকাশে,
প্রভাত না দেখি পূরবে।
শুধু চারিদিকে প্রাচীন পাষাণ
জগৎ-ব্যাপ্ত সমাধি সমান
গ্রাসিয়া রেখেছে অযুত পরাণ,
রয়েছে অটল গরবে।

জগৎ-মাতানো সঙ্গীততানে
কে দেবে এদের নাচায়ে ?
জগতের প্রাণ করাইয়া পান
কে দেবে এদের বাঁচায়ে ?
ছিঁড়িয়া ফেলিবে জাতিজালপাশ
মুক্ত হৃদয়ে লাগিবে বাতাস,
ঘুচায়ে ফেলিয়া মিথ্যা তরাস
ভাঙিবে জীর্ণ খাঁচা এ।

... ...

জীবনের জড়ত্ব হইতে জাগ্রত সত্তার মধ্যে সুপ্ত চিত্তকে উদ্‌বোধিত করিবার জন্য এ যেন কবির প্রার্থনা !

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
কে বাজাবে সেই বাজনা।
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হবে আপনা।

টুটিবে বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সঙ্গীতে নূতন ছন্দ,
হৃদয় সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাবে নবীন বাসনা।

উড়িষ্যা হইতে কবি কলিকাতায় ফিরিয়াছিলেন ফাল্গুনের (১২৯৯) শেষাশেষি। কয়েকদিন পরেই তাঁহাকে দেখি রাজসাহিতে। পথে 'মিনো' স্টীমারে বসিয়া লিখিলেন 'দুর্বোধ' কবিতাটি (১২৯৯ চৈত্র ১১)। 'কাব্যের তাৎপর্যে' পঞ্চভূতে মিলিয়া 'বিদায় অভিশাপ' কাব্যনাট্যের অর্থোদ্‌ঘাটনে যেরূপ মেহনত করিয়াছিলেন, সেরূপ মানসিক শ্রমস্বীকার করিতে পারিলে এই কবিতাটিকে সত্যই দুর্বোধ করিয়া তোলা সহজ হইত। কিন্তু সহজভাবে গ্রহণ করিলে ইহার অর্থ আবিষ্কার করা কঠিন নহে।

প্রেম বা ভালোবাসা কোনো বস্তু নয় ; বিশেষ কোনো ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রেমের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না ;

১ ১২৯৯ সালে ফাল্গুনমাসের সাহিত্য পত্রিকায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত অনামে 'তর্কবৈচিত্র্য' নামে প্রবন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর সহিত রবীন্দ্রনাথের বিরোধের জন্য কবিকেই দায়ী করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং হিং টিং ছটের লক্ষ্যস্থল যে নিঃসন্দেহে চন্দ্রনাথবাবু এই কথাও স্পষ্ট করিয়া প্রচার করিলেন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক মহলের সমালোচনার আঁচ পাইয়া পুরী হইতে (৬ ফাল্গুন ১২৯৯) 'সাহিত্য' সম্পাদককে লিখিয়া পাঠাইলেন যে চন্দ্রনাথবাবু অকারণ যেন ক্রোধ না করেন। (সাহিত্য ১৩০০ বৈশাখ পৃ ৮১-৮৪) এ ছাড়া 'সাধনা'য় অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করিলেন যে হিং টিং ছট্ ব্যঙ্গ কবিতার লক্ষ্যস্থল চন্দ্রনাথ বসু নহেন। কিন্তু কাহার বা কাহাদের উদ্দেশে রচিত তাহা স্পষ্ট না করায়, সাহিত্যিক মহলে গবেষণার যবনিকা পড়িল না। (সাধনা ১২৯৯ চৈত্র পৃ ৪৫৫)।

উহা সুখ বা দুঃখের ন্যায় মনোভাবও নহে যে হাসি বা কান্নার ন্যায় মুখাবয়বের বাহ্যিক বিকৃতির দ্বারা তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইবে। সাধারণত নারী এই অস্পষ্টতাকে বোঝে না; নারীর মন বস্তুবিলাসী, ভাববিলাসী নহে।

তুমি মোরে পার না বুঝিতে ?
প্রশান্ত বিষাদ ভরে
দুটি আঁখি প্রশ্ন ক'রে
অর্থ মোর চাহিছে খুঁজিতে···

নারী পুরুষের প্রেমের গভীরতা, ব্যাপকতা, বৈচিত্র্য, ঔজ্জ্বল্য বুঝিতে পারে না। তাই কবি তাহাকে বলিতে চাহেন, 'এ যদি হইত শুধু মণি পরাতেম গলায় তোমার।' 'এ যদি হইত শুধু ফুল' ···'পরায়ে দিতেম কালো চুলে।' কিন্তু 'এ যে সখি সমস্ত হৃদয়।' ইহাকে কে বুঝাইবে। 'এ যদি হইত শুধু সুখ' ···'বলিতে হত না কোনো কথা।' 'এ যদি হইত শুধু দুখ', 'প্রত্যক্ষ দেখিতে পেতে অন্তরের ব্যথা'। কিন্তু

এ যে সখি হৃদয়ের প্রেম; সুখদুঃখ বেদনার আদি অন্ত নাহি যার চিরদৈন্য চিরপূর্ণ হেম।
নব নব ব্যাকুলতা জাগে দিবারাতে তাই আমি না পারি বুঝাতে।

প্রেম একটা attitude, ইহার রস অনুভব করা যায় কিন্তু অন্যকে বুঝানো যায় না। নারী চায় স্পষ্টতা। অস্পষ্টতা যাহার ধর্ম, তাহাকে স্পষ্টভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিয়া পাওয়া যায় না; সেইজন্যই নারীর এত দুঃখ। কিন্তু কবির মনে বেশ একটি গভীর শান্তি নামিয়াছে; এবং তাহারই আলোকে জগতকে দেখিয়া 'মনে হইতেছে সুখ অতি সহজ সরল।'[১]

রাজসাহিতে লোকেনের সহিত সাহিত্য ছন্দ দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হয়, লঘুগুরু সকলভাবেরই কথা কাটাকাটি চলে। কবির চিত্তকে নানাভাবে উদ্‌বুদ্ধ করিবার অসাধারণ শক্তি ছিল লোকেনের। এইসব আলাপ-আলোচনার ঘাতপ্রতিঘাতে দুইটি কবিতা সেখানে রচিত হয়— ঝুলন (১৫ চৈত্র ১২৯৯) ও সমুদ্রের প্রতি (১৭ চৈত্র)।

মানুষ দৈনন্দিন জীবন যাপন করিয়া নিজের ক্ষুদ্র প্রাণটুকুকে অতি যত্নে পোষণ করিয়া থাকে— 'এতকাল আমি রেখেছিনু তারে যতন ভরে শয়ন পরে।' সেই অভ্যস্ত জীবনকে 'কত সোহাগ করেছি চুম্বন করি' নয়নপাতে স্নেহের সাথে।' জীবনের সমস্ত অভ্যাসকে, মতবাদকে, আচারকে, প্রথাকে— 'যা-কিছু মধুর দিয়েছিনু তা'র দুখানি হাতে স্নেহের সাথে।'··· কিন্তু কালে এমনি হয় যে, অভ্যাসে, আলস্যে, গতানুগতিকের অনুবর্তনে এ প্রাণ আর জাগে না; নূতন ভাবনায়, নূতন উৎসাহে প্রাণ সাড়া দেয় না, 'পরশ করিলে জাগে না সে আর।' তখন প্রাণের অর্ধমৃত অবস্থা বা দেহের অর্ধজাগ্রত অবস্থা 'ঘুমে জাগরণে মিশি' একাকার নিশি-দিবসে; বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগ মরমে পশে আবেশ বশে।' কিন্তু মহামানব চায় এই না-মরিয়া বাঁচিয়া-থাকার অবস্থা হইতে মুক্তি; অসম্ভবকে বরণ করিয়া মহাসাগরের তুফানের মাঝে সে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়। তখন সে বলে— "তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে নূতন খেলা রাত্রিবেলা।" তখন সে 'মরণদোলায় ধরি রসি গাছি' কর্মসাগরে নামিয়া পড়ে। তখন সে আপনাকে উপলব্ধি করে, জাগ্রত প্রাণকে দেখিতে পায়— তাহার পরানবধূর স্পর্শ পায়— "বধূরে আমার পেয়েছি আবার ভরেছে কোল।" তখন "প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি" হইয়া নিজের ব্যক্তিত্ব জাগ্রত হয়। ইনি সেই 'মানসসুন্দরী' যাঁর সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন— "ও মেয়েটি পয়মন্ত নয়— আর যাই হোক্ সৌভাগ্য নিয়ে আসেন না। সুখ দেন না বলতে

১ সুখ ১৩ চৈত্র ১২৯৯। চিত্রা পৃ ৩-৫। এই কবিতাটি 'সোনার তরী'র যুগে রচিত। তারিখ দিয়া দেখিলে উহা রাজসাহিতে রচিত। ১১ চৈত্র (১২৯৯) 'দুর্বোধ' রচিত হয়, ১৫ই চৈত্র লেখেন 'ঝুলন', ১৭ চৈত্র লিখিলেন 'সমুদ্রের প্রতি'।

পারিনে, কিন্তু স্বস্তির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। যাকে বরণ করেন তাকে নিবিড় আনন্দ দেন কিন্তু এক এক সময় কঠিন আলিঙ্গনে হৃৎপিণ্ডটি নিংড়ে রক্ত বের ক'রে নেন।"[১]

'সমুদ্রের প্রতি' এই পর্বের শেষ কবিতা; পুরীতে সমুদ্র দেখিয়া যে এই লেখার প্রেরণা তাহা তো কবি স্বয়ং বলিয়াছেন। এই কবিতাটির মধ্যে ইংরেজি কোনো কবিতার ছায়া থাকিলেও, তাহা এত দূরগত যে তাহাকে অনুকরণ বলিলে ভুল বলা হইবে। এই কবিতার মধ্যে শুধু কাব্যসৌন্দর্য আছে বলিলে যথেষ্ট বলা হয় না; বহু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কাব্যকলার সহিত গ্রথিত হইয়া ইহা অপরূপ হইয়াছে। ইতিপূর্বে কোনো কবিতার মধ্যে কাব্য, তত্ত্ব ও কলা এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত হইয়া একটি অখণ্ড সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তবে কবি যে তত্ত্বটি এইখানে বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা পত্রের মধ্যে ইতিপূর্বে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সে পত্র ১৩১৪ সালের পূর্বে অবশ্য গ্রন্থ মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই; সেইজন্য 'সমুদ্রের প্রতি' সাধনায় (১৩০০ বৈশাখ) যখন প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন পর্যন্ত ইহার অন্তর্নিহিত ভাবনাগুলি বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন ছিল।

কবি অগ্রহায়ণ (১২৯৯) মাসে পদ্মায় বোটের উপর ছিলেন। একদিন এই সুন্দর পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া যাহা লিখিলেন, তাহা যেন এই কবিতার ভূমিকা।[২]

"এই পৃথিবীর সঙ্গে কতদিনের চেনাশোনা! বহু যুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে সেদিনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করচেন তখন আমি এই পৃথিবীর নতুন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হ'য়ে পল্লবিত হ'য়ে উঠেছিলুম। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, অন্ধজীবনের গূঢ়পুলকে নীলাম্বর তলে আন্দোলিত হ'য়ে উঠেছিলুম। মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত, নবপল্লবে ডাল ছেয়ে যেত, বর্ষার মেঘের ঘননীল ছায়া আমার সমস্ত পাতাগুলিকে পরিচিত করতালের মতো স্পর্শ করতো। তা'র পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেচি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি ক'রে বসলেই আমাদের পরিচয় অল্প অল্প মনে পড়ে। আমার বসুন্ধরা এখন 'রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চল' গায়ের উপর টেনে ঐ নদীতীরের শস্যক্ষেত্রে বসে আছেন, আমি তাঁর পায়ের কাছে এসে বসেচি।"

কলিকাতায় ফিরিয়া কবিতাটি ইন্দিরা দেবীকে পাঠাইয়া দিলেন আগ্রায়; তখন তাঁহারা সিমলা যাইতেছেন। সেই সঙ্গে যে পত্রখানি[৩] লেখেন, তাহাতেও 'সমুদ্রের' কথা আছে। "এই পৃথিবীর সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের যে একটা বহুকালের গভীর আত্মীয়তা আছে, নির্জনে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি করে অন্তরের মধ্যে অনুভব না করলে সেকি কিছুতেই বোঝা যায়। পৃথিবীতে যখন মাটি ছিল না, সমুদ্র একেবারে একলা ছিল, আমার আজকেকার এই চঞ্চল হৃদয় তখনকার সেই জনশূন্য জলরাশির মধ্যে অব্যক্তভাবে তরঙ্গিত হতে থাকৃত।"…

১ ছিন্নপত্র ৮ই মে ১৮৯৩

২ বিচিত্র প্রবন্ধ ১ম সং (১৩১৪) জলেস্থলে। ৯ই ডিসেম্বর ১৮৯২ পৃ. ২৮৪

৩ ছিন্নপত্র। কলিকাতা, ১৬ই এপ্রিল, ১৮৯৩ [১৩০০ বৈশাখ ৪]

পদ্মার ধারে

উড়িষ্যা হইতে ফিরিয়া চৈত্রের (১২৯৯) গোড়ায় যান শিলাইদহ ; সেখান থেকে ঐ মাসের মাঝামাঝি আসেন রাজসাহিতে লোকেন পালিতের কাছে। চৈত্রের শেষে কলিকাতায় ফিরিলেন, বোধ হয় বর্ষশেষ ও নববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে। পুরীতে সমুদ্র দর্শন করিয়া তাঁহার মনে কী সব চিন্তার উদয় হইয়াছিল, তাহা ব্যক্ত করিয়া ইন্দিরা দেবীকে পত্র লেখেন। সেইসঙ্গে 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটিও তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন।[১]

কবির জীবনের অধিকাংশ সময়ই এখন কাটে কলিকাতার বাহিরে বাহিরে। এবার যে-কয়দিন বাড়িতে আছেন— জোড়াসাঁকোর অতীত জীবনের স্মৃতি মনকে বিষাদসুখে মধুর করিয়া তুলিতেছে। পত্রধারায় একটি কথা লিখিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার পরবর্তী জীবনে বর্ণে বর্ণে সত্য হয়। তিনি লেখেন, 'পুরাণো স্মৃতিগুলো মদের মতো ; — যত বেশি দিন মনের মধ্যে সঞ্চিত হ'য়ে থাকে, ততই তার বর্ণ এবং স্বাদ এবং নেশা যেন মধুর হ'য়ে আসে। ...... বুড়ো বয়সে যখন স্বভাবতই আমরা কাজে অক্ষম, শরীরের যৌবনের অতিরিক্ত তেজ আমাদের কোনো রকম তাড়না করচে না, তখন স্মৃতি বোধ হয় আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।" রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের রচনাগুলির প্রধান আশ্রয় ছিল এই পুরানো স্মৃতি।

শোনা যায় ডাঙার মানুষ সমুদ্রের নাবিক হইলে, স্থলের কাজে আর তাহার মন বসে না। জলের আহ্বান কঠিন মৃত্তিকার দৃঢ় আকর্ষণকে শিথিল করিয়া দেয়, জলের ডাকে তাহাদের 'ঘরে থাকাই দায়।' রবীন্দ্রনাথকে পদ্মা বারে বারে ডাকে ; ১৩০০ সনের বৈশাখের দারুণ গ্রীষ্মে কলিকাতার খস্‌খস্ টানাপাখার মায়া কাটাইয়া কাল-বৈশাখীর ঝড়ঝঞ্ঝার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও বোটে গিয়া বাস করিতেছেন। বৈশাখমাসে একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "এখন আমি বোটে। এই যেন আমার নিজের বাড়ি। এখানে আমিই একমাত্র কর্তা।"... "বাস্তবিক, পদ্মাকে আমি বড়ো ভালোবাসি। ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত আমার তেমনি পদ্মা আমার যথার্থ বাহন— খুব বেশি পোষমানা নয়, কিছু বুনো রকম ; কিন্তু ...ওকে আমার আদর করতে ইচ্ছে করে।...আমি যখন শিলাইদহে বোটে থাকি, তখন পদ্মা আমার পক্ষে সত্যিকার একটি স্বতন্ত্র মানুষের মতো"... (ছিন্নপত্র, শিলাইদহ, মে ১৮৯৩)।

এই নদীর চলমান স্রোত, ও আকাশের নীল স্তব্ধতা কবি-জীবনের আনন্দের, উপভোগের অন্যতম প্রধান সহায়। তিনি লিখিতেছেন, "আমি বিকেলে...চরের উপর নদীর ধারে ঘণ্টাখানেক বেড়াই, তারপর আমাদের নূতন জলি-বোটটাকে নদীর মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে তার উপরে বিছানাটা পেতে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সন্ধ্যার অন্ধকারে চীৎ হয়ে চুপচাপ পড়ে থাকি।... আমি প্রায় রোজই মনে করি, এই তারাময় আকাশের নীচে আবার কি কখনো জন্মগ্রহণ করব ?" (ছিন্নপত্র, ১৬ই মে ১৮৯৩)।

পদ্মা সম্বন্ধে বহুবার বহুভাবে কবি তাঁহার ভাবরাশি প্রকাশ করিয়াছেন। পদ্মা বা সাধারণভাবে বাংলার নদী সাহিত্য সাধনায় রবীন্দ্রনাথকে কতখানি সাহায্য করিয়াছে, তাহা বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়।

জড়প্রকৃতির প্রতি কবি-রবীন্দ্রনাথের যেমন আকর্ষণ, মূঢ় প্রজাদের প্রতি মানুষ-রবীন্দ্রনাথের মায়া কিছু কম নয়। গত কয়েক বৎসর প্রকৃতির মধ্যে বিচরণ ও মানুষের মধ্যে ঘোরাঘুরি করিয়া জীবনের নানাদিক খুলিয়া গিয়াছে। তিনি লিখিতেছেন, 'প্রজাগুলোকে দেখলে... ভারি মায়া করে।' 'এরা যেন বিধাতার শিশু সন্তানের মতো নিরুপায়।'

১ ছিন্নপত্র। কলিকাতা ১৬ই এপ্রিল ১৮৯৩।

এইসব লোকদের মহত্ত্ব ও হীনতা, পৌরুষ ও দুর্বলতা, ঐশ্বর্য ও অভাব প্রভৃতি গভীরভাবে লক্ষ্য করিবার অবসর পাইয়াছেন। চাষী-জীবনের চিরস্থায়ী দারিদ্র্য সমস্যার জন্য দায়ী কে, সে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে সাহস পাইতেছেন না; সোশিয়ালিস্টদের মনে পৃথিবীময় ধনবন্টন সম্বন্ধে যেসব বিতর্ক ওঠে সংসার-জীবনে তাহা সম্ভব কিনা তদ্‌বিষয়ে কবির সন্দেহ হয়। অসম ধনবন্টননীতিকে সমর্থন না করিয়াও থাকিতে পারেন না। তিনি লিখিতেছেন, "বিধাতা আমাদের এমনি একটি ক্ষুদ্র জীর্ণ দীন বস্ত্রখণ্ড দিয়েছেন, পৃথিবীর একদিক ঢাকতে গিয়ে আর একদিক বেরিয়ে পড়ে— দারিদ্র্য দূর করতে গেলে ধন চ'লে যায় এবং ধন গেলে সমাজের কত যে শ্রীসৌন্দর্য উন্নতির কারণ চ'লে যায় তার আর সীমা নেই।" সুতরাং ধনবিভাগ সম্বন্ধে কবি দু-মনা। পরবর্তীযুগে এই মতের পরিবর্তন হইয়াছিল,— 'রাশিয়ার চিঠি' পাঠ করিলেই তাহা বুঝা যায়; শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবের ভাষণগুলিও সেই সঙ্গে আলোচনীয়। যাহাই হউক, এইসব মতামত চিরদিন কবি ও সাহিত্যিকদের আন্তরিক শুভ-ইচ্ছার স্তরেই থাকিয়া যায়, জীবনের ব্যবহারিক অনুষ্ঠানে তাহারা মুক্তিলাভ করিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ কবি ও আর্টিস্ট, তাই তিনি ধনাভিজাত্যের দুর্বলতা আর্টের খাতিরে কখনো ত্যাগ করিতে পারেন নাই। অভ্যাসের সহিত আদর্শের চির বিচ্ছেদকে ঘুচাইতে পারেন নাই।

বাংলার চাষী রায়তের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়া আজ তাহাদের কিসে সুখ কোথায় দুঃখ তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। ইন্দিরা দেবীকে একখানি পত্রে বলিতেছেন, 'এখানে এই মেঘ রৌদ্রের যাওয়া-আসা ব্যাপারটা যে কতটা গুরুতর ··সিমলার[1] সেই অভ্রভেদী পর্বতশৃঙ্গে বসে তা ঠিকটা কল্পনা করা শক্ত হবে।' প্রজাদের মঙ্গলের জন্য রবীন্দ্রনাথ এখন যথেষ্ট ভাবেন; পর যুগে তাহাদের কল্যাণের জন্য যেসব অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান করেন, তাহার কথা যথাস্থানে আলোচনা করিব। প্রজাদের উপর অত্যাচার করিলে তিনি কাহাকেও ক্ষমা করিতেন না, উৎপীড়ক প্রাচীনতম কর্মচারী হইলেও নহে। এ জন্য সাধারণ প্রজা ও বিশেষভাবে মুসলমান প্রজারা তাঁহার বিশেষ অনুগত ছিল। এক এক সময়ে তাঁহার কাছে এক একটি সরল ভক্ত বৃদ্ধ প্রজা আসিত, যাহার অকৃত্রিম ভক্তি যুবক কবিকে মুগ্ধ করিত।[2] কিন্তু যখন সম্বন্ধটা কাব্যলোক হইতে বস্তুলোকে দেনাপাওনার মধ্যে আসিয়া পড়িত, তখন কবিও কল্পলোকের অলীকতা হইতে নামিয়া সাধারণ মানুষের ন্যায়ই ব্যবহার করিতেন। কারণ, কেবল লেখনী চালনা করিলে জমিদারি পরিচালনা করা চলে না।

কিন্তু হায় পদ্মার শোভা, ধনবন্টন, প্রজার জন্য দরদ। বই ছাপানোর কাগজের দাম বাবত জন ডিকিনসনদের আপিস হইতে টাকার তাগিদ আসে। ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য মাসহারা আড়াইশত টাকা ছাড়া আর কোনো আয়ের পথ রবীন্দ্রনাথের নাই। অতিরিক্ত কোনো ব্যয় করিতে হইলে পিতার কাছে হাত পাতিতে হয় অথবা অন্যের নিকট কর্জ করিতে হয় এবং মাসহারার টাকা হইতে শোধ করিতে হয়।

কিন্তু উড়িষ্যাতেই যান আর রাজসাহিতে যান বা কলিকাতাতে থাকুন, আর পদ্মার উপর বোটের মধ্যে বাস করুন— 'সাধনা'র জন্য নিত্যনৈমিত্তিক লেখা যথানিয়ম সরবরাহ করিতেই হইতেছে; সে যেন তাঁহার রাহু—

'জগৎ মাঝারে যেথায় বেড়াবি যেথায় বসিবি, যেথায় দাঁড়াবি,
বসন্ত শীতে দিবসে নিশীথে সাথে সাথে তোর থাকিব বাজিতে।'

সুতরাং তাহার চাহিদা পূরণের জন্য লেখনী সদাই ব্যস্ত। সাধনার দ্বিতীয় বর্ষ শুরু হইলে রবীন্দ্রনাথ নূতন ধরনে এক 'ডায়ারি' লিখিতে আরম্ভ করেন। "পাঠকেরা যদি ডায়ারি শুনিয়া মনে করেন ইহার মধ্যে লেখকের অনেক

১ গ্রীষ্মকালে ফার্লো লইয়া সত্যেন্দ্রনাথরা সপরিবারে সিমলা পাহাড়ে আছেন।

২ ছিন্নপত্র ১১ মে ১৮৯৩

আত্মকথা আছে, তবে তাঁহারা ভুল বুঝিবেন।[১] লেখক বলিতেছেন, "শাস্ত্রমতে পঞ্চভূতের সমষ্টিই জগৎ। মানুষও তাই। প্রত্যেক মানুষই প্রায় পাঁচটা মানুষ মিলিয়া। ভিতরেও পাঁচটা, বাহিরেও পাঁচটা।··· কোন মানুষ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নহে।··· কিন্তু পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলে প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে গুটিকতক বিশেষ মানুষ বিশেষরূপে সংলগ্ন হইয়া একটি বিশেষ ঐক্য নির্মাণ করে। তাহার অসংখ্য আলাপী আত্মীয়দের মধ্যে সেই কয়েকটি লোকই যেন তাহার সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।··· রচনার সুবিধার জন্য তাঁহাদের মধ্য হইতে কেবল পাঁচজনকে লওয়া যাক্। এবং তাঁহাদের পঞ্চভূত নাম দেওয়া যাক্। ক্ষিতি, অপ্ তেজ, মরুৎ, ব্যোম।"

এই ভূমিকা করিয়া লেখক পঞ্চভূতের কথোপকথন শুরু করিয়াছেন, সঙ্গে অবশ্য 'আমি'ও আছেন, সুতরাং বলা যাইতে পারে ছয়টি ব্যক্তির কথোপথন। সাধনার ১২৯৯ এর মাঘ হইতে ১৩০২ এর ভাদ্র পর্যন্ত প্রথমদিকে নিয়মিত ও পরে অনিয়মিতভাবে ষোলোটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[২] মাঝে বৎসর-অধিক এই প্রবন্ধধারা বন্ধ ছিল। পাদটীকায় প্রদত্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে প্রথম আটটি প্রবন্ধ সাধনার দ্বিতীয় বর্ষে ও শেষ আটটি সাধনার চতুর্থ বর্ষে প্রকাশিত হয়, মাঝে এক বৎসর প্রবন্ধ নাই।

পঞ্চভূতের ডায়ারি রচনার প্রেরণা কী। ঠাকুরবাড়িতে চিরদিন সাহিত্যিকদের মজলিস বসিত, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এই ধারা বরাবর চলিয়া আসিয়াছিল; সত্যেন্দ্রনাথদের বাড়িতে একটি সাহিত্যচক্র প্রায়ই বসিত। 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি' নামে একখানি হাতেলেখা খাতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে বাড়ির লোকেরা ও বাড়ির বন্ধুরা ঐ খাতায় নানা বিষয় সম্বন্ধে নিজ নিজ মনের ভাব লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ,

১ সাধনা ১২৯৯ মাঘ পৃ. ১৯৮

২ সাধনায় পঞ্চভূতের প্রবন্ধ। পঞ্চভূত (১৩০৪) গ্রন্থের মধ্যে।

১২৯৯ মাঘ	ডায়ারি। পরিচয়।	১ নং
„ ফাল্গুন	পঞ্চভূতের ডায়ারি। গদ্য ও পদ্য।	৮ নং
„ চৈত্র	ডায়ারি। নরনারী।	৩ নং
১৩০০ বৈশাখ	ডায়ারি। মনুষ্য।	৫ নং
„ জ্যৈষ্ঠ	ডায়ারি। মন।	৬ নং
„ আষাঢ়	··· ··· ···	
শ্রাবণ	পাঞ্চভৌতিক ডায়ারি। অখণ্ডতা।	৭ নং
„ ভাদ্র	পঞ্চভৌতিক ডায়ারি। সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ।	২ নং
„ আশ্বিন-কার্তিক	ডায়ারি। পল্লিগ্রামে।	৪ নং
১৩০১ অগ্রহায়ণ	কাব্যের তাৎপর্য্য।	৯ নং
„ পৌষ	কৌতুকহাস্য।	১১ নং
„ মাঘ	সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ।	১৩ নং
„ ফাল্গুন	কৌতুকহাস্যের মাত্রা।	১২ নং
„ চৈত্র	সরলতা প্রাঞ্জলতা।	১০ নং
১৩০২ শ্রাবণ	ভদ্রতার আদর্শ।	১৪ নং
„ ভাদ্র	বৈজ্ঞানিক কৌতূহল।	১৬ নং
	অপূর্ব্ব রামায়ণ	১৫ নং

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ হিতেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, লোকেন পালিত, প্রমথ চৌধুরী, যোগেশ চৌধুরী প্রভৃতির বিচিত্র মন্তব্য উহাতে আছে। কোনো কোনো স্থলে একটা বিষয় লইয়া পাঁচজনের মত আছে। সাহিত্য বিষয়ক কয়েকটি রচনা এবং পঞ্চভূতের কয়েকটি প্রবন্ধের খশড়া এখানে খুঁজিলে পাওয়া যায়।

পঞ্চভূত কে কে, তাহা লইয়া অল্পসল্প গবেষণা হইয়াছে। রাজসাহির রায় শরৎ কুমার রায় লিখিয়াছেন, "অক্ষয় বাবুর (মৈত্রেয়) মুখে শুনিয়াছি, তিনি এবং নাটোরের মহারাজ (জগদিন্দ্রনারায়ণ রায়) নাকি রবি বাবুর 'পঞ্চভূতের ডায়ারি'র দুইটি ভূত ছিলেন।"[১] এ সম্বন্ধে আমাদের অন্য রকম শোনা আছে।

পঞ্চভূতের ডায়ারি—বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন জিনিস। মাঘ (১২৯৯) মাস হইতে আরম্ভ হইল, কিন্তু ছোটো-গল্প অন্যান্য প্রবন্ধ ও প্রসঙ্গকথা প্রভৃতি যথানিয়মে চলিতেছে। এ বৎসরের প্রথম গল্প কাবুলিওয়ালা (অগ্র ১২৯৯); পৌষে বাহির হইয়াছিল 'ছুটি'। দুইটি গল্পই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ছোটোগল্পের মধ্যে পরিগণিত হয়। ফাল্গুন মাসে বাহির হয় 'বৈষ্ণব কবিতা' এবং বৈশাখে প্রকাশিত হয় 'মনুষ্য' নামে প্রবন্ধ—পঞ্চভূতের অন্তর্গত রচনা। 'বৈষ্ণব কবিতা'য় প্রেমের যে তত্ত্বটি নির্ণীত হইয়াছে, এই প্রবন্ধের একস্থানে সেই কথাটাই বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কবি লিখিয়াছেন, 'যাহাকে আমরা ভালোবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি, জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালোবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য সম্ভোগ। ইহা হইতে মনে পড়িল, সমস্ত বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে।" ··"বৈষ্ণব ধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে।"

বৈশাখ মাসটা (১৩০০) শিলাইদহে কাটাইয়া জ্যৈষ্ঠের গোড়ায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং পুনরায় আষাঢ়ের মাঝামাঝি শিলাইদহে আসিয়া বোটেই আছেন। রাজসাহিতে 'ঝুলন' ও 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাদ্বয় লিখিবার তিন মাস পরে কবির সহিত কাব্যলক্ষ্মীর সাক্ষাৎ হইল। এই আষাঢ় মাসে পাঁচটি কবিতা লিখিলেন— হৃদয় যমুনা (১৩০০ আষাঢ় ১২), ব্যর্থ যৌবন (১৬ই), ভরাভাদরে (২৭শে), প্রত্যাখ্যান (ঐ) ও লজ্জা (২৮শে)। সাজাদপুর হইতে একখানি পত্রে লিখিতেছেন (৩০শে) "আজকাল কবিতা লেখাটা আমার পক্ষে যেন একটা গোপন নিষিদ্ধ সুখসম্ভোগের মতো হ'য়ে প'ড়েছে···"।

বর্ষাকালে নদীপথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, মনটা প্রকৃতির ঐশ্বর্য সন্দর্শনে ভরিয়া আছে; কিন্তু "আগামী মাসের সাধনার জন্যে একটি লাইন লেখা হয়নি। ওদিকে মধ্যে মধ্যে সম্পাদকের তাড়া আসচে, ··· আর আমি আমার কবিতার অন্তঃপুরে পালিয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিচ্ছি।" 'সোনার তরী' কবিতাটি প্রকাশিত হইল এই আষাঢ় মাসে। পূর্বে লিখিত হইলেও বোধ হয় এই সময়ে তাহাকে শুধরাইয়া সুন্দর করিয়া প্রকাশযোগ্য করিয়াছিলেন। সোনার তরী নদীবক্ষ দিয়া সারা জীবনের সমস্ত সঞ্চয় বহন করিয়া চলিয়া যায়; জীবনের হাহাকার ছাড়া নদীতীরে আর কিছুই থাকে না। কিন্তু এই জলধারার অন্য রূপও আছে; সে দৈনন্দিন ব্যবহারিক কার্য সমাধান করে, অবগাহনের তৃপ্তি দান করে, সৌন্দর্য শোভায় চিত্তকে ভরিয়া তোলে, এবং মরণেচ্ছুর জীবনের চরমশান্তি দান করিবার ক্ষমতা তাহারই আছে। 'হৃদয় যমুনা' কবিতার মধ্যে কবি প্রেমের সকল রূপকে আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। ক্ষণিকের রসতৃপ্তির জন্য কুম্ভ ভরিয়া লইলেই চলে অনেকের; তাহাদের প্রেম প্রয়োজনের ভালোবাসা। কিন্তু যে প্রেমসাগরে অবগাহন করিতে চায় তাহার পথ অবরুদ্ধ নহে; আবার যে দূর হইতে প্রেমের ক্রীড়াকৌতুক দেখিয়া তৃপ্ত থাকিতে চাহে, আত্মসমর্পণ করিতে

১ দ্র শ্রীশরৎকুমার রায় (দয়ারামপুর) এম. এ, রবীন্দ্রস্মৃতি। রাজসাহী সাধারণ পুস্তকালয় কর্তৃক অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র জয়ন্তী সভার সভাপতি কর্তৃক পঠিত। রাজসাহী ১৩৩৮ সাল ৩ঠা মাঘ।

যে অপারক, সেও তীরে বসিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু প্রেমে আত্মবিসর্জনও করা যাইতে পারে। খণ্ডখণ্ডভাবে প্রেমকে না দেখিয়া সমগ্রভাবে আত্মোৎসর্গ করাতেই যে প্রেমের চরম সার্থকতা, সেই কথা বলা হইয়াছে রূপকচ্ছলে।

আমাদের মনে হয় এই কবিতাটির একটি ব্যাখ্যা হয়তো রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিজের অগোচরে একখানি পত্রের মধ্যে একবার লিখিয়া ফেলেন। তিনি বলিয়াছেন, "পাওয়াটা নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। অন্যে কতটা দিতে পারে তা নিয়ে নালিশ ফরিয়াদি করা ভুল, আমি কতটা নিতে পারি এইটেই হচ্চে আসল কথা। যা হাতের কাছে আসে তাকেই পুরোপুরি হস্তগত ক'রে নেওয়া অনেক শিক্ষা সাধনা এবং সংযমের দ্বারা হয়।... ইহা সুখতত্ত্ব শাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়।" (ছিন্নপত্র শিলাইদহ, ২ জুলাই, ১৮৯৩) হৃদয়-যমুনার প্রেম যে অবস্থাতেই আসুক, তাহাকে স্বীকার করিয়া লওয়াই সুখতত্ত্বশাস্ত্রের শিক্ষা।

'ব্যর্থ যৌবন' কবিতাটি গান— 'আজি যে-রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে'। সাজাদপুর হইতে লিখিত পত্রে কবি বলিয়াছেন (১০ জুলাই ১৮৯৩), "ও গানটা আমি নাবার ঘরে অনেকদিন একটু একটু ক'রে সুরের সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করেছিলুম।... এ গানটা আমি এখনো সর্বদা গেয়ে থাকি ·· এটা যে আমার একটা প্রিয় গান সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।"

'হৃদয় যমুনা' ও 'ব্যর্থ যৌবন' কবিতা দুইটির মধ্যে বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্বের প্রভাব প্রবল, একটিতে হইয়াছে 'হৃদয় যমুনা'তে প্রেমলীলা, অপরটিতে 'বৃথা অভিসারে এ যমুনা পারে এসেছি।' রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার মধ্যে বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্বের বহুচিত্র ও পদাবলীর বহু শব্দ প্রায়শই দেখা যায়; বৈষ্ণবসাহিত্যের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ বহুদিনকার। কিন্তু এ আকর্ষণ তত্ত্বমূলক না রসমূলক, তাহার সুবিচার হওয়া প্রয়োজন।

বাংলা ভাষায় যথার্থ কবিতা বৈষ্ণবীয় প্রেমলীলাকে আশ্রয় করিয়া কুসুমিত হয়। বৈষ্ণব পদাবলীর বিশেষ কতকগুলি শব্দ মানুষের চিরন্তন প্রেম বিরহ মিলনের প্রতীক রূপে কাব্যে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে; সুতরাং রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় এই বৈষ্ণবীয় শব্দের ব্যবহার স্বাভাবিক।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বৈষ্ণব পক্ষপাতিত্ব সম্বন্ধে স্বয়ং যে কথা বলিয়াছেন তাহাই বোধ হয় এতদ্‌সম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট ভাষ্য। তিনি লিখিয়াছেন, "বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ষার যমুনা বর্ণনা মনে পড়ে। প্রকৃতির অনেক দৃশ্যই আমার মনে বৈষ্ণব কবির ছন্দ ঝংকার এনে দেয়। তার প্রধান কারণ এই প্রকৃতির সৌন্দর্য আমার কাছে শূন্য সৌন্দর্য নয়— এর মধ্যে একটি চিরন্তন হৃদয়ের লীলা অভিনীত হচ্চে— এর মধ্যে অনন্ত বৃন্দাবন। বৈষ্ণব পদাবলীর মর্মের ভিতর যে প্রবেশ করেছে, সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে সে বৈষ্ণব কবিতার ধ্বনি শুনতে পায়।"[১]

বৈষ্ণব সাহিত্য ও বৈষ্ণব ধর্মের মূলগত কথা রবীন্দ্রনাথ মোটামুটিভাবে ভালোরূপেই জানিতেন। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে[২] লিখিত একখানিপত্রে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। আলোচ্য পর্বে তরুণ সাহিত্যিক [ব্যারিস্টার] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে একখানি পত্রে বৈষ্ণবধর্মের মূলতত্ত্বটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেন; এই পত্রে রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্বের রূপক ব্যাখ্যা দেন নাই, তিনি সাধারণ দ্বৈতাদ্বৈত মতকে বৈষ্ণব ধর্মমত বলিয়া প্রকাশ করেন।[৩]

১ ছিন্নপত্র। কুষ্টিয়ার পথে, ২৪শে আগস্ট ১৮৯৪ [১৩০১ ভাদ্র ৯] দ্র. বিচিত্র প্রবন্ধ (১মসং) পৃ. ২৭৫।

২ পত্র। বোলপুর, ২০ আষাঢ় ১৩১৭। দ্র. প্রবাসী ১৩৩৪ পৌষ।

৩ ১৩০২ অগ্রহায়ণ। দ্র. প্রবাসী ১৩৪৯ বৈশাখ।

আষাঢ় মাস শেষ হইতে চলিল, অথচ 'আগামী মাসের সাধনার জন্যে একটি লাইন লেখা হয়নি', 'অনতিদূরে আশ্বিন-কার্তিকের যুগল 'সাধনা' বাহির হইবে। কবির মনে দ্বন্দ্ব চলিতেছে— তাঁহার জীবনে কোন্‌টা আসল কাজ। কখনো মনে হয় গল্প লেখায় পরম সুখ, কখনো মনে হয় যে-কথাগুলি ঠিক প্রবন্ধ বা কবিতায় প্রকাশ করা যায় না, সেগুলি 'ডায়ারি' আকারে লিখিয়া ফেলিলে ভালো হয়। একএক সময়ে সামাজিক বিষয় লইয়া দেশের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিবার প্রয়োজনও বোধ করেন; সমস্ত দ্বন্দ্বের শেষে মনে আসে কবিতাতেই যেন 'সকলের চেয়ে বেশি অধিকার।' তাঁহার "ক্ষুধানল বিশ্বরাজ্য ও মনোরাজ্যের সর্বত্রই আপনার জ্বলন্ত শিখা প্রসারিত করতে চায়।" তাই একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "যখন গান তৈরি করতে আরম্ভ করি তখন মনে হয় এই কাজেই যদি লেগে থাকা যায় তাহলে তো মন্দ হয় না—আবার যখন একটা কিছু অভিনয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখন এমনি নেশা চেপে যায় যে, মনে হয় চাই কি, এটাতেও একজন মানুষ আপনার জীবন নিয়োগ করতে পারে। আবার যখন 'বাল্যবিবাহ' কিম্বা 'শিক্ষার হেরফের' নিয়ে পড়া যায় তখন মনে হয় এই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ কাজ।…চিত্রবিদ্যা…তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি— কিন্তু আর পাবার আশা নেই, সাধনা করবার বয়স চলে গেছে।"

কিন্তু চিত্রবিদ্যা সাধনার সময় যে চলিয়া যায় নাই তাহা কবি সত্তর বৎসর বয়সে প্রমাণ করিয়াছিলেন; ছবি সম্বন্ধে তাঁহার একটা স্বাভাবিক কৌতুক ও অনুরাগ বরাবরই প্রবল; 'কড়ি ও কোমল' রচনার যুগে চিত্রবিদ্যা লইয়া যে আলোচনা করিতেন তাহার আভাস 'জীবনস্মৃতি'তে কবি দিয়াছেন। 'চিত্রাঙ্গদা' প্রকাশের সময় তরুণ অবনীন্দ্রনাথকে তিনিই ছবি আঁকিবার জন্য উৎসাহিত করেন। উনচল্লিশ বৎসর বয়সে জগদীশচন্দ্র বসুকে একখানি পত্রে লিখিতেছেন "শুনে আশ্চর্য হবেন একখানা sketch book নিয়ে বসে বসে ছবি আঁকচি। বলা বাহুল্য সে ছবি আমি প্যারিস সেলোন-এর জন্যে তৈরি করছিনে এবং কোনো দেশে ন্যাশনাল গ্যালারি যে এগুলি স্বদেশের ট্যাক্স বাড়িয়ে সহসা কিনে নেবেন এরকম আশঙ্কা আমার মনে লেশ মাত্র নেই। কিন্তু কুৎসিৎ ছেলের প্রতি মার যেমন অপূর্ব স্নেহ জন্মে তেমনি যে বিদ্যাটা ভালো আসে না সেইটির উপর অন্তরের একটা টান থাকে।" (পত্র ১৩০৭ আশ্বিন)। চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে কবি যাহাই লিখুন শেষজীবনে তাঁহার এই 'কুৎসিৎ' সন্তানটির উপর টান একটু অতিমাত্রায় হইয়াছিল এবং তিনি এই পত্রে যাহা হইবে না বলিয়া ভরসা দিয়াছিলেন, তাহাই জীবনে ঘটিয়াছিল অর্থাৎ তিনি য়ুরোমেরিকার নগরে নগরে তাঁহার অঙ্কিত ছবির একজিবিশন করিয়াছিলেন আর প্রায় প্রত্যেক দেশের আর্ট গ্যালারিতে কবির আঁকা ছবি সযত্নে রক্ষিতও হইতেছে।

পূর্বোল্লিখিত পত্র মধ্যে আছে, 'মিউজদের মধ্যে আমি কোনোটিকেই নিরাশ করতে চাইনে'। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুঝিয়াছেন, 'কবিতাতেই আমার সকলের চেয়ে বেশি অধিকার'।… 'মিল করে ছন্দ গেঁথে ছোটো ছোটো কবিতা লেখাটা আমার বেশ আসে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আপনার মনে আপনার কোণে সেই কাজই করা যাক।' মিল করিয়া ছন্দ বাঁধিয়া কবিতা লিখিলেন বটে, তবে সেটি ছোটো হইল না, অত্যন্ত দীর্ঘ কবিতা,— তাঁহার ছেলেবেলাকার, 'বহুকালের অনুরাগিণী সঙ্গিনী' কবিতামিউজের জয়গান। কবিতাটির নাম 'পুরস্কার' (১৩ শ্রাবণ ১৩০০)। 'পুরস্কার' কাহিনীতে সকলভোলা আদর্শ আর্টিস্টের একখানি নিখুঁত চিত্র কবির লেখনীর তুলিতে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। কবির স্ত্রীর অভিযোগ—

> রাশি রাশি মিল করিতেছ জড়, মাথার উপরে বাড়ি পড়-পড়
> রচিতেছ বসি পুঁথি বড়ো বড়ো, তার খোঁজ রাখ কি।

কিন্তু এ অভিযোগ স্নেহের অভিযোগ; স্ত্রী জানে স্বামীর মহত্ত্ব কোথায়, শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়। কবি তাহার মিউজকে আবাহন করিয়া বলিতেছেন—

তোমারে হৃদয়ে করিয়া আসীন ক্ষ্যাপার মতন আছি চিরদিন
সুখে গৃহকোণে ধনমানহীন উদাসীন আনমনা।

সংসার সম্বন্ধে উদাসীন আনমনা থাকিলে চালের খড় জোটে না ; তবে কবিতা লিখিয়া লাভ কী, এই প্রশ্নই সাধারণ লোকের মনে জাগে। কবির কাব্য পৃথিবীর কোন্ কাজে লাগে। রাজা মহেন্দ্র রায় গুণীর পালক ; তাই কবির স্ত্রীর ভরসা তাহার স্বামীর গুণের সমাদর তিনি করিবেন। তাই নিরুপায় কবিকে স্নেহশীলা স্ত্রীর সনির্বন্ধ অনুরোধে একদিন সাজসজ্জা করিয়া রাজসভায় যাইতে হইল। যাইবার পূর্বে দৃশ্যটি অতি সুন্দর, অতি মানবীয়,— কবিজীবনে দুর্লভ দাম্পত্যের পরম আকাঙ্ক্ষিত চিত্র। কবি রাজসভায় উপস্থিত হইয়া তথাকার কৃত্রিমতা, আড়ম্বর, ভেদাভেদ প্রভৃতি দেখিয়া বিস্মিত, মর্মাহত ; এমন ট্রাজেডি তিনি তাঁহার শান্ত সমাহিত নিভৃত জীবনে দেখেন নাই।

মানুষে কেন যে মানুষের প্রতি তাই ভাবি কবি না পায় ফুরতি
ধরি আছে হেন যমের মূরতি, দমি যায় তার বুক।

রাজসভা হইতে 'পাত্র মিত্র অমাত্য আদি, অর্থী প্রার্থী বাদী-প্রতিবাদী' সকলে চলিয়া গেলে 'রাজা দেখে তারে সভাগৃহকোণে বিপন্নমুখছবি।' রাজা পরিচয় শুধাইলে ভীত ত্রস্ত কবি কহিয়া উঠিল, 'আমি কেহ নই আমি শুধু এক কবি।' ইহাই তাহার একমাত্র পরিচয় সে শুধু কবি।

'চলি গেল যবে সভ্যসুজন, মুখোমুখী করি বসিলা দুজন, রাজা বলে 'এবে কাব্যকূজন আরম্ভ কর কবি।'
কবি মহানন্দে কবিতা রচিয়া গেল— কবিজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্তবকগুলির মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

'পুলকিত রাজা, আঁখি ছলছল, আসন ছাড়িয়া নামিয়া ভূতল, দু-বাহু বাড়ায়ে পরাণ উতল কবিরে লইয়া বুকে,
কহিলা, ধন্য, কবি গো, ধন্য, আনন্দে মন সমাচ্ছন্ন, তোমারে কী আমি কহিব অন্য, চিরদিন থাকো সুখে।'

রাজা ভাবিয়া পান না কবিকে কী দিয়া পুরস্কৃত করিবেন, 'যাহা কিছু আছে রাজ ভাণ্ডারে সব দিতে পারি আনি।' কবিও জানে না কী চাহিতে হইবে, তাই শুধু বলিল— 'কণ্ঠ হইতে দেহ মোর গলে ওই ফুল মালাখানি।' 'মালা বাঁধি কেশে কবি' ঘরে ফিরেন ; কোথায় ধন রত্ন আনিতে গিয়াছিল, আনিল একখানি মালা। কবিপত্নী তাহাতেই সুখী ; 'মালাখানি লয়ে আপন গলায় আদরে পরিলা সতী।'

ভক্তি-আবেগে কবি ভাবে মনে চেয়ে সেই প্রেমপূর্ণ বদনে
বাঁধা পোলো এক মাল্য বাঁধনে লক্ষ্মী সরস্বতী।

জাগতিক ব্যাপারে কবিদের কোনো স্থান নাই, তাই তাহারা ভাগ্যবানদের নিকট কৃপার পাত্র, উপহাসের লক্ষ্যস্থল ; এমনকি গ্রীক দার্শনিক প্লাতোন তাঁহার আদর্শ রিপাব্লিক হইতে কবিদের নির্বাসন দিবার পরামর্শ দিয়াছেন, কারণ তাহারা অবাস্তবকে লইয়া আলোচনা করে। কিন্তু জীবনকে অর্থপূর্ণ বা সার্থক করে কিসে, এই প্রশ্নের উত্তর, ও একমাত্র উত্তর হইতেছে 'রস'। রস নিঃশব্দে সঞ্চারিত হইয়া সমস্ত জীবনকে তেজে স্পন্দিত, আনন্দে নিমজ্জিত করে। কবিরা সেই রস পরিবেশন করিয়া দগ্ধ পৃথিবীর উপর শ্যামলিমার শোভা ফুটাইয়া তোলে। বাস্তব জগতে সৌন্দর্যের অভাবে কদর্যতা ও বৈভবের অভাবে দারিদ্র্য মানবজীবনে যেসব বড়ো বড়ো রন্ধ্র সৃষ্টি করে, তাহা একমাত্র কবির সুর ছাড়া আর কিসে ভরিয়া উঠিবে। কবির মনের চরম সাধ কাব্যরসধারা সিঞ্চিয়া ধরিত্রীকে আর একটু অধিক সুন্দর করেন। পৃথিবীর নিকট হইতে কবির একমাত্র যাচ্ঞা— শুধু মনে রেখো ; সে চায় ভালোবাসা, একটি ফুলের মালা, 'ধন নয়, মান নয়, শুধু ভালোবাসা'। তাহার আকাঙ্খা 'আরেকটুখানি নবীন আভায় রঙীন করিয়া দিব।' 'সংসারের মাঝে কয়েকটি সুর, রেখে দিয়ে যাবো করিয়া মধুর দুয়েকটি কাঁটা করি দিব দূর তারপর ছুটি নিব।'

কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ 'জয় পরাজয়' গল্পে কবিজীবনের যে ব্যর্থতার চিত্র আঁকিয়াছিলেন তাহা যে কবির পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শ নহে, তাহাই এই কবিতাটি লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করিলেন। কবির স্থান রাজসভা নহে, রাজা ও রাজপারিষদের চিত্তবিনোদন কবির ধর্ম নহে। অরসিকের নিকট রসের নিবেদনের ন্যায় ট্র্যাজেডি কবিজীবনে আর কিছুই নাই। শেখর কবির জীবন কেন ব্যর্থ হইয়াছিল তাহার উত্তর পাওয়া যায় 'পুরস্কার' কবিতায়। শেখরের মনে রাজসভায় 'জয়ী' হইবার বাসনা ছিল। 'পুরস্কারে'র কবি কিছুই আশা করে নাই, সে অহেতুকী আনন্দে বিভোর হইয়া মিউজের উদ্দেশে গান গাহিয়া গেল, কোনো বাতায়নবাসিনীর উদ্দেশ্যেও নহে, কাহাকে পরাজিত করিবার অভিপ্রায়েও নহে,— 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর' এর ন্যায় অহেতুকী তাহার প্রার্থনা।

সোনার তরীর শেষ পর্ব

আমাদের আলোচ্য পর্বে রবীন্দ্রনাথ উত্তরবঙ্গেই আছেন। নৌকায় চলিতে চলিতে ঘাটের বিচিত্র শোভা চোখে পড়ে; মেয়েদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বিশেষ করিয়া মনকে ভরিয়া তোলে। প্রকৃতিগত তাহাদের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেন পত্রধারায়। ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন, (২৬ শ্রাবণ ১৩০০) "আমি অনেকদিন থেকে ভেবে দেখেছি পুরুষরা কিছু খাপছাড়া আর মেয়েরা বেশ সুসম্পূর্ণ।...পুরুষের চরিত্রের মধ্যে বিস্তর উঁচু নীচু, তারা যে নানাকার্যে নানাশক্তি নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে তৈরি হয়ে এসেছে তাদের অঙ্গে এবং স্বভাবে তার যেন চিহ্ন রয়ে গেছে।...প্রকৃতির সমস্ত সুন্দর জিনিস যেমন সুসম্বদ্ধ সুসম্পূর্ণ সুসংহত সুসংযত মেয়েরাও সেই রকম; তাদের মধ্যে কোনো দ্বিধা কোনো চিন্তা কোনো মন এসে তাদের ছন্দোভঙ্গ করে দিচ্ছে না, কোনো তর্ক এসে তাদের মিল নষ্ট করে দিচ্ছে না।"[১] সেই দিনই 'বিদায় অভিশাপ' কাব্যনাট্যখানি শেষ করিয়াছেন। পুরুষ যদি নিতান্তই খাপছাড়া না হইবে, তবে আদর্শের অজুহাতে যুবতী উপযাচিকার প্রেম প্রত্যাখ্যান করে! মেয়েদের কাছে পুরুষের এই ব্যবহারটা অত্যন্ত অসংগত ও অদ্ভুত! কারণ পুরুষের মধ্যে মন আছে, তর্ক আছে, আদর্শ আছে, কিন্তু কোনো মন নারীর ছন্দোভঙ্গ করে না, আদর্শ লইয়া তর্ক করিয়া তাহার জীবনকাব্যের মিল নষ্ট হয় না।

কিছুকাল পূর্বে লিখিত 'নরনারী' প্রবন্ধে[২] রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির স্তব[৩] করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষকালে ক্ষিতির মুখ দিয়া যে টিপ্পনী প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করেন, তাহা হইতেছে বিচ্ছুর লেজে বিষের মতন, (the sting is at the tail)। সেখানে আমাদের দেশের পুরুষের অকৃতার্থতার জন্য মেয়েকেই দায়ী করা হইয়াছে; তাহাদের অন্ধ সংস্কার, তাহাদের আসক্তি, তাহাদের ঈর্ষ্যা, তাহাদের কৃপণতা দেশের বক্ষে জগদ্দল পাথর চাপাইয়া রাখিয়াছে। ইহার কারণ কেবল অশিক্ষা নহে, অতিমাত্রায় হৃদয়ালুতা (sentimentality)![৪]

'বিদায় অভিশাপ' কাব্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ এই তথ্যটাই তত্ত্বাকারে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পঞ্চভূতের অন্তর্গত কাব্যের তাৎপর্যের মধ্যে ব্যোমের জবানীতে 'বিদায় অভিশাপে'র গল্পাংশ কবি যে ভাবে বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১ ছিন্নপত্র ১৮৯৩ [অগস্ট ১০] ২৬শে শ্রাবণ [১৩০০]

২ সাধনা ১২৯৯ চৈত্র। পঞ্চভূত পৃ ৩৯-৬৩

৩ ছিন্নপত্র। কলিকাতা ২১ জুন ১৮৯৩ [১৩০০ আষাঢ় ৮]

৪ পঞ্চভূত পৃ ৬২-৬৩।

"শুক্রাচার্যের নিকট হইতে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত বৃহস্পতির পুত্র কচকে দেবতারা দৈত্যগুরুর আশ্রমে প্রেরণ করেন। সেখানে কচ সহস্রবর্ষ নৃত্যগীতদ্বারা শুক্রতনয়া দেবযানীর মনোরঞ্জন করিয়া সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করিলেন। অবশেষে যখন বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল তখন দেবযানী তাঁহাকে প্রেম জানাইয়া আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন। দেবযানীর প্রতি অন্তরের আসক্তিসত্ত্বেও কচ নিষেধ না মানিয়া দেবলোকে গমন করিলেন।" বলা বাহুল্য পুরুষ যে বৃহত্তর আদর্শের জন্য, 'শ্রেয়ের জন্য প্রেয়কে ত্যাগ করিতে পারে সেই তত্ত্বটি এখানে সমর্থিত হইয়াছে। দেবযানীর প্রেম নিবেদন ব্যর্থ হইল দেখিয়া সে কচকে অভিশাপ দিল। রবীন্দ্রনাথের এই নারী 'বিসর্জনের' গুণবতীরই ন্যায় হিংস্রী প্রতিহিংসাপরায়ণা (vindictive)। নিজ কামনা সিদ্ধ না হওয়ায় সে হিংস্র মার্জারীর ন্যায় কুশ্রী হইয়া উঠিল। কচ শান্ত, সংযত; তাহার প্রেম এত গভীর যে অভিশপ্ত হইয়াও সে বলিল, 'আমি বর দিনু, দেবি, তুমি সুখী হবে। ভুলে যাবে সর্ব গ্লানি বিপুল গৌরবে'। 'কাব্যের তাৎপর্যে' রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যনাট্যটি সম্বন্ধে বহুবিস্তারে নানা দিক হইতে আলোচনা করিয়াছেন, কুতূহলী পাঠক সেটি পাঠ করিতে পারেন।

ইতিপূর্বে 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্যে কবি নারীকেই আদর্শস্থানীয়রূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন; 'বিদায় অভিশাপে' পুরুষকে সেই শ্লাঘার স্থান দান করিলেন। নারীর সৌন্দর্য— সুসম্পূর্ণতায়; চিত্রাঙ্গদার চরিত্রে তাহা সফল হইয়াছে। আর পুরুষের সৌন্দর্য— বলিষ্ঠ কর্তব্যপরায়ণতায়; কচের চরিত্রে তাহা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

কালীগ্রাম হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন ভাদ্রের গোড়ায়, সম্পূর্ণ নূতন পরিস্থিতির মধ্যে। কলিকাতায় তখন শিক্ষিতমহলে রাজনীতি লইয়া প্রচণ্ড আলোচনা চলিতেছে। তিন বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ 'মন্ত্রী অভিষেক' (১২৯৭ জ্যৈষ্ঠ) নামে যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি সাহিত্যিক বা রাজনৈতিক কাহারও মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। তাই আজ রাজনীতির মধ্যে নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইয়া সকলেই যুবক কবির দিকে তাকাইলেন। চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদক গৌরহরি সেনের অবিশ্রাম উত্তেজনায় রবীন্দ্রনাথকে অবশেষে রাজনীতি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। এবার বক্তৃতার বিষয় 'ইংরেজ ও ভারতবাসী'। চৈতন্য লাইব্রেরিতে সভা,—সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্র। 'রাজনীতি'র সমালোচনা বলিয়া বঙ্কিমকে প্রবন্ধটি পূর্বাহ্নে 'শোনাতে হয়েছিল'। পূর্বাহ্নে শোনাইবার কারণ অনুমান করা যায়, যুবক রবীন্দ্রনাথের রাজনীতির সমালোচনা সিডিশনের পর্যায়ে পড়ে কিনা তাহা জানা দরকার। এ ছাড়া যিনি কয়েকদিন পরেই সভাপতি হইবেন, তাঁহার পক্ষে সে-প্রবন্ধ পূর্বাহ্নে শুনিবার আর কোনো সংগত কারণ থাকিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথও তাঁহাকে শুনাইয়া নিরুদ্বেগ হইয়াছিলেন।[১]

কলিকাতায় প্রবন্ধ পড়িবার পর রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি স্থান ভ্রমণ করেন, তার একটি হইতেছে কর্মাটার, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রিয় বিশ্রামভূমি। কর্মাটার হইতে আশ্বিনের গোড়ার দিকে কলিকাতায় ফেরেন— প্রমথ চৌধুরী বিলাত যাইতেছেন ব্যারিস্টারি পড়িতে (১৮৯৩ অক্টোবর)।

২৬ কার্তিক হইতে ২৭ অগ্রহায়ণের মধ্যে কবিকে সোনার তরীর শেষ কয়টি কবিতা লিখিতে দেখি। অগ্রহায়ণ মাসে বোধ হয় মেজদাদার কাছে সিমলায় কয়েকদিনের জন্য যান; উডফীল্ড[২] অবস্থান কালে ঐ কয়েকটি কবিতা লেখেন বলিয়া আমাদের মনে হয়।

১ "তাহার পরে সেদিন তিনি আমার প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া সমাদর সহকারে আমার বক্তৃতার স্থলে সভাপতি হইতে স্বীকার করিলেন।" বঙ্কিমচন্দ্র, সাধনা ১৩০০ বৈশাখ। র-র ৯ম পৃ ৫৫৬। দ্র. চিঠিপত্র ৫ম ভাগ পৃ ১৬২

২ দ্র. অচল স্মৃতি, Woodfield সিমলা। ১১ অগ্রহায়ণ ১৩০০ সোনার তরী। ভারতী ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ পৃ ১৭০। খেয়াল খাতা হইতে উদ্ধৃত পত্র-কবিতা 'সৃষ্টি প্রলয়ের তত্ত্ব' মুদ্রিত হয়। বনক্ষেত্রে [Woodfield] শিমলা শৈল। শনিবার ১৮৯৮। আমাদের মনে হয় সনটি ১৮৯৩ হইবে। পুরবীতে (১মসং) (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫) করা হইয়াছিল।

কবিতার কথাই যখন বলিতেছি তখন সেই আলোচনাটা শেষ করিয়াই তাঁহার গদ্য রচনার কথা পাড়া যাইবে। ঐতিহাসিক অনুক্রমণতা একটুখানি মুলতুবি থাকিল। 'পুরস্কার' কবিতায় তিনি বলিয়াছিলেন যে পৃথিবীর সৌন্দর্যে 'আর একটু সুন্দরতা' দান করিবেন; সেই কথাটি মনের মধ্যে আকাঙ্খার বিষয় হইয়া রহিয়াছে, সেই অনুভূতিকে ব্যাপক করিয়া প্রকাশ করিলেন 'বসুন্ধরা'য় (২৬ কার্তিক ১৩০০)।

ধরিত্রী তাঁহার প্রিয়; বহুভাবে তাঁহার সেই ভালোবাসার কথা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু কেমনভাবে পাইলে কবির আধ্যাত্মিক তৃপ্তি হইবে, তাহা যেন প্রকাশের ভাষা পাইতেছে না। জড়ে জীবে, দিকে বিদিকে, সাগরে জঙ্গমে, অতীতে ভবিষ্যতে, সুখে দুঃখে, সভ্যতায় বর্বরতায় সকল ভাবে, সকল রসে, সকল দেশে, সকল কালে, সকল দেশ কালের বাহিরে— অণুতে, পরমাণুতে নিজকে সম্প্রসারিত করিয়া— সকল রূপরস অনুভব ও সম্ভোগ করিয়াও যেন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা হইল না। সে কী বেদনা। একবার বলিলেন, "ওগো মা মৃন্ময়ি তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই।" যথেষ্ট বলা হইল না; পুনরায় বলিতেছেন— 'দিগ্বিদিকে আপনাকে দিই বিস্তারিয়া বসন্তের আনন্দের মতো', এখনো যথেষ্ট হইল না, তাই পুনরায় বলিতেছেন— 'বিদারিয়া এবক্ষ পঞ্জর, টুটিয়া পাষাণবন্ধ সংকীর্ণ প্রাচীর আপনার নিরানন্দ অন্ধকারাগারে,— হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া, কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া বিচ্ছুরিয়া, শিহরিয়া, সচকিয়া, আলোকে পুলকে প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে প্রান্ত হতে প্রান্তভাগে ;" মনের এই সর্বগ্রাসী আকুলতায় বলিতেছেন—

হে সুন্দরী বসুন্ধরা, তোমা পানে চেয়ে
কতবার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাসভরে···আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের; তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনী দিন
যুগযুগান্তর ধরি, আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুল ফল গন্ধরেণু···"

এই রচনার মধ্যে বিশ্বানুভূতি যেন কাব্যে রূপ পাইয়াছে। অন্তরের দীর্ঘ আকুতির শেষ নিবেদন হইল—

জননী লহ গো মোরে
সঘনবন্ধন তব বাহুযুগে ধ'রে
আমারে করিয়া লহ তোমার বুকের
তোমার বিপুল প্রাণ বিচিত্র সুখের
উৎস উঠিতেছে যেথা, সে গোপন পুরে
আমারে লইয়া যাও— রাখিয়ো না দূরে।

কবির এই আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা এখনো প্রার্থনা ও আবেদন স্তরে রহিয়াছে,— যেমন তাঁহার সমসাময়িক ব্রহ্ম-সংগীতগুলি— ইহা এখনো গভীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মহারা হয় নাই। এখন তিনি দরদী বটে, মরমী নহেন। বসুন্ধরা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতারাজির অন্যতম; 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় একদিন যেমন তরুণ হৃদয়ে বিশ্ব আসিয়া কোলাকুলি করিয়াছিল, আজ বসুন্ধরার দিকে তাকাইয়া সবল যৌবন হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বের সৌন্দর্যকে নূতন কাব্যীয় আনন্দে কবি উপলব্ধি করিতেছেন। বসুন্ধরার পর যে আটটি চতুর্দশপদী কবিতা আছে, তাহারা একই কবিতার যেন আটটি স্তবক,— বসুন্ধরা কবিতারই পরিপূরক। বসুন্ধরায় যে কথাগুলি বলা হয় নাই, তাহাই যেন এগুলির মধ্যে বলা হইয়াছে। বসুন্ধরা তাঁহার নিকট অত্যন্ত সত্য, নিবিড়ভাবে প্রাণময়, তাহাকে মায়া বলিয়া স্বীকার করিতে তিনি অক্ষম। মায়াবাদীকে বলিতেছেন,—

ভাবিতেছ মনে
ঈশ্বরের প্রবঞ্চনা পড়িয়াছে ধরা
সুচতুর সূক্ষ্মদৃষ্টি তোমার নয়নে।···
তুমি বৃদ্ধ কিছুরেই কর না বিশ্বাস।
লক্ষ্যকোটি জীব লয়ে এ বিশ্বের মেলা
তুমি জানিতেছ মনে সব ছেলেখেলা। (মায়াবাদ)

'হোক্ খেলা, এ খেলায় যোগ দিতে হবে।'
'বিনয়ে বিশ্বাসে প্রেমে হাতে লহ তুলি'
বর্ণগন্ধগীতময় যে মহা খেলনা
তোমারে দিয়েছে মাতা ; হয় যদি ধূলি
হোক্ ধূলি, এ ধূলির কোথায় তুলনা ! (খেলা)

অকালবৃদ্ধেরা বলেন, জগৎ মায়া, সংসার ছেলেখেলা, চারিদিকে বন্ধন। কিন্তু কবি জগতের এই বন্ধনকে স্বীকার করিতেছেন, 'সকলি বন্ধন স্নেহ প্রেম সুখতৃষ্ণা', কিন্তু 'মাতৃপাশ ছিন্ন করিবারে চাস্ কোন মুক্তিভ্রমে।" (বন্ধন) জীবনের এই গতিকে কবি মানেন,

তাই পণ্ডিতের দ্বারে
চাহি না এ জনম রহস্য জানিবারে।
চাহি না ছিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর,
লক্ষকোটি প্রাণী সাথে এক গতি মোর। (গতি)

সুন্দরী বসুন্ধরাকে নিবিড়ভাবে পাইবার জন্য কবির ঐ আত্মহারা আকুতি ; তিনি 'চক্ষু কর্ণ বুদ্ধি মন সব রুদ্ধ করি, মুক্তি আশে' কোথায় যাইবেন ?

বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
আমি একা বসে রব মুক্তি-সমাধিতে।

তাই অক্ষমা, দরিদ্রা ধরিত্রীর মধ্যে তাহারই ধূলার সঙ্গে মিশিয়া থাকিতে চান— 'তা বলে কি ছেড়ে যাবো তোর তপ্ত বুক'। (অক্ষমা) তাই ধরিত্রীর কোলে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিলেন—

তোমার আনন্দগানে আমি দিব সুর
যাহা জানি দুয়েকটি প্রীতি-সুমধুর
অন্তরের গাথা ; ... ...
চেয়ে তোর স্নিগ্ধশ্যাম মাতৃমুখ পানে
ভালোবাসিয়াছি আমি ধূলিমাটি তোর।
জন্মেছি যে মর্ত-কোলে ঘৃণা করি তা'রে
ছুটিব না স্বর্গে আর মুক্তি খুঁজিবারে।

'পুরস্কার' কবিতায় ধরার প্রতি কবির প্রেমের যে সুর রাজসভাগৃহে শুনাইয়াছিলেন, 'বসুন্ধরায়' যাহা অনুভূতির চরম আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা যেন চক্রপূর্ণ করিয়া শেষ কবিতায় 'আত্মসমর্পণ' করিল। এই ভাবধারা চৈতালির পূর্বাভাস, নৈবেদ্যের পূর্বরাগ, পরিপূর্ণ জীবন রসসম্ভোগের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। কিন্তু এত বড়ো বসুন্ধরার এত বৈচিত্র্য, এত সৌন্দর্যের মধ্যে কোথায় একটি 'ক্ষুদ্র আমি' আছে কণ্টকের মতো —

'কিছুই করি না, নীরবে দাঁড়ায়ে তুলিয়া শির বিঁধিয়া রয়েছি অন্তর মাঝে এ পৃথিবীর।

পৃথিবীর সমস্ত বৃহত্ত্ব ও মহত্ত্ব ম্লান হইয়া যায়, সকল বর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়, সকল গন্ধ লোপ পায়, সকল রস বিস্বাদ হয়— এই ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র অহং-এর কাছে। সেই 'ক্ষুদ্র আমি' গর্ব করিয়া বলে—

'হই না ক্ষুদ্র, তবুও রুদ্র ভীষণ ভয়, আমার দৈন্য সে মোর সৈন্য তাহারি জয়।'

কবি অন্তরের গভীরের দিকে তাকাইয়া সেই 'অহং'কে দেখিতে পান ; তাহার দম্ভ, তাহার স্পর্ধাকে কিছুতেই যেন পরাজিত করিতে পারিতেছেন না, সে যেন সমস্ত সৌন্দর্য, সকল আদর্শকে ধ্বংস করিবার জন্য নিত্য প্রয়াসী।

'সোনার তরী'র শেষ কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। শ্যাম ধরণীর নিকট সম্পূর্ণভাবে 'আত্মসমর্পণ' করিয়া এখনো কবির সব কথা যেন বলা হয় নাই ; 'মনে হয় কী একটি শেষ কথা আছে।' মানস-সুন্দরী তাঁহাকে আলেয়ার ন্যায় দূর হইতে দূরে আহ্বান করিয়া চলিয়াছে, কবি তাহাকে ইন্দ্রিয়ের কোনো অনুভূতির মধ্যে আনিতে পারিতেছেন না ! তাই যেন তাহাকে প্রশ্ন করিতেছেন—

আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরি ? বলো কোন্ পারে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী ?

সে ইঙ্গিত করিয়া সম্মুখে চাইয়া চলিয়াছে :—"হাসিতেছ তুমি তুলিয়া নয়ন, কথা না ব'লে !" আমাদের জীবনের দিনগুলি এমনিভাবে চলিতেছে নিরুদ্দেশের যাত্রায় ; কাহার আহ্বানে কিসের আশায় রাত্রিদিন কর্মক্লান্ত চলিয়াছি

জানি না। প্রতিদিনের সোনার ধানের কর্মবোঝা সোনার তরীতে তুলিয়া মহাকাল চলিয়া যায়; মানুষ বিস্মৃতির তীরে পড়িয়া থাকে, জালে-ওঠা ধনরত্ন পথিকরা লইয়া যায়; সেই রহে অনাদৃত, বিস্মৃত, উপেক্ষিত। মানুষ কাহাকে যেন অধীর হইয়া ডাকিয়া শুধায় —

কোথা আছ ওগো করহ পরশ নিকটে আসি' কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না নীরব হাসি।

এইদিক হইতে দেখিতে গেলে, জীবন ট্রাজেডি। এ যেন চিত্রা কাব্যগ্রন্থের 'সিন্ধুপারে'র অবগুণ্ঠিতার পূর্বাভাস।

'সোনার তরী' ১২৯৮ ফাল্গুনমাস হইতে ১৩০০ অগ্রহায়ণ পর্যন্ত রচিত কবিতার সংগ্রহ। দুই বৎসর কালের মধ্যে রচিত হইলেও কবিতাগুলির মধ্যে ভাবের যে আত্মীয়তা আছে, তাহা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ও তাঁহার সাহিত্য সমালোচকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন। বৃদ্ধবয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই কাব্যখণ্ড সম্বন্ধে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা রচনাবলীর (৩য়) অন্তর্গত হইয়াছে।

মানসী কাব্যগুচ্ছের সহিত তুলনা করিয়া কবি বলেন যে সোনার তরীর লেখা আর-এক পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। "বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্বে। শুধু তাই নয়, পরিচয়ে অপরিচয়ে মেলামেশা করেছিল মনের মধ্যে। বাংলাদেশকে তো বলতে পারি না বেগানা দেশ; তার ভাষা চিনি, তার সুর চিনি। ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মর্মের অন্দরমহলে আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে; যে উদ্বোধন এনেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোটো গল্পের নিরন্তর ধারায়। সে-ধারা আজও থামত না যদি সেই উৎসের তীরে থেকে যেতুম, যদি না টেনে আনত বীরভূমের শুষ্ক প্রান্তরের কৃচ্ছ্রসাধনের ক্ষেত্রে।

"আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানি নি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি— বৈশাখের খররৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারাবর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জনসজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁচচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি— সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয় নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা, বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা। এই সময়কার প্রথম কাব্যের ফসল ভরা হয়েছিল 'সোনার তরী'তে। তখনই সংশয় প্রকাশ করেছি, এ তরী নিঃশেষে আমার ফসল তুলে নেবে কিন্তু আমাকে নেবে কি।"

'সোনার তরী' শেষ কবিতা রচিত হয় অগ্রহায়ণে (১৩০০ সালে); গ্রন্থ প্রকাশিত হয় মাঘমাসে। "কবিভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের করকমলে তদীয় ভক্তের এই প্রীতি-উপহার সাদরে সমর্পিত হইল।"

কবি দেবেন্দ্রনাথ আজ বাঙালী পাঠকের নিকট হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছেন, তরুণদের নিকট প্রায় অপরিচিত; কিন্তু এককালে লিরিক-কবি হিসাবে সুযশ অর্জন করেন ও রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। দেবেন্দ্রনাথের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের সূত্রপাত হয় গাজিপুরে। দেবেন্দ্রনাথের পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ

সেনের গাজিপুরে তুলা ও চিনির বিস্তৃত কারবার ছিল। দেবেন্দ্রনাথ[১] ওকালতী পাশ করিয়া গাজিপুরে আইন ব্যবসায় করিতে যান। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সেইখানেই বোধ হয় তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয়।

'সোনার তরী'র যুগটা (১২৯৮ অগ্র ১৩০০ অগ্র) 'সাধনা' পত্রিকার প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের প্রায় সমকালীন। এ যুগে ৪৪।৪৫টি কবিতা লেখেন, গানও রচেন অনেকগুলি, তা ছাড়া কাব্যনাট্য' বিদায় অভিশাপ' এই সময়েরই রচনা। তবে কবিতা অপেক্ষা গদ্য রচনার বৈচিত্র্য সংখ্যা ও পরিমাণ বেশি। গদ্যের দুইটি ভাগ— কথা ও প্রবন্ধ। কথা সাহিত্যের বিশেষ সৃষ্টি হইতেছে ছোটোগল্প, নাটক বা নাটিকা। গত দুই বৎসরের মধ্যে ২২টি ছোটোগল্প লেখেন— এগুলি বাংলাসাহিত্যে নূতন আদর্শ সৃষ্টি করে। এ ছাড়া গদ্য রসরচনার জন্য এ পর্বটি খ্যাত; ১২৯৯ ভাদ্র মাসে 'গোড়ায় গলদ' প্রকাশিত হয়। তাছাড়া 'ব্যঙ্গ কৌতুকে' সন্নিবিষ্ট 'পয়সার লাঞ্ছনা' (সাধনা ১৩০০ জ্যৈষ্ঠ), 'প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ' (আষাঢ়) ও 'বিনিপয়সায় ভোজ' (পৌষ) রসরচনার নিদর্শন। এই রচনাগুলির অনাবিল হাস্যরস স্বতঃউৎসারিত; কোথাও কোনো অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, অপ্রিয় শ্লেষ বা ব্যঙ্গ নাট্যের বা অন্য রচনা কয়টির হাস্যমুখর গতিকে প্রতিহত করে নাই। এই রচনাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'বিনিপয়সায় ভোজ'। সম্পূর্ণ নূতন ধরনে রসসৃষ্টির প্রয়াস।

'বিনিপয়সায় ভোজ" রচনার নমুনা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"কী ক'রেচি বলো দেখি ? জীবনবাবুর নাম সই ক'রে হ্যামিল্টনের দোকান থেকে ঘড়ি এনেচি ? পেয়াদা সাহেব, ভদ্রলোক হয়ে ভদ্রলোকের নামে ফস্ করে এতবড়ো অপবাদটা দিলে ?

ও কী ও! ওটা ধরে টেনো না! ও আমার ঘড়ি নয়! শেষকালে যদি চেন্‌মেন্ ছিঁড়ে যায় তাহলে আবার মুস্কিলে পড়তে হবে।

কী! এই সেই হ্যামিল্টনের ঘড়ি! ও বাবা সত্যি নাকি! তা নিয়ে যাও এখনি নিয়ে যাও! কিন্তু ঘড়ির সঙ্গে আমাকে সুদ্ধ টানো কেন?...তা নিতান্তই যদি না ছাড়তে পারো তো চলো। বাবা, আমাকে সবাই ভালোবাসে, আজ তা'র বিস্তর পরিচয় পেয়েচি, এখন তোমার ম্যাজিস্ট্রেটের ভালোবাসা কোনোমতে এড়াতে পারলে এ যাত্রা রক্ষে পাই। যদি জোটে রোজ এমনি বিনিপয়সার ভোজ।"

'বিনাপয়সায় ভোজ' একক-নাট্য বা monologue। এই শ্রেণীর রচনায় বক্তা থাকেন একজন, শ্রোতার উপস্থিতি কল্পিত; তাহার কথাবার্তা অশ্রুত, অথচ বক্তা যেন শুনিয়াছে। অন্যান্য ব্যক্তিরা অদৃশ্য, অথচ যেন বক্তা দেখিতেছে কল্পনা করিয়া তিনি অভিনয় করিতেছেন। এ যেন টেলিফোনের একদিকের কথা শুনিয়া কথোপকথন বুঝা। এই একক-নাট্য রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যের অন্যতম সৃষ্টি বলিয়া সর্ববাদীসম্মত। পঠনীয় রচনা হিসাবে ইহা অতুলনীয়। পরে 'নূতন অবতার' নামে এই ধরনের আর একটি একক-নাট্য লেখেন; কিন্তু সেখানে দুইটি অংশে দুইজন পৃথক ব্যক্তির স্বগত কথোপকথন আছে। তাছাড়া রচনাটি বিদ্রূপ-ব্যঙ্গে জর্জরিত বলিয়া 'বিনিপয়সায় ভোজে'র সহিত তাহার রচনাকৌশলের তুলনাই হয় না।

গদ্যপ্রবন্ধ খুব বেশি নাই; 'শিক্ষার হেরফের' সুপরিচিত। সাধনা পত্রিকার জন্য 'প্রসঙ্গ কথা', সাময়িক সার-সংগ্রহ প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক রচনাগুলিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্থায়ী গদ্য সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। এইসব

১ দেবেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল পরে একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে শোকক্রান্ত হইয়া আইন ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন। তৎপরে কিছুকাল গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীরূপে ভারতের নানা স্থানে পর্যটন করেন। তিনি 'শ্রীকৃষ্ণ মিশন' নামে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। পরে 'শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দীর্ঘকাল পরিচালনা করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ অশোকগুচ্ছ, গোলাপগুচ্ছ (১৯১২) শেফালীগুচ্ছ, অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা, পারিজাতগুচ্ছ (১৯১২) ফুলবালা, উর্ম্মিলা, অপূর্ব শিশুমঙ্গল প্রভৃতি। পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে ১৯২০ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রচনাকে আমরা সাহিত্যসৃষ্টির নিদর্শনরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। যথার্থ সাহিত্যের দিক দিয়া বিচার্য রচনা হইতেছে 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' এবং 'পঞ্চভূতের ডায়ারি'। এই 'পঞ্চভূত' গ্রন্থখানিতে যে ষোলোটি প্রবন্ধ আছে, তাহার প্রথম আটটিই এই পর্বের দ্বিতীয় বর্ষে এবং অবশিষ্টগুলি একবৎসর পরে পুনরায় প্রকাশিত হয়। পঞ্চভূত গ্রন্থাকারে ১৩০৪ সালে মুদ্রিত হয়।

'সোনার তরী'র পর্বের শেষদিকে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে রাজনীতির সমালোচনার মধ্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার কথা এই পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে। এই পর্বের অন্তে ১৩০০ সালের কার্তিক মাস হইতে ১৩০১ সালের মাঘ মাসের মধ্যে রচিত সাতটি প্রবন্ধ রাজনীতির সমালোচনাপূর্ণ। আমরা যথাস্থানে এই কয়টি প্রবন্ধের আলোচনা পৃথক্‌ভাবেই গ্রহণ করিব।

চিত্রা

১৩০০ সনের অগ্রহায়ণ মাসটা শিমলা শৈলে মেজদাদাদের সঙ্গে কাটাইয়া বোধ হয় পৌষের গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। এবার শান্তিনিকেতনের পৌষ-উৎসবে তাঁহাকে উপস্থিত হইতে দেখি, গত বৎসর পদ্মায় ছিলেন মানসসুন্দরীর রূপকল্পনায় মুগ্ধ। শান্তিনিকেতনের প্রাতের উপাসনায় তিনি ও হেমেন্দ্রনাথের পুত্র হিতেন্দ্রনাথ "মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত করিয়া উৎসবকে মধুময় করিয়া তুলিয়া ছিলেন।"[১]

কলিকাতায় এখন কবি ব্যস্ত 'সোনার তরী' প্রকাশের জন্য। এছাড়া তাঁহার ছোটোগল্পগুলি সংগৃহীত হইয়া মুদ্রিত হইতেছে। মাঘোৎসবের জন্য নূতন গান রচনার প্রেরণা কম, মাত্র চারিটি গান লিখিলেন।[২] সামাজিক কর্তব্যবোধে গীত রচনার উৎসাহ ক্রমশই ম্লান হইয়া আসিতেছে, নিজের সৃষ্টিআনন্দে এখন কাব্য উৎসারিত হয় যদিও তাহার সংখ্যা কম। সংখ্যায় কম বলিয়াই বোধ হয় রচনাশিল্পে তাহারা নিখুঁত, রবীন্দ্রকাব্য-সাহিত্যের সেরা রচনা বলিয়া সেগুলি স্বীকৃত ও সমাদৃত। সোনার তরীর শেষ কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' (২৭ অগ্র ১৩০০) লেখার কিঞ্চিদধিক মাসকালের ব্যবধানে 'জ্যোৎস্নারাত্রে' (৬ মাঘ) যে কবিতারাজির সূত্রপাত হইল সেগুলি সাহিত্যে 'চিত্রা' নামে পরিচিত। এই কাব্যগুচ্ছে দুই বৎসরের কবিতা সংগৃহীত, (২০ ফাল্গুন ১৩০২ পর্যন্ত) সাধনার শেষ দুই বৎসরের সমকালীন রচনা। এই পর্বের মধ্যে 'বিচিত্র গল্প'[৩] (১ম ও ২য় ভাগ), 'কথা চতুষ্টয়' এবং 'নদী' কবিতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।[৪]

জীবনে সাধনা দুইভাবে হইতে পারে, বিচিত্রের ও বিশেষের। আধ্যাত্মিক ধর্মসাধকরা বিশেষের মধ্য দিয়া আত্মানুভূতিলাভ করিতে চেষ্টা করেন; তাঁহারা বিচিত্রকে, দৃশ্যমান জগতের রূপকে অস্বীকার করিতে পারিলেই যেন বাঁচেন। কিন্তু কবি বিচিত্রের সাধক; রূপরসগন্ধময়ী ধরিত্রীর বৈচিত্র্যের পূজারী তিনি। সৌন্দর্যকে তিনি কাব্যে কলায়

১ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮১৫ শক (১৩০০) মাঘ, পৃ ১৮৪-৮৫। তৃতীয় বার্ষিক ব্রহ্মোৎসবে (৬৪ ব্রাহ্মসম্বৎ) ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় আচার্যাদির কার্য করেন।

২ মাঘোৎসবে নূতন গান— ১ এ ভবন পুণ্য প্রভাবে কর পবিত্র, [এসো হে গৃহ দেবতা], ২ হৃদয় নন্দন বনে নিভৃত এ নিকেতনে, ৩ আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে, ৪ অন্তরে জাগিছে অন্তর্যামী। ত-বো-প ১৮১৫ শক ফাল্গুন, পৃ ২১৯।

৩ বিচিত্র গল্প ১ম ভাগে অসম্ভব কথা, কঙ্কাল, স্বর্ণমৃগ, ত্যাগ, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, জয়পরাজয়, সম্পত্তি সমর্পণ। ২য় ভাগে, দালিয়া জীবিত ও মৃত, মুক্তির উপায়, সুভা, অনধিকার প্রবেশ, মহামায়া, একটা আষাঢ়ে গল্প, একটি ক্ষুদ্র ও পুরাতন গল্প। [১৩০১]

৪ কথা-চতুষ্টয়— মধ্যবর্তিনী, শাস্তি, সমাপ্তি, মেঘ ও রৌদ্র ১৩০১। [১৮৯৪ অক্টোবর ৫]

কেবল স্বীকার করিয়া পরিতৃপ্ত হন নাই, তাহা সর্বতোভাবে সম্ভোগের দ্বারা জীবনে পাইয়াছেন। তিনি জীবনশিল্পী। রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রের সাধক, কিন্তু তাঁহার কাছে বিচিত্র বিচ্ছিন্ন বিশ্লিষ্ট নহে, তাহা বিশ্বপ্রাণের অন্তর্ভুক্ত, বিশ্বাত্মার অন্তর্গত, সমগ্রভাবে সংশ্লিষ্ট,— বস্তুহিসাবে বিচ্ছিন্ন থাকিয়াও সমন্বিত। চিত্রা কাব্যে কবি সেই বিচিত্রের পদে পূজাঅর্ঘ্য সমর্পণ করিয়াছেন 'জ্যোৎস্না রাত্রে'।

হেরো আজি নিদ্রিতা মেদিনী,
ঘরে ঘরে রুদ্ধ বাতায়ন। আমি একা
আছি জেগে তুমি একাকিনী দেহ দেখা
এই বিশ্বসুপ্তিমাঝে, অসীম সুন্দর
ত্রিলোকনন্দনমূর্তি। আমি যে কাতর
অনন্ত তৃষ্ণায়, আমি নিত্য নিদ্রাহীন,
সদা উৎকণ্ঠিত, আমি চিররাত্রিদিন
আনিতেছি অর্ঘ্যভার অন্তর মন্দিরে
অজ্ঞাত দেবতা লাগি,—বাসনার তীরে
একা বসে পড়িতেছি কত যে প্রতিমা
আপন হৃদয় ভেঙে, নাহি তার সীমা।
আজি মোরে করো দয়া, এসো তুমি, অয়ি,
অপার রহস্য তব, হে রহস্যময়ী,
খুলে ফেলো,— আজি ছিন্ন করে ফেলো ওই
চিরস্থির আচ্ছাদন অনন্ত অম্বর।

জ্যোৎস্না রাত্রে 'যে দিব্য মুরতি'র জন্য 'উৎসুক উন্মুখ চিত্ত', 'একরাত্রি তরে' অমর করিয়া দিবার জন্য যাহার কাছে প্রার্থনা, সেই 'বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্ময়ী বালা আমি কবি তারি তরে আনিয়াছি মালা'।

সৌন্দর্যলক্ষ্মী সেই মালা গ্রহণ করিয়াছেন; শুধু গ্রহণ করেন নাই 'প্রেমের অভিষেক' দ্বারা কবিকে করেছে সম্রাট, পরায়েছে গৌরব মুকুট, পুষ্পডোরে সাজায়েছে কণ্ঠ তার। নিষ্ঠুর রূঢ় জগতের অন্তরস্থল দিয়া প্রেমফল্গু প্রবাহিত; প্রেমই মানুষকে বরণ করে মহানরূপে সুন্দররূপে— সকল দীনতা সকল হীনতা ভুলিয়া গিয়া তাহার শাশ্বত প্রেমিক মূর্তির কাছে সে আত্মনিবেদন করে।

প্রেমের অমরাবতী,··· সেথা আমি জ্যোতিষ্মান্
অক্ষয় যৌবনময় দেবতাসমান,
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা,
সেথা মোরে অর্পিয়াছে আপন মহিমা
নিখিল প্রণয়ী ;···চির-সুহৃদ সমান
সর্ব চরাচর।

'প্রেমের অভিষেক' কবিতাটি সম্বন্ধে কিছু কিছু বিচার বিতর্ক হইয়াছে। 'সাধনা'য় যখন উহা প্রথম প্রকাশিত হয় তখন উহার মধ্যে কেরানীর ধূলিমাখা জীবনের কথা ছিল। কবিবন্ধু লোকেন পালিত তজ্জন্য কবিকে অত্যন্ত ধিক্কার দেন। কিন্তু মূল কবিতাটি সেভাবে রচিত হয় নাই, সাধনায় প্রকাশকালে তাহাকে বাস্তবমূর্তি দিবার ইচ্ছায় কেরানীজীবনের অবতারণা করিয়া কবিতাটিকে নষ্ট করেন। যাহাই হউক প্রচলিত 'চিত্রা'র মধ্যে মূল সুন্দর পাঠটি আছে, সাধনার পাঠ পরিত্যক্ত হইয়াছে।[১]

১ "তাঁহারা বলেন, কোনও আপিস বিশেষের কেরানী বিশেষের সহিত জড়িত না করিয়া সাধারণভাবে, আত্মহৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস সহকারে ব্যক্ত করিলে প্রেমের মহিমা ঢের বেশি সরল উজ্জ্বল উদার এবং বিশুদ্ধভাবে দেখানো হয়— সাহেবের দ্বারা অপমানিত অভিমান-ক্ষুণ্ণ নিরুপায় কেরানীর মুখে এ কথাগুলো যেন কিছু অধিকমাত্রায় আড়ম্বর ও আস্ফালনের মত শুনায় উহার সহজ স্বত প্রবাহিত সর্ববিস্মৃত কবিত্ব রসটি থাকে না— মনে হয় সে মুখে যতই বড়াই করুক না কেন আপনার ক্ষুদ্রতা এবং অপমান কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না। এই সমস্ত আলোচনাদি শুনিয়া আমি গোড়ায় যেভাবে লিখিয়াছিলাম, সেইভাবেই (চিত্রায়] প্রকাশ করিয়াছি।" ব্যারিস্টার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র শিলাইদহ ৬ চৈত্র ১৩০২ দ্র প্রবাসী ১৩৪৯ বৈশাখ।

ফাল্গুনের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ পতিসর গিয়াছেন। "যে পারে বোট লাগিয়েছি এ পারে খুব নির্জন। গ্রাম নেই বসতি নেই চষা মাঠ ধূ ধূ করচে।" নদীর ধারে তাঁহাদের দুইটা হাতি চরে; তাহাদের দেখিয়া লিখিতেছেন 'এর এই প্রকাণ্ডত্ব এবং বিশ্রীত্বর জন্যেই যেন এর প্রতি একটা কি বিশেষ স্নেহের উদ্রেক হয়।' ঘরের ভিতর বেঠোভেনের ছবির কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, "অনেক সুন্দর মুখের সঙ্গে তুলনা করলে তাকে দর্শনযোগ্য মনে না হতে পারে, কিন্তু আমি যখন তার দিকে চাই সে আমাকে খুব টেনে নিয়ে যায়— ঐ উস্কোখুস্কো মাথাটার ভিতরে কত বড়ো একটা শব্দহীন শব্দজগৎ! এবং কী একটা বেদনাময় অশান্ত ক্লিষ্ট প্রতিভা, রুদ্ধ ঝড়ের মতো ঐ লোকটার ভিতরে ঘূর্ণ্যমান হতো।"[১] এই দুইটি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বিষয় by contrast যুগপৎ মনে উদয় হওয়ার মধ্যে মনস্তত্ত্বের যোগসূত্র আছে।

ইহার পরদিন (১৩০০ ফাল্গুন ৯) লিখিলেন 'সন্ধ্যা' কবিতাটি; নির্জন পারিপার্শ্বিকের শুব্ধ সন্ধ্যা কবিচিত্তে বিচিত্র সুর ধ্বনিয়া তুলিতেছে। কবিতাটির মধ্যে একটি 'বিষাদের মহাশান্তি' 'অন্তরের যত কথা শান্ত' হইয়া 'মর্মান্তিক নীরবতা'য় আত্মপ্রকাশ করে। বসুন্ধরা সম্বন্ধে নূতন অনুভূতি— "যেন মনে পড়ে সেই বাল্য নীহারিকা, তারপরে প্রজ্বলন্ত যৌবনের শিখা, তারপরে স্নিগ্ধশ্যাম অন্নপূর্ণালয়ে জীবধাত্রী জননীর কাজ, বক্ষে লয়ে লক্ষ কোটি জীব— কত দুঃখ, কত ক্লেশ, কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু, নাহি তার শেষ।" আমাদের এই জীবনের অর্থহীন "নিরুদ্দেশ যাত্রা"য় যে-প্রশ্ন বার বার উঠে, "আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরি," এখানেও নিঃসঙ্গিনী ধরণীর বিশাল অন্তর হতে তেমনি আজ নিরব সন্ধ্যায় 'উঠে সুগম্ভীর একটি ব্যথিত প্রশ্ন'—'আরো কোথা, আরো কত দূর।'

নদী পথে পথে আসিয়া পৌছাইলেন রাজসাহী, সেখানে তাঁহার বন্ধু লোকেন পালিত আছেন। এইখানে লিখিলেন, তাঁহার অমর কবিতা 'এবার ফিরাও মোরে' (২৩ ফাল্গুন ১৩০০)। 'চিত্রা'র পাঠকমাত্রই লক্ষ্য করিবেন যে এই কবিতার সুর, ছন্দ, ভাব হইতে ইতিপূর্বে-রচিত কবিতা বা তৎসময়ে-লিখিত পত্রধারা (ছিন্নপত্র ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪। ৯ ফাল্গুন) হইতে কত পৃথক্। এই কবিতার মধ্যে কী-এক আঘাতজনিত ক্ষুব্ধতা তাঁহার চিত্তকে ব্যথিয়া তুলিয়াছে। কবির মন স্বভাবতই কোমল স্পর্শকাতর, কোথাকার বেদনা যেন তাঁহাকে অকস্মাৎ চেতাইয়া তুলিয়াছে। "কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে শূন্যতল? কোন্ অন্ধকারা মাঝে জর্জর বন্ধনে অনাথিনী মাগিছে সহায়? স্ফীতকায় অপমান অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান লক্ষ মুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস স্বার্থোদ্ধত অবিচার।" নিরালা কাব্যজীবনের নির্জনবাস অসহ্য হইয়াছে— "সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি মাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস সঙ্গীহীন রাত্রিদিন;...তাই মোর চক্ষে স্বপ্নাবেশ, বক্ষে জলে ক্ষুধানল।'

তাই পৃথিবীর দুঃখকে দূর করিবার জন্য কবি অন্তরের মধ্যে তীব্র বেদনা বোধ করিতেছেন—'এবার ফিরাও মোরে' 'লয়ে যাও সংসারের তীরে', কারণ যাহারা নীরবে দুঃখ ভোগ করে, তাহাদিগের "মূঢ় ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা, এইসব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।"

রবীন্দ্রনাথের মন কেন অকস্মাৎ এই উত্তেজিত ভাব ধারণ করিল, কেন তিনি নিপীড়িতদের জন্য হঠাৎ এই উচ্ছ্বাসপূর্ণ বেদনা প্রকাশ করিলেন, তাহার কারণ 'রাজনীতির দ্বিধা' (সাধনা ১৩০০ চৈত্র, দ্র রাজাপ্রজা) শীর্ষক প্রবন্ধের মধ্যে সন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে; আমরা কবির রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি একত্র আলোচনা করিব, সেইখানে এই প্রশ্নের উত্তর মিলিবে।

এই কবিতা রচিত হইবার চব্বিশ বৎসর পরে ইহার সম্বন্ধে কবি 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধ (সবুজপত্র ১৩২৪

১ ছিন্নপত্র। পতিসর, ১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪ [১৩০০ ফাল্গুন ৮]

আশ্বিন-কার্ত্তিক) লিখিয়াছিলেন, "যে শ্রেয় মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে অভয় দিয়ে এগিয়ে চলে সেই আশ্রয়কে শ্রেয় ক'রেই প্রিয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষাটি 'চিত্রা'য় 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে। বাঁশীর সুরের প্রতি ধিক্কার দিয়েই সে কবিতার আরম্ভ। মাধুর্যের যে শান্তি এ কবিতার লক্ষ্য তা নয়।...বিরাট চিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের এই সংঘাত যে কেবল আরামের, কেবল মাধুর্যের, তা নয়। অশেষের দিক থেকে যে-আহ্বান এসে পৌঁছয়, সে তো বাঁশীর ললিত সুরের নয়।...এ আহ্বান তো শক্তিকেই আহ্বান; কর্মক্ষেত্রেই এর ডাক, রসসম্ভোগের কুঞ্জকাননে নয়।"

যে মাসের সাধনায় 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি বাহির হইয়াছিল, সেই সংখ্যাতেই কবিকৃত বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহে'র সমালোচনা ও 'রাজনীতির দ্বিধা' শীর্ষক রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সাহিত্য সমালোচনা 'আধুনিক সাহিত্যে'র ও রাজনীতির সমালোচনাটি 'রাজা ও প্রজা' গ্রন্থের অন্তর্গত। সমসাময়িক 'সাহিত্য' পত্রিকার (১৩০১ বৈশাখ) সম্পাদক এই রাজসিংহের সমালোচনার প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, "রাজসিংহের অনেক প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য রবীন্দ্রবাবু এমন কৌশল সহকারে ধীরে ধীরে ব্যক্ত করিয়াছেন, যাহা তাঁহার ন্যায় সৌন্দর্যের ঐন্দ্রজালিকের পক্ষেই সম্ভব।"

ফাল্গুন ও চৈত্র মাসটা প্রায়ই কাটিয়া গেল উত্তর বঙ্গে, বেশিরভাগই পতিসরে। ছিন্নপত্রের মধ্যে এই সময়ের খানকয়েক পত্র আছে, মানুষ ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথের অনেক কথা তাহাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে।[১]

তাঁহার এই নিঃসঙ্গজীবনে এক নূতন বন্ধু জুটিয়াছিল। "আমি লোকেনের ওখান থেকে তার একখানা Amiel's Journal ধার ক'রে এনেছি, যখনি সময় পাই সেই বইটা উল্‌টে পাল্‌টে দেখি—ঠিক মনে হয় তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কচ্চি— এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু আর খুব অল্প ছাপার বইয়ে পেয়েছি।" (ছিন্নপত্র পৃ ২৫০)

আমিয়েল[৩] ছিলেন ফরাসী-সুইস দার্শনিক, জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক; সাময়িক পত্রিকায় দর্শনাদি বিষয়ে প্রবন্ধ ছাড়া তিনি দার্শনিক কোনো গ্রন্থ রচেন নাই; যে দুই একখানা বই লেখেন তা খ্যাতি অর্জন করে নাই। নিজের চিন্তাধারা ডায়ারিতে লিখিয়া রাখিতেন; তাঁহার মৃত্যুর পর (১৮৮১) সেগুলি ছাপা হয় Journal Intime-এ (১৮৮৩)। এই গ্রন্থখানি কবির খুব ভালো লাগে, বহুবার ইহার কথা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি।

চৈত্র মাসের মাঝামাঝির পর বা শেষাশেষি রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। এবার এখানে আসিয়া কয়েকটি কবিতা লিখিলেন। 'বর্ষশেষের' দিন বর্ষশেষ [স্নেহস্মৃতি], পহেলা বৈশাখ 'নববর্ষ', ও কয়েকদিনের মধ্যে লেখেন দুঃসময় (৫ই), 'মৃত্যুর পরে' (৫ই), ও 'ব্যাঘাত' (৬ই বৈশাখ ১৩০১)। কবিতা কয়টিরই মধ্যে মৃত্যুর ও বিরহের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। 'এবার ফিরাও মোরে' (২৩ ফাল্গুন) কবিতার মধ্যে যে প্রচণ্ড আবেগ দেখিয়াছিলাম, তাহা আর কোনো কবিতার মধ্যে প্রকাশ পায় নাই। জ্যৈষ্ঠ মাসের সাধনায় 'মৃত্যুর পরে' কবিতাটি প্রকাশিত হইলে উহা কাহার উদ্দেশ্যে রচিত, তাহা লইয়া বহু গবেষণা হয়। নিত্যকৃষ্ণ বসু সাহিত্যিকের ডায়ারিতে (সাহিত্য ১৩১০) বলেন যে,

১ ছিন্নপত্র, পতিসর, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪ [১৩০০ ফাল্গুন ৮];—২৭ ফেব্রুয়ারি;—১৯ মার্চ;—২২ মার্চ;—২৫ মার্চ;—২৮ মার্চ;—৩০ মার্চ [১৩০০ চৈত্র ১৭]

২ Amiel, Henri Frederic (1821-1881). Swiss philosopher. Professor of Æsthetics in Geneva 1849; lecturer and then Professor of Philosophy 1854; His *Journal Intime* was printed after his death (1883 Geneva) by E. Sherer. Translated with introduction and notes by Mrs. Humphry Ward. *Macmillan* 1887. *Vide* Mathew Arnold, Essays in Criticism. Second Series Amiel....*Philine* unpublished fragments from the Journal of H. F. Amiel translated by Van Wyck Brooks with an introduction by D. L. Murray. 1931. রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেই আনাইয়া পড়েন।

কবিতাটি সাধনায় বাহির হইলে উহা বঙ্কিমের মৃত্যু উপলক্ষ্যে রচিত বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু এতদ্ সম্বন্ধে সন্দেহও তিনি প্রকাশ করেন। উহার মধ্যে এত ব্যক্তিগত ভাবাবেগ আছে যে তাহা বঙ্কিমের উপর প্রযুক্ত হইতে পারে না।

'স্নেহস্মৃতি', 'দুঃসময়', 'মৃত্যুর পরে' এমন কি 'নববর্ষ' কবিতার মধ্যে যে বিরহ মৃত্যুর কথা আছে তাহা কাহার স্মরণে রচিত তাহা স্বল্প প্রচেষ্টায় আবিষ্কার করা যায়। পাঠকের স্মরণ আছে দশবৎসর পূর্বে এই বৈশাখ মাসে (৮ই) শুক্লা নবমীর দিন তাঁহার বৌঠাকুরানী কাদম্বরী দেবী দেহত্যাগ করেন। তাঁহাকেই আজ স্মরণ হইতেছে, নূতনভাবে তাঁহাকে আজ কবি দেখিতেছেন। পূর্বেও 'কড়ি ও কোমলের' কয়েকটি কবিতার মধ্যে তাঁহারই মৃত্যুজনিত শোক-বিহ্বলতা প্রকাশ পাইয়াছিল; তাহা হইতে আজিকার বেদনার সুর অন্য প্রকারের।

সেই সব এই সব, তেমনি পাখির রব,
তেমনি চলেছে হেসে জাগ্রত সংসার;
দক্ষিণ-বাতাসে-মেশা ফুলের গন্ধের নেশা
দিকে দিকে ব্যাকুলতা করিছে সঞ্চার।
অবোধ অন্তরে তাই চারিদিকে পানে চাই,—
অকস্মাৎ আনমনে জেগে উঠে ভুল—
বুঝি সেই স্নেহসনে ফিরে এল এ জীবনে
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল। (স্নেহস্মৃতি)

কড়ি ও কোমলের 'কোথায়' ও 'পুরাতন' কবিতাদ্বয়ের সহিত 'স্নেহস্মৃতি' ও 'নববর্ষ' কবিতা দুইটি তুলনীয়। 'দুঃসময়' ও 'মৃত্যুর পরে' কবিতার মধ্যে এই শোকস্মৃতি আরও স্পষ্ট। স্মৃতির মাঝে আজ যে উদয় হইতেছে তাহারই উদ্দেশে কবি বলিতেছেন—

তোমারে আজিকে ভুলিয়াছে সবে;
শুধাইলে কেহ কথা নাহি কবে; ··
যেথা এক দিন ছিল তোর গেহ
ভিখারির মতো আসে সেথা কেহ!···
যাহারা জাগিছে নবীন উৎসবে
রুদ্ধ করি দ্বার মত্ত কলরবে
কী তোমার যোগ আজি এই ভবে
তাদের সাথে! (দুঃসময়)

এই কবিতাটির সহিত কড়ি ও কোমলের 'নূতন' কবিতাটি তুলনীয়। 'মৃত্যুর পরে' কবিতাটি পাঠক এখন আমাদের ব্যাখ্যার আলোকে পাঠ করুন। সেই অভাগিনী নারী কী বেদনায় তাহার তরুণ জীবনকে স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিল সে-সংবাদ এখনো রহস্যাবৃত। আত্মীয়স্বজনেরা তাহার এই আকস্মিক কাণ্ডকে কখনো ক্ষমাসুন্দর চক্ষে দেখিয়া বিচার করেন নাই; মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্য সকলের কাছে মৃত্যুর পরও সে নিন্দা ভাগী হইতেছিল। তাই কি কবি লিখিতেছেন—

ছিলে যারা রোষ ভরে
বৃথা এতদিন পরে
করিছ মার্জনা।
অসীম নিস্তব্ধ দেশে
চিররাত্রি পেয়েছে সে
অনন্ত সান্ত্বনা।
বসিয়া আপন দ্বারে
ভালো মন্দ বলো তারে
যাহা ইচ্ছা তাই।
অনন্ত জনম মাঝে
গেছে সে অনন্ত কাজে
সে আর সে নাই।
আর পরিচিত মুখে
তোমাদের সুখে দুখে
আসিবে না ফিরে,
তবে তার কথা থাক্,
যে গেছে সে চলে যাক
বিস্মৃতির তীরে।

প্রসঙ্গ ক্রমে বলিতে পারি কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু হয় ৮ই বৈশাখ ১২৯১ শুক্লা নবমী, এই কবিতাটি রচিত হইতেছে ৫ই বৈশাখ ১৩০১ শুক্লা দ্বাদশীর দিন।

যে চৈত্র মাসের (১৩০০) সাধনায় বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ উপন্যাসের সংশোধিত সংস্করণের দীর্ঘ প্রশংসামুখর সমালোচনা প্রকাশিত হয়, সেই মাসেরই ২৬ তারিখে বঙ্কিমের মৃত্যু হয়; বঙ্কিমের বয়স তখন ৫৬ বৎসর।[১] 'রাজসিংহ' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনা বঙ্কিম দেখিয়া গিয়াছিলেন কিনা জানি না।

বৈশাখমাসে বঙ্কিমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদক উদ্‌যোগ করিলেন। এই সম্বন্ধে নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিতেছেন, "বঙ্কিমবাবুর জন্য 'শোকসভা' হইবে, রবিবাবু শোক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, তাহার সভাপতিত্ব করিতে আমি আহূত হইয়াছিলাম। আমি উহা অস্বীকার করিয়া লিখিলাম যে সভা করিয়া কিরূপে শোক করা যায়, আমি হিন্দু তাহা বুঝি না। সভা করিয়া শোক!... শোকসভা সম্বন্ধে আমার উপরি উক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া রবিবাবুর 'সাধনা'তে এক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। আমাদের শোক বড় নিভৃত ও পবিত্র। উহা সভা করিয়া একটা তামাশার জিনিস করা আমি মহাপাতক মনে করি।" (আমার জীবন ৫ম ভাগ)।

নবীনচন্দ্রের এই আত্যন্তিক স্বাদেশিকতা ও অতিমাত্র হিন্দুত্বকে রবীন্দ্রনাথ সহজ সরলতা জ্ঞানে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সভায় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠের পর সাধনায় তাহার উত্তর প্রদান করেন[২]। প্রবন্ধের একস্থানে লিখিলেন, "যেমন আমাদের দেশে পিতৃশ্রাদ্ধ প্রকাশ্য সভায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক পিতৃহীন ব্যক্তির পিতৃশোক ব্যক্তকরা প্রকাশ্য কর্তব্যস্বরূপে গণ্য হয় তেমনি পাব্লিকের হিতৈষী কোনো মহৎ ব্যক্তির মৃত্যুকে প্রকাশ্য সভায় শোক জ্ঞাপন একটা সামাজিক কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত।" রবীন্দ্রনাথ বলিলেন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার নিকট হইতে আমরা বহু জিনিস গ্রহণ করিয়াছি ও করিতে বাধ্য হইয়াছি; শোকসভা অনুষ্ঠান তাহার অন্যতম। পাশ্চাত্ত্য বলিয়াই তাহা বর্জনীয় হইতে পারে না।

চৈতন্য লাইব্রেরিতে যে স্মৃতিসভা হইল, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন তাহা বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত প্রবন্ধ।[৩] তাহা হইতে একটিমাত্র অংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:

"অধিক দিনের কথা নহে; ইতিপূর্বেই যে-সভায় আমি সাধারণের সমক্ষে প্রবন্ধ [ইংরেজ ও ভারতবাসী] পাঠ করিয়াছিলাম বঙ্কিমচন্দ্র তাহার সভাপতি থাকিয়া আমাকে পরম সম্মানিত এবং উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তখন কে কল্পনা করিয়াছিল তাহার অনতিকাল পরে পুনশ্চ এই সাধারণ সভায় দাঁড়াইয়া তাঁহার বিয়োগে বঙ্গসাহিত্য এবং বঙ্গদেশের হইয়া আমাকে শোকপ্রকাশ করিতে হইবে। কে জানিত আমার সহিত তাঁহার সেই শেষ ঐহিক সম্বন্ধ।"

বঙ্কিমের নিকট রবীন্দ্রনাথ যে কত বিষয়ে ঋণী ছিলেন তাহার সম্পূর্ণ গবেষণা এখনো হয় না; কিন্তু আলোচনা হইলে দেখা যাইবে বহুবিষয় রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমকে অনুবর্তন করিয়া তাঁহার আরব্ধ কার্য সংচালিত করিয়াছেন। তবে সঙ্গে সঙ্গেই বলা উচিত উভয়ের জীবনাদর্শ বা দার্শনিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পৃথক ছিল, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে মিল হইতে অমিল মিলিবে বেশি। তবে একথা নিশ্চিত যে সাহিত্যের মধ্য দিয়া দেশপ্রীতি উদ্‌বোধন বিষয়ে উভয়ে সমধর্মী।

বঙ্কিমের মৃত্যুর দেড় মাসের মধ্যে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর মৃত্যু হইল (১৩০১ জ্যৈষ্ঠ ১১)। মৃত্যুর সময় বিহারীলালের বয়স ষাট বৎসর ছিল; বহু বৎসর বাংলা সাহিত্যকে তিনি নীরবে সেবা করিয়াছিলেন; বাংলার সাধারণ পাঠকশ্রেণীর নিকট তিনি বঙ্কিমাদির ন্যায় কখনো সুপরিচিত হন নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মৃত্যুর পর যে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন, তাহাই বোধ হয় ঐ কবি সম্বন্ধে শেষ কথা। তিনি লিখিলেন, 'বিহারীলালের কণ্ঠ সাধারণের নিকট

১ বঙ্কিমচন্দ্র, জন্ম ১৮৩৮ জুন ২৭— মৃত্যু ১৮৯৪ এপ্রিল ৮ [১৩০০ চৈত্র ২৬]।

২ শোকসভা, সাধনা ১৩০১ জ্যৈষ্ঠ। রবীন্দ্ররচনাবলী ৯ম পৃ ৫২৯-৩৬

৩ বঙ্কিমচন্দ্র, সাধনা ১৩০১ বৈশাখ পৃ ৫৩৫-৬৪। আধুনিক সাহিত্য। র-র ৯ম পৃ ৩৯৯-৪১০। পরিশিষ্ট পৃ ৫৪৬-৫৩।

তেমন সুপরিচিত ছিল না। তাঁহার সুমধুর সঙ্গীত নির্জনে নিভৃতে ধ্বনিত হইতে থাকিত, খ্যাতির প্রার্থনায় পাঠক বা সমালোচক সমাজের দ্বারবর্তী হইত না। কিন্তু যাহারা দৈবক্রমে এই বিজনবাসী ভাবনিমগ্ন কবির সঙ্গীত কাকলীতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছিল তাহাদের নিকটে আদরের অভাব ছিল না। তাহারা তাঁহাকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া জানিত।"১ এই গ্রন্থের প্রথমাংশে আমরা রবীন্দ্রনাথের সহিত বিহারীলালের পরিচয়ের কথা সবিস্তারে বর্ণিয়াছি, সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

গ্রীষ্মকালে কয়েকদিনের জন্য কবি গেলেন কার্সিয়ঙে; ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য রবীন্দ্রনাথকে তথায় তাঁহার সহিত কয়েকটি দিন কাটাইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। মহারাজ রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সবিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। 'ভগ্নহৃদয়' প্রকাশিত হইলে তিনি কিভাবে কবিকে সম্মানিত করিয়াছিলেন, তাহা রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠকের নিকট সুপরিচিত। বৈষ্ণব কবিদের সম্বন্ধেও তাঁহার আগ্রহ ছিল অকৃত্রিম; বৈষ্ণব সাহিত্য প্রকাশ সম্বন্ধে আলাপ আলোচনার জন্য তিনি তরুণ কবিকে নিমন্ত্রণ করেন। এই সাহিত্য প্রচারকল্পে মহারাজ একলক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার এই উদার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার সুযোগ উপস্থিত হইবার পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হয়, রাজা ও কবির স্বপ্ন অপূর্ণই থাকিয়া গেল। কিন্তু ত্রিপুরা রাজপরিবারের সহিত তাঁহার এই বন্ধন ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল।

দেশের রাজাই হউক, আর বিদেশের নবীন আগন্তুকই হউক, রবীন্দ্রনাথের দীপ্ত প্রতিভায় সকলেই আকৃষ্ট হইত। এই সময়ে (১৮৯৬ শেষ দিকে) সুইডেন হইতে হামারগ্রেন্‌ নামে এক যুবক কলিকাতায় আসেন। রাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজি গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া যুবকটি বাংলাদেশের প্রতি আকৃষ্ট হন ও নিজ জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া বাংলাদেশের কোনো সেবার কাজে জীবন উৎসর্গ করিবেন এই সংকল্প অন্তরে বহন করিয়া এদেশে আসেন। নিরন্তর অনিয়মে পরিশ্রম করিয়া অকালে তাঁহার মৃত্যু হয়; মৃত্যুকালে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে হিন্দুর ন্যায় যেন তাঁহার দাহ কার্য হয়।

এই ব্যাপারে হিন্দুসমাজের গোঁড়াদের মধ্যে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল,— একজন বিদেশী বিধর্মী হিন্দুদের শ্মশানে দাহ হইবে, এমন অনাচার ধর্মপ্রাণ লোকদের অসহ্য। রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাপারটি লইয়া 'বিদেশী অতিথি ও দেশীয় আতিথ্য' নামে এক প্রবন্ধ লেখেন (সাধনা ১৪০১, শ্রাবণ)। এই প্রবন্ধে তিনি বলিলেন, "কিছুকাল পূর্বে এক সময় ছিল যখন আমাদের স্বদেশপ্রেমিকগণ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেন যে, হিন্দুধর্মে উদারতা বিশ্বপ্রেম নির্বিচার-আতিথ্য অন্য সকল ধর্ম অপেক্ষা অধিক। ... শ্রুতিতে আছে, অতিথি দেবো ভব। কিন্তু কালক্রমে লোকাচার এমন অনুদার ও বিকৃত হইয়া আসিয়াছে যে কোনো বিদেশীয় বিজাতীয় সাধু ব্যক্তি যদি আমাদের দেশে উপস্থিত হইয়া প্রীতিপূর্বক আমাদের মধ্যে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন তবে কোনো হিন্দুগৃহ তাঁহাকে সমাদরের সহিত অসঙ্কোচে স্থান দেয় না, তাঁহাকে দ্বারস্থ কুকুরের ন্যায় মনে মনে দূরস্থ করিতে ইচ্ছা করে; এই অমানুষিক মানবঘৃণাই কি আমাদের পক্ষে অক্ষয় কলঙ্কের কারণ নহে? অবশেষে আমাদের শ্মশানকেও আমাদের গৃহের ন্যায় বিদেশীর নিকটে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিব? জীবিতকালে আমাদের গৃহে পরদেশীর স্থান নাই। মৃত্যুর পরে আমাদের শ্মশানেও কি পরদেশীর দগ্ধ হইবার অধিকার থাকিবে না? ... এই সুইডেন দেশীয় নিরীহ প্রবাসী ··· পাছে কোথাও অনধিকার প্রবেশ হয়, . ···. ···এইজন্য তিনি সর্বত্র সর্বদাই ত্রস্ত সতর্ক বিনম্রভাবে একপার্শ্বে অবস্থান করিতেন। সেই দয়ালু সহৃদয় মহাশয় ব্যক্তি কাহারও কোনো অপকার করেন নাই, কেবল পরাজিত পরধর্মীর হিতচেষ্টায় আপন জীবনপাত করিয়াছেন মাত্র। ··· এই প্রবাসী যুবক মৃত্যুকালে

১ বিহারীলাল, সাধনা ১৩০১ আষাঢ়। দ্র. আধুনিক সাহিত্য। রবীন্দ্র রচনাবলী ৯ম খণ্ড পৃ. ৪১১-৩২

পবিত্র আর্যভূমির নিকটে কোন্ অসম্ভব প্রার্থনা করিয়াছিলেন? আমাদের সুপবিত্র সংস্পর্শ, না, আমাদের দুর্লভ আত্মীয়তা? ... তিনি সুইডেনের উত্তর প্রদেশ হইতে আসিয়া কলিকাতার যে শ্মশানে 'হাড়ি ডোম' * প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিষিদ্ধ নহে সেই শ্মশানপ্রান্তে ভস্মসাৎ হইবার অধিকার চাহিয়াছিলেন মাত্র।" (পৃ ২৬০)

বহুকাল পরে সুইডেন দেশ হইতে তিনি যখন নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন, তখন বক্তৃতাকালে এই সহৃদয় সুইডেন যুবকের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন। বহুবার তাঁহার মুখে এই যুবকের কথা শুনিয়াছি।

এই মাসেই 'অনধিকার প্রবেশ' নামক গল্পটি লেখেন। হামারগ্রেন হিন্দুসমাজে অনধিকার প্রবেশ-অধিকার চাহিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু উক্ত গল্পের জয়কালীর সকল আচার ধ্বংস হইয়া গেল যখন অপবিত্র শূকর উন্মত্ত ডোমদের হাত হইতে পলায়ন করিয়া তাঁহারই পরম পবিত্র মন্দিরে জীবনরক্ষার জন্য আশ্রয় লইল। "এই সামান্য ঘটনায় নিখিল জগতের সর্বজীবের মহাদেবতা পরম প্রসন্ন হইলেন কিন্তু ক্ষুদ্র পল্লীর সমাজ-নামধারী অতি ক্ষুদ্র দেবতাটি নিরতিশয় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।" তাঁহার শেষ গল্প 'সমস্যাপূরণ' (১৩০০ অগ্র) লিখিবার প্রায় ছয় সাত মাস পরে 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পটি লিখিলেন। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ (১৩০১) মাস কলিকাতায় কাটান; আষাঢ়ের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথকে শিলাইদহে দেখা যায়।

সেখানে রবীন্দ্রনাথ বই পড়িতেছেন এবং ছোটো গল্প পুনরায় লিখিবার চেষ্টা করিতেছেন। একখানি চিঠিতে সেই কথা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন, "আজ মনে হচ্ছে, যদি আমি আর কিছু না করে ছোটো ছোটো গল্প লিখতে বসি তাহলে কতকটা মনের সুখে থাকি এবং কৃতকার্য হতে পারলে হয়তো পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। গল্প লেখার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখব, তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভ'রে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধ ঘরের সংকীর্ণতা দূর করবে, এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের পরে বেড়িয়ে বেড়াবে।" (ছিন্নপত্র ১৪ আষাঢ়, ১৩০১)

এই দিনই তিনি তাঁহার অমর গল্প 'মেঘ ও রৌদ্রে'র পত্তন করিয়াছেন—"আজ সকালবেলায় গিরিবালা নাম্নী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি ছোটো অভিমানী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতরণ করা গেছে।"

'মেঘ ও রৌদ্র' লিখিবার সময় রবীন্দ্রনাথের মনে দেশের বহু সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা জাগিতেছিল। আমরা যে-যুগের কথা বলিতেছি, তখন পথেঘাটে ইংরেজের হাতে দেশীয়দের অপমান, সাহেবদের পদাঘাতে প্লীহা-বিদারণ প্রভৃতি ঘটনা কাগজপত্রে মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইত। রবীন্দ্রনাথ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে দুই একটি উৎপীড়নের ঘটনা এই গল্পের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। ঘটনা দুটি গল্পের নায়ক শশীনাথের জীবনেতিহাসের অন্তর্গত। প্রথম ঘটনাটি হইতেছে এই যে, একখানি স্টীমারের পাশ দিয়া একখানি দেশী নৌকা চলিতেছিল; দেশী নৌকার মাঝি একখানি পালের উপর দুইখানি ক্রমে তিনখানি পাল তুলিয়া স্টীমারের সহিত পাল্লা দিয়া তাহাকে পিছাইয়া চলিয়া গেল। "ম্যানেজার সাহেব আগ্রহের ভাবে রেলের উপর ঝুঁকিয়া নৌকার এই প্রতিযোগিতা দেখিতেছিল। হঠাৎ একটা বন্দুক তুলিয়া স্ফীত পাল লক্ষ্য করিয়া আওয়াজ করিয়া দিল। একমুহূর্তে পাল ফাটিয়া গেল, নৌকা ডুবিয়া গেল; স্টীমার নদীর বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।" এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের পাঠকের নিকট সুপরিচিত বলিয়া উদ্ধৃত করিলাম না।

* "পাঠকগণ মনে করিবেন না আমরা ঘৃণা প্রকাশপূর্বক হাড়ি ডোম প্রভৃতি নামোল্লেখ করিতেছি আমরা সংবাদপত্রের ভাষা উদ্ধৃত করিতেছি।"—কবিকৃত পাদটীকা।

'মেঘ ও রৌদ্রে'র অপর ঘটনাটি হইতেছে এই। পুলিসসাহেব তাঁহার নৌকায় করিয়া যাইতেছেন। দুই নদীর মোহানার মুখে বাঁশ বাঁধিয়া জেলেরা একটা প্রকাণ্ড জাল পাতিয়াছে। একপার্শ্ব দিয়া নৌকা চলাচলের পথ দেওয়া আছে। সতর্ক করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও পুলিস সাহেবের মাঝিরা জালের উপর দিয়া নৌকা চালাইয়া লইয়া গেল; জাল হালে বাঁধিয়া গেল; কিঞ্চিৎ বিলম্বে এবং চেষ্টায় হাল ছাড়াইয়া লইতে হইল। পুলিসসাহেব অত্যন্ত গরম এবং রক্তবর্ণ হইয়া বোট বাঁধিলেন। তাঁহার মূর্তি দেখিয়াই জেলেরা ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। সাহেব তাঁহার মাল্লাদিগকে জাল কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। তাহারা সেই সাত আট শত টাকার জাল কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল।

রবীন্দ্রনাথের মন বহুদিন হইতে ইংরেজের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। তিনি বরাবর দেখিয়াছেন যে বিদেশী যখন উৎপীড়ন করে, দেশীয়রা তাহা নীরবে সহ্য করে। অত্যাচার যে করে ও অত্যাচার যে সহে উভয়ের মধ্যে কে বেশি অপরাধী বলা কঠিন, কারণ এইসব অত্যাচারের প্রয়োজক ইংরেজ, কিন্তু সম্পাদক দেশীয় লোক। শশীনাথ ইংরেজের কাছে বেশি, না দেশীয় লোকের হাত হইতে বেশি লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু এই গল্পটি আমরা যেভাবে দেখাইলাম, আসলে উহা সেরূপ নহে, কারণ এইসব ঘটনা গল্পের সৌন্দর্যকে আচ্ছন্ন করে নাই; 'বঁধু হে ফিরে এসো' এ গান কেবল শশীনাথের কর্ণে নয়, আজও সকল পাঠকের কর্ণেই ধ্বনিত হইতেছে।

যে মনোভাব হইতে 'মেঘ ও রৌদ্রে'র ঘটনাগুলি লিখিয়াছেন সেই মনোভাব হইতে 'অপমানের প্রতিকার' প্রবন্ধটি লেখেন। ইংরেজ অপমান করে সেজন্য সে নিন্দার্হ; কিন্তু যাহারা সেই অপমানের প্রতিকার করিতে পরাঙ্মুখ তাহাদিগকেও তিনি শ্লাঘার পাত্র মনে করেন না। এই সময়ে খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট বেট্‌সন্ বেল্ এক মুহুরিকে প্রহার করেন। তাহা লইয়া মোকদ্দমা হয়। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন, "হঠাৎ রাগিয়া প্রহার করিয়া বসা পুরুষের দুর্বলতা, কিন্তু মার খাইয়া বিনা প্রতিকারে ক্রন্দন করা কাপুরুষের দুর্বলতা।"

রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে লাগিল প্রহারটা নয়, তাঁহার লাগিল বাঙালী ব্যারিস্টারের অপমানকর স্বীকারোক্তি; ব্যারিস্টার বলিয়াছিলেন, মুহুরি-মারা কাজটা ইংরেজের অযোগ্য হইয়াছে, কারণ বেল্ সাহেব জানিতেন যে মুহুরি তাঁহাকে ফিরিয়া মারিতে পারিবে না। এই শেষোক্ত বিষয়টির উপর ব্যারিস্টার জোর দিলেন। রবীন্দ্রনাথ ব্যারিস্টারের এই কথাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া লিখিলেন, "যথেষ্ট অপমানিত হইলেও একজন মুহুরি কোনো ইংরেজকে ফিরিয়া মারিতে পারে না— এই কথাটি ধ্রুব সত্যরূপে অম্লান বদনে স্বীকার করা এবং ইহারই উপরে ইংরেজকে বেশি করিয়া দোহাই করা আমাদের বিবেচনায় নিতান্ত অনাবশ্যক এবং লজ্জাজনক আচরণ।" (অপমানের প্রতিকার, সাধনা ১৩০১, ভাদ্র)। এই কথাটাই আর একদিন লিখিয়াছিলেন—

অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

বাঙালী বিচারক-ম্যাজিস্ট্রেট, সাহেব ও বাঙালির মধ্যে ফৌজদারী মোকদ্দমা হইলে, অপরাধী সাহেবকে ভীতভাবে সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দেন, আর বাঙালিকে কীভাবে শাস্তি দেন তাহার উদাহরণ তো 'মেঘ ও রৌদ্রে' আছে। এই প্রবন্ধে তিনি লিখিলেন, "আমাদের স্বজাতিকে যে-সম্মান আমরা নিজে দিতে জানি না, আশা করি এবং আবদার করি সেই সম্মান ইংরেজ আমাদিগকে যাচিয়া সাধিয়া দিবে। ... এক বাঙালী যখন নীরবে মার খায় এবং অন্য বাঙালী যখন তাহা কৌতূহলভরে দেখে, এবং স্বহস্তে অপমানের প্রতিকার সাধন বাঙালীর নিকট প্রত্যাশাই করা যায় না, একথা যখন বাঙালী বিনা লজ্জায় ইঙ্গিতেও স্বীকার করে তখন ইহা বুঝিতে হইবে যে, ইংরেজের দ্বারা হত ও আহত হইবার মূল প্রধান কারণ আমাদের নিজের স্বভাবের মধ্যে, গবর্মেণ্ট কোনো আইনের দ্বারা বিচারের দ্বারা তাহা দূর করিতে পারিবে না।"

অপমান যে কেবল ইংরেজ বাঙালিকে করিতেছে, তাহা নহে ; সমাজের মধ্যে যে অপমান নিত্য মানুষকে টানিয়া টানিয়া হীন পঙ্কে নিমজ্জিত করিতেছে, তাহার উদাহরণও লেখক দিলেন। "আমাদের সমাজ স্তরে স্তরে উচ্চনীচে বিভক্ত, যে ব্যক্তি কিছুমাত্র উচ্চে আছে, সে নিম্নতর ব্যক্তির নিকট হইতে অপরিমিত অধীনতা প্রত্যাশা করে।"

রবীন্দ্রনাথ কখনো কোনো ব্যাধির মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া কেবল একপাশ হইতে তাহা দেখিতে পারেন না। সেইজন্য তিনি ইংরেজকৃত অপমানের প্রতিকার ইংরেজের বিশেষ গুণের মধ্যে অনুসন্ধান না করিয়া দেশবাসীকে জাগ্রত হইবার জন্য আহ্বান করিলেন। এই প্রবন্ধ লিখিত হয় স্বদেশীযুগের দশ বৎসর পূর্বে। বাংলার জাতীয় আত্মসম্মান উদ্‌বুদ্ধ করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি সহায়ক তাহা তাঁহার প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, গানগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে পাঠ করিলেই পাঠকের কাছে পরিস্ফুট হইবে। যাহাই হউক, এই যুগের রাজনীতিক প্রবন্ধগুলি পরবর্তী পরিচ্ছেদে একত্র আলোচিত হইবে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সত্তার সবটাই সাহিত্য, রাজনীতি ও জমিদারি নহে। রবীন্দ্রনাথ গৃহস্থ, বন্ধুবৎসল, সজনপ্রিয় ; সেসব কথা উপেক্ষা করিয়া একান্ত সাহিত্যিক তুরীয়তার মধ্যে তাঁহাকে দেখাইতে গেলে সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে বুঝা যাইবে না ; ব্যক্তিসত্তার সমগ্র চিত্রখানি না পাইলে তাঁহার কাব্যসৃষ্টির মানসিক পটভূমিও আবিষ্কৃত হইবে না ; সেইজন্যই মাঝে মাঝে মানুষ রবীন্দ্রনাথকে দেখা দরকার।

এই সময়ে প্রমথ চৌধুরী ও চিত্তরঞ্জন দাস বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়িতেছেন। প্রমথচৌধুরীকে একপত্রে[১] লিখিতেছেন যে আষাঢ়ের সন্ধ্যাবেলাটি "বহুবিধ আত্মীয় বন্ধুমণ্ডলী-পরিবৃত হয়ে পঞ্চাশ নম্বর পার্কস্ট্রীটেই [সত্যেন্দ্রনাথের বাটিতে] যাপন করা যায়। গত দুদিন ধরে শারাড অভিনয় চলছে, তাতেও আমাদের সভা খুব সরগরম হচ্ছে। এর থেকেই কতকটা বুঝতে পারবে পঞ্চাশ নম্বরে উনপঞ্চাশ পূর্ববৎ প্রবল প্রতাপে প্রবহমান।"

এই সময়ে 'রাজা ও রানী'র দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হইয়াছে এবং 'কড়ি ও কোমলে'র দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হইতেছে। দ্বিতীয় সংস্করণে 'রাজা ও রানী'র বিস্তর পরিবর্তন হইয়াছিল, আয়তনে কমিয়া প্রায় অর্ধেক দাঁড়ায়। কড়ি ও কোমলের বহু অবান্তর কবিতা বাদ যায়। মোট কথা কবির উচ্ছ্বাসের মুহূর্তের পর যখন তাঁহার আর্টিস্ট সত্তা লেখাগুলিকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেখে, তখন সেসব রচনার যথাযথ স্থান নির্দেশ হয়।[১] কিন্তু বর্ষাকালে কবি কলিকাতায় থাকিতে চান না, তাই লিখিতেছেন যে শিলাইদহে 'বর্ষাটা বোটের মধ্যে একাকী যাপন করতে হবে। অনেকগুলি কেতাব এবং গুটিকতক খালি খাতা সঙ্গে যাবে।' শিলাইদহে গিয়া ইন্দিরা দেবীকে যে পত্রধারা লেখেন, তাহারই প্রথমখানিতে কবি জীবনের সুখদুঃখের কারণ সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করিলেন।[২]

আষাঢ়ের শেষ দিকে কবি কলিকাতায় ফিরিলেন। কনিষ্ঠা কন্যা মীরা তখন কয়েকমাসের শিশু ; কবি তাহাকে লইয়া কিভাবে আনন্দ পাইতেছেন, তাহা এই অধুনাপ্রকাশিত ছিন্নপত্রগুলির মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। কবি বলিয়া মানবধর্ম সে যে ত্যাগ করিতে পারে না তাহারই চিত্র পত্রগুলি হইতে পাই। এইবার কলিকাতায় থাকিবার সময়ে

১ চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড। ১৪ নং পত্র। কলিকাতা শনিবার ১৬ জুন ১৮৯৪। [১৩০১ আষাঢ় ২]

২ 'জীবনের সমস্ত প্রবাহ যে অভিমুখে সহজে ধাবিত হচ্ছে সেখানে বাধা পেলেই আহত হয়ে ফেনিল হয়ে নিজের মধ্যে বিভক্ত হয়ে ক্রন্দন করে ওঠে।...অভ্যাস বাধাগ্রস্ত হইলে বা অভ্যস্ত বিষয় বা বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা বাহিরে গেলেই মনে দুঃখ জাগে। মানুষ সেই দুঃখের ভার লাঘব করিবার জন্য ধর্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছে। অভাব বিচ্ছেদ মৃত্যু মানুষকে দুঃখভারে আক্রান্ত করবেই, এইজন্যে মানুষ আপনার ধর্মমত আপনার সমাজকে এমন করে গড়বার চেষ্টা করচে যাতে সেই ভারকে যথসম্ভব হাল্কা করে ভাসিয়ে দেওয়া যায়। ভারগুলো যদি নিজের উপর স্থাপন করি তাহলে দুঃসহ হয়, যদি ধর্মের উপর সামাজিক কর্তব্যের উপর স্থাপন করি তাহলে অনেকটা আরাম পাওয়া যায়। ছিন্নপত্র। বিশ্বভারতী পত্রিকা তৃতীয় বর্ষ। চতুর্থ সংখ্যা। ১৩৫২ পৃ. ২২৫-২৬

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে (১৪ শ্রাবণ ১৩০১) রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। ঐদিন বাংলা পারিভাষিক শব্দ প্রণয়নের জন্য একটি সমিতি গঠিত হয়, তাহাতে সভাপতি নির্বাচিত হন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, সহকারী-সভাপতি হন নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ। নবীনচন্দ্র তখন রাণাঘাটের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট। কিছুকাল পূর্বে নবীনচন্দ্রের নিমন্ত্রণে কবি একবার রাণাঘাট যান; 'আমার জীবনে' (৪র্থ খণ্ড) নবীনচন্দ্র তাহার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এই বৎসরের (১৩০১) গোড়ার দিকে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরিষদ প্রতিষ্ঠার সময়ে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন কিনা জানি না, তবে উহার প্রতিষ্ঠা পরিকল্পনাদির মধ্যে শুরু হইতেই তিনি ছিলেন। আজ সাহিত্য পরিষৎ বলিলেই আমাদের মনে যে সুরম্য অট্টালিকা, বিরাট গ্রন্থাগার প্রভৃতির কথা জাগে অর্ধশতাব্দী পূর্বে সে-সব কিছুই ছিল না; শোভাবাজার রাজবাটীর একটি প্রকোষ্ঠে জনকয়েক মিলিয়া সভা বসিত; নিজস্ব বলিতে পরিষদের তখন কিছুই ছিল না।

কবি সপ্তাহ তিনেক কলিকাতায় ছিলেন; প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়; এই সাহিত্যসাধক, রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার কাব্যপ্রেরণা, সাহিত্যরচনা, ভাবগ্রহিতায় কতখানি যে উদ্‌বুদ্ধ করিতেন তাহার যথাযথ হিসাব হয় নাই। তাঁহার মধ্যে যে মহতী শক্তি রহিয়াছে তাহা যেন তিনি প্রিয়নাথের কাছে গেলে স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারেন।

কিন্তু অচিরেই দৃশ্য পরিবর্তন হইল। "কোথায় সেই কলিকাতা, সেই তেতলার ছাত, সেই বিশৃঙ্খল খাট পালং চৌকির নিবিড়তার মধ্যে নিয়মিত জীবনযাত্রা" আর ২০শে শ্রাবণ পুনরায় "একটি উন্মুক্ত বাতায়নে তরণীর মধ্যে একটি ক্যাম্প-টেবিলের শীর্ষদেশে বেত্রাসনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ প্রভাতে পত্রলিখনে নিযুক্ত।" অল্প সময়ের মধ্যে জমিদারির নায়েব পেস্কার কাগজপত্র লইয়া আসিবে।[১]

পদ্মার উপর বোটের ভিতর যে-রবীন্দ্রনাথ বাস করেন, আর জমিদারির কাছারি বাড়িতে নায়েব গোমস্তা ও দরিদ্র প্রজাদের মধ্যে গিয়া যিনি বসেন, তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের অনেক তফাত। নদীতে বাস করেন দরদী কবি, কুঠিবাড়িতে থাকেন বিষয়ী জমিদার। 'ছিন্নপত্রে'র পত্রধারায় আমরা পাই সেই ভাবুক মানুষকে, যাহার অন্তর বিচিত্রের সৌন্দর্যে অপরূপ বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল, মনোহর। তাই দেখি কবিচিত্তে সর্বদাই দ্বৈতের দ্বন্দ্ব; শিলাইদহ হইতে লিখিতেছেন,[২] "সন্ধ্যাবেলাটি আমার মাথার উপর, আমার চোখের সামনে, আমার পায়ের তলায়, আমার চতুর্দিকে এমন সুন্দর, এমন শান্তিময়, এমন মানুষটির মতো নিবিড়ভাবে আমার নিকটবর্তী হয়ে আসে যে, আকাশের নক্ষত্রলোক থেকে আর পদ্মার সুদূর ছায়াময় তীররেখা পর্যন্ত সমস্তটি একটি নিভৃত গোপন গৃহের মতো ছোটো হয়ে ঘিরে দাঁড়ায়— আমার মধ্যে যে দুটি প্রাণী আছে, বাইরের আমি এবং আমার অন্তঃপুরবাসী আত্মা এই দুটিতে মিলে সমস্ত ঘরটি দখল করে বসে থাকি…।" কবি যেন অনুভব করেন তাঁহার মধ্যে দুইটি পৃথক সত্তা, পাশাপাশি বিরাজিত। কয়েকদিন পরে লিখিত একখানি পত্রে 'বেদান্ত' সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিয়া বলিতেছেন যে "জগৎ মিথ্যা, সংসার মায়া ও এই মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই যে মুক্তি এ-কথা কিছুতেই মনে হয় না।… যখন জগৎটাকে নিছক মায়া বলেই নিশ্চয় জানব তখনি মুক্তির বাধা থাকবে না। এ-কথাটা আমি ঈ—ষৎ অনুমান এবং অনুভব করতে পারি— হয়তো কোনোদিন দেখব বৃদ্ধবয়সের পূর্বে আমি জীবন্মুক্ত হয়ে বসে আছি।"[৩]

আমাদের মনে হয় কবির মানসিক এই দ্বন্দ্বের অবস্থায় 'অন্তর্যামী'[৪] লিখিত। কয়েকমাস হইতেই তাঁহার ভিতরে

১ ছিন্নপত্র। বি-ভা-প তৃতীয় বর্ষ। চতুর্থ সংখ্যা। ১৩৫২ পৃ. ২৩১

২ ১৮৯৪ অগস্ট ১৬ [১৩০১ ভাদ্র ১]

৩ ছিন্নপত্র, শিলাইদা, ১৯শে অগস্ট ১৮৯৪ [১৩০১ ভাদ্র ৪]

৪ অন্তর্যামী ভাদ্র ১৩০১। সাধনা ১৩০১ আশ্বিন-কার্তিক, পৃ. ৪০৯-২৩। দ্র. চিত্রা

এই দ্বৈত-ব্যক্তিত্বের সংগ্রাম অনুভূত হইতেছে, তাহার আভাস কয়েকমাস পূর্বে লিখিত একখানি পত্রের মধ্যে পাই।[১] "নিজের ভিতরকার এই অপার রহস্যের কথা মনে করলে ভারি ভয় হয়— কী করতে পারব না পারব কিছুই জোর করে বলতে পারিনে— জানিনে আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে আমিই বা একে কোথায় নিয়ে যাব? ...অসংখ্য কাণ্ড আমাকে অবিশ্রাম আচ্ছন্ন করে ঘটচে, আমি দেখতেও পাচ্চিনে, আমার সঙ্গে পরামর্শও করচে না...! আমি তো ভেবে চিন্তে এইটুকু ঠিক করেছি আমি নিজেকে কিছুই জানিনে। আমি একটা সজীব পিয়ানো যন্ত্রের মতো— ভিতরে অন্ধকারের মধ্যে অনেকগুলো তার এবং কলবল আছে— কখন কে এসে বাজায় কিছুই জানিনে— কেন বাজে তাও সম্পূর্ণ বোঝা শক্ত— কেবল কী বাজে সেইটেই জানি...।" আমাদের মনে হয় 'অন্তর্যামী' কবিতার সূত্রপাত কবিচিত্তে হয় এই দিনেই, তারপর বহুমাস পরে তাহা পরিপূর্ণ কাব্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

এ কী কৌতুক নিত্য-নূতন ওগো কৌতুকময়ী
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবার বলিতে দিতেছ কই।
অন্তরমাঝে বসি অহরহ মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ মিশায়ে আপন সুরে।

প্রায় দশবৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ আত্মপরিচয় উপলক্ষ্যে যে রচনাটি লেখেন, তাহাতে 'অন্তর্যামী' কবিতাটির দীর্ঘ ব্যাখ্যা আছে। যে দ্বৈত ভাবের লীলারূপ তিনি কবিতার মধ্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন গদ্যপ্রবন্ধে তাহার দার্শনিক ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যাহা লিখিলেন, তাহার প্রতিক্রিয়া বাংলাসাহিত্য-জগতে আদৌ সুন্দর হয় নাই।[২]

ভাদ্রের গোড়ার দিকে কলিকাতায় আসিতেছেন, ১১ই ভাদ্র সাহিত্যপরিষদের সভা। কুষ্টিয়ার পথে নৌকায় বসিয়া যে পত্র লিখিতেছেন তাহার মধ্যে দেহের ও মনের গতির সঙ্গে নদীস্রোতের গতিধর্মের একটি সুন্দর তুলনা আছে।[৩] কলিকাতা[৪] হইতে ফিরিয়া পুনরায় নদীপথ আশ্রয় করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সাহাজাদপুরের কুঠিতে আসিয়াছেন ভাদ্রের শেষ দিকে। "অনেক কাল বোটের মধ্যে বাস করে হঠাৎ সাজাদপুরের বাড়িতে এসে উত্তীর্ণ হলে বড়ো ভালো লাগে।... আজ সকালে বসে 'ছড়া' সম্বন্ধে একটা লেখা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম— বড়ো ভালো লাগছিল। ছড়ার রাজ্যে আইনকানুন নেই, মেঘরাজ্যের মতো।" এই ছড়া 'সাধনা'য় (১৩০১ আশ্বিন) 'মেয়েলিছড়া' নামে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ দশ বৎসর পূর্বে দেশবাসীকে বাংলার গ্রাম্য সংগীত সংগ্রহ করিবার জন্য আহ্বান করিয়া স্বয়ং ছড়া সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন; এতকালে পরে সাহিত্যপরিষদের প্রেরণায় তিনি লোকসাহিত্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বাংলার আদিম কাব্যসাহিত্যের নাম হইতেছে 'ছড়া'; রবীন্দ্রনাথ বাঙালির সম্মুখে 'ছড়া'র স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া ধরিলেন। গ্রাম্য ছড়া যাহাকে কেহ কোনো দিন কোনো প্রকার সমাদর দেখায় নাই, তাহা আজ রবীন্দ্রনাথের লেখনীর সহায়তায় অপরূপ লাবণ্যে উদ্‌ভাসিয়া উঠিল। এই গ্রাম্য ছড়ার মধ্যে যে এত সৌন্দর্য থাকিতে পারে, তাহা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ভাষার ঐন্দ্রজালিকের পক্ষেই দেখানো সম্ভব। তিনি বলিলেন, কাব্যসমালোচক যদি কাব্যের শ্রেণীনির্ণয় ও অন্যান্য যুক্তিতর্ক বাদ দিয়া কাব্যপাঠজাত তাঁহার মনের আনন্দটুকুকে পাঠকশ্রেণীর মধ্যে পরিচালনা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় সমালোচনার একটি নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত। তাঁহার মতে এই সকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে। চিরত্বগুণে এ যেন শিশুর মতো। শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই, শিশু প্রকৃতির সৃজন। কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা। তেমনি ছড়াগুলিও শিশু-সাহিত্য,—

১ ছিন্নপত্র পৃ. ২৫১-৫৩। পতিসর, ২৮শে মার্চ ১৮৯৪ [১৩০০ চৈত্র ১৫]

২ বঙ্গভাষার লেখক (১৩১১) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের আত্মকথা প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'কাব্যের উপভোগ' (বঙ্গদর্শন ১৩১৪ মাঘ) প্রবন্ধে ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন। দ্র. আত্মপরিচয়, বিশ্বভারতী ১৩৫০। পৃ ১-২৮; ১২৩-২৫।

৩ ছিন্নপত্র পৃ ২৮৮। কুষ্টিয়ার পথে, ২৪শে অগষ্ট, ১৮৯৪ [১৩০১ ভাদ্র ৯]

৪ ছিন্নপত্র ২৯ অগষ্ট ১৮৯৪ [ভাদ্র ১৪] বি-ভা-প ১৩৫২ পৃ ২৩২

তাহারা মানবমনে আপনি জন্মিয়াছে। আপনি জন্মিয়াছে এ-কথা বলিবার একটু বিশেষ তাৎপর্য আছে। আমাদের মন সর্বদাই ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারা বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়া সর্বদাই এবং অকস্মাৎ প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে গিয়া উপনীত হয়। কিন্তু "যখন আমরা সচেতনভাবে কোনো একটা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া চিন্তা করি তখন এই সমস্ত ছায়াময়ী মরীচিকা মুহূর্তের মধ্যে অপসারিত হয়, আমাদের কল্পনা আমাদের বুদ্ধি একটা বিশেষ ঐক্য অবলম্বন করিয়া একাগ্রভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে।" মনের এই সজাগ অবস্থায় আমাদের অন্তর্জগতে এবং বহির্জগতের অধিকাংশই যখন সমাচ্ছন্ন হয় তখনই সাহিত্য সৃষ্টি হয়; আর তাহার বিপরীত অবস্থায় মানুষ যাহা সৃষ্টি, করে তাহাকে ছড়া বলা যাইতে পারে। সুদীর্ঘকাল শিক্ষার ও নিয়মের নিগড়ে যাহাদের মন বাঁধা তাহাদের সৃষ্ট শিল্প অশিক্ষিতপটু মানবমনের সৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইবে। শিশুর মন অশিক্ষিত, মনের প্রতাপ তাহাদের অন্তরে ক্ষীণ, সুসংলগ্ন কার্যকারণসূত্র ধরিয়া জিনিসকে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। তাই আদিম মানবের বাল্যচিত্তের অসংবদ্ধ ছড়ার ছবি তাহার এত ভালো লাগে। সেইজন্য বোধ হয় ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে তিনি যে রসাস্বাদ করিতেন ছেলেবেলাকার স্মৃতি হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

'মেয়েলি ছড়া' দীর্ঘ প্রবন্ধ[১]; তাহাতে কবি যে আশ্চর্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা রচয়িতাদের সুন্দর কল্পনার অনধিগম্য। সাজাদপুরে বাসকালে বোধ হয় ছড়া সম্বন্ধে রচনাটি শেষ করেন।[২] একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "আজকাল এই ছড়ার রাজ্যে ভ্রমণ করতে করতে আমি কতরকমের ছবি এবং কতরকমের সুখ দুঃখ ও হৃদয় বৃত্তির ভিতর দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যাচ্ছি তার আর ঠিকানা নেই।"

এই ছড়াগুলির পূর্বে যে ভূমিকাটি লিখিয়াছিলেন, তাহা আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি: "আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে নয় রসের উল্লেখ আছে; কিন্তু ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে যে রসটি পাওয়া যায়, তাহা শাস্ত্রোক্ত কোনো রসের অন্তর্গত নহে। সদ্যকর্ষণে মাটি হইতে যে সৌরভ বাহির হয়, অথবা শিশুর নবনীত-কোমল দেহের যে স্নেহোদ্বেলকর গন্ধ, তাহাকে পুষ্প, চন্দন, গোলাপজল, আতর বা ধূপের সুগন্ধের সহিত এক শ্রেণীতে ভুক্ত করা যায় না। সমস্ত সুগন্ধের অপেক্ষা তাহার মধ্যে যেমন একটি অপূর্ব আদিমতা আছে, ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে তেমনি একটি আদিম সৌকুমার্য আছে— সেই মাধুর্যটিকে বাল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাহা তীব্র নহে, গাঢ় নহে, তাহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ এবং সরস।

"শুদ্ধমাত্র এই রসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই আমি বাংলাদেশের ছড়া সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। রুচিভেদ বশতঃ সে-রস সকলের প্রীতিকর না হইতে পারে, কিন্তু এই ছড়াগুলি স্থায়িভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্তব্য, সে-বিষয়ে বোধ করি কাহারও মতান্তর হইতে পারে না। কারণ ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই ছড়াগুলি রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে; এই ছড়ার মধ্যে আমাদের মাতৃমাতামহী-গণের স্নেহ সংগীত স্বর জড়িত হইয়া আছে, এই ছড়ার ছন্দে আমাদের পিতৃপিতামহগণের শৈশবনৃত্যের নূপুর নিক্কণ ঝঙ্কৃত হইতেছে। অথচ, আজকাল এই ছড়াগুলি লোকে ক্রমশই বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে। সামাজিক পরিবর্তনের স্রোতে ছোটো বড়ো অনেক জিনিস অলক্ষিতভাবে ভাসিয়া যাইতেছে। অতএব জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।"

১ কলিকাতার নিকটবর্তী ছেলেভুলানো ছড়াগুলি সংগ্রহ করিয়া তিনি 'সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা'য় প্রবেশ করিলেন। (ব, স, প, প ; ১৩০১ মাঘ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। ছেলেভুলানো ছড়া, লোকসাহিত্য। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড।

২ ছিন্নপত্র পৃ ২১০-২১২। সাহাজাদপুর, ৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ [১৩০১ ভাদ্র ২১]

"ছড়াগুলি ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে, এজন্য ইহার বাংলায় অনেক উপভাষা (dialect) লক্ষিত হইবে। ··· ইহারা অতীত কীর্তির ন্যায় মৃতভাবে রক্ষিত নহে। ইহারা সজীব, ইহারা সচল; ইহারা দেশকাল বিষয়ে প্রতিক্ষণে আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে।" বাংলা সাহিত্যের এই একটি দিক তিনি খুলিয়া দিলেন, এবং তাঁহার পরে অনেক লেখক এই সব সংগ্রহে মন দিয়াছেন।

ছড়ার প্রতি কবির এই যে আকর্ষণ তাহা বহু বৎসর পরে বৃদ্ধ বয়সে দেখা দিয়াছিল তাঁহার নিজ কবিতার মধ্যে; শেষজীবনে কবির মনে শিশুর চোখের রঙ, শিশুমনের সুর ফিরিয়া আসিয়াছিল। পুরাতন বিষয় লইয়া ছড়া সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করিতেছেন বলিয়া মধ্যে বোধ হয় একটু প্রশ্ন উঠিয়াছে; তাই দুই দিন পরে লিখিত ডায়ারিতে পুরাতন ও নূতন সৃষ্টি লইয়া বেশ একটি মনোজ্ঞ আলোচনা আছে। "পুরাতন প্রতিদিনই নূতন করে আসে। প্রকৃতি প্রত্যহ পুনরাবৃত্তি করতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না— আমাদেরই সঙ্কোচ বোধ হয়। আমাদের দীন ভাষা তার নিত্য ব্যবহারের জীর্ণতাকে নব জীবনের উৎসধারায় প্রতিবার ধুয়ে আন্‌তে পারে না বলেই রোজ একভাবকে নূতন করে দেখাতে পারি না। অথচ সকল কবিই চিরকাল উল্‌টে পাল্‌টে একই কথা বলে আসছে। যারা ক্ষুদ্র কবি তারাই জবরদস্তি করে নূতনত্ব আনবার চেষ্টা করে— তা'তে এই প্রমাণ হয় যে, পুরাতনের মধ্যে যে চিরনূতনত্ব আছে সেটা তাদের অসাড় কল্পনা অনুভব করতে পারে না। তেমনি অনেক বোধশক্তিহীন পাঠকও আছে যারা নূতনকে কেবল তার নূতনত্বের জন্যেই পছন্দ করে। কিন্তু ভাবুক নূতনত্বের ফাঁকিকে প্রবঞ্চনা বলে ঘৃণা করে।" ছড়ার মতো পুরাতন জিনিসের সমর্থনের জন্য জবাবদিহি।[১]

সাধনার যুগে রাজনৈতিক প্রবন্ধ

'সাধনা'র গোড়ার দিকে যেসব গদ্য প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই সাময়িক সাহিত্যের আলোচনা বা সাময়িক প্রসঙ্গকথা। এছাড়া যাহা আছে তাহা হইতেছে সাহিত্য সম্বন্ধে চিঠিপত্র, ব্যাকরণ সম্বন্ধে গবেষণা, শিক্ষা ও সমাজ বিষয়ক আলোচনা। কিন্তু ১৮৯৩ সাল হইতে বৎসরাধিককাল রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিক প্রবন্ধ হইতেছে সাধনার উল্লেখযোগ্য রচনা। এই যুগের পূর্বে 'মন্ত্রী অভিষেক' নামক যে প্রবন্ধ ভারতীতে (১২৯৭) প্রকাশিত হয়, তাহা 'রাজা ও প্রজা' গ্রন্থের অন্তর্গত না হইবার যে কারণ রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন, তাহা পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। 'রাজা প্রজা'র প্রথম প্রবন্ধ 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' সাধনাযুগের প্রথম রাজনীতিক প্রবন্ধ। সাময়িক প্রসঙ্গকথার মধ্যে যেসব রাজনৈতিক আলোচনা আছে, তাহার কথা আমরা এখানে ধরিতেছি না। একথা সকলেই জানেন যে, রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত কখনো তেমন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিলেন না, কিন্তু দেশের ও দশের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ দৈন্যের সহিত সহানুভূতির অভাব কোনোদিনই তাঁহার হয় নাই।

আলোচ্যপর্বে দেশের মধ্যে যেসব প্রতিকূল ঘটনাস্রোত মানুষকে উত্যক্ত ও উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছিল,

১ দ্র বিচিত্র প্রবন্ধ ১ম সংস্করণ, স্থলে। এটা মূল পত্রের সংশোধিত পাঠ। মূল পাঠটি আছে 'ছিন্নপত্র' বিশ্বভারতী পত্রিকা তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা ১৩৫১ পৃ. ২৩৩। সাজাদপুর। ৭ই সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪। ১৩০১ ভাদ্র ২৩।

তৎসম্বন্ধে যথাতথ্য জানিতে পারিলে রবীন্দ্রনাথের এই সব সাময়িক প্রবন্ধের মর্মার্থ গ্রহণ করা সহজ হইবে। আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি সেটা হইতেছে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দ বাংলা ১৩০০ সন। ভারতীয়দের রাজনৈতিক আকাশকুসুম ১৮৯২ সালের আশার ভারতশাসনের নূতন আইন পাশের দ্বারা রূঢ়ভাবে বিচূর্ণ হইয়াছে। ১৮৬১ সালে সেই-যে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ্‌বিষয়ক আইন (Indian Councils Act) প্রবর্তিত হয়, তাহার পর ত্রিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, শাসনতন্ত্রের মধ্যে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। প্রত্যক্ষ নির্বাচনদ্বারা প্রতিনিধি-মূলক আইন সভা (Representative Government) গঠনের দাবি এ যাবৎকাল ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিকরা করিয়া আসিতেছেন বটে কিন্তু তাহা পূরণ হয় নাই। ১৮৯২ সালের নূতন আইনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের কোনো ব্যবস্থা হইল না, তদুপরি পরিষদের সামান্য কয়েকটি আসনের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বণ্টননীতির অতি ক্ষুদ্র একটি বীজ দেশের সার্বজনিক মঙ্গলের অজুহাতে সুনিপুণভাবে এমন উপ্ত হইল যে, তাহার মধ্যে যে কিছু দূষণীয় আছে, তাহা হঠাৎ কাহারো চোখে পড়িল না। এতদুপরি সরকারী চাকুরিতে ভারতীয়দের উচ্চপদ দান সম্বন্ধে বৃটিশ গবর্মেণ্টের সমস্ত প্রতিশ্রুতি নির্লজ্জভাবে উপেক্ষিত হইতেছিল। একস্‌চেনজের কারচুপিতে কোটি কোটি টাকা ভারতীয়দের লোকসান হইল; এই শ্রেণীর অসংখ্য অভিযোগ! আশাভঙ্গজনিত নিরুদ্ধ ক্ষোভের স্বল্পাংশই সাময়িক সাহিত্যে প্রকাশ পাইত। এই সাময়িক উত্তেজনা ও আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল হইতেছে রবীন্দ্রনাথের 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' শীর্ষক প্রবন্ধ।

ইংরেজ ও ভারতীয়ের মধ্যে মনোভেদ কেমনভাবে ক্রমশ গভীর ও ব্যাপক হইয়া চলিয়াছিল তাহারই কারণ অনুসন্ধান করিয়া প্রবন্ধটির সূত্রপাত। ইংরেজ এ দেশের রাজা, অথচ এদেশে বাস করে না; এদেশে না থাকিয়াও রাজ্য-শাসনের কোনোরূপ অসুবিধা তাহার হইতেছে না। শাসিতকে ভালো না বাসিয়া, তাহার ভাষা না শিখিয়া, তাহার দেশকে নিজদেশ বলিয়া স্বীকার না করিয়া ইংরেজের রাজ্যশাসনকার্য কিছুমাত্র অসাধ্য হয় নাই।

রাজা প্রজায় সম্বন্ধ কেবল খাদ্যখাদক সম্বন্ধ নহে; অন্তরের নিবিড় যোগের উপর যে উভয়ের কল্যাণ ও বিশেষ-ভাবে রাজার মঙ্গল নির্ভর করে, ইংরেজ তাহা স্বীকার করে না। শাসিত ও শাসকের মধ্যে হৃদয়ের যোগ প্রীতির যোগ বা প্রেমের যোগ বৃটিশসাম্রাজ্যের অ-সিত অধিবাসীর রাজনীতিতে অজ্ঞাত; তাহার প্রীতি স্বজাতীয়দের ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্রে উছলিয়া পড়ে, ভারতীয়দের পক্ষে সে প্রীতি অপ্রয়োজনীয়। ভারতীয়রা ইংরেজের সিম্‌প্যাথী বা সহানুভূতি পাইবার জন্য লালায়িত বলিয়া কোনো বিশিষ্ট বিলাতী পত্রিকা অনুযোগ করেন। রবীন্দ্রনাথ ইহা স্বীকার করিয়া লন, তবে বলেন দরিদ্রের মনে কেন এই সহানুভূতির আকাঙ্ক্ষা জাগে তাহাও তো বিচারের বিষয়, এই কথাগুলি নিপুণ শিল্পীর ন্যায় যুক্তিজালে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দেন। তিনি স্পষ্টই বলিলেন যে ইংরেজের উদারতা, ধর্মসম্বন্ধে নির্লিপ্ততা প্রভৃতি যে এতকাল রাজনীতির প্রচ্ছন্ন অস্ত্ররূপেই ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে তাহা গত অর্ধশতাব্দীর ইতিহাস হইতে প্রমাণিত হয়।

'রাজা প্রজা'র অন্তর্গত এই দীর্ঘ প্রবন্ধের মধ্যে লেখক বহু বিষয় আলোচনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সমস্যা-সমূহের সমাধানের যে দুইটি পথ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপত আত্মশক্তি ও অসহযোগ। ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত ও সাহেবি বেশভূষা অনুকরণ করিলে ইংরেজের সমকক্ষ হওয়া যায় না, তাহাদের আদর পাওয়া যায় না। "সম্মান বঞ্চনা করিয়া লইব না, সম্মান আকর্ষণ করিব। নিজের মধ্যে সম্মান অনুভব করিব। সেদিন যখন আসিবে তখন পৃথিবীর যে-সভায় ইচ্ছা প্রবেশ করিব।...যাচিয়া মান, কাঁদিয়া সোহাগের প্রয়োজন নাই।" যে দিন ভারতবর্ষ আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে, নিজের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে সচেতন হইবে, সেদিন সম্মান তাহার পায়ের নিকট আপনি আসিয়া পড়িবে।

ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে বিদ্বেষ শমিত করিবার উপায় "ইংরেজ হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের নিকট-কর্তব্য

সকল পালনে একান্তমনে নিযুক্ত হওয়া। কেবলমাত্র ভিক্ষা করিয়া কখনই আমাদের মনের যথার্থ সন্তোষ হইবে না।... ভিক্ষাস্বরূপে সমস্ত অধিকারগুলি যখন পাইব তখনো দেখিব অন্তর হইতে লাঞ্ছনা কিছুতেই দূর হইতেছে না। আমাদের অভাবের শূন্যতা না পুরাইতে পারিলে কিছুতেই আমাদের শান্তি নাই।"

'ইংরেজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধের শেষে তিনি গুরুগোবিন্দ সিংহের নির্জন সাধনার কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, যিনি আমাদের গুরু হইবেন তাঁহাকে বহুকাল খ্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমে অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে; নিজেকে সমস্ত সাময়িক উত্তেজনা হইতে দূরে রাখিয়া নিজের জ্ঞানকে পরিশুদ্ধ করিতে হইবে, সমস্ত মত্ততা, সমস্ত প্রলোভন ও মূঢ় জনতার আবর্ত হইতে নিজের মনকে দূরে রাখিয়া এই সাধনা চলিবে। এই সাধনা যিনি করিবেন তিনি হইবেন ভারতের নেতা, গুরু। এই প্রবন্ধ স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার প্রায় দশ বৎসর পূর্বে রচিত; এইসব রচনাই বাংলাদেশে জাতীয় আন্দোলনের পথ প্রস্তুত করিতেছিল।[১]

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের মধ্যেই ইংরেজের স্বেচ্ছাচারিতা সংযত ও শাসক সম্প্রদায়ের কূটনীতিকে ব্যর্থ করিবার জন্য আত্মশক্তি সঞ্চয় ও আত্মসম্মান জাগ্রত করিবার নূতন আন্দোলন দেখা দিল মহারাষ্ট্রদেশে। ভারতবর্ষের মধ্যে ইংরেজের অধীনতা সবশেষে স্বীকার করে শিখরা এবং তার পূর্বেই মারাঠারা। মারাঠাদের অধীনতার ইতিহাস তখনো শতাব্দী কাল অতীত হয় নাই এবং তাহারা যে একদিন সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখিয়া বৃটিশের সহিত পাল্লা লড়িয়াছিল, তাহা যে কারণেই হউক এই বীর্যবান জাতি বিস্মৃত হয় নাই। স্বাধীনতালাভের জন্য নূতন প্রচেষ্টা দেখা দিল, সে-পথ ইংরেজের নিকট আবেদন নিবেদন প্রতিবেদন প্রেরণের পথ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সুতরাং কনগ্রেস হইতে অন্যরূপ। কন্‌গ্রেসের তোষণনীতি ও আপোশরফা করিবার মনোভাবকে মহারাষ্ট্রীরা বরাবরই অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে এবং হিন্দু মহাসভা যে সেই আন্দোলনাদির প্রতিবাদে জন্মলাভ করিয়াছে, তাহা আজ সকলেই জানেন। এই নূতন আন্দোলনের নেতা হইতেছেন বালগঙ্গাধর টিলক। তিনি মহারাষ্ট্রদেশে সকল বর্ণের হিন্দুদের লইয়া সার্বজনীন গণপতি পূজা প্রবর্তন করেন; দশ দিন ধরিয়া এই উৎসব চলিত ও ঐ সময়ে মহারাষ্ট্র জাতির অতীত গৌরব কাহিনী, শিবাজী মহারাজের কীর্তি-কলাপ, তাঁহার ধর্মপ্রীতি, প্রভৃতি বিষয়ের উপর বক্তৃতা হইত। এই আন্দোলন হিন্দুদের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিল সত্য, কিন্তু 'গোরক্ষণী সভা' স্থাপিত হইলে সমস্ত আন্দোলনটা দেশের মধ্যে নূতন সমস্যা সৃষ্টি করিল। হিন্দুদের মধ্যে অসংখ্য বর্ণভেদ থাকা সত্ত্বেও গোরক্ষা সম্বন্ধে সর্বশ্রেণী, সর্ববর্ণের হিন্দুই একমত। সুতরাং মহারাষ্ট্রীয় রাজনীতিজ্ঞেরা গোরক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া নূতন হিন্দুজাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করিতে উদ্যোগী হইলেন। ইহাই হইতেছে ভারতের সমসাময়িক রাজনৈতিক পটভূমি। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসপাঠক মাত্রেই জানেন যখন কন্‌গ্রেস প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সরকার বাহাদুর ইহাকে সুনজরেই দেখিয়াছিলেন, কিন্তু দুইতিন বৎসর যাইতে

১ "যতদিন দেশী বিদেশীতে বিজিত নেতৃ সম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন আমরা নিকৃষ্ট হইলেও পূর্ব্বগৌরব মনে করিব, ততদিন জাতি-বৈর শমতার সম্ভাবনা নাই; এবং আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যতদিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, ততদিন যেন আমাদিগের মধ্যে এই জাতিবৈরীতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে। যতদিন জাতি-বৈর আছে ততদিন প্রতিযোগিতা আছে। বৈরভাবের জন্যই আমরা ইংরেজদিগের কতক কতক সমতুল্য হইতে চেষ্টা করিতেছি। ইংরেজের নিকট, অপমানগ্রস্ত, উপহসিত হইলে যতদূর আমরা তাহাদিগের সমকক্ষ হইবার যত্ন করিব, তাঁহাদের কাছে বাবু-বাছা ইত্যাদি আদর পাইলে ততদূর করিব না— কেননা সে গায়ের জ্বালা থাকিবে না। বিপক্ষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ঘটে, স্বপক্ষের সঙ্গে নহে। উন্নত শত্রু উন্নতির উদ্দীপক, উন্নত বন্ধু আলস্যের আশ্রয়। আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদের জাতিবৈর ঘটিয়াছে।"
[বঙ্কিমচন্দ্র হইতে উদ্ধৃত. দ্র 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' হইতে উদ্ধৃত পৃ. ১২৩]

না যাইতেই কনগ্রেস সম্বন্ধে ইংরেজের মত ও ব্যবহারের যুগপৎ পরিবর্তন হইয়া গেল। সরকার বেশ বুঝিলেন কনগ্রেসের বিশেষ কোনো কার্যকরী শক্তি নাই বটে তবে ইহাকে বাড়িতে দিলে বা ইহাকে ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী ও ধর্মাবলম্বী লোকদের সাধারণ মিলনক্ষেত্র হইতে দিলে ইংরেজের পক্ষে শাসনব্যাপারে অসুবিধা হইবে। এইসব আলোচনা উত্থাপন করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'ইংরেজের আতঙ্ক'[১] শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন; বোধ হয় অত্যন্ত সাময়িক ব্যাপার লইয়া আলোচনা ছিল বলিয়া প্রবন্ধটি 'রাজা ও প্রজা' গ্রন্থমধ্যে সংগৃহীত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের মধ্যে যাহা লিখিয়াছিলেন, আমরা দেখিতেছি আজ পঞ্চাশ বৎসরের ব্যবধানে পরিস্থিতির সামান্যই পরিবর্তন হইয়াছে। তবে তখন যাহা বিষবীজ রূপে রোপিত হইয়াছিল, আজ তাহা বিষবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে এবং সেই বৃক্ষচ্ছায়ে বাসের ফলে সকলের মনে যে বিষক্রিয়া হইতেছে তাহার ফলে আমরা পরস্পরকে দগ্ধ করিতেছি। ভেদনীতির সূক্ষ্ম অস্ত্রপ্রয়োগফলে সমস্ত দেশ আজ বিচ্ছিন্ন বিভক্ত ও বিবদমান। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "কনগ্রেসটার উপরে প্রত্যক্ষভাবে কোনোরূপ আঘাত করা হয় নাই। তাহার কারণ, ঢাকের উপর ঘা মারিলে ঢাক আরও বেশি করিয়া বাজিয়া উঠে। কনগ্রেসের আর কোনো ক্ষমতা থাক বা না থাক, গলার জোর আছে, তাহার শব্দ সমুদ্রপার পর্যন্ত গিয়া পৌঁছে। সুতরাং এই নবনির্মিত জাতীয় জয়ঢাকটার উপরে কাঠি না মারিয়া তাহাকে তলে তলে ছিদ্র করিবার আয়োজন করা হইল। মুসলমানেরা কনগ্রেসে যোগ দিবার উপক্রম করিয়া সহসা যে বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল তাহার কারণ বোঝা নিতান্ত কঠিন নহে—এবং পাঠকদের নিকট সে কারণ স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করা অনাবশ্যক বোধ করি।"

"কিন্তু এতদিনে ইংরেজ একথা কতকটা বুঝিয়া থাকিবে যে, হিন্দুর হস্তে পলিটিকস তেমন মারাত্মক নহে। আবহমান কালের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও ভারতবর্ষে পোলিটিকাল ঐক্যের কোনো লক্ষণ কোনোকালে দৃষ্টিগোচর হয় না। ঐক্য কাহাকে বলে মুসলমান তাহা জানে এবং পলিটিকসও তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ নহে, মুসলমান যদি দূরে দূরে থাকে তবে কনগ্রেস হইতে আশু আশঙ্কার কোনো কারণ নাই।"

কিন্তু ইংরেজের নূতন আতঙ্ক দেখা দিয়াছে গোরক্ষণী সভারূপে। হিন্দুজাতীয়তাবোধ এই গোমাতাকে আশ্রয় করিয়া যেরূপ আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করে, তাহাতে গবর্মেণ্ট শঙ্কিত, কারণ গোহত্যা নিবারণ সম্বন্ধে নেপালের গুর্খা হইতে পঞ্জাবের শিখ পর্যন্ত সকলে একমত। গোমাতাকে কেন্দ্র করিয়া বোম্বাইতে ও বিহারের নানাস্থানে যেসব দাঙ্গা হইল তাহাদের প্রতি গবর্মেণ্টের তীব্র দৃষ্টি গেল। মসজিদের সম্মুখে বাজনা নিষেধ করিয়া দিয়া 'খ্যাপা পুল নাড়িসনে' নীতি প্রবর্তিত হইল। বহু শত বৎসর পাশাপাশি বাস করিয়া হিন্দুমুসলমান কাহারও মনে যে তুচ্ছ ব্যাপারের কথা কোনোদিন মনে পড়ে নাই, তাহাকে উসকাইয়া দিয়া বিরোধের বীজ বপন করিয়া দেওয়া হইল। সুতরাং বিরোধ প্রশমিত না হইয়া উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। হিন্দুমুসলমানের বিরোধ গবর্মেণ্টের পলিসি-সম্মত না হইতে পারে, কিন্তু গবর্মেণ্ট বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুৎকারে যে ঐ অগ্নিকাণ্ডের সূচনা করিয়া থাকেন—এ বিশ্বাস এদেশে অনেকেরই। "স্যর ওয়েডারবর্ণ লিখিয়াছেন, এই সমস্ত উপদ্রবে গবর্মেণ্টের কিছু হাত আছে—ল্যান্সডাউন বলেন, এমন কথা যে বলে সে অত্যন্ত দুষ্ট। আমরা ইহার একটা সামঞ্জস্য করিয়া লই।"

'সুবিচারের অধিকার' (সাধনা ১৩০১ অগ্রহায়ণ) প্রবন্ধে এ-বিষয়ে আরও পরিষ্কার করিয়া তিনি বলেন। "অনেক হিন্দুর বিশ্বাস বিরোধ মিটাইয়া দেওয়া গবর্মেণ্টের আন্তরিক অভিপ্রায় নহে। পাছে কংগ্রেস প্রভৃতির চেষ্টায় হিন্দুমুসলমানগণ ক্রমশ ঐক্যপথে অগ্রসর হয় এইজন্য তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মবিদ্বেষ জাগাইয়া রাখিতে চান এবং মুসলমানের দ্বারা হিন্দুর দর্প চূর্ণ করিয়া মুসলমানকে সন্তুষ্ট ও হিন্দুকে অভিভূত করিতে ইচ্ছা করেন।" ইহার ফলে "উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈর্ষানল আরো অধিক করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। এবং যেখানে কোনোকালে

১ সাধনা ১৩০০ অগ্রহায়ণ। রবীন্দ্ররচনাবলী ১০ম খণ্ড পৃ ৫৩৭-৪১ পরিশিষ্ট।

বিরোধ ঘটে নাই সেখানেও কর্তৃপক্ষ আগেভাগে অমূলক আশঙ্কার অবতারণা করিয়া একপক্ষের চিরাগত অধিকার কাড়িয়া লওয়াতে অন্য পক্ষের সাহস ও স্পর্ধা বাড়িতেছে এবং চিরবিরোধের বীজবপন করা হইতেছে।" কিন্তু এই সমস্যার সমাধান কী। "দল বাঁধিয়া যে বিপ্লব করিতে হইবে তাহা নহে—আমাদের সে শক্তিও নেই। কিন্তু দল বাঁধিলে যে একটা বৃহত্ত্ব এবং বললাভ করা যায় তাহাকে লোকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারে না। শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে না পারিলে সুবিচার আকর্ষণ করা বড়ো কঠিন।"

রবীন্দ্রনাথ আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন এই যে ইংরেজের আঘাতে হিন্দুর মন ক্রমশ পরস্পরের নিকট আকৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে; কারণ, 'স্বজাতি এখনও আমাদের স্বজাতীয়দের পক্ষে ধ্রুব আশ্রয় ভূমি হইয়া উঠিতে পারে নাই। এইজন্য বাহিরের ঝটিকা অপেক্ষা আমাদের গৃহভিত্তির বালুকাময় প্রতিষ্ঠাস্থানকে অধিক আশঙ্কা করি।'

দেশের মধ্য হইতে দুই চারিজনকে 'এক-একটি বনস্পতির ন্যায় আপন অমোঘ মূলজাল চতুর্দিকে বিস্তারিত করিয়া দিয়া ভারতবর্ষের শিথিল মৃত্তিকাকে দৃঢ়বলে আঁটিয়া ধরিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ আহ্বান করিলেন। যথার্থ দেশসেবকের দেশসেবার সমস্যাগুলি দেখাইয়া তিনি বলিলেন, "অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি দণ্ডায়মান হইতে হয় তবে সর্বাপেক্ষা ভয় আমাদের স্বজাতিকে— যাহার হিতের জন্য প্রাণপণ করা যাইবে, সেই আমাদের বিপদের কারণ, আমরা যাহার সহায়তা করিতে যাইব তাহার নিকট হইতে সহায়তা পাইব না, কাপুরুষগণ সত্য অস্বীকার করিবে, নিপীড়িতগণ আপন পীড়া গোপন করিয়া যাইবে, আইন আপন বজ্রমুষ্টি প্রসারিত করিতে এবং জেলখানা আপন লৌহ-বদন ব্যাদান করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিবে, কিন্তু তথাপি অকৃত্রিম মহত্ত্ব এবং স্বাভাবিক ন্যায়প্রিয়তাবশত আমাদের মধ্যে দুই চারিজন লোকও যখন শেষ পর্যন্ত অটল থাকিতে পারিব তখন আমাদের জাতীয় বন্ধনের সূত্রপাত হইতে থাকিবে এবং তখন আমরা ন্যায়বিচার পাইবার অধিকার প্রাপ্ত হইব।"

দেশবাসী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই মর্মান্তিক বিশ্লেষণ যে কত বড়ো সত্যকথা তাহা যাঁহারা গ্রাম অঞ্চলে বাস করিয়াছেন, তাঁহারা সাক্ষ্য দিবেন। 'মেঘ ও রৌদ্র', 'গোরা', 'ঘরে বাইরে'তে তিনি এই সমস্যাটি খুব স্পষ্ট করিয়াই দেখাইয়াছেন।

রাজা ও প্রজার সম্বন্ধের মধ্যে সবথেকে যে জিনিসটা চোখে পড়ে, সে হইতেছে সুবিচার। সুবিচার পাওয়াটা প্রজার জন্মগত অধিকার। ন্যায়ান্যায়বোধ গবর্মেণ্টের থাকা উচিত—এই জনমত প্রবল হইলে প্রজার নিন্দাকে গবর্মেণ্ট শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু প্রাচ্য দেশে প্রতীচ্য দেশীয় শাসকদের ধর্মাধর্মবোধ অত তীব্র থাকিলে চলে না! তাঁহাদের এই ধারণা ক্রমেই প্রবল হইতেছে যে, 'য়ুরোপের নীতি কেবল য়ুরোপের জন্য। ভারতবর্ষীয়েরা এতই স্বতন্ত্র জাতি যে, সভ্যনীতি তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী নহে।' সে-নীতির এত বৎসরেও যে কোনো পরিবর্তন হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। 'রাজা ও প্রজা'[১] শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ শাসকদের এই মনোবৃত্তির নিন্দা করিয়াছেন। ইংরেজ ভারতবাসীকে বিশ্বাস করে না, তাই সামান্য ব্যাপারেও সে সন্দেহের চক্ষে দেখে, বিদ্রোহের আশঙ্কা করে। বিহার প্রদেশে 'গাছের ছাপ' হইতে বিদ্রোহ কল্পনা করিয়া ইংরেজরা আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিলাত-প্রবাসী প্রমথচৌধুরীকে একখানি সমসাময়িক পত্রে[২] রবীন্দ্রনাথ লেখেন "ভারতবর্ষে Tree-daubing বলে একটা ব্যাপার চলচে··· সাহেবরা বেশ একটু ত্রস্তভাবে আছে"।[৩]

১ সাধনা ১৩০১ শ্রাবণ। র-র ১০ম পৃ ৫৪২-৪৮ ২ চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড। ১৪ নং। ১৬ জুন ১৮৯১

৩ "বেহারপ্রদেশে গাছে ছাপ হইতে বিদ্রোহের আশঙ্কা করিয়া অনেক ইংরেজি কাগজে এমন কথা বলা হইয়াছে যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাতির মধ্যে কোনো কালেই যথার্থ প্রেমের সম্মিলন সম্ভব নহে।"—রাজা ও প্রজা। সাধনা ১৩০১ শ্রাবণ। র-র ১০ম পৃ. ৫৪৫

"The Tree-daubing mystery also afforded the widest grounds for speculation. This movement consisted in marking trees with daubs of mud in which were stuck hairs of different animals, buffaloes' hair and pig's bristles, according to the reports predominating; and it slowly spread through the North Gangetic districts eastwards into Bhagalpur and Purnea, and westwards through many of the districts of the N. W. Provinces. It also appeared in a few places in the districts to the South of the Ganges, and was generally attributed to wandering gangs of sadhus, or religious mendicants. The movement died out in a few months and the result seemed to shew that it had no real political significance."—Buckland," Bengal under the Lieutenants, II. p. 964

'রাজনীতির দ্বিধা' প্রবন্ধে লেখক এই ধরনের কথা দিয়া রচনা শুরু করেন যে, য়ুরোপীয়রা য়ুরোপের মধ্যে যতটা সভ্য, বাহিরে ততটা নহে, এবং তাহার প্রয়োজনও তাহারা বোধ করে না। আমাদের আলোচ্যপর্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় মাটাবিলিদের উপর ইংরেজ বণিকদের যে অত্যাচার উৎপীড়ন চলিতেছিল, তাহার কিছু কিছু কাহিনী বিলাতী কাগজ 'টুথ' হইতে কবি জানিতে পারেন। মাটাবিলিদের রাজা লবেঙ্গুলো[১] ইংরেজ মিশনারীদের কথায় বিশ্বাস করিয়া কিভাবে সর্বস্ব হারাইয়া অজ্ঞাত অখ্যাতভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইল, তাহার একমাত্র তুলনা হয় মীর কাশেমের সঙ্গে। টুথের এই কাহিনী পাঠ করিয়া কবির মনে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তাহাই 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় প্রকাশ হইয়া পড়ে। সাম্রাজ্য শাসনে ধর্মনীতির সহিত রাজনীতির দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী; নিজের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইবে এবং অন্যের অন্ন কাড়িব না এমন ধর্ম পৃথিবীতে এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইংরেজের এই মহাসমস্যা সর্বত্র— দক্ষিণ আফ্রিকায় একভাবে, ভারতে অন্যভাবে। "অতএব পঁচিশকোটি ভারতবাসীর অদৃষ্টে যাহাই থাক্ মোটাবেতনের ইংরাজ কর্মচারীকে এক্সচেঞ্জের ক্ষতিপূরণস্বরূপ রাশি রাশি টাকা ধরিয়া দিতে হইবে। সেইজন্য রাজকোষে যদি টাকার অনটন পড়ে তবে পণ্যদ্রব্যে মাশুল বসানো আবশ্যক হইবে। কিন্তু যদি ল্যাংকাশিয়ারের কিঞ্চিৎ অসুবিধা হয় তবে তুলার উপর মাশুল বসানো যাইতে পারে। তৎপরিবর্তে বরঞ্চ পাব্লিক ওয়ার্কস কিছু খাটো করিয়া এবং দুর্ভিক্ষফণ্ড বাজেয়াপ্ত করিয়া কাজ চালাইয়া লইতে হইবে।...ধর্মনীতি এমন সঙ্কটেও ফেলে!" রবীন্দ্রনাথের তখনো বিশ্বাস ছিল যে ইংরেজের ধর্মবুদ্ধি আছে; এবং সেইজন্য আমাদের পক্ষে রাজনীতির চর্চা, সভাসমিতি করা সম্ভব।

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সহিত অর্থনৈতিক সমস্যা যে বিশেষভাবে জড়িত একথা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে আবিষ্কার করা কঠিন হয় নাই কারণ গ্রামের মধ্যে বাস করিয়া দরিদ্র প্রজাদের আর্থিক অবস্থা ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দেশীয় শিল্পোন্নতির পৃষ্ঠপোষক বটে, কিন্তু ভারতগবর্মেণ্ট যখন রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য বিদেশী বস্ত্রের উপর আমদানী শুল্ক বসাইবার প্রস্তাব করিলেন, তখন তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন।[২] দেশীয় কলওয়ালারা এবং রাষ্ট্রনীতিকরা গবর্মেণ্টের এই ব্যবস্থা অনুমোদন করিলেন, তাঁহাদের বক্তব্য এই যে এই শুল্ক স্থাপিত হইলে দেশীয় শিল্পের সুবিধা হইবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলিলেন যে ইহার ফলে কাপড়ের দাম চড়িবে এবং সেই চড়া দাম বস্ত্রক্রেতা দিবে, ব্যবসায়ী দিবে না।

বিলাতী বস্ত্র আন্দোলন করিয়া বন্ধ করিবার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না; দেশী বা বিলাতীর দোহাই দিয়া সাধারণ মানুষকে চালানো কঠিন; এছাড়া পূর্বকাল হইতে অধুনা মানুষ অধিক পরিমাণে বস্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়াছে, চরকা কাটিয়া যে পরিমাণ সূতা হইত তাহাতে আজকালকার ন্যায় এত পর্যাপ্ত আচ্ছাদন লোকে পাইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ সংগঠনশীল কর্মের পক্ষপাতী; গঠনমূলক কার্যধারা যাহাতে শিল্পের উন্নতি ও বাণিজ্যের প্রসার হয় সেই দিকে তিনি নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

রবীন্দ্রনাথের মনে রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি বিচিত্র নীতি, যাহা মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে নিত্য নিয়ন্ত্রিত করিতেছে সেই বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন, তর্ক ও বিচার চলিতেছে। বিশুদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টিকালেও এইসব বিচিত্র সমস্যা কবির মানসপটে উদিত হয়; কখনো উহাদের ছায়া যথাযথ পরিপ্রেক্ষণীতে পড়িয়া অপরূপ সাহিত্য সৃষ্টি করে; কখনো বিকৃত পরিপ্রেক্ষণীতে আঘাত খাইয়া অসুন্দরকে মন্থন করিয়া তোলে। সাহিত্যের মধ্যে বিচিত্র নীতির প্রতিক্রিয়া চলিতেছে।

১ Lobengual র কাহিনী যাঁহারা জানিতে চান, তাঁহারা E. D. Morel এর The Blackman's Burden পড়িতে পারেন; পৃ ২৯-৪৩।

২ আব্দারের আইন, সাধনা ১৩০১ মাঘ। প্রবন্ধটি কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই এবং সাধনায় উহা স্বাক্ষরিত নহে। তবে আমাদের সাধনায় রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি তাঁহার রচিত বলিয়া দাগ দিয়া দিয়াছিলেন।

সাধনার সম্পাদক

আশ্বিনের (১৩০১) গোড়ায় রাজসাহীতে কয়েক দিন থাকিয়া, কবি কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। গত মাসে 'অন্তর্যামী' বলিয়া যে কবিতাটি লেখেন তাহারই ব্যাখ্যা যেন মনের মধ্যে ঘুরিতেছে; সেই কথাটা ইন্দিরা দেবীকে একখানি পত্রে[১] লিখিতেছেন, "যে-আমাকে লোকে প্রশংসা করচে, সেই আমিই যে কবিতা লিখে থাকে এ আমার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হয় না।... ভাল কবিতা ইচ্ছা করলেই লিখতে পারিনে তার একটা লাইন হারিয়ে গেলেও বহু চেষ্টায় সে লাইন গড়তে পারি কিনা সন্দেহ।" কলিকাতায় কয়েকদিন আছেন কিন্তু প্রাণ হাঁপাই-হাঁপাই করে; সেখানে 'ভাববার অনুভব করবার কল্পনা করবার, মনের ভাব প্রকাশ করবার অবসর এবং উত্তেজনা অল্পে অল্পে চলে যায়···ভিতরে ভিতরে দিন রাত্তির একটা অবিশ্রাম খুঁৎ খুঁৎ চলতে থাকে" (৯ অক্টোবর ১৮৯৪)। তাই বোধ হয় বোলপুর চলিয়া গেলেন; সেখানে "গাড়িবারান্দার ছাতের উপর বড় কেদারা পেতে একলাটি শরতের সন্ধ্যালোকে দিগন্তপ্রসারিত সবুজ মাঠের উপর আমার অন্তঃকরণের সমস্ত ভাঁজগুলি খুলে দিয়ে তাকে বিস্তৃত করে দিতে পারব"—এই আশায় যাওয়া।

তখনকার শান্তিনিকেতনে দোতলা-অতিথিশালা ও ব্রহ্মমন্দির ব্যতীত আর কোনো ঘরবাড়ি আশেপাশে ছিল না। 'এই জনশূন্য মাঠের মধ্যে শালবনের বেষ্টনে সমস্ত দরজা খোলা জাজিমপাতা দোতলায় একলা ঘরে' বসিয়া তিব্বত সম্বন্ধে ভ্রমণকাহিনী পাঠ করিতেছেন; 'সাধনা' নামে একটি কবিতা লিখিলেন এইখানে (৪ কার্তিক ১৩০১)। এই কবিতাটির মধ্যে পূর্বোল্লিখিত 'অন্তর্যামী'র সুর ধ্বনিত হইয়াছে নূতন ছন্দে। শান্তিনিকেতনে শরতের সৌন্দর্য প্রাণ ভরিয়া পান করিতেছেন, পত্রগুলির মধ্যে এই সৌন্দর্য ও মনের আনন্দ ও তৃপ্তির কথাই বারে বারে প্রকাশ পাইয়াছে। লিখিতেছেন, "আমি বস্তুর উপদ্রব এড়াবার জন্যে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই—প্রমোদের উত্তেজনার মধ্যে থাকলে আমার অন্তঃকরণ ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে আমার মনের অন্তঃপুরের ভিতরে যেন কে একজন আছে যে আমাকে বাইরের সংস্রবে আসতে দেখলে ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে।"

মানুষ সম্বন্ধে একথা অতি সত্য। তিনি একখানি পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা নিজ চরিত্রেরই সূক্ষ্ম সমালোচনা। "আমার স্বীকার করিতে লজ্জা করে, এবং ভেবে দেখতে দুঃখবোধ হয়—সাধারণতঃ মানুষের সংসর্গ আমাকে বড় বেশি উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়,—আমার চারিদিকেই এমন একটি গণ্ডী আছে আমি কিছুতেই সে লঙ্ঘন করতে পারি নে। লোকের মধ্যে আমি নূতন প্রাণী, কিছুতেই তাদের সঙ্গে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচয় হয় না—আমার যারা বহুকালের বন্ধু তাদের কাছ থেকেও আমি বহু দূরে।···অথচ মানুষের সঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাও যে আমার পক্ষে স্বাভাবিক তাও নয়—থেকে থেকে সকলের মাঝখানে গিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে···মানুষের সঙ্গের যে জীবনোত্তাপ সেও যেন মনের প্রাণধারণের পক্ষে আবশ্যক। এই দুই বিরোধের সামঞ্জস্য হচ্ছে এমন নিতান্ত আত্মীয় লোকের সহবাস, যারা সংঘর্ষের দ্বারা মনকে শ্রান্ত করে দেয় না, এমনকি যারা আনন্দ দান করে মনের সমস্ত স্বাভাবিক ক্রিয়াগুলিকে সহজে এবং উৎসাহের সহিত পরিচালিত করবার সহায়তা করে।"[২] এই সময়ে প্রমথ চৌধুরীকেও এই ধরণের একখানি পত্র লেখেন।[৩]

কার্তিক মাসে হঠাৎ জোর বাদলা শুরু হয়; কবি শান্তিনিকেতনেই; পদরত্নাবলী লইয়া বৈষ্ণব কবিতা পড়িতে মন চায়, কিন্তু সাধনার জন্য লেখা চাই-ই। "এমন দিনে কি হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গা নিয়ে পোলিটিকাল প্রবন্ধ লিখতে ইচ্ছা করে। আজ একটি অসমাপ্ত পোলিটিকাল প্রবন্ধ শেষ করতে হবে। এই প্রবন্ধটি হইতেছে 'সুবিচারের অধিকার"।[৪]

১ ছিন্নপত্র ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪। বি-ভা-প ১৩৫২ পৃ ২৩৬

২ ছিন্নপত্র। বোয়ালিয়া। ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৪। [৯ আশ্বিন ১৩০১] বি-ভা-প ১৩৫২ পৃ ২৩৫-৩৬। ৩ চিঠিপত্র ৫ম পৃ ১৬৬ ক-খ।

৪ সুবিচারের অধিকার, সাধনা ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৩০১ অগ্রহায়ণ। দ্র রাজা প্রজা।

অগ্রহায়ণ মাস হইতে সাধনার চতুর্থ বর্ষ শুরু হইল। গত তিন বৎসর সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন সম্পাদক। রবীন্দ্রনাথ প্রমথচৌধুরীকে একপত্রে লিখিতেছেন "সুধী দিনকতক সাহিত্যের সাধনা ছেড়ে অন্যবিধ সাধনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং সিদ্ধও হয়েছেন। এখন আর সাহিত্যের প্রতি তাঁর তেমন অনুরাগ এবং মনোযোগ দেখা যাচ্ছে না।"[১] রবীন্দ্রনাথ সাধনার সম্পাদক হইলেন। খুব উৎসাহের সহিতই প্রথম কয়েক মাস নিজ কর্ত্তব্য করিতে লাগিলেন; গল্প প্রবন্ধ ত আছেই ইহার উপর এ বৎসরের বৈশিষ্ট্য হইল গ্রন্থসমালোচনা। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' পুস্তক-সমালোচনার একটি নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। পাঠকের স্মরণ আছে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনা সূত্রপাত হয় গ্রন্থসমালোচনা দিয়া, 'জ্ঞানাঙ্কুরে' ভুবনমোহিনী প্রতিভাদি কাব্যের সমালোচনা লেখেন চৌদ্দবৎসর বয়সে ও 'ভারতী'তে মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা লেখেন ষোলো বৎসর বয়সে। সাধনার পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সমালোচনার যে ধারা প্রবর্তিত করিলেন, তাহা বঙ্কিমাদি পূর্বতন আচার্যের পদ্ধতি হইতে পৃথক; রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনার আদর্শ য়ুরোপীয় ক্রিটিকদের রচনার আদর্শে গঠিত। তাছাড়া কবি বলিয়া রসানুভূতির শক্তি সাধারণ হইতে অধিকই ছিল বলিয়া বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করা তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল। এই পর্বে 'রাজসিংহে'র সমালোচনা হইতেছে এই সমালোচনামালার প্রথম রচনা, সেটি প্রকাশিত হয় কয়েকমাস পূর্বে।[২] আলোচ্যবর্ষে সমালোচনা করিলেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের ফুলজানি,[৩] দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আর্য্যগাথা',[৪] সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ',[৫] বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র'[৬] ও শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তরে'র।[৭] ইতিমধ্যে বঙ্কিম[৮] ও বিহারীলালের[৯] মৃত্যুর পর তাঁহাদের সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছিলেন তাহাও সাহিত্য সমালোচনার অন্তর্গত। সকল প্রবন্ধই 'আধুনিক সাহিত্যের' মধ্যে আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বহুমুখী। ক্রিটিক রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রূপটি এ পর্যন্ত সুন্দরভাবে আলোচিত হয় নাই; তিনি অন্যের রচনারও যেমন ক্রিটিসিজম লিখিয়াছেন, নিজের রচনারও সমালোচনা কিছু কম করেন নাই; নিজের রচনাকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেখিবার তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল বলিয়া নির্মমভাবে নিজ রচনার কাটছাঁট করিতেন। কবি ও ক্রিটিকের যুগ্ম মিলন ছিল তাঁহার সত্তায়:

এই গ্রন্থ-সমালোচনার মধ্য দিয়া বহু বিষয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আর্য্যগাথা'র সমালোচনা ব্যাপদেশে তিনি ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে দীর্ঘ মন্তব্য করেন। ভারতীতে (১২৮৮) 'সঙ্গীত ও ভাব' এবং 'সঙ্গীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' সম্বন্ধে যে সমালোচনা করেন, তাহার পর প্রত্যক্ষভাবে সংগীত সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নাই। সেইজন্য এই ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে তাঁহার মত বিশেভাবে উল্লেখযোগ্য। আর্য্যগাথার সমালোচনায় তিনি লিখিয়াছিলেন, "গানে কথার অপেক্ষা সুরেরই প্রাধান্য। সুর খুলিয়া লইলে অনেক সময়ে গানের কথা অত্যন্ত শ্রীহীন ও অর্থশূন্য হইয়া পড়ে এবং সেইরূপই হওয়া উচিত; কারণ সংগীতের দ্বারা যখন আমরা ভাব ব্যক্ত করিতে চাহি তখন কথাকে উপলক্ষ্যমাত্র করাই আবশ্যক; কথার দ্বারাই যদি সকল কথা বলা হইয়া যায় তবে সংগীত সেখানে খর্ব হইয়া পড়ে।... হিন্দুস্থানী গানে কথা এতই যৎসামান্য যে তাহাতে আমাদের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না।... অধিকাংশ স্থলেই হিন্দিগানের কথায় কোনো ছন্দ থাকে না— সেইজন্যই ভালো হিন্দিগানের তালের গতিবৈচিত্র্য এমন অভাবিতপূর্ব ও সুন্দর...। তাহাকে পূর্বকৃত বাঁধা ছন্দের মধ্য দিয়া চালনা করিয়া লইয়া গেলে তাহার বৈচিত্র্য এবং গৌরবের হানি হইয়া থাকে। কাব্য স্ব-রাজ্যে একাধিপত্য করিতে পারে কিন্তু সংগীতের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে গেলে তাহার পক্ষে অনধিকারচর্চা হয়।"

১ চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড পৃ ১৬৫ : ১৮৯৪ জুন ১৬ [১৩০১ আষাঢ় ২]
২ রাজসিংহ, নূতন পরিবর্ধিত সংস্করণ। সাধনা ৩য় বর্ষ ১৩০০ চৈত্র।
৩ ফুলজানি সাধনা, ১৩০১ অগ্রহায়ণ। ৪ আর্য্যগাথা ঐ ১৩০১ অগ্রহায়ণ। ৫ সঞ্জীবচন্দ্র (পালামৌ) ঐ পৌষ।
৬ কৃষ্ণচরিত্র ঐ মাঘ ফাল্গুন। ৭ যুগান্তর ঐ চৈত্র। ৮ বঙ্কিমচন্দ্র ঐ ১৩০১ বৈশাখ। ৯ বিহারীলাল ঐ আষাঢ়।

পূর্বেই বলিয়াছি 'সাধনা'র ভার গ্রহণ করিয়া খুব উৎসাহের সহিত তিনি বিচিত্র রচনায় মন দিয়াছিলেন; কিন্তু গত তিন বৎসর একটি মাসিক পত্রিকার বহুবিধ চাহিদা মিটাইতে মিটাইতে তাঁহার মন ভিতরে ভিতরে ক্লান্ত ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল,[১] সেকথা সম্পাদকত্ব গ্রহণের সময়ে সুস্পষ্ট ছিল কিনা সন্দেহ। দুই মাসের মধ্যেই উৎসাহ নিবিয়া গিয়াছে; লিখিতেছেন, "বছরের ছয়মাস আমি এবং ছমাস আর কেউ যদি সাধনার সম্পাদক থাকে তা হলেই ঠিক সুবিধামত বন্দোবস্ত হয়। কারণ সম্বৎসর ক্ষ্যাপামি করবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই এবং সম্বৎসর অপ্রমত্ততা বজায় রেখে চলা আমার মতো লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য।...আসলে নিজের মধ্যে যে একটা চিরনূতন চিররহস্য আছে সেটাকে সলজ্জে সভয়ে গোপন করে নিজেকে সর্বসাধারণের কাছে নিতান্ত চিরাভ্যস্ত রুটীন চালিত যন্ত্রটির মতো দেখাতে হবে। সেইজন্য থেকে থেকে মানুষ বিগড়ে যায়, বিদ্রোহী হয়ে উঠে।...সেইজন্য সাহিত্য দস্তুরের আঁচল ধরা হলে নিজের উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে।"[২] ইহার পরেও মাঝে মাঝে পত্রধারার মধ্যে পত্রিকা পরিচালনা সম্বন্ধে অবসাদ বেশ স্পষ্টই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু বিচিত্র রচনার অন্ত নাই— গল্প প্রবন্ধ সমালোচনা। 'পঞ্চভূতের ডায়ারী' বহুকাল পরে পুনরায় লিখিতেছেন, মাঝে বন্ধ ছিল বৎসরকাল।

নূতন বৎসরের গল্পের মধ্যে 'প্রায়শ্চিত্ত', বিচারক ও নিশীথে বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। প্রায়শ্চিত্ত ও বিচারক গল্পে লেখক পাঠকগণকে এমন অসহায়ভাবে ফেলিয়া গেলেন যে উহারা এক হিসাবে নাটকীয় রূপ লইয়াছে। 'বিচারক' এর ঘটনাবলী অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইলেও আমাদের সম্মুখে ক্ষীরোদার নিদারুণ দুঃখময় জীবনের চিত্র নিমেষের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াই নিবিয়া যায়। কেবল কানে বাজে পতিতার করুণ প্রার্থনা, "ওগো জজবাবু, দোহাই তোমার। উহাকে বল আমার আংটিটি ফিরাইয়া দেয়।" জীবনের এত আঘাত ও অশেষ দুর্গতির মধ্যেও সে তাহার জীবনের প্রথম প্রত্যুষের প্রেমকে ভুলিতে পারে নাই। আর স্মরণে থাকে বিন্দ্যবাসিনীর স্বামীর অপরাধকে নীরবে বুকে করিয়া বরণ; স্বামীর পাপে সেই প্রায়শ্চিত্ত করিল।

এই গল্প দুইটিতে বাস্তবতার তীব্রতা যেভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, 'নিশীথে' গল্পে তেমনি প্রকাশ পাইয়াছে ভাষার তীব্র লিরিসিজম। 'নিশীথে' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পের অন্যতম বলিয়া সমালোচকরা স্বীকার করিয়া থাকেন; এখানে ঘটনা হইতে মনের লীলা বেশি প্রকাশ পাইয়া গল্পটিকে অপরূপ করিয়াছে।

পত্রিকার তাগিদে গদ্যই লেখেন বেশি। যে কবিতা লিখিলেন তাহাকে গল্পকবিতা (story in verse) বলা যায় 'যেমন ব্রাহ্মণ'[৩] (৭ ফাল্গুন ১৩০১), 'পুরাতন ভৃত্য' (১২ই)। 'ব্রাহ্মণ' কবিতার মধ্যে উপনিষদের আখ্যানাংশের যথাযথ অর্থ

১ ছিন্নপত্র ১৩০১ মাঘ ২২ ২ ছিন্নপত্র ৯ এপ্রিল ১৮৯৫; পুনশ্চ ২৪ এপ্রিল

৩ দ্র ছান্দোগ্য উপনিষদ ৪র্থ অধ্যায় ৪র্থ খণ্ড। ১। সত্যকাম জাবাল মাতা জাবালাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'হে পূজনীয়ে! আমি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে বাস করিব। আমার কি গোত্র। ২। জাবালা তাহাকে বলিল, 'হে তাত! তোমার কোন গোত্র তাহা আমি জানি না। যৌবনে বহু বিচরণ করিয়া পরিচারিণী অবস্থায় (কিংবা যৌবনে পরিচারিণী রূপে বহুলোকের পরিচর্যা করিয়া) তোমাকে লাভ করিয়াছি। আমি জানি না তোমার কোন গোত্র। আমি জাবালা, তুমি সত্যকাম: সুতরাং বলিও আমি সত্যকাম জাবাল। ৩। সত্যকাম হারিদ্রুমত গৌতমের নিকট গমন করিয়া বলিল, 'আপনার নিকট আমি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া বাস করিব; এইজন্য আপনার নিকট আসিয়াছি।' ৪। গৌতম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"হে সৌম্য! তুমি কোন্ গোত্রীয়।" সত্যকাম বলিল,"হে ভগবান! আমি কোন্ গোত্রীয় তাহা আমি জানি না। আমি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, 'আমি যৌবনে' ইত্যাদি।" ৫। গৌতম সত্যকামকে বলিলেন,"অব্রাহ্মণ কখনও এ প্রকার বলিতে সমর্থ হয় না। তুমি সমিধ কাল লইয়া আইস। আমি তোমাকে উপনীত করিব। অর্থাৎ তোমার উপনয়ন হইবে; তুমি সত্য হইতে বিচলিত হও নাই।" তাহার উপনয়ন হইবার পর তিনি ৪০০ দুর্বল ও কৃশ গো বাহির করিয়া বলিলেন "হে সৌম্য। এই সমুদয়ের অনুগমন কর।" তাহাদিগকে লইয়া প্রস্থান করিবার সময় সত্যকাম বলিল, "সহস্র সংখ্যা পূর্ণ না হইলে আমি ফিরিব না। এইরূপে সে বহু বর্ষ প্রবাস করিল, তাহাদের সংখ্যা যখন সহস্র হইল..." দ্র. ছান্দোগ্যোপনিষৎ—শ্রীমহেশচন্দ্র [ঘোষ] বেদান্তরত্ন কর্তৃক বঙ্গানুবাদ। শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত (১৯২৫) পৃ ২২২-২৭।

গ্রহণ করা হইয়াছে কিনা এ লইয়া বাংলা সাময়িক সাহিত্যে বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। অজ্ঞাত কুলশীল বালককে ব্রাহ্মণ-গুরুর পক্ষে শিষ্যরূপে গ্রহণ করাটা হিন্দুর সংস্কারে বাধে বলিয়া সাহিত্যের এই সুন্দর সৃষ্টিতে পঙ্কতিলক লেপন করিতে সমাজ-রক্ষীদের সংকোচ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটির মধ্যে মাতৃত্বের অপরাজেয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে প্রচণ্ড বিপ্লববাদকে স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম তাঁহারা হৃদয়ংগম করিতে পারেন নাই। "জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জাবালার ক্রোড়ে গোত্র তব নাহি জানি", এই উক্তির মধ্যে পবিত্র মাতৃত্বের অসংকোচ স্বীকৃতি প্রকাশ পাইয়াছে।

'পুরাতন ভৃত্য' কবিতাটির দুর্গতি হইয়াছে নবীনতমদের হাতে। এমন কি 'দুই বিঘা জমি'র একদল সমালোচক রবীন্দ্রনাথের বুর্জোয়া মনোবৃত্তি আবিষ্কার করিয়া তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন। কাব্যের দোষগুণ বিচারিয়া এসব নিন্দাবাদ হইলে দুঃখের কারণ থাকে না, কারণ কবিতা ভালোমন্দ দুইই হইতে পারে। কিন্তু কবিতার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে কতখানি হিন্দুয়ানি আছে, কতখানি ধনতন্ত্রবাদ আছে, কতখানি কম্যুনিজম-বিরোধী 'বুর্জোয়া' মনোভাব আছে, তাহারই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অপ-বিশ্লেষণ হইতে কবিতার বিচার হয়,— রসের দিক হইতে, রূপের দিক হইতে হয় না। কবি কবিতা লেখেন, নিজের আনন্দে আর গদ্য লেখেন অন্যের তাগিদে বা প্রয়োজনের খাতিরে। যেদিন ব্রাহ্মণ কবিতাটি রচনা করেন সেইদিনই লিখিলেন শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' উপন্যাসের সমালোচনা। "অদৃষ্টের পরিহাসবশত ফাল্গুনের এক মধ্যাহ্নে ·· এই নিভৃত নৌকার মধ্যে বসে···আমাকে একখানা বই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হতে হচ্ছে। সে বই কেউ পড়বে না সে সমালোচনাও কেউ মনে রাখবে না, মাঝে থেকে এমন দিনটা মাটি করতে হবে।"[১]

গরম পড়িতেই এবার কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। চৈত্রের শেষ দিকে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সাম্বৎসরিক উৎসব সভায় 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য' নামে একটি দীর্ঘভাষণ দান করেন। তাহাতে বাঙালির ভাষা ও বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধে যে আশার বাণী তিনি সেদিন শোনাইয়াছিলেন, তাহা যে তিনিই একদিন সার্থক করিবেন, সেকথা সেদিন বক্তা বা শ্রোতার স্বপ্নাতীত ছিল।[২] সাধনার শেষ গল্প 'অতিথি' (১৩০২ ভাদ্র) ও এ যুগের শেষ গল্প 'ইচ্ছাপূরণ'।[৩]

কলিকাতায় আসিলে বিচিত্র কর্মপ্রবাহ চারিদিক হইতে আকর্ষণ করে; সাধনার একঘেয়ে কাজের সূত্র হয় ছিন্ন, মন বিদ্রোহী হয় দৈনন্দিনের পুনরাবর্তনের বিরুদ্ধে। প্রতিমাসে পাঁচমিশালি রচনা লেখা, সংকলন, সম্পাদন করা, পত্রিকার প্রুফ দেখা, প্রেসের টাকার ব্যবস্থা করা, কাগজওয়ালার তাগিদ মিটাইবার জন্য কর্জ গ্রহণ এবং সেই কর্জ শোধ করিবার জন্য পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা প্রভৃতি কার্য কবিচিত্তের পক্ষে ক্লান্তিকর হইয়া উঠিতেছে। তাই বোধ হয় লিখিতেছেন, 'ইচ্ছা করচে কোনো একটা বিদেশে যেতে বেশ একটা ছবির মতো দেশ।'[৪]

নববর্ষার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কবি পুনরায় উত্তরবঙ্গে নদীপথে বাহির হইয়াছেন। সাধনার 'রাহু' সঙ্গে সঙ্গে আছে; সাজাদপুর হইতে লিখিতেছেন "বসে বসে সাধনার জন্যে একটা গল্প লিখছি— খুব একটু আষাঢ়ে গোছের

১ ছিন্নপত্র। শিলাইদহ ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫ (১৩০১ ফাল্গুন ৭)

২ বাংলা জাতীয় সাহিত্য (১৩০১ চৈত্র ২৫) র-র ৮ম পৃ ৪১৫-৩২

৩ সখা ও সাথী ১৩০২ আশ্বিন পৃ ১০৯-১৪। এই পত্রিকার (১৩০২ শ্রাবণ) সম্পাদক ভুবনমোহন রায় রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করেন; ভাদ্র সংখ্যায় কবি স্বয়ং ঐ জীবনীর কয়েকটি ঘটনা শুদ্ধ করিয়া এক পত্র দেন। আমাদের মনে হয় বাংলাসাহিত্যে 'সখা ও সাথী'তে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনী ও প্রথম আত্মচরিত প্রকাশিত হয়। সাধনা ৪র্থ বর্ষে প্রকাশিত গল্পগুলি একত্র করিয়া 'গল্প দশক' গ্রন্থ প্রকাশ করেন, (৩৫ ভাদ্র ১৩০২) 'ইচ্ছাপূরণ' গল্প সম্বন্ধে কবি সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিয়াছিলেন (৬ চৈত্র ১৩০২। শিলাইদহ) " 'সখা ও সাথী'র কর্তৃপক্ষেরা দিনকতক তাঁহাদের কাগজে একটা গল্প দিবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করেন।···আমি একটা নূতন ছোটো গল্প লিখিয়া সম্পাদকীয় perturbed spiritকে শান্তি দান করিলাম।" (দ্র. প্রবাসী ১৩৪৯ বৈশাখ পৃ ৪)।

৪ ছিন্নপত্র। কলিকাতা ১৮৯৫ এপ্রিল ৯

গল্প।"[১] 'ক্ষুধিত পাষাণ'[২] এই গল্পের মধ্যে যে প্রাসাদের কথা আছে তাহা আহমদাবাদের জজ সাহেবের বাদসাহী আমলের বাড়ির স্মৃতি বহন করিতেছে। রবীন্দ্রনাথের সেরা ছোটোগল্পের মধ্যে এইটি যে একটি সে বিষয়ে সমালোচকদের সকলেই একমত। রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্পের মধ্যে এইটি (Hungry stones) ইংরেজিতে সর্বপ্রথম অনূদিত হইয়াছিল।[৩] সাধারণভাবে দেখিতে গেলে 'ক্ষুধিত পাষাণকে গল্প বলাই কঠিন, ইহার মধ্যে গল্প কোথায়? মনের ছায়ার সহিত কল্পনার লীলা মাত্র, যে সামান্য গল্পাংশ আছে, তাহা ভুতুড়ে ব্যাপারের মতো রক্তমাংসে জড়ানো মানুষের সংযোগশূন্য। গল্প সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা এই রচনায় পূরণ হয় না; নায়ক-নায়িকাহীন ঘটনাশূন্য— এইরূপ গল্প বাংলাভাষায় নূতন সৃষ্টি—যদিও এই শ্রেণীর Phantasy য়ুরোপীয় লেখকদের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। কবি এই রচনাটি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "একটু একটু ক'রে লিখছি এবং বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক বর্ণ ধ্বনি আমার লেখার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি যে সকল দৃশ্য লোক ও ঘটনা কল্পনা করছি পাঠকেরা এর অর্ধেক জিনিসও পাবে না ···আমার গল্পের সঙ্গে যদি এই মেঘমুক্ত বর্ষাকালের স্নিগ্ধ রৌদ্র রঞ্জিত ছোটো নদীটি এবং নদীর তীরটি এই গাছের ছায়া এবং গ্রামের শান্তিটি এমনি অখণ্ডভাবে তুলে দিতে পারতুম তাহলে সবাই তার সত্যটুকু একেবারে সমগ্রভাবে একমুহূর্তে বুঝে নিতে পারত। অনেকটা রস মনের মধ্যেই থেকে যায়, সবটা পাঠককে দেওয়া যায় না।" সম্পাদকত্বের কাজ যে ক্রমেই দুর্বহ হইয়া উঠিতেছে তাহা কয়দিন পরে রচিত 'শীতে ও বসন্তে' (১৮ আষাঢ় ১৩০২) কবিতায় কবি অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রকাশ করিলেন। আর্টের সহিত বাস্তবের সংগ্রাম চলিতেছে; সম্পাদকের দৈনন্দিন তুচ্ছ আলোচনায় কবিচিত্ত ক্ষুব্ধ, ভারাক্রান্ত, বিদ্রোহী। সমস্ত অন্তর আশ্রয় খুঁজিতেছে মানসসুন্দরীর মধ্যে। প্রার্থনার ন্যায় আকুতি প্রকাশ পাইতেছে—

এস এস বঁধু এস	আনো পরানের প্রীতি,
আধেক আঁচরে বসো,	থাক্ প্রবীণের ভাষ্য।
অবাক অধরে হাসো,	আনো বাসনার ব্যথা
ভুলাও সকল তত্ত্ব।	অকারণ চঞ্চলতা
তুমি শুধু চাহ ফিরে,	আনো কানে কানে কথা,
ডুবে যাক ধীরে ধীরে	চোখে চোখে লাজ দৃষ্টি।
সুধা সাগরের নীরে	অসম্ভব, আশাতীত
যত মিছা যত সত্য।	অনাবশ্য, অনাদৃত
আনো গো যৌবন গীতি,	এনে দাও অযাচিত
দূরে চলে যাক নীতি,	যত কিছু অনাসৃষ্টি। ··

এই কবিতাটির মধ্যে যেমন আছে কাজের পাশাপাশি প্রকৃতির পরিহাস 'সুগভীর পরিহাসে হাসিতেছে নীল শূন্য, তেমনি পরদিনে লিখিত পত্রে আছে এই কথাটিরই আভাস। "কাজ করতে করতে কোনো একদিকে মুখ ফেরালেই দেখতে পাই নীল আকাশের সঙ্গে মিশ্রিত সবুজ পৃথিবীর একটা অংশ একেবারে আমাদের ঘরের লাগাও হাজির।··· আমি আকাশ এবং আলো এত অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসি। আকাশ আমার সাকি, নীল স্ফটিকের স্বচ্ছ পেয়ালা উপুড় করে ধরেছে···যেখানে আমার এই সোনার মদ সব চেয়ে সোনালি ও স্বচ্ছ সেইখানে আমি কবি, আমি রাজা, সেইখানে আমার সঙ্গে বরাবর ঐ সুনীল নির্মল জ্যোতির্ময় অসীমতার এই রকম প্রত্যক্ষ অব্যবহিত যোগ থাকবে।[৪]

১ ছিন্নপত্র সাজাদপুর ১৮৯৫ জুন ২৮, ১৩০২ আষাঢ় ১৫। ২ সাধনা ১৩০২ শ্রাবণ।
৩ Mod. Rev. 1910 Feb. Trd. by Pannalal Bose
৪ ছিন্নপত্র। সাজাদপুর ২রা জুলাই ১৮৯৫। ১৩০২ আষাঢ় ১৯

আষাঢ়ের শেষাশেষি কবি কলিকাতায় আসেন। শ্রাবণের ১৩ তারিখে এমারেল্ড থিয়েটরে বিদ্যাসাগরের স্মৃতিদিবসে যে সভা হয় তাহাতে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত সম্বন্ধে বক্তৃতা পাঠ করিলেন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হইয়াছে, চারি বৎসর পূর্বে ১২৯৮। ইতিমধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিবার সুযোগ কবির হয় নাই। এতদিন পরে তিনি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ও ঋণ স্বীকার করিবার সুযোগ পাইলেন।

চিত্রার শেষ পর্ব

নূতন তত্ত্ব, নূতন তথ্য, নব উত্তেজনা চিরদিনই বারেবারে কবিকে আহ্বান করিয়াছে; অপরিচিতের মধ্যে অজ্ঞানার মধ্যে কৌতূহল আছে, আকস্মিকতার আনন্দ আছে; সুখদুঃখের আনন্দ অবসাদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় যে রসসৃষ্টি হয়, তাহা কবির পক্ষে সম্ভোগের বিষয়। চিরনবীনের জন্য লালায়িত কবিচিত্ত যে-নূতনের আকর্ষণে এবার সাড়া দিল, আদৌ তাহা শাস্ত্রমতে কবিজনোচিত নহে, তাহা সরস্বতীর মানসকুঞ্জবনে বিহার নহে, উহা অত্যন্ত বস্তুতান্ত্রিক বৈষয়িক ব্যাপার— 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী'-বাণীকে সার্থক করিবার জন্য ব্যাকুলতা।

বিষয়টা ভালো করিয়া বলা উচিত। আমাদের আলোচ্যপর্বে (১৩০২) সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও বীরেন্দ্রনাথের পুত্র বলেন্দ্রনাথ কুষ্টিয়াতে ব্যবসায়ের জন্য এক কুঠি (ফার্ম) খোলেন। ঠাকুরপরিবারের পূর্বপুরুষরা ব্যবসায়বাণিজ্যের পথ ধরিয়া ধনজনমান লাভ করেন ও আভিজাত্যের গৌরব অর্জন করেন। ব্যবসায়ের ধন হইতে তাঁহাদের জমিদারির উদ্ভব। কিন্তু ক্রমে সেই ধন বদ্ধজলের মতো হইয়া গেল। তাহা আর বাড়ে না; অথচ জলাশয়ের পাশে বসতি বাড়িয়া চলিয়াছে। তাই বোধ হয় পূর্বপুরুষদের ধনাগমের কীর্তিকাহিনী স্মরণ করিয়া এই দুই যুবক কুষ্টিয়ায় ব্যবসায়ে নামেন। প্রত্যক্ষভাবে না নামিলেও অর্থ দিয়া, উৎসাহ দিয়া, উপদেশ দিয়া রবীন্দ্রনাথ কুষ্টিয়ার এই ব্যবসায়ের সহিত যুক্ত হইয়া পড়িলেন। এখন হইতে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে মহা কর্মী মনে করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেছেন, পত্রধারায় এমনকি কবিতার মধ্যেও এই বিপুল কর্মচেতনার সমর্থন পাওয়া যায়। ব্যবসায়বাণিজ্যের তথাকথিত হীনতা আজ কবির দৃষ্টিভঙ্গিতে তাহার সর্বগ্লানি চ্যুত হইয়া নূতনভাবে দেখা দিতেছে। বোধ হয় নিজের অন্তরের বিরোধকে শান্ত করিবার জন্য একখানি পত্রে লিখিতেছেন:

"কর্ম যে উৎকৃষ্ট পদার্থ সেটা কেবল পুঁথির উপদেশরূপেই জানতুম। এখন জীবনেই অনুভব করচি কাজের মধ্যেই পুরুষের যথার্থ চরিতার্থতা; কাজের মধ্য দিয়েই জিনিস চিনি, মানুষ চিনি, বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে সত্যের সঙ্গে মুখামুখি পরিচয় ঘটে।"... "যত বিচিত্র রকমের কাজ হাতে নিচ্চি ততই কাজ জিনিসটার পরে আমার শ্রদ্ধা বাড়ছে।"..."দেশ দেশান্তরের লোক যেখানে বহুদূরে থেকেও মিলেছে সেইখানে আজ আমি নেমেছি; মানুষের পরস্পর শৃঙ্খলাবদ্ধ এই একটা প্রয়োজনের চিরসম্বন্ধ, কর্মের এই সুদূরপ্রসারিত ঔদার্য আমার প্রত্যক্ষগোচর হয়েছে। কাজের একটা মাহাত্ম্য এই যে কাজের খাতিরে নিজের ব্যক্তিগত সুখদুঃখকে অবজ্ঞা ক'রে যথোচিত সংক্ষিপ্ত ক'রে চলতে হয়।"[১]

কর্মজীবনে নামিয়া-পড়িবার জন্য রবীন্দ্রনাথের মনের যে আকুতি, 'নগর সঙ্গীত' কবিতায় তাহা অন্যভাবে

১ ছিন্নপত্র। শিলাইদা। ১৪ আগস্ট ১৮৯৫ [৩০ শ্রাবণ ১৩০২]

মূর্তিগ্রহণ করিয়াছে। এই কবিতাটির প্রত্যেক পংক্তিতে তাঁহার মনের মধ্যে কর্মের জন্য যে আনন্দ ও আবেগ সঞ্চালিত হইতেছিল, তাহারই উচ্ছ্বাসময় বাণী শ্রুত হয়। কবির বয়স এখন ৩৪ বৎসর—পরিপূর্ণ যৌবনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইতেছে কর্মে ও সাহিত্যে।

> ঘূর্ণচক্র জনতা-সংঘ, বন্ধনহীন মহা-আসঙ্গ, তারি মাঝে আমি করিব ভঙ্গ আপন গোপন স্বপনে।
> ক্ষুদ্র শান্তি করিব তুচ্ছ, পড়িব নিম্নে চড়িব উচ্চ, ধরিব ধূম্রকেতুর পুচ্ছ, বাহু বাড়াইব তপনে।
> নব নব খেলা খেলে অদৃষ্ট, কখনো ইষ্ট, কভু অনিষ্ট, কখনো তিক্ত, কখনো মিষ্ট, যখন যা দেয় তুলিয়া।
> সুখের দুখের চক্রমধ্যে কখনো উঠিব উধাও পদ্যে, কখনো লুটিব গভীর গদ্যে নাগরদোলায় দুলিয়া।
> হাতে তুলি লব বিজয়বাদ্য, আমি অশান্ত, আমি অবাধ্য, যাহা কিছু আছে অতি-অসাধ্য তাহারে ধরিব সবলে।
> আমি নির্মম, আমি নৃশংস, সবেতে বসাব নিজের অংশ, পরমুখ হতে করিয়া ভ্রংশ তুলিব আপন কবলে।[১]

এই কবিতাটির মধ্যে জীবনের কর্মযজ্ঞে অন্ধ নিয়তির টানে জীবের আত্মবলিদানের কথা রূপকচ্ছলে বলা হইয়াছে। এই কর্মের মধ্যে জড়াইয়া পড়িয়া জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির বেশ একটু বদল হইয়াছে। কিছুকাল পূর্বে (ছিন্নপত্র। ২ জুলাই ১৮৯৩) 'সুখতত্ত্ব শাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়' বলিয়া যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহা হইতে এখন সুরের তফাত স্পষ্ট। জীবনকে ব্রতযাপনের মতো করিয়া দেখিলে এই সত্য আবিষ্কার করা যায় যে "অল্প সুখই প্রচুর সুখ এবং সুখই একমাত্র সুখকর নয়।" "হৃদয়ের প্রাত্যহিক পরিতৃপ্তির প্রাচুর্যে মানুষের কোনো ভালো হয় না— তাতে প্রচুর উপকরণের অপব্যয় হ'য়ে কেবল অল্পই সুখ উৎপন্ন করে এবং কেবল আয়োজনেই সময় কেটে গিয়ে উপভোগের অবসরমাত্র থাকে না।"[২] এই উপকরণবাহুল্যের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ চিরদিন তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু কোনোদিনই এই বাহুল্যকে বর্জন করিতে পারেন নাই; কারণ আর্ট-এর সৃষ্টিসৌন্দর্য প্রয়োজনের অতিরিক্তের উপর বনিয়াদ গড়ে। রবীন্দ্রনাথ কবি ও আর্টিস্ট— তাই তিনি দার্শনিকভাবে বাহুল্যের নিন্দা করিলেও আর্টিস্ট হিসাবে সেই প্রয়োজনাতিরিক্ত, অপর্যাপ্ত বাহুল্যের উপরে সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন।

এদিকে 'সাধনা' বন্ধ হইয়া গেল।[৩] গল্পলেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে (১৩০২ অগ্র ৯) কবি লিখিতেছেন, "সম্প্রতি সাধনা ছাড়িয়া দিয়া আমি বহুকাল পরে আমার চিরবন্ধু আলস্যের প্রিয় সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি।"[৪] রবীন্দ্রনাথ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। পত্রিকা বন্ধ হইবার সাহিত্যিক বা আধ্যাত্মিক কারণ যাহাই থাকুক, প্রত্যক্ষ ও বাস্তব কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট; সাধনা চালাইবার ব্যয়ভার ক্রমেই একা তাঁহার উপর আসিয়া পড়িতেছিল; যথাসময়ে ন্যায্য প্রাপ্য টাকাপয়সা আদায়ে শৈথিল্যের জন্য ও যথানিয়ম প্রেস ও কাগজওয়ালার বিল পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকায় ঋণভার বাড়িয়া চলিতেছিল। এই ক্রমশ বর্ধমান ঋণভার বহন করিয়া চলা অসম্ভব হইয়া উঠিল তাছাড়া, মনও ক্রমে 'কেজো' কাজের মধ্যে গিয়া পড়িতেছিল।

মাসিক কাগজের নিত্যনৈমিত্তিক লেখা সরবরাহের দায় হইতে আজ কবি মুক্ত। মন সেদিক হইতে নিরুদ্‌বিগ্ন। বহুকাল পরে তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীকে ফিরিয়া পাইলেন। কবি নৌকায় আছেন, নাগর নদীর ঘাটে পতিসরে নৌকা

১ নগর-সংগীত, চিত্রা। ২ ছিন্নপত্র। কুষ্টিয়া ৫ অক্টোবর ১৮৯৫।

৩ সাধনা চারি বৎসর চলিয়াছিল, ১২৯৮ অগ্রহায়ণ হইতে ১৩০২ কার্তিক।

৪ পত্র। প্রবাসী ১৩৪৭ বৈশাখ।

বাঁধা। সন্ধ্যার পর বাতি জ্বালাইয়া ইংরেজ সাহিত্যসমালোচক ডাউডেনের [১] সদ্য প্রকাশিত New Studies in Literature (1895) পড়িতেছেন। তত্ত্বের তপ্তখোলায় রসের যে পরিণতি হয়, তাহা যথার্থ রসিক হৃদয়কে তৃপ্তি দেয় না; কবির হৃদয় শুকাইয়া উঠিল, বইটা টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া যেমনি বাতি নিবাইয়া দিলেন, "অমনি চারিদিকের মুক্ত জানালা দিয়া এক মুহূর্তে অনন্ত আকাশভরা পূর্ণিমা আমার বোটে পরিপূর্ণ করিয়া নিঃশব্দ উচ্চহাস্যে সকৌতুকে হাসিয়া উঠিল। যখন সমস্ত আকাশে সৌন্দর্য আপনি আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে তখন বাতি জ্বালাইয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাউডেনের পুঁথি হইতে সৌন্দর্যতত্ত্ব খুঁটিয়া খুঁটিয়া উদ্ধার করার দুশ্চেষ্টা অত্যন্ত হাস্যজনক...। অনন্ত নক্ষত্রলোক হইতে এই নিস্তরঙ্গ নদীতল পর্যন্ত কি পরিমাণ অসীম নিঃশব্দতা, অথচ কানের কাছে ডাউডেন সাহেবের এই অকিঞ্চিৎকর বিতর্কে অন্তহীন আকাশের বিশ্বম্ভর নীরবতা একেবারে অগোচর হইয়া গিয়াছিল।"[২]

এই সন্ধ্যাদিনের কথাই তিনি লিখিয়াছিলেন 'পূর্ণিমা' কবিতায়। "আমি গৃহকোণে তর্কজালবিজড়িত ঘন বাক্য বনে শুষ্কপত্র পরিকীর্ণ অক্ষরের পথে একাকী ভ্রমিতেছিনু শূন্য মনোরথে তোমারি সন্ধানে।" শিলাইদহ হইতে লিখিত একখানি পত্রের মধ্যে এই কবিতাটির ভাব ব্যাখ্যা আছে, "আমার ক্ষুদ্র একরত্তি বাতির শিখা সয়তানের মতো নীরস হাসি হাসছিল, অথচ সেই অতি ক্ষুদ্র বিদ্রূপ হাসিতে এই বিশ্বব্যাপী গভীর প্রেমের অসীম আনন্দচ্ছটাকে একেবারে আড়াল করে রেখেছিল।"[৩]

'পূর্ণিমা' কবিতাটি রচনার দুই দিন পরে লিখিলেন 'চিত্রা' নামে কবিতাটি, যেটি পরে 'চিত্রা' কাব্যগুচ্ছের ভূমিকা-রূপে ব্যবহৃত হয়। পূর্ণিমায় যে 'বিশ্বব্যাপিনী লক্ষ্মী'র রহস্য রূপটি চকিতে দেখিতে পাইলেন, তাহাকে আহ্বান করিলেন নূতন সংজ্ঞায় "জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে, তুমি বিচিত্ররূপিনী।" পূর্ণিমায় যাহাকে বলিয়াছেন 'অনন্তের অন্তর-শায়িনী' তাহাকে এইখানে বলিতেছেন,'অন্তর মাঝে শুধু তুমি এক একাকী তুমি অন্তরব্যাপিনী।...তুমি অন্তরবাসিনী।' একদিকে যিনি বিশ্বব্যাপিনী লক্ষ্মী অপরদিকে তিনিই অন্তরবাসিনী প্রেয়সী। এই নৈর্ব্যক্তিক সৌন্দর্যসত্তা নারীরূপে কল্পিত; তাহারই সেবা কবির চিরাকাঙ্খিত। সেই সৌন্দর্য প্রতিমার কাছে কবির 'আবেদন', 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।' 'অকাজের কাজ যত আলস্যের সহস্র সঞ্চয়। শতশত আনন্দের আয়োজন' এর মধ্যে এই তাহার প্রার্থনা। আর সে কী পুরস্কার চায়। "প্রত্যহ প্রভাতে ফুলের কঙ্কণ গড়ি কমলের পাতে আনিব যখন, পদ্মের কলিকাসম ক্ষুদ্র তব মুষ্টিখানি করে ধরি মম আপনি পরায়ে দিব, এই পুরস্কার।" কবি সৌন্দর্যলক্ষ্মীর নিকট হইতে যাহা প্রার্থনা করেন, তাহা 'ধন নয়, মান নয়, শুধু ভালোবাসা'। আজ কর্মসাগরে নামিয়া কবিচিত্ত অন্তরে অন্তরে বিশেষভাবেই মানসসুন্দরীর জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে, কর্মযজ্ঞের উদ্দেশ্যে যতই উচ্ছ্বসিত সংগীত রচনা করুন, কবিচিত্ত পিপাসিত যথার্থ গীত সুধা তরে। কবির নিজের ভাষায় বলি, "আমি তাহারই কাছে আবেদন করিয়াছি যে, তোমার কাছে নানা লোক নানা বড়ো বড়ো পদ পাইয়াছে, আমি তাহার কোনোটাই চাই না; আমি তোমার মালঞ্চের মালাকর হইব, আমি তোমার নিভৃত সৌন্দর্যরাজ্যে তোমার গোপন সেবায় নিযুক্ত থাকিব; এক কথায় আমি কবিতা লিখিব, আমি বিশ্বহিতের জন্য সম্পাদকি করিতে পারিব না, কবিতা লিখিয়াও তোমার কাজ করা হইবে, হিতকার্য না করিতে পারি যথাসাধ্য আনন্দের আয়োজন করিতে পারিব।"[৪] বহু বৎসর পরে রবীন্দ্র রচনাবলী অন্তর্গত 'চিত্রা'র ভূমিকায় কবির নিবেদনের

১ Edward Dowden (1833-1913)

২ ব্যারিস্টার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র, ৬ চৈত্র ১৩০২। পতিসর। নাগর নদীর ঘাট। দ্র প্রবাসী ১৩৪৯ বৈশাখ।

৩ পূর্ণিমা। ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩০২, শিলাইদহ। দ্র. চিত্রা।

৪ ছিন্নপত্র, শিলাইদা ১২ই ডিসেম্বর ১৮৯৫ [১৩০২ অগ্রহায়ণ ২৭]।

মধ্যে আছে, "কর্মক্ষেত্রে যেখানে কার্যক্ষেত্রের জনতায় কর্মীরা কর্ম করছে সেখানে আমার স্থান নয়। আমার স্থান সৌন্দর্যের সাধকরূপে একা তোমার কাছে।"১

সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে সেবা করিয়া কবি সেবক, মালঞ্চের মালাকর। কিন্তু সেও তো সম্বন্ধ বটে, হউক না কেন 'দীন ভৃত্য'। কিন্তু বিশ্বসৌন্দর্য তো সম্পূর্ণরূপে নৈর্ব্যক্তিক (abstract); সেই সৌন্দর্যের সহিত কি কোনো নামযুক্ত সম্বন্ধ হইতে পারে। সত্যই তো সৌন্দর্যের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহা সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাম, তাহা অনামিকা,— সকল লোকাচারবিশ্রুত সম্বন্ধের অগোচর, সকল ভাষার অতীত, সকল মানব-অভিজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে। সেই অবচ্ছিন্ন সুন্দরকে কবি 'উর্বশী'২ কবিতায় বন্দনা করিলেন—

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী, হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।

বিশ্বের অন্তরে চিরন্তন অপরিবর্তনীয় যে সৌন্দর্য রহিয়াছে, সে মানসলোকে অখণ্ড পরিপূর্ণ সত্যরূপে বিরাজিত, উর্বশী সেই অনামিক সৌন্দর্যের প্রতীক। সমসাময়িক পত্রে কবি লিখিতেছেন, "পৌরাণিক উর্বশীর নাম অবলম্বন করিয়া আমি যাহাকে কম্‌প্লিমেণ্ট দিয়াছি তাহাকে অনেক দিন হইতে অনেক কবি কম্‌প্লিমেণ্ট দিয়া আসিতেছেন। গেটে যাহাকে বলেন The Eternal Woman (Ewige Weibliche), তাহাকে উর্বশীমূর্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন। সে আমাদের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ নহে, বধূ নহে, মাতা নহে, কন্যা নহে, সে রমণী,— সে আমাদের লজ্জা হরণ করে, সে দিব্যরূপে আমাদের স্বর্গে বিরাজ করে, সে আমাদের ভুলায়, সে আমাদের পৌত্রদিগকেও চঞ্চল করিয়া তুলিবে—অর্জুন তাহার সহিত পূর্বপুরুষগত সম্পর্ক পাতাইতে গিয়াছিলেন সেটা অর্জুনের ভ্রম— তাহার সহিত কাহারও কোন বন্ধন নাই; যে আদিম রহস্য-সমুদ্র হইতে দেবতারা সংসারের সমস্ত সুধা ও বিষ উন্মথিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই পিতৃমাতৃহীন গৃহহীন অতল হইতে এই চিরযৌবনা অপ্সরী উঠিয়া আজ পর্যন্ত মুনিদের ধ্যানভঙ্গ, কবিদের কবিত্ব-উদ্রেক, এবং দেবতাদের চিত্ত-বিনোদন করিয়া আসিতেছে। সে নৃত্য করে, গান করে, আনন্দ দান করে এবং আমাদের বাসনার চরম তীর্থ স্বর্গলোকে বাস করে। আর একটি woman পৃথিবীতে থাকেন তিনি আমাদের সেবা করেন, কাজ করেন, কল্যাণ বিধান করেন, তিনি আমাদিগকে ভালবাসেন, তাঁহাকে আমরা কাঁদাই দুঃখ দিই, তিনি তাঁহার অশ্রুধারাধৌত প্রফুল্লতার কিরণে আমাদের এই মাটির ঘরটিকে উজ্জ্বল করিয়া রাখেন। আদর্শ রমণীকে দুই ভাগ করিয়া দেখিলে একভাগে the beautiful একভাগে the good পড়ে। উর্বশী কবিতায় প্রথমোক্তটির স্তবগান আছে— 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায় দ্বিতীয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়।"১

কিন্তু মানুষ এই abstractionকে,—নামহীন, সম্বন্ধহীন প্রেমকে লইয়া সুখী হইতে পারে না; সে চায় প্রেমকে নিতান্ত আপনার করিয়া অন্তরঙ্গভাবে পাইতে। যে-প্রেম 'নাহি জ্বালে সন্ধ্যাদীপ খানি' অথবা 'সলজ্জ বাসর শয্যাতে স্তব্ধ অর্ধরাত্রে' স্মিতহাস্যে আসে না, সেই 'নিষ্ঠুরা বধিরা' অবচ্ছিন্নতা মানুষের প্রেমপিপাসা কি মিটাইতে পারে। তাই প্রেমার্ত মানুষ স্বর্গ চায় না; 'শোকহীন হৃদিহীন সুখস্বর্গভূমি মানুষের দুঃখে উদাসীন', তাহার দুর্বলতায়। কঠোর দেবতাদের মধ্যে লক্ষ বৎসর বাস করিয়া 'স্বর্গ হইতে বিদায়' লইবার সময় যে মানুষ আশা করে 'লেশমাত্র অশ্রুরেখা স্বর্গের নয়নে' দেখা যাবে, সে মর্মান্তিক ভুল করে। স্বর্গের দেবতারা মর্তের পাষাণ দেবতাদের ন্যায়ই ভাবশূন্য মূর্তিমাত্র; তাহাদের মুখচ্ছবি সুখদুঃখের চঞ্চলতায় কখনো বিকার প্রাপ্ত হয় না। তাই 'বৈষ্ণব কবিতা'য় কবি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "এত প্রেমকথা, রাধিকার চিত্ত-দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার আঁখি হতে।" তাই আজও স্বর্গের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—

১ পত্র। ব্যারিস্টার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে শিলাইদহে ৬ চৈত্র ১৩০২। দ্র. প্রবাসী ১৩৪৯ বৈশাখ।

২ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে (২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩) রবীন্দ্রনাথ উর্বশীর ব্যাখ্যা করেন। রবি-রশ্মি।

থাক স্বর্গ হাস্যমুখে, কর সুধাপান
দেবগণ! স্বর্গ তোমাদেরি সুখস্থান
মোরা পরবাসী। মর্তভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি— তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা; যদি দুদিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দু দণ্ডের তরে।

উর্বশী কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নারীর সকল সম্বন্ধকে নেতি নেতি করিয়া অবচ্ছিন্ন সম্বন্ধে দেখাইয়াছেন; কিন্তু সেখানে নারীর অখণ্ড পরিপূর্ণ মূর্তি কবি দেখান নাই। 'বিজয়িনী' সেই হিসাবে 'উর্বশী'র পরিপূরক কবিতা অথবা উর্বশী সার্থকতা লাভ করিয়াছে 'বিজয়িনীর' মধ্যে। 'সৌন্দর্যকে সমস্ত মানব সম্বন্ধের বিকার হইতে, সমস্ত প্রয়োজনের সংকীর্ণ সীমা হইতে দূরে, তাহার বিশুদ্ধিতায় ও তাহার অখণ্ডতায় উপলব্ধি করিবার তত্ত্ব নিহিত আছে' এই কবিতায়। এই বিশুদ্ধ অখণ্ড সৌন্দর্যে কামনার স্পর্শ পৌঁছায় না; অনঙ্গের সায়ক ব্যর্থ হয়, সৌন্দর্যের অন্তস্থলে সে যাইতে অক্ষম।

মদন, বসন্ত সখা ... অধীর চঞ্চল
উৎসুক অঙ্গুলি তার, নির্মল কোমল
বক্ষস্থল লক্ষ্য করি লয়ে পুষ্পশর
প্রতীক্ষা করিতেছিল নিজ অবসর।

কিন্তু বিজয়িনীর নগ্ন নিরাভরণ অবিচলিত কামনাহীন নির্বিকার সৌন্দর্যের নিকট মদন পরাজিত হইল।

উঠিল অনঙ্গদেব। ...মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল তরে। পরক্ষণে ভূমিপরে
জানু পাতি বসি, নির্বাক বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশর ভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা উপচার
তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদন পানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।

আবেদন, উর্বশী ও স্বর্গ হইতে বিদায় কবিতা ত্রয়ের১ মধ্যে কবিচিত্তের একটি অখণ্ড ধারা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার পরের তিনটি কবিতার২ মধ্যে মানবীয় প্রেমের সত্যকার মাধুর্যটুকু দেখাইয়াছেন; এই ধরিত্রীকে এই পৃথিবীর প্রেমকে নিবিড়ভাবে পাইবার আকুলতা ব্যক্ত হইয়াছে। 'দ্বন্দ্বহীন শোকহীন, পরিপূর্ণ সুখের নিবাস' স্বর্গ হইতে বিদায় লইয়া মানুষ দিনশেষে এই অক্ষমা ধরণীর প্রিয়তমের বক্ষে সান্ত্বনা 'সন্ধান' করে ও তাহাকে তাহার 'শেষ উপহার' নিবেদন করে।

কাব্যরচনায় ছেদ পড়িল। শান্তিনিকেতনে মন্দির প্রতিষ্ঠার পঞ্চম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব; রবীন্দ্রনাথকে যাইতে হইল। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি উপাসনার বিবিধ অংশ গ্রহণ করেন; রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে 'দণ্ডায়মান হইয়া…'ভোজ্যোৎসর্গ করিলেন।৩ ইহার বেশি করিবার অধিকার তখনো প্রাপ্ত হন নাই, ভ্রাতুষ্পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁহা হইতে বয়োকনিষ্ঠ হইলেও মহর্ষির ধর্মসাহিত্য আলোচনায় সর্বদাই পিতামহকে সাহায্য করিতেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত এইসব দিকে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি যায় নাই; তথাচ পারিবারিক কর্তব্য পালনে তিনি কখনো পরাঙ্মুখ হইতেন না।

মাঘোৎসবের কয়েকদিন পরে বলেন্দ্রনাথের বিবাহ৪ হইল; তদুপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ উৎসব (২২ মাঘ) নামে

১ আবেদন, উর্বশী ও স্বর্গ হইতে বিদায় পরপর তিন দিনে রচিত, ২২, ২৩, ২৪ অগ্রহায়ণ ১৩০২।

২ দিনশেষে (২৮) সান্ত্বনা, ২৯ অগ্রহায়ণ, শেষ উপহার (১লা পৌষ) রচিত।

৩ ত-বো-প ১৮১৭ শক [১৩০২] পৃ ১৫১

৪ প্রফুল্লময়ী দেবী [বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ও বলেন্দ্রনাথের জননী], আমাদের কথা, দ্র. প্রবাসী ১৩৩৫।

কবিতাটি রচনা করেন, 'মোর অঙ্গে অঙ্গে যেন আজি বসন্ত উদয় কত পত্রপুষ্পময়।' আর বিবাহোপলক্ষে 'নদী' কবিতাটি তিনি উৎসর্গ করেন।১ কবিতাটি নিশ্চয়ই কিছুকাল পূর্বে রচিত, নতুবা বিবাহের দিনে মুদ্রিত হইয়া উপহৃত হইতে পারে না।

নদী কবিতাটি এখন 'শিশু' কবিতাগুচ্ছের মধ্যে চাপা পড়িয়াছে কিন্তু প্রথমে উহা পৃথক বই ছিল। বাংলাদেশের নদী রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি পর্বে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া ছিল বলিয়া নদীর ন্যায় কবিতা রচনা সম্ভব হয়। তিনি ছিন্নপত্রের একস্থানে লিখিয়াছিলেন পদ্মা তাঁহার কাছে বড়ো প্রিয়; সেটা যে কত সত্য তা কবির পদ্মা জীবন আলোচনা করিলে স্পষ্ট হয়।

নদী কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গির বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। প্রথমেই চোখে পড়ে ইহার যুক্তবর্ণহীন শব্দ২ চয়নে কবিপ্রতিভা; ছন্দের গতিলালিত্য শিশুমনে বিচিত্র হিল্লোল সৃষ্টি করে। কিন্তু সবথেকে লক্ষণীয় হইতেছে এই কাব্যের imagery বা রূপসৃষ্টি। ইহার একমাত্র তুলনা হইতেছে জাপানী চিত্রশিল্পী তাইকানের নদীর দীর্ঘ ছবি (scroll) — পর্বত হইতে নামিয়া মহাবিচিত্রের মধ্য দিয়া নদীর গতি ও মহাসাগরে তাহার অবসান।

নদী রচনার আরও একটি প্রেরণা ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার বয়স আট বৎসর, জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথের বয়স ছয় বৎসর। তাহাদের কল্পনাশক্তি, সৌন্দর্যবোধ উদবুদ্ধ করিবার জন্য অনুকূল কাব্য সৃষ্টির প্রয়োজনবোধে এই যুক্তাক্ষরহীন কবিতাটি রচনা করেন বলিয়া আমাদের অনুমান।

সৌন্দর্যের যে পরিকল্পনা কবিচিত্তকে মুগ্ধ করিতেছে, তাহার প্রতীক হইতেছে নারী, একজন স্বর্গের অপর জন মর্ত্যের — উর্বশী ও বিজয়িনী। দুইটি দুইরূপের — উর্বশী তাহার সৌন্দর্য, তাহার নৃত্যকুশলতা, তাহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সচেতন। অন্যকে মুগ্ধ করিবার কলা সে জানে, কিন্তু নিজে কাহারও প্রেমে মুগ্ধ না হইবার শক্তি সে রাখে। দেব মানব সকলেই তাহার প্রেমকণা পাইবার জন্য উন্মত্ত কিন্তু সে নির্বিকার; সে সুখ দেয় কিন্তু শান্তি দেয় না। 'বিজয়িনী'র মধ্যে নারীর আত্মচেতনা যেন আজও কুণ্ঠিত হয় নাই, সে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ অথচ নিজ পরিপূর্ণ যৌবনশোভা সম্বন্ধে অচেতন; মুগ্ধ করিবার কলা সে জানে না, মুগ্ধ হইবার প্রেরণ সে পায় না। সে যেন জীবন্ত 'প্রস্তরমূর্তি'।৩ সেই পাষাণীর দিকে তাকাইয়া মানুষের অন্তর তৃপ্তি মানে না; সে সেই 'অনম্বরা অনাসক্তা চির-একাকিনী' আপন সৌন্দর্যধ্যানে তপস্যামগনাকে বলে 'কথা কও, কথা কও, কথা কও, প্রিয়ে'। মানবের আকুলিত মনের দুঃসহ বেদনা বুঝিবার শক্তি তাহার নাই; কিন্তু তাহার অনাঘ্রাত পুষ্পসৌন্দর্য যথার্থ প্রেমিকের স্পর্শচেতন চিত্তকে ভরিয়া তোলে। সে অন্ধ, বিজয়িনীর ন্যায় মূঢ় — তাহার পুষ্পমালিকা কবির চিত্তে।

'কী ধন তুমি করিছ দান না জান আপনি।' পুষ্পসম অন্ধ তুমি অন্ধ বালিকা
দেখোনি নিজে মোহন কী যে, তোমার মালিকা ৪

চিত্রার শেষ কয়টি কবিতার মধ্যে ভাব সামঞ্জস্য অস্পষ্ট নহে। এই কবিতারাজির মধ্যে 'জীবনদেবতা' (২৯ মাঘ) ও 'সিন্ধুপারে' (২০ ফাল্গুন) পাঠক ও সমালোচকগণের দৃষ্টি ও ক্রিটিসিজম সর্বাপেক্ষা অধিক আকর্ষণ করিয়াছে। বৎসরাধিক কাল পূর্বে রচিত 'অন্তর্যামী' ও 'সাধনা' কবিতার সুর 'জীবনদেবতা'র মধ্যে পুনরায় ধ্বনিয়া উঠে;

১ নদী [বাল্য গ্রন্থাবলী ২] ২২ মাঘ ১৩০২। বাল্যগ্রন্থাবলীর ১সংখ্যক বই 'শকুন্তলা' শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

২ 'নদী' কবিতায় যুক্তবর্ণ আছে স্বপন, ক্ষেত ও ক্রমে। ইতিপূর্বে অক্ষয়চন্দ্রসরকার 'গোচরণের মাঠ' নামে যুক্তাক্ষরহীন কাব্য লিখিয়াছিলেন।

৩ প্রস্তরমূর্তি (২৪ মাঘ ১৩০২)।

৪ নারীর দান (২৫ মাঘ)।

যে সৌন্দর্যসুধা কবি এতকাল চিত্ত ভরিয়া পান করিয়াছেন তাহা তাঁহার অন্তরে কি সার্থকতা আনিয়াছে সেই প্রশ্ন মনে উদয় হইতেছে। তাই যেন তিনি চিরসুন্দরকে শুধাইতেছেন—

ওহে অন্তরতম, মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ আসি অন্তরে মম।

এই কবিতার অর্থ লইয়া 'চিত্রা' প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যিকদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পত্রের উত্তরে 'জীবন দেবতা' ও 'সিন্ধুপারে' সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা১ দান করেন, তাহাই বোধ হয় এই কবিতা সম্বন্ধে কবির সব প্রথম কৈফিয়ত।

কয়েক বৎসর পরে অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন যখন কবির 'কাব্যগন্থ' নূতনভাবে সাজাইতেছেন, সেই সময়ে 'জীবনদেবতা' খণ্ডের অর্থ স্পষ্ট করিয়া জানিবার জন্য কবিকে তিনি পত্র লেখেন; তাহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন হইতে জীবনদেবতাবাদের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া পত্র দেন (৫ ফাল্গুন ১৩০৯)। জীবনদেবতার এই রহস্যবাদ মোহিতচন্দ্র 'কাব্যগ্রন্থে'র ভূমিকায় আলোচনা করেন। ইহাই জীবনদেবতা সম্বন্ধে প্রথম মুদ্রিত ব্যাখ্যা (১৩১০)।

কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইবার এক বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ জীবনদেবতাবাদের দার্শনিক ব্যাখ্যায় স্বয়ং প্রবৃত্ত হন। বঙ্গবাসী হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে কবি তাঁহার জীবনকথা লিখিয়া দিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু যাহা লিখিলেন তাহাতে জীবনকাহিনী ছিল না—ছিল তাঁহার কাব্যজীবনের অভিব্যক্তির কাহিনী বা জীবনদেবতাবাদের ব্যাখ্যান। তিনি লিখিয়াছিলেন "আমার সুদীর্ঘ কালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি, তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই—এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম, তখন মনে করিয়াছি আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি কথাটা সত্য নহে। কারণ, সেই খণ্ড কবিতাগুলিতে আমার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হয় নাই— সেই তাৎপর্যটি কি, তাহাও আমি পূর্বে জানিতাম না। এইরূপে পরিণাম না জানিয়া আমি একটির সহিত একটি কবিতা যোজনা করিয়া আসিয়াছি; তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, সে কথা অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল। ··· কিন্তু আজ বুঝিয়াছি, সে সকল লেখা উপলক্ষ্যমাত্র, তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে, সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর একজন রচনাকারী আছেন, যাঁহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান। শুধু কবিতা লেখার একজন কর্তা কবিকে অতিক্রম করিয়া তাহার লেখনী চালনা করিয়াছেন? তাহা নহে। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখ দুঃখ, তাহার সমস্ত যোগ বিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন কিনা জানি না, কিন্তু আমার সমস্ত বাধা বিপত্তিকে ও আমার সমস্ত ভাঙাচোরাকেও তিনি নিয়তই গাঁথিয়া জুড়িয়া দাঁড় করাইতেছেন। কেবল তাই নহে, আমার স্বার্থ, আমার প্রবৃত্তি, আমার জীবনকে যে অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেছে, তিনি বারে বারে সে সীমা ছিন্ন করিয়া দিতেছেন— তিনি সুগভীর বেদনার দ্বারা, বিচ্ছেদের দ্বারা বিপুলের সহিত বিরাটের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া দিতেছেন। ··· যে শক্তি আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে, সমস্ত ঘটনাকে ঐক্যদান, তাৎপর্যদান করিতেছে, আমার রূপান্তর—জন্মজন্মান্তরকে এক সূত্রে গাঁথিতেছে, যাহার মধ্যে ঐক্য অনুভব করিতেছি, তাহাকেই 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছিলাম,— 'ওহে অন্তরতম মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ আসি অন্তরে মম'। কবিতাটির শেষে আছে,

১ পত্র ৬ চৈত্র ১৩০২।

২ পত্রাবলী, বি-ভা-প-১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৩৪৯ শ্রাবণ পৃ, ৩৩-৩৫

এই প্রশ্ন 'এখন কি শেষ হয়েছে, প্রাণেশ, যা কিছু আছিল মোর— ·· জীবনকুঞ্জে অভিসারনিশা আজি কি হয়েছে ভোর।" তাই একখানি পত্রে[১] লিখিয়াছিলেন, "আমার দ্বারা যা-কিছু হওয়া সম্ভব সব যদি শেষ করে থাক, এখন যদি তোমার আঘাতে আমার এ বীণা আর না বেজে ওঠে, তোমার ইঙ্গিতমাত্র আমার মনোঅশ্ব আর ছুটতে না পারে, তবে এই জীর্ণতা অসাড়তা ভেঙে চুরে ফেলে আবার আমাকে নূতন রূপ নূতন প্রাণ দাও; নূতন লোকের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আমাদের অনাদি কালের চিরপুরাতন বিবাহবন্ধন নবীকৃত করে দাও।

নূতন করিয়া লহ আর বার চির-পুরাতন মোরে—
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায় নবীন জীবনডোরে।

জীবনদেবতার মূলসূত্রটি 'সিন্ধুপারে' (২০ ফা ১৩০২) কবিতায় শেষ বলা হইয়াছে রূপকচ্ছলে— অনেকটা কঙ্কাল, ক্ষুধিত পাষাণের ভুতুড়ে বর্ণনার সঙ্গে ইহার মিল। জীবন ও মৃত্যু দুইটি পরস্পর-বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাপার নহে, উহাদের একটি অপরের প্রতিবাদ নহে, উহারা উভয়ে একই অস্তিত্বধারার দুইটি দিক মাত্র। মৃত্যু জীবনকে সমষ্টি জীবনের মধ্যে বহন করিয়া লইয়া যায়, মৃত্যু অবসান বা নির্বাসন নহে। (রবিরশ্মি পৃ. ৩৫৮)। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন— "যে প্রাণলক্ষ্মীর সঙ্গে ইহজীবনে আমাদের বিচিত্র সুখদুঃখের সম্বন্ধ, মৃত্যুর রাত্রে আশঙ্কা হয় সেই সম্বন্ধবন্ধন ছিন্ন ক'রে বুঝি আর কেউ নিয়ে গেল। যে নিয়ে যায়, মৃত্যুর ছদ্মবেশে, সেও সেই প্রাণলক্ষ্মী। পরজীবনে সে যখন কালো ঘোমটা খুলবে তখন দেখতে পাবো চিরপরিচিত মুখশ্রী।...আসল কথা পুরাতনের সঙ্গে মিলন হবে নূতন আনন্দে।" (ঐ পৃ. ৩৫৯)।

কবির নিজের ভাষায় বলি—"মৃত্যুর পরে 'সিন্ধুপারে' এই জীবনদেবতাই আমাকে চিরপরিচিত প্রিয় মূর্তিতে দেখা দিয়েছিলেন, আমি মিথ্যা ভয় করেছিলাম, মনে করেছিলাম, যিনি আমাদের এই জীবন লীলাভূমির মাঝখানে আনিয়া আমাদের সহিত খেলা করিয়াছিলেন তিনি বুঝি চিরকালের মতো ছুটি লইলেন, আর একজন কোন্ অচেনা লোক আমাদের পূর্বাপরের মাঝখানে একটা ভয়ঙ্কর বিচ্ছেদ আনয়ন করিতেছে, কিন্তু সে লোকটি যেমনি ঘোমটা খুলিয়া ফেলিল অমনি দেখিলাম আমাদের এই চিরকালের সঙ্গীটি একটুখানি ভয় দেখাইয়া আরো যেন অধিকতর ভালোবাসার সঙ্গে কাছে টানিয়া লইল।"[১]

সমগ্র 'চিত্রা' কাব্যগুচ্ছের একটি মূল সুর আবিষ্কারের চেষ্টা শুধু যে সাহিত্যিকরা করিয়াছেন, তাহা নহে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সমগ্রের মধ্য হইতে একটি সাধারণ সুর বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। চিত্রা গ্রন্থ প্রকাশের কয়েকদিন পরে লিখিতেছেন— "যিনি 'আমি' নামক এই ক্ষুদ্র নৌকাটিকে সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র হইতে লোক লোকান্তর যুগ যুগান্তর হইতে একাকী কালস্রোতে বাহিয়া লইয়া আসিতেছেন,···যিনি বাহিরে নানা এবং অন্তরে এক, যিনি ব্যস্তভাবে সুখদুঃখ অশ্রু হাসি এবং গভীরভাবে আনন্দ 'চিত্রা' গ্রন্থে আমি তাহাকেই বিচিত্রভাবে বন্দনা করিয়াছি। ধর্মশাস্ত্রে যাহাকে ঈশ্বর বলে তিনি বিশ্বলোকের, আমি তাঁহার কথা বলি নাই, যিনি বিশেষ রূপে আমার, যিনি ছাড়া আর কেহ এবং কিছুই আমাকে আনন্দ দিতে পারে না, চিত্রাকাব্যে তাঁহারই কথা আছে।" চিত্রা রচনার পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরে (১৩৪৭) রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই কাব্য সম্বন্ধে 'রচনাবলী'তে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আর এই সঙ্গে উদ্ধৃত করিলাম না।

'চিত্রা' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার (ফাল্গুন ১৩০২) অনতিকাল পরেই তাঁহাকে জমিদারি পরিদর্শনের জন্য

১ পত্র। ৬ চৈত্র ১৩০২। প্রবাসী ১৩৪৯ বৈশাখ।

যাত্রা করিতেছে। তৎপূর্বে ২৬ ফাল্গুন (১৩০২) কলিকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে শ্রীমান্ সুহৃৎনাথ চৌধুরীর দীক্ষা কালে রবীন্দ্রনাথ তথায় সংগীত করেন। সুহৃৎনাথ হইতেছেন আশুতোষ চৌধুরী ও প্রমথনাথ চৌধুরীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ডাক্তার। অল্পকাল পরে দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা পৌত্রী নলিনী দেবীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। বোধ হয় বিবাহের পূর্বে মহর্ষির বিধানমতে কন্যাপ্রার্থীকে ব্রাহ্মধর্মে যথাযথ ভাবে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই বিবাহ উপলক্ষে (১৩ বৈশাখ ১৩০৩) রবীন্দ্রনাথ একটি গান রচনা করেন—'উজ্জ্বল করহে আজি এ আনন্দ রাতি।'[১]

চৈতালি, মালিনী, ও বৈকুণ্ঠের খাতা

চৈতালি—প্রথমার্ধ

চৈত্র মাসের মাঝামাঝি হইতে রবীন্দ্রনাথ পতিসরের সম্মুখে নৌকায় আছেন। "পতিসরের নাগর নদী নিতান্তই গ্রাম্য। অল্প তার পরিসর, মন্থর তার স্রোত। তার এক তীরে দরিদ্র লোকালয়, গোয়ালঘর, ধানের মরাই, বিচালির স্তূপ; অন্য তীরে বিস্তীর্ণ ফসলকাটা শস্যক্ষেত ধূ ধূ করছে।··· দুঃসহ গরম। মন দিয়ে বই পড়বার মতো অবস্থা নয়। বোটের জানালা বন্ধ করে খড়খড়ি খুলে সেই ফাঁকে দেখছি বাইরের দিকে চেয়ে। মনটা আছে ক্যামেরার চোখ নিয়ে, ছোটো ছোটো ছবির ছায়া ছাপ দিচ্ছে অন্তরে। অল্প পরিধির মধ্যে দেখছি বলেই এত স্পষ্ট করে দেখছি। সেই স্পষ্ট দেখার স্মৃতিকে ভরে রাখছিলুম নিরলংকৃত ভাষায়। অলংকার প্রয়োগের চেষ্টা জাগে মনে যখন প্রত্যক্ষবোধের স্পষ্টতা সম্বন্ধে সংশয় থাকে। যেটা দেখছি, মন যখন বলে, এটাই যথেষ্ট, তখন তার উপরে রঙ লাগাবার ইচ্ছাই থাকে না। চৈতালির ভাষা এত সহজ হয়েছে এই জন্যেই।"

'চিত্রা' কাব্যগুচ্ছ প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে গত মাসের শেষে (ফাল্গুন ১৩০২); সেই কবিতারাজির সুরের রেশ এখনো সম্পূর্ণ মিলিয়া যায় নাই, তাই দেখা যায় "এর প্রথম কয়েকটি কবিতায় পূর্বতন কাব্যের ধারা চলে এসেছে। অর্থাৎ সেগুলি যাকে বলে লিরিক।" 'উৎসর্গ' (আজি মোর দ্রাক্ষা কুঞ্জবনে) কবিতাটি মোহিতচন্দ্র সেন 'কাব্যগ্রন্থের' জীবনদেবতা খণ্ডের অন্তর্গত করিয়াছিলেন। 'গীতহীন', 'স্বপ্ন' প্রভৃতি কয়েকটি এই লিরিকগুচ্ছের অন্তর্গত।

কবির অন্তরে নানা প্রশ্ন ওঠে, নানা ছবি জাগে। মানুষকে তো সদাসর্বদাই দেখিতেছেন; অন্তর্যামী ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রশ্নও নিত্য জাগে। অন্তর্যামী বা ঈশ্বর নৈর্ব্যক্তিক হইলেও অদৃশ্য নহেন, তিনি পৃথিবীতে মানুষের মধ্যেই আছেন। পৃথিবীকে ভালোবাসিয়াছেন, একথা কবি বহু কবিতায় নানাভাবে বলিয়াছেন; কিন্তু কবির সে ভালোবাসায় প্রকৃতিকে বেশি করিয়া নিকটে পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে, মানুষ সেখানে গৌণ; মানুষ প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়া তাহাকে সুন্দর করিয়াছে মাত্র। কিন্তু এই নূতন কবিতাগুচ্ছে মানুষ এবং প্রকৃতি হাত ধরাধরি করিয়া জগৎসংসারে অবতীর্ণ। তাই দেখি মানবলোকের মহিমায় 'চৈতালি'র নূতন কবিতাগুলি সমৃদ্ধ। 'দেবতার বিদায়', 'পুণ্যের হিসাব', 'বৈরাগ্য' কবিতাত্রয়ে 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়' বাক্যটির তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। কড়ি ও কোমলের 'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই' হইতে আরম্ভ করিয়া চৈতালির কবিতা কয়টির মধ্য দিয়া 'নৈবেদ্যে'র 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ' এই সুরে পৌঁছাইয়াছিলেন।

১ দ্র সাহিত্য ৭ম বর্ষ ১৩০৩ বৈশাখ।

নৌকার খড়খড়ি খুলিয়া বাহিরকে দেখিতেছেন, সম্মুখ দিয়া ছায়ার মতো ঘটনাস্রোত বহিয়া চলিয়াছে, তাহাই কাব্যের তুলিতে আঁকিয়া চলিয়াছেন। 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় "ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জর স্থির স্রোতো-হীন' চিত্রখানি জাগিয়া উঠিয়াছে। 'পল্লীগ্রামে' 'সামান্য লোক', 'দুর্লভ জন্ম', 'খেয়া', 'কর্ম' কবিতায় সামান্য জিনিসের চিত্র। কর্ম, স্নেহদৃশ্য ও করুণা কবিতার মধ্যে আর্তের জন্য বেদনা অত্যন্ত স্পষ্ট। কর্মের ঘটনাটি সত্য, ছিন্নপত্রে[১] বিবৃত আছে। 'বন ও রাজ্য' 'সভ্যতার প্রতি' 'বন' 'তপোবন' কবিতা চতুষ্টয় একত্র পঠনীয়; কবির মন একটি বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে যাইতে যাইতে তপোবনে আসিয়াছে ও কালিদাসের কথা স্মরণে উদয় হইতেছে; কালিদাসের কাব্য ঋতুসংহার ও মেঘদূতের কথা মনে পড়ে। অত্যন্ত পুরাতন কথা কল্পনার চোখে দেখেন, আবার হঠাৎ বাতায়ন পথ দিয়া চোখে পড়ে অত্যন্ত বাস্তব সত্য "নদীতীরে মাটি কাটে সাজাইতে পাঁজা পশ্চিমি মজুর।" আর একদিন দেখেন, "উলঙ্গ সে ছেলে ধূলি 'পরে বসে আছে পা দুখানি মেলে।" চোখে পড়ে "ছোটো মেয়ে খেলাহীন, চপলতাহীন", তাহার জন্য অকারণ দরদ মনকে ব্যথিয়া তোলে।

কোন্ অজানিত গ্রামে কোন্ দূরদেশে
কার ঘরে বধূ হবে, মাতা হবে শেষে,
তার পরে সব শেষ— তারো পরে, হায়,
এই মেয়েটির পথ চলেছে কোথায়।

শান্ত সমাহিত ভাবে ধরিত্রীর দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া উহাকে বড়োই ভালো লাগিতেছে, তাই 'মধ্যাহ্নে' যেন বলিতেছেন, "আমি মিলে গেছি যেন সকলের মাঝে; ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জন্মস্থলে বহুকাল পরে।" 'চৈতালি'র সুর পৃথিবীকে, মানব জীবনকে স্বীকার করিয়া নেওয়ার সুর। তাই এই পৃথিবীকে এত সুন্দর দেখেন—

ধন্য আমি হেরিতেছি আকাশের আলো
ধন্য আমি জগতেরে বাসিয়াছি ভালো। (প্রভাত)

এই ধরায় জন্মলাভ দুর্লভ; সুতরাং ইহার আনন্দ কবি নিঃশেষে পান করিতে চান—

যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়।
সকলি দুর্লভ যেন আজি মনে হয়। (দুর্লভ জন্ম)।
ভালোমন্দ দুঃখ সুখ অন্ধকার আলো,
মনে হয় সব নিয়ে এ ধরণী ভালো। (ধরাতল)

এই সৌন্দর্য ও আত্মতৃপ্তির চোখে তিনি পদ্মাকে দেখিতেছেন; সেই চোখেই বিশ্বের 'তরুলতা, পশুপক্ষী, নদনদীবন, নরনারী' সকলের মিলনের মাঝে অপরূপ সুন্দরকে দেখিতেছেন; কবির চোখে কোথাও কোনো অসংগতি নাই, সমস্ত অর্থপূর্ণ প্রাণময়। 'পদ্মা' কবিতায় কবি তাঁহার অন্তরের একটি কথা খুবই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন; ছিন্নপত্রে বহুবার পদ্মার প্রতি তাঁহার মনের একান্ত অনুরাগের কথা প্রকাশ পাইয়াছে।

কত দিন ভাবিয়াছি বসি তব তীরে,
পরজন্মে এ ধরায় যদি আসি ফিরে,
যদি কোনো দূরতর জন্মভূমি হতে ···
পার হয়ে এই ঠাঁই আসিব যখন
জেগে উঠিবে না কোনো গভীর চেতন ?···
আর বার সেই তীরে সে সন্ধ্যাবেলায়
হবে না কি দেখাশুনা তোমায় আমায়!

সেই দিনে লিখিত হইলেও 'স্নেহগ্রাস' সম্পূর্ণ ভিন্ন অভিঘাতে রচিত; পরদিনের লেখা 'বঙ্গমাতা' 'দুই উপমা' 'অভিমান' 'পরবেশ' (২৬ চৈত্র) কবিতা চতুষ্টয়ও যে একই মনোভাবের প্রতিক্রিয়াউদ্‌বুদ্ধ তাহা কবিতা কয়টি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে।

বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্যের ধ্যানে ধরাকে অখণ্ডরূপে দেখিতেছেন; সেই ধরিত্রীর অখণ্ড জীবনের মধ্যে মানুষের সৃষ্ট আকস্মিকতা বা আংশিকতার বাধা তাঁহার কবিচিত্তকে পীড়িত করে; সে বেদনা তিনি চিরদিনই

১ ছিন্নপত্র ১৮৯৫ আগস্ট ১৪। [১৩০২ শ্রাবণ ৩০] পৃ. ৩৩৮]

পাইয়াছেন, 'মানসী'র যুগে বাঙালির খর্ব খণ্ডিত জীবনের দিকে তাকাইয়া তিনি সেই বেদনায় বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন।" আজও বাঙালির অসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র সীমায়িত পঙ্গু জীবনের কথা ভাবিয়া অত্যন্ত বেদনায় বলিতেছেন,

অন্ধ মোহবন্ধ তব দাও মুক্ত করি।
বেষ্টন করিয়া তারে আগ্রহ পরশে,
জীর্ণ করি দিয়া তারে লালনের রসে,
মনুষ্যত্ব-স্বাধীনতা করিয়া শোষণ
আপন ক্ষুধিত চিত্ত করিবে পোষণ?…
নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্বদেবতার,
সন্তান নহে গো মাতঃ সম্পত্তি তোমার।

'বঙ্গমাতা'কে আহ্বান করিয়া বলেন—

পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে…
পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভালো ছেলে ক'রে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে।
সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি করে মানুষ কর নি।

'দুই উপমা'য় বলিতেছেন,

সর্বজন সর্বক্ষণ চলে যেই পথে
তৃণগুল্ম সেথা নাহি জন্মে কোনো মতে;
যে জাতি চলে না কভু, তারি পথ' পরে
তন্ত্র-মন্ত্র সংহিতায় চরণ না সরে।

'অভিমান' কবিতায় তীব্র উত্তেজনা দেখা দিয়াছে—

যারা শুধু মরে কিন্তু নাহি দেয় প্রাণ,
কেহ কভু তাহাদের করেনি সম্মান।
যে তোমারে অপমান করে অহর্নিশ
তারি কাছে তারি পরে তোমার নালিশ।
নিজের বিচার যদি নাই নিজ হাতে,
পদাঘাত খেয়ে যদি না পার ফিরাতে,
তবে ঘরে নতশিরে চুপ ক'রে থাক্,
সাপ্তাহিকে দিগ্‌বিদিকে বাজাস নে ঢাক্।

বিদেশী পোশাকের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অবজ্ঞা চিরদিনের; 'পরবেশ' কবিতায় লিখিতেছেন—

কে তুমি ফিরিছ পরি প্রভুদের সাজ।
ছদ্মবেশে বাড়ে না কি চতুর্গুণ লাজ।

এই পাঁচটি কবিতার মধ্যে কিছুদিন পূর্বে রচিত 'অপমানের প্রতিকার' প্রভৃতি প্রবন্ধের রেশ ধ্বনিত হইতেছে; নাগর নদী তীরে অকস্মাৎ এই উত্তেজনা বোধের কারণ কী আমরা জানি না। ইহার পরের কবিতাগুলি সেই ধরনের। যাহাদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "চৈতালিতে অনেক কবিতা দেখতে পাই যাতে গানের বেদনা আছে কিন্তু গানের রূপ নেই। "তুমি পড়িতেছে হেসে তরঙ্গের মতো এসে হৃদয়ে আমার"কে গান বললেও সেটি গান হয় নাই; কারণ তখন যে-আঙ্গিকে আমার লেখনীকে পেয়ে বসেছিল তাতে গানের রস যদি বা নামে, গানের সুর জায়গা পায় না।"

এই নাগর নদীতীরে 'বর্ষশেষ' উদ্‌যাপন করিলেন; সেদিন মনকে অভয় দিয়া ভয়কে বলিতেছেন—

দেবতা রাক্ষস নহে মেলি মৃত্যুগ্রাস;
প্রবঞ্চনা করি তুমি দেখাইছ ত্রাস।
তুমি কে কর্কশ কণ্ঠ তুলিছ ভয়ের।
আনন্দই উপাসনা আনন্দময়ের।

শেষ পংক্তিটির মধ্যে যে একটি গভীর তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে তাহার সহিত এখন আমাদের প্রায়ই সাক্ষাৎ হইবে। ইহার দুই তিন দিন পরে পতিসর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ফিরিলেন। গত ১১ই চৈত্র হইতে ২রা বৈশাখ ১৩০৩

সালের মধ্যে এই কবিতাগুলি রচিত ; স্বল্প সময়ের মধ্যে রচিত হইলেও কবিমনের বিচিত্র স্পন্দনের লীলা আমরা অনুভব না করিয়া থাকিতে পারি না।

মালিনী

সাজাদপুর হইতে জমিদারি সংক্রান্ত কার্য উপলক্ষে এবার চলিলেন উড়িষ্যা। রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে ভ্রমণকালে তিনি বিস্তর বই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Sanskrit Buddhist Literature in Nepal তাঁহার সঙ্গে প্রায়ই থাকিত। বইখানিতে প্রাচীন পুঁথির বর্ণনা ও অবদানগ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত গল্প দেওয়া আছে। এই সব গল্প হইতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বহু কবিতা ও নাট্য-উপাদান সংগ্রহ করেন, যথাযথস্থানে আমরা সেসব দৃষ্টান্তের কথা বলিয়া যাইব। এবার এই গ্রন্থ হইতে 'মহাবস্তু অবদান' অন্তর্গত এক উপাখ্যান অবলম্বনে 'মালিনী' নাট্যকাব্য রচনা করিলেন। তবে মূলের সহিত কবির সৃষ্টি এত তফাত যে উহাকে চেনাই মুশকিল। এই নাট্যকাব্য রচনার যে একটু ইতিহাস আছে তাহা কবি অল্পকালপূর্বে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :

"মালিনী নাটিকার উৎপত্তির একটা বিশেষ ইতিহাস আছে, সে স্বপ্নঘটিত।···তখন ছিলুম লণ্ডনে। নিমন্ত্রণ ছিল প্রিমরোজ হিলে তারক পালিতের বাসায়।···গোলেমালে রাত হয়ে গেল।···তাই পালিত সাহেবের অনুরোধে তাঁর ওখানেই রাত্রিযাপন স্বীকার করে নিলুম।···স্বপ্ন দেখলুম যেন আমার সামনে একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। বিষয়টা একটা বিদ্রোহের চক্রান্ত। দুই বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু কর্তব্যবোধে সেটা ফাঁস করে দিয়েছেন রাজার কাছে। বিদ্রোহী বন্দী হয়ে এলেন রাজার সামনে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে তাঁর বন্ধুকে যেই তাঁর কাছে এনে দেওয়া হল দুই হাতে শিকল তাঁর মাথায় মেরে বন্ধুকে দিলেন ভূমিসাৎ করে।

"জেগে উঠে যেটা আমাকে আশ্চর্য ঠেকল সেটা হচ্ছে এই যে, আমার মনের একভাগ নিশ্চেষ্ট শ্রোতামাত্র অন্য ভাগ বুনে চলেছে একখানা নাটক। স্পষ্ট হ'ক অস্পষ্ট হ'ক একটা কথাবার্তার ধারা গল্পকে বহন করে চলেছিল। জেগে উঠে সে আমি মনে আনতে পারলুম না।" 'মালিনী'র গল্পটি রবীন্দ্রনাথ যেভাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা এই :

কাশীরাজ কিকির কন্যা মালিনী বুদ্ধশিষ্য কাশ্যপের উপদেশে ভিক্ষুণী হইয়াছে। এই সংবাদে নগরীর ব্রাহ্মণগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়া রাজকন্যার নির্বাসন চাহিল। প্রজারা নির্বাসন চাহে জানিতে পারিয়া মালিনী স্বয়ং গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া ব্রাহ্মণসভায় উপস্থিত হইলেন। এই শান্তসমাহিত নারীমূর্তি দেখিয়া, উদ্যতরোষ ব্রাহ্মণগণ মুহূর্তে শান্ত হইয়া গেল। তাহাদের বিদ্রোহভাব দূর হইল। তাহারা 'জয় জয়' রবে রাজকন্যাকে প্রাসাদে পৌঁছাই দিল।

বিদ্রোহের নেতা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ক্ষেমংকর ও তাহার বন্ধু সুপ্রিয়। ক্ষেমংকর ও সুপ্রিয় ব্যতীত সকল ব্রাহ্মণই রাজকন্যার ধর্ম গ্রহণ করিল। ক্ষেমংকর বুদ্ধির দ্বারা সমস্তই বুঝে কিন্তু সংস্কার ধর্মবোধ হইতে প্রবল। সে বুদ্ধের ধর্মদ্বারা ব্রাহ্মণ্যধর্মকে অপমানিত হইতে দিবে না। আবাল্যবন্ধু সুপ্রিয়কে রাজধানীতে রাখিয়া ক্ষেমংকর বিদেশ হইতে সৈন্য আনিয়া বুদ্ধের ধর্মকে কাশী হইতে দূর করিবার জন্য প্রস্থান করিল। রাজধানীতে থাকিল সুপ্রিয়।

সুপ্রিয় রাজকন্যা মালিনীর সহিত শাস্ত্র আলোচনা করিতে প্রায়ই যায়। ক্রমে ক্রমে পরস্পরের মধ্যে গভীর একটি আকর্ষণ দেখা দিল। সুপ্রিয় চিরদিন শাস্ত্র পড়িয়াছে, হৃদয় হইয়াছে প্রখর মরুভূর ন্যায় শুষ্ক। নারীচিত্তের সংস্পর্শে সেই কঠিন হৃদয় গলিল। এমন সময় ক্ষেমংকরের পত্র আসিল ; কার্যসিদ্ধি হইয়াছে, বিদেশী সৈন্য আনিয়া সে অচিরেই

বেদবিরোধী ধর্মকে দূর করিবে। সুপ্রিয় সেই পত্র রাজাকে দিল।. রাজা মৃগয়ার ছলে বাহিরে গিয়া ক্ষেমংকরকে বন্দী করিয়া আনিলেন।

রাজা ফিরিয়া আসিয়া মালিনীকে সুপ্রিয়র হাতে দান করিবেন স্থির করিলেন। ইতিমধ্যে ক্ষেমংকরকে লইয়া বিচারার্থে প্রহরীরা সভায় উপস্থিত করিল; ক্ষেমংকরের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইল, কিন্তু মালিনী ও সুপ্রিয়র অনুরোধে রাজা তাহাকে ক্ষমা করিবেন ঠিক করিলেন। ক্ষেমংকরকে পরীক্ষা করিবার জন্য রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছাড়িয়া দিলে তুমি কী করিবে?" ব্রাহ্মণ নির্ভীকভাবে উত্তর করিয়াছিল, 'পুনরায় স্বকার্য সাধন'। ক্ষেমংকর বন্ধু সুপ্রিয়কে নিকটে আহ্বান করিয়া যাহা বলিবার সবই বলিল, তারপর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য হত্যা করিল। অবশেষে ঘাতককে আহ্বান করিল। রাজা ক্ষেমংকরকে হত্যা করিবার আদেশ করিলেন; মালিনী ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

এই নাটকের মধ্যে ক্ষেমংকর ও সুপ্রিয় দুই বিরুদ্ধ চরিত্র। সুপ্রিয় মানবের ন্যায়ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে; লৌকিক বা আচারগত ধর্মকে বড়ো বলিয়া সে মানে না। তাহার মন শান্ত, কিন্তু সে দুর্বল এমন কি ভীরু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ যেন 'গোরা'র বিনয়, 'ঘরে বাইরে'র নিখিলেশ, 'বিসর্জনে'র জয়সিংহ।১ ক্ষেমংকর দীপ্ত, গর্বিত, কঠোর; সংস্কারগত ধর্মকেই সে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে; সে রঘুপতির ন্যায় কঠিন। রবীন্দ্রনাথ ক্ষেমংকরকে কোথাও ভীরু বা দুর্বলভাবে বর্ণনা করেন নাই; আচারধর্মকে তিনি বিশ্বাস করেন না, তাঁহার সহানুভূতি সুপ্রিয়র সহিত, তাহার সংস্কারহীন ন্যায়ধর্মকে তিনি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু সে-পক্ষপাতিত্ব লেখার মধ্যে প্রকাশ পায় নাই; ক্ষেমংকরকে তিনি মহৎ করিয়াছেন।

চৈতালি—দ্বিতীয়ার্ধ

উড়িষ্যা হইতে ফিরিয়া মাস খানেক কলিকাতায় কাটাইতে হইল। তাঁহার কাব্যের প্রথম সংগ্রহ প্রকাশের ব্যবস্থা চলিতেছে। আর চলিতেছে জমিদারি পার্টিশন লইয়া নানা সাংসারিক অশান্তি। এতাবৎকাল ঠাকুরবাড়ির জমিদারি এজমালিতে দেখাশুনা হইত, রবীন্দ্রনাথের উপর ছিল তদারকের ভার। পাঠকের স্মরণ আছে মহর্ষির ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবারের জন্য জমিদারির অংশ পৃথক করিয়া দেওয়া হয়; তাঁহার পুত্রদ্বয় উভয়েই অল্পবয়সে মারা যান; জমিদারির আদায়পত্র শাসনব্যবস্থা এজমালিতে বরাবর হইত। গুণেন্দ্রনাথের পুত্রগণ গগনেন্দ্র, অবনীন্দ্র ও সমরেন্দ্র সাবালক হইলে মহর্ষি তাঁহাদের এস্টেট পৃথক করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন; মহর্ষির বয়স তখন আশির কাছাকাছি; মৃত্যুর পূর্বে সকলের যথাযথ প্রাপ্য যথোচিতভাবে বণ্টন ও সুব্যবস্থিত করিবার জন্য তিনি উদগ্রীব হইয়াছিলেন। তদনুসারে গগনেন্দ্রনাথদের জমিদারি পৃথক করিয়া দেওয়া হইল, সাজাদপুরের ও উড়িষ্যার জমিদারি তাঁহাদের অংশে পড়িল। জমিদারি সংক্রান্ত কার্য বন্দোবস্ত করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুর চলিলেন, এই পরগণার সহিত সম্বন্ধ এইখান হইতে চুকিল।

কবি নৌকায়; মন শান্ত, প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের মধ্যে সমাহিত হইবার জন্য মন আকুলিত। নদীযাত্রা, মৃত্যুমাধুরী স্মৃতি, বিলয় (৭ শ্রাবণ ১৩০৩) এই কবিতা কয়টির মধ্যে একটি মৃত্যুর কথা আছে। কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী অভিজ্ঞা তাঁহার বড়ো আদরের ছিল; তাহার কথা তিনি পত্রের মধ্যে নানাস্থানে বলিয়াছেন, তাহারই মৃত্যুর কথা স্মরণ হইতেছে, এই স্বল্প আঘাতে কবির মন বোধ হয় একটু বেশি করিয়া ঈশ্বরনির্ভর হইতেছে।

১ একটা জিনিস লক্ষ্য করিবার যে সুপ্রিয়, বিনয়, জয়সিংহ প্রত্যেকেই নারীর প্রেমের কাছে তাহাদের মত ও ব্যক্তিত্বকে খর্বিত করিয়াছে; নারীশক্তির জয় কবি আরও অনেক জায়গায় দেখাইয়াছেন।

সাজাদপুরের শেষ কয়দিন মন নানাভাবে উত্তেজিত। বিষয় পার্টিশন লইয়া কলিকাতা হইতে যে সব তৃণাঙ্কুশপত্র পান তাহাতে মন বিষণ্ণ ও উৎক্ষিপ্ত হয়, নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন। 'যাত্রী' কবিতাতে লিখিতেছেন "কার কথা শুনে মরিস জ্বলিয়া মিছে মনের আগুনে।···কোথা রবে আজিকার কুশাঙ্কুরক্ষত।" 'তৃণ' কবিতায় বলিতেছেন, "হে বন্ধু প্রসন্ন হও দূর করো ক্রোধ। তোমাদের সাথে মোর বৃথা এ বিরোধ।" 'স্বার্থে' আছে, "কে রে তুই, ওরে স্বার্থ, তুই কতটুক তোর স্পর্শে ঢেকে যায় ব্রহ্মাণ্ডের মুখ, লুকায় অনন্ত সত্য; স্নেহ সখ্যপ্রীতি মুহূর্তে ধারণ করে নির্লজ্জ বিকৃতি; থেমে যায় সৌন্দর্যের গীতি চিরন্তন তোর তুচ্ছ পরিহাসে।"

সাজাদপুরের সহিত কবির মনের একটি গভীর যোগ ছিল, ছিন্নপত্র পাঠে তাহা আমরা জানিতে পারি। এই পরগণা পার্টিশনে তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইলে কবির মনে খুবই আঘাত লাগিয়াছিল, এই মনোভাব সাময়িক কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে,— 'শান্তিমন্ত্র' কবিতাটি পাঠ করিলেই কথাটি স্পষ্টতর হইবে। এই বিদায়ের পূর্বে তিনি 'অতিথিবৎসলা নদী'র নিকট হইতে যে সুধাধারা 'দগ্ধহৃদয়ের মাঝে' পাইয়াছেন, তাহাই স্মরণ করিতেছেন 'শুশ্রূষা' কবিতায়।

এইসব বৈষয়িক অশান্তির মধ্যে কবির মনে পড়িতেছে কবি কালিদাসের কথা। কালিদাস তাঁহাকে চিরদিনই আনন্দ দান করিয়াছে; কালিদাস-কল্পিত তপোবন তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, তাঁহারই ঋতুসংহার, মেঘদূত কবির যৌবনে মধুর সৌন্দর্য-আবেশ আনিয়াছিল; প্রাচীন ভারতের মহামৌন ব্রাহ্মণ-মহিমা তাঁহার মনকে সাময়িকভাবে মোহাচ্ছন্ন করিয়াছিল এই অতীত তপোবনের গৌরবে। মোটকথা এই সময় হইতে কালিদাসের প্রভাব তাঁহার সাহিত্যে প্রবেশ করিতে দেখা যাইতেছে; অতীত ভারতের মধ্যে আদর্শের সন্ধান করিবার শিক্ষা তিনি কালিদাসের নিকট হইতেই বোধ হয় লাভ করিলেন; কালিদাস গুপ্তযুগের ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের মিলিত দম্ভের মধ্যে বাস করিয়া অন্তরে অন্তরে পীড়া অনুভব করিয়াছিলেন ও প্রাচীনতর ভারতের মধ্যে কল্পনার মোহমন্ত্রবলে আদর্শের সন্ধানে ঘুরিয়াছিলেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথও সমসাময়িক সভ্যতা ও তাহার ব্যর্থতায় বিরক্তমনে কালিদাসকেই স্মরণ করিতেছেন ('কালিদাসের প্রতি', 'কুমারসম্ভব' 'মানসলোক')। কিন্তু বাস্তবের সহিত নিজ জীবনের ক্ষুদ্র সংগ্রাম দেখিয়া তাঁহার মনে হইতেছে, বাস্তব জগতের ক্ষুদ্র দুঃখ কি সেই মহাকবিকেও ভোগ করিতে হয় নাই।

তবু কি ছিল না তব সুখদুঃখ যত, হে অমর কবি! ছিল না কি অনুক্ষণ
আশানৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব আমাদেরি মতো রাজসভা ষড়যন্ত্র, আঘাত গোপন।

রবীন্দ্রনাথের ভরসা আছে সবের ঊর্ধ্বে মহাকবি কালিদাস যেমন আজ উঠিয়া গিয়াছেন, তাঁহারও জীবনের উপর দিয়া যে নির্যাতন, "অপমানভার অনাদর, অবিশ্বাস, অন্যায় বিচার, অভাব কঠোর ক্রূর", বহিয়া যাইতেছে, তাহারও অবসান হইবে। কবির স্পর্শকাতর মন সামান্য বেদনাকেও অত্যন্ত তীব্র করিয়া তোলে; আবার প্রচণ্ড আঘাতকেও অত্যন্ত শান্তভাবে বহন করিতে দেখি। তাই কালিদাসকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

তবু সে সবার ঊর্ধ্বে নির্লিপ্ত নির্মল ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্যকমল আনন্দের সূর্য পানে; তার কোন ঠাঁই
দুঃখদৈন্য দুর্দিনের কোনো চিহ্ন নাই। জীবন মন্থনবিষ নিজে করি পান, অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান।

রবীন্দ্রনাথের ইহাই আশার কথা; এই আশ্বাসেই বল পাইলেন, মহাকবির কথা স্মরণ করিয়া সান্ত্বনা পাইলেন।

চৈতালির ন্যায় কাব্যও বাংলার সাহিত্যক্রিটিকদের তীব্র সমালোচনা হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। যুবক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 'সাহিত্য' পত্রিকায় (১৩০৫) এই কাব্যখণ্ডের নিন্দাসূচক সমালোচনা প্রকাশ করেন। 'সাহিত্য' রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে বিরুদ্ধ সমালোচনা বহুবৎসর যাবৎ যথানিয়ম প্রকাশ করিয়া সাময়িক সাহিত্যক্ষেত্রে যশস্বী হন,তাহার

সূত্রপাত হয় হেমেন্দ্রপ্রসাদের এই প্রবন্ধ হইতে। চৈতালির অনবদ্য স্থান নির্দিষ্ট হইবার পূর্বে সাময়িক সাহিত্যে রবীন্দ্রপক্ষীয় ও বিপক্ষীয়দের মধ্যে বহুকাল মসীযুদ্ধ চলিয়াছিল।১

চৈতালি পৃথক পুস্তাকারে মুদ্রিত হইল না, যে 'কাব্যগ্রন্থ' সম্পাদিত হইতেছিল উহা তাহার অন্তর্গত করা হইল, মালিনীও সবপ্রথম ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়।২ এই কাব্যগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংগৃহীত কাব্য। ইহার মধ্যে কবি তাঁহার বাল্যবয়সের রচনাসমূহকে স্থায়ী সাহিত্য হিসাবে স্থান দিলেন না, বনফুল, কবিকাহিনী, ভগ্নহৃদয়, শৈশব সঙ্গীত রবিচ্ছায়া কালমৃগয়া রবীন্দ্রসাহিত্য হইতে সেই যে অপাংক্তেয় হইয়া গেল, তাহার পর আর তাহারা সাহিত্যের জাতে উঠে নাই। এইসব গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু সঞ্চয়ন করিয়া কৈশোরক খণ্ড গঠিত হয় মাত্র। বলিতে গেলে এই সময়েই কবি সন্ধ্যাসংগীতকে তাঁহার কাব্যগন্থের প্রথম কবিতাগুচ্ছ বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং সেই ধারাই এপর্যন্ত চলিতেছে। এই সংগ্রহের জন্য কবি তাঁহাব সমস্ত কাব্য সাহিত্যটাকেই নাড়াচাড়া করেন ; সেই নাড়াচাড়ার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে বিসর্জন নাটকের পরিবর্তন। আমরা যে 'বিসর্জন' পড়ি তাহা প্রথম সংস্করণ হইতে অনেক তফাত ; এই সময়ে উহা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্জিত ও সম্পাদিত হইয়া দ্বিতীয় সংস্করণরূপে প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে বিসর্জনেব যে সব পরিবর্তন করা হয়, তাহার কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। এই সব পরিবর্তনের দ্বারা বিসর্জন যে সর্বাংশে সুন্দর হইয়াছে তাহা উভয় সংস্করণের পাঠকের নিকট সহজেই প্রতিভাত হইবে। ক্রিটিকহিসাবে নিজ রচনার কঠিন বিচার করিতে তাঁহার কোনো মায়া ছিল না।

কাব্য সম্পাদন ছাড়া অন্যান্য কাজের মধ্যে চোখে পড়ে ছেলেমেয়েদের জন্য গ্রন্থ সম্পাদন ; পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের সহায়তায় 'সংস্কৃত শিক্ষা' নামে দুই খণ্ড গ্রন্থ এই সময়ে প্রকাশিত হয় (৮ আগস্ট ১৮৯৬)। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য আদিব্রাহ্মসমাজের সহিত যুক্ত ছিলেন, তাঁহার অনূদিত রামায়ণ বাংলাভাষায় সুপরিচিত। পরযুগে রবীন্দ্রনাথ শান্তি-নিকেতন বিদ্যালয়ে হাতে-কলমে শিক্ষাদানকল্পে বহু পাঠ্য বই রচনা ও সম্পাদন করিয়াছিলেন, এই 'সংস্কৃত শিক্ষা' তাহার সূচনা। আমাদের মনে হয় তাঁহার পুত্রকন্যাদের সহজে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য এই গ্রন্থ সম্পাদিত হয় ; এই সময়ে জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার বয়স দশ বৎসর ও জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রের বয়স আট বৎসর, সংস্কৃত শিক্ষারম্ভের যথোপযুক্ত বয়স। মহর্ষির পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের সংস্কৃত মন্ত্র ও শ্লোক প্রত্যেক বালকবালিকাকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত আবৃত্তির দ্বারা আয়ত্ত করানো ছিল আবশ্যিক বিধান। সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধে মহর্ষির যেমন নিষ্ঠা ছিল, রবীন্দ্রনাথেরও সে বিষয়ে উৎসাহের অভাব ছিল না। তাঁহার নিজের সংস্কৃত বুনিয়াদ খুব পাকা না থাকিলেও, প্রতিভাবলে সংস্কৃত সাহিত্যর রস গ্রহণের ক্ষমতা অনুশীলনের দ্বারা অর্জন করিয়াছিলেন। বিশ্বভারতী স্থাপনের মুখে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকগণকে পাণিনির ব্যাকরণ সাহায্যে সংস্কৃত শিখাইবার জন্য কবির কী উৎসাহ তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কাহারও জানিবার কথা নহে। সাহিত্যরচনা এখন বড়োই মন্দা। নানা অবান্তর বিষয় তাহাকে টানিতেছে। কলিকাতার কনগ্রেস (১৩০৩ পৌষ)। সভাপতি রহমতুল্লা। অধিবেশনের প্রথম দিন উদ্‌বোধন সংগীত 'বন্দমাতরম্' রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন ; তখন কবির কণ্ঠ ছিল যেমন মিষ্ট, তেমনি তীক্ষ্ণ। সে-যুগে মাইক্রোফন আবিষ্কৃত হয় নাই ; কবির কণ্ঠ বিরাট প্যাণ্ডেলের দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত শোনা গিয়াছিল ; তবে একথা বলা প্রয়োজন যে, আজকালকার কনগ্রেস-প্যাণ্ডেলের তুলনায় সেযুগের প্যাণ্ডেল

১ দ্র. রমণীমোহন ঘোষ, 'চৈতালি সমালোচনা' প্রতিবাদ, প্রদীপ ১ম বর্ষ ১৩০৫ শ্রাবণ। তরুণ সাহিত্যিক ব্যারিস্টার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'প্রশ্ন' কবিতায় অত্যন্ত জঘন্যভাবে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে আক্রমণ করিলেন ; কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত হইল, তবুও "রবির আলো ম্লান হোল নাহি।... হে কুক্কুর, ঘোষ কেন, কেন আক্রোশ নিষ্ফল অত উর্দ্ধে পৌঁছে কি কণ্ঠ ক্ষীণ বল।" ইত্যাদি।

২ সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, ১৫ আশ্বিন ১৩০৩। গ্রন্থাবলী অন্তর্গত কাব্যাদি কালানুক্রমে সজ্জিত।

নিতান্তই সামান্য ছিল। শোনা যায় বঙ্কিমের জীবিতকালে রবীন্দ্রনাথ 'বন্দে মাতরম্' এর প্রথমাংশ নিজে সুর বসাইয়া বঙ্কিমকে শুনাইয়া ছিলেন।১

কন্‌গ্রেসের অল্পকাল পরেই মাঘোৎসব। এবার রবীন্দ্রনাথ উৎসবের জন্য বহু গান রচনা করিয়াছেন; চৈতালির কবিতার মধ্যে গানের বিষয় ছিল, কিন্তু সুর আসে নাই মনে। এতদিন পরে ব্রহ্মসংগীত রচনার মধ্য দিয়াই সুরের মুক্তি হইল; নিজ অন্তরের গানের সুর অল্পে অল্পে আসিতেছে।

পত্রিকার দায় নাই, লিখিবার তাগিদ নাই; কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে কিছু না লিখিলেও চলে না; তাই বৎসরের শেষ দিকে লিখিলেন প্রহসন 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৩০৩ চৈত্র)। চারি বৎসর পূর্বে লেখেন গোড়ায় গলদ। সঙ্গীত সমাজের তাগিদে, এবারেও বোধ হয় উক্ত সমাজের জন্যই এইটি লিখিলেন। 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র গল্পাংশ সংক্ষেপে এই :

বৃদ্ধ বৈকুণ্ঠ জ্ঞানতপস্বী, প্রাচীন সংগীত শাস্ত্র আলোচনায় মত্ত, বাহিরের জগত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। অবিনাশ তাহার ভাই, বড়ো চাকুরি করে, বয়স অনেক হইয়াছে বিবাহ করে নাই, বাগানের শখ খুব বেশি। কেদার ও তিনকড়ি দুই লক্ষ্মীছাড়া লোক, জুয়াচোর ও ঠক। কেদার তাহার শ্যালীর সহিত অবিনাশের বিবাহ দিবার মতলবে বৃদ্ধের পুঁথি শোনে, চীনাবাজারের জুতার হিসাব চীনা-সংগীতশাস্ত্রের বই বলিয়া বৈকুণ্ঠের নিকট বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করে। অবিনাশ মনোরমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। বিবাহ হইয়া গেলে কেদার তাহার যত আত্মীয় কুটুম্ব একে একে আনিয়া বাড়ি পূর্ণ করিয়া ফেলিল। তাহার ইচ্ছা বৃদ্ধকে কোনোরূপে তাড়ায়। অন্তঃপুরে বৈকুণ্ঠের বিধবা কন্যা নীরুর উপর কেদারের এক পিসির অত্যাচার অবিনাশের দৃষ্টিগোচর হইলে, সে আত্মীয় কুটুম্বদের তাড়াইয়া দিল।

'বৈকুণ্ঠের খাতা'র স্বচ্ছ হাস্যরসের মধ্যে এমন একটি করুণ রস ফল্গুধারার ন্যায় উহার অন্তস্থল দিয়া বহিয়া গিয়াছে যে উহা কেবল পাঠককে হাসায় না, উহা তাহার চক্ষুপল্লবকে অশ্রুসিক্ত করে। বৃদ্ধ জ্ঞানতপস্বী বৈকুণ্ঠ কনিষ্ঠভ্রাতা অবিনাশের কল্পিত সুখের জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে উদ্যত, বিরোধ করিতে তিনি অনিচ্ছুক ও অক্ষম। এই ঘটনাটি বিসর্জনের গোবিন্দমাণিক্যর কথা মনে পড়াইয়া দেয় যিনি ক্ষমতা থাকিতেও শক্তির প্রয়োগ না করিয়া ভ্রাতাকে সিংহাসন ও রাজ্য দিয়া গেলেন। এই প্রহসনের মধ্যে যথার্থ চরিত্র ফুটিয়াছে তিনকড়ির; এটি রবীন্দ্রনাথের অপরূপ সৃষ্টি। এই অত্যন্ত লক্ষ্মীছাড়া জুয়োচোর লোভী লোকটাকে ভালো না বাসিয়া থাকা যায় না। ভুলে ভ্রান্তিতে ভরা সত্যকার হাড়েমাসে গড়া মানুষটা সামনে দেখা দিয়াছে অপরূপ ভঙ্গিতে।

বৈকুণ্ঠের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরিত্রচিত্রের আভাস আছে বলিয়া একএকবার মনে হয়। চক্ষু-লজ্জার খাতিরে কাহাকে কিছু না বলিতে পারার দুর্বলতা কবির মধ্যেও যথেষ্ট ছিল। 'গল্পসল্পে' যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিতান্ত বানানো গল্প নহে। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রকাশিত হইবার একমাসের মধ্যেই পঞ্চভূত গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইল; গ্রন্থখানি 'মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর সুহৃদ্বর করকমলেষু' উৎসর্গ করেন। পাঠকের স্মরণ আছে 'সাধনা' পত্রিকায় পঞ্চভূতের ডায়ারি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ সৃষ্টি বলিয়া আমাদের মনে হয়। বাংলা ভাষায় এ শ্রেণীর গ্রন্থ রচিত হয় নাই, প্রথম চৌধুরীর 'চারইয়ারীকথা'র মধ্যে দূরতম অনুকৃতির আভাস পাওয়া যায়। তবে রবীন্দ্রনাথের গোরা, চতুরঙ্গ, শেষের কবিতা প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যে এই শ্রেণীর বাকচাতুর্যপূর্ণ কথাবার্তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। উভয় শ্রেণীর আলোচনার মধ্যে একটি প্রকাণ্ড পার্থক্য রহিয়াছে;

১ দ্র ১ আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৪৪, ৫ আশ্বিন।

দ্র: শ্রীকালিদাস রায়, রবীন্দ্রনাথের পঞ্চভূত, জয়ন্তী উৎসর্গ (১৩৩৮) পৃ-২৪৮-৫৯

পঞ্চভূতের ভূতগুলি নানাবিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছেন বটে তবে সে-আলোচনা আর্টিস্টের আনন্দ, উদ্দেশ্যহীন চিত্তবিনোদনমাত্র; কোনো সমস্যার সামঞ্জস্যগত সমালোচনা যে সম্ভব নহে, এবং রচনার উদ্দেশ্যও নহে তাহা কবি মুখবন্ধেই বলিয়া লইয়াছেন। কিন্তু উপন্যাসগুলির মধ্যে কেবল আর্টিস্ট রবীন্দ্রনাথকে পাই না, সেখানে ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারক রবীন্দ্রনাথকে দেখা যায়; বিচিত্র সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তরিকতা পরিলক্ষিত হয়।

কল্পনার সূত্রপাত

চৈতালির শেষ কবিতা রচনার পর কয়েক মাস কবির কাব্যলেখনী স্তব্ধ হইয়া আছে। ব্রহ্মসংগীত রচিয়াছেন সত্য, কিন্তু মানসসুন্দরীর উদ্দেশে স্বতঃউৎসারিত গীতধারা উচ্ছ্বসিত হয় নাই,— যে গানে কবির কল্পনা, সৌন্দর্যের সাধনা সার্থক হয়, সে-গান প্রাণে আসে নাই। কবিজীবনের দিক হইতে সে-পর্বটা কবির পক্ষে দুঃসময় বলিতে হয়। সেই বেদনা সত্যই প্রকাশ পাইয়াছে 'দুঃসময়' কবিতায় (১৫ বৈশাখ ১৩০৪)। অন্তরে ক্লান্তি আসিয়াছে বলিয়াই যেন অন্তরকে সাবধান করিয়া দিতেছেন; ব্যাত্যাবিক্ষুব্ধ জীবনযাত্রায় মধ্যপথে যেন সে থামিয়া না যায়, তাহার উদ্যমকে রক্ষা করিতে হইবে। এই কথাটিই কবি কাব্যময় ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, "ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি, অন্ধ, বন্ধ ক'রো না পাখা।" রবীন্দ্র-সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তী কবির এই কাব্যজীবনপর্ব সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে লিখিত। "বিগত জীবনের স্মৃতিতে কবি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া নূতন জীবন যাত্রায় পক্ষ বিস্তার করিতে যাইতেছেন। কবি জীবনের এমন এক অবস্থার দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, যাহার পূর্ণ পরিচয় তিনি অবগত নহেন; কিন্তু পিছনে ফেলিয়া-আসা ঐশ্বর্যের দিকে চাহিয়াও তিনি পরিতৃপ্তি পাইতেছেন না।" সমালোচকের এই ব্যাখ্যায় সকলের মন সাড়া দিবে কিনা সন্দেহ।

নূতন বৎসরে কবির কাব্যশ্রী ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সংখ্যার দিক হইতে এবারকার রচনা শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করিতে পারিতেছে না সত্য, কিন্তু কল্পনার ঐশ্বর্যে তাহারা অতুলনীয়। বৈশাখ মাসে রচিত চারিটি মাত্র কবিতা; এই কবিতা কয়েকটিকে পুরোভাগে রাখিয়া যে কাব্যখণ্ড 'কল্পনা' নামে তিন বৎসর পরে (১৩০৭ বৈশাখ) প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে কবিমনের বিচিত্র লীলামাধুরী দেখা যায়, যথাযথ স্থানে আমরা তাহাদের আলোচনা প্রয়োজনমত করিব। কবির কল্পনাক্ষেত্র বিচিত্র; বর্ষার আবাহন (বর্ষামঙ্গল ১৭ বৈশাখ ১৩০৪) করিয়া বসন্ত নিশীথের জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ধরার দিকে তাকাইয়া কত কথা মনে পড়ে—

> কত নদীতীরে, কত মন্দিরে, কত বাতায়ন তলে,
> কত কানাকানি, মন জানাজানি, সাধাসাধি কত ছলে।
> শাখাপ্রশাখার দ্বার জানালার আড়ালে আড়ালে পশি
> কত সুখদুখ কত কৌতুক দেখিতেছ একা বসি।

এই গোপন মন-জানাজানির মর্মকথাটি 'চৌরপঞ্চাশিকা'র মধ্যে অমর ভাষায় কবি প্রকাশ করিলেন। চোরকবি শিহ্লন (বিহ্লন) পঞ্চাশটি শ্লোকে প্রেমের আদিরস বর্ণনা করেন; বাঙালীকবি ভারতচন্দ্র তাহার অনুবাদ করিয়া প্রেমিকদের কণ্ঠে শ্লোকের মালা গাঁথিয়া সমর্পণ করিয়া যান। আজ রবীন্দ্রনাথও সেই প্রেমিক কবির জয়গান করিয়া কহিলেন,

> ওগো সুন্দর চোর,
> তোমারি রচিত সোনার ছন্দ পিঞ্জরে তারা ভোর।
> দেখিতে পায় না কিছু চারিধারে,
> শুধু চিরনিশি গাহে বারে বারে
> তোমাদের চিরশয়নদুয়ারে, ওগো সুন্দর চোর—
> আজি তোমাদের দুজনের চোখ অনন্ত ঘুমঘোর।

জ্যৈষ্ঠ মাসের[১] প্রথম সপ্তাহে কবি শান্তিনিকেতনে গিয়া কয়েক দিন আছেন। মনের মধ্যে কল্পনার বিচিত্র সুরতরঙ্গ চলিতেছে। সেখানে গিয়া লিখিলেন 'ভ্রষ্টলগ্ন' (৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪), 'মার্জনা' (৮ই), 'স্বপ্ন' (৯ই), 'মদনভস্মের পূর্বে' (১১ই) ও 'মদনভস্মের' পর (১২ই)। এই কবিতাগুলি একত্র পাঠ করিলে কবিচিত্তের প্রেমের দ্বন্দ্ব কিভাবে নানা মূর্তিতে প্রকাশ পাইতেছে, তাহার একটি অখণ্ড রূপ দেখা যাইবে। প্রথম তিনটি কবিতায় লাজ-নতা প্রেমিকার ব্যর্থ প্রেমের রুদ্ধ ক্রন্দন গুমরিয়া মরিতেছে; সে 'শরমে মরিয়া বলিতে' পারে না "নবীন পথিক, সে যে আমি সেই আমি।" "শ্রান্ত পথিক, সে যে আমি, সেই আমি।" এই কথাটিই কবি আর-একদিন আর-এক ভাব হইতে অন্য ভাষায় বলিয়াছেন, "আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে", "আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হোত যে মিছে।" কিন্তু সে তো পরমাত্মার আহ্বানে অন্তরাত্মার সাড়া। 'মার্জনা'র মধ্যে প্রেমের ভীরুতা আরও স্পষ্ট; ভালোবাসিবার অপরাধের জন্য প্রেমাস্পদের কাছে এই প্রার্থনা—"মোরে দয়া করে ক'রো মার্জনা, ক'রো মার্জনা"। ইহা দুর্বলতা, দীনতার পরাকাষ্ঠা। কিন্তু প্রেমিকা আশা রাখে, সে একদিন রানীর মতন প্রিয়তমকে রত্নাসনে বসাইবে, প্রণয়শাসনে তাহাকে বাঁধিবে, দেবীর মতো সকল বাসনা পুরাইবে। সকলই প্রেমের কল্পনা— রামধনুর ন্যায় সপ্তবর্ণ, চোখকে মুহূর্তের জন্য কেবল ধাঁধায়, মনকে ক্ষণিকের জন্য রঙাইয়া তোলে। কিন্তু প্রেমের জন্য এমন দীনতা কেন। বাস্তবতার রূঢ় স্পর্শে মন যখন ক্লিষ্ট, তখন সে কল্পনার জগতে আশ্রয় খোঁজে, বাস্তব জগত হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া "দূরে বহু দূরে স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনী পুরে শিপ্রানদী পারে" 'পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে' খুঁজিতে যাওয়াই তো নিরাপদ! মনোলোকে মালবিকা 'দেখা দিল দ্বারপ্রান্তে সোপানের পরে', 'ফেলিল সর্বাঙ্গে' 'উতলা নিশ্বাস।' স্বপ্নের মধ্যেও মধুর বাস্তবের জন্য দেহমন পিপাসিত।

প্রেমের ব্যর্থতায় চিত্ত আজ আকুল হইয়া আবাহন করিতেছে প্রেমের দেবতা মদনকে। শিবকোপানলে ভস্মীভূত হইবার পূর্বে মদন অঙ্গ ধরিয়া ফিরিত নবভুবনে; আজ তাহারই নিকট করুণ প্রার্থনা জানাইতেছে মানব,— উচ্ছ্বাসহীন প্রেমকে, প্রাণহীন প্রণয়কে সঞ্জীবিত করিবার প্রার্থনা—

> এস চতুর মধুর হাসি তড়িৎসম সহসা চকিত করো বধূরে হরষে,
> নবীন করো মানব-ঘর ধরণী করো বিবশা দেবতাপদ সরস-পরশে।

কিন্তু মদন আজ কোথায়? সে তো অন্-অঙ্গ। সে তো আজ বিশ্বময়, নরনারীর হৃদয়দ্বারে, অমূর্তভাবে বিরাজিত। "আজিকে তাই বুঝিতে নারি কিসের বাজে যন্ত্রণা হৃদয়-বীণাযন্ত্রে মহা পুলকে"। আজ তরুণ-তরুণীরা পঞ্চশরের মর্মভেদী সায়কের অপেক্ষায় নাই, ইহা আজ বিশ্বব্যাপী মর্মন্তুদ বেদনায় রূপ পাইয়াছে। তাই কবি লিখিতেছেন—

> পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কি, সন্ন্যাসী, বিশ্বময় দিয়েছ তা'রে ছড়ায়ে।
> ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি' অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।

'মদনভস্মের পর' কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কুমারসম্ভবের কাহিনীর যে অপরূপ ব্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহা কোনো সাহিত্যাচার্য ইতিপূর্বে করিয়াছিলেন বলিয়া জানি না।

জ্যৈষ্ঠের শেষদিকে কবি শিলাইদহের বোটে পসারিনী (২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪) কবিতাটি লেখেন। শান্তিনিকেতনে কয়েকদিন পূর্বে 'ভ্রষ্টলগ্ন' লিখিয়াছিলেন, এ যেন তাহারই পরিপূরক; সে-কবিতাটিতে যে-কথাটি 'মরমে মরিয়া' বলা হয় নাই, আজ 'পসারিনী'কে তাহা বলা হইল— "দাঁড়াও, যেওনা আর, নামাও পসরা ভার, মোর হাতে দাও তব ডালি।" 'ভ্রষ্টলগ্ন' ও 'পসারিনী' পর পর পড়িলেই পাঠক বুঝিবেন যে এই দুইটি যেন যুগ্মকবিতা।

১ ৩০ৗ জ্যৈষ্ঠ (১৩০৪) কবি কলিকাতায় ছিলেন। সেদিন চৌর-পঞ্চাশিকা পরিবর্ধন করিয়া লেখেন। র-র ৭ম পৃ ১২৬।

কল্পনায় কুসুম গাঁথিয়া, স্বপ্নে উজ্জয়িনী গড়িয়া, মানসলোকে মালবিকা ও কাব্যলোকে পসারিনী সৃষ্টি করিতেছেন, সে-কবিকে কেহ দেখিতে পায় না, সে-কবিও কাহাকে দেখা দেন না। "কাব্যে যেমন দেখগো কবি তেমন নয়।" কবি সম্বন্ধে এ যে কতবড়ো সত্য উক্তি, তাহা রবীন্দ্র-জীবনী পাঠ করিলে বুঝা যায়। কবি কিন্তু উত্তর বঙ্গের জমিদারিতে নৌকায় যখন থাকেন, তখন তিনি অন্তরে কবি হইলেও বাহিরে জমিদার। বাস্তব জগতের রূঢ়তা বোটের চারিদিকে অন্ধবেগে নিত্য খরস্রোতে বহিয়া চলে। মানুষ তাঁহাকে রেহাই দেয় না, তিনিও কাহাকে রেহাই দেন না। জমিদারির কাগজপত্র দেখাশোনা, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করা, খাজনার হিসাব করা, সুদকশা, বকেয়া আদায় ও মকুপ করা, প্রজার আশীর্বাদ ও অভিশাপ গ্রহণ প্রভৃতির তরঙ্গাভিঘাত চলে জমিদারকে ঘিরিয়া। এসব কল্পনা নহে, নিষ্করুণ বাস্তবতা। এই বাস্তবের মধ্যে জীবন যতই ডুবিতেছে, মন যেন ততই তাহাকে অস্বীকার করিতেছে তদূর্ধ্বে উঠিবার জন্য। স্বপ্নময় কল্পনার জীবন ও বাস্তবময় জমিদারের জীবনের বাহিরে আছে বৃহত্তর দেশের কাজ বা পলিটিক্স।

জ্যৈষ্ঠের শেষে [২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪।১৮৯৭ জুন ১১] নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন, কলিকাতার ও মফঃস্বলের বহু গুণী জ্ঞানীর নিমন্ত্রণ। অভ্যর্থনা সভার সভাপতি নাটোরের রাজা জগদিন্দ্রনারায়ণ রায় (২৯)। ইনি রবীন্দ্রনাথ হইতে বয়সে প্রায় সাত বৎসরের ছোটো (১৮৬৮-১৯২৬)। উভয়ের জমিদারি ছিল সংলগ্ন। সৌহার্দ সেইজন্য হয় নাই ; সৌহার্দ হয় জগদিন্দ্রনারায়ণের সাহিত্যের রসগ্রাহিতার জন্য। সংগীতশাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ জ্ঞান থাকায় উভয়ের মধ্যে এই বন্ধন সুদৃঢ় হয়। ১৮৯৩ সালে তিনি এস্টেটের মালিক হন ও সেই হইতে উভয়ের মধ্যে আসাযাওয়া প্রায়ই চলিত। এই মিত্রতার নিদর্শনস্বরূপ কবি মহারাজকে 'পঞ্চভূত' উৎসর্গ করেন (১৩০৪ বৈশাখ)। জগদিন্দ্রনারায়ণ জমিদারশ্রেণীর লোক হইলেও সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ রাজনৈতিক নেতাদের সর্বপ্রকার আন্দোলনের সহিত যুক্ত থাকিতেন। বাংলার ধনী জমিদারদের মধ্যে তিনিই প্রকাশ্যভাবে কন্‌গ্রেসের সদস্য হন ; তাঁহারই উৎসাহে ও উদ্যোগে ১৮৯৭ সালে নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অধিবেশন আহূত হইল।

সম্মিলনীর মনোনীত সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে সিবিল সার্বিস হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্থায়ীভাবে দেশে ফিরিয়াছেন। সেযুগে রাজনৈতিক সভাসমিতিতে অবসরপ্রাপ্ত সরকারী রাজকর্মচারীদের পক্ষে এভাবে যোগদান করাটা গভর্মেণ্টের চক্ষে দূষণীয় হয় নাই ; কারণ সে যুগের রাজনীতি আবেদন নিবেদনের অভিযোগ ক্রন্দন পর্যায়ের উর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই, আত্মশক্তি লাভের প্রচেষ্টায় তাহার কল্পনা উদ্দীপ্ত হয় নাই ; সেইজন্য গবর্মেণ্ট এইসব সভাসমিতিকে আদৌ ভয়ের চক্ষে দেখিতেন না।

প্রাদেশিক সম্মিলনীকে এখন বলা হয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রসভা বা প্রভিন্সিয়েল কংগ্রেস। পূর্বে ইহার অধিবেশন হইত কলিকাতায় ; ১৮৯৫ সাল হইতে বাংলার প্রধান প্রধান শহরে সম্মিলন আহূত হইবার ব্যবস্থা হয়। প্রথম বৎসরে সম্মিলন হয় বহরমপুরে, সভাপতি হন আনন্দমোহন বসু ; দ্বিতীয় বৎসরে কৃষ্ণনগরের সম্মিলনের সভাপতি হন গুরুপ্রসাদ সেন। তৃতীয় বৎসর উহা নাটোরে আহূত হইল।

তখনকার রাজনীতিকদের অভ্যাস ও বিশ্বাস অনুসারে রাষ্ট্রনীতিক সম্মিলনের সকল কার্যই ইংরেজি ভাষায় পরিচালিত হইত। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার অভিভাষণ ইংরেজিতেই লেখেন। এদিকে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ যুবকদের নিকট দেশের মঙ্গল কর্মে বিদেশী ভাষার ব্যবহার অত্যন্ত বিসদৃশ বলিয়া মনে হইল। সম্মিলনীর কাজকর্ম যাহাতে বাংলা ভাষায় পরিচালিত হয়, তাহার জন্য নবীন দল বিশেষ আগ্রহান্বিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জ্যেষ্ঠের অভিভাষণ বাংলায় তর্জমা করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন ও ইংরেজি অভিভাষণ পাঠের পর উহা সভায় পাঠ করেন। অনুবাদের ভাষা শুনিয়া কোনো একজন বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞ মন্তব্য করেন 'যে উহা 'চাষাভুষা'দের বোধগম্য

নহে। সাহিত্যিক বাংলা বোধগম্য যদি না হয় তো ইংরেজি কেমন করিয়া সাধারণের বোধগম্য হইবে, একথা প্রতিবাদীরা ভাবেন নাই। রবীন্দ্রনাথ ঠিক করিয়াছিলেন স্বেচ্ছাসেবকগণকে ধন্যবাদ দিবার সময় তিনি তাঁহার মন্তব্য ব্যক্ত করিবেন। কিন্তু সে সুযোগ মিলিল না; সভার দ্বিতীয় দিনে (৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪, ১২ জুন ১৮৯৭) বৈকালে ভীষণ ভূমিকম্পে সভার কার্য বন্ধ হইয়া গেল। প্রলয়ান্তে আর সভা বসিল না (দ্র. ঘরোয়া)।

বহু বৎসর পরে কবি এই যুগের রাজনৈতিক ব্যবস্থা স্মরণ করিয়া শচীন্দ্র সেনের গ্রন্থ সমালোচনা[১] ব্যপদেশে লিখিয়াছিলেন—"সাধনা পত্রিকায় রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আমি প্রথম আলোচনা শুরু করি। তাতে আমি এই কথাটার উপরেই বেশি জোর দিয়েছি। তখনকার দিনে চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করা ও গলা মোটা করে গবর্মেন্টকে জুজুর ভয় দেখানোই আমরা বীরত্ব বলে গণ্য করতেম। আমাদের দেশে পোলিটিক্যাল অধ্যবসায়ের সেই অবাস্তব ভূমিকার কথাটা আজকের দিনের তরুণেরা ঠিকমতো কল্পনা করতেই পারবেন না। তখনকার পলিটিক্সের সমস্ত আবেদনটাই ছিল উপরওয়ালার কাছে, দেশের লোকের কাছে একেবারেই না। সেই কারণেই প্রাদেশিক রাষ্ট্র সম্মিলনীতে, গ্রাম্যজনমণ্ডলী সভাতে, ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করাকে কেউ অসংগত ব'লে মনে করতেই পারতেন না। রাজশাহী সম্মিলনীতে নাটোরের পরলোকগত মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে চক্রান্ত করে সভায় বাংলাভাষা প্রবর্তন করবার প্রথম চেষ্টা যখন করি তখন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি তৎসাময়িক রাষ্ট্রনেতারা আমার প্রতি একান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কঠোর বিদ্রূপ করেছিলেন। বিদ্রূপ ও বাধা আমার জীবনের সকল কার্যেই আমি প্রচুর পরিমাণেই পেয়েছি, এ ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। পর বৎসরে রুগ্ন শরীর নিয়ে ঢাকা কন্‌ফারেন্সেও আমাকে এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হ'তে হয়েছিল। আমার এই সৃষ্টিছাড়া উৎসাহ উপলক্ষ্যে তখন এমনতরো একটা কানাকানি উঠেছিল যে, ইংরেজি ভাষায় আমার দখল নেই বলেই রাষ্ট্রসভার মতো অজায়গায় আমি বাংলা চালাবার উদ্যোগ করেছি। বাঙালীর ছেলের পক্ষে যে গালি সবচেয়ে লজ্জার সেইটেই সেদিন আমার প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছিল, অর্থাৎ ইংরেজি আমি জানিনে। এতবড় দুঃসহ লাঞ্ছনা আমি নীরবে সহ্য করেছিলাম তার একটা কারণ, ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় বাল্যকাল থেকে আমি সত্যই অবহেলা করেছি, দ্বিতীয় কারণ, পিতৃদেবের শাসনে তখনকার দিনেও আমাদের পরিবারের পরস্পর পত্রলেখা প্রভৃতি ব্যাপারে ইংরেজিভাষা ব্যবহার অপমানজনক বলে গণ্য হত।" বোধ হয় নাটোরের ব্যাপারের পর মনের গ্লানি যেন দূর করিতে চাহিয়াছিলেন—'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' লিখিয়া।

যে তোমারে দূরে রাখি নিত্য ঘৃণা করে হে মোর স্বদেশ, মোরা তারি কাছে ফিরি সম্মানের তরে পরি তারি বেশ।

আশ্বিনমাসে (১৩০৪) কবি উত্তরবঙ্গের নদীতে নদীতে ঘুরিতেছেন, জমিদারির কাজ তদারকে ব্যস্ত। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে ঝড়, বর্ষণেরও অভাব নাই— কবির মনেও সুরের বন্যা নামিল। 'কল্পনা'র অনেকগুলি গান এই সময়ের রচনা— লজ্জিতা, হতভাগ্যের গান, যাচ্‌না, কাল্পনিক, মানসপ্রতিমা, সংকোচ, প্রার্থী, সকরুণা, প্রণয় প্রশ্ন, ভিখারি প্রভৃতি। 'হতভাগ্যের গানে' সুর দেওয়া থাকিলেও উহা একটি দীর্ঘ কবিতা; ইহার মধ্যে 'ক্ষণিকা'র ক্ষীণ পূর্বাভাস ধ্বনিতেছে। চলন বিলের মধ্যে নৌকা চলিয়াছে— ভীষণ ঝড়, নৌকা টলমল করিতেছে— আর কবি সুর করিয়া গান লিখিতেছেন, "যদি বারণ কর তবে গাহিব না, যদি সরম লাগে, মুখে চাহিব না।" মন কতটা আত্মস্থ থাকিলে প্রবল ঝড়ের মধ্যেও প্রাণে গান আসে তাহা সাধারণের পক্ষে অনুমান করা কঠিন। এই সময়ে রচিত 'বিদায়' শীর্ষক গানটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলার অগ্নিমন্ত্রের যুগে বহু যুবক "এবার

১ প্রবাসী ১৩৩৬ ২৯ শ ভাগ ২য় খণ্ড ২য় সংখ্যা। অগ্রহায়ণ পৃ ১৭৩, রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত। Sachindranath Sen, Political Philosophy of Rabindranath Tagore গ্রন্থের সমালোচনা।

চলিনু তবে সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে"— আবৃত্তি করিয়া গৃহত্যাগী হইয়াছিল। সেদিন এই কবিতার বাণী রুদ্রের আহ্বানের ন্যায় তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়া মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। গানটি প্রকাশিত হয় 'প্রদীপ' পত্রিকায়।

গানের পালা শেষ হইলে শুরু হইল গল্প বলার পালা। তবে এ গল্প গদ্যে বলা হইল না— এ গল্প রূপ লইল ছন্দে, নাট্যকাব্য গাথারূপে। শ্রেষ্ঠভিক্ষা (৫ই কার্তিক ১৩০৪) প্রতিনিধি (৬ই) গান্ধারীর আবেদন, পতিতা (৯ই), ভাষা ও ছন্দ, দেবতার গ্রাস (১৩ই), সতী (২০এ), মস্তক বিক্রয় (২১এ) নরকবাস, (৭ই অগ্রহায়ণ) লক্ষ্মীর পরীক্ষা (২৯এ অগ্র) মাসাধিককালের মধ্যে রচিত হয়; শেষ দুইটি নাট্যকাব্য শান্তিনিকেতনে লেখা। দুই বৎসর পরে রচিত হয় কর্ণ-কুন্তী সংবাদ। এই নাট্যকাব্যগুলির সহিত 'ভাষা ও ছন্দ' এবং 'পতিতা' কবিতা-দুইটি যোজনা করিয়া 'কাহিনী' নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অপর কবিতাগুলি 'কথা' গ্রন্থের মধ্যে যায়; এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

বাংলাসাহিত্যে নাট্যকাব্য রবীন্দ্রনাথের একটি নূতন সৃষ্টি। এগুলিকে Reading drama বলা যাইতে পারে,কারণ ইহাদের মধ্যে নাটকীয় গুণ স্বল্প, লিরিসিজমই প্রবল। আমাদের মনে হয় রবার্ট ব্রাউনিংএর নাটকের সহিত এগুলির সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এই রচনার মধ্যে ব্রাউনিঙের প্রেরণা ছিল বলিলে কবিকে ছোটো করা হইবে না। এই শ্রেণীর প্রথম নাট্যকাব্য প্রকৃতির প্রতিশোধ (১২৯১)। তারপর লেখেন চিত্রাঙ্গদা (১২৯৮), বিদায় অভিশাপ (১৩০১) ও মালিনী (১৩০৩)। মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত নাট্যকাব্য সংগ্রহে তিনি 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'কে পৃথকভাবে শ্রেণীত করিয়াছিলেন, কারণ যথাভাবে উহা নাটকও নহে, নাট্যকাব্যও নহে। কাঁচা কাব্য হিসাবে তত্ত্বের দিক হইতে পাকা কথা থাকা সত্ত্বেও উহা সাহিত্যের বড়ো আসন পায় নাই।

এই নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস, এক শ্রেণীর রচনা; সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর নাটিকা 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'। লক্ষ্মীর পরীক্ষার ভাষা ও ভঙ্গি তাঁহার সকল নাটক বা নাট্যকাব্যের ভাষা ও রীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্; ইহার ভাষা সরল, বলিবার ভঙ্গি সরস, বিষয়টিও হাস্যোজ্জ্বল আনন্দকৌতুক পূর্ণ। বিষয়ের গুরুত্বানুযায়ী ভাষার ও রীতির পরিবর্তন হয়; এই ভাষায় গান্ধারীর আবেদন লিখিলে তাহা অপাঠ্য হইত। সুতরাং ভাষা ছন্দ ও ভাবের মধ্যে যে একটি সংগতি আছে তাহা এই নাট্যকাব্যগুলি আলোচনা করিলে স্পষ্টতর হয়। ভাষা ও ছন্দের কথা যখন উঠিল তখন নাট্যকাব্যগুলির আলোচনার পূর্বে কবির 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটি সম্বন্ধেই আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই কবিতায় একটি বড়ো সত্যের ব্যাখ্যা হইয়াছে, তাহা হইতেছে— যাহা ঘটে, তাহা সত্য নহে, যাহা কবি সৃষ্টি করেন তাহাই সত্য। "নারদ কহিলা হাসি, 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যা, তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো'।" রবীন্দ্রনাথ পৌরাণিক কাহিনী লইয়া নাট্য রচনা করিতেছেন, প্রশ্ন উঠিতে পারে মহাভারতের বা পুরাণের উপাখ্যানের সহিত কবিরচিত আখ্যানভাগের মিল পাওয়া যায় না। কবি তাহারই উত্তর যেন পূর্ব হইতে এই কবিতার মধ্যে দিয়া বলিয়া রাখিলেন— 'সেই সত্য, যা রচিবে তুমি'।

এই কথার সমর্থনে 'কৃষ্ণচরিত্র'র সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিলে বিষয়টি স্পষ্টতর হইবে। "তথ্য যাহাকে ইংরেজিতে fact বলে, তদপেক্ষা সত্য অনেক ব্যাপক। এই তথ্যস্তূপ হইতে মুক্তি ও কল্পনাবলে সত্যকে উদ্ধার করিয়া লইতে হয়। অনেক সময় ইতিহাসে শুষ্ক ইন্ধনের ন্যায় রাশীকৃত তথ্য পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সত্য, কবির প্রতিভাবলে কাব্যেই উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে। সেই কারণেই কবিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। মহৎব্যক্তির কার্যবিবরণ কেবল তথ্যমাত্র, তাঁহার মহত্ত্বটাই সত্য; সেই সত্যটি পাঠকের মনে উদিত

করিয়া দিতে ঐতিহাসিকের গবেষণা অপেক্ষা কবি-প্রতিভার আবশ্যকতা অধিক।" 'ভাষা ও ছন্দে' কবিদের সাহিত্যসৃষ্টির যে অধিকার নারদ বাল্মীকিকে দিয়াছিলেন, তাহা কবির নিজ রচনাসৃষ্টির সমর্থনে কৈফিয়ত। তিনি রামায়ণোল্লিখিত ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যান লইয়া 'পতিতা' ও মহাভারত-বর্ণিত গান্ধারীর জীবনী লইয়া 'গান্ধারীর আবেদন' রচনা করিলেন বটে তবে সেগুলি পরম্পরাগত আখ্যান হইতে পৃথক্, নিজ কল্পনাপ্রসূত আখ্যান; কল্পনার যুগেরই উপযুক্ত কাব্য।

প্রথম তিনটি নাট্যকাব্যে রবীন্দ্রনাথ যে কথাটি পরিস্ফুট করিয়াছেন তাহা হইতেছে তাঁহার নিজের ধর্মবোধের কথা। লোকধর্ম, রাজধর্ম, ব্যাবহারিকধর্ম, মোক্ষধর্ম প্রভৃতি নানা কোঠায় মানুষ মানবধর্মকে ভাগ করিয়া সত্যধর্মের মধ্যে বিরোধ কল্পনা করিষা সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছে। রাজধর্ম নিঃসংকোচে লোকধর্মকে অবমাননা করিতে পারে, মোক্ষধর্ম মানবধর্মকে অনায়াসে লাঞ্ছনা করিতে পারে। মানবের শাশ্বত ধর্ম, নিত্য ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; সে সত্য লোকাচার ও রাজধর্মের উর্ধ্বে এমন কি মোক্ষধর্মেরও উপরে। 'গান্ধারীর আবেদনে' দুর্যোধন রাজধর্মের নিকট লোকধর্মকে বলি দিয়া গর্ব করিতেছেন। গান্ধারী সত্যধর্মের পূজারী; তাঁহার কাছে "ধর্ম নহে সম্পদের হেতু, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু, ধর্মেই ধর্মের শেষ!" সকল ধর্মের উপর মানধবর্ম; আচারের ধর্ম হইতে প্রেমের ধর্ম মহৎ; সংস্কারের ধর্ম হইতে মানবের সহজ ধর্ম শ্রেষ্ঠ। প্রচলিত সত্যাসত্য, লৌকিক ধর্মাধর্মের সহিত তিনি শাশ্বত সত্যের আপোশ করিতে রাজি নহেন; সত্যকে অখণ্ডভাবে গ্রহণই মানবের ধর্ম। এই নাট্যে রবীন্দ্রনাথ সেই অখণ্ড সত্যই যে মানবের সত্যধর্ম এই তত্ত্বটি অতুলনীয় ভাষায় ও নাটকীয়ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

'সতী' নাট্যটি মিস্ ম্যানিং সম্পাদিত ন্যাশনাল্ ইণ্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েশনের পত্রিকায় মারাঠীগাথা সম্বন্ধে অ্যাক্‌ওয়র্থ সাহেব রচিত প্রবন্ধবিশেষে বর্ণিত ঘটনা হইতে সংগৃহীত। এই মারাঠী গাথার গল্পে বিনায়ক রাও-এর কন্যা অমাবাঈ নাট্যের নায়িকা। অমাবাঈ কোনো মুসলমানকে ভালোবাসিয়া তাহাকে বিবাহ করে। অমাবাঈ-এর মাতা ম্লেচ্ছের সঙ্গে কন্যার এই বিবাহকে অস্বীকার করিয়া কন্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন। যুদ্ধে অমাবাঈ-এর যবন স্বামী নিহত হয়। বিনায়ক স্বহস্তে তাহাকে বধ করেন। পিতা কন্যাকে তাঁহার যবন ঔরসজাত শিশুপুত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবার জন্য বলিলেন; তাহার পতি ও পুত্র বিনায়কের চক্ষে মিথ্যা পাপমাত্র, তাহাদিগকে ভুলিলেই ভালো—ভুলিলেই তাহার মুক্তি। জীবাজী ছিল অমাবাঈ-এর বাক্‌দত্ত। সেও সেইরাত্রের যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিল। বিনায়ক বলিলেন, জীবাজি তাহার পতি, যবন পতি নহে। ইহার উত্তরে অমাবাঈ বলিল—

তব ধর্ম কাছে	করে ছিনু বীরপদে। যবন ব্রাহ্মণ
পতিত হয়েছি, তবু মম মর্ম আছে	সে ভেদ কাহার ভেদ? ধর্মের সে নয়।
...	অন্তরের অন্তর্যামী যেথা জেগে রয়
সমুজ্জ্বল! পত্নী আমি নহি সেবাদাসী।	সেথায় সমান দোঁহে!

হৃদয় অর্পণ

প্রেম মানবের ধর্ম; ইহা শাশ্বত ধর্ম— লৌকিক ধর্ম নহে; লৌকিক ধর্মে প্রেম জাতিবর্ণ বিচার করে। তাই মানুষের রচিত ধর্মানুসারে অমাবাঈ জিবাজীর পত্নী, যবনের নহে। তাহাকে মুসলমানের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া জিবাজীর মৃতদেহের সহিত সহমৃতা করা হইল। অমাবাঈ প্রার্থনা করিল—

তব নিত্যধর্মে কর জয়ী ক্ষুদ্র ধর্ম হতে।

অমাবাঈ যথার্থ সতী; কিন্তু তাহার মাতা কন্যাকে পরপুরুষের সঙ্গে দাহ করিয়া সতীধর্মের জয় ঘোষণা

করিলেন। প্রেম নিত্য; সেই নিত্যধর্ম ক্ষুদ্র আচারধর্মের নিকট অপমানিত হইল। ধর্ম কুণ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ আচার-ধর্ম বিরোধী, তিনি মানবের সত্য ধর্ম, নিত্যধর্মের বিশ্বাসী।

তৃতীয় নাট্য 'নরকবাস'। এখানেও সেই মহান্ সুরটি পাই। পিতাপুত্রের সম্বন্ধ নিত্য সত্য, যেমন সত্য স্বামীস্ত্রীর নিত্যসম্বন্ধ। রাজা সোমক ক্ষত্রিয়ের ধর্ম রক্ষা করিতে গিয়া পিতৃধর্ম পালনে বিরত। নিজ পুত্রকে যজ্ঞে আহুতি দিয়া মহাপুণ্য অর্জন করিয়া স্বর্গে চলিয়াছেন। তিনি ক্ষত্রিয়ের অন্যতম ধর্ম বাক্যরক্ষা, তাহা পালন করিয়া যশস্বী। লৌকিক ধর্মের আদর্শে তিনি পুণ্যাত্মা। স্বর্গের পথে ঋত্বিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ। নরকে ঋত্বিককে দেখিয়া রাজার চেতনা হইল। তিনি পুণ্যলোভাতুর হইয়া নিজের নিষ্পাপ পুত্রকে দগ্ধ করিয়াছিলেন, এই কথা মনে জাগিল; তিনি ধর্মকে বলিলেন, ঋত্বিক যে পাপে পাপী তিনিই তো সেই অপরাধে অপরাধী; তাছাড়া পিতাপুত্রের নিত্য সত্য সম্বন্ধে তিনি আঘাত করিয়াছেন, তাঁহার স্বর্গে যাইবার অধিকার নাই। যে লৌকিক ধর্ম তাঁহাকে গৌরব দান করিতেছিল তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বয়ং প্রায়শ্চিত্ত করিলেন নরকবাস করিয়া। লৌকিক ধর্ম অপেক্ষা মানুষের 'মনুষ্যত্ব ধর্ম' শ্রেষ্ঠ সেই কথা লেখক তাঁহার এই নাট্যকাব্যেও দেখাইলেন।

যদিও দুই বৎসর পরে রচিত তবুও, এইগুলির সহিত ভাবের ধারায় যুক্ত 'কর্ণকুন্তী সংবাদ'। কর্ণ যে বিদ্রোহী তাহার কারণ কুন্তী তাঁহার আদিম মাতৃত্বধর্ম পালন করেন নাই, লোকভয়ে সমাজভয়ে তিনি তাঁহার মাতৃত্বধর্মকে অবমাননা করেন— যে ধর্ম মানবের আদিমধর্ম। কুন্তী কর্ণকে পাণ্ডবদের পক্ষে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলে কর্ণ উত্তর করিলেন—

যে ফিরাল মাতৃ-স্নেহ-পাশ—
তাহারে দিতেছ মাতঃ রাজ্যের আশ্বাস!
মাতা মোর, ভ্রাতা মোর, মোর রাজকুল
এক মুহূর্তেই মাতঃ করেছ নির্মূল
মোর জন্মক্ষণে। সূত জননীরে ছলি
আজ যদি রাজ-জননীরে মাতা বলি,—
কুরুপতি কাছে বদ্ধ আছি যে বন্ধনে
ছিন্ন ক'রে ধাই যদি রাজ সিংহাসনে
তবে ধিক্ মোরে।

তত্ত্বের দিক ছাড়িয়া দিয়া সাহিত্যের দিক হইতেও এই নাট্যকাব্যগুলি অতুলনীয়। মনের যে ঘাত-প্রতিঘাতে ইহাদের সৌন্দর্য ফুটিয়াছে তাহাও প্রণিধানযোগ্য। দুর্যোধন, ভানুমতীকে আমাদের যতই খারাপ লাগুক তাহাদের তেজোদীপ্ত নির্ভীক, ক্ষত্রোচিত বাণী তাহাদেরই উপযুক্ত বলিয়া মন প্রশংসমান হয়। বিনায়করাও তাহার যবন জামাতাকে হত্যা করিয়া কন্যাকে বিধবা করেন, সে কঠোরভাবে কন্যাকে তিরস্কার করিতেছিল। কিন্তু যেই তাহার স্ত্রী কন্যার বিরুদ্ধে গেল তখনই তাহার পিতৃহৃদয় কন্যার দুঃখে কাতর হইল— পিতা কন্যার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। 'ঘটনাটি সামান্য হইলেও সূক্ষ্ম বিচারে ইহার সৌন্দর্য ধরা না পড়িয়া যায় না। শেষোক্ত নাটকে কর্ণের প্রার্থনা—

জয়লোভে যশলোভে রাজ্যলোভে, অয়ি,
বীরের সদ্গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।

কর্ণের যে যুক্তি তাহার উপর কেহই বলিতে পারে না যে কর্ণের পক্ষে পাণ্ডবপক্ষে আসা উচিত ছিল। রবীন্দ্রনাথের আর্ট এইসব জায়গায় অপরূপ সৌন্দর্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

'কর্ণকুন্তী সংবাদে'র তর্জমা— The Foundling Hero— স্টার্জমুর এর করা। তিনি এই ছোটো নাট্যরচনার মধ্যে গভীর epic সুরের সন্ধান পাইয়াছিলেন। Sturge Moore ইংরেজি তর্জমা অবলম্বন করিয়া অমিত্রাক্ষরে আগাগোড়া রচনাটিকে ইংরেজি কাব্যরূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এই কয়খানি নাট্যকাব্যের বিশ্লেষণ করিলে কবির মনোভাব সম্বন্ধে একটি কথা খুবই স্পষ্ট দেখিতে পাই। সেটি হইতেছে লৌকিক মতামত বা আচার সংস্কারাদি না মানিবার একটা বিদ্রোহ ভাব। প্রাচীন লৌকিক ধর্মই যে

মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম নহে, সবার উপরে একটি যে নিত্য সত্য ধর্ম রহিয়াছে— যাহা অহিংস, অসাম্প্রদায়িক, যাহা সর্বজীবের কল্যাণ ইচ্ছায় পূর্ণ, যাহা যুক্তিতে সুদৃঢ়— সেই ধর্মই মানবের ধর্ম। নাট্যগুলি সেই ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া প্রচার করিতেছে।

একখানি পুরাতন পত্রেও রবীন্দ্রনাথ এই কথাটি বলিয়াছেন ; "ঠিক যাকে সাধারণ ধর্ম বলে, সেটা যে আমি আমার নিজের মধ্যে সুস্পষ্ট দৃঢ়রূপে লাভ করতে পেরেছি, বলতে পারিনে। কিন্তু মনের ভিতরে ভিতরে ক্রমশ যে একটা সজীব পদার্থ সৃষ্ট হয়ে উঠচে তা অনেক সময় অনুভব করতে পারি। বিশেষ কোনো একটা নির্দিষ্ট মত নয়,— এ একটা নিগূঢ় চেতনা— একটা নূতন অন্তরিন্দ্রিয়। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি ক্রমশ আপনার মধ্যে আপনার একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব,— আমার সুখ, দুঃখ, অন্তর, বাহির, বিশ্বাস, আচরণ সমস্তটা মিলিয়ে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব। শাস্ত্রে যা লেখে, তার সত্য অনেক সময় আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, বস্তুত আমার পক্ষে তার অস্তিত্ব নাই বললেই হয়। আমার সমস্ত জীবন দিয়ে যে জিনিসটাকে সম্পূর্ণ আকারে গড়ে তুলতে পারব, সেই আমার চরম সত্য।" (বঙ্গভাষার লেখক গ্রন্থে উদ্ধৃত পত্র পৃ ৯৭১)

'গান্ধারীর আবেদন' (১৩০৪) অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে কবি পড়িয়া শোনান ; এই সময়ে অনেকরই ধারণা হয় যে এই নাট্যকাব্যের মধ্যে লোকনিন্দা সম্বন্ধে যে উক্তি আছে তাহার অন্তরালে কোনো রাজনৈতিক অর্থ আছে। "নিন্দারে রসনা হতে দিলে নির্বাসন নিম্নমুখে অন্তরের গূঢ় অন্ধকারে গভীর জটিল মূল সুদূরে প্রসারে, নিত্য বিষতিক্ত করি রাখে চিত্ততল"— এই যে উক্তি, ইহার পশ্চাতে আছে সমসাময়িক বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের liberty of speech and freedom of the press সম্বন্ধে আইন প্রণয়নের চেষ্টা। এই সময়ে ভারতীয় ফৌজদারি আইনের ১২৪ ক ধারা ও ৫০৫ ধারার সংশোধন হইবার প্রস্তাব চলিতেছিল ; বৃটিশরাজ অন্ধের ন্যায় যেন বলিতে চাহিতেছিলেন— "অব্যক্ত নিন্দায় কোনো ক্ষতি নাহি করে রাজমর্যাদায়।" ১৮৯৭-এ অমরাবতীতে ত্রয়োদশ কংগ্রেস অধিবেশনে এই আইনের পরিবর্তনবিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। কয়েকদিন পরে 'কণ্ঠরোধ' শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহা ইহারই অনুক্রমণ। কবির মনে এই রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ব্যতীত তৎকালীন আরও কয়েকটি সামাজিক ঘটনা জাগিতেছিল। গান্ধারীর এইযে উক্তি "পতি সাথে বাধায়ে বিরোধ যে নর পত্নীরে হানি' লয় তার শোধ সে শুধু পাষণ্ড নহে, সে যে কাপুরুষ।"— ইহার মধ্যেও যে সত্য ইঙ্গিত আছে তাহা সমসাময়িক পত্রিকাদি দেখিলেই পাঠক জানিতে পারিবেন। "পুরুষেরে ছাড়ি' অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া নিরুপায় নারী গৃহধর্মচারিণীর পুণ্যদেহ 'পরে" কলঙ্কের বোঝা প্রকাশের ফলে কোনো সংবাদপত্রের সম্পাদকের কারাগার হয়। সাহিত্যজীবীর এই অপমানকর, রুচিবিগর্হিত ব্যবহারের জন্য কবি যেন অত্যন্ত লজ্জিত ; তাহাকে তিনি 'শুধু পাষণ্ড' বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তাহাকে 'কাপুরুষ' বলিয়া চরম নিন্দা করিলেন।

ভারতী ১৩০৫

১৩০৫ সনে 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদকত্বের পদের দায়িত্ব আসিয়া রবীন্দ্রনাথের উপর পড়িল ; 'সাধনা' বন্ধ হইয়া যাইবার পর প্রায় আড়াই বৎসর কাল কোনো পত্রিকার ভার নাই। গত দুই বৎসর ভারতী ছিল তাঁহার ভাগ্নেয়ী হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবীর হাতে, তৎপূর্বে দশবৎসর ছিল স্বর্ণকুমারী দেবীর পরিচালনাধীন।

মাসিকপত্রের সম্পাদকরূপে রবীন্দ্রনাথকে দুইটি নির্দিষ্ট কার্য সম্পন্ন করিতে হইত ; একটি হইতেছে, সাময়িক প্রসঙ্গ লইয়া প্রবন্ধ লেখা, দ্বিতীয় হইতেছে পাঠকদের মনোরঞ্জনার্থ গল্পরচনা। সেইজন্য 'ভারতী'র সম্পাদকত্ব কালটি

রবীন্দ্রনাথের গদ্যযুগ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না ; কারণ কয়েকটি গান ও দুইচারিটি কবিতা ছাড়া উল্লেখযোগ্য কাব্য এ-বৎসরে রচিত হয় নাই। তাঁহার বিচিত্র গদ্যরচনার অধিকাংশই গদ্য গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত হইয়াছে।

বৈশাখের (১৩০৫) 'ভারতী'তে 'কণ্ঠরোধ' নামে যে রাজনৈতিক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়[১] তার ইতিহাস সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন, কারণ কবির বহু সাময়িক রচনা তৎকালীন রাজনীতির সমালোচনা। রাজনৈতিক প্রবন্ধের পিছনে যে ঐতিহাসিক পটভূমি থাকে তাহা কালান্তরে অস্পষ্ট হইয়া আসে, সেইজন্য পরবর্তীযুগের পাঠকদের নিকট তাহাদের অভিজ্ঞা প্রকাশিত হয় না।

উনবিংশ শতকের শেষ দশকে ভারতবর্ষময় জাতীয়তাবোধের যে নূতন প্রেরণা দেখা দিয়াছিল, তাহার হোতা ছিলেন বালগঙ্গাধর টিলক (১৮৫৬-১৯২০)। ভারতের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস দেশের সকল শ্রেণীর লোকের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে আর পারিতেছিল না ; গত দশ বৎসর কন্‌গ্রেস আইন-অনুগত আন্দোলন পরিচালনার অজুহাতে বৃটিশরাজের কাছে আবেদন ও নিবেদন করিয়াছে। বৃটিশ শাসনতন্ত্রের ন্যায়পরায়ণতার দোহাই দিয়া, ইংরেজ জাতির স্বাধীনতা-প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, মহারানী ভিক্টোরিয়ার সিপাহীবিদ্রোহোত্তর ঘোষণা পত্রকে ভারতীয়দের ম্যাগ্‌না কার্টা বা স্বাধীনতার কবচপত্র কল্পনা করিয়া, ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা দিয়া ও প্রবন্ধ লিখিয়া আমরা আপনাকে স্বাধীনতা পাইবার পরম যোগ্য জ্ঞান করিতেছিলাম। এইসব কারণে কন্‌গ্রেস এক শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে সম্মান হারাইয়াছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে টিলকের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতির মধ্যে নূতন প্রেরণা আসিয়াছিল, তাহার আভাস আমরা পূর্বে দিয়াছি। টিলকের কাছে স্বদেশ ও স্বধর্ম প্রতিশব্দবাচক ; এই চিন্তাপদ্ধতি মহারাষ্ট্রদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না, কারণ আজ ভারতময় হিন্দুজাতীয়তাবোধের যে তেজোদীপ্ত আন্দোলন চলিতেছে, তাহারও প্রবর্তক মহারাষ্ট্র বীর দামোদর সবরকার।

পাঠকদের স্মরণ আছে কয়েক বৎসর পূর্বে (১৮৯৩) মহারাষ্ট্র সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র পুণা নগরীতে গো-বধ নিবারণী সভা স্থাপিত হইলে, কিভাবে তাহার তরঙ্গ হিন্দুভারতের নানাস্থানে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। অতঃপর টিলক মহারাষ্ট্রদের গণপতি পূজাকে 'সার্বজনিক' গণদেবতার পূজায় রূপান্তরিত করিয়া মারাঠাদের ধর্মীয় জীবনে নূতন চেতনা আনয়ন করেন। এই গণধর্মবোধের সহিত রাজনৈতিক আত্মচেতনা প্রবুদ্ধ করিবার জন্য 'শিবাজী-উৎসব' প্রবর্তিত হয় (১৮৯৫)। এমন সময়ে বোম্বাইতে প্লেগ দেখা দিলে (১৮৯৬) টিলক ও তাঁহার যুবক স্বেচ্ছাসেবক দল প্লেগের বিভীষিকা এবং তাহা হইতে ভীষণতর প্লেগ প্রতিষেধক কর্মচারীদের উৎপীড়ন হইতে মারীভয়-গ্রস্ত নগরীকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন। শিবাজী-উৎসব মারীভয়ের জন্য শিবাজীর জন্মদিনে অনুষ্ঠিত না হইয়া ১৩ই জুন (১৮৯৭) সম্পন্ন হইল। এই উৎসবক্ষেত্রে হিন্দুমেলার ন্যায় নানাবিধ শারীরিক ব্যায়াম প্রদর্শিত হইত, সভায় স্বদেশ ও স্বধর্মসেবা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদত্ত ও কবিতা আবৃত্ত হইত। এই উৎসব অনুষ্ঠানের কয়েকদিন পরে টিলক-সম্পাদিত 'কেশরী' সাপ্তাহিকে (১৫ই জুন) শিবাজী উৎসবের বিস্তৃত বর্ণনা ও উৎসবে পঠিত কবিতাটি প্রকাশিত হইল। ইহার কয়েকদিন পরে (২২শে) দুইজন প্লেগঅফিসার (W. C. Rand I. C. S.; Lieutenant Ayerst) পুণার রাজপথে দুইজন মহারাষ্ট্রীয় যুবক দ্বারা নিহত হন। ইতিপূর্বে মহারাষ্ট্রীয় যুবসঙ্ঘের নেতৃস্থানীয় নাটু ভ্রাতৃযুগলকে বোম্বাই গভর্মেণ্ট ১৮২৭ সালের এক রেগুলেশন-আইনবলে বিনা বিচারে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। এই ভ্রাতৃদ্বয় ছিলেন যুব আন্দোলনের নেতা ও টিলকের দক্ষিণহস্তস্বরূপ।

র‍্যান্‌ড হত্যার জন্য গবর্মেণ্ট টিলককে পরোক্ষভাবে দায়ী করিলেন ; দীর্ঘকাল মোকদ্দমা চলিয়াছিল ; অবশেষে

১ ভারতী ১৩০৫ বৈশাখ পৃ ২৩-৩৪। রাজা প্রজা দ্রষ্টব্য

টিলকের দেড় বৎসরের জন্য জেল হইল। রাজনৈতিক অপরাধের জন্য কারাবরণ জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এই প্রথম; সুতরাং সমস্ত দেশময় এই ব্যাপারে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইল, তাহা গবর্মেণ্ট যাহা চাহিয়াছিলেন, ঠিক তাহার বিপরীত। গবর্মেণ্ট জেলের ভয় দেখাইয়া যাহা নিবৃত্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল; লোকের জেলের ভয় ভাঙিয়া গেল। অচিরে এই দমন নীতির প্রতিক্রিয়া দেশমধ্যে নানা ভাবে, নানা মূর্তিতে দেখা দিল; সেটি হইতেছে জাতীয় আন্দোলনে রুদ্রপন্থা।

টিলকের প্রতি সহানুভূতি সর্বত্রই প্রকাশিত হইল; বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র মল্লিক ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত টিলকের মোকদ্দমার সাহায্যকল্পে জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া পুণায় পাঠাইয়াছিলেন। টিলকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তেমন ঘনিষ্ঠতার সুযোগ কোনো দিনই হয় নাই; তৎসত্ত্বেও একজন অপরকে বিশেষভাবেই শ্রদ্ধা করিতেন, অথচ ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে উভয়ের মতামত শুধু বিভিন্ন নহে, বিরুদ্ধ। টিলক রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। রবীন্দ্রনাথ 'যাত্রী'তে লিখিয়াছিলেন যে টিলক তাঁহার "কোনো দূতের যোগে আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলেন আমাকে য়ুরোপে যেতে হবে। সে সময়ে পোলিটিক্যাল আন্দোলনের তুফান বইচে। আমি বললুম, রাষ্ট্রিক আন্দোলনের কাজে যোগ দিয়ে আমি য়ুরোপে যেতে পারব না। তিনি বলে পাঠালেন, আমি রাষ্ট্রিক চর্চায় থাকি এ তাঁর অভিপ্রায় বিরুদ্ধ। আমি জানতুম জনসাধারণ টিলককে পোলিটিক্যাল নেতারূপেই বরণ করেছিল এবং সেই কাজেই তাঁকে টাকা দিয়েছিল। এইজন্য আমি তাঁর পঞ্চাশ হাজার টাকা গ্রহণ করতে পারিনি। তারপরে বোম্বাই শহরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে পুনশ্চ বললেন, 'রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপারে থেকে নিজেকে পৃথক্ রাখলে তবেই আপনি নিজের কাজ সুতরাং দেশের কাজ করতে পারবেন— এর চেয়ে বড়ো আর কিছু আপনার কাছে প্রত্যাশা করিনি।' আমি বুঝতে পারলুম, টিলক যে গীতার ভাষ্য করেছিলেন— সে কাজের অধিকার তাঁর ছিল, সেই অধিকার মহৎ অধিকার।"[১]

ভারতবর্ষের এই উদ্যত জাতীয়তাবোধ টিলকের কারাগারে মুখর হইয়া উঠিল; সুতরাং গবর্মেণ্ট যে কণ্ঠ হইতে কেবল আবেদন ও ক্রন্দন শুনিতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাহা হইতে স্পষ্টভাষায় প্রতিবাদ প্রচারিত হইতে দেখিয়া অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিলেন; সেই কণ্ঠকে রোধ করিবার জন্য সিডিশন বিলের খসড়া প্রস্তুত হইল, গোপনে প্রেস কমিটি[২] বসিল। সিডিশন বিল পাশ হইবার পূর্বদিন টৌনহলের জনসভায় রবীন্দ্রনাথ 'কণ্ঠরোধ' নামে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ আরম্ভ করিলেন এই বলিয়া: "অদ্য আমি যে ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা যদিও বাঙালির ভাষা, দুর্বলের ভাষা, বিজিত জাতির ভাষা তথাপি সে-ভাষাকে আমাদের কর্তৃপক্ষেরা ভয় করিয়া থাকেন। তাহার একটি কারণ, এ ভাষা তাঁহারা জানেন না এবং যেখানেই অজ্ঞানের অন্ধকার সেইখানেই অন্ধ আশঙ্কার প্রেতভূমি।"

কবি লিখিলেন যে, কতকগুলি অভাবনীয় ঘটনায় হঠাৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে যে আমরা অত্যন্ত ভয়ংকর এবং সেই ভয় হইতে তাঁহারা ধর্ষণনীতি অবলম্বনে অগ্রসর হইলেন। "গবর্মেণ্ট অত্যন্ত সচকিতভাবে তাঁহার পুরাতন দণ্ডশালা

১ যাত্রী, পৃ ৯-১০। দ্র বিজলী ২০ আশ্বিন ১৩৩০। Mod. Rev. 1923. II 611.

২ ১৮৯৮ সালে Secret Press Committee গবর্মেণ্ট স্থাপন করেন। মাদ্রাজের কন্‌গ্রেসে ইহার প্রতিবাদে প্রস্তাব গৃহীত হয়। 1898 Dec 30. Resolution No VIII. 'Resolved that this Congress is strong of opinion that the establishment of Secret Press Committee in certain parts of India is highly objectionable and inconsistant with the spirit of British administration'. Besant, How India wrought her Freedom p 285. The Hon. Mr. C. Jambulingam Mudaliar moved Resolution IV, a protest on the law of sedition which had been passed in the supreme Legislative Council against the stubborn opposition of the non-official members and an unprecedented agitation in the country". ibid p 274

হইতে কতকগুলি অব্যবহৃত কঠিন নিয়মের প্রবল লৌহশৃঙ্খল টানিয়া বাহির করিয়া তাহার মরিচা সাফ করিতে বসিয়াছেন।...রোষরক্ত গবর্মেণ্ট ...পুণা সহরের বক্ষের উপর রাজদণ্ডের জগদ্দল পাথর চাপাইয়া দিলেন।...রাজপ্রাসাদের গুপ্তচূড়া হইতে কোনো এক অজ্ঞাত অপরিচিত বীভৎস আইন বিদ্যুতের মতো নাটুভ্রাতৃযুগলকে ছোঁ মারিয়া কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছে।"

দেশের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হইলে তাহাকে প্রকাশ করিতে দিতে হয়, সর্পের গতি গোপন এবং দংশন নিঃশব্দ। সেইজন্যই "সংবাদপত্র যতই অধিক এবং যতই অবাধ হইবে স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে দেশ ততই আত্মগোপন করিতে পারিবে না।...রহস্যই অনিশ্চিত ভয়ের প্রধান আশ্রয়স্থান...রুদ্ধবাক্ সংবাদপত্রের মাঝখানে রহস্যান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকা আমাদের পক্ষে বড়ই ভয়ংকর অবস্থা।...শাসিত ও শাসনকর্তার মধ্যবর্তী শাসনশৃঙ্খলটাকে সর্বদা ঝংকার না দিয়া সেটাকে আত্মীয় সম্বন্ধ বন্ধনরূপে ঢাকিয়া রাখিলে অধীন জাতির ভার লাঘব হয়। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এই প্রকাশের একটা আচ্ছাদনপট।...মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাবরণ উত্তোলন করিয়া লইলে আমাদের পরাধীনতার সমস্ত কঠিন কংকাল এক মুহূর্তে বাহির হইয়া পড়িবে।...দুইশত বৎসর পরিচয়ের পরে আমাদের মানব সম্বন্ধের এই কি অবশেষ?"

উনবিংশ শতকের শেষদিকে রবীন্দ্রনাথ যেকথা লিখিয়াছিলেন, তাহা গত অর্ধশতাব্দীর ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে। ইংরেজের অবিশ্বাস ও সন্দেহ ঘুচে নাই। একহাতে দান করিয়া অপর হস্তে কৌশলে চতুর্গুণ আদায়ের চেষ্টা প্রতিনিয়ত চলিতেছে। এখনো সেই প্রশ্ন— মানব সম্বন্ধের এই কি পরিণাম!

এমন সময়ে কলিকাতায় প্লেগের আবির্ভাব হইল। বোম্বাইতে প্লেগের সময় সরকার যেভাবে উপদ্রব করিয়া তথাকার অধিবাসীকে একেবারে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, কলিকাতায় তাঁহারা সেরূপ করিলেন না। সরকারের ভাবখানা এইরূপ হইল, প্রজারা যখন পুরদেশী এবং পরিবারমণ্ডলীর প্রতি হস্তক্ষেপ করার বিরুদ্ধে উহাদের যখন এতই দৃঢ় সংস্কার তখন সেটা বিবেচনা করিয়া এবং যথাসম্ভব বাঁচাইয়া কাজ করাই রাজার কর্তব্য। (ভারতী ১৩০৫ পৃ ১৭৫)

রবীন্দ্রনাথের মতে এইরূপ দুর্যোগই বিদেশী রাজার পক্ষে প্রজাদের হৃদয়জয়ের দুর্লভ অবকাশ। এই সময়েই রাজা প্রমাণ করিতে পারেন যে, আমরা পর হইয়াও পর নহি। এই সময়েই তাঁহাদের পক্ষে ধৈর্য ও সমবেদনা ফৌজ ও গুলিগোলা অপেক্ষা রাজশক্তির যথার্থ পরিচয়স্থল। তিনি পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, পতিতের উপর পদপ্রহার, ব্যথিতের উপর জবরদস্তি ভয়ের নিষ্ঠুরতা মাত্র। ইহাতে রাজার রাজশক্তি নহে বিদেশীর দুর্বলতা প্রকাশ পায়।

মারীগ্রস্ত পুণার দুর্দশার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিলেন যে, গোরা-সৈন্যের আতঙ্কজনিত কাতরোক্তিকে প্রজার স্পর্ধা বলিয়া গণ্য করিয়া সরকার উত্তরোত্তর নির্দয় হইয়াছিলেন; তাঁহারা প্রবলজনোচিত ঔদার্য অবলম্বন করিলেন না। রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন, স্বীকার করা গেল গোরা-সৈন্যগণ শিষ্ট শান্ত সংযত এবং দেশীয় লোকদের প্রতি স্নেহশীল। কিন্তু দেশের মূঢ় লোকের যদি এমন একটা সুদৃঢ় অন্ধ সংস্কার জন্মিয়াই থাকে যে গোরাসৈন্য দুর্দান্ত উচ্ছৃঙ্খল এবং শ্রদ্ধার অভাবে দেশীয় লোকের প্রতি অবিবেকী, তবে সেই চরম সংকটের সময় বিপন্ন ব্যক্তিদের একটা অনুরোধ রক্ষা করিলে দুর্বলতা নহে মহত্ত্ব প্রকাশ পাইত। এই ধর্ষণনীতি অবলম্বনের ফলে ভারতের 'আদ্যন্ত মধ্যে অশান্তির আক্ষেপ কোথাও প্রকাশ্যে ফুটিবার উপক্রম করিল, কোথাও গুমরাইয়া উঠিল।" ভবিষ্যৎদ্রষ্টার ন্যায় তিনি বলিলেন, "কঠিন আইন ও জবরদস্তিতে সম্পূর্ণ উলটা ফল ফলিবে।"

এই প্রসঙ্গ-কথায় রবীন্দ্রনাথ একটি নূতন শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, প্রজাবিদ্রোহ। "ক্ষমতা যাহার হস্তে, বিচারের শেষ ফল সেই দিতে পারে। আমাদের মন বিগড়াইয়া গেলে আমরা কাগজে দুচার কথা বলিতে পারি, কিন্তু কর্তৃপক্ষের মন বিগড়াইয়া গেলে তাঁহারা আমাদের কাগজে গলা চাপিয়া ধরিতে পারেন। আমরা ক্ষুব্ধ হইলে

তাহা রাজবিদ্রোহ, কিন্তু রাজারা রুখিয়া থাকিলে তাহা প্রজাবিদ্রোহ নহে ? উভয়েরই ফল কি রাজ্যের পক্ষে সমান অমঙ্গলজনক নহে ?”

দেশীয়দের প্রতি ইংরেজের ব্যবহার দিনে দিনে কিভাবে রুদ্ররূপ ধারণ করিতেছে তাহারই উদাহরণ দিয়া তিনি বলিলেন, “পূর্বদেশীয়দের এই নীরব সহিষ্ণুতা, যাহাতে পশ্চিমদেশীয়দিগকে অলক্ষ্যে অসতর্কতা ও ঔদ্ধত্যে লইয়া যায়, ইহাই প্রজা ও পাশ্চাত্ত্য রাজা উভয়েরই পক্ষে বিপদের মূল। ইহা হইতেই গোরাসৈন্যদের মজার খেলা ও কালা আদ্‌মিদের অকস্মাৎ উন্মত্ততার সৃষ্টি হয়।”

এককালে সাধারণ ইংরেজ গোরা-কর্মচারী, ব্যবসায়ী, কথায় কথায় ঘুষা লাথি চড় মারিয়া এবং কটু সম্ভাষণ করিয়া ইতর, ভদ্র ও শিক্ষিত লোককে প্রায়ই অপমানিত করিতেন ; এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, “তাঁহারা প্রত্যহই ভারতবর্ষে কি প্রকার বিপৎপাতের ভিত্তি রচনা করিতেছেন, তাহা তাঁহারা জানেন না, এবং যে ইংরাজ সমাজ এইরূপ রূঢ়তা ও অবজ্ঞাপরতার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার নৈতিক বাধা প্রদান করেন না তাঁহারা যে-শাখায় বসিয়া আছেন সেই শাখা ছেদনে প্রবৃত্ত। আমাদের প্রতি ইংরেজদের এই প্রকার ভাবই প্রজাবিদ্রোহের ভাব।” (ভারতী ১৩০৫ পৃ ১৮৩)। রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক অবস্থার যে বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন— তাহা ভবিষ্যদ্‌বাণীর ন্যায় সত্য হইতেছে, বর্তমান ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

১৩০৫ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার (Bengal Provincial Conference) অধিবেশন হয় ঢাকায়। সভার সভাপতি ছিলেন রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নিষ্ঠাবান্ খ্রীস্টান সাধক পরম দেশভক্ত ছিলেন ; সে-যুগের রীতি অনুসারে তিনি সভাপতির অভিভাষণ ইংরেজিতে পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ও তিনিই সভাপতির সম্ভাষণের সারমর্ম বাংলায় তথায় পাঠ করিয়াছিলেন। (ভারতী ১৩০৫, পৃ ২৪৮)।

রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি হইতে দূরে ছিলেন এবং ছিলেন না— এই দুই কথাই সত্য। এ কথা যথার্থই সত্য যে তিনি সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতাদের ন্যায় কখনো রাজনৈতিক কর্মসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়েন নাই ; কিন্তু যখনই দেশের ডাক পড়িয়াছে তখনই নির্ভয়ে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন তাহা দেশবাসীর বা সরকার বাহাদুরের অপ্রিয় হইলেও নির্ভীক-ভাবে ও নিঃসংকোচে বলিয়া গিয়াছেন। সরকারের দোষ প্রচুর পরিমাণে দেখাইয়া আমাদের একদল নেতা নিজ কর্তব্য সমাপন হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করেন— রবীন্দ্রনাথ সে-দলের সমালোচক নহেন। দেশবাসীর মধ্যে যে পাপ পুঞ্জীভূত হইয়া বিদেশীর এই শাসনকে সম্ভব করিয়াছে, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য তিনি বার বার বলিয়াছেন ; পরাধীনতার কারণ বাহিরে নাই— তাহা আমাদের মধ্যেই আছে। সাধারণত স্বাধীনতা অর্থে রাজনীতিক স্বাধীনতা বুঝায় ; কিন্তু উহা যে মানবের সর্ববিধ স্বাধীনতা বা মুক্তি বিষয়ে প্রযোজ্য, একথা সহজে স্বীকৃত হয় না। রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসীর জন্য এই সমগ্র স্বাধীনতা চাহেন— কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতায় তিনি তুষ্ট নহেন।

ঢাকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রাদেশিক কনফারেন্স সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-সমালোচনা করিলেন, তাহা আদৌ লোকের প্রীতিপ্রদ হয় নাই। এইসব কনফারেন্সে ডেলিগেট বা প্রতিনিধিদের আদর আপ্যায়ন একটা রাজসূয় যজ্ঞের তুল্য ছিল। দেশের কাজের জন্য সকলে সমবেত হইয়াছেন, অথচ তাঁহাদের আবদার, অভিযোগের অন্ত নাই—এই দৃশ্য রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত পীড়িত করিয়াছিল। “অতিরিক্ত মাত্রায় আদর অভ্যর্থনা উপভোগ করিয়া আমরা বরযাত্রীর মত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছি। গৃহস্বামীর অতিথি হইয়া সর্বদা সহস্র খুঁটিনাটি ধরিয়া সেবকদলকে উত্যক্ত করিয়া তুলিতেছি ; কত অসঙ্গত আদেশপালনে অনুজ্ঞা প্রচার করিয়া ক্ষুদ্র নবাবরূপে প্রতিভাত হইতেছি। ইহাতে দেশের কতটুকু কল্যাণ?” এইসব কনফারেন্স এককালে কি অন্তঃসারশূন্য ছিল, তাহা ইতিহাস পাঠকমাত্রই জানেন। কারণ “আমাদের দেশের সামাজিক ও ধর্মনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের ন্যায় রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডও একটা অন্তঃসারশূন্য বাহ্যাড়ম্বের

দিকে ছুটিয়া চলিতেছে।··আশার কথা 'প্রাদেশিক সমিতি' বিলাতী ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া দেশী সাজে দেশের দ্বারের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। আমাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের যে-সকল পুরোহিত দেশীমন্ত্রে দেশী অনুষ্ঠানবিধিতে অনভ্যস্ত, এ জনসভা হইতে তাঁহাদের দুর্বোধ জল্পনা ক্রমশ নির্বাসিত হইবে এবং দেশের জনসাধারণ মাতৃভূমির নিজের মুখে নিজের ভাষায় আহ্বান পাইয়া এ সভার আপন স্থান অধিকার করিয়া লইতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা ক্রমশ অনিবার্য হইয়া পড়িতেছে।"

রাজদ্বারে আবেদন ছাড়া দেশের স্বচেষ্টা-সাধ্য গুরুতর কর্তব্যও যে পড়িয়া আছে এবং দেশের ধনবৃদ্ধি শিল্পোন্নতির উপর নির্ভর করে, এই কথা এই সম্মিলনে আলোচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন "কেবল রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বারা আমাদের লজ্জা দূর হইবে না। আমরা বিবেচনা করি এই মন্তব্য প্রকাশ ঢাকা প্রাদেশিক সমিতির বিশেষ গৌরবের কারণ।" (ভারতী ১৩০৫, পৃ ২৭৪)।

ঢাকা হইতে কবি শিলাইদহে ফিরিয়াছেন। রাজনৈতিক সমস্যা যে-কবিকে উদ্‌ভ্রান্ত করে, সংসারের দৈনন্দিন সমস্যা ও সংগ্রামের মুখে পড়িতেছেন তিনিই। রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র ভারতীর সম্পাদক ও আদিব্রাহ্মসমাজের সেক্রেটারি নহেন, এমনকি কেবল কবিও নহেন; সংসারের বহু সমস্যার সমাধান তাঁহাকে একলাই করিতে হয়। সেইসব সমস্যার অন্যতম হইতেছে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রশ্ন। রথীন্দ্রনাথের উপনয়নের পর[১] সন্তানদের শিক্ষার কথা কবিকে গভীরভাবে চিন্তা করিতে হইতেছে। কবি নিজ জীবনে শিক্ষাবিষয়ে গতানুগতিকতাকে অনুসরণ করেন নাই; বিদ্যালয়ের প্রকোষ্ঠ মধ্যে বিদ্যালাভের বেদনাময় স্মৃতি তাঁহার খুবই স্পষ্ট ছিল। তাই তিনি সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা গোড়া হইতেই পৃথকভাবে শুরু করিয়াছিলেন। জোড়াসাঁকোর বৃহৎ বাড়িতে বহুগোষ্ঠিসমন্বিত বহু কুটুম্বকুটুম্বিনীপরিবেষ্টিত সংসারে সকলেই গতানুগতিকের পথে চলিতেছিলেন; দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্রেরা, হেমেন্দ্রনাথের পুত্রকন্যারা যথাবিধ স্কুলকলেজে নিজ নিজ সাধ্য ও মেধামতো অধ্যয়ন করেন; রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সন্তানদের জন্য সেপথ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। এ ছাড়া কোনো কোনো ভ্রাতুষ্পুত্রের নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা মহর্ষির পূত জীবনের আদর্শকে পদে পদে ব্যাহত করিতেছিল, কিন্তু তিনি তাহা কোনো প্রকারে সংযত ও শমিত করিতে পারেন নাই। এইখানে যথার্থ আদর্শের সংগ্রাম চলে কবির অন্তরে। এ ছাড়াও এই বৃহৎ পরিবারের মধ্যে একজন কর্ত্রী না থাকাতে সংসারে বধূদের মধ্যে যে মনোমালিন্য হইবে, তাহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই; বিরোধের বিষয় ক্ষুদ্র হইলেও বালুকণার ন্যায় চোখে পড়িলে উহাই জগতকে অন্ধকার করিয়া তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট।

ঢাকা হইতে ফিরিয়া মৃণালিনী দেবীর নিকট হইতে যে পত্র পাইলেন, তাহা হইতে বুঝিলেন সাংসারিক গোলমালে তিনি অত্যন্ত অশান্তি ভোগ করিতেছেন; কবি তদুত্তরে তাঁহাকে যে পত্র লেখেন তাহাতে কবিজীবনের আর একটি দিক উদ্‌ভাসিত হইয়াছে; দাম্পত্য জীবনে তিনি কী চাহিতেছেন, তাহারই আদর্শ ঐ পত্রে বিবৃত হইয়াছে।[২] এই পত্রের শেষে তিনি স্ত্রীপুত্রকে কলিকাতা হইতে শিলাইদহে লইয়া যাইবার সংকল্প প্রথম প্রকাশ করেন; "আমি কলকাতার স্বার্থদেবতার পাষাণমন্দির থেকে তোমাদের দূরে নিভৃত পল্লীগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসতে এত উৎসুক হয়েছি।" ইহারই কয়েকমাস পরে তিনি তাঁহার পরিবার শিলাইদহে আনিলেন ও তথায় গৃহবিদ্যালয়ের পত্তন করিলেন; যথাস্থানে তাহার আলোচনায় আমরা ফিরিয়া আসিব।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে শেষজীবনে দেখিয়াছেন, বা যাঁহারা তাঁহার জীবনের শেষার্ধের রচনাদির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, তাঁহারা কবিকে

১ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন। বিশ্বভারতী পত্রিকা। ১০৪৯ অগ্র। পৃ ২৬৪।

২ দ্র চিঠিপত্র ১ম খণ্ড ১৬ নং পত্র

সর্বধর্ম সর্বসমাজ সর্বদেশকাল অতীত বাণীর প্রচারক বলিয়া জানিবেন। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে তিনি সামাজিক ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে পৈত্রিক পথের অনুবর্তক। তাঁহাদের পরিবারের সকলকেই সামাজিক ব্যাপারে আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানপদ্ধতির অনুশাসন মানিতে হইত। আদি ব্রাহ্মসমাজে পৌত্তলিক অনুষ্ঠান ব্যতীত হিন্দুসমাজের বর্ণভেদাদি স্বীকৃত হইত, উপনয়নাদি যথাবিহিত অনুষ্ঠিত হইত; বিবাহাদি সবর্ণের মধ্যে নিষ্পন্ন না হইলে তাহা অসিদ্ধ হইত। পৌরোহিত্যে ব্রাহ্মণেতর বর্ণের অধিকার ছিল না। তবে সমস্ত অনুষ্ঠান অপৌত্তলিকভাবে সম্পন্ন হইত। রবীন্দ্রনাথ যে এসব অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণ করিতেন তাহার কোনো ব্যবহারিক প্রমাণ আমরা পাই না। তাঁহার সে-যুগের বহু রচনার মধ্যে হিন্দুসমাজের বহু লোকাচার, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বাদির সমর্থন পাই, এমন কি আচারিক শৈথিল্যকে সামাজিক অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করিতে দেখি।

ঢাকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কবি একাই নৌকাযোগে উত্তরবঙ্গে ঘুরিতেছেন। নাগর নদীতে আত্রাই-এর পথে লিখিলেন 'মাতার আহ্বান' ও সেইদিনেই 'হতভাগ্যের গান'টির পরিবর্ধন সাধন করেন (৭ আষাঢ় ১৩০৫)। আমাদের মনে হয় 'আশা' 'বঙ্গলক্ষ্মী' ও 'শরৎ' কবিতা কয়েকটিও এই সময়ের বা এই কাছাকাছি সময়ের রচনা, সমস্তগুলির মধ্যে একটি ভাবসংগতি আছে। দেশমাতৃকার নূতন রূপ কবির লেখনীতে মূর্তি লইতেছে; তাহারই একটি কল্যাণ-সুন্দর মূর্তি গড়িয়া কবি দেশবাসীর সম্মুখে স্থাপন করিবার উদ্‌যোগ করিলেন—অচিরেই জাতীয় জীবনের পূজাবেদিতে সম্পূর্ণ একটি নূতন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

সম্পাদক হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে যেসব গদ্য, রাজনৈতিক প্রবন্ধ বা সাময়িক প্রসঙ্গ লিখিতে হইয়াছিল, তাহা দেশের ইতিহাসের পট পরিবর্তনের সঙ্গে নিরর্থক হইয়া যাইবে, তাহার পটভূমি ভবিষ্যৎ বংশধরগণ জানিবে না, রচনার ইতিহাস কেহ যুগে যুগে স্মরণ করিয়াও রাখিবে না। তবে সেই ভাবী কালকে গড়িবার জন্য যেসব মানসিক উপাদানের প্রয়োজন, তাহার আয়োজন হয় এই কালেই; রবীন্দ্রনাথ যদি কেবলমাত্র সাহিত্যস্রষ্টা, কবি, ঔপন্যাসিক হইতেন তবে বাঙালীর জাতীয় জীবন গঠনের ইতিহাসে তাঁহার স্থান থাকিত না, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আর পাঁচজন প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের সহিত তাঁহার নাম পাওয়া যাইত। দেশের মঙ্গলামঙ্গল তাঁহার জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিল বলিয়া তিনি সাহিত্যিক তুরীয়তার মধ্যে অচল হইয়া থাকিতে পারেন নাই, প্রিয় অপ্রিয় কথা অযাচিতভাবে বলিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বাংলাদেশে ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রাজনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়াছিল। তাহাকে ব্যর্থ করিবার বিবিধ প্রকাশ্য ও গোপন চেষ্টা যে গবর্মেণ্ট করিতেছিলেন, জাতীয় ইতিহাসের পাঠকের তাহা অবিদিত নহে। 'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথ এ-সম্বন্ধে যেসব প্রবন্ধ লেখেন তাহার কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। ১৩০৫ পৌষ মাসে লর্ড কর্জন বড়লাট হইয়া আসিবার পর হইতে বাংলার জাতীয়তাকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য বিধিবদ্ধ চেষ্টা শুরু হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে বঙ্গচ্ছেদ হইল। কিন্তু ইহা একটা রাজনৈতিক ব্যাপার। কিন্তু কর্জনের আগমনে পূর্ব হইতে ইহা অপেক্ষা গভীরভাবে আঘাত করিবার প্রস্তাব হয় ভাষাবিচ্ছেদের দ্বারা। ইংরেজ শাসনের ফলে যে-একটা ঐক্যসূত্রে ভারতের বিভিন্ন অংশ গ্রথিত হইয়াছে, সে সত্য রবীন্দ্রনাথ কখনো অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু এই ঐক্যসূত্র কখনো যাহাতে রজ্জুতে পরিণত না হয় সে-বিষয়ে সরকার চিরদিনই হুশিয়ার। কন্‌গ্রেস হইতে কেমনভাবে মুসলমান সমাজকে পৃথক করিয়া লইয়া গিয়া একটি প্রতিরোধক স্রোত তৈয়ারী করিতে গভর্মেণ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া যে যোগ তাহা সংস্কৃতিমূলক; তাই তাহার ভিত্তি দৃঢ়। সুতরাং সেই দৃঢ় ভিত্তির মূলে কুঠারাঘাত করা রাজনৈতিক বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা। একসময়ে উড়িষ্যা ও আসামে বাংলাভাষাই শিক্ষিত সমাজের ভাষা ছিল। কিন্তু বাংলাকে আসাম ও উড়িষ্যা হইতে যথাসম্ভব নির্বাসিত করিয়া সরকার বাহাদুর স্থানীয় ভাষাগুলিকে কৃত্রিম উত্তেজনায় পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে প্রবৃত্ত

হইয়াছিলেন। (ভারতী, ১৩০৫ শ্রাবণ পৃ ৩০৩)। রবীন্দ্রনাথের শ্যেন দৃষ্টি গবর্ণমেণ্টের এই কূটনীতির উপর যথাসময়ে পতিত হইয়াছিল।

একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বহু উদাহরণ দ্বারা দেখাইলেন যে ওড়িয়া ভাষার সহিত ভদ্র বাংলাভাষার পার্থক্য সামান্য; কৃত্রিম উপায়ে এই ভাষার বিচ্ছেদকে স্থায়ী করাই সরকারের উদ্দেশ্য। "উড়িষ্যা ও আসামে বাংলাশিক্ষা যেরূপ সবেগে ব্যাপ্ত হইতেছিল, বাধা না পাইলে বাংলার এই দুই উপবিভাগ ভাষার সামান্য অন্তরালটুকু ভাঙ্গিয়া একদিন গৃহবর্তী হইতে পারিত।" রবীন্দ্রনাথ বাংলার প্রান্তবাসী এই দুই ভাষাকে উপভাষা বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য উক্ত প্রবন্ধের উপসংহারে লিখিলেন, "যে ভাষা ভ্রাতাদের মধ্যে ভাবপ্রবাহ সঞ্চারের জন্য হওয়া উচিত তাহাকেই প্রাদেশিক অভিমান ও বৈদেশিক উত্তেজনায়, পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীরস্বরূপ দৃঢ় ও উচ্চ করিয়া তুলিবার যে চেষ্টা — তাহাকে স্বদেশ-হিতৈষিতার লক্ষণ বলা যায় না এবং তাহা সর্বতোভাবে অশুভকর।" (ভারতী, ১৩০৫ পৃ ৩০৮)।

আসামী ও ওড়িয়া ভাষা পৃথক করিবার আরও কয়েক বৎসর পর বাংলার ভাষাকে চারিটি উপভাষায় বিভক্ত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল— সে কথা যথাস্থানে আলোচিত হইবে। প্রাদেশিক ভাষাগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য কতদূর ঐতিহাসিক তাহা আমাদের বিচারের বিষয় নহে; তবে তিনি সরকারের এইসব প্রয়াসের মধ্যে যে ভেদনীতির প্রকোপ দেখিতেছিলেন, তাহাই নিঃসংকোচে প্রকাশ করিলেন। এই সময় হইতে সরকারী মহলে বাংলা বিভাগের জল্পনা কল্পনা শুরু হয়।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বাঙালীর ও বিশেষভাবে বাঙালী-হিন্দুর সংস্কৃতিগত ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্য গোপনে যখন নানারূপ সায়ক প্রস্তুতে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে হিন্দুদের মধ্যে উদ্‌বুদ্ধ আত্মবিশ্বাস, আত্মসম্মান ও আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হইল। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিলে (১৩০৩ ইং ১৮৯৬) বাংলাদেশের হিন্দুসমাজের মধ্যে একটি নূতন প্রাণের সাড়া পড়িয়া যায়। হিন্দুগণ বিশেষ একটি জাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে কিনা তাহা লইয়া তর্ক উঠিয়াছিল; মারাঠাদেশে টিলক যে হিন্দু-আত্মবোধ জাগ্রত করিয়াছিলেন, তাহাই স্বামীজির অভ্যুত্থানে বাংলাদেশে নূতন ভাবে প্রাণ পাইল। হিন্দুসমাজের এই নূতন চেতনাসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এক সুচিন্তিত মন্তব্য আমরা এই সময়ে পাই। রবীন্দ্রনাথের মতে জগতে হিন্দুজাতি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। "ইহাকে বিশেষ জাতিরূপে গণ্য করা যায় এবং যায়ও না। জাতীয়ত্বের সঙ্কীর্ণতা ইহার মধ্যে আছে অথচ জাতীয়ত্বের বল ইহার মধ্যে নাই। ইহা এক অথচ অনেক ইহা বিপুল অথচ দুর্বল। ইহার বন্ধন যেমন কঠিন তেমনি শিথিল, ইহার সীমা যেমন দৃঢ়, তেমনি অনির্দিষ্ট।"

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে আর্য ও অনার্য সভ্যতার মিলনে কিভাবে এই হিন্দুসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। যে কথা বহু বৎসর পরে 'ভারতে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার পূর্বাভাস পাই এই প্রবন্ধে। তিনি বলিয়াছিলেন যে আর্য অনার্যের বাহ্যিক যুদ্ধ যদিও বহুকাল শেষ হইয়াছে, তথাচ "তাহা পরিব্যাপ্ত হইয়া সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করিয়াছে। তাহার এক কারণ আমাদের পরস্পরের মধ্যে বৈসাদৃশ্য এত অধিক যে প্রকৃতির অনিবার্য নিয়মে যখন আমরা মিলিতেছিলাম তখনো শেষ পর্যন্ত আমাদের স্বাতন্ত্র্য-চেষ্টার বিরাম ছিল না। আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ কেহই সম্পূর্ণ হার মানিতে চাহে নাই।"

এইকারণে বহু সংখ্যক আর্য অনার্য এবং সংকর জাতি হিন্দুত্ব নামক এক অপরূপ ঐক্যলাভ করিয়াছে; তথাপি তাহারা বল পায় নাই। হিন্দুসমাজ যেমন এক তেমনি বিচ্ছিন্ন। এই দুর্বলতার কারণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে, "আমরা অভিভূত ভাবে এক, আমরা সচেষ্টভাবে এক নহি।" তাঁহার মতে রাষ্ট্রতন্ত্রীয়ভাবে একতা আমাদের

ছিল না। "আমরা চিরদিন খণ্ড খণ্ড দেশে খণ্ড খণ্ড সমাজে সঙ্কীর্ণ, প্রাদেশিকতা দ্বারা বিভক্ত। আমাদের স্থানীয় আচার, স্থানীয় বিধি, স্থানীয় দেবদেবীগণ বাহিরের আক্রমণ ও সংশোধন হইতে নিরাপদভাবে সুরক্ষিত হইয়া একদিকে ক্ষুদ্র, অসঙ্গত, অন্যদিকে প্রবল পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছে। ... আমরা প্রাদেশিক, আমরা পল্লীবাসী, ; বৃহৎ দেশ ও বৃহৎ সমাজের উপযোগী মতের উদারতা, প্রথার যুক্তিসঙ্গতি এবং সাধারণ স্বার্থরক্ষার উদ্যোগপরতা আমাদের মধ্যে নাই। এক কথায় বৃহৎ ক্ষেত্রে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার যে সফলতা তাহা আমরা লাভ করিতে পারি নাই।"

ভারতবর্ষের এই সমস্যা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট সজাগ ; তাই বলিতেছেন, "আমাদের সংস্কার ও শিক্ষা এত দীর্ঘকালের, তাহা আমাদিগকে এমন জটিল, বিচিত্র ও সুদৃঢ়ভাবে জড়িত করিয়া রাখিয়াছে যে, বৃহৎ জাতিকে চিরকালের মতো তাহার বাহিরে লইয়া যাওয়া কাহারও সাধ্যায়ত্ব নহে। সেই চিরোচ্ছিন্ন ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির মধ্য হইতেই আমাদের অভ্যুত্থানের উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে। ... অতএব একদিকে আমাদের দেশীয়তা, অপরদিকে আমাদের বন্ধনমুক্তি উভয়ই আমাদের পরিত্রাণের পক্ষে অত্যাবশ্যক। সাহেবি অনুকরণ আমাদের পক্ষে নিষ্ফল এবং হিঁদুয়ানির গোঁড়ামি আমাদের পক্ষে মৃত্যু।" (ভারতী ১৩০৫ ; পৃ ৩৫৮-৩৬১)

শেষের কথাটি আরও পরিষ্কার করিয়া লেখেন 'কোট ও চাপকান' প্রবন্ধে (ভারতী, ১৩০৫ আশ্বিন)। দেশীয়তা দেশীয়ভাবকে রক্ষা করা ঠাকুর পরিবারের বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথ এ-পর্যন্ত নানাভাবে দেশীয় শিল্প আচার অনুষ্ঠান, পোশাক পরিচ্ছদকে একটি বিশেষ দেশীয় রূপ দান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সাহেবিয়ানার অনুকরণ তাঁহাদের পরিবারের প্রকৃত বিরুদ্ধ, ও উদগ্র জাতীয়তা বা হিঁদুয়ানি তাঁহাদের ধর্মসাধনার পরপন্থী। পাঠকগণের কাছে রবীন্দ্রনাথ লিখিত 'নকলের নাকাল' প্রবন্ধ সুপরিচিত (বঙ্গদর্শন ১৩০৮, জ্যৈষ্ঠ। সমাজ দ্রষ্টব্য)। 'কে তুমি ফিরিছ পরি প্রভুদের সাজ'— এই কবিতাটিও এই সঙ্গে স্মরণীয়। ১৯১২ অব্দে যখন বিলাত যাইতেছেন তখনো আলোয়ার মহারাজের পোশাকের প্রশংসা করিয়া পত্র লেখেন (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৩১৯ শ্রাবণ)। এই পরিচ্ছদের দেশীয়তা কবির মতে আত্মশক্তি ও আত্মসম্মানের অন্যতম পরিচায়ক। কিন্তু এই দেশাত্মবোধ যে কেবল পরিচ্ছদের দেশীয়তায় পর্যবসিত তাহা নহে ; আচার ব্যবহারে এবং জীবনের প্রতি একটা দৃষ্টিতে এই দেশীয়তা দেখিতে পাই।

এই দেশীয়তার বোধ হইতে বাংলার জমিদারগণের আদর্শ কী সে-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে 'মুখুয্যে বনাম বাঁড়ুয্যে' (ভারতী, ১৩০৫, ভাদ্র) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। 'মুখুয্যে' হইতেছেন রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়,[১] আর বাঁড়ুয্যে হইতেছেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কন্‌গ্রেস বা জাতীয়তাবাদীদের নেতা। রাজা প্যারীমোহন কোনো এক পত্রিকায় কন্‌গ্রেসপক্ষীয়দের প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশপূর্বক লিখিয়াছিলেন যে দেশের যাঁহারা 'ন্যাচারাল লীডার' বা স্বাভাবিক নেতা বা প্রকৃত মোড়ল, নানা অস্বাভাবিক কারণে ক্ষমতা তাহাদের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছে। রাজা সাহেবের এই আক্ষেপ উক্তি লইয়া রবীন্দ্রনাথ জমিদার সম্প্রদায় যে দেশের প্রকৃত নেতৃস্থানীয় নহেন, তাহাই প্রমাণ করেন।

রবীন্দ্রনাথ দেখান যে ইংলণ্ডের জমিদারশ্রেণী বা অ্যারিস্টক্রেসীর সহিত, বাংলাদেশের জমিদারদের তুলনা হয় না, কারণ ইহাদের অধিকাংশের ইতিহাস শতাধিক বৎসর যায় না। ইংলণ্ডের 'অভিজাত' শ্রেণী বাংলায় অজ্ঞাত ; বাংলার সুপরিচিত হইতেছে 'কুলীন'। কিন্তু 'কুলীনে'র সম্মান বা আভিজাত্য অর্থ দিয়া হয় নাই। তা ছাড়া

১ প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়ার রাজা জয়কৃষ্ণ মুখুজ্জের (১৮০৮-১৮৮৮) পুত্র। প্যারীমোহনের জন্ম হয় ১৮৪০ সালে ; ১৮৬৪-এ এম. এ. ও ১৮৬৫-এ বি. এল. পাশ করেন। ১৮৭৯-এ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার মনোনীত সদস্য ; ১৮৮৪, ১৮৮৬ সালে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। ১৮৮৭ সালে তিনি 'রাজা' উপাধি পান।

আমাদের দেশে ধনগৌরবের উপর সমাজ-মর্যাদা নির্ভর করে না। ধনী জমিদারদের অতি নির্ধন মূর্খ আত্মীয় হয়, তাহার মাপকাটি কুল, অর্থ নহে। সুতরাং যাহাকে 'লীডারশীপ' বলে তাহা অর্থের দ্বারে এখনো উপনীত হয় নাই।

যাঁহাদের হাতে ধন আছে তাঁহারা যে ইচ্ছা করিলে প্রজাসাধারণের আনুগত্য আকর্ষণ করিতে পারেন—এ কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জমিদার ভ্রাতাগণকে স্মরণ করাইয়া দিলেন।

"সেকালের ধনী জমিদারগণ নবাব সরকারে প্রতিপত্তি ও পদবীলাভের জন্য চেষ্টা করিতেন কি না তাহা আমরা ভালরূপ জানি না। তখন নবাব দরবারের প্রসন্নতা হইতে কেবল শূন্যগর্ভ খেতাব ফলিত না, তখন সম্মানের মধ্যে সৌভাগ্য এবং রাজপদের মধ্যে সম্পদ পূর্ণ থাকিত, অতএব তাহা লাভের জন্য অনেকেই চেষ্টা করিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তখনকার যাহা সাধারণ হিতকার্য—অর্থাৎ দীঘিখনন, মন্দির স্থাপন, বাঁধনির্মাণ, এই সকলকেই তাঁহারা যথার্থ কীর্তি বলিয়া জ্ঞান করিতেন, খেতাবলাভ নহে। দশের নিকট ধন্য হইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের প্রবল ছিল। তখন এই সকল কার্য রাজসম্মানের মূল্যস্বরূপ ছিল না, ইহাতে সাধারণের সম্মান আকর্ষণ করিত। সেই সাধারণের সম্মানের প্রতি তাঁহাদের উপেক্ষা ছিল না।"

কিন্তু বর্তমানের জমিদারগণ "নিজ গৌরবেও উচ্চ নহেন, সর্বসাধারণের সহিত ঐক্যদ্বারাও বৃহৎ বলিষ্ঠ নহেন। ইঁহারা বিলাতের লর্ডদের ন্যায় স্বতন্ত্র নহেন, বিলাতের জননায়কদের ন্যায়ও প্রবল নহেন; ইঁহারা কুষ্মাণ্ড লতার ন্যায় একমাত্র গবর্মেণ্টের আশ্রয়যষ্টি বাহিয়া উন্নতির পথে চড়িতে চাহেন, ভুলিয়া যান যে সেই রাজদণ্ডবাহী উচ্চতা অপেক্ষা গুল্মসমাজের খর্বতা শ্রেয় এবং তৃণসমাজের নম্রতা শোভন।"

কেবল তীব্র সমালোচনা করিয়া তিনি প্রবন্ধ শেষ করেন নাই, কিভাবে জমিদারগণ দেশের ও দশের শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারেন সে-কথা বলিলেন; "এদেশে পূর্বকালে জমিদার সম্প্রদায়ের যে গৌরব ছিল তাহা খেতাব অবলম্বনে ছিল না, তাহা দান, অর্চনা, কীর্তিস্থাপন, আর্তগণের আর্তিচ্ছেদ, দেশের শিল্প সাহিত্যের পালন পোষণের উপর নির্ভর করিত। সেই মহৎ গৌরব এখনকার জমিদারগণ প্রতিদিন হারাইতেছে।" (ভারতী, ১৩০৫, পৃ ৪৩১)।

রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের মনোভাব যে কেবল এই 'মুখুয্যে বনাম বাঁড়ুয্যে' প্রবন্ধে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নহে, 'রাজটীকা' (ভারতী ১৩০৪, আশ্বিন) নামে গল্পেও তাহা হাস্যকর প্রহসনের মধ্যে শেষ হইয়াছে। এই দুইটি প্রবন্ধ ও গল্প লিখিবার কারণ হইতেছে তখন বাংলাদেশের বড়লোকদের মধ্যে স্যর আলফেড ক্রফট-এর প্রস্তরমূর্তি নির্মাণ করিবার জন্য চাঁদা উঠিতেছিল। এই বিসদৃশ ব্যাপারে অর্থ সংগ্রহে দেশীয় অভিজাত শ্রেণীর উৎসাহ দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের মন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল।[১]

পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধপাঠে পাঠকদের সহজেই মনে হইতে পারে রবীন্দ্রনাথ বাংলার জমিদারদের নেতৃত্বকে অস্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং বাংলার স্বাভাবিক নেতা হইতেছেন— রাজনৈতিক বক্তা ও নেতারা। তিনি জমিদারগণের নেতা হইবার দাবিকে ধূলিসাৎ করিয়াছিলেন বলিয়াই যে অপর পক্ষের নেতৃত্বের দাবিকে সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিলেন,

১ In February, 1897 Sir Alfred Cropt K. C. I. E who had been connected with the Education department of Bengal for more than 31 years and had been Director of Public Instruction for nearly 20 years, left India. (Buckland, Bengal under the Lieutenant Governors II, p 899)

কবি কি তাই লিখিয়াছিলেন 'উন্নতি লক্ষণ' কবিতায়,—"সিংহ-দুয়ারে পথের দু'ধারে পথের না দেখি অন্ত, কার সম্মানে ভিড়েছে এখানে যত উষ্ণীষবন্ত?... রাজা মহারাজ মিলেছেন আজ কাহারে করিতে ধন্য? বসেছেন এঁরা পূজ্যজনেরা কাহার পূজার জন্য?... গেল যে সাহেব ভরি দুই জেব, করিয়া উদর পূর্তি; এঁরা বড়লোক করিবেন শোক স্থাপিয়া তাঁহার মূর্তি।" ভারতী ১৩০৬ অগ্রহায়ণ।

তাহা নহে। তিনি লিখিলেন, "জমিদারগণ দেশের জন্য যাহা করেন তাহা গবর্মেণ্টের মুখ তাকাইয়া, ইঁহারা যাহা করেন তাহাও ইংরেজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া। তাহার ভাষা ইংরেজি, তাহার প্রণালী ইংরেজি, তাহার প্রচার ইংরেজিতে।" (ভারতী, ১৩০৫, পৃ ৪৪৬)। আমরা দেশের হিত করিব, কিন্তু দেশকে স্পর্শ করিব না, ইহা হইতে পারে না। দেশকে কেমনভাবে স্পর্শ করা যায় তাহার খুব সহজ উত্তর রবীন্দ্রনাথ দিয়াছিলেন; সে-কথা আজ অতি সামান্য ও সাধারণ বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু তখন উহা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলিয়াই রাজনীতিকদের মনে হইত। তিনি বলিয়াছিলেন, "দেশের ভাষা বলিয়া দেশের বস্ত্র পরিয়া।[১] ইংরেজের প্রবল আদর্শ যদি মাতার ভাষা এবং ভ্রাতার বস্ত্র হইতে আমাদিগকে দূরে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া যায় তবে জননায়কের পদ গ্রহণ করিতে যাওয়া নিতান্তই অসঙ্গত।"

রবীন্দ্রনাথ এক প্রবন্ধে জমিদারগণকে ও অপর প্রবন্ধে জননায়কগণকে আক্রমণ করিলেন—সুতরাং কাহাকেও খুশি করা দূরে থাক্ উভয় পক্ষকে অসন্তুষ্টই করিলেন। তাঁহার কাছে যাহা অযৌক্তেয়, যাহা সমগ্র কল্যাণ হইতে বিচ্যুত তাহা অশ্রদ্ধেয়। অসত্যের হইতে সন্ধি করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং যাঁহারা দেশের সমগ্র কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া কেবল স্থানিক অভাব অভিযোগকেই একান্ত বিবেচনা করিয়া চলেন, তাঁহাদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের এই কঠোর সমালোচনা যথার্থই অপ্রিয় সত্যের ন্যায় অসহ্য হয়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জমিদারদের ও শিক্ষিতশ্রেণীর নেতৃত্বের দাবির উপযুক্ততা সম্বন্ধে তিনি যে কেবল লিখিয়াছিলেন তাহা নহে, ধর্মসম্বন্ধে এক শ্রেণীর লোকের একাধিপত্যের দাবিকেও তিনি অস্বীকার করিলেন অপর একটি প্রবন্ধে। ধর্মসম্বন্ধে অযৌক্তিক অন্ধনিষ্ঠাও যে জাতীয় জীবনগঠনের অন্তরায় এ কথাও তিনি বলিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। হিন্দুত্বের নামে অন্ধমূঢ়তাকে সমর্থনও জাতীয়তার অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল। এই মনোভাবকে নীরবে বিনা প্রতিবাদে সহ্য করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অসম্ভব।

কিছুকাল হইতে বাংলাদেশের হিন্দুসমাজের শিক্ষিতদের মধ্যে যে নূতন প্রাণশক্তি আসিয়াছিল তাহা স্বামী বিবেকানন্দের সমন্বয়বাদের প্রচারের ফলে বিশেষভাবে বললাভ করে। শিক্ষিত বাঙালী পরমহংসদেবের ভক্তিবাদ ও মূর্তিপূজায় নূতনভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল; ব্রাহ্মসমাজের নিরাকার উপাসনাকে মানবের বিচিত্র সাধনপন্থার অন্যতম বলিয়া স্বীকার করিতেও তাঁহারা অনিচ্ছুক। যতীন্দ্রমোহন সিংহ তাঁহার এক গ্রন্থে বলিলেন যে নিরাকার উপাসনা হইতেই পারে না; হয় সোহংব্রহ্ম হইয়া যাও, নয় মূর্তিপূজা করো। তিনি কালাপাহাড়ের ঠিক বিপরীত মুখে সংহারকার্য শুরু করিয়াছিলেন; মূর্তিপূজাকে কেবল যে তিনি রক্ষা করিতে চান তাহা নহে, অমূর্তপূজাকে তর্কের দ্বারা ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করেন।

রবীন্দ্রনাথ এই মতের দীর্ঘ সমালোচনা লিখিয়া ব্রাহ্মসমাজের নিরাকার উপাসনাপদ্ধতি সমর্থন করেন; প্রবন্ধটি তাঁহার গদ্যগ্রন্থাবলীর অন্তর্গত 'আধুনিক সাহিত্যে' আছে।

এই বৎসরের 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক প্রবন্ধ, প্রসঙ্গকথা ও পুস্তকসমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার সকলগুলির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে। রাজনৈতিক প্রবন্ধ ব্যতীত গল্প, সাহিত্য ও ব্যাকরণবিষয়ক বহু প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল। বিচিত্র রচনার অবসরের মধ্যে ভাষাতত্ত্ব-

১ যাহা বাক্যে বলিতেছেন, জীবনেও তাহা রূপায়িত করিবার প্রয়াস চলিতেছে। একখানি ক্ষুদ্র পত্র হইতে তাহারই আভাস পাই। রাজসাহী "শিল্পবিদ্যালয়কে উৎসাহ দিবার জন্য সেখান হইতে আমি সর্বদাই রেশমের বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া থাকি।... বন্ধুদের নিকট আমার এই উপহার কেবল আমার উপহার নহে, তাহা স্বদেশের উপহার।" ত্রিপুরার মহারাজার জন্য একটি সাদা রেশমের থান পাঠাইয়াছিলেন। দ্র পূর্বাশা ১৩৪৮।

আলোচনা তাঁহার শ্রান্তি-অপনোদনের অন্যতম সঙ্গী। ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার আনন্দ দেখিতে পাই; ঘণ্টার পর ঘণ্টা সুনীতি বাবু, বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত তিনি আলোচনায় মগ্ন আছেন দেখিয়াছি।

সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'গ্রাম্য সাহিত্য' সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা। বহু বৎসর বাংলাদেশের গ্রামের মধ্যে বাস করিবার ফলে বাংলার নারীকে সমগ্রভাবে দেখিবার সুযোগ এবং বাংলার মানুষের মনের সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন। বাংলার চাষি, মাঝিমাল্লা, গৃহস্থ প্রজা, নায়েব গোমস্তা প্রভৃতি কর্মচারী, এবং দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে মিলিবার যে অসাধারণ সুযোগ তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা খুব কম কবির ভাগ্যে ঘটে। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির দ্বারা যাহা তিনি লেখেন, অসাধারণ কল্পনাশক্তির বলে তাহাকে অপরূপ করিয়া তুলিবার অসামান্যশক্তিও তিনি রাখেন। ইহার উপর সহানুভূতি ও অনুকম্পার দ্বারা যে রচনা সৃষ্টি হয় সাহিত্যে তাহা অপরূপ। গ্রামের সহিত এই নিবিড় পরিচয়ের ফলে কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি 'সাধনা'য় 'মেয়েলি ব্রতকথা' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন, 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা'য় 'ছড়া' সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন; এবারও লোকসাহিত্য বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করিলেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্য আলোচনার দীক্ষাগুরু।

গ্রন্থ-সমালোচনা এই বৎসরের রচনাবলীর আর একটি বিশেষত্ব। বৎসরের গোড়ায় দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র এক মনোজ্ঞ সমালোচনা প্রকাশিত হয় (ভারতী ১৩০৫, বৈশাখ)। দীনেশচন্দ্রের শ্রম ও নিষ্ঠার ফলে তিনি যে অমর গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথ খুবই আনন্দ প্রকাশ করিয়া উহাকে গ্রহণ করেন। ১৩০২ (১৮৯৬) সালে যখন দীনেশবাবুর এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন তিনি কুমিল্লায়; রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বিশেষ সমাদর জানাইয়া যে পত্র দেন তাহার মূল্য দীনেশবাবু স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "তাহা একটি গৌরবের জিনিস বলিয়া আমি অনেক দিন রাখিয়া দিয়াছিলাম। ছোট একখানি কাগজ দোভাঁজ করিয়া মুক্তার মতো হরফে কবিবর লিখিয়াছিলেন, সেই প্রত্যেকটি হরফ আমার নিকট মুক্তার মতো মূল্যবান বলিয়া মনে হইয়াছিল। বঙ্গসাহিত্যের রাজার অভিনন্দন সেই রাজ্যে নূতন প্রবেশার্থীর পক্ষে কত আদর সম্মানের, তাহা সহজেই অনুমেয়।"[১] দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থ বাঙালীর আত্মপ্রকাশের অন্যতম প্রয়াস।

সাহিত্যেও যেমন ইতিহাসের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশে তেমনি আত্মপ্রকাশের চেষ্টা চলিতেছিল। ইহার সূত্রপাত করেন পরলোকগত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রস্তাবে তিনি 'ঐতিহাসিক চিত্র' প্রকাশ করেন। এই সময়ে তাঁহার অমর গ্রন্থ 'সিরাজদ্দৌলা' বাহির হয়। বাংলাভাষায় বাঙালীর ঐতিহাসিক গবেষণা— যে গবেষণা তাহার জাতীয় আত্মকর্তৃত্বের সহায়তা করিয়াছে— তাহার সূত্রপাত এইখানে। রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের এই গ্রন্থকে বিস্তৃতভাবে সমালোচনা করিয়া বঙ্গসমাজে সুপরিচিত করেন। (ভারতী ১৩০৫ জ্যৈষ্ঠ)

পাঠকের স্মরণ আছে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আর্যগাথা' নামক গান ও কবিতার বই বাহির হইলে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকায় তাহার সমালোচনা করিয়া বাংলার পাঠকমণ্ডলীর কাছে উহাকে সুপরিচিত করেন। তাঁহার 'আষাঢ়ে' নামক হাস্যোদ্দীপক কাব্যগ্রন্থ এই বৎসর অ-নামে প্রকাশিত হইলেও রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'তে (১৩০৫ অগ্রহায়ণ; দ্র আধুনিক সাহিত্য) ইহার দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করেন। সমালোচনায় ভালোমন্দ উভয়ই ছিল, তবে প্রশংসা ও বিচারই অধিক। রবীন্দ্রনাথের লেখনী হইতে নির্গত সমালোচনা দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক যশলাভের সহায়তা করিয়াছিল, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নাই।

১ দীনেশচন্দ্র সেন, ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য পৃ ৩৪৩। † বঙ্গভাষার লেখক, পৃ ১৪৬। ১৩০৯ শ্রাবণ বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথ দীনেশবাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আর এক সমালোচনা করেন। উহা 'সাহিত্য' গ্রন্থে আছে। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে ১৩০৫ এর সমালোচনাও আছে।

তবে বিশুদ্ধ সাহিত্যসৃষ্টির দিক হইতে বৎসরটি একেবারে ব্যর্থ যায় নাই; ভারতীর পাঠকদের জন্য সাতটি ছোটোগল্প লিখিতে হয়— একবৎসরে সাতটি গল্প লেখেন।[১] 'দুরাশা' রবীন্দ্রনাথের গল্পধারার তৃতীয় যুগের প্রথম গল্প। এত বড়ো ট্রাজেডি তাঁহার ছোটোগল্পের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। ঘটনার দিক হইতে ইহার সমাবেশ যেমন সম্পূর্ণ, অনুভূতির দিক হইতে ইহার তীব্রতা তেমনি অপরূপ। যে ব্রাহ্মণের সদাচারদীপ্ত নৈষ্ঠিকতা মুসলমানী কুমারীর তরুণ হৃদয়কে একদা হরণ করিয়াছিল, তাহা কেশরলালের সত্যধর্ম ছিল না— তাহা ছিল তাহার সংস্কারগত অর্জিত আচারধর্ম। তাই সে বহিরাবাসের ন্যায় আচারধর্মকে ত্যাগ করিয়া সহজেই ভুটানী-স্ত্রী ও ভুট্টাখেতে আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু নারী তাহার সর্বস্ব দান করিয়া আজ রিক্তা। নবাব কুমারীর খেদোক্তিতে গল্পের শেষকথা বলা হইয়াছে—"হায় ব্রাহ্মণ, তুমি তো তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্তে আর-এক অভ্যাস লাভ করিয়াছ, আমি আমার এক যৌবন এক জীবনের পরিবর্তে আর এক জীবন যৌবন কোথায় ফিরিয়া পাইব।" ভারতী যুগের এই গল্পটিকে কবির অন্যতম উৎকৃষ্ট রচনা বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।

ভারতীর চৈত্রসংখ্যা প্রকাশ করিয়া কবি ভারতীর সম্পাদকত্ব হইতে অব্যাহতি গ্রহণ করিলেন। একই কর্মের মধ্যে বহুকাল নিমগ্ন থাকা কবির ধর্ম নহে। পত্রিকা পরিচালনার ক্লান্তি,— তাহার উপর ছিল ঠাকুর কোম্পানির ব্যবসায়ের গ্লানি, উভয়ই বোঝাস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। বর্ষশেষের দিন জীর্ণ বৎসরের দিকে তাকাইয়া, কবির মনে বিচিত্র চিন্তার উদয় হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন, "এই ঝড়ে আমার কাছে রুদ্রের আহ্বান এসেছিল, যা-কিছু পুরাতন ও জীর্ণ তার আসক্তি ত্যাগ করতে হবে— ঝড় এসে··· সেই ডাক দিয়ে গেল।" এইজন্যই 'বর্ষশেষ' কবিতায় বলিয়াছিলেন, 'শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি', 'শরমের ডালি', বহন করিতে মন বিদ্রোহী। অভ্যস্ত কর্মে দিন যায়, চিত্ত প্রসন্ন হয় না। "যে-আশ্রম জীর্ণ হয়ে যায়, তাকেও নিজের হাতে ভাঙতে মমতায় বাধা দেয়।"

লাভ ক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ, কলহ সংশয়,
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।

"ঝড় এসে আমার মনের ভিতকে নাড়া দিয়ে গেল, আমি বুঝলুম বেরিয়ে আসতে হবে।"[২] কবি ভারতীর সম্পাদকত্ব ছাড়িলেন, কলিকাতার বাস ইতিপূর্বে ছাড়িয়া শিলাইদহে গিয়া সপরিবারে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

শিলাইদহে সপরিবারে

১৩০৫ সাল হইতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্ত্রীপুত্রকন্যাদের লইয়া শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে বাস করিতেছেন। ছেলেমেয়েদের পড়াইবার জন্য লরেন্স নামে এক ইংরেজ শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন; অল্পকাল মধ্যে জগদানন্দ রায় আসিয়া ইঁহার সহিত যুক্ত হইলেন। প্রথমে ইনি ঠাকুর এস্টেটের কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হন, গণিতে ও বিজ্ঞানে ইঁহার ঔৎসুক্য দেখিয়া কবি ইঁহাকে নিজ সন্তানদের শিক্ষকরূপে গ্রহণ করিলেন।

শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে কবি নানা বিষয়ের পরীক্ষা করিতেছেন; আমেরিকান ভুট্টা ও মাদ্রাজী সরু ধান

১ ১৩০৫ বৈশাখ— দুরাশা। জ্যৈষ্ঠ— পুত্রযজ্ঞ। আষাঢ়— ডিটেকটিভ্। ভাদ্র— অধ্যাপক। আশ্বিন— রাজটীকা। অগ্রহায়ণ— মণিহারা। পৌষ— দৃষ্টিদান।

২ শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩৩২ বৈশাখ।

আনাইয়া চাষের পরীক্ষা, রাজসাহী হইতে রেশমের গুটি আনাইয়া তাহার তৈয়ারির পরীক্ষা যুগপৎ চলিতেছে। রাজসাহীর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এক সময়ে কবির বিশেষ বন্ধু ছিলেন; আমাদের আলোচ্য পর্বে রাজসাহীতে রেশমের একটি কারখানা তাঁহারই উৎসাহে স্থাপিত হয়। আমরা অক্ষয়কুমারকে ঐতিহাসিক বলিয়া জানি, কিন্তু বাংলার এই মৃতকল্প রেশমশিল্পের পুনর্গঠন কার্যে তাঁহার সহায়তার কথা কম লোকেই জানে। ১৩০৫ চৈত্রমাসে ত্রিপুরার কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুরকে রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্রে লিখিতেছেন যে, রাজসাহী "শিল্পবিদ্যালয়কে উৎসাহ দিবার জন্য সেখান হইতে আমি সর্বদাই রেশমের বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া থাকি।··· বন্ধুদের নিকট আমার এই উপহার কেবল আমার উপহার নহে, তাহা স্বদেশের উপহার।" এই পত্রের সঙ্গে ত্রিপুরার মহারাজার জন্য একখানি উৎকৃষ্ট চাদর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।[১] রেশমগুটির পরীক্ষা করিতে গিয়া কবির কী যে দুর্দশা হইয়াছিল তাহা জগদীশচন্দ্রকে লিখিত একখানি পত্রে বর্ণনা করিতেছেন; অক্ষয়কুমার "কুক্ষণে ২০টি রেশমের গুটি আমার ঘরে ফেলিয়া গিয়াছিলেন; আজ দুইলক্ষ ক্ষুধিত কীটকে দিবারাত্রি আহার এবং আশ্রয় দিতে আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি— দশ বারো জন লোক অহর্নিশি তাহাদের ডালা সাফ করা ও গ্রামান্তর হইতে পাতা আনিবার কার্যে নিযুক্ত হইয়াছে—লরেন্স স্নানাহার পরিত্যাগ করিয়া কীটসেবায় নিযুক্ত"।[২]

কিন্তু এ সব দুঃখ খানিকটা স্বখাত সলিল। আসল দুঃখ পাইতেছেন 'সাহিত্য'-সম্পাদকের তীব্র সমালোচনা হইতে। বহু বৎসর ধরিয়া সাহিত্য পত্রিকা রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল প্রকার রচনারই প্রতিকূল সমালোচনা করিয়া আসিতেছিলেন। এই সব সমালোচনার অধিকাংশই অর্থহীন, এমন কি কিছুকিছু বিদ্বেষপ্রসূত; তবে কখনো কখনো সমাজপতি যাহা বলিতেন তাহার মধ্যে তাঁহার সাহিত্যপ্রতিভা প্রকাশ পাইত। ভারতীর সম্পাদকত্ব ত্যাগ করিলে 'সাহিত্য' লিখিয়াছিলেন "মাসিকের জন্য অনবরত লিখিয়া তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) সাহিত্যশিল্পের যতটা অবনতি হইয়াছে, তাহা বঙ্গভাষার ক্ষতি বলিয়া গণ্য করি"।[৩] কিন্তু এ একপ্রকার ব্যাজ স্তুতিই। আসল তীব্র সমালোচনাই কবিকে চঞ্চল করিত। সাহিত্যের কোনো এক গল্পে কবিকে অত্যন্ত কুৎসিত আক্রমণ করা হয়। কবি প্রিয়নাথ সেনকে লিখিতেছেন "এ সম্বন্ধে যদি তোমার কোন বন্ধুকৃত্য করিবার থাকে ত থাকিবে" (৭ আষাঢ় ১৩০৬। প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি পৃ ২৭৫)। কয়েকদিন পরে পুনরায় একপত্রে লিখিতেছেন যে, সাহিত্যের লেখকের কাপুরুষতার প্রতি ঘৃণা এবং তাঁহার প্রতি সমবেদন প্রকাশ করিয়া তিনি ও জগদীশচন্দ্র যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা তাঁহাকে বিশেষ বল দান করিয়াছে, "মন শান্ত না থাকিলে আমি কোন কাজ করিতে পারি না। সেইজন্য জীবনকে নিষ্ফলতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সকল প্রকার ক্ষোভের কারণ হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করি"। (প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি পৃ ২৭৮)।

সপরিবারে শিলাইদহে থাকিলেও কবিকে প্রায়ই কলিকাতা আসিতে হয়। বলেন্দ্রনাথের কঠিন পীড়া; ঠাকুর কোম্পানির কর্ণধার ছিলেন তিনি। কোম্পানির একটা আপিস ছিল কলিকাতায়। বাণিজ্যতরণী ডুবুডুবু দেখিয়া কবি খুবই উদ্‌বিগ্ন হইয়া কাজকর্ম দেখিবার চেষ্টা করিতেছেন। কলিকাতায় আসিলে পারিবারিক, সামাজিক, বৈষয়িক, সাহিত্যিক অসংখ্য কাজ যেন তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে, তিনিও যে নানা কাজের পিছনে ধাবিত না হন, সেকথাও জোর করিয়া বলিতে পারি না। ফলে কলিকাতায় যখন থাকেন উদয়অস্ত কাজ তাঁহার পিছু লাগিয়া থাকে। এই সময়ে একটি বিশেষ মঙ্গল কর্ম তাঁহাকে করিতে দেখি; সেটি হইতেছে অন্ধকবি হেমচন্দ্র

১ পূর্বাশা ১৩৪৮।

২ পত্র। জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত। ১০ আষাঢ় ১৩০৬। দ্র প্রবাসী ১৩৩৩ মাঘ পৃ. ৪৬২।

৩ সাহিত্য, ১০ম বর্ষ, ১৩০৬ বৈশাখ, পৃ ৬৮।

বন্দ্যোপাধ্যায়কে অর্থ সাহায্য দান ও তদ্‌বিষয়ে ব্যবস্থা করা। কবি হেমচন্দ্র এককালে কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন, কিন্তু বার্ধক্যের পূর্বেই অন্ধ হইয়া যান। সেই হইতে তাঁহার দারিদ্র্য দুঃখের সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথ ইহা জানিতে পারিয়া স্বয়ং মাসিক ২০৲ করিয়া ও গগনেন্দ্রনাথদের বলিয়া ১০৲ করিয়া সাহায্য ব্যবস্থা করিয়া দেন।[১]

সাহিত্যিক দুঃখভোগ করা ছাড়া আরও অনেক দুঃখভোগের কারণ তিনি স্বয়ং জুটাইয়াছিলেন যাহার জের তাঁহাকে বহু বৎসর ভোগ করিতে হইয়াছিল। এস্থলে গোড়ার কথা দুই একটি বলা প্রয়োজন।

বোধ হয় ১৩০২ সালে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কুষ্টিয়ায় 'ঠাকুর কোম্পানি' নামে এক কারবার খোলেন। মফঃস্বলের জমিদারি হইতে ভুষি মাল ও পাট কিনিয়া বাঁধি কারবার কাজের সূত্রপাত হয়। কিছু কাল পরে আখমাড়াই কলের কাজেও তাঁহারা হাত দিলেন। গত শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা দেশে আখের চাষ ভালোই ছিল ও গ্রামে গ্রামে আখমাড়াই হইত। সে সময়ে আখমাড়াই কলের একমাত্র সরবরাহক ছিল রেনউইক নামে এক ইংরেজ কোম্পানি; তাহাদের কল, তাহাদেরই দালাল গ্রামে গ্রামে বিলি করিত। ঠাকুর কোম্পানি এই ইংরেজ কোম্পানির সহিত প্রতিযোগিতায় নামিয়া অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদের একচেটিয়াত্ব ভাঙিয়া দিতে সক্ষম হইলেন।

রবীন্দ্রনাথ ভ্রাতুষ্পুত্রদের কর্মোৎসাহ দেখিয়া স্বয়ং ব্যবসায়ে আকৃষ্ট হইলেন ও ব্যবসায়কে বহু বিস্তৃত করিবার জন্য প্রয়োজনমতো অর্থ সাহায্য ও পরামর্শ দিতে লাগিলেন। গোড়ার দিকে ব্যবসায়ের খুঁটিনাটি লইয়া রবীন্দ্রনাথ কখনো মাথা ঘামাইতেন না, কারণ জমিদারির কাজই তাঁহার যথেষ্ট ছিল। তিনি কাজের বিস্তার ও সফলতা দেখিয়া বাস্তবের সহিত কল্পনা জুড়িয়া সব জিনিসটাকে রঙিন করিয়া দেখিতেন। কাজ ভালোই চলিতেছিল। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের মন ক্রমশ জীবনবীমা, সমবায় প্রভৃতি জাতীয়-জীবনের বৃহত্তর কর্মাভিমুখে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ব্যবসায়ের দেখাশোনা সম্পূর্ণরূপে গিয়া পড়িল বলেন্দ্রনাথের[২] উপর। বলেন্দ্রনাথ ছিলেন সাহিত্যিক, আদর্শবাদী, মনুষ্যচরিত্রে অনভিজ্ঞ; তাঁহার স্কন্ধে মৈত্রেয় নামে এক শনি চাপিয়াছিল। সে ছিল ম্যানেজার; সেই লোকটি বাণিজ্যতরণীর তলদেশে এমন সুনিপুণভাবে ছিদ্র করিয়া দিয়াছিল যে, উহা যে ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হইতেছে তাহা কেহই উপর হইতে বুঝিতে পারেন নাই। ১৩০৬ সালে বলেন্দ্রনাথ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং ব্যবসায়ের সমস্ত ঝুঁকি গিয়া পড়িল রবীন্দ্রনাথের উপর। বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে সমস্যা জটিলতর হইল। রবীন্দ্রনাথ পিতৃসম্পত্তির আংশিক মালিক। কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রগণ সে হিসাবে কোনো সম্পত্তির মালিক নয়; আইনের দিক হইতে সমস্ত দায় ও দায়িত্ব গিয়া বর্তাইল রবীন্দ্রনাথের উপর। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত অসহিষ্ণুভাবে ব্যবসা গুটাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্যবসায় করিবার জন্য যেমন আগ্রহ, ব্যবসায় না-করিবার জন্য আগ্রহ ততোধিক। বলেন্দ্রনাথের অতি-বিশ্বাসী ম্যানেজার অকস্মাৎ ফেরার হইলে দেখা গেল ঠাকুর কোম্পানির ৭০।৮০ হাজার টাকার দেনা। কিন্তু সে লোকসান সামলানো যাইত যদি রবীন্দ্রনাথ কারবার বন্ধ করিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত না হইতেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে কবি তাঁহার নিষ্ফলতার সকল চিহ্ন এমনভাবে অবলুপ্ত করিয়া দিয়াছেন যে অতীতের কোনো স্মৃতি তাহার করুণ কাহিনী বলিবার জন্য যেন না থাকে। এই অসহিষ্ণুতার সময় তিনি লাভ ক্ষতি নিন্দা স্তুতি কোনো কিছুই গ্রাহ্য করিতেন

১ পত্র। জোড়াসাঁকো। ৩ শ্রাবণ ১৩০৬। মন্মথনাথ, হেমচন্দ্র ৩য় খণ্ড পৃ ২৪৬।

২ বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় ১৩০৬, ৬ই ভাদ্র। ইঁহার মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের নিকট বিশেষ আঘাতরূপে আসিয়াছিল; 'বলু' ছিলেন আকৃতি প্রকৃতিতে তাঁহার মতন: রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে নিজহাতে তৈয়ারী করিয়া তুলিয়াছিলেন; তাঁহার বড়ো আশা ছিল এককালে বলেন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যে গদ্য রচনায় অমরস্থান লাভ করিবেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথের অসমাপ্ত রচনা, প্রদীপ ১ম ভাগ ১৩০৬ আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা পৃ ৩৪৮। অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত, রচনাকার বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিক্ষা ও সাহিত্য. ২৩শ বর্ষ ১৩৫০ মাঘ পৃ ১১-১৭

না, কেবল অতীতের সমস্ত চিহ্ন মুছিয়া ফেলিবার জন্যই ব্যাকুল হইতেন। বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও কুষ্টিয়ার ব্যবসায় বেশ কিছুকাল চলিয়াছিল; প্রিয়নাথ সেনকে এক পত্রে[১] (১৫ ফাল্গুন, ১৩০৭) লিখিতেছেন, "সম্প্রতি কলকাতার একজন মাড়োয়ারী baler এবং তার সঙ্গে একজন ইংরেজ আমাদের সঙ্গে অর্দ্ধেক ভাগে আগামী বৎসর কাজ করতে চায়—যা কিছু খরিদ হবে তার অর্দ্ধেক খরচ আমাদের অর্দ্ধেক তাদের— তারা নিজ ব্যয়ে কলকাতার Establisment চালাবে আমরা নিজব্যয়ে কুষ্টিয়ায় চালাব— আমরা খরিদ করব তারা বিক্রী করবে…এ বৎসর কালিগ্রামে ধানের কারবার সুবিধা নয় বলে আমরা তাতে হাত দিইনি কেবল আখের কল পূর্ববৎ চলচে।" সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যে ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়ে লিপ্ত হইয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। পরে কুষ্টিয়ার ব্যবসায় গুটাইয়া কারবারের জিনিসপত্র কোম্পানির একজন কর্মচারীকে[২] সামান্য খাজনায় দান করিয়া দিলেন; এই কর্মচারী কালে কুষ্টিয়ার একজন বিশিষ্ট ধনীরূপে খ্যাত হন।

এদিকে কারবারে যে লোকসান হইল তাহার দায় আসিয়া পড়িল রবীন্দ্রনাথের উপর। বন্ধু লোকেন পালিতের নিকট হইতে ঋণ করিলেন। মাড়োয়ারী মহাজনদের নিকট হইতেও বোধ হয় ধার করেন। প্রিয়নাথ সেনকে একপত্রে লিখিতেছেন ২০,০০০৲ টাকা ৮ পার্সেণ্টে তিন বছরের মেয়াদে ধার পাওয়া গেলে তিনি মাড়োয়ারীর ও লোকেনের ঋণ শুধিবেন।

"লোকেনের দেনা শুধতে যদি দেনা করি তাহলে লোকেন নিশ্চয়ই বিরক্ত হবে, সেইজন্য আমি বই-এর কপিরাইট বেচতে প্রস্তুত হয়েছি। নিজের বই এবং নিজের দেহটা ছাড়া সম্প্রতি আর কিছু বিক্রেয় পদার্থ আমার আয়ত্তের মধ্যে নেই। বই কেনবার মহাজন পাওয়া দুর্লভ, এবং নিজেকে বিক্রয় করতে গেলেও খরিদার পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ। কোন ছাপাখানাওয়ালা মহাজন যদি গ্রন্থাবলী কেনে তা হলে ঠকে না এটা নিশ্চয়।"

এই টাকার জোগাড় হয় নাই। টাকা লোকেনের ছিল না, তারক পালিতের টাকা। সেই টাকা শোধ করেন ১৯১৭ সালে; তখন সে টাকার মালিক বিশ্ববিদ্যালয়; কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে মুক্তি লাভ করেন।

কণিকা, কথা, কাহিনী

পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিষয় হইতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টির বাধা কোথায়, তাহার কারণ আমরা অনুমান করিয়াছি মাত্র। নূতন কিছু লিখিতেছেন না, লিখিবার প্রেরণাও নাই। জমিদারি ও ব্যবসায় সংক্রান্ত বহুবিধ জঞ্জাল যাহা জুটিয়াছিল তাহার হিসাব নিকাশ, বলেন্দ্রনাথের পীড়াজনিত উদ্‌বেগ, পুত্রকন্যাদের জন্য শিলাইদহে শিক্ষার সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবস্থাজনিত সমস্যা তাঁহার শরীর ও মনকে ক্লান্ত করিতেছে। নূতন লেখা সামান্যই চোখে পড়ে। সুমহৎ চিন্তা, সুবৃহৎ সাহিত্যসৃষ্টির জন্য সুপ্রশস্ত অবসরের প্রয়োজন। সে অবসর নাই, মনেও শান্তি নাই; তাই অবসর সময়ে লিখিতেছেন 'কণিকা'র কবিতা। সেগুলিকে কবিতা বলা উচিত নয়, বলা যাইতে পারে epigrams। "এপিগ্রাম জাতীয় কবিতার বিশেষত্ব এই যে অতি সহজ সত্যকে বহু বাহুল্যের আবর্জনা হইতে মুক্ত করিয়া সহজভাবে অল্প কথায় প্রকাশ করা, যাহা সাধারণ তাহাকে অসাধারণ দৃষ্টিতে দেখিয়া তাহার গভীর তত্ত্ব অতি অল্প কথায় কবিত্ব মণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করা।" (রবিরশ্মি ৩৭৮) কণিকার মধ্যে যে সব তত্ত্ব কবিতাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা পৃথিবী

১ ২৪ শ্রাবণ ১৩০৭। দ্র শনিবারের চিঠি ১৩৪৮ আশ্বিন পৃ ৭৩৮।

২ দ্র শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ পৃ ১০৮

সম্বন্ধে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পরিচয়লব্ধ সত্য। আমাদের মনে হয়, ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে আসিয়া যে-অভিজ্ঞতা যাহাকে প্রায় নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা বলা যাইত তাহাই যেন বিদ্রূপের ভাষায় রূপ পাইয়াছে। পার্থিব সত্যের দিক হইতে পৃথিবীর সেরা epigrams এর সহিত এগুলির তুলনা করা যায়, এমন কি চাণক্য মুনির লেখা বলিয়া যাহা চলিত আছে তাহার সঙ্গে তুলনায় কণিকার সত্যোক্তিগুলির ঔজ্জ্বল্য ম্লান হইবে না। বহুকাল পরে প্রকাশিত 'লেখন' কবিতাগুচ্ছের মধ্যে কণিকার এই হালকা ভাষায় গম্ভীর বাণীর প্রতিধ্বনি পাই।

"কণিকার কবিতাগুলিতে কয়েকটি পংক্তির মধ্যে কবি সকলের জানা কথাকে কবিত্বমণ্ডিত করিয়া অতি সূক্ষ্ম একটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং উপমা রূপক শ্লেষ ও বিপরীত ভাবের একত্র সমাবেশ করিয়া এমন একটি আকস্মিক বিস্ময় পাঠকের ও শ্রোতার মনে উৎপাদন করেন যে, কবির সূক্ষ্ম দৃষ্টির, গভীর জ্ঞানের, কৌতুকের, কৌশলের এবং নিপুণ শ্লেষপটুতার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়।" (রবিরশ্মি পৃ ৩৭৮)।

গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেন সাহিত্যিক বন্ধু প্রমথনাথ চৌধুরীকে। প্রমথনাথ ময়মনসিংহ সন্তোষের অন্যতম জমিদার; ইঁহার কনিষ্ঠ মন্মথনাথ বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার প্রথম প্রেসিডেণ্ট হন। প্রমথনাথ এককালে বাংলা-সাহিত্যে নাম করিয়াছিলেন; তাঁহার 'গৌরাঙ্গ' কাব্যখানি তাঁহাকে যশস্বী করে। প্রমথনাথের সহিত পরযুগে রবীন্দ্র-নাথের সাহিত্য বিষয়ে আর কোনো যোগ ছিল না বলিয়া জানি।

কণিকার কবিতাগুলি দুই পুংক্তি হইতে দশ পংক্তির মধ্যে রচিত; পাঁচ বৎসর পর 'কাব্যগ্রন্থ' সম্পাদনকালে কণিকার যে ভূমিকা লিখিয়া দেন তাহা কবির নিজ ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। "হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা।"

বৎসরের মাঝামাঝি হইতে যে কাব্যলক্ষ্মীর সহিত কবির সাক্ষাৎ হইল তিনি মানস সুন্দরী নহেন, তিনি সুবচনী কথালক্ষ্মী। অন্তর্বিষয়ী কাব্যের প্রেরণা আজ ম্লান, তাই আজ বহির্বিষয়ী বস্তু বর্ণনায় গল্প বা কাহিনী রচনায় মন যাইতেছে। পাঠকের স্মরণ আছে (১৩০৪) কার্তিক মাসে কবি চারিটি গাথা রচনা করিয়াছিলেন,— শ্রেষ্ঠভিক্ষা, প্রতিনিধি, দেবতার গ্রাস ও মস্তকবিক্রয়। এইবার এই ধরনে কুড়িটি নূতন কবিতা লিখিলেন; ১৮ই আশ্বিন হইতে ১১ই কার্তিকের (১৩০৬) মধ্যেই অধিকাংশ রচিত, দুইটি মাত্র অগ্রহায়ণে লেখা।

এই কবিতাগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মনের একটি নূতন সুর ধ্বনিতে দেখি; 'চৈতালি'র মধ্যে প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদ সম্বন্ধে কবিচিত্তে প্রথম সজাগ সাড়ার সন্ধান পাই। কল্পনার কাব্যকাকলিতে উহা স্পষ্টতর হয়। নৈবেদ্যের মধ্যে এই দেশপ্রীতি ও ভগবৎপ্রেম এমনভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে যে উহাদিগকে পৃথক করা কঠিন।

ভাবলোকে যে ভারতকে দেখিতেছিলেন আশ্চর্যরূপে, জীবনে তাহাকে দেখিতে চাই আদর্শরূপে। কবি খুঁজিতেছেন সেই বাস্তব রূপকে; তাই তিনি বৌদ্ধসাহিত্য, বৈষ্ণবগ্রন্থ, রাজপুত, শিখ ও মারাঠাদের কাহিনী তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়া আত্মত্যাগের মহৎ দৃষ্টান্তগুলি অবলম্বনে 'কথা' গুলি রচনা করিলেন।[১]

১ "এই গ্রন্থে যে সকল বৌদ্ধ কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সংকলিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধীয় ইংরাজি গ্রন্থ হইতে গৃহীত। রাজপুত কাহিনীগুলি টডের রাজস্থান ও শিখ বিবরণগুলি দুই একটি ইংরাজি শিখ-ইতিহাস [Cunnigham, History of the Sikhs] হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। 'ভক্তমাল' হইতে বৈষ্ণব গল্পগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। মূলের সহিত এই কবিতাগুলির কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হইবে আশা করি সেই পরিবর্তনের জন্য সাহিত্যনীতি বিধান মতে দণ্ডনীয় গণ্য হইব না।" (প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার কর্তৃক লিখিত। ১ মাঘ ১৩০৬)।

'কথা' কাব্যগ্রন্থ বাংলাদেশে জাতীয়তাবোধ উদ্‌বুদ্ধ করিতে কী পরিমাণ সহায়তা করিয়াছে তাহা বাঙালীপাঠকমাত্রই অবগত আছেন। কয়েক বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই কবিতাগুচ্ছের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন,—

কথা কও, কথা কও
তুমি জীবনের পাতায় পাতায় অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ মজ্জায় মিশাইয়া।
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী স্তম্ভিত হয়ে বও।
ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতীত, কথা কও, কথা কও।

বহু কাল পরে কবি তাঁহার 'কথা' কাব্যকে কিভাবে দেখিয়াছিলেন তাহার সন্ধান পাই 'রবীন্দ্র রচনাবলীর' সূচনায় (৭ম খণ্ড)। তিনি লিখিতেছেন, "ভালো করে ভেবে দেখলে দেখা যাবে 'কথা'র কবিতাগুলিকে ন্যারেটিভ শ্রেণীতে গণ্য করলেও তারা চিত্রশালা। তাদের মধ্যে গল্পের শিকল গাঁথা নেই, তারা এক একটি খণ্ড খণ্ড দৃশ্য। ছবির অভিমুখিতা বাইরের দিকে, নিরাবিল দৃষ্টিতে স্পষ্ট রেখায়। সেইজন্য মনের মধ্যে এই ছবির প্রবর্তনা এমন বিষয়বস্তুকে স্বভাবত বেছে নেয় যার ভিত্তি বাস্তবে। এই সন্ধানে এক সময়ে গিয়ে পড়েছিলুম ইতিহাসের রাজ্যে। সেই সময়ে এই বহির্দৃষ্টির প্রেরণা কাব্যে ও নাট্যে ভিড় করে এসেছিল ইতিহাসের সঞ্চয় নিয়ে। এমনি করে এই সময়ে আমার কাব্যে একটি মহল তৈরি হয়ে উঠেছে যার দৃশ্য জেগেছে ছবিতে, যার রস নেমেছে কাহিনীতে, যাতে রূপের আভাস দিয়েছে নাটকীয়তায়।"

'কথার' ন্যায় অপরূপ কাব্যগুচ্ছও সমালোচকদের হাতে কলঙ্কিত হইয়াছে। 'শ্রেষ্ঠভিক্ষা'য় অশ্লীলের ইঙ্গিত আছে, 'বন্দীবীর' মুসলমানদের আত্মসম্মানে আঘাত দিয়াছে, 'শেষশিক্ষা'য় শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের নিন্দা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ! শিখদের অভিযোগ গুরু গোবিন্দ সিংহের মৃত্যুবিষয়ক কাহিনী ঐতিহাসিক সত্য নহে। দুঃখের বিষয় ১৯ শতকের মধ্যভাগে রচিত কানিংহাম সাহেবের শিখ-ইতিহাসে ঐ ঘটনাটি লিপিবদ্ধ আছে, এতদিন তাহা কাহারও আত্মসম্মানে লাগে নাই, কবিতা প্রকাশিত হইবার প্রায় ত্রিশবৎসর পরে এই বিষয় লইয়া সাময়িক পত্রিকায় সমুদ্রমন্থন হয়।

'কথা'র কয়েকটি কবিতাকে পরবর্তীযুগে কবি নূতন রূপ দান করিয়াছিলেন; 'পূজারিনী'র আখ্যানবস্তুকে আশ্রয় করিয়া 'নটীর পূজা' নাটিকা লেখেন (১৩৩৩ বৈশাখ, মাসিক বসুমতী)। যথাস্থানে আমরা নাটিকাটির কথা আলোচনা করিব। 'পরিশোধ'কে[১] নৃত্যছন্দে নূতন রূপ দিয়াছেন 'শ্যামা'য়।

'কথা' কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেন জগদীশচন্দ্র বসুকে[২]। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের সহিত কবির সম্বন্ধবিষয়ে আমরা অন্যত্র বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করিব। উভয় উভয়কে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন এবং পরস্পর গুণগ্রাহী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দুই বৎসর (১৩০৪) পূর্বে জগদীশচন্দ্রের উদ্দেশ্যে লিখিয়াছিলেন, "বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে দূর সিন্ধুতীরে হে বন্ধু গিয়েছে তুমি" (কল্পনা)। জগদীশ তখন বিলাতে (১৮৯৫-৯৭)।

১ শ্যামা তাহার অনুরক্ত উত্তীয়কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বজ্রসেনের স্থলাভিষিক্ত করিয়া বজ্রসেনকে লাভ করিয়াছিল; বজ্রসেন যখন জানিতে পারিল যে শ্যামা কোন্ উপায়ে তাহাকে মুক্তি দিতে পারিয়াছে, তখন শ্যামার প্রেম ও সঙ্গ বজ্রসেনের নিকট বিষাক্ত বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু শ্যামাকে দূরে সরাইয়া সে আবার শ্যামার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। উত্তীয় শ্যামাকে ভালবাসিত, তাই সে প্রিয়ার অনুরোধে নিজের প্রাণ দিয়া প্রিয়ার প্রেমপাত্রকে প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা করিয়া প্রিয়ার তুষ্টিসাধন করিয়া নিজে কৃতার্থ হইয়াছিল। শ্যামাকে বজ্রসেনও ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু তাহার অপকর্মকে নয়। সে শ্যামাকে ত্যাগ করিল এবং এই দুঃখে শ্যামা প্রাণ ত্যাগ করিল। বজ্রসেন শ্যামার কাছে প্রাণ পাইয়া তাহার ঋণ 'পরিশোধ' করিলেন তাহার প্রাণ লইয়া। এই যে ক্রমাগত আকর্ষণ বিকর্ষণ এবং অনুরাগ ও ধর্মনিষ্ঠার দ্বন্দ্ব, তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্ কবি অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। (রবিরশ্মি ১ম পৃ ৩৮০)

২ শিলাইদহ অগ্রহায়ণ ১৩০৬। 'কথা' প্রকাশিত হয় ১লা মাঘ ১৩০৬।

'কথা' প্রকাশিত হইবার কিছুকাল পরেই বাহির হইল 'কাহিনী' নামে কাব্য। আমরা ইতিপূর্বে কাহিনী কাব্যগুচ্ছের অন্তর্গত কবিতা ও নাট্যগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। নাট্যকাব্যগুলি পাণ্ডুলিপি অবস্থায় জগদীশচন্দ্র শোনেন এবং তিনি কবিবন্ধুকে কর্ণ সম্বন্ধে একটি নাট্যকাব্য লিখিবার জন্য অনুরোধ[১] জ্ঞাপন করেন (৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬)। কাহিনী খণ্ড ছাপাইতে দিবার পর কবি 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' লিখিতে আরম্ভ করেন বলিয়া মনে হয়। উহার রচনা সমাপ্ত হইল ১৫ই ফাল্গুন, গ্রন্থ প্রকাশিত হইল ২০শে ফাল্গুন। সহজেই অনুমান করা যায় যে মুদ্রণের কার্য প্রায় শেষ হইয়া আসিলে রচনায় হাত দেন।

'কাহিনী'[২] কাব্যখণ্ড উৎসর্গ করিলেন (২০ ফাল্গুন ১৩০৬) "শ্রীলশ্রীযুক্ত রাধাকিশোর দেব মাণিক্য মহারাজ ত্রিপুরেশ্বরের করকমলে।" ত্রিপুরার মহারাজা রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগতের কক্ষমধ্যে কখন ও কিভাবে আসিলেন, তাহা আমরা পৃথকভাবে আলোচনা করিব।

কবির ইচ্ছা কাব্যচর্চা করেন; কিন্তু বাহিরের পাঁচ রকম কাজ নিত্য তাঁহাকে আহ্বান করে; কর্তব্যবোধে, অনুরোধ-উপরোধের দায়ে, চক্ষুলজ্জার খাতিরে ভালোমন্দ অনেক কাজ করিতে হয়। জমিদারিতে নিত্যনৈমিত্তিক কাজ তো আছেই, কলিকাতায় যখন আসেন তখন সামাজিক বিচিত্র আহ্বানে সাড়া দিতে হয়, কলিকাতার ভদ্র সমাজের বহু কাজ 'রবিবাবু' না হইলে চলে না। সমসাময়িক একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। এই সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি হয়, রবীন্দ্রনাথ তাহার মধ্যে জড়িত হইয়া পড়েন। পরিষদ্ সৃষ্টির পর হইতে আজ এই ছয় বৎসর উহা গ্রে স্ট্রীটস্থ শোভাবাজারের রাজবাটীতে অবস্থিত ছিল। পরিষদের নিজের কোনো গৃহ ছিল না। নবীন সাহিত্যিকরা এইরূপ একটা পাবলিক প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিবিশেষের বাটীতে কায়েমিভাবে থাকার বিরোধী। ইহার প্রতিবাদকল্পে যে এগারো জন সদস্যের সহিযুক্ত পত্র সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হয়, তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাম ছিল। এই পত্রে পরিষদের কার্যালয় কোনো সাধারণ প্রকাশ্যস্থানে স্থানান্তরিত করিবার জন্য সাধারণ সভা আহ্বানের অনুরোধ ছিল। ৩রা ফাল্গুনের (১৩০৬) অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ দলেরই জয় হইল; তাঁহাদের চেষ্টায় পরিষদ্ ভাড়াটিয়া বাড়িতে স্থানান্তরিত হইল। সাময়িকভাবে একটি দল পরিষদের সংস্রব ত্যাগ করিলেও অচিরে সদস্যসংখ্যা আশাতীত বৃদ্ধি পাইল।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংগীতসমাজের সহিত খুবই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। পাঠকের স্মরণ আছে ১২৯৮ সাল হইতে এই সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটক এখানে অভিনীত হয় এবং কোনো কোনো অভিনয়ে স্বয়ং তিনি অবতীর্ণ হয়েন। 'বিসর্জন' নাটক সংগীতসমাজের ব্যবস্থানুসারে অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথই তাহার মহড়া দেন ও স্বয়ং রঘুপতির ভূমিকা গ্রহণ করেন, হেমচন্দ্র বসু মল্লিক জয়সিংহ সাজেন। অভিনয়ভঙ্গির নূতন একটি আদর্শ রবীন্দ্রনাথ বাংলা রঙ্গমঞ্চে প্রবর্তিত করিলেন। এই রঙ্গমঞ্চে 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৩০৩) অভিনয়ে নাটোরের

১ জগদীশচন্দ্রের পত্র, দার্জিলিং ২০ মে ১৮৯৯। দ্র. প্রবাসী ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ পৃ ২৫৭

২ এইখানে 'কথা', 'কাহিনী' এবং 'কথা ও কাহিনী' গ্রন্থত্রয় সম্বন্ধে মন্তব্য প্রয়োজন :

কথা— ১মাঘ ১৩০৬ পৃ ১১০। উৎসর্গ শ্রীজগদীশচন্দ্র বসুকে।

কাহিনী— ২০ ফাল্গুন ১৩০৬ পৃ ১৬৪। উৎসর্গ শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর দেবমাণিক্যকে [গান্ধারীর আবেদন, পতিতা, ভাষা ও ছন্দ, সতী, নরকবাস, লক্ষ্মীর পরীক্ষা, কর্ণ-কুন্তী সংবাদ]। পরে নাট্যগুলি কাব্যগ্রন্থের ৯ম ভাগ নাট্য অংশে (ক) মুদ্রিত হয়— সতী, নরকবাস, গান্ধারীর আবেদন, কর্ণ-কুন্তী সংবাদ, বিদায় অভিশাপ, চিত্রাঙ্গদা, লক্ষ্মীর পরীক্ষা।

কথা ও কাহিনী—মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত (১৩১০) কাব্যগ্রন্থের ৫ম ভাগ, কাহিনী পৃ ৬১-৯৪ ; কথা ৯৫-১১২। ইহাই 'কথা ও কাহিনী' নামে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে ১৯১০এ (১৩১৬সালে পৌষ মাসে) প্রকাশিত হয়। ইহার বহু সংস্করণে বহু রকমের গ্রহণ-বর্জন হইয়াছে।

মহারাজা জগদিন্দ্রনারায়ণ অবিনাশের ও রবীন্দ্রনাথ কেদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কেদারের সাজপটে ও মেক্‌আপে কবি এমন একটা হ্যালাগোছ কপট বিনয়ের অবতারণা করিয়াছিলেন, যাহাতে চরিত্রের অন্তর্লিখিত ভাবটি সহজেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। চেষ্টাকৃত অযত্নের আবরণে স্বার্থসাধনের গূঢ় অভিপ্রায় ঢাকা দিবার চেষ্টা যেন সহজেই নজরে পড়ে এই ভাবটিই প্রকাশ পাইয়াছিল। (খগেন্দ্রনাথ)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীক বাবু' প্রহসনে রবীন্দ্রনাথ 'অলীক বাবু'র ভূমিকায় নামেন। প্রহসনখানি ফরাসী হাস্যনট মোলেয়ারের একটা নাটক ভাঙিয়া লেখা। পাঠকের স্মরণ আছে ১৮৭৭ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'এমন কর্ম আর করব না' নামে একটা প্রহসন লেখেন; 'অলীক বাবু' এই নাটকের নায়ক। প্রথমবার বিলাত যাইবার পূর্বে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নিজেদের মধ্যে ইহার অভিনয় হয়; রবীন্দ্রনাথ তাহাতে 'অলীক বাবু'র ভূমিকা গ্রহণ করেন। হেমাঙ্গিনী সাজেন অক্ষয় চৌধুরীর স্ত্রী শরৎকুমারী। প্রায় বিশ বৎসর পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকখানিকে 'অলীক বাবু' নামে প্রকাশ করিলে সংগীতসমাজে উহার অভিনয়ের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু অভিনয় করাইতে গিয়া দেখা গেল রঙ্গমঞ্চে সফল করিতে হইলে কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন। অবনীন্দ্রনাথ 'ঘরোয়া'য় লিখিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ "অনেক অদল বদল করে দিয়ে তার ফরাসী গন্ধ থেকে মুক্ত করলেন। হেমাঙ্গিনীর প্রার্থীর সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেন। আগে ছিল এক অলীক বাবুই নানা সাজে ঘুরে ফিরে এসে বাপকে ভুলিয়ে হেমাঙ্গিনীকে বিয়ে করে। রবি কাকা সেখানে অনেকগুলো লোক এনে ফেললেন। তাতে হোলো কী, অনেকগুলো ক্যারেকটারেরও সৃষ্টি হোলো। হেমাঙ্গিনীকে রাখলেন একেবারে নেপথ্যে।...আর বেরই করলেন না।" (পৃ ১১৭)

সংগীতসমাজের অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ অলীকবাবুর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন; প্রিয়নাথ সেন এই অভিনয় দেখেন ও কিছুকাল পরে তৎসম্বন্ধে লেখেন, "এমন সুন্দর অভিনয় কখনও দেখি নাই। নিজে রবিবাবু অলীক প্রকাশ সাজিয়াছিলেন। যাঁহারা রবিবাবুর অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, কবিবর শুধু আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের শিরোমণি নহেন, নটচূড়ামণিও বটে।"[১]

সঙ্গীতসমাজের গোড়ার দিকে কবি একটু নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিতে ভালোবাসিতেন, স্টেজেও সহসা নামিতে রাজি হইতেন না। কিন্তু ক্রমে আভিজাত্যের সংকোচ কাটিয়া যায় ও স্বর্ণকুমারী দেবীর 'পুনর্বসন্ত' নামে গীতনাট্যে রিহার্সালে কোমরে চাদর বাঁধিয়া হাততালি বাজাইয়া সখিদের নাচ দেখাইয়া দেন। (খগেন্দ্রনাথ পৃ ২২৬)। সংগীতসমাজের সহিত রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ প্রায় দশ বৎসর (১২৯৮-১৩০৮) পর্যন্ত বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই ছিল; তারপর কলিকাতা মহানগরী হইতে কবির জীবনের কর্মভারকেন্দ্র বোলপুরের প্রান্তরের মধ্যে চলিয়া গেল এবং স্বভাবতই কবি এই সমাজ হইতে দূরে সরিয়া গেলেন,— 'জীবন যাত্রা আগে চলে যায় ছুটে— কালে কালে তার খেলার পুতুল পিছনে ধুলায় লুটে'।[২]

রবীন্দ্রনাথ অভিনয় শিক্ষা বিষয়ে যেসব মন্তব্য করিতেন তৎসম্বন্ধে খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিতেছেন, "তাঁহার মত যে, অভিনয়ে কিছু তেজস্বিতা বরং ওভার-একটিং ভালো, তাহাতে অভিনেতার আত্মাভিমানজনিত সংকোচের যে অভ্যাসদ্বারা দূরীকৃত হইয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় ও দর্শকের প্রাণ স্পর্শ করিতে পারে। কিন্তু বাঙালি জাতির সামাজিক জীবনযাত্রার ফলে স্বাভাবিক প্রবণতা আণ্ডার-একটিং-এর দিকে।"

১ সাহিত্য ১০মবর্ষ ১৩০৬ চৈত্র পৃ ৭৭১। প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি পৃ ১২৮।

২ খগেন্দ্রনাথ পৃ ২১৮। ইহার পর প্রায় ষোলো বৎসর পরে কবি কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বাটিতে পাবলিকের কাছে ফাল্গুনীতে নামেন কবিশেখর ও অন্ধবাউলের ভূমিকায়। যথাস্থানে তাহার আলোচনা হইবে।

ক্ষণিকা

পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব নাই বটে, কিন্তু রচনা সরবরাহের দায় হইতে অব্যাহতি নাই। নূতন বৎসরের শুরু হইতে (১৩০৭) ভারতীতে 'চিরকুমার সভা' ধারাবাহিক প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। 'কল্পনার' শেষ কবিতা (২০ ফাল্গুন ১৩০৬) রচিত হইয়া যাইবার পরই বোধ হয় 'ক্ষণিকা'র কবিতা ও 'চিরকুমার সভা' যুগপৎ আরম্ভ হয়। সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের রচনা হইলেও উভয় গ্রন্থের পরিস্ফুট ব্যঙ্গের মধ্যে প্রচ্ছন্ন সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিহিত আছে তাহা সাধারণ পাঠকও আবিষ্কার করিতে পারেন। জীবনের অতীত স্মৃতি ও অলীক কল্পনার মধ্যে বহুকাল বাস করিয়া আজ তাহাকেই ভুলিবার জন্য কবির আপ্রাণ চেষ্টা ; সে বন্ধন ছিন্ন করার প্রয়াসমাত্রেই ভাষায় আসিল সরলতা, ছন্দে আসিল চটুল গতি, ভাবনায় আসিল পরিহাস। 'ক্ষণিকার গান'[১] সত্যই এই কবিতাগুচ্ছের ভূমিকা।

প্রতিনিমেষের কাহিনী
আজি বসে বসে গাঁথিসনে আর,
বাঁধিসনে স্মৃতি-বাহিনী।
যা আসে আসুক, যা হবার হোক,
যাহা চ'লে যায় মুছে যায় শোক,
গেয়ে ধেয়ে যাক দ্যুলোক ভূলোক
প্রতি পলকের রাগিণী।
নিমেষে নিমেষে হয়ে যাক শেষ
বহি নিমেষের কাহিনী।

এই কবিতার চারিটি মাত্র স্তবকে কবি তাঁহার কাব্যজীবনের ও জীবনকাব্যের দার্শনিক কথাটি পরিব্যক্ত করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের মূল সূত্র ছিল নৈর্ব্যক্তিকভাবে সমস্তকে স্পর্শ করা ; কোনো বিষয় বা বস্তুর প্রতি অন্ধ আকর্ষণ না থাকায় তিনি যাহা এই কবিতায় লিখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার জীবনসাধনায় সত্য—

শুধু অকারণ পুলকে
নদীজলে-পড়া আলোর মতন
ছুটে যা ঝলকে ঝলকে
ধরণীর পরে শিথিল-বাঁধন
ঝলমল প্রাণ করিস যাপন,
ছুঁয়ে থেকে দুলে শিশির যেমন
শিরীষফুলের অলকে।

ক্ষণিকার কবিতাগুলি খুব অল্প সময়ের মধ্যে যে রচিত তাহা কাব্যখানি পাঠ করিলেই বুঝা যায়।[২] নূতন বৎসরের বৈশাখ হইতেই বোধ হয় শুরু হয় ; জ্যৈষ্ঠের গোড়ায় দিন দশের জন্য দার্জিলিং[৩] যান ত্রিপুরার মহারাজার নিমন্ত্রণে ; মহারাজ রাজকুমারদের শিক্ষা ব্যাপার লইয়া খুব চিন্তান্বিত। সেই বিষয়ে পরামর্শের জন্যই তাঁহার আহ্বান। কারণ এসব ব্যাপারে নিঃস্বার্থভাবে সদুপদেশ দিতে পারে এমন লোক রাজদরবারে প্রায়ই দুর্লভ।[৪] দার্জিলিঙে থাকেন আনন্দেল হাউসে৪। এইখানে গোটাদুই কবিতা লেখেন। তারপর শিলাইদহে ফিরিয়া আসিয়া ১০ই আষাঢ় পর্যন্ত একটির পর একটি কবিতা রচনা করেন। ক্ষণিকা প্রকাশিত হয় শ্রাবণের গোড়ায়।[৫]

১ ভারতী ১৩০৭ বৈশাখ। ক্ষণিকায় 'উদ্বোধন' নামে প্রকাশিত।

২ প্রথম কবিতা 'ক্ষণিকের গান' ভারতী ১৩০৭ বৈশাখে প্রকাশিত হয়।

৩ জ্যৈষ্ঠের গোড়ায় কবি দার্জিলিঙে আনন্দেল হাউসে দিন দশ থাকেন। আনন্দ মোহন বসুর কন্যা (৺) শ্রীমতী নলিনী নাগের (শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ নাগের পত্নী) অটোগ্রাফের খাতায় (১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭) 'সমুদ্র ও গিরিরাজ' কবিতাকণা লিখিয়া দেন।

৪ স্বর্গীয় বসন্তকুমার গুপ্তকে লিখিত পত্র। শিলাইদহ [১৩০৭] ৯ বৈশাখ। রবীন্দ্রজীবনীর নূতন উপকরণ। শনিবারের চিঠি ১৪শ বর্ষ ১৩৪৮ কার্তিক।

৫ জ্যৈষ্ঠের শেষ দিকে শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু শিলাইদহে যান ও তাঁহার মোলাকাত বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে সেই সময়ে 'ক্ষণিকা' ছাপাখানায় গিয়াছে। প্রেসে খুব দেরি হইতেছিল। সেই কথাই কি মনে করিয়া কবি লিখিয়াছিলেন, "যেমন আছ তেমনি এস আর কোরো না সাজ" (চিরায়মানা)। দ্র যতীন্দ্রনাথ বসু, শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ (সচিত্র) সাহিত্য ১১শ বর্ষ ১৩০৭ আষাঢ় ১৪৪-৪৮

'কণিকা'র কবিতাকণা ও ক্ষণিকার কবিতাবলীর মধ্যে কালের ব্যবধান দীর্ঘ নহে; উভয়ের সুরের মধ্যে একটা আপাত-লঘুতা থাকিলেও গভীর তত্ত্বের সমাবেশ সুস্পষ্ট; কণিকায় কবি বিশ্বসংসারের বিবিধ বিষয় ও বস্তুর মধ্যে যে যোগসূত্র দেখিয়াছিলেন, তাহা কবিতাকণায় প্রকাশ করেন, আর 'ক্ষণিকা'য় কবি সেই বিশ্বকে কালের মধ্যে সহজভাবে স্বীকার ও গ্রহণ করিয়া নূতন রীতিতে আত্মমোচন করিলেন। রচনার মধ্যে কোথাও কোনো কষ্টকল্পনা বা অতিশয়োক্তি দ্বারা বিশ্বকে স্বীকার করা হয় নাই—"মনেরে আজ কহ, যে, ভালোমন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে।"

পুরাতন জীবন, পুরাতন সমাজ—সকল হইতে কবি যেন তাঁহার নাড়ির যোগকে ছিন্ন করিয়া দিতে চান। পদ্মাবক্ষে নৌকাবাসে প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে গূঢ় নিবিষ্ট কেবলমাত্র জীবন তাঁহার চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্তি দিতেছে না— আপনার বেষ্টন ছাড়াইয়া একটা বড়ো ত্যাগের জীবনের জন্য তাঁহার বেদনা জাগিতেছিল। —(অজিতকুমার, রবীন্দ্রনাথ) নিজ জীবনের ক্ষুদ্র সামাজিক বেষ্টনী হইতেও বাহিরে আসিবার বেদনা অন্তরকে পীড়িত করিতেছিল। সেই গভীর বেদনার উচ্ছ্বাসকে তিনি যেন লঘুভাবে উড়াইতে চাহেন, সুখ দুঃখকে মিলাইয়া লইয়া মনের একটি সহজ মাধুর্যের ছন্দ রচনা করিতেছেন। "বাহিরে থাকে হাসির ছটা ভিতরে থাকে আঁখির জল।"

সমাজের ও সংসারের চিরাচরিত রীতি তাঁহার কাছে আজ অর্থহীন; সংসারের অভ্যস্ত মূল্য সবই বদলাইয়া গেল, নব নব ব্যঞ্জনার আলোক বিদ্রোহী কবিকে সম্পূর্ণ নূতন পথে, জীবনকে জানিবার পথে প্রবৃত্ত করিল। 'মাতাল' কবিতায় এই বেপরোয়া বিদ্রোহের সুর ঝলমল করিয়া উঠিতেছে। অথচ স্রোতের এই উচ্ছলতার তলে তলে গভীর তন্ময়তার বেদনা ও আনন্দ তরঙ্গায়িত। কবি নিজ নায়ের হালের দড়ি নিজহাতে কাটিয়া দিয়া পালে অসীমের খোলা হাওয়া লাগাইয়া মাতালের মতো চলিতে উদ্যত। এইখানে দেখি সংস্কারমুক্তিপ্রয়াসী রবীন্দ্রনাথকে, যিনি লিখিয়াছিলেন, 'অযাত্রায় ভাসাই তরী' 'ভালো মানুষ নই গো মোরা', 'উল্টো কথা কই'। ক্ষণিকার কাব্যগুচ্ছে সেই বন্ধন বিরোধী নূতন পথের পথিক, মুক্তিকামী রবীন্দ্রনাথ।

আমরা বলিয়াছি এই কাব্যখানির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অতীত জীবনের সকল অবস্থার কথা তুলির-রেখায়-টানা ছবির মতো ফুটিয়াছে, রেখাঙ্কনে শিল্পীর প্রয়াসমাত্র নাই, অত্যন্ত সহজভাবে পরিহাসচ্ছলে যেন আঁকা। পৃথিবীকে ভোগ করিবার জন্য দেহীর জন্ম হয় ধরার বুকে, "আজকে শুধু এক বেলারই তরে আমরা দোঁহে অমর, দোঁহে অমর।" (যুগল) কিন্তু কে সে পৃথিবীকে ভোগ করিতে পারে? বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। বৃদ্ধ পঞ্চাশ ঊর্ধ্বে বনে গিয়া কী করিবে? বিশ্বপ্রকৃতির চিন্ময়লীলার সহিত তাহার যোগ কোথায়? "আমরা বলি বানপ্রস্থ যৌবনেতেই ভালো চলে"। "ফাগুন মাসে লগ্ন দেখে যুবারা যাক বনের পথে, রাত্রি জেগে সাধ্যসাধন, থাকুক রত কঠিন ব্রতে।" সৌন্দর্যভোগ তো যৌবনেরই ধর্ম (শাস্ত্র)। যৌবনের মন বিচারী নহে, চিরাচরিতের লৌহশৃঙ্খল যুগে যুগে তাহারা ভাঙিয়াছে, যৌবনই সগর্বে বলিতে পারে, "চিত্তদুয়ার মুক্ত ক'রে সাধুবুদ্ধি বহির্গতা, আজকে আমি কোনো মতেই বলব নাকো সত্য কথা।" সে বলে জীবনে যাহাই আসুক তাহাকে সহজভাবে স্বীকার করিব; মনের সঙ্গে 'বোঝাপড়া' করিয়া বলে "মনেরে আজ কহ, যে, ভালো মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে।" জগৎ বিচিত্র— এই বিচিত্রতাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলে অন্তরে বাহিরে সামঞ্জস্য প্রকাশ পায়; "তোমার মাপে হয়নি সবাই, তুমিও হওনা সবার মাপে" এই সহজ কথাটি বুঝিতে পারিলে পৃথিবীর অনেকখানি অশান্তিকে মন হইতে দূরে রাখা যায়। সেই সুরেই 'অচেনা' কবিতায় বলিলেন, "চাইনেরে মন চাইনে", মুখের মধ্যে যেটুকু পাই, যে হাসি আর যে কথাটাই, যে কলা আর যে ছলনাই, তাই নেরে, মন তাই নে।

বিশ্বের যে বিচিত্র রস নিত্য সর্বত্র সঞ্চারিত হইতেছে, কবি ছাড়া আর কে সেই সহজ গতিছন্দকে প্রকাশ করিতে

পারে? 'পুরস্কার' কবিতায় কবি এই ধরণীকে আর একটু সুন্দর করিবার জন্য অন্তরের আকুতি ব্যক্ত করিয়াছিলেন; পরবর্তীযুগের কতকগুলি নাটকে ঠাকুর্দা, সন্ন্যাসী প্রভৃতির চরিত্রে আমরা চিরযৌবন কবিকে পাই যিনি গাহিয়াছিলেন 'মোদের পাকবে না চুল গো' ইত্যাদি। ক্ষণিকার 'কবির বয়স' হইয়াছে, কেশে তাঁহার 'পাক ধরেছে বটে'; কিন্তু তিনি "পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো সবার আমি এক-বয়সী জেনো" বলিয়া সকলকে আশ্বাস দিতেছেন। তরুণ তরুণীরা যখন 'মিলিতে চায় দুরন্ত সংগীতে', তখন

কে তাদের মনের কথা লয়ে
বীণার তারে তুলবে প্রতিধ্বনি,
আমি যদি ভবের কূলে বসে
পরকালের ভালো মন্দ গনি।

গৃহত্যাগীর জন্য কে গান গাহিবে? সে কবি।

ত্রিভুবনের গোপন কথাখানি
কে জাগায়ে তুলবে তাহার মনে
আমি যদি মুক্তি নিয়ে
যুক্তি করি আপন গৃহকোণে।

কবি যে সবার সমান বয়সী এ কথা খুবই সত্য। শিশুর হইয়া শিশুর কবিতা, প্রেমিকের হইয়া প্রেমের গান, ধার্মিকের হইয়া ঈশ্বরের গুণানুকীর্তন, স্বাদেশিকের জন্য তেজোময়ী বাণী দান সবই তিনি সকল বয়সেরই জন্য করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেকের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার নিরুদ্ধ ভাবরাজিকে ভাষা দেন কবি, সুর দেন তিনি; সর্ব মানবের হৃদয়ে তিনি অমর। "সবাই মোরে করেন ডাকাডাকি, কখন শুনি পরকালের ডাক? সবার আমি সমান-বয়সী যে, চুলে আমার যত ধরুক পাক।"

ক্ষণিকার প্রত্যেকটি কবিতার স্বতন্ত্র সমালোচনা আমাদের গ্রন্থের বিষয়-বহির্ভূত। তবে একটি কথা মনে হয় যে, এই কাব্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের একটি অখণ্ড চিত্র ফুটিয়াছে। তাঁহার অতীত জীবনের শুরু হইতে ভাবরাজ্যে যেসব স্তর পর পর অতিক্রম করিয়া তিনি আসিয়াছেন কবিতাগুলির মধ্যে সবেরই চিহ্ন যেন রহিয়া গিয়াছে। যৌবনের চঞ্চলতা ধীরে ধীরে গ্রন্থের মাঝখানে স্বচ্ছ সরোবরের শান্তি-সৌন্দর্যের মধ্যে সমাহিত হইয়া আসিয়াছে। এই কবিতাগুলি প্রথমদিককার কবিতা হইতে গভীর ও স্নিগ্ধ। গ্রন্থের শেষ দিকে আসিয়া দেখি কবি বিগত জীবনের অনেক শ্রান্তি, অনেক ক্লান্তি, অনেক মোহকে বিসর্জন দিতে উদ্যত। 'কল্যাণী' কবিতায় নারীর নূতন মূর্তি গড়িয়া গাহিয়াছেন, "সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান আছে তোমার তরে।" 'অন্তরতম' কবিতাকে রুচিভেদে অর্থ করা যায়,— প্রেমের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য 'সবশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান' তাহা নারীর উদ্দেশে গীত হইয়াছে বলিতে পারা যায়, আবার জীবনদেবতার উদ্দেশে রচিত হইয়াছে বলিলেও কাব্যবোধের কোনো ক্ষতি হইবে না। 'সমাপ্তি' কবিতায় সত্যই কাব্যগুচ্ছ একটি সমে আসিয়া শান্ত হইয়াছে। "কখন যে পথ আপনি ফুরাল সন্ধ্যা হল যে কবে পিছনে চাহিয়া দেখিনু কখন চলিয়া গিয়াছে সবে।" কিন্তু সব শেষ হল যেখানে "সেখানে তুমি আর আমি একা।" অত্যন্ত লঘুভাবে সহজভাবে জীবন ও জগতকে দেখিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা সম্ভব হইল না, হইতে পারেও না। কাব্যের উৎস পরম বেদনার গুহামধ্যে; যাহাকে হাসির ছটার দ্বারা বাহিরে প্রকাশচেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার ভিতরে যে 'আঁখির জল' জমিয়াছিল! তাই 'সমাপ্তিতে' বলিতেছেন,—

চিহ্ন কি আছে শ্রান্ত নয়নে
অশ্রুজলের রেখা!
বিপুল পথের বিবিধ কাহিনী
আছে কি ললাটে লেখা।

এই বেদনার মাঝে ফিরিয়া পাইলেন জীবনদেবতাকে—

পথে যতদিন ছিনু, ততদিন
অনেকের সাথে দেখা
সবশেষ হল যেখানে সেথায়
তুমি আর আমি একা।

বারে বারে পাইয়া যাহাকে হারাইয়াছেন, নবীন করিয়া তাহাকে কবি যেন আজ পাইলেন। ক্ষণিকার প্রথম দিককার আপাত-লঘুতা এখন নাই, জীবন অচঞ্চল হইয়াছে, এ যেন একটি গভীর অধ্যাত্ম জীবনের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে প্রতীক্ষা, বিরাটের জন্য নৈবেদ্যের আয়োজন। যৌবনের কাছে শেস আরতি নিবেদন করিয়া কবি বিদায় লইলেন।

ক্ষণিকার কবিতাকে মোহিতচন্দ্র সেন তাঁহার সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থে' (১৩১০) লীলা নাম দিয়াছেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।—"ভালবাসা আপনাকে প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতায় কেবল সত্যকে নহে অলীককে, সংগত নহে অসংগতকে আশ্রয় করিয়া থাকে। স্নেহ আদর করিয়া সুন্দর মুখকে পোড়ার মুখী বলে, মা আদর করিয়া ছেলেকে দুষ্ট বলিয়া মারে, ছলনাপূর্বক ভৎর্সনা করে। সুন্দরকে সুন্দর বলিয়া যেন আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না, ভালবাসার ধনকে ভালবাসি বলিলে যেন ভাষায় কুলাইয়া উঠে না, সেইজন্য সত্যকে সত্য কথার দ্বারা প্রকাশ করা সম্বন্ধে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া ঠিক তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে হয়, তখন বেদনার অশ্রুকে হাস্যচ্ছটায়, গভীর কথাকে কৌতুক পরিহাসে এবং আদরকে কলহে পরিণত করিতে ইচ্ছা করে। প্রেমলীলার এই অঙ্গটি এই গ্রন্থাবলীর 'লীলা' [ক্ষণিকা] খণ্ডে পাঠকেরা পাইবেন। ইহা ছাড়া 'লীলা' [ক্ষণিকা]র মধ্যে আর একটি জিনিষ আছে— তাহা বিদ্রোহ। প্রতিকূলতার কাছে বেদনা স্পর্ধাপূর্বক আপনাকে বিরূপ মূর্তিতে প্রকাশ করিতেছে। 'মাতাল' যাহা বলিতেছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে, তাহা বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া গায়ের জোরের কথা। বিদ্রোহী অভিমান বলে, আমি সমাজসংগত ভব্যতার ধার ধারি না— বিদ্রোহী প্রেম বলে আমি ক্ষণকালের খেলামাত্র, আমি চিরস্থায়ী একনিষ্ঠতার ধার ধারি না—, একান্ত বেদনাকে স্পর্ধিত অত্যুক্তির মধ্যে গোপন করিয়া রাখিবার এই বিড়ম্বনা। এই সকল কথার যথার্থ তাৎপর্য গ্রহণ করিতে গেলে অনেক সময়ে ইহাদিগকে উল্টা করিয়া বুঝিতে হয়।"

'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে উৎসর্গ করেন। দুঃখের বিষয় উৎসর্গ পত্রখানি বহুকাল কবির প্রচলিত সংস্করণে ছিল না। পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :

ক্ষণিকারে দেখেছিলে ক্ষণিকবেশে কাঁচা খাতায়,
সাজিয়ে তারে এনে দিলেম ছাপা বইয়ের বাঁধা পাতায়।
আশা করি নিদেন পক্ষে দু'টা মাস কি এক বছর(ই)
হবে তোমার বিজনবাসে সিগারেটের সহচরী।
কতকটা তার ধোঁয়ার সঙ্গে স্বপ্নলোকে উড়ে যাবে ;
কতকটা কি অগ্নিকণায় ক্ষণে ক্ষণে দীপ্তি পাবে ?
কতকটা বা ছাইয়ের সঙ্গে আপনি খসে পড়বে ধুলোয় ;
তারপর সে ঝেঁটিয়ে নিয়ে বিদায় কোরো ভাঙা কুলোয়।

ক্ষণিকা সম্বন্ধে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিবে যদি আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের একখানি চিঠি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত না করি। চন্দ্রনাথের সহিত রবীন্দ্রনাথের বহুবার মসীযুদ্ধ হইয়াছে তথাচ রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বরাবর অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা এবং চন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে আন্তরিকভাবে স্নেহ করিতেন। এই পত্রখানি সেই স্নেহের নিদর্শন। তিনি কবিকে লিখিতেছেন,—"তোমার সহিত পথ চলিবার সামর্থ্য আমার নাই। তোমার গতি এতই দ্রুত এতই বিদ্যুৎবৎ। তোমার প্রতিভার পরিমাণ নাই— উহার বৈচিত্র্যও যেমন প্রভাও তেমনি। আমি তোমার প্রতিভার নিকট অভিভূত। কণিকা, কথা, কল্পনা, ক্ষণিকা বলিতে গেলে চারিমাসের মধ্যে চারিখানা—

পারিয়া উঠিব কেন? ... যে চারিখানার নাম করিলাম সকলগুলিই মিষ্ট হৃদয়স্পর্শী সুগভীর সুললিত (অনেকস্থলে) সূক্ষ্ম সুতীক্ষ্ম। কিন্তু ক্ষণিকায় বঙ্গের পল্লীজীবনের পল্লীপ্রকৃতির যে অনির্বচনীয় সৌরভ পাইলাম তাহাতে আমি পল্লীপ্রিয় পাড়াগেঁয়ে মুগ্ধ হইয়াছি। এ সৌরভ তোমার আর কোন কাব্যে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয় এ সৌরভ শিলাইদহজনিত। প্রকৃতির প্রাণের সৌরভ পল্লীতেই পাওয়া যায়। কোনটার কথা বলিব? অনেক-গুলাতে ঐ সৌরভ পাইয়াছি। কিন্তু কি জানি কেন, বিরহের সৌরভে বড়ই মজিয়াছি। তুমি যে উহা প্রত্যক্ষবৎ করিয়া দিয়াছ। তোমার প্রতিভার পরিমাণ হয় না।"

রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন পূর্বে মাত্র প্রিয়নাথ সেনকে ক্ষণিকা সম্বন্ধে কিছু লিখিবার জন্য অনুরোধ করেন; ইতিমধ্যে চন্দ্রনাথ বাবুর অযাচিত পত্র পাইয়া কবি এতই সুখী হইয়াছেন যে বন্ধুকে পত্রখানি আদ্যোপান্ত কপি করিয়া পাঠাইলেন।[১] প্রিয়নাথকে কবি লিখিতেছেন যে, ক্ষণিকার "ভাষা ছন্দ প্রভৃতি এতটা অধিক নতুন হয়েছে যে, যারা স্বাধীন রসগ্রাহী লোক নয়, তারা কিছুতেই ভেবে পাচ্চে না এটা তাদের ভালো লাগা উচিত কিনা, সুতরাং পনেরো আনা পাঠক ইতস্তত: করচে—আর যদি অধিককাল তাদের এই দ্বিধার মধ্যে ফেলে রাখা যায় তাহলে তারা চটেমটে বইটাকে গাল দিতে আরম্ভ করবে—একটা সমালোচনা পেলে তারা আশ্রয় পেয়ে বাঁচবে।"[২]

ক্ষণিকার সুরের মধ্যে যে কেবল বৈশিষ্ট্য ছিল তাহা নহে, উহার ছন্দ ও রীতির বৈশিষ্ট্যও বাংলায় নূতন। বহু বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "ক্ষণিকায় আমি প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রাকৃত বাংলা ভাষা ও প্রাকৃত বাংলা ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম। তখন সেই ভাষার শক্তি, বেগ ও সৌন্দর্য প্রথম স্পষ্ট করিয়া বুঝি। দেখিলাম এ ভাষা পাড়াগেঁয়ে টাট্টু ঘোড়ার মতো কেবলমাত্র গ্রাম্য ভাবের বাহন নয়, ইহার গতিশক্তি ও বাহনশক্তি কৃত্রিম পুঁথির ভাষার চেয়ে অনেক বেশী।"[৩] কবির এই উক্তি যে কত সত্য তাহা গত পঞ্চাশ বৎসরের বাংলা কবিতার বিচিত্র ছন্দ পরীক্ষার ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায়। সে আলোচনার ক্ষেত্র এ গ্রন্থ নহে।

ক্ষণিকার পরে

ক্ষণিকা রচনার পর্বটা খুব সংকীর্ণ—১৩০৭ সনের বৈশাখ হইতে আষাঢ়ের প্রথমার্ধের মধ্যে এই তিনমাস মাত্র। সময়টা শিলাইদহে বাসের পর্ব; স্ত্রীপুত্রকন্যা সব সেখানেই। শান্তিনিকেতনের ভাবী বিদ্যালয়ের অঙ্কুর গৃহের মধ্যে রোপিত হইয়াছে। ক্ষণিকার লেখা ছাড়া 'চিরকুমার সভা' ভারতীতে মাসে মাসে দিতে শুরু করিয়াছেন নূতন বৎসরের গোড়া হইতেই। দুই একটা প্রবন্ধ লেখেন যেমন 'কাব্যে উপেক্ষিতা।'

কাব্য জগৎ ও বাস্তব জগৎ কবিজীবনে ওতোপ্রোতভাবে মিশ্রিত। ক্ষণিকার কবিতা লেখা চলিতেছে, বই ছাপা শুরু হইয়াছে কলিকাতায়; কুষ্টিয়ায় ঠাকুরকোম্পানির বাণিজ্য এখনো আছে, প্রিয়নাথ সেনকে সুতার নমুনা আনিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছেন ও আখমাড়া কল সম্বন্ধে আলোচনার জন্য এবং মুকাবিলায় কথাবার্তা কহার জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ পাঠাইতেছেন।[৪] কবিতা লিখুন, ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল করুন, কিন্তু ঠাকুরকোম্পানির ব্যবসায়ের

১ প্রিয়নাথকে লিখিত পত্র মধ্যে উদ্ধৃত। ৩১ শ্রাবণ ১৩০৭। দ্র প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি পৃ ২৭৭-৭৯।

২ পত্র। ২৪ শ্রাবণ ১৩০৭। দ্র শনিবারের চিঠি ১৩৪৮ আশ্বিন।

৩ ভাষার কথা, সবুজপত্র ১৩২৩ চৈত্র। দ্র প্রবোধচন্দ্র সেন, ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ পৃ ২৩-২৫

৪ পত্রাবলী। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ জ্যৈষ্ঠ পৃ ৫৯৫। এই সময়ে হঠাৎ 'দীনদান' (২০ শ্রাবণ ১৩০৭) কবিতাটি যে কেন লিখিলেন বলিতে পারি না। এরূপ আখ্যানমূলক কবিতা আগে-পরে কোথায়ও নাই।

ঝুঁকি আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে পড়িয়াছে, তাহার জন্য মন মাঝে মাঝে উদ্‌ভ্রান্ত না হইয়া পারে না। প্রিয়নাথকে লিখিতেছেন কলিকাতায় মোটা সুদেও হাজার চল্লিশ টাকা ধার পাওয়া যায় কিনা।[১] কিন্তু এটা সাময়িক অশান্তি বলিয়া মনে হয়; কারণ দিন দুই পরে প্রিয়নাথকে যে চিঠি দেন তাহা হইতে জানিতে পারি যে, কবির মন সাহিত্যের মধ্যে পুনরায় বাসা বাঁধিয়াছে।

ক্ষণিকা প্রকাশের অব্যবহিত পরে কবির মন গল্প বলিবার জন্য ব্যাকুল হইল; এক প্রস্থ কবিতা লিখিবার পর বারেবারে তাঁহার সাহিত্যজীবনে গল্পের পালা শুরু হইতে দেখি। কল্পনার ও মননের অসীম ক্ষেত্ররচনার সুযোগ পান ইহার মধ্যে। এই সময়ে 'চোখের বালি'র প্রথম খসড়া করেন; প্রিয়নাথ সেনকে (২৬ শ্রাবণ ১৩০৭) একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে বিনোদিনীর 'সুদীর্ঘ কাহিনীটি' খাতার মধ্যে অসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। সেটিকে বাহির করিয়া কাটাকুটি আরম্ভ করিলেন এইসময়ে।

'চিরকুমার সভা' ছাড়া কয়েকটি ছোটো গল্প[২] এই সময়ে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। শুনিয়াছি বিলাত যাইবার পূর্বে জগদীশচন্দ্র কয়েক দিন শিলাইদহে বাস করিয়া যান; সেই সময়ে প্রতিদিন একটি করিয়া গল্প লিখিয়া জগদীশচন্দ্রের চিত্তবিনোদন করিতে হইত। সাময়িক পত্রিকার তাগিদে গল্প কয়টি প্রকাশিত হয়; কিন্তু প্রকাশের পূর্বে রচনাগুলির প্রতি যথোপযুক্ত দৃষ্টি যে দেন নাই, তাহা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে গল্পগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। 'উদ্ধার' গল্প সম্বন্ধে সাহিত্য-সম্পাদক যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাকে বিদ্বেষপূর্ণ সমালোচনা বলিয়া অগ্রাহ্য করা যায় না। তিনি লিখিয়াছিলেন, "রবীন্দ্রবাবুর গৌরী 'অমেঘবাহিনী বিদ্যুল্লতা'ই বটে, তাহার চকিত দীপ্তি নিমেষের জন্য চক্ষের উপর উজ্জ্বল হইয়া উঠে, কিন্তু তাহার সমস্তটা কখনই কল্পনার কারায় ধরিয়া রাখিতে পারা যায় না। গল্পটি নিতান্ত ক্ষুদ্র, গল্পের কঙ্কাল বলিলেও চলে। এই পঞ্জর-পিঞ্জরে তিনটি প্রাণী,...। অতি ক্ষুদ্র গল্পের সংকীর্ণ পরিসরে তিনজনের স্থান পর্যাপ্ত নয়। কবি কেবল রেখায় গল্পটি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে আখ্যান বস্তুর একটা অস্পষ্ট আভাসমাত্র অভিব্যক্ত হইয়াছে। ছায়ালোক সম্পাতে আর একটু পরিণত হইলে গল্পটি সম্পূর্ণ বিকশিত হইতে পারিত।" (সাহিত্য ১৩০৭ ভাদ্র পৃ ৬১৯) এই সময়ের রচিত কয়টি গল্প সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে, আমরা এই সত্যেই উপনীত হইব।

এই সময়ে জগদীশচন্দ্র তাঁহার আবিষ্কারসমূহ বিলাতে রয়েল সোসাইটির নিকট প্রমাণ করিবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন (শ্রাবণ ১৩০৭)। রবীন্দ্রনাথকে তিনি প্রায়ই পত্র দেন, রবীন্দ্রনাথ উত্তর লেখেন, দুইজনে তখন প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। লণ্ডন হইতে জগদীশচন্দ্র তাঁহার ভ্রমণকাহিনী ও বিজ্ঞানীদের সহিত আলাপ-আলোচনার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ পাঠান। জগদীশচন্দ্রের এক পত্রের[৩] উত্তরে লিখিতেছেন, "আপনি 'ক' বিন্দুতে কম্পমান, আমি 'খ' বিন্দুতে দিব্য নিশ্চেষ্ট নিরুদ্বিগ্ন হয়ে বসে আছি— আমার চারিদিকে আমন ধান এবং আখের ক্ষেত আসন্ন শরতের শিশিরাক্ত বাতাসে দোদুল্যমান। শুনে আশ্চর্য হবেন একখানা Sketch book নিয়ে বসে বসে ছবি আঁকচি। বলা বাহুল্য, সে ছবি আমি প্যারিস সেলোন-এর জন্যে তৈরী করচি নে, এবং কোন দেশের ন্যাশান্যাল গ্যালারী যে এগুলি স্বদেশের ট্যাক্স বাড়িয়ে সহসা কিনে নেবেন এরকম আশঙ্কা আমার মনে লেশমাত্র নেই। কিন্তু কুৎসিত ছেলের প্রতি মার যেমন অপূর্ব স্নেহ জন্মে তেমনি যে বিদ্যাটা ভালো আসে না সেইটের উপর অন্তরের একটা টান থাকে। সেই কারণে যখন

১ পত্র। ২৪ শ্রাবণ ১৩০৭। শনিবারের চিঠি ১৩৪৮ আশ্বিন।

২ এই গল্পগুলি হইতেছে—সদর-অন্দর (প্রদীপ ৪র্থ ভাগ ১৩০৭ আষাঢ়), উদ্ধার (ভারতী ১৩০৭ শ্রাবণ), দুর্বুদ্ধি (ভারতী ১৩০৭ ভাদ্র), ফেল (ভারতী ১৩০৭ আশ্বিন), শুভদৃষ্টি (প্রদীপ ৪র্থ ভাগ ১৩০৭ আশ্বিন)।

৩ জগদীশচন্দ্রের পত্র, ৩১ আগস্ট ১৯০০। প্রবাসী ১৩৩৩ আষাঢ়।

প্রতিজ্ঞা করলুম, এবারে ষোল আনা কুঁড়েমিতে মন দেব তখন ভেবে ভেবে এই ছবি আঁকাটা আবিষ্কার করা গেছে। এই সম্বন্ধে উন্নতি লাভ করবার একটা মস্ত বাধা হয়েছে এই যে, যত পেন্সিল চালাচ্ছি তার চেয়ে ঢের বেশী রবার চালাতে হচ্চে, সুতরাং ঐ রবার চালনাটাই অধিক অভ্যাস হয়ে যাচ্চে, অতএব মৃত র‍্যাফেল তাঁর কবরের মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে মরে থাকতে পারেন— আমার দ্বারা তাঁর যশের কোনো লাঘব হবে না।"[১]

পত্রশেষে ঝড়বৃষ্টির আভাস দেওয়া আছে, তাহা অল্প কয়েক দিনের মধ্যে ভীষণ সাইক্লোনে পরিণত হইল। প্রিয়নাথকে লিখিতেছেন, "আঃ কি দুর্যোগ! ক'দিন অবিশ্রাম ঝড় ও বৃষ্টি চলচে…। এই অবিশ্রাম দুর্যোগে চারিদিকের লোকসান আর তো দেখা যায় না। বড়ো বড়ো আখের ক্ষেত ভূমিশায়ী, শস্যক্ষেত প্লাবিত, কূলপ্লাবিনী নদী পুরাতন পল্লী এবং বৃদ্ধ ছায়াতরুগুলিকে গ্রাস করে চলেছে। কোনো দরবারে এর নালিশ নেই,… অন্ধ হাওয়া হাঁ হাঁ করে ছুটে আসচে, অন্ধ স্রোত নৃত্য করতে করতে কি করচে কিছুই জানে না…। কিন্তু এ ব্যাপারটি যে কি কারণে না-হলেই-নয় এবং না-হলে দূর দুরান্তর এবং কালকালান্তর পর্যন্ত তার কি ফল ফলত তা আমি কিছুই জানিনে, অতএব যতই ব্যথিত হই পীড়িত হই কারো নামে কোনো নালিশ আনব না এটা বলব না যে, আমরা যেটা চাচ্চি সেটা কেন হচ্চে না।…"[২]

কবির দিন কাটে নানাভাবে। ছেলেদের পড়াশুনার ব্যবস্থা দেখেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে; লরেন্স, জগদানন্দ রায় ও শিবধন বিদ্যার্ণবের সঙ্গে শিক্ষা বিষয়ক প্লানিং চলে। পত্রিকার দায় নাই বলিয়া লেখার তাগিদ কম, কেবল 'চিরকুমার সভা' নিয়মিত লিখিতে হয়। নিজের ইচ্ছায় বই পড়েন আনন্দের জন্য, অন্যের অনুরোধে বই পড়িতে হয় সমালোচনার জন্য। বন্ধুত্বের খাতিরে সমালোচনা করিতে গিয়া সত্য কথা বলা শক্ত, আবার শক্ত কথা না বলিলেও সাহিত্যের মর্যাদা রক্ষা করা হয় না। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'তপস্বিনী' সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য প্রিয়নাথকে লিখিলেন, বন্ধুবিচ্ছেদের ভয়েই বোধ হয় কোথাও প্রকাশ করিলেন না। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের এই উপন্যাসখানিকে বাংলাভাষায় বাস্তব সাহিত্য সৃষ্টির অন্যতম প্রাচীন প্রচেষ্টা বলিতে পারি। সাহিত্যে বাস্তবতা বা অলীকতা লইয়া আন্দোলন তখনও সাময়িক সাহিত্যে তেমন সুলভ হয় নাই; সেজন্য এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতটি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে; বোধ হয় বাস্তবতা সম্বন্ধে ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রাচীনতম আলোচনা। তিনি লিখিতেছেন, "নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের তপস্বিনী পড়ে দেখলুম। ঠিক হয়নি। স্পষ্ট দেখা যাচ্চে, বাংলা উপন্যাসে তিনি উন্মুক্ত Realism-এর অবতারণা করতে চাচ্চেন। তাতে আমি কিছুই আপত্তি করিনে। কিন্তু সেটা পারা চাই। যেমন নাচতে বসে ঘোমটা সাজে না, তেমনি এরকম বিষয় লিখতে বসে কিছু হাতে রাখা চলে না। সম্পূর্ণ নির্ভীক নগ্নতা ভালো, কিন্তু স্বল্প আবরণ রাখতে গেলেই আব্রু নষ্ট হয়। এ বইয়ে তা হয়েছে। গ্রন্থকার সাহসপূর্বক সব কথা পরিষ্কারভাবে শেষ পর্যন্ত বলতে পারেন নি, সেইজন্য তাঁর selfconscious ভাব প্রকাশিত হয়ে রচনাটাকে লজ্জিত করে তুলেছে। নগেন্দ্রবাবু তাঁর ঘটনা-বিন্যাসের স্বাভাবিক পরিণামের পূর্বেই হঠাৎ থেমে যাওয়াতে বোঝা যাচ্চে নিঃসংকোচ নিরাবরণ তাঁর লেখনীর পক্ষে সহজ নয়, ওটা তিনি জবরদস্তি করে করেচেন।… এসব জিনিস তিনি ছুঁতে ঘৃণা করেন অথচ নাড়তে প্রবৃত্ত হয়েছেন, সেইজন্যে সব কথা ভালো করে প্রকাশ করতেও পারেন নি।"[৩] এই ধরনের আরও দুই চারটা বইএর সমালোচনা পত্রযোগে প্রিয়নাথকে

১ পত্রাবলী, শিলাইদহ, ১ আশ্বিন [১৩০৭]। দ্র প্রবাসী ১৩৩৩ ফাল্গুন, পৃ ৬৩১।

২ পত্রাবলী শিলাইদহ ২১ সেপ ১৯০০। বি-ভা-প ১৩৫০ বৈশাখ পৃ ৫৯৫। এই সময়ে কলিকাতায় শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের ভ্রাতা শৈলেশচন্দ্র মজুমদার 'মজুমদার এজেন্সী' নাম দিয়া একটি পুস্তক প্রকাশের ব্যবসায় শুরু করেন। এই নূতন প্রকাশকরা কবির ছোটোগল্পের প্রথম সংগ্রহ মুদ্রিত করেন; 'গল্পগুচ্ছ' প্রথমাংশ (পৃ ৪৪৮) ১লা আশ্বিন ১৩০৭ সালে বাহির হয়।

৩ পত্রাবলী। ১২ই আশ্বিন ১৩০৭। বি-ভা-প ১৩৫০ বৈশাখ পৃ ৫৯৮।

জানান। পড়াশুনা করিতেছেন; টলস্টয়ের What is Art পাইয়াছেন; আনাতোল ফ্রাঁসের Le crime de Sylvester Bonnard মূলের সন্ধান করিতেছেন, এ ছাড়া অনেকগুলি ফরাসী উপন্যাসও এ সময়ে পড়েন।[১]

শিলাইদহের বাড়ির-স্কুলের পূজার ছুটি হইল; জগদানন্দ রায়, শিবধন বিদ্যার্ণব প্রভৃতিরা বাড়ি গেলেন; বিদ্যালয় খুলিবে অগ্রহায়ণের আরম্ভে। কবি বেশির ভাগ সময় থাকেন শিলাইদহে; কিন্তু অগ্রহায়ণের মাঝ হইতে তাঁহাকে দেখি কলিকাতায়। কলিকাতায় শীতের সময় উত্তেজনার অন্ত নাই; ত্রিপুরার মহারাজা কলিকাতায় আসিতেছেন; বাঙালী হিন্দু রাজা,—স্বাধীন ত্রিপুরার রাজা—আসিতেছেন; যথাযোগ্য তাঁহার সম্মান প্রদর্শনের জন্য অভিজাত কলিকাতা প্রস্তুত হইতে লাগিল। এই আয়োজন ব্যবস্থায় সংগীত সমাজ অগ্রণী হইলেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয় হয়; অভিনয় হইয়াছিল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পার্কস্ট্রীটস্থ বিশাল ভবনে। ত্রিপুরাধিপতির অভ্যর্থনার জন্য কবি একটি নূতন সংগীত রচনা করিয়া দেন; গানটি এই[২]—

রাজ-অধিরাজ তব ভালে জয় মালা,
ত্রিপুর-লক্ষ্মী বহে তব বরণ ডালা,
গুণী-রসিক সেবিত উদার তব দ্বারে,
মঙ্গল বিরাজিত বিচিত্র উপচারে;
তরুণ তব মুখচন্দ্র করুণ-রস ঢালা।
ক্ষীণ-জন ভয়-তারণ অভয় তব বাণী,
দীন-জন দুখহরণ-নিপুণ তব পাণি,
গুণ-অরুণ কিরণে তব সব ভুবন আলা।

বিসর্জন অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ রঘুপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সমসাময়িক এক দর্শক[৩] লিখিয়াছিলেন, "রবীন্দ্রবাবু রঘুপতি সাজিয়া এমন চমৎকার অভিনয় করিয়াছিলেন যে সঞ্জীবনী-সম্পাদক মহাশয় একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিয়া তাহার প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" এই বাক্যটি লিখিবার বিশেষ তাৎপর্য আছে, কারণ সঞ্জীবনী-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় অত্যন্ত নিষ্ঠাবান Puritan ব্রাহ্ম ছিলেন, লঘু সাহিত্য ও অভিনয়াদির ঘোর বিরোধী।; তৎসত্ত্বেও তিনি যে প্রশংসা করিয়াছিলেন, ইহাই অভিনয়ের উৎকর্ষের পরিচায়ক। অভিনয় হয়[৪] ১লা পৌষ ১৩০৭।

কিন্তু অভিনয় ছাড়াও বহু কাজ ও বিচিত্র দায়ের বোঝা রবীন্দ্রনাথকে বহন করিতে হয়। শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের উৎসবে এবার রবীন্দ্রনাথকে উপাসনা করিতে হইবে মহর্ষির ব্যবস্থা হইয়াছে। তাই স্ত্রীকে লিখিতেছেন "আজ তো পয়লা— এখনো ৭ই পৌষের লেখায় হাত দিতে পারিনি।" দিন দুই পরে পুনরায় লিখিতেছেন, "সমস্ত সকাল ধরে লোক সমাগম হয়েছিল— ভেবেছিলুম ৭ই পৌষের লেখাটা লিখব— তা আর লিখতে দিলে না।" তবে নৈবেদ্যের দুইটি কবিতা সেদিন লিখিয়াছেন বলিয়া মনটা তৃপ্ত।

অবশেষে 'ব্রহ্মমন্ত্র' নামে প্রবন্ধ[৫] লিখিয়া মহর্ষিকে শুনাইলেন। "তিনি দুই এক জায়গায় বাড়াতে বল্লেন— এখনি তাই বসতে হবে—আর ঘণ্টা খানেক মাত্র সময় আছে।" ৬ই পৌষ রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আসিলেন; পৌষ উৎসবে ব্রহ্মমন্দিরে তাঁহার সর্ব প্রথম ভাষণ দান করিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বরতত্ত্ব ও ধর্মমত এই প্রবন্ধে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল মাত্র, ইহাতে কবির নিজ ধর্মবোধের কোনো দীপ্তি পাই না।

'ব্রহ্মমন্ত্র' লিখিতে পারেন, কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথের সংসার তো করিতে হয়। সংসারের সুখদুঃখ, হর্ষবিষাদ, বিরহমিলন তাঁহাকে আর পাঁচজনের মতোই সুখী বা দুঃখী করে। স্ত্রীপুত্রাদির নিকট হইতে দূরে থাকিলে

১ দ্র পত্র। বি-ভ-প ১৩৫০ জ্যৈষ্ঠ পৃ ১৭৪।

২ ত্রিপুরা দরবারের শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বসু কর্তৃক প্রেরিত।

৩ অমৃতলাল গুপ্ত বাঁকিপুর হইতে লিখিয়াছিলেন। প্রবাসী ২য় বর্ষ ১৩০৯ পৃ ৩৫৫

৪ চিঠিপত্র ১মখণ্ড পৃ ৫৬। দ্র জগদীশচন্দ্রকে লিখিত পত্র ১২ ডিসেম্বর ১৯০০

৫ ব্রহ্মমন্ত্র... ৮ মাঘ ১৩০৭। দ্র র-র অচ ২ পৃ ১৮২-৯৪

রবীন্দ্রনাথের মন তাহাদের জন্য খুবই ব্যস্ত থাকে। স্ত্রীর চিঠি না পাইলে অত্যন্ত চিন্তিত হন, কিন্তু পাইলেও তেমন তৃপ্ত হন না। একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "তোমার সন্ধ্যা বেলাকার মনের ভাবে আমার কি কোন অধিকার নেই? আমি কি কেবল দিনের বেলাকার? সূর্য্য অস্ত গেলেই তোমার মনের থেকে আমার দৃষ্টিও অস্ত যাবে? তোমার যা মনে এসেছিল আমাকে কেন লিখে পাঠালে না? তোমার শেষের দু চার দিনের চিঠিতে আমার যেন কেমন একটা খটকা রয়ে গেছে। সেটা কি ঠিক analyze করে বলতে পারিনে কিন্তু একটা কিসের আচ্ছাদন আছে। যাক গে! হৃদয়ের সূক্ষ্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করাটা লাভজনক নয় মোটামুটি সাদাসিধে ভাবে সব গ্রহণ করাই ভাল।" দিন দুই তিন পরে পুনরায় লিখিতেছেন; "আমাকে সুখী করবার জন্যে তুমি বেশী কোন চেষ্টা কোরো না— আন্তরিক ভালবাসাই যথেষ্ট। অবশ্য তোমাতে আমাতে সকল কাজ ও সকল ভাবেই যদি যোগ থাকত খুব ভাল হত— কিন্তু সে কারো ইচ্ছায়ত্ত নয়। যদি তুমি আমার সঙ্গে সকল রকম বিষয়ে সকল রকম শিক্ষায় যোগ দিতে পার ত খুসি হই…। জীবনে দুজনে মিলে সকল বিষয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে অগ্রসর হওয়া সহজ হয়, তোমাকে কোন বিষয়ে আমি ছাড়িয়ে যেতে ইচ্ছা করিনে কিন্তু জোর করে তোমাকে পীড়ন করতে শঙ্কা হয়। সকলেরই স্বতন্ত্র রুচি অনুরাগ এবং অধিকারের বিষয় আছে— আমার ইচ্ছা ও অনুরাগের সঙ্গে তোমার সমস্ত প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ মেলাবার ক্ষমতা তোমার নিজের হাতে নেই— সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র খুঁৎ খুঁৎ না করে ভালবাসার দ্বারা যত্নের দ্বারা আমার জীবনকে মধুর— আমাকে অনাবশ্যক দুঃখ কষ্ট থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করলে সে চেষ্টা আমার পক্ষে বহুমূল্য হবে।"

কবিজীবনের এই সব আন্তরিক সংগ্রামের সংবাদ বাহিরের উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাবলী হইতে জানিতে পারা যায় না। নিরন্তর কর্মসাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে দিন কাটিলেও অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ হৃদয় থাকায় তিনি স্ত্রীকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনো কোনো কাজ করিতে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন নাই। মৃণালিনী দেবীর চরিত্র মধ্যে এমন একটি কর্ত্রীশক্তি ছিল যে রবীন্দ্রনাথ কখনো তাঁহাকে অবহেলা করিতে সাহসী হইতেন না। কলিকাতার সমাজ ও সংসার হইতে দূরে নির্জনে শিলাইদহবাসকে মৃণালিনী দেবী সম্পূর্ণ অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই; এবং কলিকাতায় কবিও তাঁহার সমস্ত শক্তিকে কবরিত করিয়া থাকিতে অনিচ্ছুক। অবশেষে কবিকেই শিলাইদহের বাস উঠাইতে হইল। ইহাই হইল আদর্শের সহিত বাস্তবের সংগ্রাম। কিছুকাল পরে শিলাইদহে আসিয়া তিনি স্ত্রীকে কলিকাতায় লিখিতেছেন, "অনেক রাত্রে জেগে উঠে জ্যোৎস্নায়...বসে বসে মনে পড়ছিল এই ছাদের উপর তোমার অনেক মর্ম্মান্তিক দুঃখের সন্ধ্যা ও রাত্রি কেটেছে— আমারও অনেক বেদনার স্মৃতি এই ছাদের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। যদি অনেক রাত্রে এই ছাদের জ্যোৎস্নায় তুমি বসতে তা হলে বোধ হয় আবার তোমার মন ধীরে ধীরে বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসত। আমি এখন সংসারকে এত মরীচিকার মত দেখি যে, কোন খেদের কথা মনে উঠলে পদ্মপত্রে জলের মত শীঘ্রই গড়িয়ে যায়…।"

যাহাই হউক যখন 'ভিতরে থাকে চোখের জল' তখন বাহিরে চলে 'হাসির ছটা'। সুতরাং সংসারের অসংখ্য কাজ যথানিয়ম করিতে হয়,— জমিদারি তদারক, কুষ্টিয়ার ব্যবসায় পরিদর্শন, ভারতীর জন্য উপন্যাস রচনা, জগদীশচন্দ্রের জন্য ত্রিপুরার নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ, সংগীত সমাজে বিসর্জনের অভিনয় পরিচালনা প্রভৃতি। কিন্তু বাহিরে যবে হাসির ছটা, ভিতরে থাকে চোখের জল! এই সবেরই মাঝে অন্তরের আকুল প্রার্থনা প্রকাশ পায় নৈবেদ্যের মধ্যে।

মাঘ মাসের গোড়ায় কবি কলিকাতায়; রাজধানীতে জীবন কিভাবে কাটে তাহার চিত্র পাই স্ত্রীর কাছে লেখা এক পত্র হইতে; কবি লিখিতেছেন, "সঙ্গীত সমাজওয়ালারা তাদের রিহার্সালের জন্যে আমাকে ধরতে আসবে সেখানে ৪টে পর্য্যন্ত চেঁচামেচি করে সুরেনকে দেখতে বালিগঞ্জে যাব সেখান থেকে সরলাকে তুলে নিয়ে এসে [মাঘোৎসবের]

গান শেখানোর ব্যাপারে রাত নয়টা বেজে যাবে, তারপরে সঙ্গীতসমাজে আবার রিহার্সালে রাত দুপুর হয়ে যাবে।”

সংগীত সমাজই রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে পাবলিকের কাছে সবপ্রথম পরিচিত করেন। রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম সাহিত্যরস উপভোগ করিবার মতো দর্শক ও শ্রোতা তখনো কম ; সংগীত-সমাজের পৃষ্ঠপোষকগণের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের নাটক লইয়া পরীক্ষা এই যুগের স্মরণীয় ঘটনা বলিতে হইবে। পরযুগে পাবলিক থিয়েটরে পেশাদার নটনটীরা তাঁহার নাটকগুলিকে আসরে নামাইবার চেষ্টা করিলে কবি সেগুলিকে থিয়েটর-উপযোগী করিবার জন্য অনেক অদল বদল করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহারা সেখানে জনাদর লাভ করে নাই। উহা এখনো রসজ্ঞ দর্শকের জন্যই অভিনীত হইয়া থাকে।

মাঘোৎসবাদির পর কবি শিলাইদহে ফিরিয়া যান ; এমন সময়ে এলাহাবাদ কায়স্থকলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে পত্র পাইলেন যে তিনি প্রবাসী বাঙালির মুখপত্র হিসাবে ‘প্রবাসী’ নামে একখানি মাসিকপত্র বাহির করিবেন, প্রথম সংখ্যার জন্য একটি কবিতার প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ ‘প্রবাসী’ নামে কবিতা লিখিয়া (১৩০৭ ফাল্গুন ৩) তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন। প্রবাসী ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় (১৩০৮ বৈশাখে) উহা প্রকাশিত হয়। বর্তমানে কবিতাটি ‘উৎসর্গ’ কবিতাগুচ্ছের অন্তর্গত— “সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া ; দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া।” কবিতাটি ‘নৈবেদ্য’ যুগে রচিত ; নৈবেদ্যের কবিতার মধ্যে যে একটি শান্ত আধ্যাত্মিক আকুতি প্রকাশ পাইতেছে, এই কবিতাটির মধ্যে তাহা আরও ব্যাপকভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। বিশ্বের অণু পরমাণুর সহিত দেহ ও মনের একান্ত অনুভূতির কথা এই কবিতার মধ্যে পাই,—

“তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা লুটায় আমার সামনে সে আমায় ডাকে এমন করিয়া কেন যে, কব তা কেমনে। মনে হয় যেন সে ধূলির তলে যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে, সে দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে বাহির হয়েছি ভ্রমণে। সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে লুটায় আমার সামনে।” এই ভাবটি রবীন্দ্রকাব্যে নূতন নহে।

কবিতাই লিখুন, আর ভারতীর মাসিক কিস্তিই সরবরাহ করুন, সংসার ও বিষয়সম্পত্তিকে অবহেলা করিতে পারেন না। কুষ্টিয়ার ব্যবসায় এখনো ধোঁয়াইয়া ধোঁয়াইয়া চলিতেছে, সম্পূর্ণরূপে মন হইতে উহাকে ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না, চালাইতেও সক্ষম হইতেছেন না। শিলাইদহ হইতে প্রিয়নাথ সেনকে লিখিতেছেন (১৩০৭ ফাল্গুন ১৫), “সম্প্রতি কলকাতার একজন মাড়োয়ারী baler এবং তার সঙ্গে একজন ইংরাজ আমাদের সঙ্গে অর্ধেক ভাগে আগামী বৎসর কাজ করতে চায়— যা কিছু খরিদ হবে তার অর্ধেক খরচ আমাদের অর্ধেক তাদের,— তারা নিজ ব্যয়ে কলকাতায় establishment চালাবে আমরা কুষ্টিয়ায় চালাব— আমরা খরিদ করব তারা বিক্রি করবে— লোকসানের সম্ভাবনা দেখলে অল্পের উপর দিয়েই কাজ বন্ধ করে দেব— এই রকম একটা প্রস্তাব চলচে— তুমি কি এরকম কাজে হাত দিতে ভরসা পাবে ?… এ বৎসর কালিগ্রামে ধানের কারবার সুবিধা নয় বলে আমরা তাতে হাত দিইনি, কেবল আখের কল পূর্ববৎ চলচে। তুমি যদি আখের কলে টাকা ফেলতে চাও আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু আখের কল সম্বন্ধে কতকগুলি চিন্তার কারণ আছে, তোমাকে আমাদের কোনো বিপদের মধ্যে জড়াতে ইচ্ছা করে না।”[১] মোট কথা কুষ্টিয়ার ব্যবসায়ের প্রতি মমতা এখনো আছে।

শিলাইদহ বাসটা কবির পক্ষে নির্বাসন ছিল না, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবরা যে প্রায়ই যাওয়াআসা করিতেন তাহার আভাস আমরা বহুবার পাইয়াছি। লোকেন পালিত, প্রমথ চৌধুরী, সুরেন ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র, যতীন বসু

১ বি-ভা-প ১৩৫০ জ্যৈষ্ঠ ৭১৫-১৬।

প্রভৃতি অনেকে আসেন, যান ; এবার আসিলেন নাটোরের রাজা জগদিন্দ্রনারায়ণ, দিনবারো থাকিয়া গেলেন।[১] আনন্দে, গানে, আলোচনায় দিনগুলি—বেশ কাটিয়া গেল। ইহারই মধ্যে কোন্ সময়ে যে কবি অন্তরটিকে শান্ত করিয়া ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করেন, কেহ জানিতে পারে না, 'নৈবেদ্যে'র কবিতাগুলি লিখিয়া যান। প্রিয়নাথকে ১৫ই ফাল্গুন লিখিতেছেন, "কিছুদিন থেকে অতিথি সৎকারের ব্যবস্থায় অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। প্রাতঃকাল থেকে রাত দেড়টা পর্যন্ত লেশমাত্র অবসর পাইনে গৃহিণীর অবস্থা ততোধিক।··· গোলমালের মধ্যেও গোটা ৯০ নৈবেদ্য লিখেচি। এখন অতিথির প্রতি মন দিতে যাই।"[২] এইখানেই রবীন্দ্রনাথ অপরাজেয় অদ্বিতীয়।

কিন্তু 'ভারতী'র 'চিরকুমার সভা'র শেষ কিস্তি এখনো লেখা হয় নাই, সম্পাদিকার ঘন ঘন তাগিদ আসিতেছে। অবশেষে একদিন "চিরকুমার সভা' শেষ[৩] করিয়া 'হাড়ে বাতাস' লাগাইলেন (১০ই চৈত্র)। চৈত্রমাসের শেষদিকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, 'চিরকুমার সভা'র শেষ দিকটায় কবি নিজেই বলিয়াছেন যে, "একেবারে full steam লাগানো গিয়েছিল।" চাপে পড়িয়া লেখেন, তাই রচনা সম্বন্ধে মনে তাঁহার অনেক সন্দেহ থাকে। তিনি লিখিতেছেন, "নিতান্ত অনিচ্ছা এবং নিরুদ্যমের মধ্যে কেবলমাত্র প্রতিজ্ঞার জোরে ওটা শেষ করেছি— মনের সে অবস্থায় কখনো রস নিঃসারণ হয় না। যেখানে থামা উচিত তা হয়েচে কিনা নিজে বুঝতে পারচি নে। একবার সমস্ত জিনিসটা একসঙ্গে ধরে দেখতে পারলে তবে ওর পরিমাণ সামঞ্জস্য বিচার করা যায়···। যখন বই বেরবে, তখন অনেকটা বদল হয়ে বেরবে।" (প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি পৃ ২৯০)

প্রিয়নাথকে আর একদিন লিখিতেছেন যে, 'বিনোদিনী' নামে উপন্যাসখানি "অন্ততঃ মাস তিনেকের মতো লেখা সংশোধন করে ঠিক করে লিখে রেখেছি, সুতরাং কতকটা রয়েবসে ওটা সমাধা করতে পারব।" সেই পত্রেই লিখিতেছেন, " 'ভারতী'র জন্য আজকালের মধ্যেই একটা লেখা শুরু করতে হবে— আজ খুব শক্ত তাগিদ এবং প্রলোভন এসেছে।" ভারতীর জন্য যাহা লিখিলেন তাহা হইতেছে 'নষ্টনীড়'। ১৩০৮ সাল হইতে বঙ্গদর্শনে 'চোখের বালি' ও ভারতীতে 'নষ্টনীড়' যুগপৎ প্রকাশিত হইতে থাকিল। যথাস্থানে উহাদের আলোচনা হইবে।

ভারতীতে চিরকুমার সভা ১৩০৮এর জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত চলে ; এই প্রহসন-উপন্যাসখানি হিতবাদী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী'র (১৩১১) মধ্যে সবপ্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৩১৪ সালে গদ্য গ্রন্থাবলীর (৮ম) অন্তর্গত হইয়া উহা যখন প্রকাশিত হয়, তখন উহার নামকরণ হয় 'প্রজাপতির নির্বন্ধ।' ১৩৩২ সালে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটিকে পরিবর্তিত করিয়া নাটকীয় রূপদান করেন ; এই নাটকের অনেক অংশ নূতন করিয়া লিখিত হয় এবং নূতন গানও যোগ করেন অনেকগুলি। তখন উহার নামকরণ পুনরায় হয় 'চিরকুমার সভা'।[৪]

'চিরকুমার সভা' উপন্যাসের ন্যায় শুরু হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রায়ই নাটকের রীতিতে লেখা। এই বৃহৎ গ্রন্থের উপাখ্যান অংশ অতি অল্প, সামান্য সূত্র ধরিয়া ঘটনাকে রঞ্জিত করা। লেখক পাত্রপাত্রীদের কথোপকথনের মধ্যে মধ্যে প্রচুর হাস্যরস আনিয়াছেন, কিন্তু সে হাস্যরস অত্যন্ত মার্জিতরুচি, সুশিক্ষিত, শ্রোতা বা পাঠক ব্যতীত সাধারণকে তৃপ্তি দান করিতে পারে কিনা সন্দেহ ; ভাষার subtlety ও শব্দচাতুর্য (punning) অত্যন্ত সূক্ষ্ম ; সেইজন্য কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন কবির মধ্যে humour হইতে wit বেশি। আমাদের সে সূক্ষ্ম আলোচনায় প্রয়োজন নাই ; তবে একথা সত্য, ঘটনা সমাবেশে যে হাস্যরস সৃষ্টি হয়, তাহা হইতে বাক্যরস

১ মানসী ১৮শ বর্ষ ১৩৩২ পৃ ৫২৩।

২ বি-ভা-প ১৩৫০ জ্যৈষ্ঠ ৭১৬।

৩ প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি। পত্র ১১ই চৈত্র ১৩০৭।

৪ রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড প্রজাপতির নির্বন্ধ [উপন্যাস] ; র-র ১৬শ খণ্ড চিরকুমার সভা। [নাটক]

দ্বারা যে হাস্যরস সৃষ্টি হয় তাহা intellectualদের নিকটই উপভোগ্য। রবীন্দ্রনাথের প্রহসনে তাহারই প্রাধান্য। রসিকতার মধ্যে কোথাও রূঢ়তা গ্রাম্যতা নাই, হাস্যমুখর বাক্যালাপ অনাবিল।

'চিরকুমার সভা' প্রহসন বলিয়া যে উহার সকল কথাই হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মতো তাহা নহে। এই গ্রন্থের মধ্যে কবি এমন অনেকগুলি মানুষের অবতারণা করিয়াছেন, যাঁহাদের চিনি বলিয়া মনে হয়; এমনকি নিজের অজ্ঞাতে লেখক নিজেও গ্রন্থমধ্যে ধরা দিয়াছেন। চন্দ্রমাধববাবুর মুখ দিয়া তিনি যেসব কথা প্রকাশ করিয়াছেন সেগুলি পাঠ করিলে 'জীবনস্মৃতি'-বর্ণিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ বসুর কথাই আমাদের মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠে। গ্রামের উন্নতিসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বিশেষ সব মত পোষণ করিতেন। চন্দ্রমাধববাবুর কথাবার্তার মধ্য দিয়া এসব মত প্রকাশ করিতে গিয়া লেখক অনেক সময়ে দীর্ঘ বক্তৃতাদির অবতারণা করিয়াছেন; তাহা স্বভাবতই গ্রন্থকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে।

ভারতীতে যখন এই উপন্যাস ধারাবাহিক প্রকাশ হইতেছে তখন প্রিয়নাথ সেন উহার চরিত্রগুলি সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। তাহারই উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "চন্দ্রমাধব বাবুর চরিত্রে অনেক মিশল্ আছে, তারমধ্যে কতক মেজদাদা কতক রাজনারায়ণ বসু এবং কতক আমার কল্পনা আছে। নির্মলাও তথৈবচ— এর মধ্যে সরলার অংশ অনেকটা আছে বটে। কিন্তু কোনো রিয়াল্ মানুষ প্রত্যহ আমাদের কাছে যে রকম প্রতীয়মান সে রকমভাবে কাব্যে স্থান পাবার যোগ্য নয়। কারণ রিয়াল্ মানুষকে যথার্থ ও সম্পূর্ণরূপে জানবার শক্তি আমাদের না থাকাতে আমরা তাকে এতদিন খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত এবং অনেক সময় পূর্বাপর বিরোধীভাবে না দেখে উপায় পাইনে— কাজেই তাকে নিয়ে কাব্যে কাজ চলে না। সুতরাং কাব্যে যদিচ কোনো কোনো রিয়াল্ লোকের আভাসমাত্র থাকে তবু তাকে সম্পূর্ণ করতে অন্তর বাহির নানা দিক থেকে নানা উপকরণ আহরণ করতে হয়। চন্দ্রমাধবে মেজদাদার শিশুবৎ স্বচ্ছসারল্যের ছায়া আছে এবং নির্মলায় সরলার কল্পনাপ্রবণ উদ্দীপ্ত কর্মোৎসাহ আছে কিন্তু উভয় চরিত্রেই অনেক জিনিস আছে যা তাঁদের কারোই নেই।"[১]

চিরকৌমার্যকে কবি পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শরূপে স্বীকার করেন নাই; তাঁহার মতে চিরকুমার জীবন অস্বাভাবিক ও অসামাজিক। আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি তখন স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে তাঁহার নূতন সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গঠনের আয়োজনে ব্রতী। শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে কৌমার্য ব্রত গ্রহণ করিয়া দেশসেবার জন্য একটি নবীন চেতনা দেখা দিয়াছিল। আমাদের মনে হয় এই প্রহসন রচনার সময় সন্ন্যাসের নূতন আন্দোলনকে বিদ্রূপ করিবার উদ্দেশ্য পরোক্ষভাবে লেখকের মনে ছিল। 'ক্ষণিকা'র কবিতায় "আমি হব না তাপস"·· ইত্যাদি পংক্তি এই আন্দোলনেরই প্রতিক্রিয়ায় রচিত। ক্ষণিকায় যাহা বিদ্রূপের সুরে বলেন, তাহা ঐ বৎসরেরই শেষভাগে দেখা দেয় "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়" বাণীরূপে। শ্রীশের জবানীতে যে নবীন সন্ন্যাসীর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহার মধ্যে সে-বৈরাগ্য নাই, যাহা সাধারণত লোকে সন্ন্যাসীর নিকট হইতে আশা করে। রবীন্দ্রনাথ 'শারদোৎসবে' 'প্রায়শ্চিত্তে' 'রাজায়' যে বৈরাগ্যের চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা লৌকিক সন্ন্যাসীর আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

চন্দ্রমাধববাবুর বক্তৃতা হইতে আমরা একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—সে অংশটি নিতান্ত প্রহসনের বিষয় নহে; কারণ পর যুগে স্বয়ং কবি ও দেশের অনেক নেতা এই সমস্যাগুলি পূরণের চেষ্টা করিয়াছেন।

"আমি বলছিলুম, সন্ন্যাসব্রতের জন্য আমাদের এখন থেকে প্রস্তুত হ'তে হবে। হঠাৎ একটা অপঘাত ঘটলে, কিংবা সাধারণ জ্বরজ্বালায়, কি রকম চিকিৎসা সে আমাদের শিক্ষা করতে হবে।" "আর একটি আমাদের করতে

১ পত্রাবলী। শিলাইদহ.২১ সেপ্টেম্বর ১৯০০ [১৩০০ আশ্বিন] বি-ভা-প ১৩৫০ বৈশাখ পৃ ৫২৬।

হচ্ছে—গোরুরগাড়ি, ঢেঁকি, তাঁত প্রভৃতি আমাদের দেশী অত্যাবশ্যক জিনিষগুলিকে একটু আধটু সংশোধন করে' যাতে কোনো অংশে তাদের শস্তা বা মজবুৎ বা বেশী উপযোগী করে' তুলতে পারি সে-চেষ্টা আমাদের করতে হবে।" "আমার মত এই, এই সমস্ত গ্রামের ব্যবহার্য্য সামান্য জিনিষগুলির যদি আমরা কোনো উন্নতি করতে পারি তাহ'লে তা'তে করে চাষাদের মনের মধ্যে যে রকম আন্দোলন হবে, বড় বড় সংস্কার কার্য্যেও তেমন হবে না। তাদের সেই চিরকেলে ঢেঁকি ঘানির কিছু পরিবর্তন করতে পারলে তবে তাদের সমস্ত মন সজাগ হয়ে উঠবে, পৃথিবী যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই এ তা'রা বুঝতে পারবে।"

"মানুষ অগ্রসর হচ্চে অথচ তা'র জিনিষপত্র পিছিয়ে থাকবে, এ কখনো হ'তেই পারে না। আমরা পড়েই আছি—ইংরেজ আমাদের কাঁধে ক'রে বহন করচে, তা'কে এগোনো বলে না। ছোটো-খাটো সামান্য গ্রাম্যজীবনযাত্রা পল্লীগ্রামের পঙ্কিল পথের মধ্যে বদ্ধ হ'য়ে অচল হ'য়ে আছে আমাদের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে সেই গোরুর গাড়ীর চাকা ঠেলতে হবে—কলের গাড়ীর চালক হবার দুরাশা এখন থাক।" ..."আমাদের একদল কুমারব্রত ধারণ করে দেশে দেশে বিচরণ করবেন, একদল কুমারব্রত ধারণ ক'রে এক জায়গায় বসে কাজ করবেন, আর একদল গৃহী নিজ নিজ রুচি ও সাধ্য অনুসারে একটা কোনো প্রয়োজনীয় কাজ অবলম্বন ক'রে দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করবেন। যাঁরা পর্যটক সম্প্রদায়-ভুক্ত হবেন, তাঁদের ম্যাপ প্রস্তুত, জরিপ, ভূতত্ত্ববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব প্রভৃতি শিখতে হবে,—তাঁরা যে-দেশে যাবেন সেখানকার সমস্ত তথ্য তন্ন তন্ন করে সংগ্রহ করবেন—তাহ'লেই ভারতবর্ষীয়দের দ্বারা ভারতবর্ষের যথার্থ বিবরণ লিপিবদ্ধ হবার ভিত্তি স্থাপিত হ'তে পারবে—হান্টার সাহেবের উপরেই নির্ভর করে কাটাতে হবে না।"

তথ্যসংগ্রহ সম্বন্ধে যে কথাগুলি চন্দ্রমাধব বাবু বলিলেন সেগুলি নাটকের নায়কের মুখের কথামাত্র নহে। কারণ বহুবার রবীন্দ্রনাথ তথ্যসংগ্রহের জন্য ছাত্র ও যুবকবর্গকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

প্রহসনটিতে কবি চিরকৌমার্যের ব্যর্থতাই দেখাইয়াছেন; এবং শেষকালে নরনারীর মিলনের দ্বারা সংসারের মধ্যে শান্তি এবং জীবনের মধ্যে synthesis আনিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রহসনে যে কয়টি চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদের অনেকেই তাঁহার অন্যান্য উপন্যাস নাটকের মধ্যে নানাভাবে দেখা দিয়াছে। চন্দ্রমাধব বাবুর শান্ত সমাহিত জীবনাদর্শ পরেশ বাবু, জ্যেঠামশায়ের মধ্যে ফুটিয়াছে; নির্মলা ললিতার মধ্যে দেখা দিয়াছে। রসিক একটি অদ্ভুত সৃষ্টি; ইনি যেন 'শারদোৎসবের' ও 'রাজা'র ঠাকুর্দারূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এই উপন্যাসখানির মধ্যে কবি বহু সংস্কৃত শ্লোক বাংলায় পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন।[১]

কবি ও বিজ্ঞানী

রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হইতেছে এই যুগের একটি বিশেষ ঘটনা, সাহিত্যিকের বিজ্ঞানী বন্ধুলাভ ও বিজ্ঞানীর সাহিত্যিক বন্ধু লাভ। জগদীশচন্দ্রের সহিত কবির পরিচয় কবে হয় আমরা জানি না, তবে ঘনিষ্ঠতা হয় ১৩০৪ হইতে। বিলাত হইতে জগদীশচন্দ্র লিখিতেছেন (২ নভে ১৯০০) "তিন বৎসর পূর্বে আমি তোমার নিকট একপ্রকার অপরিচিত ছিলাম। তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ডাকিলে। তারপর একটি একটি করিয়া তোমাদের অনেকের স্নেহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলাম।"[২] কবি বা বিজ্ঞানী কেহই তখনো খ্যাতির চূড়ায় উঠেন নাই। কবির ভাষায় কবি

১ ক্ষিতিমোহন সেন, বেদমন্ত্র রসিক রবীন্দ্রনাথ। বি-ভা-প ১৩৫০ বৈশাখ ৬০১-৮।

২ ১৭ কার্তিক ১৩০৭ প্রবাসী ১৩৩৩, আষাঢ় পৃ ৪১২।

"পূর্ব উদয়াচলের ছায়ার দিকটা থেকেই ঢালু চড়াই পথে যাত্রা করে চলেছেন, কীর্তিসূর্য আপন সহস্র কিরণ দিয়ে তাঁর সফলতাকে দীপ্যমান করে তোলে নি।"

জগদীশচন্দ্র বিলাত হইতে ১৮৮৪ সালে ফিরিয়া আসিবার পর কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, তখন তাঁহার বয়স ২৬ বৎসর মাত্র। তারপর দশ বৎসর নিরন্তর পরিশ্রমের ফলে বহু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। এদেশ হইতে বিদেশে সেইসব গবেষণার জন্য মান পাইয়াছিলেন বেশি। কারণ এদেশে তখনো শিক্ষাবিভাগের ইংরেজ অধ্যক্ষেরা বা গভর্মেণ্ট-তরফের শিক্ষাপরিচালকগণ দেশীয় অধ্যাপকদের পক্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণাদি সম্ভবপর বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহাদের মতে দেশীয় অধ্যাপকদিগকে গবেষণার জন্য কোনোপ্রকার সুযোগ-সুবিধা বা অবসর দান করাটা সরকারী অর্থের অপব্যয়; তাঁহাদের বিশ্বাস অধ্যাপক নিযুক্ত হয় অধ্যাপনার জন্য, অধ্যয়নের জন্য নহে। জগদীশচন্দ্রই সেই ভুল ভাঙিয়া দিলেন। কিন্তু কী অপমান ও উপেক্ষার মধ্যে তাঁহাকে এই কার্য সমাধান করিতে হয়, আচার্যের জীবনচরিত-পাঠকগণ ব্যতীত আর কাহারো নিকট সেসব তথ্য বিদিত নহে। জীবনের এই সংগ্রামের সময় জগদীশচন্দ্রের প্রধানতম সহায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সংগ্রামকে কেন্দ্র করিয়া উভয় বন্ধুর মধ্যে যেসব পত্র বিনিময় হইত, তাহার কিছু মহাকালের নিষ্পেষণ হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

জগদীশচন্দ্র যখন দ্বিতীয়বার গবেষণার জন্য বিদেশে ছিলেন (১৮৯৪-৯৭), সেই সময় আচার্যের প্রতিভার দীপ্তি রবীন্দ্রনাথকে মোহিত করে এবং তাহারই স্মরণে 'কল্পনা'র বিখ্যাত কবিতা 'জগদীশচন্দ্র' লেখেন। তিনি বিলাতে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন যে কোনো সময়ে "আপনার সঙ্গে ভ্রমণ করে আপনার জীবনচরিতের একটা অধ্যায়ের মধ্যে ফাঁকি দিয়ে স্থান পেতে ইচ্ছা করি।" রবিকে প্রকাশের জন্য কোনো আলোকের প্রয়োজন হয় না, রবি স্বয়ংপ্রকাশ, একথা তখনো রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বুঝিতে পারেন নাই।

১৮৯৭ এ জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরিলেন ও তিনবৎসর পর পুনরায় দুই বৎসরের জন্য বিদেশ যান। দেশে বাসকালে তিনি কয়েকবার শিলাইদহে যান; কবি তাঁহার বিজ্ঞানী বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ 'কথা' কাব্যগ্রন্থখানি তাঁহার নামে উৎসর্গ করেন (অগ্রহায়ণ ১৩০৬)।

১৯০০ জুলাই হইতে ১৯০২ অক্টোবর বা ১৩০৭ সালের আষাঢ় হইতে ১৩০৯এর আশ্বিন পর্যন্ত সময়টি জগদীশচন্দ্রের তৃতীয়বার বিলাত প্রবাসকাল। বিচিত্র সংগ্রামে পূর্ণ এই পর্বটি। য়ুরোপে ও বিশেষভাবে ইংলণ্ডে তাঁহার গবেষণা ও প্রতিভা স্বীকৃত হইবার অন্তরায় ছিল অনেক, পদে পদে অবিশ্বাস পদে পদে লাঞ্ছনা। ইহার উপর বঙ্গীয় সরকারের শিক্ষা-বিভাগ তাঁহাকে ছুটি দিতে অসম্মত হইলেন। তাঁহার জীবনের এই অগ্নিপরীক্ষা সময়ে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ-বাণী ও তাঁহার অকৃত্রিম সৌহার্দ তাঁহাকে কর্মে অটল রাখিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "তুমি কি আমাদের মত লোকের কাছ হইতে বলের বা উৎসাহের অপেক্ষা রাখ?...নিরাসক্ত ভারতবর্ষের অবিচলিত স্থৈর্য্য তোমাকে তোমার কর্মের মধ্যে অনায়াসে রক্ষা করুক।...তুমি ফিরিয়া আসিলে আমাদের যজ্ঞ সমাধা হইবে। তুমি এখানে আসিয়া তপস্বী হইয়া নিভৃতে তোমার শিষ্যদিগকে জ্ঞানের দুর্গম দুর্গের গোপন পথ সন্ধান করিতে শিখাইয়া দিবে, এই আমি আশা করিয়া আছি। বিদেশী আমাদিগকে জ্ঞানের অগ্নি যেটুকু দেয় তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী ধোঁয়া দিয়া থাকে— তাহাতে যে কেবল আমাদের অন্ধকার বাড়ে তাহা নহে, আমাদের অন্ধতাও বাড়িয়া যায়, আমাদের দৃষ্টি পীড়িত হয়। তোমার কাছে জ্ঞানের পন্থা ভিক্ষা করিতেছি— আর কোন পথ নহে— তপস্যার সাধনার পথ আমাদের। আমরা জগৎকে অনেক জিনিষ দান করিয়াছি, কিন্তু সে-কথা কাহারো মনে নাই— আর একবার আমাদিগকে গুরুর বেদীতে আরোহণ করিতে হইবে— নহিলে মাথা তুলিবার আর কোনো উপায় নাই।"

বাংলা গভর্মেণ্ট জগদীশচন্দ্রকে বিলাতে দীর্ঘকাল গবেষণা-কার্য করিবার জন্য ছুটি মঞ্জুর না করায় সমস্যা জটিল

হইয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথ সেই কথা উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন, "গভর্মেণ্ট যদি তোমাকে ছুটি দিতে সম্মত না হয়, তুমি কি বিনা বেতনে ছুটি লইতে অধিকারী নও? যদি সে সম্ভাবনা থাকে তবে তোমার সেই ক্ষতিপূরণের জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করিতে পারি। যেমন করিয়া হৌক তোমার কার্য অসম্পন্ন রাখিয়া ফিরিয়া আসিও না। তুমি তোমার কর্মের ক্ষতি করিও না, যাহাতে তোমার অর্থের ক্ষতি না হয়, সে-ভার আমি লইব।"[১] কত বড়ো ভরসা দিয়া রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে উৎসাহিত করিলেন।

অপরদিকে জগদীশচন্দ্রও তাঁহার সাহিত্যিক বন্ধুকে ইংরেজমহলে পরিচিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রচনা ইংরেজিতে অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্বন্ধে কবির প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনিই। তিনি বিলাত হইতে লিখিতেছেন, "তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে আমি তাহা হইতে দিব না। তুমি তোমার কবিতাগুলি কেন এরূপ ভাষায় লিখ যাহাতে অন্য কোন ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব? কিন্তু তোমার গল্পগুলি এদেশে প্রকাশ করিব।"…"লোকেনকে ধরিয়া translation করাইতে পার না? আমি তাহাকে অনেক অনুনয় করিয়া লিখিয়াছি।"[২] কয়েকদিন পরে পুনরায় লিখিতেছেন, "তোমাকে যশোমণ্ডিত দেখিতে চাই। তুমি পল্লীগ্রামে আর থাকিতে পারিবে না। তোমার লেখা তরজমা করিয়া এ দেশীয় বন্ধুদিগকে শুনাইয়া থাকি, তাঁহারা অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন না। তবে কি করিয়া publish করিতে হইবে, এখনও জানি না।"[৩]

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিচিত্র কর্মের মধ্যে জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ রাখেন; জগদীশের রচিত প্রবন্ধ ও তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মতামত এবং আলোচনা তিনি নিয়মিত পড়েন। য়ুরোপের বিজ্ঞানমন্দিরে উপস্থিত হইয়া যে কোনো ভারতীয় তথাকার বিজ্ঞানীদের সমক্ষে বক্তৃতা করিবেন— ইহা গর্বান্ধ ইংরেজের পক্ষে কল্পনা করা এবং সহ্য করা অসম্ভব। কিন্তু যেদিন জগদীশ জড়ের সজীবতা সম্বন্ধে তত্ত্বটি পরীক্ষার দ্বারা রয়েল সোসাইটিতে প্রমাণিত করিলেন সেদিন সত্যই বাঙালী তথা ভারতীয়দের পক্ষে একটি স্মরণীয় দিন। রবীন্দ্রনাথ বন্ধুর সাফল্যে গর্ব অনুভব করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে 'জগদীশচন্দ্র বসু' শীর্ষক কবিতাটি লিখিয়া বিলাতে পাঠাইয়া দিলেন।[৪]

ভারতের কোন বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি
হে আর্য আচার্য জগদীশ। কী অদৃশ্য তপোভূমি
বিরচিলে এ পাষাণ-নগরীর শুষ্ক ধূলিতলে?

বাংলাভাষায় জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথই লেখেন (বঙ্গদর্শন ১৩০৮ শ্রাবণ)। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া জগদীশ খুবই বিস্মিত হন; আশ্চর্য নৈপুণ্যের সহিত কবি হইয়া তিনি এই দুরূহ বৈজ্ঞানিক বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া লিখিলেন।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি এদিকে বিলাতে গবেষণার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন জগদীশচন্দ্রের সে সন্ধান ছিল না; সেই গবেষণা-কার্য সফল করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরাধিপতি রাধাকিশোরের শরণাপন্ন হইলেন। মহারাজকে লিখিতেছেন, "আমি যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পরের অবিবেচনা দোষে ঋণজালে আপাদমস্তক জড়িত

১ জগদীশচন্দ্রের পত্রাবলী ১২ ডিসেম্বর [১৯০০। ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৭] প্রবাসী ১৩৩৩ ফাল্গুন পৃ ৬৩।

২ পত্র। লণ্ডন ২ নভেম্বর ১৯০০। প্রবাসী ১৩৩৩ আষাঢ় পৃ ৪১৩

৩ পত্র। ২৬ নভেম্বর ১৯০০। ঐ

৪ বঙ্গদর্শন ১ম বর্ষ ১৩০৮ আষাঢ়। ৬ জুলাই ১৯০১ জগদীশচন্দ্র এই কবিতার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন।

হইয়া না থাকিতাম, তবে জগদীশবাবুর জন্য আমি কাহারো দ্বারে দণ্ডায়মান হইতাম না। আমি একাকী তাঁহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিতাম।"[১] এই অর্থের জন্য অবশেষে রবীন্দ্রনাথ মহারাজ সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন (১৩০৮ কার্তিক)। মহারাজ কবি ও বিজ্ঞানীর সম্মান রক্ষা করিয়া দশ সহস্র মুদ্রা কবির হস্তে সমর্পণ করিলেন। ত্রিপুরা দরবারে এই অর্থ ভিক্ষা করিতে গিয়া কবিকে পারিষদমণ্ডলীর নিকট যে নীরব লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় তাহা তিনি কখনো বিস্মৃত হন নাই। তিনি কর্নেল মহিমচন্দ্র ঠাকুরকে লিখিতেছেন,—"কেবল জগদীশ বাবুর কার্যে আমি মান অপমান অভিমান কিছুই মনে স্থান দিতে পারি না— লোকে আমাকে যাহাই বলুক এবং যতই বাধা পাই না কেন তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত ভারমুক্ত করিতে পারিলে আমি কৃতার্থ হইব— ইহা কেবল বন্ধুত্বের কার্য নহে, স্বদেশের কার্য। সুতরাং ভিক্ষুভাবে আমি এবার অসংকোচে মহারাজের দ্বারে দাঁড়াইব।"[২] জগদীশচন্দ্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের এই ঘনিষ্ঠতার নিদর্শন আরও পরে দেখিতে পাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'খেয়া' কাব্যগুচ্ছ তাঁহার বিজ্ঞানী বন্ধুকে উপহার দেন (আষাঢ় ১৩১৩)। উৎসর্গে লিখিয়াছিলেন—

এ যে আমার লজ্জাবতী লতা।
কী পেয়েছে আকাশ হতে,
কী এসেছে বায়ুর স্রোতে,
পাতার ভাঁজে লুকিয়ে আছে
সে যে প্রাণের কথা।
যত্নভরে খুঁজে খুঁজে
তোমায় নিতে হবে বুঝে,
ভেঙে দিতে হবে যে তার
নীরব ব্যাকুলতা।
আমার লজ্জাবতী লতা।

কবি ও রাজা

অন্তর-জীবনের গভীরতার সঙ্গে চলিতেছে কর্মজীবনের ব্যাপ্তি। কবির কাব্যজীবনের বন্ধু ছিলেন প্রিয়নাথ সেন, লোকেন পালিত, আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতি। ক্রমে জীবন যতই জটিল, কর্ম যতই বিচিত্র হইতেছে, নূতন নূতন মানুষ রবিকক্ষে জ্যোতিষ্ককণার ন্যায় প্রবেশ করিতেছে। জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতি বহু মনীষী ও মনস্বিনীদের সহিত বিচিত্র কর্মসূত্রে বা ভাবসূত্রে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হইতেছে। এখানে আমরা কেবলমাত্র ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের সহিত কবির পরিচয়কাহিনী বিবৃত করিব। ত্রিপুরার পূর্বতন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের কথা আমরা পূর্বে বর্ণিয়াছি।

বীরচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যুর পর রাধাকিশোর মাণিক্য রাজা হইলে তাঁহার সহিত পূর্বের সামান্য পরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। যুবরাজ-জীবনে একদা কলিকাতায় পিতার দরবারে রাধাকিশোরের সহিত কবির ক্ষণকালের সাক্ষাৎ হয়; কিন্তু সেই মুহূর্তের দর্শনেই একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। যুবরাজী আমলে নানা রাজনৈতিক কারণে রাধাকিশোর মাণিক্য নিজ রাজধানীর বাহিরে কাহারো সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পান নাই। রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচয় হওয়ায় তিনি শুধু তাঁহাকেই বন্ধুরূপে পাইলেন তাহা নহে, তিনি বাংলাদেশের বহু গুণী জ্ঞানীর পরিচয় লাভ করিলেন; কলিকাতার শিক্ষিত অভিজাত সমাজের সহিত তাঁহার পরিচয় ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষেও

১ ২৪ শ্রাবণ ১৩০৮। বি-ভা-প ১ম বর্ষ ১৩৪৯ আশ্বিন পৃ ১৬৯।

২ পূর্বাশা রবীন্দ্রস্মৃতি সংখ্যা ১৩৪৮ পৃ ১১১।

কল্যাণকর হইল। রাধাকিশোর মাণিক্য রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে বীরচন্দ্র মাণিক্যের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন কার্সিয়ঙে, দার্জিলিঙে; কলিকাতায় বহুবার সাক্ষাৎ হয় তাঁহার সঙ্গে। কিন্তু ত্রিপুরার রাজধানীতে কখনো যান নাই। "তখন বসন্তকাল রাজধানীর উত্তরভাগে পাহাড়ের উপর কুঞ্জবনের বসন্তোৎসবে কবি সম্মেলনের ঘটা, রাজা প্রজার সমব্যবহার, কবি রবীন্দ্রনাথের যুগপৎ আনন্দ এবং বিস্ময় উৎপাদন করিল।" আমাদের মনে হয় এই বসন্তোৎসবে স্মৃতি বহন করে 'কাহিনী' কাব্যগুচ্ছের উৎসর্গপত্র (২০ ফাল্গুন ১৩০৬)।

১৩০৭ সালের শীতকালে মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য কলিকাতায় আসিলেন, ইতিপূর্বে আসিয়াছিলেন যুবরাজরূপে। কলিকাতার অভিজাত হিন্দুরা তাঁহার যোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন; সংগীতসমাজ ও রবীন্দ্রনাথই এই বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে যে 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয় হয়, তাহাতে রাধাকিশোর ছিলেন সম্মানার্হ অতিথি; রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উদ্দেশে বিশেষ সংবর্ধনাসংগীত রচনা করেন; সে-সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।

এই সময়ে বিলাতে অর্থাভাবে জগদীশচন্দ্রের গবেষণাকার্য বন্ধ হইবার উপক্রম হয়; রবীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় ও অক্লান্ত চেষ্টায় তিনি কিভাবে ত্রিপুরাধিপতির অর্থ সাহায্য লাভ করেন, তাহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি।

যাহাই হউক, ইহার পর হইতে কবির সহিত রাজার ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রাধাকিশোর মাণিক্য নানা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন; রাজপুত্রদের শিক্ষা, রাজ্যশাসন, মন্ত্রীনিয়োগ প্রভৃতি ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রগত ব্যাপারে তিনি প্রায়ই কবির সহায়তা কামনা করিতেন। কিন্তু অনেক সময়ে রাজপারিষদবর্গের ও ইংরেজ সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে তাঁহার বহু সদ্‌ইচ্ছা কার্যে পরিণত হইতে পারিত না, তাই তিনি কবিকে বলিতেন, "রবিবাবু, আপনি আমাকে আমার হাত হইতে রক্ষা করিবেন।"

মহারাজের প্রধান সমস্যা হইল রাজকুমারদের শিক্ষা লইয়া। তৎকালীন আগরতলার নৈতিক আবহাওয়া উচ্চাঙ্গ জীবন যাপনের পক্ষে অনুকূল ছিল না, অথচ রাজকুমারদের জন্য গভর্মেণ্টনিয়ন্ত্রিত বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষা ভারতীয় রাজধর্মআদর্শের পরিপন্থী। এই জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়া তিনি রবীন্দ্রনাথেরই শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহারই উপর শিক্ষকাদি সংগ্রহের ভার অর্পণ করিলেন। এদিকে যুবরাজদের শিক্ষাব্যবস্থা লইয়া তৎকালীন বড়লাট লর্ড কর্জন অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন; তাঁহার একান্ত ইচ্ছা আজমীড়ের মেয়ো কলেজে য়ুরোপীয় অভিভাবকদের হস্তে 'রাজোচিত' শিক্ষালাভ করিয়া কুমারগণ 'মানুষ' হন।

রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ চাহিলে তিনি বলিলেন, এবিষয়ে সর্বোত্তম উপদেশ পাওয়া যাইবে কোচবিহারের মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের নিকট হইতে। ইতিপূর্বে নানা কারণে এই দুই দেশীয় বাঙালী রাজাদের মধ্যে সাক্ষাৎকারের সুযোগ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় দার্জিলিঙে উভয় নৃপতির মধ্যে সাক্ষাৎ হয়; সাক্ষাৎকারের সময় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই, বিশেষ কাজে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হয়। এই সূত্রে দুই মহারাজার মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় হয়। নৃপেন্দ্রনারায়ণের পরামর্শে বিলাত হইতে উপযুক্ত শিক্ষক আনাইয়া গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করাই ঠিক হইল। কিন্তু এই শিক্ষক নির্বাচনের ব্যবস্থাভার রবীন্দ্রনাথের উপরই মহারাজ অর্পণ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিলাতপ্রবাসী বন্ধু জগদীশচন্দ্রকে শিক্ষক সন্ধানের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। জগদীশচন্দ্র এই সংবাদ পাইয়া লিখিয়াছিলেন যে রাজ্যমধ্যে খাল কাটিয়া কুমীর আনিবার প্রয়োজন কী। তিনি ইংরেজশিক্ষক নিয়োগের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ইংরেজ শিক্ষক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন একেবারে সংস্কারশূন্য ছিল না, কারণ নিজ পুত্রকন্যাদের জন্য তিনি লরেন্সকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

কোচবিহারের মহারাজার সহিত তিনি কেন ত্রিপুরার মহারাজার পরিচয় করাইয়া দেন তাহা একখানি পত্রে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। "দুই মহারাজার মধ্যে বন্ধুত্ব হইলে মন্ত্রণাদি দ্বারা উভয়ে বললাভ করিবেন। ··· রাজকার্য্য সম্বন্ধে গভর্মেণ্টের সহিত কোন গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত হইলে নিঃস্বার্থ, নিরপেক্ষ ও মহারাজের সমশ্রেণীর ব্যক্তিদের [Peers] সহিত পরামর্শযোগে মহারাজের সেই অভাব মোচন হইবে কল্পনা করিয়া আমি আশ্বস্ত আছি।"[১]

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের উপর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদনের ভার আসিয়া পড়ে। ১৩০৮এর জ্যৈষ্ঠমাসে কয়েকদিনের জন্য দার্জিলিঙ যান; সেখান হইতে বিলাতে জগদীশচন্দ্রকে জানাইতেছেন যে, "মহারাজও এই পত্রটিকে আশ্রয় দান করিয়াছেন।" অর্থাৎ ইহার পরিচালন ব্যাপারে অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন।[২] কিন্তু রাজ-ইচ্ছা ও রাজকার্যের মধ্যে ব্যবধান বিস্তর, বাধাও দুস্তর। 'বঙ্গদর্শন' সম্বন্ধে মহারাজার আশ্বাস পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজানুগৃহীত পার্ষদদের তাহা মনঃপূত হয় নাই। শিলাইদহ হইতে (১৩০৮ আষাঢ়) একখানি পত্রে মহিমচন্দ্র ঠাকুরকে লিখিতেছেন, "বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে যদি তোমাদের মনে লেশমাত্র দ্বিধা থাকে আমাকে জানাইতে সঙ্কোচ করিয়ো না, ··· আমি মহারাজকে কোন বিষয়ে লেশমাত্র সঙ্কটে ফেলিতে চাহি না। তাঁহার সুপ্রসন্ন সৌহার্দ্দই আমি চাই; আর সমস্ত তুচ্ছ জ্ঞান করি।"[৩]

লোকের সাধু উদ্দেশ্যে পারিষদদের বিশ্বাস কম—সকলকেই তাঁহারা সন্দেহের চক্ষে দেখেন ও মহারাজের স্বাভাবিক ঔদার্যকে তাঁহারা আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনে শান্তিনিকেতনে আশ্রম স্থাপনের পরিকল্পনা অস্ফুটভাবে দেখা দেয়। কবির মনে বোধ হয় অস্পষ্ট ভাবে এই আশ্রমে রাজানুগ্রহ লাভের ইচ্ছাও ছিল; এবং সেই বিদ্যায়তনে রাজকুমারদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করিবেন বলিয়া মনে মনে আশা পোষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজসভার চক্রান্তে সে-প্রস্তাব কার্যকরী হয় নাই। মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্র কিশোরকে এক পত্রে লিখিতেছেন (১৮ শ্রাবণ ১৩০৮), "এরূপ অবস্থায় কোন প্রকার সদভিপ্রায় সাধন প্রায় অসাধ্য বলিয়া আমার মনে একএক সময় নৈরাশ্য উপস্থিত হয়— এবং ঐশ্বর্যশালীদের দ্বার হইতে বহুদূরে থাকিয়া যথাসাধ্য নিজের কর্তব্য পালন করিয়া যাইতে ইচ্ছা বোধ করি। লক্ষ্মীমান্ পুরুষেরা নিজে মহদাশয় হইলেও ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তিদের দ্বারা এমন পরিবেষ্টিত যে ইচ্ছা করিলেও তাঁহাদের শুভচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহাদিগকে পৃথিবীর শুভকার্যে প্রবৃত্ত করা অসম্ভব।"[৪]

কবির মনে এই স্বপ্ন জাগিতেছিল যে ত্রিপুরা রাজদরবারের মধ্য দিয়া একটি আদর্শ রাজ্যশাসন তন্ত্র গড়িয়া তুলিবেন, যাহার পটভূমে থাকিবে হিন্দু নৃপতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ। সাহিত্যে, শিক্ষায়, শাসনপরিকল্পনায় তিনি মহারাজকে নানাভাবে সদুপদেশ ও সহায়তা দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াস পান। ত্রিপুরার মহারাজকে বর্ণাশ্রমের মহিমা ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গৌরব ব্যাখ্যা করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

রাজ্যকে নূতনভাবে চালাইতে এবং নূতন আদর্শে গড়িতে কবি মহারাজকে নানাভাবে সাহায্য করেন। তাঁহারই পরামর্শে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা আটর্নি কৃতবিদ্ রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় রাজ্যের দেওয়ান পদে ও অক্ষয়

১ দ্র মহিমচন্দ্র ঠাকুর, দেশীয় রাজ্য পৃ ৩১৫। ইহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে মহত্ত্বভাব ছিল, তাহা আবিষ্কার করা এখন কঠিন নহে।

২ দ্র পূর্ব্বাশা ১৩৪৮ রবীন্দ্রস্মৃতি সংখ্যা পৃ ১১০

৩ প্রবাসী ১৩৪৮ আশ্বিন।

৪ পত্রাবলী। জোড়াসাঁকো। [১৩০৮ আষাঢ়] এই পত্রে আছে শ্রাবণ মাসের [১৩০৮] আগামী বঙ্গদর্শনে "হিন্দুত্ব প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি সমাজই হিন্দুর হিন্দুত্ব এবং রাজা ব্রাহ্মণ বণিক শূদ্র সেই সমাজকেই নানা দিক হইতে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য।" বি-ভা-প ১৩৪৯ আশ্বিন পৃ ১৬৭।

চৌধুরীর জামাতা যতীন্দ্রনাথ বসু (মৃত ১৯৪৫ জুন) রাজার প্রাইবেট সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হন। ইহার কারণ রবীন্দ্রনাথ জানিতেন যে বিদেশী অধ্যাপক ও অভিভাবকগণের শিক্ষা ও সঙ্গ ভারতীয় রাজকুমারগণের পক্ষে আদৌ মঙ্গলকর হইবে না; তিনি আশা করিতেছিলেন বাংলার এই প্রত্যন্তবাসী তেজস্বী জাতির মধ্যে ভারতের প্রাচীন হিন্দুরাজাদের সুস্থ বলিষ্ঠ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতের মঙ্গল সুনিশ্চিত। রাজকোষের অপব্যয় প্রবাদগত; সেই অপব্যয় কথঞ্চিৎ রোধ করিয়া সাহিত্যসেবায়, শিক্ষাকর্মে রাজসভার মন আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিলেন। 'বঙ্গদর্শনে'র জন্য যে সাহায্য চাহিয়াছিলেন, তাহা ভারতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রচারের জন্য, তপোবনের পরিকল্পনা ও ভারতে হিন্দুবর্ণাশ্রমের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ মহারাজকে যেসব পত্র লেখেন তাহার অধিকাংশের মধ্যে ভারতীয় হিন্দু আদর্শবাদের আলোচনা থাকিত; তাঁহার চিত্তকে নানা মঙ্গলকর্মে উদ্‌বুদ্ধ করিবার সকল প্রকার সাধু চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ সাধ্যমত করেন। কুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকেও যেসব পত্র লেখেন তাহাও ক্ষত্রিয়ধর্মের গৌরব ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের মহিমাসম্বন্ধে উপদেশ। মোট কথা ত্রিপুরা রাজদরবারের সহিত রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতার কথা আলোচনা করিলে গ্যেটের সহিত Weimer রাজদরবারের সম্বন্ধের কথা স্মরণ হয়।

ওগো যৌবন-তরী,
এবার বোঝাই সাঙ্গ করে দিলাম বিদায় করি।
কতই খেয়া, কতই খেয়াল,
কতই না দাঁড়-বাওয়া,
তোমার পালে লেগেছিল
কত দখিন হাওয়া।

. . .

অনেক খেলা, অনেক মেলা,
সকলি শেষ করে
চল্লিশেরি ঘাটের থেকে
বিদায় দিনু তোরে।

নির্দেশিকা

গ্রন্থতালিকা

১২৮৫-১৩০৭

কবিকাহিনী (১২৮৫) [পাণ্ডুলিপিতে উপহার আছে, নাম নাই]
বনফুল (১২৮৬) —
ভগ্নহৃদয় (১২৮৮) [কাদম্বরী দেবী]
রুদ্রচণ্ড (১২৮৮) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র (১২৮৮) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সন্ধ্যাসংগীত (১২৮৮) —
কালমৃগয়া (১২৮৯) —
বৌঠাকুরানীর হাট (১২৮৯) সৌদামিনী দেবী
প্রভাতসংগীত (১২৯০) ইন্দিরা দেবী
বিবিধ প্রসঙ্গ (১২৯০) —
ছবি ও গান (১২৯০) [কাদম্বরী দেবী]
প্রকৃতির পরিশোধ (১২৯১) [কাদম্বরী দেবী]
নলিনী (১২৯১) —
শৈশবসংগীত (১২৯১) [কাদম্বরী দেবী]
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১২৯১) [কাদম্বরী দেবী]
রামমোহন রায় (১২৯১) —
আলোচনা (১২৯১) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
রবিচ্ছায়া (১২৯২) —
কড়ি ও কোমল (১২৯৩) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
রাজর্ষি (১২৯৩) —
চিঠিপত্র (১২৯৩) —
সমালোচনা (১২৯৪) জ্ঞানদানন্দিনী দেবী
মায়ার খেলা (১২৯৫) সরলা রায়
রাজা ও রানী (১২৯৬) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিসর্জন (১২৯৭) সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মন্ত্রী অভিষেক (১২৯৭) —
মানসী (১২৯৭) [মৃণালিনী দেবী ?]
য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি ভূমিকা (১২৯৮) লোকেন পালিত
চিত্রাঙ্গদা (১২৯৯) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গোড়ায় গলদ (১২৯৯) প্রিয়নাথ সেন
য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি (১৩০০) লোকেন পালিত
সোনার তরী (১৩০০) দেবেন্দ্রনাথ সেন
ছোটোগল্প (১৩০০) বিহারীলাল গুপ্ত
বিচিত্র গল্প (১৩০১) —
কথাচতুষ্টয় (১৩০১) —
গল্পদশক (১৩০২) আশুতোষ চৌধুরী
নদী (১৩০২) বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর
চিত্রা (১৩০২) —
কাব্যগ্রন্থাবলী (১৩০৩) —
বৈকুণ্ঠের খাতা (১৩০৩) —
পঞ্চভূত (১৩০৪) জগদিন্দ্রনারায়ণ রায়
কণিকা (১৩০৬) প্রমথনাথ চৌধুরী
কথা (১৩০৬) জগদীশচন্দ্র বসু
কাহিনী (১৩০৬) রাধাকিশোর মাণিক্য
কল্পনা (১৩০৭) শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
ক্ষণিকা (১৩০৭) লোকেন পালিত

১২৮৫ সালে রবীন্দ্রনাথের কবিকাহিনী প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তখন তাঁহার বয়স ১৭ বৎসর। ক্ষণিকা প্রকাশিত হয় ১৩০৭ সালে, তখন তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর। এই তালিকায় কাহাকে কোন্ গ্রন্থ উপহৃত হইয়াছে তাহা দেওয়া হইল। যেখানে নাম স্পষ্ট করিয়া নাই, সেখানে নামটি বন্ধনীর মধ্যে দিয়াছি। যে গ্রন্থ উৎসর্গিত হয় নাই, তাহার পাশে রেখা টানা হইল।

সংশোধন ও সংযোজন

পৃষ্ঠা- ও পংক্তি-ক্রমে সজ্জিত

সূচী ৮।১৮	অশুদ্ধ 'কবিগান' শুদ্ধ 'কবিগণ'।
৯।১	অশুদ্ধ '১৭৫৫ শক', শুদ্ধ '১৭৬৫ শক'।
১৪।১৬	অশুদ্ধ 'অক্টোবর ২২', শুদ্ধ 'অক্টোবর ২৫'।
১৪।২৩	অশুদ্ধ 'জানুয়ারি ২৬', শুদ্ধ 'জানুয়ারি ২৩'।
২৭।৯	অশুদ্ধ 'কৈলাস মুখুজ্জে', শুদ্ধ 'কিশোরী চাটুজ্জে'।
২৭।২৫-২৮	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' পুস্তকেই রবীন্দ্রনাথ 'কর খল' ও 'জল পড়ে পাতা নড়ে' পড়িয়াছিলেন কি না সন্দেহের বিষয়। দ্র প্রবোধচন্দ্র সেন-কৃত 'জীবনস্মৃতি'র সমালোচনা, কবিতা ১৩৫১ আষাঢ় পৃ ২৭০-৭২।
৪০।২১	অশুদ্ধ 'প্রথম সর্গের', শুদ্ধ 'তৃতীয় সর্গের'।
৪০। পাদটীকা ১	অশুদ্ধ '১১ বৎসর', শুদ্ধ '১৩ বৎসর'।
৪১। পাদটীকা ৩য় পংক্তি	ভারতীতে কুমারসম্ভব-অনুবাদকের নাম ছিল না। তাই অনুবাদটি যে রবীন্দ্রনাথেরই তাহা এতদিন বোঝা যায় নাই। একথা প্রথম বোঝা গেল প্রবোধচন্দ্র সেন-কর্তৃক প্রকাশিত পাণ্ডুলিপির অংশ এবং তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা' নামক প্রবন্ধ হইতে (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ বৈশাখ পৃ ৫৮৫-৯১ এবং ৬৫৪-৫৫)।
৪২।১৩	ম্যাকবেথের ডাকিনী-অংশের যে অনুবাদ ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে কৃত প্রথম অনুবাদ নয়। দ্র প্রবোধচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ বৈশাখ পৃ ৬৫৩।
৪২।২৭	'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ বিদ্বজ্জনসমাগমের দ্বিতীয় অধিবেশনে (১২৮২ বৈশাখ) পাঠ করেন। দ্র প্রবোধচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা, দেশ ১৬ চৈত্র ১৩৫২ পৃ ৩৭৫।
১৩১।১৪	'ভূদেববাবু এডুকেশন গেজেটে আমার প্রভাতসংগীতের সম্বন্ধে যে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাই বোধ করি আমার শেষ লাভ।' —পাণ্ডুলিপি
১৩২।৪	অশুদ্ধ lyaria, শুদ্ধ lyric.
২৫৫।১৭-১৮	প্রবোধচন্দ্র সেনের মতে সিন্ধুদূতের সমালোচনাটি রবীন্দ্রনাথেরই লেখা। দ্র রবীন্দ্রনাথ ও লৌকিক ছন্দ— বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫১ শ্রাবণ, ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ পৃ ২০-২১, রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রন্থ (দ্বিতীয় সং) পৃ ১৬৯-৭১।
২৬৪।৫	অশুদ্ধ 'ছন্দের যুক্তি', শুদ্ধ 'ছন্দের মুক্তি'।
২৬৪।৮	অশুদ্ধ 'স্বাধীনতা এ', শুদ্ধ 'স্বাধীনতা ও'।
৩৫৩। পাদটীকা	অশুদ্ধ 'পথের না দেখি', শুদ্ধ 'রথের না দেখি'।
৩৬৭।২৩	অশুদ্ধ 'দু'টা মাস', শুদ্ধ 'ছ'টা মাস'।